সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত।

Vol 3

তৃতীয় বর্ষ।

১২৯৯।

কলিকাতা

২৩নং বিদ্যাসাগরের ষ্ট্রীট, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে

শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা মুদ্রিত।

র্ণানুক্রমিক সূচী।

ঘ

চ

জ

ট

ত

দ

ন

প

সাহিত্য।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত।

তৃতীয় বর্ষ।

১২৯৯।

কলিকাতা

২৩নং বিদ্যাসাগরের ষ্ট্রীট, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

১৭নং রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে

শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা মুদ্রিত।

র্ণানুক্রমিক সূচী।

পূর্ণ মানবত্বের আদর্শ ও লক্ষণ। এই দুই বস্তুই মানবকে মানবত্ব প্রদান করিয়াছে, এবং ইহাদের চরম উৎকর্ষেই মানব ক্রমে দেবপদ লাভ করিবে।

সুতরাং, সাহিত্য সকলেরই আরাধ্য দেবতা।

কত, প্রতিভাশালী মানব-দেবতা প্রতিভার প্রত্যগ্র পুষ্প দিয়া সাহিত্যের পূজা করিতেছেন। আমাদের সে মহনীয় উপকরণ নাই বলিয়া, আমরা বিরত থাকিব কেন।—সূর্য্যের আলোক সত্ত্বেও জগতে খদ্যোতের ক্ষীণ দ্যুতি দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তি ক্ষুদ্র হউক, কিন্তু উদ্দেশ্য ক্ষুদ্র করিবার প্রয়োজন কি? শক্তির হীনতাবশতঃ আমাদের সাধনা সিদ্ধ হউক না হউক, আমরা কায়মনোবাক্যে ভক্তিভরে এই মহান্ ও পবিত্র সাহিত্যব্রত গ্রহণ করিয়াছি।

তাই এই ক্ষুদ্র আয়োজন। মহাব্রতের উদ্‌যাপনে এই নগণ্য তুচ্ছ আয়োজন যতই উপহাসাস্পদ হউক না কেন, তাহাতে ব্রতের মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হইবে না,—এই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

যাঁহার অনাবিল দৃষ্টির শুভ্র পবিত্র কিরণে, ধীরে ধীরে সমগ্র শিশু মানবগণের ক্ষুদ্র হৃদয় ক্রমে বিকশিত ও মহত্ত্বে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতেছে, তাঁহার প্রসাদে আমাদের সাহিত্যও ক্রমবিকশিত হউক; সত্য ও সৌন্দর্য্যের দীপ্ত প্রতিভায় আমাদের দীন সাহিত্য আলোকিত হইয়া উঠুক।

প্রভাবতীসম্ভাষণ।

বৎসে প্রভাবতি! তুমি, দয়া, মমতা ও বিবেচনায় বিসর্জ্জন দিয়া, এ জন্মের মত, সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছ। কিন্তু আমি, অনন্যচিত্ত হইয়া, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিন্তায় নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকি যে, তুমি, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পার নাই। প্রতি ক্ষণেই, আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে—

১। যেন, তুমি বসিয়া আছ, আমায় অন্য মনে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, 'নীনা' (১) বলিয়া, করপ্রসারণপূর্ব্বক, কোলে লইতে বলিতেছ।

২। যেন, তুমি, উপরের জানালা হইতে দেখিতে পাইয়া, 'আয় না' বলিয়া, সলীল করসঞ্চালন সহকারে, আমায় আহ্বান করিতেছ।

(১) নেনা।

৩। যেন, আমি আহার করিতে গিয়া, আসনে উপবিষ্ট হইয়া, তোমার পূজ্যপাদ পিতামহী দেবীকে, প্রভাবতী কোথায়, এই জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি শ্রবণমাত্র, সত্বর পদসঞ্চারে আসিয়া, 'এই আমি এসেছি' বলিয়া, প্রফুল্লবদনে, আমার ক্রোড়ে উপবেশন করিতেছ।

৪। যেন, তুমি, আমার ক্রোড়ে বসিয়া আহার করিতে করিতে, 'মাগী শোলো' (২) বলিয়া, আমার জানুতে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া, শয়ন করিতেছ।

৫। যেন, আমি আহারান্তে আসন হইতে উত্থিত হইবামাত্র, তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছ; আর সকলে, সাতিশয় আহ্লাদিত মনে, সহাস্য বদনে, শ্রবণ ও অবলোকন করিতেছেন (৩)।

৬। যেন, আমি, বিকালে, বাড়ীর ভিতরে জল খাইতেছি; তুমি, ক্রোড়ে বসিয়া, আমার সঙ্গে জল খাইতেছ; এবং, জল খাওয়ার পর, আমি মুখে সুপারী দিবামাত্র, তুমি, 'দুখুনি (৪) দে' বলিয়া, অঙ্গুলি দ্বারা, আমার মুখ হইতে সুপারী বহিষ্কৃত করিয়া লইতেছ।

৭। যেন, তুমি, বাহিরে আসিবার নিমিত্ত, আমার ক্রোড়ে আরোহণ করিয়াছ, এবং, সিঁড়ি নামিবার পূর্ব্বক্ষণে, আমার চিবুকধারণপূর্ব্বক, আকুল চিত্তে বলিতেছ, 'নাফাস্‌নি, পড়ে যাব।' আমি কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিতেছি, না আমি লাফাব। তুমি অমনি, ঈষৎ কোপাবিষ্ট হইয়া, তোমার জননীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছ, 'দেখ্‌দিখি মা, আমার কথা শোনে না' (৫)।

---

(২) মাগী শুইল। আমি আদর করিয়া, তোমায় মাগী বলিয়া আহ্বান ও সম্ভাষণ করিতাম; তদনুসারে, তুমিও মাগীশব্দে আত্মনির্দ্দেশ করিতে। তোমার এই দৈনন্দিন মঞ্জুল শয়নলীলা নয়নগোচর করিয়া, ব্যক্তিমাত্রেই পুলকিত হইতেন।

(৩) তুমি, এই নিয়মিত কৃত্রিম ঝগড়ার সময়ে, এরূপ স্বরভঙ্গী, বাক্যবিন্যাস, ও অঙ্গসঞ্চালনাদি করিতে, যে তদ্দর্শনে নিতান্ত পামরেরও হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দপ্রবাহে ও অননুভূতপূর্ব্ব কৌতুকরসে উচ্ছলিত হইত। বস্তুতঃ, এই ব্যাপার এত মধুর ও এত প্রীতিপ্রদ বোধ হইত, যে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, অনেকে তৎপ্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান থাকিতেন।

(৪) দুখানি।

(৫) তুমি এমন ভীরুস্বভাবা ছিলে, যে কখনও, সাহস করিয়া, গাড়ীতে চড়িতে পার

৮। যেন, তোমার দাদারা, উনি আর তোমায় ভাল বাসিবেন না, এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিতেছে। তুমি, তাহা পরিহাস বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া, পাছে আমি আর না ভাল বাসি, এই আশঙ্কায় আকুলচিত্ত হইয়া, 'ভাল বস্‌বি, ভাল বস্‌বি' (৬), এই কথা আমায় অনুপমেয় শিরশ্চালন-সহকারে, বারংবার বলিতেছ (৭)।

৯। যেন, আমি, খাব খাব বলিয়া, তোমার মুখচুম্বনের নিমিত্ত, আগ্রহপ্রদর্শন করিতেছি। তুমি, 'এই খা' বলিয়া, ডাইনের গাল ফিরাইয়া দিতেছ। আমি, ও খাব না বলিয়া মুখ ফিরাইতেছি। তুমি, 'তবে এই খা' বলিয়া, বামের গাল ফিরাইয়া দিতেছ। আমি, ও খাব না বলিয়া, মুখ ফিরাইতেছি। অবশেষে, তুমি, আর কিছু না বলিয়া, আপন অধর আমার অধরে অর্পিত করিতেছ।

এই রূপে, আমি, সর্ব্ব ক্ষণ, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি ও নিরতিশয় প্রীতিপ্রদ অনুষ্ঠান সকল অবিকল প্রত্যক্ষ করিতেছি; কেবল, তোমায় কোলে লইয়া, তোমার লাবণ্যপূর্ণ কোমল কলেবর পরিস্পর্শে, শরীর অমৃত-রসে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি না। দৈবযোগে, এক দিন, দিবাভাগে, আমার নিদ্রাবেশ ঘটিয়াছিল। কেবল, সেই দিন, সেই সময়ে, ক্ষণ কালের

নাই; এবং, সেই ভীরুস্বভাবতাবশতঃ, পড়িয়া যাইবার ভয়ে, সিঁড়ি নামিবার পূর্ব্বক্ষণে, আমায় সাবধান করিয়া দিতে।

(৬) ভাল বাসিবি, ভাল বাসিবি।

(৭) এই বিষয়ে, এক দিনের ব্যাপার মনে হইলে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আমি বাহিরের বারাণ্ডায় বসিয়া আছি; তুমি, বাড়ীর ভিতরের নীচের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া, আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছ। এমন সময়ে, শশী (রাজকৃষ্ণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিল, 'উনি আর তোমায় ভাল বাসিবেন না।' তুমি অমনি, শিরশ্চালন পূর্ব্বক, 'ভাল বস্‌বি, ভাল বস্‌বি,' এই কথা আমায় বারংবার বলিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন, আমি, ভাল বাসিব বলিয়া, অবিলম্বে তোমার শঙ্কা দূর করিতাম। সে দিন, সকলের অনুরোধে, আর ভাল বাসিব না, এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলাম; তুমিও, প্রতি বারেই, 'না ভাল বস্‌বি,' এই কথা বলিতে লাগিলে। অবশেষে, আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির করিয়া, তুমি, স্ফূর্ত্তিহীন বদনে, 'তুই ভাল বস্‌বিনি, আমি ভাল বস্‌বো,' এই কথা, এরূপ মধুর স্বরভঙ্গী ও প্রভূত স্নেহরস সহকারে বলিয়া বিরত হইলে, যে তদ্দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল। আমি, এই চিরস্মরণীয় ব্যাপার, কস্মিন্ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না।

জন্য, তোমায় পাইয়াছিলাম। দর্শনমাত্র, আহ্লাদে অধৈর্য্য হইয়া, অভূতপূর্ব্ব আগ্রহ সহকারে ক্রোড়ে লইয়া, প্রগাঢ় স্নেহভরে বাহু দ্বারা পীড়নপূর্ব্বক, সজল নয়নে তোমার মুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইতেছি, এমন সময়ে, এক ব্যক্তি, আহ্বান করিয়া, আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। এই আকস্মিক মর্ম্মভেদী নিদ্রাভঙ্গ দ্বারা, সে দিন, যে বিষম ক্ষোভ ও ভয়ানক মনস্তাপ পাইয়াছি, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিবার নহে।

বৎসে! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যখন, তুমি, এত সত্বর চলিয়া যাইবে বলিয়া, স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না-আসাই সর্ব্বাংশে উচিত ছিল। তুমি, স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়া, সকলকে কেবল মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়া গিয়াছ। আমি যে, তোমার অদর্শনে, কত যাতনাভোগ করিতেছি, তাহা তুমি একবারও ভাবিতেছ না।

* * * *

বৎসে! কিছু দিন হইল, আমি, নানা কারণে, সাতিশয় শোচনীয় অবস্থায় অবস্থাপিত হইয়াছি। সংসার নিতান্ত বিরস ও বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক পদার্থ ভিন্ন, আর কোনও বিষয়েই, কোনও অংশে, কিঞ্চিন্মাত্র সুখবোধ বা প্রীতিলাভ হইত না। তুমি আমার সেই এক পদার্থ ছিলে। ইদানীং, একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া, এই বিষময় সংসার অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম। যখন, চিত্ত বিষম অসুখে ও উৎকট বিরাগে পরিপূর্ণ হইয়া, সংসার নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণাভবন বলিয়া প্রতীয়মান হইত, সে সময়ে, তোমায় কোলে লইলে, ও তোমার মুখচুম্বন করিলে, আমার সর্ব্ব শরীর, তৎক্ষণাৎ, যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইত। বৎসে! তোমার কি অদ্ভুত মোহনী শক্তি ছিল, বলিতে পারি না। তুমি অন্ধতমসাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপ্ত প্রদীপের, এবং চিরশুষ্ক মরুভূমিতে প্রভূত প্রস্রবণের, কার্য্য করিতেছিলে। অধিক আর কি বলিব, ইদানীং তুমিই আমার জীবনযাত্রার একমাত্র অবলম্বন হইয়াছিলে। সুতরাং, তোমার অসদ্ভাবে, আমার কীদৃশ শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা তুমি, ইচ্ছা করিলে, অনায়াসে, স্বীয় অনুভবপথে উপনীত করিতে পার।

কিন্তু, এক বিষয় ভাবিয়া, আমি, কিয়ৎ অংশে, বীতশোক ও আশ্বাসিত হইয়াছি। বৎসে! তুমি এমন শুভ ক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে যে, ব্যক্তিমাত্রেই, তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি ও প্রভূতমাধুরীপূর্ণ ভাবভঙ্গী দৃষ্টি-

গোচর করিয়া, নিরতিশয় পুলকিত ও চমৎকৃত হইতেন। তুমি সকলের নয়নতারা ছিলে। সকলেই তোমায় আপন প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিতেন। এই নগরের অনেক পরিবারের সহিত আমার প্রণয় ও পরিচয় আছে; কিন্তু, কোনও পরিবারেই, তোমার ন্যায়, অবিসংবাদে সর্ব্বসাধারণের নিরতিশয় স্নেহভূমি ও আদরভাজন অপত্য, এ পর্য্যন্ত, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। তুমি যে স্বল্পকাল সংসারে ছিলে, তাহা আদরে আদরে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছ। অস্নেহ বা অনাদর কাহাকে বলে, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, তোমায় তাহার অণুমাত্র অনুভব করিতে হয় নাই।

কিন্তু, এই নৃশংস সংসারে দীর্ঘ কাল অবস্থিতি করিলে, উত্তর কালে, তোমার ভাগ্যে কি ঘটিত, তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। হয় ত, ভাগ্যগুণে সৎ পাত্রে প্রতিপাদিতা ও সৎ পরিবারে প্রতিষ্ঠিতা, হইয়া অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতে; নয় ত, ভাগ্যদোষে, অসৎ পাত্রের হস্তগতা ও অসৎ পরিবারের করাল কবলে পতিতা হইয়া, অবিচ্ছিন্ন দুঃখসম্ভোগে কালাতিপাত করিতে হইত। যদি, পরম যত্নে ও পরম আদরে পরিবর্দ্ধিত করিয়া, পরিশেষে, তুমি অবস্থার বৈগুণ্যনিবন্ধন দুঃসহ ক্লেশপরম্পরায় কালযাপন করিতেছ, ইহা দেখিতে হইত, তাহা হইলে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বোধ হয়, তোমার অতর্কিত অন্তর্ধান নিবন্ধন যাতনা অপেক্ষা, সে যাতনা বহু সহস্র গুণে গরীয়সী হইত। তুমি, স্বল্পকালে সংসারব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া, আমাদের সেই সম্ভাবিত অতি বিষম আন্তরিক যাতনাভোগের সম্পূর্ণরূপ অপসারণ করিয়াছ। তোমায় যে, ক্ষণ কালের জন্য, কাহারও নিকটে, কোনও অংশে, অণুমাত্র অস্নেহ বা অনাদরের আস্পদ হইতে হইল না, আদরে আদরে নরলীলা সম্পন্ন করিয়া গেলে, ইহা ভাবিয়া, আমি আমার অবোধ মনকে কথঞ্চিৎ প্রবোধ দিতে পারিব।

বিশেষতঃ, দীর্ঘকাল নরলোকবাসিনী হইলে, অপরিহরণীয় পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়া, প্রৌঢ় অবস্থায়, তোমায় যে সকল লীলা ও অনুষ্ঠান করিতে হইত, নিতান্ত শৈশব অবস্থাতেই, তুমি তৎসমুদয় সম্যক্ সম্পন্ন করিয়া গিয়াছ। স্বভাবসিদ্ধ অদ্ভুত কল্পনাশক্তির প্রভাববলে, তুমি শ্বশুরালয় প্রভৃতি উদ্ভাবিত করিয়া লইয়াছিলে (৮)।

(৮) তুমি শ্বশুরালয়ের নাম কৃষ্ণনগর, স্বামীর নাম গোবর্দ্ধন, শাশুড়ীর নাম ভাগ্যবর্ত্ত পুত্রের নাম নদে রাখিয়াছিলে।

১। কখনও কখনও, স্নেহ ও মমতার আতিশয্যপ্রদর্শন পূর্ব্বক, ঐকান্তিক ভাবে, তনয়ের লালনপালনে বিলক্ষণ ব্যাপৃত হইতে।

২। কখনও কখনও, 'তাহার কঠিন পীড়া হইয়াছে' বলিয়া, দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে, ধরাসনে শয়ন করিয়া থাকিতে।

৩। কখনও কখনও, 'শ্বশুরালয় হইতে অশুভ সংবাদ আসিয়াছে' বলিয়া, ম্লান বদনে ও আকুল হৃদয়ে, কালযাপন করিতে।

৪। কখনও কখনও, 'স্বামী আসিয়াছেন' বলিয়া, ঘোমটা দিয়া, সঙ্কুচিত ভাবে, এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতে; এবং, সেই সময়ে, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, লজ্জাশীলা কুলমহিলার ন্যায়, অতি মৃদু স্বরে উত্তর দিতে।

৫। কখনও কখনও, 'পুত্রটি একলা পুকুরের ধারে গিয়াছিল, আর একটু হইলেই ডুবিয়া পড়িত,' এই বলিয়া, সাতিশয় শোকাভিভূত হইয়া, নিরতিশয় আকুলতাপ্রদর্শন করিতে।

৬। কখনও কখনও, 'শ্বাশুড়ীর পীড়ার সংবাদ আসিয়াছে' বলিয়া, অবিলম্বে শ্বশুরালয়ে যাইবার নিমিত্ত, সজ্জা করিতে (৯)।

এই রূপে, তুমি সংসারযাত্রাসংক্রান্ত সকল লীলা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছ। বোধ হয়, যদি এই পাপিষ্ঠ নৃশংস নরলোকে অধিক দিন থাক, উত্তর কালে বিবিধ যাতনাভোগ একান্ত অপরিহার্য্য, ইহা নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছিলে। এই জন্যই, ঈদৃশ স্বল্প সময়ে, যথাসম্ভব, সাংসারিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিয়া, সত্বর অন্তর্হিত হইয়াছ। তুমি, স্বল্প কালে নরলোক হইতে অপসৃত হইয়া, আমার বোধে, অতি সুবোধের কার্য্য করিয়াছ। অধিক কাল থাকিলে, আর কি অধিক সুখভোগ করিতে; হয় ত, অদৃষ্টবৈগুণ্যবশতঃ, অশেষবিধ যাতনাভোগের একশেষ ঘটিত। সংসার যেরূপ বিরুদ্ধ স্থান, তাহাতে, তুমি, দীর্ঘজীবিনী হইলে, কখনই, সুখে ও সচ্ছন্দে, জীবনযাত্রার সমাধান করিতে পারিতে না।

---

(৯) তুমি, স্বকপোলকল্পিত সাংসারিক কাণ্ড লইয়া, যে সমস্ত লীলা করিয়াছ, তৎসমুদায় প্রায় প্রবীণতা সহকারে সম্পাদিত হইয়াছে। * * * কখনও কখনও, তোমার পূজ্যপাদ পিতামহী দেবী, তোমার কল্পিত স্বামীর উল্লেখপূর্ব্বক, পরিহাস করিয়া জিজ্ঞাসিতেন, 'কমন প্রভা, সে এসেছিল?' তুমি অমনি, শিরশ্চালন পূর্ব্বক, 'কাল এসেছিল' বলিয়া, উত্তর দিতে। পর ক্ষণেই তিনি, 'কি দিয়ে গেল,' এই জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি, 'চারি পয়সা ও সিকি পয়সার শাক,' এই উত্তর দিতে।

কিন্তু, এক বিষয়ে, আমার হৃদয়ে নিরতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়া রহিয়াছে। অন্তিম পীড়াকালে, তুমি, উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া, জলপানের নিমিত্ত, নিতান্ত লালায়িত হইয়াছিলে। কিন্তু, অধিক জল দেওয়া চিকিৎসকের মতানুযায়ী নয় বলিয়া, তোমায় ইচ্ছানুরূপ জল দিতে পারি নাই। ঔষধসেবনান্তে, কিঞ্চিৎ দিবার পর, আকুল বচনে, 'আর খাব' 'আর খাব' বলিয়া, জলের নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি লালসাপ্রদর্শন করিতে। কিন্তু, আমি, ইচ্ছানুরূপ জলপ্রদানের পরিবর্ত্তে, তোমায় কেবল প্রবঞ্চনাবাক্যে সান্ত্বনাপ্রদানের চেষ্টা করিতাম। যদি তৎকালে জানিতে পারিতাম, তুমি অবধারিত পলায়ন করিবে, তাহা হইলে, কখনই, তোমায় পিপাসার যন্ত্রণায় অস্থির ও কাতর হইতে দিতাম না; ইচ্ছানুরূপ জলপান করাইয়া, নিঃসন্দেহ, তোমার উৎকটপিপাসানিবন্ধন অসহ্য যাতনার সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিতাম। সে যাহা হউক, বৎসে! তুমি উৎকট পিপাসায় সাতিশয় আকুল হইয়া, জলপ্রার্থনাকালে, আমার দিকে, বারংবার, যে কাতর দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, তাহা আমার হৃদয়ে বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায়, চির দিনের নিমিত্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে। যদি তোমার সকল কাণ্ড বিস্মৃত হই, ঐ মর্ম্মভেদী কাতর দৃষ্টিপাত, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইবেক না। যদি তাহা বিস্মৃত হইতে পারি, তাহা হইলে, আমার মত পামর ও পাষণ্ড ভূমণ্ডলে আর নাই।

বৎসে! আমি যে তোমায় আন্তরিক ভাল বাসিতাম, তাহা তুমি বিলক্ষণ জান। আর, তুমি যে আমায় আন্তরিক ভাল বাসিতে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি, তোমায় অধিক ক্ষণ না দেখিলে, যারপরনাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতাম। তুমিও, আমায় অধিক ক্ষণ না দেখিতে পাইলে, যারপরনাই অসুখী ও উৎকণ্ঠিত হইতে; এবং, আমি কোথায় গিয়াছি, কখন আসিব, আসিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন, অনুক্ষণ, এই অনুসন্ধান করিতে। এক্ষণে, এত দিন তোমায় দেখিতে না পাইয়া, আমি অতি বিষম অসুখে কালহরণ করিতেছি। কিন্তু, তুমি এত দিন আমায় না দেখিয়া, কি ভাবে কালযাপন করিতেছ, তাহা জানিতে পারিতেছি না। বৎসে! যদিও তুমি, নিতান্ত নির্ম্মম হইয়া, এ জন্মের মত, অন্তর্হিত হইয়াছ, এবং আমার নিমিত্ত আকুলচিত্ত হইতেছ কি না, জানিতে পারিতেছি না; আর, হয় ত, এত দিনে, আমায় সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হইয়াছ; কিন্তু, আমি

তোমায়, কস্মিন্ কালেও, বিস্মৃত হইতে পারিব না। তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি, চির দিনের নিমিত্ত, আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমায় বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যারপরনাই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। সতত পাঠ করিয়া, তোমায় সর্ব্বক্ষণ স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিব; তাহা হইলে, আর আমার তোমায় বিস্মৃত হইবার অণুমাত্র আশঙ্কা রহিল না।

বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্ম্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত, অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া, যাবজ্জীবন যাতনাভোগ করিতে না হয়। *

ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

---

* পূজ্যপাদ, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাতামহ মহাশয়, শিশুদের প্রতি অতিশয় স্নেহময় ছিলেন। বর্ত্তমান ক্ষুদ্র রচনায় তাঁহার সেই স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়।

পূজ্যপাদ শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত, মাতামহদেবের বিশেষ সৌহৃদ্য ও আত্মীয়তা ছিল। তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রভাবতী এই রচনার বিষয়। ১৭৮২ শাকের ২৩শে মাঘ প্রভাবতীর জন্ম হয়; ১৭৮৫ শাকের ৪ঠা ফাল্গুন, তিন বৎসর বয়সে প্রভাবতীর মৃত্যু হয়। মাতামহদেব, প্রভাবতীকে অপত্যনির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতেন। এই সময়ে, নানাবিধ কারণে, তিনি সংসারে সম্পূর্ণ বীতরাগ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন, এই ক্ষুদ্র রচনায় তাহার আভাষ পাওয়া যায়। মনের এই অবস্থায়, স্নেহভাজনের বিয়োগে, তাঁহার স্নেহময় করুণ-হৃদয় বড় ব্যথিত হইয়াছিল। প্রভাবতীর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য, তিনি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর তিন চারি মাস পূর্ব্বেও আমি তাঁহাকে একান্তে "প্রভাবতী-সম্ভাষণ" পড়িতে দেখিয়াছি। প্রভাবতীর স্মৃতি তিনি চিরদিন হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন।

প্রভাবতীর ক্ষুদ্র কথায়, একটি ছোট মেয়ের খেলাধুলার বেশ একটি মনোজ্ঞ ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। স্নেহ ও প্রেমের মধুর ভাবে, এবং সরল শোকের ছায়ায়, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি যেন আরও মনোহর হইয়াছে। ইহা কখনও পাঠকসমাজে প্রকাশিত হয় নাই। পূজ্যপাদ মাতামহদেবের এই অপ্রকাশিত রচনা, পাঠকগণের প্রীতিপ্রদ হইবে মনে করিয়া, "সাহিত্যে" মুদ্রিত হইল।

এই প্রবন্ধ, ১৭৮৬ শকাব্দার ১লা বৈশাখ লিখিত হয়। এক্ষণে, ১৮১৪ শকাব্দা চলিতেছে। অতএব, প্রায় ঊনত্রিশ বৎসর হইল, এই প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছিল।—সাহিত্য-সম্পাদক।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

বোম্বাইয়ের সেণ্টজেভিয়ার কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর রাজারাম রামকৃষ্ণ ভাগবত মহোদয় "মরাঠ্যাঁচ্যা সম্বন্ধানে চার "উদ্গার" অর্থাৎ "মরাঠাগণের (মহারাষ্ট্রীয়গণের) সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত। ইহাতে মরাঠাগণের (মহারাষ্ট্রীয় জাতির) ও মরাঠী (মহারাষ্ট্রীয়) ভাষার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও অতি প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার মহারাষ্ট্র দেশের একজন সুপরিচিত প্রতিভাশালী লেখক ও বক্তা। তাঁহার গ্রন্থে ও বক্তৃতায় স্বাধীন গবেষণার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তদীয় গ্রন্থের প্রতি পংক্তিতে, তাঁহার স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতিপ্রীতির জলন্ত ভাব সমূহ সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। এই কারণেই তাঁহার স্বদেশবাসিগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, এই গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের অবতারণা ও বিচার করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে (মহারাষ্ট্রীয় ভাষায়) যত অধিক আলোচনা ও বিচার বিতর্ক হইবে, তিনি ততই সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আলোচিত বিষয়গুলি বঙ্গীয় পাঠকগণের বোধগম্য হইবার কোনও উপায় নাই। এই নিমিত্ত, এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ বিচার করা হইয়াছে, আমরা এ স্থলে তাহার কিয়দংশ অনুবাদিত করিয়া, বঙ্গীয় পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

[এই প্রবন্ধের অন্তর্গত (ক)-চিহ্নিত প্যারেগ্রাফ্‌গুলি মূল গ্রন্থের অনুবাদ, এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য অংশগুলি উহারই টীকারূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।]

(ক) "নন্দের রাজত্বকালে অর্থাৎ শকাব্দের প্রায় ৪২৫ বৎসর পূর্ব্বে (৩৪৩ পূঃ খৃঃ), কাত্যায়ন বররুচি "প্রাকৃত প্রকাশ" নামক প্রাকৃত ভাষার (সংস্কৃত নাটকাদিতে ব্যবহৃত বাল ভাষার) এক ব্যাকরণ রচনা করেন।"

ডাক্তার হন্টারের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে প্রাকৃতপ্রকাশ রচিত

হয়। "The prakrita (that is naturally ivolved dialects) found their earliest extant exposition in the grammar of Vararoochi, about the first century B. C." (W. W. Hunter's Indian Empire pp. 336.) পণ্ডিতপ্রবর লাসেনের মতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যভাগে বররুচি প্রাদুর্ভূত হন।

বররুচি তাঁহার গ্রন্থে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী এই চারি ভাষারই আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে নয় অধ্যায় (৪২৪ সূত্র) মহারাষ্ট্রী ভাষার; এক অধ্যায় (৩২ সূঃ) শৌরসেনী ভাষার; এক অঃ (১৭ সূঃ) মাগধী ভাষার ও অবশিষ্ট এক অধ্যায় (১৪ সূঃ) পৈশাচী ভাষার অলোচনায় পরিপূর্ণ (১)।

(ক) "শেষং মহারাষ্ট্রীবৎ" এইটি তাঁহার ব্যাকরণের শেষ সূত্র। ইহার অর্থ—"এতদ্ব্যতীত শৌরসেনী ভাষার অন্যান্য সমুদয় নিয়ম মহারাষ্ট্রী ভাষার ন্যায় জানিবে।" শৌরসেনী ভাষা প্রাকৃত বা বাল ভাষার অন্তর্গত। শূরসেন—মথুরা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ। পূর্ব্বে এই প্রদেশে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহারই নাম শৌরসেনী ভাষা। নাটকাদিতে উচ্চবংশীয়া সম্ভ্রান্তা রমণীগণ পূর্ব্বে এই শৌরসেনী ভাষাতেই কথোপকথন করিতেন। নাটক, সমাজের অবিকল চিত্রস্বরূপ। অতএব, যে সময়ে সংস্কৃত ভাষায় নাটকাদি রচিত হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় সমাজে উচ্চবংশীয়া রমণীগণ শৌরসেনী ভাষাতেই কথোপকথন করিতেন, সন্দেহ নাই। কাত্যায়ন বররুচি বলেন, শৌরসেনী ভাষার এক প্রকৃতি যেমন সংস্কৃত, অপর প্রকৃতি তেমনই মহারাষ্ট্রী। শৌরসেনী ভাষা হইতে মাগধী ও পৈশাচী নামক বাল-ভাষাদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছে।"

বররুচি যে সূত্রে এ সকল কথা বলিয়াছেন, গ্রন্থকার তাহা উদ্ধৃত করেন নাই। রাম তর্কবাগীশ স্বরচিত "প্রাকৃতকল্পতরু" গ্রন্থে প্রথমতঃ মহারাষ্ট্রী ভাষার বিষয় বলিয়া পরে বলিতেছেন,—"বিরচ্যতে সম্প্রতি শৌরসেনী, পূর্ব্বৈব ভাষা প্রকৃতিঃ কিলাস্যাঃ।"—(১ম স্তবক, দ্বিতীয় শাখা) অর্থাৎ মহারাষ্ট্রী ভাষাই শৌরসেনীর প্রকৃতি বা জননী। প্রাকৃতপ্রকাশের দশমাধ্যায়ের প্রারম্ভে বররুচি বলিয়াছেন, "পৈশাচী—প্রকৃতিঃ শৌরসেনী" এবং

(১) Vide Dr. Jhon Muir's "Original Sanskrit Texts." Vol II. Section IV.

একাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, "মাগধী—প্রকৃতিঃ শৌরসেনী"। অর্থাৎ শৌরসেনী ভাষা মাগধী ও পৈশাচী এই বালভাষাদ্বয়ের প্রকৃতি বা জননী।

মাগধী ভাষা সম্বন্ধে রাম তর্কবাগীশ বলেন,—"অথ ইহ মাগধী অনুশিষ্যতে। * * * অন্যাঃ মহারাষ্ট্রকশৌরসেনভাষে প্রবীণৈঃ প্রকৃতী নিরুক্তে। (প্রাঃ কঃ তঃ ২য় স্তবক।) ভাবার্থ—মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী ভাষা প্রবীণদিগের মতে মাগধী ভাষার প্রকৃতি। (২)

(ক) "গয়া, পাটনা ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশকে মগধ বলে। এই প্রদেশে প্রচলিত ভাষার নাম মাগধী। পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশকে পুরাকালে পিশাচ দেশ বলিত। বাহ্লীক, বোখরা ও সমরকন্দ প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসিগণকে মহাভারতীয় কর্ণপর্ব্বে "পিশাচসন্তান" বলা হইয়াছে। ইহাদের ভাষা পৈশাচী।"

প্রাকৃতপ্রকাশের টীকাকার বলেন,—"পিশাচানাং ভাষা পৈশাচী।" অর্থাৎ পিশাচদিগের ভাষাকে পৈশাচী ভাষা বলে। কোন্ কোন্ দেশের অধিবাসিদিগকে পিশাচ বলে? এ সম্বন্ধে ডাঃ জন মিউয়ারের "Orignial Sanskrit Texts" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৮ পৃষ্ঠায় যে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এইঃ—"পিশাচদেশনিয়তম্ পিশাচীদ্বিতয়ম্ বিদুঃ। পিশাচদেশস্তু বৃদ্ধৈরুক্তঃ। পাণ্ড্য-কেকয়-বাহ্লীক-সহ্য-নেপাল-কুন্তলাঃ। সুধেষ-ভোট-গান্ধার-হৈব-কানোজনাস্তথা। এতে পিশাচদেশাঃ স্যুস্তদ্দেশ্য-স্তদ্‌গুণো ভবেৎ।" ভাবার্থ—প্রাচীনদিগের মতে, পাণ্ড্য, কেকয়, বাহ্লীক, সহ্য, নেপাল, কুন্তল, সুধেষ, ভোট, গান্ধার, হৈব ও কানোজন—এই কয়টি প্রদেশকে পিশাচদেশ বলে। ডাক্তার হণ্টার বলেন, "Paishachee, loosely applied to out lying non-Aryan dialects from Nepal to Cape Commorin." (Indian Empire. pp. 337.)

মাগধী ভাষা সম্বন্ধে ডাক্তার রামদাস সেন বলেন, "সাধারণতঃ পালি মগধদেশীয় ভাষা। এই প্রাকৃতভাষার নাম মাগধী; কিন্তু ইহা দৃশ্যকাব্যের প্রাকৃত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অতিপ্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে 'পালি ভাষা' এই নামের পরিবর্ত্তে 'মাগধী ভাষা,' এই নামে পালি ভাষা বুঝাইত। বররুচির প্রাকৃতপ্রকাশের মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর সহিত পালি ভাষার কোনও সাদৃশ্য নাই।"—ঐতিহাসিক রহস্য ২য় ভাগ ১৫৫ পৃষ্ঠা।

(২) Vide Dr, Jhon Muir's "original Sanskrit Texts." Vol II. Section. IV.

(ক) "কাত্যায়নের মতে, শৌরসেনী হইতে মাগধী ও পৈশাচী ভাষার উৎপত্তি হয়; এবং শৌরসেনী ভাষার এক প্রকৃতি সংস্কৃত ও আর এক প্রকৃতি মহারাষ্ট্রী। অতএব মহারাষ্ট্রী ভাষাকে প্রাচীন কালে প্রচলিত বালভাষাসমূহের প্রকৃতি বা জননী বলা অসঙ্গত নহে। আলঙ্কারিকগণ বলেন, "গাথার ভাষা মহারাষ্ট্রী।" (৩) 'গাথা' শব্দের উৎপত্তি 'গৈ' ধাতু হইতে। গাথা শব্দে প্রায়ই গীতি বুঝায়। আলঙ্কারিকগণের এই বচনানুসারে প্রাচীনকালের গান গাইবার ভাষা মহারাষ্ট্রী ছিল, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যে ভাষা সকল বালভাষার জননী এবং প্রাচীনকালের গান গাইবার যে ভাষা, তাহাই মহারাষ্ট্রী বা অতি প্রাচীন মরাঠী।"

ডাক্তার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর বলেন, "যতগুলি প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা আছে, তন্মধ্যে যে ভাষা প্রধান, তাহাকে মহারাষ্ট্রী বলে। মহারাষ্ট্রী = মহারাষ্ট্র দেশের ভাষা"। (Dr. Bhandarkar's Early History of the Deccan. part III.)

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিত আছে,—"It is remarkable, however, that the principal dialect in the oldest Prakrita grammar (that by Vararuchi) is called maharastree." (Vide his history of India. PP. 224. note.). রাম তর্কবাগীশ বলেন,—"সর্ব্বাসু ভাষাম্বিহ হেতুভূতাম্ ভাষাম্ মহারাষ্ট্রভাষাম্ পুরস্তাৎ।" অর্থাৎ—"মহারাষ্ট্রদেশ-সম্ভূতা এই প্রাকৃত ভাষাই অন্যান্য সমস্ত ভাষার জননীস্বরূপ"। মহারাষ্ট্রভাষার শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধে চণ্ডীদেবকৃত 'প্রাকৃতদীপিকা' গ্রন্থে লিখিত আছে, "এতদপি লোকানুসারাৎ নাটকাদৌ মহাকবিপ্রয়োগদর্শনাৎ প্রাকৃতম্ মহারাষ্ট্রদেশীয়ম্ প্রকৃষ্টভাষণম্। তথাচ দণ্ডী— 'মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাম্ প্রকৃষ্টং প্রাকৃতম্ বিদুঃ।' ইতি"। অর্থাৎ মহারাষ্ট্র দেশ প্রচলিত এই প্রাকৃত ভাষা, সাধারণের ব্যবহারের উপযোগিতার জন্য এবং প্রসিদ্ধ কবি ও নাটককারদিগের ব্যবহারবশতঃ সমস্ত ভাষার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কারণ দণ্ডী বলিয়াছেন, "যে প্রাকৃত ভাষা মহারাষ্ট্রদেশে ব্যবহৃত হয়, তাহাই অনেকের বিবেচনায়

(৩) "গাথাসু মহারাষ্ট্রীম্ প্রযোজয়েৎ"—(সাহিত্য-দর্পণ)। 'গাথা' শব্দের একটি আভিধানিক অর্থ সঙ্গীত বা গেয় শ্লোক। তদনুসারে, গাথা সমুদায় পূর্ব্বে গীত হইত, বোধ হয়। গাথা শব্দটি অতি প্রাচীন।" ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় ২য় ভাগ ২৮৫ পৃঃ।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ।” দণ্ডী আরও বলিয়াছেনঃ—“সাগরঃ শুক্তিরত্নানাম্ সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্” । অর্থাৎ এই মহারাষ্ট্রী ভাষা, সেতুবন্ধাদির (৪) ন্যায় শুক্তিরত্ন-পরিপূর্ণ সাগর সদৃশ । (৫)

(ক) “কাত্যায়নের শেষ সূত্রের মহারাষ্ট্রী শব্দ ও ‘প্রাকৃত’ এই শব্দ, অতি নিকট-সম্বন্ধ-যুক্ত বা এক পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া বোধ হয় । ‘মহারাষ্ট্রীবৎ অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষার ন্যায় মুখ্য’ ।”

ডাক্তার জন মিওয়ারও বলেন,—“It appears that the ancient maharastri, and the dialect called by way of eminence “the Prakrit” are the same. (Original Sanskrit Texts. Vol II. pp. 44.) অর্থাৎ প্রাচীন মহারাষ্ট্রী ভাষা এবং যে ভাষা অপর ভাষা সমূহের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রাকৃত নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহা এক বলিয়াই বোধ হয় । সদ্ভাষাচন্দ্রিকা-কার লক্ষ্মীধরও বলেনঃ—“প্রাকৃতং মহারাষ্ট্রদেশোদ্ভবং” । অর্থাৎ মহারাষ্ট্রদেশোৎপন্ন ভাষাই প্রাকৃত, অথবা প্রাকৃতভাষার উৎপত্তি মহারাষ্ট্রদেশে । (৬)

(ক) “ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ‘প্রাকৃত’ শব্দের যে ব্যুৎপত্তি করেন, তাহা এই, ‘প্রকৃতেরাগতম্ ; প্রকৃতিশ্চ সংস্কৃতম্’ । কিন্তু প্রাকৃত ভাষার অধিকাংশ

---

(৪) সেতুবন্ধ—মহাকবি কালিদাস প্রণীত একটি উৎকৃষ্ট কাব্য । ইহার আদ্যোপান্ত মহারাষ্ট্রী নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত । উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকার্দ্ধটি বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না । উহার ভাব যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহা এই ;—সাগর যেরূপ শুক্তিমুক্তাদি রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ, সেইরূপ মহারাষ্ট্রী ভাষা সেতুবন্ধ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্যনিচয়ে পরিপূর্ণ । এই প্রাকৃত মহারাষ্ট্রী ভাষায় “সপ্তশতী” নামক একটি গাথা কোষ রচিত হইয়াছে । মহারাজ শালিবাহন ইহার প্রণেতা । ইহা খৃঃ অব্দের ১ম শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হয় । ইহার অধিকাংশ আদিরসাত্মক ও আর্য্যাচ্ছন্দে রচিত । এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বাণভট্ট স্বকৃত হর্ষচরিতে বলিয়াছেন,—

“অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোচ্ছাতবাহনঃ ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোষং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ ॥”

ভাবার্থ ;—শাতবাহন (শালিবাহন) বিশুদ্ধজাতীয় রত্নের ভাণ্ডারের ন্যায়, এই চিরস্থায়ী ও অগ্রাম্য (যাহা বিরক্তিকর নহে) সুভাষিত (সুমিষ্ট কবিতাবলী) রচনা করিয়াছেন ; দশরূপক গ্রন্থের ধনিককৃত টীকায়, সরস্বতীকণ্ঠাভরণে ও কাব্যপ্রকাশে, উদাহরণস্থলে এই সপ্তশতী হইতে বিবিধ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

(৫) Quoted in the “original Sanskrit Texts” Vol II. Section. IV.

(৬) Quoted in the “original Sanskrit Texts” Vol II. Section. IV.

শব্দই যে সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হয় নাই, ইহা নিশ্চয়। এবং 'প্রাকৃত' শব্দও সংস্কৃতের বাচক নহে। (অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষা বলিলে সংস্কৃত ভাষাকে বুঝায় না।) প্রাকৃত শব্দের উক্তরূপ ব্যুৎপত্তি যদি কাত্যায়নের মনোনীত হইত, তাহা হইলে তিনি "শেষং মহারাষ্ট্রীবৎ" এই সূত্র কখনই রচনা করিতেন না। কারণ, শৌরসেনী ভাষার একটি প্রকৃতি সংস্কৃত, এ কথা কাত্যায়ন এই প্রকরণের প্রারম্ভে একবার বলিয়াছেন, আবার শেষে যখন "শেষং মহারাষ্ট্রীবৎ" একথা বলিতেছেন, তখন নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে, সংস্কৃত ভাষার ও মহারাষ্ট্রী ভাষার পরস্পর নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করাই কাত্যায়নের অভিপ্রেত।"

কিন্তু ডাক্তার জন মিওয়ার বলেন, "The greater part of Vararuchi's work is devoted to Showing how it (maharastri) is formed by modification of Sanskrit." কাত্যায়নের মতের প্রতিবাদ করিয়া ডাক্তার হণ্টার বলেন,—"The Bramhanical theory is, that these ancient spoken dialects or Prakrits were corruptions of the purer Sanskrit. European philology has disprosed this view, and the question has risen whether Sanskrit was ever spoken language at all. (Indian Empire. pp. 334.) শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতেও প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত ভাষার দুহিতা নহে।

(ক) "মূল শব্দের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে "পাঅড়" শব্দ পাওয়া যায়। এই 'পাঅড়' শব্দের সহিত সংস্কৃত 'প্রকট' শব্দের বিশেষ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। 'পাঅড়' ভাষা প্রকট ভাষা, অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য ও চলিত ভাষা। সংস্কৃত ভাষা ধর্ম্মপ্রচারক ব্রাহ্মণগণের ব্যবহার্য্য; উহা সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগিনী ভাষা নহে। কিন্তু 'পাঅড়' ভাষা সর্ব্বসাধারণের মনোগত ভাব প্রকট বা প্রকাশ করিবার ভাষা। কাজেই ইহা সকলের জীবনস্বরূপ, এবং ইহার সহিত সাধারণের সম্বন্ধও কিছু অধিক। এই নিমিত্ত পাঅড়=সকলের বুঝিবার ও মনোগত ভাব প্রকাশ করিবার ভাষা, এইরূপ অন্বর্থ করা হইয়াছে। এবং ধর্ম্ম ভাষার নাম সংস্কৃত (অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিমর্জ্জিত ভাষা) রাখা হইয়াছে। (৭)

---

(৭) "সর্ব্বাদৌ কি আকারে ভাষা মানব কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ফল, সেই ভাষার পরিণাম বা সংস্কার হইয়া সংস্কৃত ভাষা উৎপন্ন হয়।"—ঐতিহাসিক রহস্য, ৩য় ভাগ।

(ক) "অনন্তর কিছুদিন পরে এই পাঅড় শব্দ সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া 'প্রাকৃত' এই নাম প্রাপ্ত হইল। বেদের একটি অঙ্গের নাম শিক্ষা (৮)। তাহাতে "প্রাকৃতে সংস্কৃতে চাপি স্বয়ং প্রোক্তা স্বয়ম্ভুবা" এইরূপ উল্লেখ থাকায় সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, অতি প্রাচীন কালাবধি মুনি ঋষিগণ প্রাকৃত ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া মনে করিতেন। অতএব, প্রাকৃত শব্দের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কৃত উক্তরূপ ব্যুৎপত্তি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।"

"নিরুক্ত-পরিশিষ্টের ভাষ্যে উদ্ধৃত একটি ব্রাহ্মণ-বচনে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণেরা দুই প্রকার ভাষায় কথোপকথন করেন, দেবভাষা ও মনুষ্য-ভাষা। "ব্রাহ্মণা উভয়ীং বদন্তি যাচ দেবানাং যাচ মনুষ্যাণাং" (নিঃ পঃ ভা ১।৯)। বোধ হয়, এই ব্রাহ্মণ রচনার সময়ে ব্রাহ্মণেরা বৈদিক ও প্রচলিত সংস্কৃত অথবা প্রচলিত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা উভয়ই ব্যবহার করিতেন, ইহাই নির্ব্বাচন করা এই বচনের উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা সর্ব্ব প্রকার সংস্কৃতকেই দেবভাষা বলিয়া বিশ্বাস করেন। তদনুসারে এ স্থলে উল্লিখিত মনুষ্য-ভাষা প্রাকৃত ভাষাই বোধ হয়। অধ্যাপক ওয়েবার বলেন, প্রাকৃত ভাষা সমুদয় বৈদিক ভাষার সমকালবর্ত্তী।" উপাসক সম্প্রদায়। ২য় ভাগ; পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

"লিখিবার ও কথোপকথনের (গৃহধর্ম্মের) ভাষা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার, এবং এই দ্বিবিধ ভাষা চিরকালই প্রসিদ্ধ। "ন ম্লেচ্ছিতং বৈ নাপভ্রংশিতং বৈ" এই শ্রুতিবাক্য, আর "য এব শব্দা লোকে ত এব বেদে", "লোক-বেদয়োঃ সাধারণ্যাৎ," ইত্যাদি আচার্য্যবাক্য, এবং "যদ্যযজ্ঞীয়ং বাচং

---

(৮) শিক্ষানামক গ্রন্থটি মহাবৈয়াকরণ পাণিনি প্রণীত বলিয়া [illegible] অনেকের বিশ্বাস আ[illegible] ডাঃ ভাণ্ডারকর এই মতের ভ্রমাত্মক[illegible] প্রদর্শন করিয়াছেন। শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম শ্লো[illegible] গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"অথ শিক্ষাং প্রবক্ষ্যামি পাণিনীয়ং মতং যথা।" অর্থাৎ পাণি[illegible] মতে শিক্ষা কাহাকে বলে, তাহা আমি বলিতেছি। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থের[illegible] কতকগুলি পদ্যে পাণিনির স্তুতি ও প্রশংসা করিয়া "তস্মৈ পাণিনয়ে নমঃ," [illegible] হইয়াছে। এই সকল কারণে অনুমান হয় যে, শিক্ষা নামক [illegible] প্রণীত হইতে পারে না। আর এক কথা, পাণিনির অষ্টা[illegible] সমগ্র পদ্যময়। পদ্যময় গ্রন্থগুলি যে সূত্রময়[illegible] স্বীকার করেন। এই গ্রন্থটি পাণি[illegible] রচিত হইয়া থাকিবে, [illegible]

বদেৎ” এই বাক্য এবং “যাতযামঞ্চ যত্তবেৎ” ইত্যাদি স্মৃতি বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, অতি প্রাচীনকালেও দ্বিবিধ ভাষা প্রচলিত ছিল।” ঐতিহাসিক রহস্য ২য় ভাগ—১৫২ পৃঃ দেখ।

(ক) “যাহা হউক, এইরূপে ক্রমে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী প্রভৃতি যতগুলি ‘পাঅড়’ ভাষা ছিল, সেইগুলি ‘প্রাকৃত’ নামে অভিহিত হইল; এবং কাত্যায়ন সর্ব্ব প্রথম এই প্রাকৃতভাষাসমূহের “প্রাকৃত-প্রকাশ” নামক এক সূত্রময় ব্যাকরণ রচনা করিলেন। উল্লিখিত পাঁচটি (?) ভাষাই পাঅড়। কেবল বিশেষ এই যে, তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রী ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অন্যান্য সকল ভাষার প্রকৃতি বা জননী। মহারাষ্ট্রী = অতি প্রাচীন মরাঠী। মহারাষ্ট্রী হইতে (কাত্যায়নের মতে,) শৌরসেনী, ও শৌরসেনী হইতে কালক্রমে মাগধী ও পৈশাচী প্রভৃতি বালভাষাসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব মহারাষ্ট্রী ভাষা শৌরসেনী ভাষার জননী এবং মাগধী ও পৈশাচী প্রভৃতি ভাষার মাতামহী স্বরূপা। শৌরসেনীর প্রকৃত জননী মহারাষ্ট্রী বা অতি প্রাচীন মরাঠী ভাষা। ইংরাজী ভাষাতে লাটিন ও গ্রীক শব্দ অনেক পরিমাণে আছে; কিন্তু তথাপি উক্ত ভাষাদ্বয় ইংরাজী ভাষার জননী রূপে পরিগণিত হয় না। সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাকে শৌরসেনী ভাষার জননী বলা সঙ্গত নহে। (অর্থাৎ যে কারণে লাটিন ও গ্রীক ভাষা ইংরাজী ভাষার জননী নহে, সেই কারণেই সংস্কৃত ভাষা শৌরসেনী ভাষার জননী নহে।) সাক্সন (Saxon) ভাষা যেরূপ ইংরাজী ভাষার মাতৃস্থানীয়া, সেইরূপ প্রাচীন মরাঠী ভাষাই শৌরসেনী ভাষার মাতৃস্থানীয়া। ‘ইদং যাচে মদুক্তানি বিচারয়ত সাদরম্’।”

আমরা ভাষাতত্ত্বে অনভিজ্ঞ। সুতরাং অধ্যাপক ভাগবত প্রাকৃত ভাষার ...ৎপত্তি ও মরাঠী ভাষার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ...দূর সমর্থনীয়, তাহা বলিতে পারিলাম না। বঙ্গীয় পাঠকগণের উপর ...য়ের বিচার ভার অর্পিত হইল। তবে প্রাকৃতভাষাসমূহের উৎপত্তি-...াংশ পণ্ডিতের এরূপ মত দৃষ্ট হয় যে, অতি প্রাচীনকালে আর্য্য-...কথনাদি করিতেন, সেই ভাষাই উত্তরোত্তর পরি-...াম গ্রহণ করিয়াছে। বেদের মন্ত্রভাগ ...ণিত ভাষা হইলেও, উহা সেই ...থঞ্চিৎ পরিমার্জ্জিত

বলিয়া বোধ হয়। মন্ত্রভাগ অপেক্ষা ব্রাহ্মণ ভাগের (৯) ভাষা সমধিক পরিমার্জ্জিত। কিন্তু এই পরিমার্জ্জিত ভাষায় কেবল মাত্র কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণই (ব্রাহ্মণগণই) কথোপকথন করিতেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মগ্রন্থ সকলও এই পরিমার্জ্জিত ভাষাতেই রচিত হইত। লিপিপ্রণালীপ্রচলনের পর হইতেই আর্য্যভাষা উত্তরোত্তর পরিমার্জ্জিত হইয়া, উন্নত অংশ সার্থকভাবে সংস্কৃত নাম ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সাধারণ লোকে ব্রাহ্মণগণের ন্যায় পরিমার্জ্জিত ভাষা ব্যবহার করিতেন না। তাঁহারা অতি প্রাচীন সাধারণ আর্য্যভাষাতেই কথোপকথন করিতেন। এই অতি প্রাচীন সাধারণ ভাষা আর্য্যগণের রাজ্যবিস্তৃতির সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হইতে লাগিল। আর্য্যগণ অনার্য্য দেশসমূহ জয় করিয়া, তথায় আর্য্যভাষার প্রচার করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, অনার্য্য জাতির আর্য্য ভাষার বিশুদ্ধরূপ উচ্চারণে অপারগতা ও তাহাদের উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য বশতঃ, তাহারা আর্য্যভাষা কথঞ্চিৎ বিকৃতভাবে ব্যবহৃত করিতে লাগিল। সেইরূপ আবার সাধারণ আর্য্যগণও অনার্য্য জাতির সংসর্গে থাকায়, অনেক অনার্য্য শব্দ আর্য্যভাষায় প্রবেশ করেন। এইরূপে অনার্য্য জাতির সংসর্গে এক প্রাচীন আর্য্য ভাষাই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাহ্যিক ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আকার ধারণ করে। এইরূপে এক মূল আর্য্যভাষা হইতেই, মগধে মাগধী, শূরসেনে শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্রী ভাষা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হয়। কেহ কেহ এই সমস্ত প্রাকৃত ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার দুহিতা বলেন। কিন্তু তাহা ভ্রম। কারণ বস্তুতঃ 'সংস্কৃত' স্বয়ং একটি ভিন্ন ও আদিম ভাষা নহে। সাধারণ প্রাচীন আর্য্যভাষার উন্নত অংশ 'সংস্কৃত' নামে পরিচিত। সাধারণ প্রাচীন আর্য্যভাষার উত্তরোত্তর উন্নতিতে যেমন 'সংস্কৃত' ভাষার উৎপত্তি, সেইরূপ উক্ত ভাষার অনার্য্য জাতির সংসর্গজাত রূপান্তরে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি। ফল কথা, প্রাকৃত ও সংস্কৃত, উভয় ভাষাই সেই বহুপ্রাচীন আর্য্যভাষা হইতে উৎপন্ন ও পালিত (১০)। শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

(৯) মন্ত্রভাগ অপেক্ষা ব্রাহ্মণভাগ যে অপ্রাচীন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কৃষ্ণ—যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকারও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন, "যদ্যপি মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকো বেদস্তথাপি ব্রাহ্মণস্থ মন্ত্রব্যাখ্যানরূপত্বাৎ মন্ত্রএবাদৌ সমাম্নাতাঃ।" অর্থাৎ যদিও বেদ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ের সমাবেশে রচিত, তথাপি ব্রাহ্মণাংশে মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া, মন্ত্রাংশই প্রথমে সঙ্কলিত হইয়াছিল, মনে হয়।

(১০) বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত এবং ডাঃ ভাণ্ডারকারের Early History of the Deccan অবলম্বনে এই উপসংহারভাগ লিখিত হইল।

নূতন বাড়ী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, “নূতন বাড়ী কিনিয়াছি। দেখিতে যাইব মনে করিয়াছি। তোমাকেও আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।”

মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী ধনী। বয়স ত্রিশের মধ্যে। আমি তাঁহার সহপাঠী। পাঠ্যাবস্থা হইতে আলাপ। নাম সূর্য্যকান্ত রায়, দরিদ্র সন্তান। ঘরে বিধবা মাতা, বিধবা পিসি, বিধবা ভগিনী। সকলের ভার আমার উপর। বিষয়-কর্ম্মের চেষ্টায় ফিরিতেছিলাম। শুনিয়াছিলাম, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। এ পর্য্যন্ত দেখিতেছিলাম, চাকরীটি চেষ্টার সাধ্যাতীত।

মহেন্দ্র বাবুর বাড়ী আমি কতক মোসাহেব, কতক বন্ধুর মত। মোসাহেবির উমেদারি করিয়া বড় কিছু হয় নাই। যখন বড় মোসাহেবিয়ানা করি, তখন মহেন্দ্র বাবু সহসা বন্ধুভাবে দেখেন, বন্ধুত্বের পাকাপাকি করিতে গেলে মোসাহেব মহলে সামিল হই। ফল কথা, মহেন্দ্র বাবু লোকটা সেয়ানা। কথাবার্ত্তায় বেশ, কাজের বেলা বড় ধরা দেন না। আমোদ আহ্লাদেও কাহারও ভাগ বসিত না। কথায় পেট ভরে না দেখিয়া আমি বাবুর বৈঠক পরিত্যাগ করিব মনে করিতেছিলাম।

এমন সময় মহেন্দ্র বাবু এক দিন বলিলেন, “নূতন বাড়ী দেখিতে যাইব। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।”

একটু হাসির ভান করিয়া কহিলাম, “কোথায় ?”

“বীরভূম জেলায়। মস্ত বাড়ী। শস্তা পাইয়াছি।”

কথায় জানিলাম, মহেন্দ্র বাবু নিজে এ পর্য্যন্ত বাড়ী দেখে[illegible] নাই, তাঁহার লোক [illegible]য়া দেখিয়া আসিয়াছে। এত দূরে বাড়ী কিনিবার কি প্রয়োজন বুঝিতে পারিলাম না। মহেন্দ্র বাবু সহরের লোক, পল্লীগ্রামে তাঁহার মন বসিবে কেন ? তিনি বলিলেন, বরাবর কলিকাতায় ভাল লাগে না, কিছুদিন একান্তে নির্জ্জনে থাকা ভাল। এ কথায় মতভেদে কোন ফল নাই দেখিয়া আমি নীরব হইলাম।

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বল ? যাইবে ?”

বলি কি ? বাবু ত নিজের বাড়ী দেখিতে যাইতেছেন, আমি কি সুখে তাঁহার সঙ্গে যাই ? যদি একটা কোন আশা থাকে, তাহা হইলেও একটা কথা। কিন্তু এখানে যে টুকু আশা, দূর পল্লীগ্রামে সে টুকুও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অন্য দিকে ত কিছুই নাই, বাবুরও আশা বড় অল্প। তিনি বেড়াইতে যাইতেছেন। বেড়াইবার সময় কাজের কথা কে শুনে ?

মনের ভাব গোপন না করিয়া আমি কহিলাম, "আমি যদি আপনার সহিত বেড়াইতে যাই ত বাড়ীতে বিধবাগুলির কি দশা হইবে ?"

মহেন্দ্র বাবু ঈষৎ ব্যঙ্গ স্বরে কহিলেন, "তুমি এখানে থাকিয়াই বা তাহাদের কি উপকার করিতেছ ?"

আপনা আপনি একটা নিশ্বাস পড়িল। বলিলাম, "এখানে থাকিয়া তবু কর্ম্ম কাজের চেষ্টা করিতে পারি।"

মহেন্দ্র বাবু আর কোন কথা কহিলেন না। আমার দিকে চাহিয়া চুপ করিলেন। পরে বলিলেন, "একবার বৈকালে আসিও।"

বৈকালে আবার উপস্থিত হইলাম। মহেন্দ্র বাবু আমার হাতে বিশ টাকার দুইখানি নোট দিলেন। কহিলেন, "এই টাকা বাড়ীতে দিও। কাল সকাল বেলা যাত্রা করিতে হইবে। এক মাসের মধ্যে আমরা ফিরিয়া আসিব।"

আমি বিস্মিত হইলাম। লোকটাকে এতদিন চিনিতেই পারি নাই! মনে আবার আশা হইল।

পরদিবস প্রাতঃকালে আমরা যাত্রা করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হেন্দ্র বাবুর নূতন বাড়ীতে পঁহুছিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বাড়ীর নিকটে গ্রাম নাই। চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রান্তর। বাড়ীর চারিদিকে বাগান, অযত্নে বনের মত হইয়া রহিয়াছে। রক্ষকের মধ্যে এক বৃদ্ধ মালী, তাহার বর্ষীয়সী স্ত্রী ও এক যুবতী কন্যা। কন্যাটি বিধবা।

বৃহৎ বাড়ী। বাড়ী বড় নূতন নয়, খরিদ্দার নূতন। মহেন্দ্র বাবুর আদেশমর্ত বাড়ী আবার মেরামত হইয়াছিল, এবং ঘরগুলি সাজান হইয়াছিল। বাগান-বাড়ীর ধাঁজা, কিন্তু আয়তন বৃহৎ। প্রথম তলায় দশ বারটি বড় বড় ঘর। দ্বিতালায়ও সেইরূপ। কেবল ত্রিতালার ঘরের সংখ্যা অল্প।

বাগানে কয়েকটি বৃক্ষ অতিশয় প্রাচীন ও সেই অনুসারে বড়। লতা

পাতায় চারিদিক জঙ্গলের মত। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে আমরা সেথানে উপনীত হইলাম। বাগানে ঘুঘু, কাটঠোক্‌রা পাখী ডাকিতেছে। উদ্যানে প্রবেশ করিতে বাঁশবাগানের বেড়া। স্থানটা বড়ই নির্জ্জন। একটা কুকুর পর্য্যন্ত নাই। আমরা সহরের লোক, সেই নির্জ্জন স্থানে উপনীত হইয়া প্রাণ হু হু করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র বাবুর একটু কল্পনাশক্তি ছিল। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই আনন্দে অস্থির। "আঃ বাঁচা গেল। এখানে কোন গোলমালই নেই। কেমন শান্তি, কেমন নিস্তব্ধ, কেমন সুন্দর!" বাগানে ঘাট-বাঁধান পুষ্করিণীর ধারে চাঁপা, কামিনী, গন্ধরাজ ফুলের গাছ। কিন্তু যত্নের চিহ্ন কোথাও নাই। বাগানের ধারে মালীর ঘর। কিন্তু বাগানের সহিত মালীর কোন সম্বন্ধ আছে, বাগান দেখিয়া এরূপ বোধ হয় না।

পুষ্করিণীর নিকট যখন আমরা উপস্থিত হইলাম, তখন একটী স্ত্রীলোক ঘাটে বসিয়া বাসন মাজিতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল— মাথার কাপড় টানিয়া দিল, কিন্তু পূরা ঘোমটা দিল না।

মহেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা ?"

স্ত্রীলোকটী কহিল, "আমি মালীর মেয়ে।"

এই মালীর বিধবা কন্যা।

স্ত্রীলোকটী পূর্ণ যুবতী। বর্ণ তেমন গৌর না হউক, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বটে। গড়ন চমৎকার। চক্ষু নত ছিল, কিন্তু বোধ হইল বেশ বড় বড়। তাহাকে সম্ভ্রান্ত দেখিয়া আমরা অন্যদিকে গমন করিলাম। গমন কা[illegible] মহেন্দ্র বাবু দুই চারি বার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। স্ত্রীলোকটি কৌতূহলপরবশ হইয়া আমাদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছিল।

কয়েক মাস হইল, মহেন্দ্র বাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে। তিনি এ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। এ কথাটা পরে বলিলে হইত, কারণ এ [illegible]ময় আমার মনে এ কথা উদয় হয় নাই।

বাবুর সঙ্গে চাকর অধিক ছিল না। এখানে অধিক লোকের আবশ্যকও ছিল না। যে দুই তিন জন লোক নহিলে নয়, তাহারাই আসিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পর দিবস প্রভাতে উঠিয়া আমরা ভ্রমণে বাহির হইলাম। অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে একটি ছোট গ্রাম। গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস বড় নাই, কৈবর্ত্ত সদ্-

গাপের পল্লী। গ্রামে প্রবেশ করিতে কুকুর গুলা ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া াসিল। সঙ্গে সঙ্গে বালকের দল বাহির হইল। স্ত্রীলোকেরা দরজার াড়াল হইতে আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। আমরা অনেকটা ঘুরিয়া রিশ্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

বাগানে প্রবেশ করিতে পাশে মালীর ঘর। ঘরের বাহিরে ফটকের াছে মালীর কন্যা দাঁড়াইয়াছিল। মহেন্দ্র বাবু আমার অগ্রে গমন করিতে- হলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি বাছা?"

মালীর কন্যা ঈষৎ হাসিয়া চক্ষু নত করিল। বাম হস্ত দিয়া অঞ্চলের কাণ পাকাইতে লাগিল। কহিল, "আমার নাম মোক্ষদা।"

এই প্রশ্ন ও উত্তর আমার ভাল লাগিল না। পুষ্করিণীর ধারে মহেন্দ্র াবু যে কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা অপরিচিত লোককে দেখিলেই জ্ঞাসা করা যায়। কিন্তু পরিচয় পাইয়া আবার বাক্যালাপ কেন? আমি অবশ্য কিছুই বলিলাম না। কেবল মোক্ষদার প্রতি আর একবার ভাল রিয়া চাহিয়া দেখিলাম। সেও আমার প্রতি চাহিয়া দেখিল। চাহনির াবটা যেন অপ্রসন্ন।

দিন কয়েকের মধ্যে মহেন্দ্র বাবুর আচরণে কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে াইলাম। কিছু অন্যমনস্ক, একা থাকিতে ভাল বাসেন। বেড়াইবার ময় আমাকে আর বড় একটা ডাকিতেন না, একাই বেড়াইতেন। দুই কবার বাগানে বা পুষ্করিণীর ধারে দেখিলাম মোক্ষদা দাঁড়াইয়া আছে, বা চলিয়া যাইতেছে, মহেন্দ্র বাবুও যেন সেইখানে হঠাৎ উপস্থিত তেন। হয় ত একটা কথা হইত, হয় ত কথা হইত না। দুই জনে দুই দিকে য়া যাইত। আমি আর বড় বাড়ীর বাহির হইতাম না, ভ্রমণের সময় র কোথাও চলিয়া যাইতাম। আমি আর কি বলিব? যাহার যেমন ভিরুচি।

কিন্তু মোক্ষদার উপর বড় রাগ হইল। একদিন তাহাকে একেলা দখিতে পাইয়া কহিলাম, "দেখ, কাজটা বড় ভাল হইতেছে না।"

মোক্ষদা চোক ডাগর করিয়া, বোকা সাজিয়া, আকাশ হইতে পড়িল; কহিল, "কেন, বাবু, কি কাজটা?"

আমি রাগিয়া কহিলাম, "মাগীর আবার ন্যাকামি— চোকে পড়িলে কি রাজত্ব পাইবে মনে ক—

মানুষ নয়। দু দিন পরে তোমার দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। তখ
তোমার দশা কি হইবে ?"

মোক্ষদা বড় ভাল মানুষের মত কহিল, "বাবু, তোমার মন বড় ভা
তা নইলে পরের জন্ম এত ভাবনা কেন ? তা, বাবু, মেয়ে মানুষের f
মোসাহেবি জোটে না ?"

মুখে একটা দুর্ব্বাক্য আসিল, সামলাইয়া লইলাম। শুধু বলিলাম
"চুলোয় যাও।"

মোক্ষদা টিপি টিপি হাসিল, কহিল, "একা ?"

আমি আর দাঁড়াইলাম না। স্ত্রীলোকের মুখের ধার যে সর্ব্বত্রই এইরূপ
তাহা জানিতাম না। বুঝিলাম, মোক্ষদা সামান্ত পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোক নয়।

তাহাকে আমি তখনও মোটেই চিনিতে পারি নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একটু পরেই আমার বড় ভয় হইল। যদি মোক্ষদা মহেন্দ্র বাবুকে বলিয়
দেয় ? আমার কোন কথায় থাকিবার আবশ্যক কি ? মনে বিশ্বাস হইল যে
আর এক রাত্রিও আমায় এখানে বাস করিতে হইবে না। কিন্তু সেট
আমার ভ্রম। মোক্ষদা কি করিল বা বলিল জানি না, কিন্তু মহেন্দ্র বাবু
মুখে কোন উচ্চবাচ্যই শুনিলাম না।

আর একদিন গেল। রাত্রে আমি শয়ন করিয়াছিলাম। দিব্য নিদ্রি
রহিয়াছি, এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম, ঘরে যে আলো
জ্বলিতেছিল, তাহা নিভিয়া গিয়াছে। এরূপ আর কোন রাত্রে হয় না
নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াই আমার মনে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল।

অন্ধকারে ঘরের ভিতর একটা বিড়াল ডাকিল। তখন আমি বাস্তবিক
ভীত হইলাম। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম, বিড়ালের প্রবে
শের কোন পথ ছিল না। বিড়াল হইলেই বা প্রদীপ নিভাইবে কেন
বিড়াল কি না তাহাই আমার মনে সন্দেহ হইল।

বিড়ালের শব্দ আর শুনিতে পাইলাম না। একটু পরে নিশ্বাস
পতনের শব্দ শুনিতে পাইলাম। শব্দ যেন আমার নিকটে আসিতে লাগিল,
শব্দ নাই। আমার খাটের চারিদিকে নিশ্বাসের শব্দ যেন

হইয়া পড়িয়া রহিলাম। সমস্ত শরীরে কাঁটা

লে কি বিড়াল সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে, না বিড়া-

র্ন আবার দূরে চলিয়া গেল, আর শুনিতে পাইলাম না। অক-
ারে খাটখানা নড়িয়া উঠিল। খাট উপরে উঠিতে লাগিল, শিয়রের
নীচে রহিল, পায়ের দিক উপরে উঠিতে লাগিল। খানিক উঠিয়া খাট-
ানা পড়িয়া গেল। খাটে মাথা ঠুকিয়া মাথায় অত্যন্ত আঘাত লাগিল। আর
মামি স্থির হইয়া রহিতে পারিলাম না। খাট হইতে নামিয়া পড়িলাম। নামিয়া
াড়িতেই যেন অস্ফুট পদশব্দ শুনিতে পাইলাম। পদশব্দ যেন ঘরের প্রান্তে
লিয়া গেল। তাহার পর, দ্বার উদ্ঘাটন করিলে অথবা কুলুপে চাবি দিলে
যরূপ শব্দ হয়, সেইরূপ একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম। তাহার পর আর
কিছু শুনিতে পাইলাম না।

এরূপ স্পষ্ট ধারণা তখন হইল না। তখন আপাদমস্তক ঘর্ম্মাক্ত হইল।
পা কাঁপিতে লাগিল। কণ্ঠ জিহ্বা শুষ্ক হইতে লাগিল। চোর নয় বিশ্বাস
হইল। চীৎকার করিতেও সাহস হয় না। পাশের ঘরে বাবু শয়ন করিয়া
আছেন, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ কেমন করিয়া করি? আর জিজ্ঞাসা করিলেই বা
কি বলিব? ইংরাজি পড়িয়া ভুতের অস্তিত্ব স্বীকার করিব কেমন করিয়া?
াথায় হাত দিয়া দেখি, মাথার পিছনে বিলক্ষণ ফুলিয়াছে। ভুতের অস্তিত্ব
ীকার করি, আর নাই করি, মাথার আঘাত ও তাহার নিদর্শন অস্বীকার
রিতে পারি না। আর সব স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু মাথায় যে লাগিয়াছে,
পক্ষে ত কোন সন্দেহ নাই।

অনেকক্ষণ যখন আর কিছু শুনিতে পাইলাম না, তখন অতি অল্প ঈষৎ
হস হইল। মনে পড়িল, খাটের কাছে জানালার উপর একটা দেশলাইর
ক্স আছে। অনেক হাঁৎড়াইয়া, অনেকবার অকারণে ভয় পাইয়া, দেশ-
াইর বাক্স পাইলাম। একটা কাটি জ্বালিয়া দেখিলাম, আলোকে তৈল
হিয়াছে, আপনি নিভিয়া যায় নাই। ঘরে বায়ু প্রবেশের পথ নাই। কে
আলোক নিভাইল।

ঘরের দরজা আমি যেমন বন্ধ করিয়াছিলাম, সেইরূপ বন্ধ রহিয়াছে। ঘরে
মাদুর পাতা, সুতরাং পদচিহ্ন লক্ষিত হয় না। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া
অনুসন্ধানে বিরত হইলাম। রাত্রে আর নিদ্রা হইল না। আলোকের নিকট
বসিয়া অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভোরে উঠিয়া নীচে নামিয়া গেলাম। নূতন গৃহস্বামীর
কিছু কর্ম্ম বাড়িয়াছিল। দেখিলাম, সে বাগানের এক দিক
তেছে। তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এখ
দিন আছ?"

মালী বলিল, "আজ্ঞে, অনেক দিন। দশ বছর কি কুড়ি বছর হবে।"

"ইহার উর্দ্ধ নয়?"

মালী আকাশের দিকে দেখিতে লাগিল। তাহাতে যেন গণনার কিছু সুবিধা হইল। কহিল, "আজ্ঞে তা হবে। পঁচিশ বছর হবে।"

"বাড়ীর কিছু দুর্ণাম আছে?"

"দুর্ণাম—কই, না। মস্ত বাড়ী, রাজবাড়ীর মত, দুর্ণাম হবে কেন? বাবু আমরা এতদিন আছি, আমাদের ত কখন দুর্ণাম হয় নি। আমরা গরীব মানুষ খেটে খাই, দুষ্কর্ম্ম কখন করি নি।"

ভাল লোককে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলাম! বুঝাইয়া বলিলাম, "তোমার কথা নয়। তুমি বিশ্বাসী লোক জানি। বলি, এই বাড়ী কখন কিছু দুর্ঘটনা হয়েছিল? তোমরা কখন কিছু দেখিতে পাও, শুনিতে পাও।"

"রাম, রাম, রাম," বলিয়া মালী উঠিয়া দাঁড়াইল। সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কহিল, "দুর্ঘটনা ত সব বাড়ীতে হয়। এম বিশেষ কিছু—"

আমি স্পষ্ট বুঝিলাম, লোকটা কোন কথা গোপন করিতেছে। বলিলা "তুমি যাহা জান, সত্য বল। আমি কাহাকেও কিছু বলিব না। বাবু ও কিছু মানেন না।"

তখন মালী চারি দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে কহিল, "বাবু, শুনেছি, আ কার বাবুদের একটি বউ তেতালার ছোট ঘরে গলায় দড়ী দিয়ে মরেছিল আর একবার—"

"আর একবার কি?"

"আর একবার একটি বিধবা মেয়ে পুকুরে ডুবে মরেছিল। সে অনেক দিনকার কথা। আমি কখন কিছু দেখিনি। রাত্রে আমি কখন বাড়ীর ভিতর যাই না।"

ভূত পেত্নী যদি থাকে, তাহা হইলে এই রকম ভূতেরই উপদ্রব সম্ভব।

কিন্তু আমার উপর প্রথমেই উপদ্রব কেন? দিনের বেলা কতক সাহস ফিরিয়া আসিয়াছিল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখি, বাড়ীর সম্মুখে মহেন্দ্র বাবু ঘাসের উপর পাই-চারি করিতেছেন। আমাকে একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া কহিলেন, "কিহে ঋর্ষ্যি, তোমায় শুক্‌নো শুক্‌নো দেখ্‌ছি কেন?"

"আজ্ঞা, রাত্রে নিদ্রা ভাল হয় নাই।"

"বটে, ব্যাপারখানা কি বল দেখি! আমারও নিদ্রা ভাল হয় নাই। কি হইয়াছিল, শুনি?"

মহেন্দ্র বাবুর মুখে দেখিলাম, অনিদ্রা অথবা মানসিক ভীতিবিকারের কোন চিহ্ন নাই। বরং মুখ প্রফুল্ল, যেন কোন সুখস্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছেন। যে কারণে আমার নিদ্রা হয় নাই, সেই কারণে ইহাঁরও নিদ্রা-ভঙ্গ হইলে মুখ এত প্রফুল্ল হইত না।

সেই জন্য কথাটা একেবারে খুলিলাম না। বলিলাম, "নূতন জায়গা, সেই জন্য বোধ হয় নিদ্রার ব্যাঘাত হয়।"

"তাহা হইলে এতদিন হয় নাই কেন? ও কোন কথা নয়, কি হইয়া-ছিল, বল।"

আমি বলিলাম, "আপনি কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলেন?"

মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, "আমি কিছু শুনিয়াছিলাম, কিছু দেখিয়াছিলাম। মি কি দেখিয়াছিলে?"

"আমি কিছুই দেখি নাই। কেবল শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

"কিসের শব্দ?"

বাবুর মুখ দেখিয়া ধাঁ করিয়া আমার মুখে মিথ্যা কথা আসিল। "ছোট ছেলের কান্নার শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

"আর কিছু?"

"আর কিছু না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি শুনিয়াছিলেন?"

"বৃদ্ধের হাসির শব্দ।"

"কি দেখিয়াছিলেন?"

"একটা বৃদ্ধের মূর্ত্তি।"

মহেন্দ্র বাবু মিথ্যা কথা বলিতেছেন, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। এমন

বিষয়ে সত্য কথা গোপন করিবার তাঁহারই বা কি উদ্দেশ্য, আমারই বা কি উদ্দেশ্য, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

মহেন্দ্র বাবু হাসিয়া কহিলেন, "বাড়ীটা হানা বোধ হয়। তুমি ভূতে বিশ্বাস কর?"

আমি কহিলাম, "ভূত ত কখন দেখি নাই।" কথাটা সত্য।

বাবু কহিলেন, "যা হোক্, বেশ হয়েচে। নিষ্কর্ম্মা না থাকিয়া একটা কাজ পাওয়া গিয়াছে। ভূত ধরা যাইবে। কি বল?"

মোসাহেবের যাহা বলা কর্ত্তব্য, তাহাই বলিলাম। "আপনার যেমন ইচ্ছা।"

মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, কিন্তু একটা কথা আছে। ভূত দেখিতেছি রকমারী। আমরা দুইজনে একত্র থাকিলে চলিবে না। নীচেকার তলায় ভূত আছে কি না দেখিতে হইবে। আমি আজ হইতে নীচে শয়ন করিব।"

ভূত ধরিবার উত্তম উপায় বটে। যে স্থানে ভূতের সঙ্গে প্রথম দেখা, সেই স্থান হইতে পলায়ন। আমি কহিলাম, "আমি কি তবে দোতলায় একা থাকিব?"

"তবে কোথায় যাইবে?"

"নীচে।"

"স্বচ্ছন্দে। কিন্তু তাহা হইলে আমি দোতলায় কিম্বা তেতলায় শুইব।" বাবুর কথা গুলা কিছু শুষ্ক।

ভূত ধরিতে বাবুর যতখানি ইচ্ছা, আমাকে নিকটে শয়ন করিতে দিতে ঠিক ততখানি অনিচ্ছা। আমি কহিলাম, "আজ্ঞে না, আমি যেখানে শয়ন করি, সেইখানেই থাকিব। আপনি নীচের তলায় শয়ন করিবেন।"

বাবু আর কিছু না বলিয়া, গুণ গুণ করিয়া গান করিতে করিতে ঘরে উঠিয়া গেলেন।

মনে অনেক কথা উঠিতে লাগিল। একটু ভাবিবার জন্য বাগানের দিকে গমন করিলাম। যে দিকে গাছপালা বেশী, সেই দিকে গমন করিলাম। দেখি, গাছের তলায় একটু অন্ধকারে মোক্ষদা চুল এলো করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় পর্য্যন্ত দিল না।

আমাকে দেখিয়া মোক্ষদা মৃদু মৃদু হাসিয়া, ধীরে ধীরে, স্পষ্টাক্ষরে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু মহাশয়, কাল রাত্রে কি ভাল ঘুম হয়েছিল?"

এ কথা সে কেন আমায় জিজ্ঞাসা করিল? তীব্র দৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম। সেই মৃদু মৃদু হাসি, হাসির সহিত অধরপ্রান্তে যেন একটু ব্যঙ্গ, চক্ষে স্থির কটাক্ষ। তাহাকে দেখিয়া, মনে মনে, অজ্ঞাতে, আমার ভয় হইল। মুখে কহিলাম, "পাপীয়সি, তুমি কি মনে কর, তোমার জন্য কাহারও ঘুম হয় না।" এই বলিয়া আমি বেগে চলিয়া গেলাম।

আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, মোক্ষদা আর যাহাই করুক, আমার কোন কথা কাহাকেও বলে না। বলিলে তাহারও বিপদের সম্ভাবনা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আহারাদির পর, একটু বিশ্রাম করিব বলিয়া, যে ঘরে রাত্রে শয়ন করিয়াছিলাম, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম। কিন্তু শয়নের ইচ্ছা আদৌ ছিল না।

মোক্ষদার মুখে সেই বিদ্রূপের কথা শুনিয়া আমার মনে অনেক কথা উদয় হইতেছিল। নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিবার জন্য ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়াছিলাম।

এই কয়েকটা কথা আমার মনে হইতেছিল। রাত্রে আমার নিদ্রা হয় নাই, মোক্ষদা এ কথা অবগত ছিল। আর কাহারও কাছে এ কথা শুনে নাই, ইহাও নিশ্চিত। মহেন্দ্র বাবুও রাত্রে কিছু দেখিয়া অথবা শুনিয়া থাকিবেন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভয় পান নাই। যাহা দেখিয়া অথবা শুনিয়াছিলেন, তাহাতে এই পর্য্যন্ত স্থির করিয়াছিলেন যে, আমার পার্শ্বের ঘরে শয়ন করি-বন না। আমি যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাতে আমার ভয় হইয়াছিল। এই কল ঘটনার ভিতর নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।

ঘরে বসিয়া কিছুক্ষণ আমি এই সকল কথা ভাবিলাম। তাহার পর উঠি ঘরের চারিদিকে দেয়ালে তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিলাম। কোথাও ি দেখিতে পাইলাম না। ঘরে একটা ছড়ি ছিল। সেইটা হাতে করিয়া লের চারিদিকে ধীরে ধীরে আঘাত করিতে লাগিলাম। মেজে হই আড়াই হাত উপরে লক্ষ্য করিয়া, এক বিঘত প্রমাণ অন্তরে অন্তরে করিতে লাগিলাম ও মনোযোগপূর্ব্বক শব্দ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম এক স্থানে শব্দের বৈলক্ষণ্য অনুভূত হইল। দুই চারি বার আরও লাম। বুঝিতে পারিলাম, সেই স্থানে দেয়াল নিরেট নয়। তখ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

দেয়ালে নীল রং। চারিদিকে ছবি। আমি লাঠির আঘাতে যে টুকু স্থানে শব্দবৈলক্ষণ্য বোধ হইতেছিল, নির্দ্দেশ করিলাম। পকেটে পেন্সিল ছিল পেন্সিল দিয়া চারিধারে সূক্ষ্ম রেখা টানিলাম। তাহার পর চারিদিকে করাঘাত করিতে লাগিলাম। নীচের দিকে করাঘাত করিতে আর এক রকম শব্দ হইল। সেই অংশে হাত রাখিয়া জোরে ঠেলা দিলাম। খট্ করিয়া অল্প শব্দ হইল। একটি ক্ষুদ্র দ্বার মুক্ত হইয়া গেল। দ্বার দেয়ালে এরূপ করিয়া বসান ছিল যে, বন্ধ করিলে কোন চিহ্ন দেখা যায় না। দেয়ালের একটি বিশেষ স্থানে আঘাত না করিলে মুক্তও হয় না। দ্বারের নীচে সিঁড়ী রহিয়াছে। নীচে অন্ধকার।

ঘরে বাতি ছিল। বাতি জ্বালিয়া সিঁড়ীতে নামিলাম। নামিয়া সম্মুখে সঙ্কীর্ণ পথ দেখিতে পাইলাম। খানিক গিয়া দেখিলাম, চৌমাথার মত, চারি-দিকে চারিটা পথ। বরাবর সম্মুখে গিয়া দেখিলাম, আর একটি দরজা, বন্ধ রহিয়াছে। অনুমান হইল, দরজা ভিত্তির নিকট কিম্বা বাটীর প্রান্তভাগে। সে দরজা আর খুলিলাম না। ফিরিয়া আসিলাম। আমার ঘরের নিকটে আসিয়া আলোক ধরিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম, আর একদিকে উপরে যাইবার সিঁড়ী রহিয়াছে। সে দিকে গিয়া দেখিলাম, সিঁড়ীর উপরে আর এক দরজা। আমি ক্লান্ত হইলাম, আর কোন দরজা খুলিবার চেষ্টা করিলাম না।

ফিরিয়া আসিয়া আমার ঘরের দেওয়ালের দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। মনে হইল, রাত্রেও এইরূপ শব্দ শুনিয়াছিলাম। এরূপ কৌশলে বাড়ী কেন নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু বুঝিলাম, অনেক ঘরে এইরূপ গুপ্ত প্রবেশের পথ আছে, এবং সেই পথ অবগত থাকিলে যে কে চ্ছন্দে রুদ্ধদ্বার গৃহেও প্রবেশ করিতে পারে। রাত্রে ভূতের দৌরাত্ম্যে ব পাইয়াছিলাম। এখন স্থির করিলাম, ভূত আসিলে সহজে ধরিতে ব।

হেন্দ্র বাবু বৈকালে ভ্রমণে বাহির হইলেন না। দেখিলাম, কিছু মৌন-ড় কথা কহিতে চাহেন না। আমি একা বাহিরে গেলাম। সন্ধ্যার রান্তে বাবু যেমন গল্প গুজব করিতেন, আজ আর তাহা হইল না। পরই বাবু শয়ন করিতে গেলেন। নীচেকার তলায় এক প্রান্তে ঘরে তাঁহার শয্যা রচিত হইয়াছিল। আমি আস্তে আস্তে গিয়া পনার ঘরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু শয়ন করিলাম না।

যখন সব নিস্তব্ধ হইল, তখন আমি নিঃশব্দে ঘরের দরজা খুলিলাম। বাড়ীর ছাদে বসিয়া পেচক ডাকিতেছে, বাগানে ঝিঁঝী পোকার রব। দূর হইতে গ্রামের কুকুরের চীৎকার শোনা যাইতেছে, আকাশে চাঁদ নাই। আমি ঘরের আলোক নিভাইয়া দিলাম। পকেটে দেশলাইয়ের বাক্স ও মোমবাতি ছিল। পায়ের জুতা খুলিয়া রাখিলাম। ঘরের দরজা ভেজাইয়া দিয়া বারান্দায় আসিলাম।

মৎলবটা কি? ভূত ধরিব বলিয়া ঘরের বাহির হই নাই। মহেন্দ্র বাবু কি করিয়া ভূত ধরেন, দেখিবার ইচ্ছা ছিল।

পা টিপিয়া টিপিয়া নীচে নামিলাম। নীচে বরাবর বড় বড় থামওয়ালা বারান্দা। যে দিকে বাবুর শয়নগৃহ, সে দিকে জন প্রাণী ছিল না, চাকরেরা আর এক দিকে শয়ন করিয়াছিল। অত্যন্ত সাহস না হইলে একেলা অসহায় এমন স্থানে ভূতের সহিত রাত্রিবাস করিতে সাহস হয় না।

ঘরের ভিতর হইতে অল্প আলোকরশ্মি জানালা সাসি দিয়া বাহির হইতেছিল, দরজাও একেবারে বন্ধ ছিল না। আমি চোরের মত চুপি চুপি দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। দরজার নিকটে একটা মস্ত থাম, পাশে দেওয়াল। সেখানে বড় অন্ধকার।

ঘরের ভিতর দুইজন লোকে কথা কহিতেছে। গলা খুব চাপা, কিন্তু দরজার কাছে দাঁড়াইলে শুনিতে পাওয়া যায়। দুইটার মধ্যে একটাও ভূত নয়, বেশ বুঝিতে পারিলাম। গলা চাপা বটে, কিন্তু কথার বেগ কিছু বেশী। সেই জন্য আরও কিছু স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল।

মহেন্দ্র বাবু বলিতেছিলেন, "তবে কি তুমি রাজি হবে না?" বাবুর স্বর কাঁপিতেছিল,—রাগে নয়, অনুরাগে।

মোক্ষদা বলিল, "তুমি কি আমায় অসচ্চরিত্রা মনে করিয়াছ?"

মহেন্দ্র বাবু যেন একটু বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "সেটা মনে করা আমার অন্যায় হইয়াছে। কিন্তু তুমি এখানে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছ, জিজ্ঞাসা করিতে দোষ আছে কি?"

"আমি তোমার ঘরে কোন অসদভিপ্রায়ে আসি নাই।" মোক্ষদার কথা বেশ স্থির, স্বরে একটু তেজ, কিন্তু চাঞ্চল্য কিছুই নাই।

"আচ্ছা, তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আর দুইজনকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কি বলিবে? তোমার আমার অবস্থাভেদ বিবেচনা করিয়া

তোমার সহিত পরিচয় হওয়াই অসম্ভব। তাহার পর তুমি যুবতী, তুমি বিধবা। আমার ঘরে এত রাত্রে একা আসিয়াছ? আমার প্রতি আসক্ত না হইলে কেন তুমি আমার প্রতি এত অনুগ্রহ করিবে?"

"মন্দ অভিপ্রায় ছাড়া কি ভালবাসিতে নাই? ভালবাসা কি অসদভিপ্রায় ছাড়া কখন হয় না? তোমার ঘরে আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসি নাই। শুধু তোমায় ভালবাসি বলিয়া আসিয়াছি।" মোক্ষদার কথা যেন মাখম-মিছরী-মাখা, স্বরে যেন মধু মাখাইয়াছে।

বাবু একেবারে গলিয়া গেলেন। "তাই ত ঠিক! এতে ত মন্দ অভিপ্রায়ের কথাই নেই। তুমি আমায় ভাল বাস, আমি তোমায় ভাল বাসি। ইহাতে লোকে কিছু মনে করিলেই বা?"

"আমি তোমায় যেমন ভালবাসি, তুমি কি আমায় তেমন ভাল বাস?" সেই স্বর, মধুর মাত্রা কিছু বেশী।

"বাসি না? মোক্ষ, তবে তুমি আমার মন কিছুই জান না। আমি যে দিন হইতে তোমায় দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে ভাল বাসি। আর আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না। তুমি আর আমায় যন্ত্রণা দিও না। কি চাও তুমি? যাহা চাও, তাহাই দিব। আমাকে আর কষ্ট দিও না।"

মোক্ষদা কহিল, "আমি তোমা বই আর কাহাকেও কখন ভাল বাসি নাই, কখন বাসিবও না। কিন্তু মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন। আজ পর্য্যন্ত অধর্ম্ম করি নাই। প্রাণান্তেও ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না।"

মহেন্দ্র বাবু বিস্মিতের ন্যায় কহিলেন, "আমি তো তোমার কথা কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। ভালবাসার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি?"

"ভালবাসা কি অধর্ম্ম?"

"কে বলিল?"

"তবে তুমি আমায় ধর্ম্ম মতে ভাল বাস না কেন?"

"কি রূপে?"

"আমায় বিবাহ কর।"

ঘরের ভিতর যেন একটা পাথর পড়িল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই, কিছু পরে হাসির শব্দ শুনিলাম—মহেন্দ্র বাবু একটু হাসিলেন। পরক্ষণেই মোক্ষদা অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল, "ছাড়, ছাড়, আমার হাত ছাড়িলে চেঁচাইব।"

"চেঁচাও। কেহ আসিলে তোমায় জিজ্ঞাসা করিতে বলিব, তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে। তোমার অনিচ্ছা থাকিলে আমি তোমায় কেমন করিয়া ধরিয়া আনিলাম।"

"আমি সকল কথাই বলিব, কোন কথা গোপন করিব না। এখনি লোক জড় করিব। ছাড় বল্‌চি।" শেষের দুইটা কথা বেশ জোরে বলিল। মোক্ষদা চুপ করিল দেখিয়া, আমি মনে করিলাম, তাহার হস্ত মুক্ত হইয়াছে।

মহেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তুমি পাগল।"

মোক্ষদা পূর্ব্বের ন্যায় ধীর তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল, "যদি তোমার কথা এখন শুনি, তাহা হইলে সত্যই পাগলের কাজ হয়। তোমার কি? দু-দিনের সখ্ দু-দিন পরে মিটিয়া যাইবে। পাড়াগাঁয়ে একটা পুঁতুল কুড়াইয়া লইয়া দু-দিন খেলা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সহরে চলিয়া যাইবে। তোমায় আমি বড় ভালবাসি, তাই আমি ধর্ম্ম ত্যাগ করিব না। আর অধর্ম্মের কথাও শুনিব না।"

আমি থামের আড়ালে লুকাইলাম। মোক্ষদা দরজা খুলিয়া নিঃশব্দে বেগে চলিয়া গেল। মহেন্দ্র বাবু কিছুক্ষণ বাহিরে আসিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। যখন সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, তখন একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন।

বুঝিলাম, মহেন্দ্র বাবু ভূত ধরুন আর না ধরুন, তাঁহাকে বিষম ভূতে ধরিয়াছে। আমি উপরে গেলাম। সে রাত্রে বিড়াল ও ভূতের আবির্ভাব হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তাহার পর এক নূতন রঙ্গ আরম্ভ হইল। মহেন্দ্র বাবু বিমর্ষ, ব্যাকুল, সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্ক, কাহারও সহিত বড় কথা কন না, যেন কিছু ভাল লাগে না। বাগানে, পুষ্করিণীর ধারে একা ঘুরিয়া বেড়ান। মোক্ষদা তাঁহার সম্মুখে বড় বাহির হয় না। তাঁহার সম্মুখে পড়িলে মাথায় কাপড় দিয়া চলিয়া যায়। একেবারে যে তাঁহার চক্ষে পড়ে না, তাহা নয়, কিন্তু তাঁহার সহিত বড় কথা কয় না। কথা কহিবার অবকাশ দেয় না। মহেন্দ্র বাবু বন্ধনে আরও জড়িত হইতে লাগিলেন।

এক দিন মহেন্দ্র বাবুর মুখে অত্যন্ত বিকৃতির লক্ষণ দেখিলাম। চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ, ঠোঁট শুষ্ক। দেখিয়া ভয় হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কোন অসুখ করিয়াছে?"

মহেন্দ্র বাবু কিছু ক্ষীণ স্বরে কহিলেন, "না। তুমি সেই এক রাত্রে কিসের শব্দ শুনিয়াছিলে, মনে আছে?"

"আছে, আপনি আর কিছু দেখিয়াছেন?"

বাবু বলিলেন, "সেই কথা তোমায় বলিব মনে করিয়াছিলাম। কাল রাত্রে অনেক রকম বিকট শব্দ শুনিয়াছিলাম। ভূতে বিশ্বাস না থাকিলেও মনে কেমন সন্দেহ হইতেছে।"

আমি কহিলাম, "আপনি এ রকম একা শয়ন করেন কেন? আমি কেন আপনার নিকটে শয়ন করি না? না হয় কোন চাকর দরজার কাছে শয়ন করুক না।"

"না, না। আমি একাই ইহার কারণ অনুসন্ধান করিব। আমি কিছু ভয় পাই নাই।"

আরসীতে যদি তখন নিজের মুখ দেখিতে পাইতেন ত মহেন্দ্র বাবু বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার মুখে ভয়ের চিহ্ন ছিল কি না। আমি কহিলাম, "ভয় না পান, নিদ্রার ত ব্যাঘাত হয়। তাহা হইলে শরীর খারাপ হইবে।"

মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, "না না, কিছুই হইবে না। তুমি আর কিছু দেখিয়াছ?"

"না।"

"আশ্চর্য্য" বলিয়া মহেন্দ্র বাবু পাইচারি করিতে লাগিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন।

সেদিন আমি বাড়ীর বাহির হইলাম না। দোতালার একটি ঘরে সাশি ভেজাইয়া দিয়া বসিয়া রহিলাম। সেখান হইতে বাগানের কতক অংশ ও পুষ্করিণী দেখা যায়।

অপরাহ্নের সময় মোক্ষদা গা ধুইতে আসিল। গা ধুইয়া উঠিয়া যাইবে, এমন সময় মহেন্দ্র বাবু উপস্থিত হইলেন। মোক্ষদা জলের বাহিরে আসিয়া জলের নিকট প্রথম সিঁড়ীর উপর দাঁড়াইয়া আছে, সে দিকে জনমনুষ্য তখন ছিল না। মহেন্দ্র বাবু একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর—স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম—মোক্ষদার পা ধরিলেন।

আমি চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম, যেন কেহ দেখিতে পাইলে আমা-ই বিশেষ লজ্জার কারণ।

মোক্ষদা কি একটা সঙ্কেত করিল, হয় ত একটা কথাও কহিল। সেই াঙ্গে পা ছাড়াইয়া লইয়া আর্দ্রবস্ত্রে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

আমি রাত্রিকালে গোপনে বাবুর গৃহদ্বারে আবার উপনীত হইলাম। াজটা হয় ত বড়ই গর্হিত হইতেছিল, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, য মহেন্দ্র বাবুর বিশেষ বিপদ উপস্থিত। তাঁহাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য। সাবধান হওয়াও অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ, যে মহেন্দ্র বাবুর ার্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছিল, সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।

মোক্ষদা বলিতেছিল, "আজও কি মন্দ অভিপ্রায়ে আসিয়াছি না কি?"

মহেন্দ্র বাবু কাতর স্বরে কহিলেন, "আমি আর কিছু বলিব না। দেখ, তোমার শরীরে যদি একটুও দয়া থাকে ত আমাকে আর কষ্ট দিও না। আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিব, কিন্তু তোমার আশা ত্যাগ করিতে পারিব না।"

মোক্ষদা কহিল, "আমি তোমারই। ধর্ম্মভাবে যে দিন গ্রহণ করিবে, সেই দিন আমি তোমার।" তাহার স্বরের কোমলতায় ও মাধুর্য্যে আমি ভীত ইলাম।

"ও কি কথা?"

মোক্ষদা কহিল, "ও কথা ত আমি আগেই বলিয়াছি।"

মহেন্দ্র বাবু আরও কাতর স্বরে কহিলেন, "তুমি যে বিধবা।"

"বিধবার কি বিবাহ হয় না?"

"তুমি যে আমার স্বজাতি নও, তোমাকে বিবাহ করিলে আমি জাতিভ্রষ্ট ব, সমাজে আর মুখ দেখাইতে পারিব না।"

"তোমাকে সমাজভ্রষ্ট কে করিবে? আর আমার জন্য যদি জাতিভয়ই া ছাড়িতে পারিলে ত আর ভালবাসা কি?"

মহেন্দ্র বাবু একটু চুপ করিয়া কহিলেন, "দেখ, এ বাড়ীতে অধিক দিন াকিতে পারিব না। বোধ হয় হানা বাড়ী।"

মোক্ষদা কহিল, "কবে যাইবে?"

মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, "তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

মোক্ষদা কহিল, "আমি কি তোমার সহিত যাইতে অনিচ্ছু? আমাকে বিবাহ করিয়া লইয়া চল না?"

"এখানে কি করিয়া হইবে ?"

"কেন ? ব্রাহ্মণ পুরোহিত এখানে আসিতে পারে, বিধবাবিবাহে পুরোহিত এখানে আসিতে পারে না ?"

"তুমি আমার সঙ্গে কলিকাতায় চল, সেখানে একটা ঠিক হইবে।"

"তুমি আমাকে বিবাহ না করিলে তোমার সঙ্গে এ বাড়ীর বাহিরে এ পা যাইব না।"

মহেন্দ্র বাবু আর কোন কথা কহিলেন না। মোক্ষদা গলা আর একটু খাট করিয়া কহিল, "তুমি বলিতেছিলে হানা বাড়ী। কেন, তুমি কি কিছু দেখিয়াছ না কি ?"

মহেন্দ্র বাবুও ভীতিসূচক স্বরে কহিতে লাগিলেন, "বড় ভয়ানক স শব্দ শুনিয়াছি। একবার একটা পুরুষ আর একবার একটা স্ত্রীলোকে মূর্ত্তি দেখিয়াছি। এখানে আর বাস করিতে পারিব না।"

মোক্ষদা কহিল, "লোকে কি বলে শুনিয়াছ ?"

"না।"

"যাহারা এ বাড়ীতে প্রথমে বাস করিত, তাহাদের একটি বিধবা মেয়ে ছিল। মেয়েটি যুবতী। এই বাড়ীতে তাহার চরিত্র মন্দ হয়। বাড়ীর লোকে কানে সে কথা উঠিলে মেয়েটি আত্মহত্যা করে। তুমি যে ভয় পাও, তাহা কারণ বোধ হয় তোমার মনে পাপ আছে।"

"যখন তোমার সঙ্গে কোন বিশেষ কথা হয় নাই তখন ও ত একদি কিছু দেখিয়াছিলাম।"

"তখন কি ভয় পাইয়াছিলে ?"

"না।"

"তবে এখন ভাবিয়া দেখ, সত্য বলিয়াছি কি না।"

মহেন্দ্র বাবু কিছু বেগের সহিত কহিলেন, "চল, আমার সঙ্গে চল এখানে আর থাকিতে সাহস হইতেছে না।"

মোক্ষদা বলিল, "আমার যাওয়া না যাওয়া তোমার হাত। যে দিন আমাকে বিবাহ করিবে, সেই দিনই তোমার সঙ্গে যাইব।"

মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, "আমি পাগলের মত হইয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কেবল এই পর্য্যন্ত মনে হইতেছে যে, তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না। দুই দিন আমায় ভাবিতে দাও। একটু ভাবিয়া দেখি।"

মোক্ষদা বলিল, "তবে সেই কথা রহিল। যত দিন তুমি কিছু স্থির না রিতে পার, আমায় আর ডাকিও না। আমি আর আসিব না।

দ্বার নিঃশব্দে মুক্ত হইল। আমি থামের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিলাম। ক্ষদার পশ্চাতে মহেন্দ্র বাবু বাহিরে আসিলেন, কহিলেন, "আবার কবে সিবে বল ?"

মোক্ষদা কহিল, "যে দিন তুমি বিবাহের আয়োজন করিবে।"

একবার মহেন্দ্র বাবুর হাত ধরিয়া মোক্ষদা চলিয়া গেল। মহেন্দ্র বাবুর মস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

র দিবস বাগানে একবার মোক্ষদার সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে ফুল লিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন, পাখী ফাঁদে পড়িয়াছে ?"

মোক্ষদা অত্যন্ত তীব্র দৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিল। অনেকক্ষণ পরে হিল, "তুমি কি গোয়েন্দা ? তোমার মনিব কে ?"

আমি কহিলাম, "একটু সাবধানে থাকিও। তোমার কথায় আমি ভয় ইব না।"

মোক্ষদা মৃদু স্বরে কহিল, "আমার সঙ্গে শত্রুতা করিয়া তোমার ফল ? এক কথায় তোমায় তাড়াইতে পারি, জান ?"

আমি কহিলাম, "জানি। তাই ভাবিতেছি, তুমি আগে আমায় তাড়া-ার চেষ্টা করিবে না আমি তোমায় তাড়াইবার চেষ্টা করিব।"

"দেখা যাবে।"

আর কোন কথা হইল না।

রাত্রে আমি একটু সাবধান হইয়া শয়ন করিলাম। বালিশের তলায় শলাই ও বাতি সর্ব্বদা থাকিত। ঘরের আলোক নিভাইয়া দিলাম।

অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। খট্ করিয়া অল্প শব্দ শুনিতে পাইলাম। ামি সে শব্দ জানিতাম। চুপ করিয়া রহিলাম। ক্রমে নানাবিধ ভৌতিক ব্দ হইতে লাগিল। আমি নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অতি সাবধানে কিছুমাত্র শব্দ । করিয়া যে দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, তাহার বিপরীত দিকে ঘরের ক কোণে গিয়া দাঁড়াইলাম। সহসা আলোক উৎপাদন করিলাম।

আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার নিকটেই গুপ্ত পথ। দরজা খোলা ছিল। আলোক দেখিয়া ভূত বেগে সেই দরজায় প্রবেশ করিল।

আমি ভূতের কাপড় ও কেশ ধরিলাম। ভূত নিরুপায় দেখিয়া ঘ
ফিরিল। আমি ক্ষুদ্র দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম।

দেখিলাম—মোক্ষদা। আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হইলাম না। ধরা পড়ি
মোক্ষদা ভয়ে অস্থির হইল, কিন্তু চীৎকার করিবার কোন উপক্রম করিল ন

আমি আর একটা দেশলাই জ্বালিয়া বাতি জ্বালিলাম। নিশ্চিন্ত হই
খাটে বসিলাম। মোক্ষদা দাঁড়াইয়া রহিল। কহিলাম, "পলাইবার চে
করিও না। যে-পথে তুমি আসিয়াছ, সে পথ আমি জানি।"

মোক্ষদা পলায়নের চেষ্টা করিল না, কোন কথা কহিল না, দাঁড়াই
রহিল।

আমি কহিলাম, "যে পথ দিয়া আসিয়াছ, সে দিক দিয়া আর যাইতে
পাইবে না। কাল সকলে উঠিলে পর সিঁড়ী দিয়া সকলের সম্মুখ দিয়া নামি
যাইতে হইবে।"

মোক্ষদা শিহরিল, চক্ষে আঁচল দিল। ভগ্ন স্বরে কহিল, "এখন তোমা
হাতে পড়িয়াছি, যাহা ইচ্ছা হয়, তাই কর।"

আমি কহিলাম, "তুমি আমার ঘরে কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আইস না;
তাহা আমি জানি।"

মোক্ষদা আঁচল ছাড়িয়া দিল, আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমি কহিলাম, "তুমি আমায় ভালবাস বলিয়া আসিয়াছ, আর কো
তোমার ইচ্ছা নাই।"

মোক্ষদার চক্ষু স্থির হইল, তাহার চক্ষে ভয়ের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম

আমি কহিলাম, "আমি যদি তোমার হাত ধরি, তাহা হইলে তু
চীৎকার করিয়া লোক জড় করিবে। তাহাদের সাক্ষাতে সকল ব
বলিবে, কেমন?"

মোক্ষদা হাত যোড় করিল, কহিল, "আর আমাকে লজ্জা দিও না
তুমি সব জান।"

আমি অল্প অল্প হাসিতে লাগিলাম।

মোক্ষদা একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল। আর একটু কাছে আসিল
কহিল, "তুমি এইমাত্র বলিতেছিলে, সম্মুখ দরজা দিয়া আমায় নীচে যাইতে
হইবে। তোমার তাহাতে কি লাভ?"

আমি কহিলাম, "তুমি রাত্রে কোথায় ছিলে, সকলে জানিতে পারিবে।

। হইলে তোমার বিবাহের সুবিধা হইবে।” মুখের ভাব আমার বড়
র।

মোক্ষদা বলিল, “সে কথা বুঝিলাম। আমার যেন মাথা হেঁট হইল।
় তোমার কি কোন ভয় নাই? বাবু কি তোমায় কিছু বলিবেন
।”

“সে কথাও ত ঠিক! সে কথাটা ভাবি নাই।” আশ্চর্য্য হইয়া
মি মোক্ষদার দিকে চাহিলাম। কথাটা শুধু ছলনা। ভাবিয়াছিলাম
নকক্ষণ।

মোক্ষদা আর একটু কাছে আসিল। “আমার যাহাই হউক, তুমি আর
ুর কাছে মুখ দেখাইতে পারিবে না। ইহাতে লোকসান দুইজনের, লাভ
কাহারও দেখিতেছি না। আমার সঙ্গে কি তোমার এতই শত্রুতা যে
ম নিজের ক্ষতি করিয়া আমার ক্ষতি করিতে চাও? আমি তোমার কি
রিয়াছি?”

আমি একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিলাম, “কিছু না।”

“শত্রুতা না হইয়া আমাদের মিত্রতা হইবার কথা। তোমারও ইচ্ছা কিছু
ভ, আমারও সেই ইচ্ছা। দুইজনে পরস্পর সাহায্য করিতে পারি। দুইজনে
ংবের লাভের ভাগী হইতে পারি।”

“তবে ভূত সাজিয়া আমায় ভয় দেখাও কেন?”

“তুমি নিজে মনে করিয়া দেখ, কাহার দোষ। তুমি প্রথম হইতেই আমার
ক্ষ হইলে,—কাজেই আমি তোমায় তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিলাম।”

“কিন্তু বাবুকে ভয় দেখাও কেন?”

“শীঘ্র একটা মিট্‌মাট্ হইবে বলিয়া।”

“বুঝিলাম। তাহার পর?”

“তোমাকে আর কি বলিব? আমার সহায়তা করিলে কি তোমার
ক লাভের আশা নাই?”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেমন করিয়া?”

“আমার যদি ইচ্ছা সফল হয় ত বাবুর কাছে তোমার একটি ভাল কাজ
রিয়া দিব, ও যথাসাধ্য নগদ টাকা দিব।”

আমি যেন আপনার মনে বলিলাম, “বাবু যাহাকে বিবাহ করুন, আমার
াতে কিছু ক্ষতি কি? আমার একটি কর্ম্ম হয়, সেই ত কামনা।”

মোক্ষদা অবশ্য আমার কথা শুনিল, কহিল, "আমি শপথ করিয়া ব
তেছি, তোমার উপকার ভুলিব না। কিন্তু যেমন করিয়া হয়, তুমি বাবুর স
এ কথা পাড়িও।"

"তিনি ত তোমার কথা কাহারও সঙ্গে কন না।"

"আমার কি আর নাম করিয়া বলিবে, না পরিষ্কার করিয়া বলি
ঠারে ঠোরে, ইঙ্গিতে। বিবাহের কথা হইল, শাস্ত্রের কথা হইল। এই র
করিয়া। বুঝিয়াছ?"

আমি অত্যন্ত বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িলাম, কহিলাম, "হাঁ, এখন
বুঝিয়াছি। তোমায় একটা কথা বলি।"

"কি?"

"তুমি দিন দুই তিন আর রাত্রে পবিত্র প্রেমলীলা করিও না। ত
হইলে বাবুর মন তেমন ব্যস্ত হইবে না। আর ভূতের পালাটা যেন রে
রাত্রে হয়। আমি খুব পড়াবার চেষ্টা কোরব।"

মোক্ষদা হাসিল, কহিল, "তাই হবে।"

আমি কহিলাম, "পুরস্কারের মধ্যে কেবল কি চাকরীটি?"

মোক্ষদা আমার হাতে হাত দিল। "আবার কি?"

আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

মোক্ষদা কহিল, "আচ্ছা, তুমি আমায় এত বিষ দেখিয়াছিলে কে
বল ত?"

আমি কহিলাম, "হিংসায়। আমি গরীব বলিয়া কি আমার দিকে
বার তাকাইতে নাই?"

মোক্ষদা আমাকে দুই একবার মৃদু মৃদু করাঘাত করিল, "ছি! মনি
গৃহিণীর প্রতি কি নজর তুলিতে আছে?"

আমি কহিলাম, "তাও বটে। আর রাত নাই। আজ তুমি যাও।"

মোক্ষদা কহিল, "সত্যই ত! ভোর হয় যে। আমি যাই, কোন্
দিয়ে যাইব?" বলিয়া, ফিরিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিল।

আমি কহিলাম, "যে দিক দিয়া ইচ্ছা।"

দেওয়ালের দরজা খুলিয়া মোক্ষদা নামিয়া গেল। আমি আলোক ধ
লাম। আমার মনে যাহা হইতেছিল, জানিতে পারিলে মোক্ষদা গমনকা
হাসিয়া যাইত না।

নবম পরিচ্ছেদ।

াদয়ের পর নীচে নামিয়া আসিয়া মহেন্দ্র বাবুর মুখ দেখিয়া আমার হইল। তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ বিশুষ্ক, হাত কাঁপিতেছে। আমি কহি- "কাল রাত্রেও আপনার নিদ্রা হয় নাই?"

বাবু কহিলেন, "না, বাড়ী বড় ভয়ানক বোধ হইতেছে।"

আমি বলিলাম, "এখানে আর কিছু দিন থাকিলে আপনার শরীর হ হইবে। আপনি কলিকাতায় চলুন।"

"তাহাই মনে করিতেছি। দুই চারি দিনের মধ্যে স্থির করিব।"

আমি কহিলাম, "দুই চারি দিন যদি এখানে থাকেন ত রাত্রে একা করিবেন না।"

"কেন?"

"আপনার শরীর ভাল নাই। রাত্রে ভয় পাইলে সহসা রোগ জন্মিতে া।"

"কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

আমি ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, কেহ নিকটে নাই। ভিতরে কহিলাম, "আপনি ভূত ধরিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হন?"

বাবু আমার দিকে চাহিয়া ক্ষীণ হাস্য করিলেন। "ভূত কি ধরা যায়?"

"ভূত হইলে ত? যদি ভূত না হয়?"

হেন্দ্র বাবু আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইবে?"

দি মানুষ হয়?"

তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

আমার সন্দেহ হইতেছে। আমার অনুরোধ, এক রাত্রি আপনার ঘরে য় থাকিতে দিন। তাহা হইলে আপনি আর কখন রাত্রে ভয় পাই- না।"

বাবু কহিলেন, "তুমি থাকিলে কি লাভ?"

আমি কহিলাম, "যদি আপনার সন্দেহ না ভঞ্জন করিতে পারি, তাহা লেও এক জন লোক ঘরে থাকিলে ভয় কম হইবে। আপনি এক দিন ার কথা রাখুন।"

বাবু অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিলেন, পরে কহিলেন, "সন্ধ্যার ১
তোমায় ঠিক করিয়া বলিব।"

দিনের বেলা বাবু পুষ্করিণীর ধারে, বাগানে অনেকবার বেড়াইলে
মোক্ষদার একবার দেখাও পাইলেন না। সন্ধ্যার সময় আমায় কহি
"আচ্ছা, আজ তুমি আমার ঘরে থাকিও। দু-জনে মিলিয়া যদি কিছু
সন্ধান করিতে পারি।"

আমি কহিলাম, "আপনি এ কথা প্রকাশ করিবেন না। গোপনে
অত্যন্ত আবশ্যক। সকলে শয়ন করিলে আমি আপনার ঘরে যাইব। আ
দরজা ভেজাইয়া রাখিবেন।"

বাবু অনেকক্ষণ সন্দিগ্ধচিত্তে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।
কহিলেন, "তোমার জন্য বিছানা না থাকিলে তুমি শয়ন করিবে কোথা

আমি কহিলাম, "সমস্ত রাত বসিয়া কাটাইব। আপনি কোন
করিবেন না।"

বাবু আর কিছু বলিলেন না।

রাত্রে যখন চাকরেরা শয়ন করিতে গেল, তখন আমি ঘরের আ
নিভাইয়া দিয়া চুপি চুপি নীচে নামিয়া গেলাম। মহেন্দ্র বাবু দরজা
ইয়া দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। নিদ্রা যান নাই। আমাকে দেখিয়া
লেন, "এখন কি করিবে?"

আমি প্রথমে আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করিলাম। ঘরে একটি
সোফা ছিল, টানিয়া দরজার নিকটে আনিলাম। পরে কহিলাম,
আলোক নিভাইতে হইবে।"

মহেন্দ্র বাবু সভয়ে কহিলেন, "কেন?"

আমি কহিলাম, "আমার পকেটে বাতি ও দেশলাই আছে। অ
হইলে তখনি আলো জ্বালিতে পারিব। যদি মানুষ হয়, তাহা
আলোক থাকিতে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না।"

"মানুষ হইলে আসিবে কোথা হইতে?"

"সেইটা আমাদের জানিতে হইবে। যে কয় দিন আপনি ভয় প
ছেন, ঘরে কি আলোক ছিল?"

"না, ঘর অন্ধকার।"

"আলোকে যে তৈল থাকে, তাহাতে কি সমস্ত রাত আলো জ্বলি

নয়? যে রাত্রে আপনি কিছু শব্দ শুনিতে পান না, সে রাত্রে কি সমস্ত
 আলো জ্বলে না?"
"জ্বলে বই কি।"
"তবে নিশ্চয়ই কেহ আলোক নিভাইয়া দেয়। ভূত কি মানুষ স্থির
ন্ত হইবে। আপনি আর কথা কহিবেন না। আমি আলো নিভাই-
ই।"
আলো নিভাইয়া দিয়া আমি সোফায় বসিলাম। মহেন্দ্র বাবু একটা
াস ফেলিয়া শয়ন করিলেন। ভয়ে তাঁহার মনের বল কিছুমাত্র ছিল না।
বসিয়া বসিয়া আমি ঝিমাইতে লাগিলাম। ঝিমাইতে ঝিমাইতে তন্দ্রা
সিল।
খুট্ করিয়া একটু শব্দ হইল। তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি ভাল করিয়া
য়া বসিলাম।
এ ভূতের বিক্রম কিছু অধিক। নানাবিধ বিকট শব্দ হইতে লাগিল।
ই সকল শব্দের একটু বিরাম হইলে, আর এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাওয়া
। বাবুর দাঁতে দাঁতে লাগিয়া ঠক্ ঠক্ করিতেছে।
ভূতের উপদ্রব বাড়িতে লাগিল। দুই একবার বাবুর খাট ধরিয়া টানিল,
বার তুলিয়া ফেলিয়া দিল, শব্দ শুনিলাম। একটু পরে ভূত কথা
হল। চিরকাল ভূতে যেমন খোনা কথা কয়, সেইরূপ কহিল। চন্দ্রবিন্দু-
 বাদ দিয়া কথাটা এই। "তুমি যদি ভাল চাও ত যাহাকে মন্দ দৃষ্টিতে
য়াছ, তাহাকে বিবাহ কর। আমি পাপের ফল ভুগিতেছি। তুমি যদি
ইচ্ছা না ত্যাগ কর, তাহা হইলে আমি তোমার ঘাড় মুচ্‌ড়াইব। এখা-
থাক, আর যেখানেই যাও, আমি তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। বিবাহ
লে আমায় আর দেখিতে পাইবে না, তোমায় ছাড়িয়া যাইব। যাহাকে
ক্ষ দেখিয়াছ, তাহাকেই বিবাহ কর। পাপের শাস্তি হউক।"
"ও-ও-ও স্-স্-যি", বাবু গোঙ্গাইতে লাগিলেন। আমি আর অপেক্ষা
রতে পারিলাম না। দেশলাই বাহির করিয়া মোমবাতি জ্বালিলাম।
মে আর কোন দিকে না চাহিয়া দেওয়ালের চারিদিকে চাহিলাম।
খানে ক্ষুদ্র গুপ্ত প্রবেশ পথ দেখিতে পাইলাম, দ্রুত সেইখানে গিয়া দেও-
লে পিঠ দিয়া দাঁড়াইলাম। মোমবাতি পাশের জানালায় রাখিয়া দিলাম।
তাহার পর চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

মোক্ষদা ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছিল। মুখে কথা নাই, চক্ষে, শরী স্পন্দ নাই।

মহেন্দ্র বাবু খাটে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। চোক কপালে উঠিয়াছি সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, দাঁত ঠক্ ঠক্ করিতেছিল। আলোকে চারিদি চাহিয়া দেখিলেন। মোক্ষদাকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষু স্থির হইল। অ ক্ষণ পরে কহিলেন, "তুমি!"

আমি কহিলাম, "এই ভূত।"

তখন মোক্ষদা একবার মহেন্দ্র বাবুর দিকে চাহিল, ফিরিয়া আ দেখিল। কোন কথা না কহিয়া ব্যাঘ্রীর ন্যায় আমাকে আক্রমণ করি হস্তে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা।

আমি বাম হস্ত উত্তোলন করিলাম। হস্তে ছুরিকা বিদ্ধ হইল। দ হস্ত দ্বারা মোক্ষদার গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিলা ছুরি কাড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিলাম।

বাবু চাকরদের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আমি কহিলাম, "ক্ষ হউন, করেন কি? দুইজনে মিলিয়া একটা স্ত্রীলোকে কি ধরিয়া রাখা য না? চাকরেরা আসিলে নানা কথা উঠিবে।"

বাবু চুপ করিলেন। তখনি আবার রাগিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "মাগী পুলিসে দিব, জেলে দিব। মাগী চুরি করিতে আসিয়াছিল, খুন করি আসিয়াছিল।"

আমি কহিলাম, "যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। আপাততঃ একবার ইহ ধরুন, আমি হাতটা দেখি।"

মহেন্দ্র বাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া মোক্ষদার কেশ ধরিলেন। আমি দে লাম, হাতে সামান্যই আঘাত লাগিয়াছে। ক্ষত স্থান ধুইয়া চাদ থানিকটা ছিঁড়িয়া জড়াইয়া বাঁধিলাম। শোণিতস্রাব অল্পক্ষণ পরেই বন্ধ হ গেল।

তাহার পর মোক্ষদার সাক্ষাতেই আমি সকল কথা বলিলাম। বাবু মা মাঝে কহিতে লাগিলেন, "কি আস্পর্দ্ধা! মাগীকে নিশ্চয়ই জেলে দিব। ত কি রক্ষাই পাইয়াছি। এখনি পুলিস ডাক, মাগীকে বাঁধিয়া লইয়া যাক্।"

আমি কহিলাম, "পুলিসের হাঙ্গামায় কাজ নাই। উহার যদি দশ বৎস জেল হয়, তাহাতে আমাদের কোনই লাভ নাই, আপনার নামে একা

থা উঠিলে বড় অপমানের কথা। উহাকে বিদায় করিয়া দিন, আর কোন কথায় কাজ নাই।"

মহেন্দ্র বাবু কহিলেন, "তাই ভাল। গোষ্ঠীশুদ্ধ বিদায় করিয়া দাও।"

আমি কহিলাম, "কাল সকাল বেলা বিদায় করিয়া দিলেই হইবে। খন উহাকে ছাড়িয়া দিন।"

বাবু মোক্ষদার কেশ ছাড়িয়া দিলেন। আমি দরজা খুলিয়া মোক্ষদাকে হিলাম, "যাও।" বাবু কহিলেন, "দূর হইয়া যাও, কাল তোমায় ঝাঁটা ারিয়া বিদায় করিব।"

মোক্ষদা কথা কহিল না, কোন দিকে চাহিল না, ঘরের বাহিরে গেল।

মহেন্দ্র বাবু তখন আমার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, তোমার এ উপকার আমি কখন ভুলিব না। কি রাক্ষসীর হাত হইতে তুমি মামায় রক্ষা করিয়াছ!"

দশম পরিচ্ছেদ।

াত্রিজাগরণে ও শোণিতনির্গমে শরীর একটু অবসন্ন হইয়াছিল। সোফায় য়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

একটা ঘোর কোলাহলে নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখি, অনেক বেলা হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবু চোক রগড়াইতে রগড়াইতে হাই তুলিতে লিতে উঠিলেন।

বাড়ীর সম্মুখে চাকরগুলা চেঁচামেচি করিতেছিল। মালী ও তাহার ী বড় চীৎকার করিতেছিল। কহিতেছিল, "মোক্ষদা কোথায় গেল। ালে উঠে তাকে দেখ্‌তে পাইনি।"

গোপাল নামে বাবুর একটা চাকর কলিকাতা হইতে ছিল। কলিকাতার করের মত সে একটু চালাক। মালীর সম্মুখে গিয়া কহিতেছিল, "দেখ্, তার মোক্ষদাকে ধরে আস্ত গিলে ফেলেচি। এই দেখ্, মুখে এখনো তার াথার চুল রয়েচে।" এই বলিয়া গোপাল বদন ব্যাদান করিল।

আমি আসিয়া কহিলাম, "কি, হয়েচে কি?" আমার পিছনে পিছনে হেন্দ্র বাবু আসিলেন।

আমাদিগকে দেখিয়া বুড়া বুড়ী কাঁদিতে লাগিল। ব্যাপারখানা কি? না, মোক্ষদা মালীদের ঘরে নাই। কখন যে উঠিয়া কোথায় গিয়াছে, কেহ জানে না।

আমি বলিলাম, "তা, সে জন্য বাড়ী মাথায় করা কেন? সে ত আ ছেলে মানুষ নয় যে পথ হারাবে।"

"না বাবু, তা নয়। ডাগর মেয়ে, সেই ভয়। যদি ছাই বাতাস লাগে—

মহেন্দ্র বাবুতে আমাতে একবার চোকোচোকি হইল। বাবু বিরক্ত হই কহিলেন, "তা এখানে কেন? কোথায় গিয়াছে, খুঁজিয়া দেখ না।"

মালী কহিল, "তাই খুঁজিতেছি। একবার এ দিকে খুঁজিতে আসিয়াছি

আমি হাসিয়া কহিলাম, "দেখ, ঘরগুলা ভাল করিয়া দেখ। ঘরে পুরি কেহ না রাখিয়া থাকে।"

বুড়া বুড়ী ঘরে ঘরে খুঁজিয়া দেখিল। তাহার পর গ্রামে খুঁজিতে গেল দুপুর বেলা তাহারা ফিরিয়া আসিল। মোক্ষদার কোন সন্ধান পাওয় যায় নাই।

বাবু সেই দিন সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় ফিরিবেন, স্থির করিয়াছিলেন বৈকালে আমরা বাগানে বেড়াইতেছিলাম। মালীর ঘর হইতে রোদনের শব হইতেছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে পুষ্করিণীর নিকটে গেলাম। পাড়ে একট নোনা গাছ জলের উপর একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। সেখানে একটু অন্ধ কার। বোধ হইল, জলে কি ভাসিতেছে।

নিকটে গিয়া দেখিলাম, মোক্ষদার মৃত দেহ ভাসিতেছে। মুখ জলের মধ্যে, মাথার চুল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মালীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। সে আসিয়া মোক্ষদার মৃত দেহ দেখি ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। শোকের তেমন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। আ জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি?"

মালী সভয়ে কহিল, "সে আসিয়া মোক্ষদাকে লইয়া গিয়াছে।"

"কে?"

"সেই বাবুদের বিধবা মেয়ে!"

আমরা সেই দিনই কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। মহেন্দ্র বাবু জলে দরে নূতন বাড়ী বেচিয়া ফেলিলেন। আমার আর চাকরীর চেষ্টা করিতে হইল না। মহেন্দ্র বাবু জমিদারীর সমস্ত ভার আমার হাতে দিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সনেট।

দীপ-হস্তে যুবতী।

'ড়, ছাড়, হাত ছাড়—"

ছাড়িলাম হাত!

ন্দরি, রোষ কেন? তুমি যে আমার

চিত; মনে নাই সে নিশি আঁধার?

মাতে আমাতে হ'ল প্রথম সাক্ষাৎ!

রুটি ভরিয়া গেছে অশোকে অশোকে;

সছে জোনাকি-পাঁতি কুসুমে কুসুমে;

বি-চিত্ত গেল ভরি মাধুরী-আলোকে;

মি সখি তরু হ'তে নেমে এলে ভুমে!

ক অশোক-বার্ত্তা আনি, মরমে মরমে,

লি দিলে কবি-কর্ণে, অশোক সুন্দরি!

বসের পাপ চিন্তা, কলুষ সরমে,

রি ও সাঁজের দীপ, গিয়াছি বিস্মরি!

সিয়া, ছাড়ায়ে হাত, গেল বধূ ছুটি!—

ণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়া দেউটি!

লাজ-ভাঙান।

মটা খুলিবে না'ক? থাক তবে বসি।

মি করি কাব্য-পাঠ, যামিনী জাগিয়া!

! একি! চাঁপাগুলি গেছে বুঝি খসি?

পা চাহে ফুলগুলি, কাঁদিয়া কাঁদিয়া!

মি দিব? কাজ নাই—পরশে আমার,

আমি গো চঞ্চল বড়) খুলিবে কবরী!

ন্তলের ফুলদানী, আহা মরি মরি!

পাগুলি ফিরে পেয়ে, হাসিছে আবার!

মন সুন্দর পান কে গো সেজেছিল?

সিছ? তোমারি কীর্ত্তি? এ বড় অন্যায়!

তব ওষ্ঠ এত লাল! পানের বাটায়,

আমা লাগি ভিন্ন পান কে বল আনিল!

"যাও—যাও"—সে কি কথা? ধরি দুটি কর,

আমিও রাঙ্গিয়া লই আপন অধর!

যুবতীর হাসি।

হে রূপসি, নিশি শেষে, কোন্ নদী ধারে,

কোন্ স্বপ্নময় পুরে, কোন্ কামাখ্যায়,

চরণে নূপুর যেন, অন্তর-মাঝারে,

বহিয়া সে কুলুধ্বনি, আইলে হেথায়?

নাগেশ্বর-চাঁপাতলে কোন্ অলকায়,

দাঁড়াইয়াছিলে, তুমি মদনমোহিনি?

এক রাশি জাতি, যূথি, মল্লিকা, কামিনী,

ঝাঁপাইয়া কোলে তব, পশিল হিয়ায়!

গান নাহি বোঝা যায়, ভাসে সুধু সুর;

ফুল নাহি দেখা যায়, সৌরভ কেবলি;

প্রাণের গবাক্ষ দিয়া, জ্যোৎস্না মধুর,

উছলিয়া অধরেতে পড়ে আসি চলি!

সে কাহিনী তুমি আমি গেছি এবে ভুলি!

এ কি হাসি! এ যে সুধু আকুলি ব্যাকুলি!

সদ্য-স্নাতা যুবতী।

শ্রী-অঙ্গে মিশিয়া গেছে লজ্জা আবরণ;

কেশের তরঙ্গরাশি চুম্বিছে মেদিনী!

সশৈবাল সরোজেতে ভ্রমর-গুঞ্জন,

ঝির্ ঝির্ বহে যায় রূপ-নির্ঝরিণী!

কে যেন খুলিয়া দেছে গোলাপ-কারাবা!

কার্ত্তিকে ফুটিয়া যেন উঠেছে মালতী!

মেঘরাশি গেছে উড়ি! আহা, কিবা শোভা,

বর্ষারাতে হাসে চাঁদ পাইয়ে মুকতি!

নগন সৌন্দর্য্যময়ি, হে চারু রূপসি,

অসত্যে ও সত্যরাশি ছিল রে গোপন;

এ অনুপ্রাণিত বক্ষ উঠিছে উলসি,

হেরি তব অনাবৃত আকৃতি মোহন।

মায়াময় এ জগতে অলীক সকলি;

সত্য হেথা নগ্ন-শোভা চারুতা কেবলি!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মনুষ্য ও পশুবুদ্ধি।

মানুষ অবস্থা বুঝিয়া কাজ করে। দশ দিক দেখিয়া, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তম
চিন্তা করিয়া, ভাল মন্দ বিচার করিয়া, সে কর্ত্তব্য নিরূপণ করে। পরিবর্ত্ত
শীলতা মনুষ্যবুদ্ধির প্রকৃতি। কোন অবস্থায় কে কিরূপ কার্য্য করিবে, পূ
নির্দ্ধারণ করিবার কাহারও সামর্থ্য নাই। অনেকের সমষ্টি করিয়া অবস্থ
বিশেষে কর্ত্তব্যবিশেষ নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ
সম্বন্ধে কোন অনুমান সমীচীন নহে।

কিন্তু পশু পক্ষী সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ সাধারণতঃ প্রতিপন্ন হয়। একটি মধুমক্ষিব
যেরূপে গৃহ নির্ম্মাণ করে, অন্যটি সেইরূপে করিবে; ইহা পূর্ব্বেই অনুমান
করা যাইতে পারে। মেষ বা সিংহ একদিন যাহা আহার করিয়াছে, চির
দিনই তাহাই আহার করিবে। অপরিবর্ত্তনীয়তা পশুবুদ্ধির প্রকৃতি।

মানুষের বুদ্ধি ক্রমবিকাশসাপেক্ষ। শিশুর অপেক্ষা যুবার বুদ্ধি অধিক
অসভ্যের অপেক্ষা সভ্যের বুদ্ধি অধিক। ইহা সাধারণ বিশ্বাস যে, পশুবু
বয়স অনুসারে উন্নতি লাভ করে না। ক্ষমতার কথা ছাড়িয়া দিলে ইচ্ছার
পরিমাণে বুদ্ধির বিকাশ নিরূপণ করিলে দেখা যায়, পশুপক্ষী বাল্যকা
যাহা করে, চিরদিনই তাহাই করে। কখন বুদ্ধির তারতম্য অনুভব করা যা
না। একটি গণ্ডীর ভিতর তাহার বুদ্ধি ঘুরিয়া বেড়ায়, সে গণ্ডী অতিক্র
করিবার তাহার সাধ্য নাই। মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা আছে; পং
শুর প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসে সে কোন কর্ম্ম করিতে চাহে না। বুদ্ধিবলে মনু
ভাবপ্রবণতা দমন করে। পশুর ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই, তাহার বিচা
শক্তি নাই, সে বুদ্ধিবলে ভাবপ্রবণতা দমন করিতে পারে না। ভাবোচ্ছ্বা
প্রাণ বিসর্জ্জন হয়, তবু ভাবের প্রচণ্ডতার হ্রাস হয় না।

মানুষ অন্যের দেখিয়া শিখে। দূরদর্শীর বিজ্ঞতা তাহার স্বোপার্জ্জিত জ্ঞা
পরিমাণ বৃদ্ধি করে। পরিবারে বিদ্যালয়ে বা সমাজে, সে অন্যের বিজ্ঞত
হইতে আপনার জ্ঞান সংগ্রহ বৃদ্ধি করিয়া লয়। পশুর সে অধিকার নাই।
অন্যকে স্থানবিশেষে বা কালবিশেষে বিপন্ন হইতে দেখিয়া, সে স্থান বা
কাল পরিহার করিতে তাহার চৈতন্য হয় না। এক জন যাহা খাইয়া

াত্যাগ করে, অন্তে আগ্রহপূর্ব্বক তাহাই খায়। এক জন যে জালবদ্ধ
া প্রাণত্যাগ করে, অন্তে পরক্ষণেই সেই জালে বদ্ধ হয়; যে হস্তে একবার
ত হয়, পরক্ষণেই সেই হস্ত লেহন করে।

মানুষের স্মৃতিশক্তি প্রখর। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, জীবনে প্রতিবেশীমণ্ডলে,
শী বা বিদেশে যাহা ঘটিয়াছে, মানুষের তাহা স্মরণ থাকে। দশ বৎসর
যাহার সহিত আলাপ করিয়াছে, দেখিলেই তাহাকে চিনিতে পারে।
বার যাহার নিকট উপকার বা অপকার পাইয়াছে, কখন তাহাকে
ত হয় না। যে মুখখানি, যে ফুলটি, যে পাখিটি দেখিয়া একবার আনন্দ
ভ করিয়াছে, যে গানটি শুনিয়া একবার তাহার হৃদয় উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হই-
ন, কখন তাহা ভুলে না। সে মুখখানি তাহার মনে যেন জাগিয়াই
হ, সে মুরলী তাহার কাণে যেন নিরন্তর বাজিতেছে। পশুপক্ষীর কেহ
প্রভুকে বা বাসগৃহকে কিছুকাল স্মরণ রাখে বটে, কিন্তু একবার স্থানা-
বা হস্তান্তর হইলেই তাহা ভুলিয়া যায়। অন্যের কথা দূরে থাকুক, দুদিন
আপন সন্তানকেই চিনিতে পারে না; উপকারীর উপকার, মিত্রের
তা, নিত্য-সঙ্গীর সঙ্গ, বালুর উপর জলের রেখার ন্যায় অচিরে তাহার
হইতে অন্তর্হিত হয়। মুখের ছায়া তাহার মনে ফটোগ্রাফ হয় না।

মানুষের কল্পনা শক্তি আছে। পশুর আদৌ নাই। কল্পনাশক্তি স্মৃতি-
চিন্তাসাপেক্ষ। অতীত দেখিয়া ভবিষ্যৎ অনুমান করিতে হয়।
র স্মরণশক্তি নাই, তাহার কল্পনার সম্ভাবনা কোথায়? মানুষ সাধু
য়া দেবতার কল্পনা করে, সুন্দরী দেখিয়া পরীর কল্পনা করে, প্রাসাদ
য়া স্বর্গের কল্পনা করে। মেঘ দেখিয়া ঝড়ের কল্পনা করে, আকাশ
য়া দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করে, মুকুল দেখিয়া ফলের আশা করে। তোষা-
দেখিয়া বন্ধুতার কল্পনা করে, হাসি দেখিয়া অনুরাগের কল্পনা করে,
দেখিয়া প্রিয়তমার মুখ কল্পনা করে। ফুল ফল বৃক্ষ, তারা চন্দ্র মেঘ
দেখেন, তাহাতেই রাম, সীতার অঙ্গ লক্ষণ দেখিতে পান। কাক
াকিল হংস, বায়ু মেঘ চন্দ্র, সকলেই মানুষের দৌত্যকর্ম্ম স্বীকার করে।
তাফলে মাধ্যাকর্ষণ জন্মে, ভাতের হাঁড়িতে বাষ্পযানের উদয় হয়, পিঠের
ড় মস্তিষ্ক দেখা যায়। কাব্য ও বিজ্ঞান, কল্পনায় জন্মলাভ করে। আন-
র উৎস, জ্ঞানের প্রস্রবণ, কল্পনা পশুবুদ্ধির কল্পনাতীত।

মানুষের ন্যায় পশু পক্ষীর সৌন্দর্য্যানুভাবকতা শক্তি নাই। গাহিতে হয়,

তাই পাখী গায়, নাচিতে হয়, তাই ময়ূর নাচে, পুচ্ছ বিস্তার করিতে হ
তাই সে করে। নতুবা রূপের সৌন্দর্য্য, গুণের গাম্ভীর্য্য, স্বরের মাধুরী অনু
করিবার তাহার ক্ষমতা নাই। একখানি মুখে মানুষ সাত জন্ম পাগল থা
একটি ফুলের গন্ধে পুলকিত হয়, একটি গানে স্তম্ভিত হইয়া থাকে। সাজি
ও সাজাইতে, দেখিতে ও দেখাইতে মানুষ দিন রাত বিব্রত। রঙ্গে রঙ্গ মি
ইতে, তালে তাল মিলাইতে, সুরে সুর মিলাইতে তাহার কতই আ
কতই অনুরাগ। এতৎসম্বন্ধে পশু পক্ষীকে অন্ধ ও বধির বলিলেও চলে, প
অনিমেষ-নয়নে কবে প্রিয়তমার মুখের দিকে তাকাইয়াছে, উৎকণ্ঠ হ
কবে সঙ্গীতে কর্ণপাত করিয়াছে, কবে চারু সজ্জায় আবাসগৃহ সুসজ্জি
করিয়াছে, কবে বাসর সাজাইয়া মনোমোহনের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া
পাখীর নিকট সুকুমার শিল্পের আদর, গড়ের মাঠে লর্ড মেয়োর প্রতি
দেখিলেই বুঝা যায়।

কাম ক্রোধ লোভাদি পশুপ্রবৃত্তি মানুষের অপেক্ষা পশু পক্ষীর অ
গুণ অধিক।

দয়া বিনয় কৃতজ্ঞতা ভদ্রতা প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি তাহাদের আদৌ নাই
অতি সামান্য আছে। দুর্ব্বল পীড়িতকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, বরং ত
দিগের প্রাণ বিনাশ করিতেই পশু পক্ষীদিগকে সর্ব্বদাই উদ্যত দেখা য
মৃতদেহের সযত্নে সমাধি, আহতের সুশ্রূষা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান, তৃষ্ণার্ত্তকে
দান করিতে কে কবে পশু পক্ষীকে দেখিয়াছেন? পরোপকারিতা
সমাজে সুদুর্লভ। বয়োবৃদ্ধকে কে কবে সম্মান করে? বলবানের নি
কাতরতা স্বীকার করা পশু পক্ষীর ভীতিব্যঞ্জক, সম্মানব্যঞ্জক নহে।
প্রভুর নিকট যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহা কৃতজ্ঞতা কি স্বার্থপর
পরিপোষক আনন্দব্যঞ্জক, বুঝা সহজ নহে। মানুষের ন্যায় পশু পক্ষীর অ
স্নেহ আছে বটে, কিন্তু সে স্নেহ সাময়িক, চিন্তাজনিত নহে। বৃক্ষ ল
যেমন রসের উৎস স্বতই প্রবাহিত হয়, পশুর এ স্নেহ সেইরূপ স্বতঃপ্রবা
উৎসের মত। মনুষ্যের অপত্যস্নেহ মনুষ্যকে পবিত্র করে, স্বার্থপরতা হ
উর্দ্ধে তুলে, মানুষের মানবত্ব ঘুচাইয়া দেবত্ব প্রতিপাদন করে। অপ
স্নেহীর স্নেহ আপন সন্তানকে অতিক্রম করিয়া পরের সন্তানকেও অভি
করে। স্নেহোচ্ছ্বাসের সময়েও পশু পক্ষী অকাতরে অন্যের সন্তানকে আক্র
করে। মানুষ পরিবারের ও সমাজের রক্ষা এবং মঙ্গলের জন্য আপনার স্ব

র্জ্জন দিতে কাতর নহে, পশু পক্ষীর এইরূপ নিঃস্বার্থ পরার্থপরতা কে
ব দেখিয়াছেন ? পশু পক্ষীর ভাবপ্রবণতা নীচজাতীয়—ভয় কাম ক্রোধ
াভ অহঙ্কারের উপরে তাহারা উঠিতে পারে না।

সৎপ্রবৃত্তির ন্যায় মানুষের মত পশু পক্ষীর গণনা ও বিচারশক্তি নাই,
ৗরিক বলের অতীত হইলে বিপদকে তাহারা পরাস্ত করিতে পারে না।
ী বিপদের প্রতিকার আয়োজন তাহাদের বুদ্ধির অতীত, বিপদে প্রত্যুৎ-
মতিত্বের তাহাদের পরিচয় নাই। কার্য্য-কারণ-কল্পনার লেশমাত্রও
াহাদের মধ্যে দেখা যায় না। আপন সন্তান দুটি কি তিনটি, তাহারা গণনা
রিতে পারে না। একে একে দুই হয়, ইহা শিশুতেও বলিতে পারে ; কিন্তু
দর্শী পশুপণ্ডিতের এ সামান্য গণনা-শক্তি নাই। যে যতই চতুরতার
চয় দেউক, এ গণনা-শক্তির পরিচয় কে কবে দিয়াছে ?

যাহাদের সামান্য গণনা ও বিচারশক্তি নাই, সৎপ্রবৃত্তির অস্তিত্ব যাহা-
র মধ্যে দেখা যায় না, তাহাদের বিবেকশক্তির সম্ভাবনা কোথায় ? ভাল মন্দ
ান পশু পক্ষীর আদৌ নাই, পাপ পুণ্য সদসৎ বিচারের, জীবশ্রেষ্ঠ মানবে,
দা সর্ব্বত্র নিদর্শন পাওয়া যায়—পশু পক্ষীর নিকট কুত্রাপি প্রত্যাশার
াবনা নাই। কামোন্মত্ত হইলে ইহাদের আত্মীয়বিচার নাই, ক্রোধোন্মত্ত
ল পিতা পুত্রের প্রাণ বিনাশ করে, লোভে নিকট আত্মীয়ের সর্ব্বস্ব আত্ম-
করিতে কুণ্ঠিত হয় না। ইহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস নাই, পরকালের বিশ্বাস
, দেবতার বিশ্বাস নাই। ইহকাল ও বর্ত্তমান ইহাদের একমাত্র ভাবনা।
নাস্তিকতার তুলনায় চার্ব্বাকের নাস্তিকতা অতি অকিঞ্চিৎকর।

যাহাদের মনোভাব প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই, বাক্য কথন ভাষা
দের স্বপ্নাতীত, তাহাদের নিকট সৎপ্রবৃত্তি, বিচার ও বিবেকশক্তির
াশা করাই মূঢ়তা। যাহাদের স্মৃতি ও কল্পনাশক্তি নাই, তাহাদিগকে,
ার মনোভাব প্রকাশ করিবার, বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞাপন করিবার ক্ষমতা নাই,
দূরদর্শী বয়োবৃদ্ধ কি শিখাইবে, আর শিষ্যই বা কি শিখিবে ? ঈশ্বর
বুদ্ধি নিয়মিত করিয়া দিয়াছেন, আবার প্রকৃতিদোষে সে বুদ্ধির ক্রম-
াশের সম্ভাবনা নাই। অগত্যা পশুবুদ্ধি লক্ষ্মণের গণ্ডী অতিক্রম করিতে
র না। বুদ্ধি আপন প্রকৃতি হারাইয়া বৃক্ষলতার সাময়িক উচ্ছ্বাসে পরি-
হইয়াছে।

এ কথা কি সত্য ?—প্রাচীন নির্দ্ধারিত পশুবুদ্ধির অপরিবর্ত্তনীয়তা কি

বিজ্ঞান ও দূরদর্শন সিদ্ধ ? পশু পক্ষীর কি স্মৃতিকল্পনা ও সৌন্দর্য্যানুভাবক শক্তি নাই ? গণনা বিচার ও বিবেক শক্তি কি মনুষ্যের একাধিকৃত সম্পা মনোভাব প্রকাশ করিবার শক্তি বা বাক্যকথন ভাষা কি পশু প্র নাই ? পরোপকারিতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, বিনয় ও ভদ্রতা, হিতাহিত ও কৃতজ্ঞতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও ভাবী-প্রতিকার শক্তি, নিম্নসমাজে একান্ত দুর্লভ ? পরার্থপরতা ও সামাজিকতার কি নিদর্শন পাওয়া যায় চিন্তার বারিধি পশু ও মনুষ্য সমাজকে কি একান্ত ব্যবহিত করিয়াছে ?

আমরা ক্রমে ক্রমে দেখাইব, ইহা এরূপ নহে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়

সহজাত-সংস্কার। *

যাহাকে আমরা সহজাত সংস্কার বলি, তাহা ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও বিচারশ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া সচরাচর বিবেচিত হইয়া থাকে। জীবের সকল কার্য্য, আপাতদৃষ্টিতে বিবেচনা শক্তি, অভ্যাস বা বহুদর্শিতার ফল ব উপলব্ধি হয় না, সহজাত-সংস্কার-মূলক বলিয়া আমরা সেই সকল কা ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। ইহাতে এইরূপ বুঝায় যে, যে শক্তিকে আমরা সহ সংস্কার বলি, মনুষ্যের বুদ্ধি বিবেচনাদি হইতে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও প্রকৃতির শক্তি। মধুমক্ষিকার মধুচক্রে, পক্ষীর নীড়ে, পিপীলিকার স পদ্ধতিতে, ক্ষুদ্র কীটের অপত্যসংরক্ষণ-যত্নে আমরা এই শক্তির কার্য্য ক্ষণ করি। কেহ কেহ এই শক্তিকে মনুষ্যের বুদ্ধি, বিবেচনা, প্রতিভা হই উচ্চতর, মহত্তর, বিশালতর শক্তি বলিয়া নমস্কার করেন। তাঁহারা বলে সুরম্য রাজপ্রাসাদে আমরা মনুষ্য শিল্পীর নৈপুণ্য দেখিতে পাই, কিন্তু প নীড়ে বিশ্ব-শিল্পীর নৈপুণ্য প্রকাশমান।

সাধারণতঃ মনুষ্যেতর জীবেই এই শক্তি আরোপিত হইয়া থাকে—ই জীবের কার্য্যকলাপই সহজাত-সংস্কার-মূলক বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু স জাত-সংস্কার-বাদীগণের মধ্যে অনেকে এ কথাও বলেন যে, ইতর জীব ন্যায় মনুষ্যেরও সহজাত-সংস্কার আছে। তাঁহারা বলেন যে, মনুষ্য মধে

---

* Instinct.

ন সকল কার্য্য দেখা যায়, যাহার ব্যাখ্যা সহজাত-সংস্কার-কল্পনা ব্যতীত
কোনরূপে করা যায় না—বুদ্ধি, বিবেচনা, অভ্যাস, স্মৃতি, অনুকরণ, এ
লের দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা হয় না। দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁহারা বলেন—এই যে
স্তন্যের জন্য আপনা হইতেই মাতৃ-বক্ষের অনুসন্ধান করে, ইহা ত
কে কেহ শিখায় না, শিখাইতে হয়ও না ; ইহা অবশ্যই সহজাত-সংস্কার-
। স্তন্যপান-প্রক্রিয়াও এই সংস্কার-বলেই সম্পাদিত হইয়া থাকে, কেন না,
ন্ শিরা ও পেশীর কিরূপ সঞ্চালনে চোষণকার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা
র সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পতনকালে আমরা যে হস্তদ্বয় প্রসারিত করি, তাহাও
সংস্কারবশতঃ, কেন না, সে অবস্থায় বিবেচনা পুর্ব্বক কার্য্য করিবার স্থল
ক না। আমেরিকার আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে দেখা যায় যে, তাহারা
রচিত, অদৃষ্টপূর্ব্ব পথশূন্য নিবিড় অরণ্যানী অনায়াসে অতিক্রম করিয়া
ন গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে, কখন দিগ্‌ভ্রান্ত বা পথ-হারা হইয়া যায়
। সহজাতসংস্কার-বাদীরা বলেন যে, এই শক্তিবশতঃই ইহারা এ কার্য্যে
প অভ্রান্ত, কেন না, এই দক্ষতা পর্য্যবেক্ষণ বা বিবেচনামূলক হইলে সভ্য
কেরও আয়ত্তাধীন হইত।

তের জীবের সহজাত-সংস্কার-সম্বন্ধে বিচার করিবার পূর্ব্বে, মনুষ্যের সংস্কার-
ক কার্য্যের উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি একবার বুঝিয়া দেখা যাউক। প্রথম,
যে আপনা হইতে স্তন্যের জন্য মাতৃবক্ষের অনুসন্ধান করে, এ কথাটা
ী সত্য নহে। যে কোন প্রসূতিকে, যে কোন ধাত্রীকে, যে কোন বিজ্ঞ
ৎসককে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই বলিবে, ইহা প্রকৃত কথা নহে ;—সেই
ব, মাতৃস্তন প্রথম প্রথম শিশুর মুখে দিয়া দিতে হয় ; সে আপনা হইতে
বক্ষের অনুসন্ধান করে না। দ্বিতীয় স্তন্যপানপ্রক্রিয়া ;—ইহা শারীরিক
নের ফলমাত্র। শিশুর মুখে উপযুক্ত আয়তনের কোন কিছু দিলেই
র শিরা ও পেশী সকল উত্তেজিত হয়, এবং সেই উত্তেজনানিবন্ধন
ষণকার্য্য সম্পাদিত হয়। সেই জন্য দেখা যায় যে, শুধু মাতৃস্তন কেন,
র মুখে যাহা কেন দাও না, সে তাহাই চুষিতে চেষ্টা করে। তার পর,
ন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমরা যে হস্তদ্বয় প্রসারিত করি, সেটা
্যাসের ফল মাত্র। ইহা সহজাত-সংস্কারমূলক হইলে পতনোন্মুখ শিশুতেও
প্রকার আত্মরক্ষার চেষ্টা পরিলক্ষিত হইত। তাহা যখন হয় না, তখন
প্তবয়স্কের এবম্বিধ চেষ্টাকে কেমন করিয়া সহজাত-সংস্কার-মূলক বলা

যাইতে পারে? যাহা বলিয়াছি তাই ;—পতনোন্মুখের হস্তপ্রসারণ অভ্যা
ফলমাত্র।

অসভ্যেরা যে অপরিচিত দুর্গম অরণ্যানী অনায়াসে অতিক্রম করে,
ব্যাখ্যা করিবার জন্যও কোন প্রকার প্রকৃতিসিদ্ধ সংস্কারকে টানিয়া ত
বার প্রয়োজন দেখা যায় না। বাল্যকাল হইতে তাহারা এ বিষয়ে অ
হইয়া উঠে। অরণ্যে পরিভ্রমণ তাহাদের জীবনের দৈনন্দিন কার্য্য। পাঁ
একত্র হইলেই তাহারা এই বিষয়েই কথাবার্ত্তা কহে; পরস্পরের জ্ঞান
স্পরের জ্ঞানের দ্বারা সংশোধিত, পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। কোন প্র
কিরূপ পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ বাস করে, কোন অঞ্চলে কি প্রকার লতা প
ফুল ফল জন্মে, কোন নদী কোন্ পথে প্রবাহিত, কোন্ অচল কেমন
অবস্থিত; এই সকল বিষয়ে তাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান লাভ করে। মৃত্তি
মূর্ত্তি দেখিয়া, বৃক্ষত্বকের বর্ণ দেখিয়া, প্রাতে ও সায়াহ্নে বিহঙ্গের গতি দে
তাহারা কখন কোথায় রহিয়াছে, তাহা অতি সুন্দর রূপ বুঝিতে পারে।
প্রকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহারা যে সখ করিয়া উপার্জ্জন করে, তাহা নহে। জী
সংগ্রামে রক্ষা পাইবার জন্য এ বিষয়ে দক্ষতা লাভ করা তাহাদের পক্ষে ত
মাত্র প্রয়োজনীয়। তাহাদের যেরূপ জীবনপ্রণালী, তাহাতে দিক নিরূপ
পথনির্ব্বাচনে, স্থাননির্দ্দেশে সুদক্ষ হইতে না পারিলে তাহাদের বাঁচি
উপায় নাই। তাহাদের এ সকল বিষয়ে ভ্রান্তির অর্থ—বিনাশ। কেবল ব্য
বিশেষের বিনাশ নহে; এরূপ একটা ভ্রান্তিনিবন্ধন একটা সমস্ত পরি
একটা সমগ্র জাতি বিনাশপ্রাপ্ত হইতে পারে। সুতরাং, এ বিষয়ে ত
হইবার জন্য, তাহাদিগকে দায়ে পড়িয়াই প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হয়।
পণে সাধনা করিয়া যদি তাহারা প্রায় সিদ্ধ হইয়া উঠে, সেটা ত কিছু বি
নহে। অতএব, অসভ্যদিগের এই দক্ষতা কতকটা পর্য্যবেক্ষণের ফল, কত
প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে উপার্জ্জিত। ইহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য সহজাত-সং
রের আশ্রয় লওয়া অবিধেয়। যাহা জ্ঞাত শক্তি দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পা
তাহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য কোন অজ্ঞাত শক্তির অবতারণা করা বৈজ্ঞানি
প্রণালীর বিরুদ্ধ।

মনুষ্যের এই সকল কার্য্য সহজাত-সংস্কার-মূলক না হইলেও, অহ
জ্ঞান শক্তি দ্বারা এ সকল কার্য্যের ব্যাখ্যা সুসাধ্য হইলেও, সহজাত-সংস্কা
বাদীরা বলিতে পারেন এবং বলিয়াও থাকেন যে, পক্ষীর নীড়নির্ম্মাণ, মধু

কার চক্ররচনা প্রভৃতি কার্য্য প্রকৃতিসিদ্ধ সংস্কার ব্যতীত অন্য উপায়ে
্যাত হইবার নহে। প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা উল্লেখ করেন যে, যে পক্ষী যে
লীতে, যে প্রকার উপকরণে, যে রকম নীড় আজ নির্ম্মাণ করিতেছে,
ালই সেই পক্ষী, সেই প্রণালীতে, সেই রকম নীড় রচনা করিয়া আসি-
। তাহার নীড়রচনায় কোনকালে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায়
কন না, প্রকৃতিসিদ্ধ সংস্কার অপরিবর্ত্তনশীল। পক্ষীর নীড়রচনা যদি
চন বা অনুকরণ-মূলক হইত, তাহা হইলে, রচনাপ্রণালীর অল্পাধিক
বর্ত্তন কোন না কোন সময়ে, কোন না কোন অবস্থায়, অবশ্যই দেখা
ত। যে কার্য্য নির্ব্বাচনমূলক, অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে তাহাতে পরি-
অবশ্যই ঘটিবে, এবং এই নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল জগতে অবস্থার পরিবর্ত্তন
ম্ভাবী, অনতিক্রম্য। মনুষ্যের কার্য্য বিবেচনামূলক, মনুষ্য ভাবিয়া
য়া আপন গৃহনির্ম্মাণ করে, তাই তাহার গৃহনির্ম্মাণপ্রণালী নিয়ত পরি-
, নিয়ত সংস্কৃত হইতেছে। পক্ষীজাতি প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট সংস্কারবশে আপন
ন নীড়রচনা করে, তাই তাহার রচনাপ্রণালীতে কখন কোন পরি-
া ঘটে না—আজ যাহা আছে, চিরকালই তাহাই ছিল, চিরকালই
ই থাকিবে।

মনুষ্যের গৃহনির্ম্মাণপ্রণালী সকল সময় বিবেচনা দ্বারা স্থিরীকৃত হয় কি
মনুষ্য আপন প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থার
ঃ উপযোগিতা বিবেচনা করিয়া, সাধারণতঃ আপন গৃহ নির্ম্মাণ করে কি
স কথার বিচারের এথানে আবশ্যক নাই। তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি
িনিই একটু সূক্ষ্মভাবে এ বিষয়ের আলোচনা করিবেন, তিনিই বুঝিতে
বেন যে, মনুষ্য সাধারণতঃ বিবেচনা করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করে না—
দেখে, তাহারই অনুকরণ করে মাত্র। পক্ষীজাতির কুলায়রচনা সহ-
-সংস্কারসিদ্ধ, অথবা অনুকরণ বা নির্ব্বাচনমূলক, তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য।
কথাটাই একটু অনুসন্ধান করিয়া বুঝিবার জন্য একটু আলোচনা
য়া দেখা যাউক।

প্রথমেই উপকরণের কথা ধরা যাউক। দেখা যায় যে, যে পক্ষীর পক্ষে
উপকরণ সহজপ্রাপ্য, সে পক্ষী সেই উপকরণে আপন কুলায় রচনা করে।
তক প্রভৃতি যে সকল পক্ষী কর্ষিত মাঠে সর্ব্বদা যাতায়াত করে, এবং
তলে নীড় নির্ম্মাণ করে, তাহারা তৃণ শষ্প ব্যবহার করে। গলিতমাংস-

ভোজী পক্ষী—যথা, কাক—আপন বাসা ঢাকিবার জন্য লোম এবং
ব্যবহার করিয়া থাকে। 'সোয়ালো' পক্ষী আপন খাদ্যকীটের অনুসন্ধ
পুষ্করিণী ও নদীতীরে সর্ব্বদা বিচরণ করে; বাসার জন্য তাহারা মৃত্তিক
কর্দ্দম ব্যবহার করে। মৎস্যরঙ্গ পক্ষী, ভক্ষিত মৎস্যের কাঁটা দ্বারা
নীড় প্রস্তুত করে। যে সকল পক্ষী মনুষ্যাবাসে ঘর বাঁধে, তাহারা
প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে, কেন না, ইহাদের পক্ষে এই সকলই
লভ্য। এই সকল এবং অন্যান্য দৃষ্টান্ত হইতে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়
প্রত্যেক জাতীয় পক্ষী আপন আপন নীড়ের উপকরণ আপনার পারিপা
অবস্থানুসারে সংগ্রহ করিয়া থাকে। অতএব, পক্ষীর নীড়রচনাসম্বন্ধে, অ
উপকরণ নির্ব্বাচনবিষয়ে, সহজাত-সংস্কার কল্পনা করিবার কোন প্রয়ো
দেখা যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা যে বিষয়ের ব্যাখ্যা হইতে
তাহার ব্যাখ্যার জন্য কোন প্রকার অজ্ঞাত শক্তির কল্পনা করা বিজ্ঞান
নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক যে, প্রত্যেক জাতীয় পক্ষী সকল সময়ে এবং
অবস্থাতেই ঠিক একই রকম নীড় নির্ম্মাণ করে, অথবা অবস্থা পরিবর্ত্ত
সঙ্গে নীড়ের গঠনও পরিবর্ত্তিত হয়। আমেরিকার কাননবাসী "ওরি
পক্ষীদের মধ্যে দেখা যায় যে, তাহারা যখন স্থূল ও শক্ত ডালে বাসা ব
তখন সেগুলিকে অপেক্ষাকৃত অল্প গভীর করিয়া প্রস্তুত করে; কিন্তু
বেতসাদি দুর্ব্বল বৃক্ষের কৃশ পল্লবে নীড় রচনা করে, তখন সেগুলি
অপেক্ষাকৃত অনেক গভীর করে। ইহাতে এই লাভ হয় যে, প্রবল
এই সকল দুর্ব্বল বৃক্ষ আলোড়িত হইলে নীড়স্থিত শাবকের নীড়চ্যুত
পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা অল্প হয়। আবার ইহাও দেখা যায় যে,
প্রদেশে এই সকল পক্ষী যে নীড় নির্ম্মাণ করে, তাহার বুনানি অধি
ঘনবিন্যস্ত, কেন না উত্তর প্রদেশে শীতের প্রকোপ অধিক। দক্ষিণাং
যেখানে শীতের প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প,—যে সকল নীড় নির্ম্মিত
তাহা অধিকতর শিথিলবন্ধন এবং ছিদ্রযুক্ত। ফরাশী পক্ষীতত্ত্ববিৎ পূশে
সময়ে 'গৃহ-মার্টিন' নামক পক্ষীর নীড় কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া, রুয়েঁ
রের মিউজিয়মে রাখিয়া দিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর পরে এই জাতীয় প
আর কতকগুলি বাসা পাইয়া তিনি দেখিলেন যে, এগুলির আকার
গঠন কিছু স্বতন্ত্র রকমের। বিস্মিত হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন

লেন, এই জাতীয় পক্ষী সে সময়ে দুই রকম বাসাই নির্ম্মাণ করে। পুরা-
পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে এই পক্ষীর নীড়ের যে সব বর্ণনা দেখিলেন, তাহা
বৎসর পূর্ব্বে সংগৃহীত সেই নীড়ের বর্ণনা। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন
পূর্ব্বসংগৃহীত বাসাগুলি সঙ্কীর্ণ এবং গভীর; নূতনগুলির তলভাগ এবং
অধিকতর প্রশস্ত;—তজ্জন্য শাবকেরা অধিকতর মুক্ত বায়ু পায় এবং
ক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে নড়িতে চড়িতে পারে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়
পাখীর নীড়নির্ম্মাণে পরিবর্ত্তন ত ঘটেই, সংস্কার ও উন্নতিও অবস্থা-
যে সঙ্ঘটিত হয়। অতএব নীড়-গঠন-প্রণালী সম্বন্ধেও প্রকৃতিসিদ্ধ কোন
র সংস্কার কল্পনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ এবং ভ্রান্তিমূলক।

প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট সংস্কারবশে যাহা কৃত হয়, তাহাতে অপূর্ণতা ও ভ্রান্তির
রাপ করা চলে না। সহজাত-সংস্কার-বাদীরা নিজেই এ কথা বলিয়া
কন। পক্ষীর নীড় যদি নিসর্গ-নির্দ্দিষ্ট কোন শক্তির ফল হয়, তাহা
ইহা অবশ্যম্ভাবী যে, নীড়গুলি আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে সর্ব্বতো-
এবং সর্ব্বাবস্থায় উপযোগী হইবে। তাহা কিন্তু সকল সময় হয় না;
ক সময় ঠিক্ তাহার বিপরীত দেখা গিয়া থাকে। নীড়রচনার উদ্দেশ্য,
র আমরা বুঝিতে পারি, সে ত—ডিম্ব ও শাবকের যথাযথ সংরক্ষণ। এ
শ্য সকল সময়ে সিদ্ধ হইতে দেখা যায় না। আমেরিকায় 'প্যাসেঞ্জার
ন্' বলিয়া এক শ্রেণীর কপোত আছে। ইহারা একই বৃক্ষশাখায় এত
ক নীড় রচনা করে যে, তাহারই ভারে সেই শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া
—নীড়, ডিম্ব, শাবক, সব ভূতলে গড়াগড়ি যায়। এইরূপ নীড়নির্ম্মা-
বিশ্বশিল্পীর রচনা-নৈপুণ্য বলিব কি? 'রূক' নামক পক্ষীর বাসা এতটা
যোগী যে, ঝড় হইলেই ডিম্ব ও শাবক সকল নীড়চ্যুত হইয়া পড়িয়া
;—এ স্থলেও বিশ্বশিল্পীর হস্ত দেখিতে হইবে কি? সেল্‌বোর্ণের হোয়াইট্
ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, 'গৃহ-মার্টিন' নামক পক্ষী কোন স্থলে বাসা
ত করিয়াছে; বৃষ্টিপ্রবাহে তাহার বাসা ভাসিয়া গিয়াছে, শাবক সকল
া গিয়াছে, অথচ প্রতি বৎসরই সেই পাখী সেইখানেই বাসা বাঁধিয়াছে।
রের পর বৎসর যাইতেছে; প্রতি বৎসরই সেই পাখীর বাসা ভাসিয়া
তেছে, শাবক নিধন হইতেছে; অথচ প্রতি বৎসরই সেই পাখী সেই-
ন বাসা বাঁধিতে ছাড়ে না। ইহাকেও কি নিসর্গের অভ্রান্ত উপদেশ
লতে হইবে?

মনে করিয়াছিলাম, একটা প্রবন্ধেই আলোচ্য বিষয়ের মোটামুটি ব
গুলি বলিয়া শেষ করিব। এখন দেখিতেছি, তাহা সম্ভব নহে। যাহা ব
বাকি রহিল, তাহা প্রবন্ধান্তরে বলিতে চেষ্টা করিব। ওয়ালেস্ সাহে
একখানি গ্রন্থ হইতে প্রবন্ধের এই অংশ মোটের উপর সঙ্কলিত। বারা
ডারউইন প্রভৃতি অন্যান্য পণ্ডিতগণের কথার অবতারণা করা যাইবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্য

সিপাহীযুদ্ধে ভারতবাসীর পরোপকারিতা

কানপুরের ইউরোপীয়েরা সিপাহীযুদ্ধে বিপক্ষদিগের সমক্ষে তিন সপ্তাহ
আত্মরক্ষা করেন। শেষে তাঁহাদের দুর্গতির একশেষ হয়। আহার সাম
অভাবে, পানীয় জলের অভাবে, শুশ্রূষার অভাবে তাঁহারা নিদারুণ যা
অবসন্ন হইয়া পড়েন। তাঁহাদের প্রাণসমা প্রণয়িনী ও প্রাণাধিক শিশু
গুলি কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তাঁহারা উপায়ান্তরের অভাবে,
ক্ষের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহাদিগকে এলাহাবাদে পঁহুছিয়া দি
জন্য ভাগীরথীতে নৌকা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তাঁহারা নৌকায় আরোহণ
সেই বিশ্বাসঘাতক বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়। অ
গুলি নৌকা দগ্ধীভূত হইয়া যায়। আরোহীরা প্রজ্জ্বলিত অনলে বা ঘাত
অসির আঘাতে প্রাণত্যাগ করে।

এ দিকে ঘটনাক্রমে একখানি নৌকায় আগুন লাগে নাই। এই নে
তত ভারী ছিল না। সুতরাং উহা চড়ায় লাগিলে আরোহীরা প্রাণপণে
দিয়া ঠেলিয়া ভাসাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই নৌকায় কাপ্তেন
সন্, মূর, ডিলাকোলী প্রভৃতি বীর পুরুষেরা ছিলেন। ইহারা প্রাচীর
স্থান রক্ষার জন্য যথোচিত সাহস ও পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন, এখন
নাদের অধিষ্ঠিত তরী রক্ষা করিতেও সেইরূপ সাহস ও পরাক্রম দেখা
উদ্যত হইলেন। সিপাহীরা তটদেশ হইতে অবিশ্রান্তভাবে গুলি বৃষ্টি ক
লাগিল। কাপ্তেন মূর ও তৎসহ যাত্রীদিগের কেহ কেহ, গুলির আঘ
প্রাণত্যাগ করিলেন। অনেকে আহত হইল। নিহত ও আহতগণ নৌ
তলদেশে পড়িয়া রহিল। আরোহীরা শবরাশি টানিয়া বাহির করি

গিল। এ দিকে নৌকায় কোন খাদ্যদ্রব্য ছিল না। গঙ্গার জলমাত্র এ
য়ে তাহাদের উদরপূর্ত্তি ও তৃষ্ণানিবারণের অদ্বিতীয় অবলম্বন হইল।
ম দিবাবসান হইতে লাগিল। পশ্চাৎধাবিত আক্রমণকারীরাও পরিশ্রান্ত
য়া পড়িল, কিন্তু ইহাতেও আরোহীদিগের কষ্ট বা বিপদের অবসান হইল
নৌকার হাল বা দাঁড় ছিল না। মাঝি বা মাল্লারা উপস্থিত ছিল না।
ার ও ক্ষেপণীক্ষেপকের অভাবে, নৌকা কখন কখন স্রোতোবেগে
সিয়া যাইতে লাগিল। কখন কখন চড়ায় লাগিয়া রহিল। যে স্থানে চড়ায়
বদ্ধ হইতে লাগিল, সেই স্থানেই আরোহীরা আবার উহা ভাসাইয়া দিতে
ণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিল। মানুষ চিরদিনই অবস্থার দাস। যখন যে
স্থায় পতিত হয়, তখন আপনাদের মঙ্গলের জন্য সেই অবস্থানুরূপ বিষ-
ই কামনা করিয়া থাকে। আরোহীরা যখন কানপুরের মৃৎপ্রাচীরের
থে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিল, তখন তাহারা তপনের প্রচণ্ড তাপে
ভূত হইলেও বৃষ্টির কামনা করেন নাই। যে হেতু বৃষ্টি হইলেই তাহাদের
রক্ষার অবলম্বন মৃৎপ্রাচীর প্রক্ষালিত হইয়া যাইত। অবরোধকারীরা
সুযোগে তাহাদের সর্ব্বনাশসাধন করিত। কিন্তু এখন তাহারা নৌকায়
কিয়া প্রতিদিনই বৃষ্টির কামনা করিতে লাগিল। যে সকল চড়া তাহা-
াকে নিরন্তর কষ্ট দিতেছিল, নিরন্তর তাহাদের নৌকা অবরুদ্ধ করিয়া
খিতেছিল, বৃষ্টি হইলে সেই সকল চড়া ডুবিয়া যাইত। গঙ্গার স্রোতও
াক্ষাকৃত প্রবল হইত এবং তাহাদের অধিষ্ঠিত তরী অধিকতর প্রবলবেগে
ার হইতে থাকিত। কিন্তু প্রথম দিন হতভাগ্য আরোহীদিগের কামনা
হইল না। তাহাদিগকে চড়া ঠেলিয়াই যাইতে হইল। এ দিকে নদীর
তটে, উত্তেজিত জনসাধারণ, তাহাদের শোচনীয় অবস্থা অধিকতর
চনীয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৮শে জুন,
নপুরের নিকটবর্ত্তী নজফগড় নামক স্থানে আরোহীদিগের নৌকা আবার
ায় লাগিয়া গেল। আবার আরোহীদিগের প্রতি গুলি বৃষ্টি হইতে
গিল। একটি কামান নদীতটে স্থাপিত হইল। কিন্তু এই সময়ে এরূপ
বলবেগে বৃষ্টি হইতে লাগিল যে, বিপক্ষেরা গোলা বৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল
। সূর্য্যাস্তসময়ে কানপুর হইতে ৫০।৬০ জন সশস্ত্র লোক একখানি
ৌকায় চড়িয়া নৌকারোহী ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিতে আসিল।
টনাক্রমে তাহাদের নৌকাও চড়ায় লাগিয়া গেল। এই সুযোগে ইউরোপী-

য়দিগের ১৮।১৯ জন উৎসাহিত হইয়া, গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহ
আক্রান্তগণের ক্ষমতা পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল। তাহাদের অতি অল্প লো
প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইল। আরোহীরা বিপক্ষদিগের নে
অধিকার করিলেন। উহাতে বারুদ, টোটা প্রভৃতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ি
কিন্তু খাদ্য সামগ্রী অধিক ছিল না। জয়শ্রীর অধিকারী হইলেও, ইউরে
দিগের বিষণ্নতা অন্তর্হিত হইল না। নিদারুণ জঠরানল তাঁহাদের সর্ব্বাব.
প্রতি স্তরে প্রসারিত হইয়া, তাঁহাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তেই বিদগ্ধ কর্
লাগিল।

ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল। আরোহীরা ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া, নিদ্র
ভূত হইলেন। এই সময়ে সহসা ঝটিকার আবির্ভাব হইল। নৌকা ঝটিকা
ভাসিয়া যাইতে লাগিল। চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। স্ু
নৌকা কোনদিকে কোথায় যাইতেছে, আরোহীরা বুঝিতে পারিলেন
প্রভাত হইলে তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের আশ্রয়তরী আবার নদী
সংলগ্ন হইয়াছে। এই সময়ে অনেক স্থানই উচ্ছৃঙ্খল লোকে পরিপূর্ণ
ছিল। উত্তেজিত সিপাহীদিগের দেখাদেখি ইহারাও উত্তেজিত হইয়া া
ঙ্গীর শোণিতপাতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। ইহাদের বিশ্বাস হইয়া
কোম্পানির রাজত্ব শেষ হইয়াছে। সুতরাং ইহারা কোম্পানির বিপক্ষদি
সহিত সম্মিলিত হইয়া, আপনাদের সৌভাগ্যবৃদ্ধির চেষ্টা করিতে
পলায়িতদিগের নৌকা যখন তীরে আসিল, তখন পশ্চাদ্ধাবনকারী বি
গণ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপ উদ্ধত ও উে
লোকে আক্রান্ত হইয়া, পলায়িতেরা আবার আত্মরক্ষায় উদ্যত হই
তাঁহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল, আহারের অভাবে তাঁহাদের দেহ
হইয়া গিয়াছিল, সময়োচিত বিশ্রামের অভাবে তাঁহাদের দেহ শিথিল
পড়িয়াছিল, পুনঃ পুনঃ অস্ত্রঘাতে তাঁহাদের তেজস্বিতার হ্রাস হইয়া
তথাপি তাঁহারা নিরস্ত হইলেন না। কাপ্তেন টম্‌সন্, কতিপয় সৈনিক
সঙ্গে লইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং নৈরাশ্যে উন্মত্ত হইয়া, আক্র
কারীদিগকে প্রত্যাক্রমণ করিলেন। তীরে সশস্ত্র সিপাহীর সহিত নি
লোকও উপস্থিত ছিল। চৌদ্দ জন ইউরোপীয় সৈনিকপুরুষ সেই ঘোর
বিপত্তিকালে বন্দুক ও সঙ্গীন লইয়া, তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল। এ দি
তাহাদের বিপন্ন সহযাত্রিগণ নৌকায় রহিল।

াপ্তেন টম্‌সন্ সহযোগীদিগের সহিত যখন নদী হইতে অগ্রসর হইয়া
হীদিগকে আক্রমণ করিলেন, তখন তাঁহাদের নৌকা আবার ভাসিতে
তে দৃষ্টিপথবহির্ভূত হইল। অবিচ্ছিন্ন গুলি বৃষ্টিতে আক্রমণকারী সিপা-
হঠিয়া গেল। টম্‌সন্ সহযোগীবর্গের সহিত তীরে আসিয়া দেখিলেন,
া অন্তর্হিত হইয়াছে, হতভাগ্য আরোহীদিগের কি দশা ঘটিয়াছে, তাহা
রা আর জানিতে পারিলেন না। এ দিকে তাঁহারা যে স্থানে উপস্থিত
ছিলেন, সে স্থানের ভূস্বামী বাবুরাম বক্স তাঁহাদের বিপক্ষ ছিলেন।
ম বক্সের আদেশে সশস্ত্র লোকে তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ
ত লাগিল। তাঁহারা আহত হইয়া, দৌড়িয়া পলাইতে লাগিলেন।
পে তিন মাইল যাইয়া তাঁহারা সম্মুখে একটি দেবমন্দির দেখিতে পাই-
। উপায়ান্তর না দেখিয়া, হতভাগ্য পলাতকেরা ঐ মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ
ন। মন্দিরে শীতল পানীয় জল ছিল। উহাতে হতভাগ্যদিগের তৃষ্ণা-
ও কথঞ্চিৎ বলবৃদ্ধি হইল। দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্ধাবনকারীরা
রর চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত করিল, পলায়িতদিগকে আক্রমণ করিল।
কদিগের চারি জন দ্বারদেশে থাকিয়া সঙ্গীন দ্বারা আক্রমণকারীদিগকে
া দিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত, তাহাদের গুলিতে, আক্রমণকারীদের কেহ
গতাসু হইল। এইরূপে বাতায়নহীন সঙ্কীর্ণ মন্দিরে থাকিয়া হত-
্য ইউরোপীয়েরা আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। উত্তেজিত লোকে শুষ্ক
রাশি মন্দিরের প্রবেশ পথে সজ্জিত করিয়া, এবং উহাতে আগুন
, আপনারা সরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা ভাবিয়াছিল, ধূমস্তূপে আত্ম-
কারীদিগের শ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু এ সময়ে পবনদেব
গ্যদিগের সহায় হইলেন। প্রচণ্ড বায়ুবেগে ধূমরাশি মন্দিরে প্রবেশ
করিয়া অন্যত্র ধাবিত হইল। প্রয়াস বিফল হইল দেখিয়া, আক্রমণ-
রিগণ অতঃপর বারুদের থলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।
রাং পলায়িতেরা আর মন্দিরে থাকিতে পারিল না। তাহারা উন্মত্ত-
ব ও অসংসাহসে আক্রমণকারীদিগের ব্যূহভেদ করিয়া নদীতটাভি-
থ দৌড়িতে লাগিল। চৌদ্দজনের মধ্যে সাত জন প্রাণ লইয়া নদীতটে
নীত হইল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আপনাদের অস্ত্রাদি ফেলিয়া জাহ্নবীজলে
প দিল। এই সাত জনের মধ্যে চারিজন তটবর্ত্তী লোকের নিক্ষিপ্ত গুলিতে
ত্যুমুখে পতিত হইল। অধিকতর সন্তরণপটু ছিল বলিয়া, অবশিষ্ট চারি জন

আত্মজীবন রক্ষা করিল। ইহারা যখন জাহ্নবীর জলপ্রবাহে ভাসিয়া ছিল, তখন তীরবর্ত্তী কতিপয় ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে ক "সাহেব! সাহেব! কেন তোমরা সাঁতার দিতেছ। আমরা বন্ধুভাবে ড য়াছি।" সন্তরণকারীগণ সহসা তাহাদের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিলেন কিন্তু যখন তাঁহাদের কথায় তীরবর্ত্তী লোকে আপনাদের অস্ত্রাদি ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল, তখন সন্তরণকারীরা ধীরে ধীরে তীরে আ লাগিলেন। তীরবর্ত্তী ব্যক্তিগণ অযোধ্যার অন্তঃপাতী মোরারমৌ স্থানের সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ভূস্বামী রাজা দিগ্বিজয় সিংহের প্রজা। ইহারা সন্তরণকারীদিগকে ধরিয়া তীরে উঠাইল। এই চারি জনের মধ্যে ক টম্‌সন্ ছিলেন।

রাজা দিগ্বিজয় সিংহ ব্রিটিশ কোম্পানির অনুরক্ত ও নিরতিশয় দয় ছিলেন। তিনি পলায়িতদিগকে আনিবার জন্য হাতী পাঠাইয়া দিয়া পলায়িতেরা তাঁহার সম্মুখে সমাগত হইলে, তিনি তাঁহাদের যথোচিত ও অভ্যর্থনা করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাদের সা বীরত্বের নিরতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে অতিথিদিগের বাস জন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, দরজী অতিথি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিল, চিকিৎসক আহতদিগের ক্ষতস্থানের চিকি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কাপ্তেন টম্‌সন্ প্রভৃতি তিন সপ্তাহ কাল দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তাঁহারা ক কোন বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করেন নাই। তাঁহাদের আহারের প্রতিদিন তিন বার করিয়া খাদ্যসামগ্রী আসিত। রাজা ও রাণী উ প্রতিদিন তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। দিগ্বিজয় সিংহ পরম ছিলেন। স্বধর্ম্মোচিত ক্রিয়াকলাপে তাঁহার যেরূপ বলবতী নিষ্ঠা, সে মহীয়সী শ্রদ্ধা ছিল। বিভিন্নজাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উপাসনাপ প্রচলিত আছে। এই বিভিন্নরূপ উপাসনায় যদি উপাসকের চিত্তসংযম শ্রদ্ধা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার অকপট ঈশ্বরভক্তি দর্শনে উ প্রকৃতি ভিন্নজাতীয় দর্শকের হৃদয়ও ভক্তিশ্রদ্ধায় আনত হইয়া থাকে। f যে রাজার অবিচ্ছিন্ন দয়ায় ও যে রাজার অপরিসীম অনুগ্রহে, কাপ্তেন সন্ প্রভৃতি নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছিলেন; সেই দানশীল, সৌম্য বর্ষীয়ান্ ভূস্বামী যখন প্রতিদিন আপনাদের চিরপ্রচলিত পদ্ধতি অনুসা

নবর্ত্তী দেবমন্দিরে যাইয়া, তদ্গতচিত্তে বরণীয় দেবতার আরাধনায় নিবিষ্ট
ন, তখন উক্ত আরাধনাপদ্ধতি, আশ্রিত ইউরোপীয়দিগের কেবল
দের বিষয়ীভূত হইত। এ সময়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁহাদের হৃদয়ে আবি-
ইত না, একজনের অপূর্ব্ব ঈশ্বরভক্তি দেখিয়াও তাঁহারা ঐশ্বরিক
াকৃষ্ট বা উদারতায় আনত হইতেন না। তাঁহারা সাহসে ও বীরত্বে
সমাজে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু উদারতা, শিষ্টতা, গাম্ভীর্য্য এবং
রক্ষাকারী মহাপুরুষের প্রতি হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভাবে, সহৃদয়
জ প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইবেন না।

পলায়িতেরা যতদিন রাজা দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে ছিলেন, ততদিন
র আদেশে দুর্গপ্রাচীরের বহির্ভাগে যাইতে পারিতেন না। যে হেতু,
দিকে উত্তেজিত জনসাধারণ ফিরিঙ্গীদিগের শোণিতপাতের জন্য ঘুরিয়া
ইতেছিল। উত্তেজিত সিপাহীরাও নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহে অবস্থিতি
তছিল। ইউরোপীয়গণ দুর্গের বহির্ভাগে গেলেই, ঐ সকল উত্তেজিত
কের আক্রমণে নিঃসন্দেহ বিপদ্গ্রস্ত হইতেন। রাজার সশস্ত্র অনুচরগণ
াদের রক্ষার জন্য সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। কানপুরের বিপক্ষগণ, পলা-
দিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য রাজা দিগ্বিজয় সিংহকে
রাধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শরণাগতপালক বর্ষীয়ান্ রাজপুত বীর, সেই
রাধরক্ষায় সম্মত হন নাই। তিনি তেজস্বিতা সহকারে স্পষ্টাক্ষরে
পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহার উপর কানপুরের কাহারও কোনরূপ
নাই। তিনি অযোধ্যার অধিপতির করদ। সুতরাং নানা সাহেব বা
ুরের কাহারও কোন কথা শুনিতে প্রস্তুত নহেন। বৃদ্ধ বীরপুরুষের
প আশ্রিতবৎসলতা, এইরূপ হিতৈষিতা ও এইরূপ পরার্থপরতার মহি-
নিঃসহায়, নিরবলম্ব ও নিপীড়িত ইউরোপীয়েরা ঘোরতর বিপত্তিকালেও
ত ছিলেন।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

বিপত্নীক।

১

বিশাল সংসার সেই প'ড়ে আছে, হায়,
সেই দিন যায় ব'য়ে—
জাগিতাম যারে চেয়ে,
ঘুমাতেম যারে পেয়ে এ শূন্য ধরায়—
সেই নাই, হায়!

২

নাই সে উষার হাসি,
প্রভাত-আনন্দ-রাশি;
নাই সে সন্ধ্যার তারা—শ্রান্তির আশ্রয়;
নাই সে জীবন-মায়া,
মধ্যাহ্ন-বকুল-ছায়া;
কোলে সে সেতার নাই, দেহে সে হৃদয়।

৩

বহিতেছে সেই বায়—
চমকিয়া পায়-পায়
ফুলের সুবাস মত কেহ নাহি আসে;
ফুটিতেছে সেই শশী,—
জ্যো'স্না-মত খসি-খসি
গায়ে প'ড়ে—বুকে প'ড়ে কেহ নাহি হাসে।

৪

সেই নিধুবন-গায়
সে তটিনী ব'হে যায়,
সে প্রমোদ-তরী আর ভেসে না বেড়ায়।
লতা-ফাঁকে, তরু-কোলে
সে জোছনা নাহি দোলে;
পথে প'ড়ে ফুল-রাশি—কে দলিয়া যায়!

৫

সে শয়ন-গৃহ এই,
গৃহে সে আলোক নেই,
আলোকে সে খেলা নেই, খেলায় সে টান;
পালঙ্কের আশে-পাশে
সে হাসি আর না ভাসে!
দ্বারে যবনিকা-আড়ে নাহি সে বয়

৬

কত দিন গেছে চ'লে—
নাহি আর গৃহ-তলে,
লুণ্ঠিত অঞ্চল-চিহ্ন, চরণের রাগ;
নাহি আর এ শয্যায়
সে রূপ-আভাস, হায়,
সে পবিত্র দেহ-গন্ধ, সে স্বপ্ন-সজাগ!

৭

সে বৈকুণ্ঠ-ধাম তার,
আজি রে শ্মশানাকার,
হানা ঘরে বায়ু মত, ঘুরি হাহা ক'রে
কোণে কোণে জ'মে ধূলা,
হেথা-হোথা বই-গুলা,
ছেঁড়া ছবি, ভাঙ্গা বীণা চারি দিকে প

৮

তার সে মুখর শুক
পাখায় ঢেকেছে মুখ,
আদর না পায় কারো, আদর না চা
সাধের শিখিটি তার,
নাচে না নিকুঞ্জে আর;
সাধের হরিণী তার ম'রেছে কোথায়

৯

তার সে আদুরে মেয়ে
দ্বারে ব'সে পথ চেয়ে,
ঠোঁটে আর হাসি নাই, মুখে নাই রব
কোলে তুলে নিতে গেলে
অমনি কাঁদিয়া ফেলে,
ঘরে যেন কেহ নাই, পথে যেন সব।—

১০

দাস-দাসী-পরিজন,
সকলেই ভাঙা মন,
কাটাতে পেলে প্রাণ যেন পায়।
আঁধারে দুঃস্বপ্ন মত
বেঁচে আছি অবিরত,
র কি সান্ত্বনা দিব, কে দেয় আমায়!

১১

বুঝেছি কপাল মোর—
ঘুচে নাই তবু ঘোর,
বতে—ভাবিতে কভু সব ভুলে যাই।
ভাবি নিশি হলে গাঢ়
কি হেতু বিলম্ব তার,
চমক ভাঙ্গে তবু—দ্বারে চাই!

১২

ডাকিলে পেচক, হায়,
অমঙ্গল-আশঙ্কায়,
ল টেনে নিতে তারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি;
আকাশে গর্জ্জিলে মেঘ,
বাড়িলে বায়ুর বেগ,
তে ধরিতে তারে উপাধান ধরি।

১৩

আবার মুদিয়া আঁখি,
কত-কি ভাবিতে থাকি,—
মৃতেরা এ ধরাতল দেখিতে কি আসে?
কোথা হ'তে সে যদি রে
সহসা আসিয়া ফিরে,
আঁখি যুগ ঢাকে [illegible] বসে হেসে পাশে।

১৪

বসে ব'সে গত কথা,
বাঁধে গলে বাহু-লতা,
বলে চুমি দেহ-অন্তে হইবে মিলন।
বলিবে কি—এখনো রে
ভুলিতে পারেনি মোরে,
মরণেও আছে তার জীবন-বন্ধন।

১৫

কেবা দেয় সে বিশ্বাস,—
মৃত্যু পরে স্বর্গ-বাস,
এ সংসার কর্ম্মভূমি, স্বর্গের সোপান;
পাপ হ'তে কেবা রাখে,
পুণ্য-পথে কেবা ডাকে,
কোথা এ দুখের শেষ, কোথা ভগবান।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

কবিতাকুঞ্জ।

কৃষ্ণ।

বেলা যে প'ড়ে এল, দিন যে যায়!
বহিছে ঝুরু ঝুরু দখিণা বায়,
আকাশে মেঘ-গিরি, ভাসিছে ধীরি ধীরি,
ঘিরেছে মাঠখানি সাঁঝের ছায়!
সারিয়া গোচারণ গিয়াছে সখাগণ
যে যার নিজালয়ে ত্বরিত পায়;
নিঝুম বৃন্দাবন, ব্যাকুল ভেবে মন,
আসিবে সে কখন্, দেখিব তায়!

২

চলন মৃদু মৃদু কলস কোলে;
নিজন পথ বাঁকা, দুধারে তরুশাখা,
করিয়া জড়াজড়ি পড়েছে ঢোলে!
ঘন সে ছায়া দিয়ে, আপনা লুকাইয়ে,
একেলা আসিবে সে যমুনা-জলে!
কোমল রাঙ্গা পায়, বাজিবে ধরা হায়!
পাতিতে সাধ যায় হৃদয় তলে!

৩

আধেক বিকশিত সে চারু দেহ,
জগতে নিরুপম রূপের গেহ!
গভীর কালো নীরে, লুকাবে ধীরে ধীরে,
সরমে ভয়ে ভয়ে দেখে বা কেহ!

৪

দেখিব অলখিতে আপনা হারা!
ভাসিছে মুখখানি নলিনী পারা!
ছড়ানো কেশরাশি, অধরে আধ হাসি,
বহিছে চারিদিকে সলিল ধারা।
বালুর মৃদু ঘায়, লহরী ভেঙ্গে যায়,
শিহরে বারি তলে সাঁঝের তারা!

৫

করিয়া জলখেলা ক্ষণেক পরে,
আঁচোলে আবরিয়া সুতনু থরে,
কলসী ভরি নীরে, উঠিবে পুনঃ
চলিবে বন পথে আলস ভরে!

৬

লুকায়ে বাঁশী ল'য়ে তমাল বনে,
গাহিব "রাধা রাধা" আকুল স্বনে!
কাঁপিবে বুক তার, হেরিবে চারি
থমকি দাঁড়ায়ে ব্যাকুল মনে!

৭

বেলা যে প'ড়ে এল, দিন যে যায়!
মিশিছে ম্লান আলো আকাশ গায়,
লুটায়ে বেলা পরে, কি জানি কার
যমুনা কুলু কুলু বিলাপ গায়।
তৃষিত দু'নয়ানে, চাহিয়া পথ
একেলা আছি ব'সে কোথা সে হ
অধীর প্রাণ মন, না হেরে সে আ
ডাক্ রে ডাক্ বাঁশি, 'রাধিকা আয়
বেলা যে প'ড়ে এল, দিন যে যায়!

শ্রীবিনয়কুমারী

কেন স্মৃতি ?

কেন স্মৃতি বরিষা আঁধারে,
দেখাইছ চাঁদিনী যামি
দামিনীর চকিত অধরে
এঁকে সেই মধু হাসিখা
গুরু গুরু মেঘ গরজনে
তুমি আন কোথাকার ক
কার, মায়ামাখা সুমধুর স্বর,
কবেকার সুখভরা ব্যথা।
কেন, পরাণের ঘোর অন্ধকারে
জাগাও সে হরসের হাসি,
কেন, নীরব এ প্রকৃতির কোলে
বাজাও সে মধুময় বাঁশী

শ্রীপ্রমীলা

সেঞ্চুরী স্কুল।

১৭নং, ইড্‌ন হাঁসপাতাল ষ্ট্রীট্।

ইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দাসের পুত্র, কেম্বি্রজের ক্রয়ার কলেজের, পূর্ব্বতন স্কলার ও সিটি অব্ লণ্ডন কলেজের পূর্ব্ব- ফেসর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা স্থাপিত।

শ্রীযুক্ত দাস মহাশয় বহুকাল ইংলণ্ডে ছিলেন, অি বিলাতে সিটি অব্ কলেজ, বরবেক্ ইন্‌ষ্টিটিউশন, রেন ও গর্ণি, ও স্কন্সের ইণ্ডিয়ান সিভিল ্ ইন্‌ষ্টিটীউশন প্রভৃতিতে অনেক বৎসর প্রফেসর ও লেক্‌চারারের কাজ । শিক্ষাকার্য্যে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেই বহু দিনের অভি- ও তাঁহার ধারাবাহিক শিক্ষার গুণে তিনি কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীর বিশেষ রূপে পরিচিত।

ঞ্চুরী স্কুলে সবশুদ্ধ শেষ থেকে এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত ৬টা ক্লাস, সে জন্য য স্কুলে যে বিদ্যা শিখিতে ৯ বৎসর লাগে, সেঞ্চুরী স্কুলে তাহা ৬ বৎসরে ন হয়। অর্থাৎ, উহাতে ৬ বৎসর পড়িয়াই বালকেরা এণ্ট্রেন্স দিতে । স্কুলের শিক্ষকেরা সকলেই সুদক্ষ ও অত্যন্ত আস্থা ও যত্নের সহিত শিক্ষা মিষ্টার দাস ও অন্যান্য শিক্ষকদের ধারাবাহিক শিক্ষার গুণে ছাত্রেরা দ্রুত বিদ্যালাভ করে। শিক্ষকেরা প্রত্যেক ছাত্রের উপর মনোযোগ ও যত্ন লন। স্কুলের সমস্ত কাজ ও শিক্ষা, সুন্দর ধারামতে চালিত হয় ছাত্রদের সময় বা কার্য্যশক্তির কিছুমাত্র অপচয় হয় না; আর ৯ র পাঠ ৬ বৎসরে সাধিত হওয়ায় পিতামাতার ৩ বৎসরের ব্যয় বাঁচিয়া ছাত্রদিগকে নীতিজ্ঞান, সত্যবাদিতা, সাহস, শিষ্টাচার, ভদ্রতা, শৃঙ্খলা গুণ, মুখের উপদেশের পরিবর্ত্তে, কার্য্যত উদাহরণ দ্বারা শিখান হয়।

তত্ত্বাবধারক।

যুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দাস, বি, এ, কেম্বি্রজ; পূর্ব্বতন স্কলার ক্লেয়ার কলেজ; পূর্ব্বতন প্রফেসর সিটি অব লণ্ডন কলেজ, বরবেক্ ইন্‌ষ্টিটিউশন। পূর্ব্বতন লেক্‌চারার, রেণ এণ্ড গর্ণি, ও স্কন্সের ইন্‌ষ্টি- টিউশন, ইণ্ডিয়ান সিভিল সর্ভিস্ লণ্ডন।

শিক্ষকবর্গ।

, এন্, দাস, এস্কোয়ার, বি, এ, কেম্বি্রজ।

অম্বিকাচরণ উকীল, এম্, এ, পূর্ব্বতন প্রফেসর, চন্দননগর কলেজ।

বাবু প্রবোধচন্দ্র চাটার্জি, এম্, এ,।

বাবু গুরুদাস বসু, বি, এ, পূর্ব্বতন প্রফেসর অব্ ম্যাথম্যাটিক্স ও
সি, এম্ কলেজ, ইন্দোর ও পূর্ব্বতন হেড মাষ্টার, টি, কে,
অ্যাকাডেমি, বাঁকিপুর।

বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পূর্ব্বতন টিচার, কটন ইনষ্টিটিউশন

বাবু হরষিত ঘোষ, বি, এ, পূর্ব্বতন টিচার, রিপন্ কলিজিয়েট স্কুল

পণ্ডিত উমেশচন্দ্র মৈত্র, বি, এ।

বাবু হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়, বি, এ।

স্কুলের ফি—প্রথম চার ক্লাস মাসে ৩৲ টাকা, ও শেষ দু ক্লাস মাসে
টাকা করিয়া। অ্যাডমিশন ফি—৩৲ টাকা।

বিদ্যাসাগর পদক।

এই বৎসর যিনি "বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি" সম্বন্ধে সে
প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, কলিকাতার "শান্তি-সমিতির" সভ্যেরা তঁ
"বিদ্যাসাগর মেডেল" নামে একটি রৌপ্যপদক প্রদান করিবেন।
চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ, ও পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়দ্বয় প্রবন্ধ প
ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা যাঁহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন,
কেই পদক প্রদত্ত হইবে। আগামী ৩১এ মের মধ্যে প্রবন্ধগুলি নিম্ন
ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীমন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, সম্প

৪৪ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিক

লয়।

২

য় সত্যও হইতে পারে অসত্যও হইতে পারে, ভ্রান্তিমূলক হইতেও পারে
মূলক নাও হইতে পারে, জ্ঞানমূলকও হইতে পারে অজ্ঞানমূলকও
পারে। লয়তত্ত্বের সত্যাসত্যাদির কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু লয়তত্ত্ব যে
ন করে এবং লয়তত্ত্ব যে অনুসরণ করে সে যে বিরাটত্ব-প্রিয় এবং
মন যে বিরাট মন সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ হইতে পারে না।
বন্ধে এ কথা যে রকম করিয়া বুঝাইয়াছি তাহাতেও যদি কেহ না
তবে তিনি এ কথা বুঝিতে হয় অসমর্থ না হয় অনিচ্ছুক। অতএব
এই কথা বলিতে পারি যে লয়তত্ত্ব অসত্য বা ভ্রান্তিমূলক হইলেও উহার
ন যে বিরাটত্বপ্রিয়তা ও মানসিক বিরাটত্ব প্রকাশ পায়, একথার
অপলাপ বা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বিরাটত্বপ্রিয়তা
সিক বিরাটত্ব যদি হিন্দুত্বের লক্ষণই হয় তবে সে লক্ষণ নষ্ট হইলে
কি অধোগতি প্রাপ্ত হইবে না? বিরাটত্বপ্রিয়তা ও মানসিক বিরাটত্ব
চ্চ উৎকৃষ্ট জিনিস হয় তবে সে জিনিসের অভাবে উন্নতি বুঝাইবে না
বুঝাইবে? যে বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বকালে হিন্দুর এই বিরাটত্বপ্রিয়তা
সিক বিরাটত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল সে বিষয়ে যদি তোমার বিশ্বাস বা
থাকে, অর্থাৎ, যদি তোমার ব্রহ্মে বিশ্বাস না থাকে কিম্বা তোমার
ন সেই প্রাচীন হিন্দুর ব্রহ্মজ্ঞান হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তুমি অন্য
সেই উচ্চ উৎকৃষ্ট অসাধারণ গুণের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিও, তাহা
তোমার হিন্দু বিশেষত্ব রক্ষিত হইবে। কিন্তু সে অসাধারণ গুণের
তাদর হইয়া তাহা এককালে পরিত্যাগ করিও না। পরিত্যাগ করিলে
তোমার অবনতি ও অধোগতি হইবে, তোমার হিন্দু বিশেষত্ব নষ্ট
হিন্দুর এই বিশেষত্ব বড় উৎকৃষ্ট জিনিস বলিয়াই তোমাকে উহা
রিতে বলিতেছি।

ন্তু হিন্দুর কাছে লয়তত্ত্ব অসত্য নয়। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ও
ঋষি ও শাস্ত্রদর্শীরা বহুকালব্যাপী গভীর আলোচনা দ্বারা এই

অসাধারণ লয়তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মি
ধর্ম্মানুরাগ, সত্যপ্রিয়তা অসাধারণ ও অবিসম্বাদী। তাঁহাদের উ
লয়তত্ত্ব হাসিয়া বা ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিস নয়। ব্রহ্মে তাঁ
অগাধ ও অকৃত্রিম বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল। তাই তাঁহারা ব্রহ্মলাভ ব
লয় হওয়া মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। যে
ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি সেইখানেই এক রকম না এক রকম লয়ত্ত্ব দে
পাইবে। যীশুখৃষ্ট মনুষ্যকে বলিয়াছেন—"Be ye therefore per
even as your Father which is in heaven is perfect" (মেথি
৫, ৪৮)। এই উপদেশে মনুষ্যকে ঈশ্বরের প্রকৃতি লাভ করিতে
হইতেছে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতি লাভ করা আর ঈশ্বরে লয় হওয়া
একই কথা। অতএব লয়তত্ত্ব একা হিন্দুর নয়, খৃষ্টানেরও বটে। এবং
সেইজন্য প্রকৃত খৃষ্টানের মতে আপনাকে বা অপরকে সুখী করা
'আত্মসুখ' বা 'বিশ্বের সুখ' মানব-জীবনের আদর্শ বা চরম উদ্দেশ্য
ঈশ্বরে লয় হওয়া বা যীশু খৃষ্টের কৃপায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করাই
জীবনের আদর্শ বা চরম উদ্দেশ্য। পরার্থপরতা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক
একটি উপায় বটে, কিন্তু পরার্থপরতা আর সে উদ্দেশ্য এক নয়। ফল
যেখানে ধর্ম্ম ঈশ্বরমূলক বা ঈশ্বরকে লইয়া সেখানে জীবনের আ
প্রধান উদ্দেশ্য ঈশ্বর বা ঈশ্বরসংসৃষ্ট হইবেই হইবে। অতএব
জীবনের আদর্শ বা প্রধান উদ্দেশ্য ঈশ্বর বা ঈশ্বরসংসৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত
বা আদৃত না হয় সেখানে বোধ হয় ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই এবং ধর্ম্ম ঈশ
বা ঈশ্বরকে লইয়া নয়।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম উভয় ধর্ম্মেই লয়তত্ত্ব থাকিলেও দুইটি
অনুসরণ করিবার অর্থ বা ফল এক নয়। কারণ ঈশ্বরের প্রকৃতি
হিন্দুর সংস্কার এক রকম খৃষ্টানের সংস্কার অন্য রকম। হিন্দুর ঈশ্বর
খৃষ্টানের ঈশ্বর সগুণ। হিন্দুর ঈশ্বরে জীবরূপী মানুষের কি সদ্‌গুণ কি
গুণ কোন গুণই নাই, খৃষ্টানের ঈশ্বরে জীবরূপী মানুষের সদ্‌গুণ ত
দুই একটা অসদ্‌গুণও আছে—খৃষ্টানের ঈশ্বর সুধু প্রেমময়, স্নেহবান,
নন, ক্রোধপরায়ণও বটেন। ঈশ্বরের প্রকৃতি বিষয়ক সংস্কারের এই
বিভিন্নতা বশতঃ দুইটি লয়তত্ত্বের অর্থেও বিপুল বিভিন্নতা ঘটিয়াছে।
খৃষ্টানের লয় যত কষ্টসাধ্য ও কালসাপেক্ষ হিন্দুর লয় তাহার কোটি

ও কালসাপেক্ষ। এবং এত বেশী কষ্টসাধ্য ও কালসাপেক্ষ বলিয়া হিন্দুর ত্ব হিন্দুর বিরাটত্ব স্বীকার করিতেই হয়।

ন্তু হিন্দুর লয়তত্ত্বের অর্থ সুধু বিরাটত্ব নয়, সগুণ অবস্থা পরিত্যাগ নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াও উহার একটি অর্থ। কিন্তু নির্গুণ অবস্থা হইতে হইলে মায়া মোহ লোভ কামনা বাসনা স্পৃহা প্রভৃতি সংসারের ই পরিত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে সমাজও থাকে না, জাতিও না, বিজ্ঞান শিখিতেও হয় না, কবিতা পড়িতেও হয় না, প্রকৃতির গসৌন্দর্য্যও দেখিতে হয় না, কাজকর্ম্মও করিতে হয় না, পরোপকারও ত হয় না, ইত্যাদি। সংসার হইতে দূরে থাকিয়া দিবারাত্রি চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিলেই হয়। আমাদের লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে ইউরোপীয়েরা এই কথা কহিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের দেখাদেখি এদেশেও কেহ কেহ এই কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে এ আপত্তি অতি অসার ও অকিঞ্চিৎকর। এ সকল আপত্তি শুনিলে মনে আপত্তিকারিগণ বুঝি ভাবেন যে সগুণ অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণ প্রাপ্ত হওয়া একটা ঘর হইতে আর একটা ঘরে যাওয়ার মতন সেসাধ্য এক নিমিষের কাজ, ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন করা যায়, তজ্জন্য রকম শিক্ষা বা অনুশীলনেরও প্রয়োজন নাই, সাধনারও প্রয়োজন কিছুরই প্রয়োজন নাই! তাঁহারা বুঝি মনে করেন যে জীবের জীব-ি—মায়ামোহ ভোগেচ্ছা সঙ্গলিপ্সা সামাজিকতা প্রভৃতি—এতই দুর্ব্বল স করিব মনে করিলেই তাহা ধ্বংস হইয়া যায়! প্রকৃত কথা এই ানুষের জীব-প্রকৃতি স্বভাবতঃ এত প্রবল যে অতি কঠিন শিক্ষা ান সত্ত্বেও তাহা অনেক স্থলে সংশোধিত হয় না। অপর পক্ষে সেই প্রকৃতির এমন একটি ধর্ম্ম আছে যে সুপ্রণালীতে পরিচালিত হইলে ই মানুষকে দেবপ্রকৃতি লাভ করিতে সহায়তা করে। অতএব জীব-তকে উপেক্ষা করিয়া দেবপ্রকৃতি বা তদপেক্ষা উচ্চ ও বিশুদ্ধ যে ণ প্রকৃতি তাহা লাভ করিবার চেষ্টা করা বাতুলের কাজ। এবং যদি মনে করেন যে আমাদের শাস্ত্রে সেইরূপ চেষ্টার প্রশংসা বা ব্যবস্থা ় তবে তিনি নিজেই বাতুল। আমাদের শাস্ত্রে গার্হস্থ্য ও সমাজ ধর্ম্মের শংসা ও ব্যবস্থা আছে তত আর কোন শাস্ত্রে নাই। ফলতঃ মন্বাদি ানবধর্ম্মশাস্ত্রের পনর আনারও বেশী ভাগ গৃহ ও সমাজ সম্বন্ধে। এবং

যাঁহারা হিন্দুর লয়তত্ত্বকে গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের প্রতিকূল ব
আপত্তি করিয়া থাকেন তাঁহাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে তঁ
নিজেই অনেক সময় আমাদের মন্বাদি শাস্ত্রকারদিগের গৃহ ও
বিষয়ক ব্যবস্থাগুলিকে বড় বেশী আঁটাআঁটির বেশী পীড়াপীড়ির
বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। আসল কথা এই যে শিক্ষা ও
দ্বারা মানুষের জীব-প্রকৃতিকে সংশোধিত ও সংযত করিতে না পা
মানুষ সহস্র চেষ্টায়ও দেব-প্রকৃতি লাভ করিতে বা নির্গুণ প্রবৃ
দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। আমাদের শাস্ত্রকারেরা ইহা জানি
অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের অপেক্ষা ইহা বেশী বুঝিতেন, তাই তাঁহারা গ
ও সামাজিক জীবন সম্বন্ধে এত বেশী ও এত কঠিন নিয়ম করিয়া গিয়
বিবাহাদি যে সকল গার্হস্থ্য ও সামাজিক অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষের ঐ
স্পৃহাদি চরিতার্থ হয় মানুষকে তাহা পালন করিতে বাধ্য করিয়া গিয়া
এবং পার্থিব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার পূর্ব্বে বৈরাগ্য-পথ অবলম্বন ক
নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এখনও আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিয়া থাকি
বালক বা যুবক যোগীর নিকট দীক্ষা ভিক্ষা করিলে যোগী বালক বা যু
বৈরাগ্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে গমন করিতে উপদেশ
এবং কিছুতেই তাহাকে দীক্ষিত করেন না। যোগী ও শাস্ত্রকারা
এরূপ করিবার অর্থ এই যে মানুষের জীবপ্রকৃতি ভোগ দ্বারা চরিতা
করিয়া বৈরাগ্যমার্গে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে বৈরাগ্যমার্গে
করিতে পারাও যায় না। অতএব যেখানে ধর্ম্মের শিরোভাগে হিন্দুর
সেই খানেই গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন বেশী আবশ্যক ও বেশী অ
কিন্তু জীবপ্রকৃতির ভোগ অনিয়ন্ত্রিত হইলে জীবপ্রকৃতি কখনই দেব
লাভের অনুকূল হয় না, বিষম প্রতিকূলই হইয়া থাকে। অপর পক্ষে জীব
সুনিয়মে চরিতার্থ হইলে উহা দেবপ্রকৃতি লাভের বিশেষ অনুকূলই
থাকে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করা সম্বন্ধে
আঁটাআঁটি নিয়ম। এবং এই জন্যই বিবাহাদি যে সমস্ত ক্রিয়া দ্বারা স
বন্ধন সুদৃঢ় হয় সেই সমস্ত ক্রিয়াকে ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়া অবশ্যকর্ত্তব্য ব
দেওয়া হইয়াছে।

আবার মায়ামোহাচ্ছন্ন মনুষ্যকে মায়ামোহমুক্ত ব্রহ্মের দিকে
হইতে হইলে অনেক সাধনা আবশ্যক—মানুষ মনে করিলেই ে

সর হইতে পারে না। মানুষের মায়ামোহের মূলে স্বার্থপরতার অনুকূল ত্তি। সে সকল প্রবৃত্তির বিষম শক্তি, বিষম বল। সে সকল প্রবৃত্তি করিব মনে করিলেই দমন করা যায় না। অতএব ব্রহ্মের দিকে র হইব মনে করিলেই অগ্রসর হওয়াও যায় না। সে সকল প্রবৃত্তি করিবার নানা উপায় আছে। তন্মধ্যে এক উপায় উহাদের সুনিয়ন্ত্রিত চালন। সে কথা উপরে বলিয়াছি। আর এক উপায় পরার্থপরতার কূল প্রবৃত্তিগুলির অধিকতর পরিচালন। ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য যে সাধনা প্রক্রিয়া আবশ্যক ও অপরিহার্য্য পরার্থপরতার অনুশীলন তাহার অতি ৎকৃষ্ট অঙ্গ ও উচ্চ উপায়। ব্রহ্মত্ব লাভের একটি অর্থ মায়ামোহাদিজনিত র্ণতা বিনাশ করিয়া ব্রহ্মের বিশাল ব্যাপকতা লাভ করা। এই পরি- বা পরিণতিকে এক কথায় আত্মসম্প্রসারণ বলা যাইতে পারে। যাঁহারা ন ইহার অর্থ আত্মনাশ তাঁহারা বড় ভুল বুঝেন—তাঁহারা বোধ হয় তাঁহা- মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সঙ্কীর্ণতা বা বিকৃতি বশতঃ আমাদের তত্ত্বে প্রবেশ করিতে একেবারেই অসমর্থ। এই আত্মসম্প্রসারণ সংসা- র্ পরার্থপরতার অনুশীলন নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ পরার্থপরতার শীলন ব্যতিরেকে স্বার্থপরতাজনিত সঙ্কীর্ণতা দূর হয় না বা পরার্থপরতার াকতায় পরিণত হইতে পারে না। পরার্থপরতার অনুশীলনে স্বার্থপরতার ্যাপকতা হয় অথবা যে পরিমাণ আত্মসম্প্রসারণ লাভ করা যায় তাহাতে ব্যাপকতা পাওয়া যায় না সত্য। ব্রহ্মের ব্যাপকতা লাভ করিবার পরার্থপরতার অনুশীলনজনিত ব্যাপকতার উপরেও ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন- ব্যাপকতা অর্থাৎ পরার্থপরতার অনুশীলনজনিত আত্মসম্প্রসারণের ও ব্রহ্মজ্ঞানুশীলনজনিত আত্মসম্প্রসারণ আবশ্যক। কিন্তু ব্রহ্মের কতা লাভ করিবার পক্ষে পরার্থপরতার অনুশীলন জনিত ব্যাপকতা বড় ঞ্চিৎকর নয় এবং একেবারেই অপরিহার্য্য। কারণ পরার্থপরতার অনু- নজনিত ব্যাপকতা ব্রহ্মের অন্তর্ভূত—ব্রহ্মের ব্যাপকতা লাভ করিবার যে বিরাট সাধনা আবশ্যক তাহার ক্রম বা পর্য্যায় স্বরূপ। কিন্তু র্থপরতার অনুশীলন দ্বারা আত্মসম্প্রসারণ করিতে হইলে অর্থাৎ পরতাকে পরার্থপরতায় পরিণত করিতে হইলে অথবা পরার্থ- কই স্বার্থপরতা করিয়া তুলিতে হইলে সমাজ অপরিহার্য্য। ছাড়িলে পরার্থপরতার অনুকূল প্রবৃত্তির পরিচালন এক রকম

অসম্ভব হয় বলিলেই হয়। এবং সেই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে গৃহ
শ্রমের এত প্রশংসা এবং গৃহস্থাশ্রম প্রবেশের জন্য এত পীড়াপী
গৃহস্থ অপর সকল আশ্রম পালন করেন বলিয়া গৃহস্থাশ্রম
সকল আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মনু একথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়া
এবং গৃহস্থাশ্রমে মানুষের স্বার্থপরতা পরার্থপরতায় পরিণত হইতে
বা পরার্থপরতা প্রকৃষ্ট স্বার্থপরতা হইয়া উঠিতে পারে এই উ
মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা আত্মসেবা সঙ্কুচিত করিয়া পরসেবাই গৃহ
প্রধান ও নিত্য কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। অনন্য
হইয়া অনুক্ষণ সেই কঠিন ব্যবস্থার অনুসরণ না করিলে কিছুতেই প
পরতা শিখিতে পারা যায় না, পরার্থপর হইব বলিলেই হওয়া যায় না,
মনে করেন হওয়া যায় পরার্থপরতা কি বিষম সাধনা তিনি তাহা জানে
গৃহে মোহমূলক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অবসর অত্যন্ত বেশী। অতএব ধ
শাসনে গৃহে মোহমূলক প্রবৃত্তি সকল দমিত না হইলে পরার্থানুকূল প্র
সকল কখনই ফুটিতে পারে না এবং মানুষ কখনই মোহমুক্ত অবস্থা
করিতে পারে না,অর্থাৎ, যে মোহমুক্তাবস্থা নির্গুণ অবস্থার প্রবেশদ্বার
সেই মোহমুক্তাবস্থা লাভ করিতে পারে না। যে আপনাতে ও আপনারগু
মুগ্ধ সে কেমন করিয়া পরের ভাবনা ভাবিবে? পরার্থপরতায় পরের
স্নেহ দয়া প্রীতি প্রভৃতি বুঝায় বটে, কিন্তু সে স্নেহ বা দয়া বা প্রীতি
নয়, যে মোহ মানুষকে আপনাতে বা নিতান্ত আপনার বস্তুতে আ
আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সে মোহ নয়,তাহাতে মোহের অন্ধকারও নাই সঙ্কী
নাই দুরাশাও নাই দুর্দ্দমনীয়তাও নাই। সেই স্নেহ দয়া বা প্রীতিই
প্রশস্ততা ও বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া বিশ্বব্যাপী মৈত্রীর আকার ধারণ ক
যে বিশ্বব্যাপী মৈত্রী প্রহ্লাদে প্রস্ফুটিত,জীবন্মুক্ত নারদ যাহার অদ্বিতীয়
নীয় এবং অলৌকিক উদাহরণ ও প্রতিকৃতি এবং চৈতন্যদেব যাহার শেষ
তার। অতএব লয়ের পথে প্রবেশ করিতে হইলে গৃহও যেমন আ
সমাজও তেমনি আবশ্যক, গৃহও যেমন অপরিহার্য্য সমাজও তেমনি অ
হার্য্য। গৃহ ও সমাজ ত্যাগ করিবার ব্যবস্থাও আমাদের শাস্ত্রে আছে।
তাহা নয়, আমাদের শাস্ত্রে যেমন ব্যবস্থা আছে অন্য কোন শাস্ত্রে
ব্যবস্থা নাই। কিন্তু সংযত আচারে ও সমাজের সেবায় ইন্দ্রিয়াদিজনি
বহুল পরিমাণে বিনষ্ট না হইলে গৃহ ও সমাজ ত্যাগ করিবার

আবার সমাজ হইতে দূরে বাস করিবার বিধি থাকিলেও সমাজ ভুলিয়া
বার বিধি নাই। অনেকে মনে করেন যে যোগী হইলে কেবল ভগ-
কথাই ভাবিতে হয়, লোকসমাজের কথা ভাবিতেও হয় না, লোকের
কোন কাজকর্ম্মও করিতে হয় না। কিন্তু ইহার অপেক্ষা ভ্রম বোধ
র কিছুই নাই। পুরাণাদিতে দেখিতে পাই অরণ্যবাসী যোগী ঋষি
রা সর্ব্বদাই লোকহিতকর কার্য্য করিতেছেন, সর্ব্বদাই সমাজের হিত-
নিযুক্ত রহিয়াছেন। যখনই লোক বিপদগ্রস্ত বা শত্রুভয়ে সন্ত্রাসিত
দেখিতে পাই ঋষি তপস্বীরা তাহাদিগকে বিপদ্‌মুক্ত বা ভয়ভ্রষ্ট করি-
ন। দৈত্যভয় নাশ করিবার জন্য অগস্ত্য মুনি সমুদ্রবারি গণ্ডূষ করিয়া
য়াছিলেন, বৃত্রাসুর বিনাশ করিবার জন্য দধীচি মুনি আপনার দেহের
দান করিয়াছিলেন, জনপদে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইলে
্য ঋষি তপস্বীরা জনপদের অনিষ্টনিবারণার্থ যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিতেন।
যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপস্থিত হইলে বন হইতে ব্রহ্মচারীরা আসিয়া রাজাকে
দেশ দিয়া যাইতেন। লোকসমাজের সুখ দুঃখের কথা অরণ্যচারী ঋষি
রা যত ভাবিতেন আর কেহ তত ভাবিতেন কি না বলিতে পারিনা।
তখনই দেখিতে পাই এই ঋষি এই রাজার সভায় আসিয়া রাজ্যের কুশল
সা করিতেছেন, ঐ ঋষি ঐ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রজাপালন-
ী বুঝাইয়া দিতেছেন। পূজনীয় শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়
যোগী তপস্বীর সহিত আলাপ করিয়াছেন, অনেক যোগী তপস্বীর
র্য্য ও জীবনপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। যোগী তপস্বী সম্বন্ধে
এইরূপ লিখিয়াছেন :—

যোগীদের সংবাদপত্র নাই, বক্তৃতা নাই, বাহ্য কোন চিহ্ন দ্বারা তাঁহা-
সংবাদ প্রকাশিত হয় না, তাঁহারা প্রায়ই গোপনে, নির্জ্জন কাননে বা
কন্দরে বাস করেন, যখন লোকালয়ে আসেন তখনও সচরাচর সাধারণ
কের সহিত দুই চারিটা কথা কহিয়া চলিয়া যান, এই সকল কারণে যদি
মনে করেন যে, তাঁহারা অলস-প্রকৃতি, ধ্যান-পরায়ণ সংসার-বিমুখ
ক মাত্র, তাহা হইলে তাঁহার ঘোরতর অপরাধ হয় মনে করি। যদি
সপ্তাহ কোন প্রকৃত যোগীর সহবাসে কাটান যায় তাহা হইলে বুঝা
তাঁহারা কিরূপ পরোপকারী, সংসারের কল্যাণের জন্য কত চিন্তা
কিরূপ ভয়ানক ত্যাগ-স্বীকার করিয়া জনসমাজের দুঃখ দূর ও সুখ

বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পান এবং কেমন অদ্ভুত নিয়ম বশে ঈশ্বরের কৃপা
নিজেদের শক্তিবলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হন। যাঁহারা জীবনে (
যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কখন কোন মহাত্মার সঙ্গলাভে
সার্থক করেন নাই, কেবল কতকগুলা ভণ্ড, অলস ও ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী
দেখিয়া যোগী দর্শনের জ্ঞান পাইয়াছেন মনে করেন, তাঁহারা যোগী
ত্রের অদ্ভুত রহস্য কি বুঝিবেন? তাঁহাদের এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিব
অধিকার নাই। যে দেশের ঋষিরা দার্শনিক, ঋষিরা সাহিত্য লেখক, ঋ
বিজ্ঞান প্রভৃতির আবিষ্কর্ত্তা, ঋষিরা জ্যোতির্ব্বিদ, ঋষিরা গণিত শাস্ত্রের উ
বক, ঋষিরা দৈহিক যন্ত্র, বিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বেদের স্থষ্টিকর্ত্তা, ঋষিরা ব্যবস্থ
ও রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক, যে দেশের ঋষিরাই সংসারযাত্রা নির্ব্বাহোপ
যাবতীয় বিষয়ের আদি, মধ্য ও অন্ত সেই দেশে যে আজ যোগ, তপস
আলস্য এক কথা বলিয়া বিবেচিত হইতেছে ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও দুঃখজ
ব্যাপার আর কি হইতে পারে? যে দেশে জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ প্র
মহাযোগীগণ জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার ও ধর্ম্ম যে একই বস্তু এই মহাস
পরিষ্কার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন যে দেশের তাপসাগ্রগণ্য বুদ্ধ
শঙ্করাচার্য্য, নানক, কবীর ও শ্রীচৈতন্য সকলেই জনসমাজের
মঙ্গল সংসাধনের জন্য আপন আপন সুখ স্বচ্ছন্দতা, শান্তি ও সমাধি,
জীবনই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপিও যে দেশের আধ্যাত্মিক
নতি ও নৈতিক পাপাচার দূর করিবার জন্য কত কত সিদ্ধ মহাপু
অরণ্যের বা পর্ব্বতগুহার নির্জ্জন সাধন পরিত্যাগ করিয়া, অনাহার ও
প্রভৃতি শত সহস্র ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া দূর দূরান্তর পদব্রজে পরিভ্রমণ ক
ছেন, এবং বিধিমতে ধর্ম্ম-পিপাসু জনগণের অন্ধকারময় জীবনাকাশে
পবিত্রতা সত্য ধর্ম্মের জ্যোতি সমুদিত করিয়া, জল কষ্টে পীড়িত লোক
ক্লেশ বিদূরিত করিয়া, অন্নকষ্টে মৃতপ্রায় সহস্র সহস্র দরিদ্র লোকের সাহ
লক্ষ লক্ষ মুদ্রা সংগ্রহ ও ব্যয় করিয়া, এবং রুগ্নকে ঔষধ, শোকার্ত্তকে সা
অজ্ঞানকে জ্ঞান ও হতাশকে আশা দিয়া প্রতিদিন এই হতভাগ্য দেশে
রায় সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আনয়ন করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া বে
তেছেন, হায়! সেই দেশের লোক হইয়া আমরা চীৎকার করিতেছি
আলস্য ও কর্ম্মবিমুখতা আনিয়া দেয়!! লজ্জার কথা, ক্ষোভের
অজ্ঞতার কথা। যাঁহাদের ষড়ৈশ্বর্য্যশালিত্ব, যাঁহাদের মহত্ত্ব ও অ

র কিছুমাত্র আভাস পাইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা স্তম্ভিত ও
স্তব্ধ, যাঁহাদের দুই চারিটা কথার প্রতিধ্বনি এমার্সন,
ইল-প্রমুখ পাশ্চাত্য যোগীগণের নিকট পাইয়া উনবিংশ শতাব্দী
উপাসনা করিতেছে এবং যে মহাত্মাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতা যিশুখ্রীষ্ট
দ্ধ এই দুই সহস্র বৎসর পৃথিবীর অধিকাংশ মানবমণ্ডলীকে পরি-
রিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদেরই সন্তান হইয়া আজ যে আমরা
গর যৌবন-সুলভ চপলতা দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়াছি ও যোগকে আলস্য
তেছি ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা আর কি হইতে পারে * ?”
রূপই ত হইবার কথা। মোহমুক্ত ব্রহ্মপিপাসু ব্রহ্মভক্ত যোগী ব্রহ্মের
যেমন ভাল বাসিবেন আর কেহই তেমন বাসিবেন না, বাসিতে
রেন না। এবং বোধ হয় যে তিনি ভিন্ন আর কেহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে
াসেনও না বাসিতে পারেনও না। অতএব দেখা গেল যে ব্রহ্মলাভ
হইলে গৃহ ও সমাজ অপরিহার্য্য, গৃহ ও সমাজের ভিতর দিয়া না
লয়ের পথে প্রবেশ করা এক রকম অসম্ভব। এবং ইহাও বুঝা গেল
তপস্বীর ন্যায় লয়ের পথে বেশী অগ্রসর হইলে মানবমন বেশী
ক্ত হইয়া সমাজের বেশী কল্যাণকামী হইয়া থাকে এবং মানব
র বেশী কল্যাণসাধন করিয়াও থাকে। এই একটি কথা।

র একটি কথা। লয় কত সাধনাসাপেক্ষ তাহা বলিয়াছি। কত
ত শতাব্দী, কত যুগ ধরিয়া সাধনা করিলে তবে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত
য় তাহার ঠিকানা নাই। অতএব লয় যে শাস্ত্রের চরম কথা এবং লয়
জর শেষ লক্ষ্য সে শাস্ত্রে এবং সে সমাজে মনুষ্যের ও সমাজের দীর্ঘ
অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।
যথানে দীর্ঘ সাধনা আবশ্যক সেখানে দীর্ঘজীবন লাভ করিবার প্রয়াস
ই প্রবল হইবার কথা। আমাদের মধ্যে হইয়াছেও তাহাই। মনু-
জীবন ও মনুষ্যসমাজের জীবন দীর্ঘ করিবার অভিপ্রায়ে আমাদের
যেরূপ বিধিব্যবস্থা আছে বোধ হয় আর কোথাও সেরূপ নাই।
ক্ষা আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক ব্যবস্থারই উদ্দেশ্য। আমাদের অনেক
ানের উদ্দেশ্যের সহিতও ঐ উদ্দেশ্য জড়িত। আমাদের আহ্নিক

* াধন সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নোত্তর—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত—২৭—৩০ পৃষ্ঠা।

ক্রিয়াতেও ঐ উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত। দীর্ঘ সাধনার জন্য দীর্ঘজীবন এত শ্যক বলিয়াই পুরাণে বহুসহস্রব্যাপী তপস্যার কথা দেখিতে পাওয়া য' প্রজার অকালমৃত্যু রাজার মহাপাপের ফল বলিয়া উক্ত। ফলতঃ অসীম সাপেক্ষ লয় যেখানে জীবনের চরম উদ্দেশ্য জীবন দীর্ঘ করিবার আ সেখানে যত অধিক অন্য কোথাও তত অধিক হইতে পারে না। এ জের ভিতর দিয়া না গেলে যখন লয়ের পথে প্রবেশ করিবার ঁ তখন সমাজের জীবন দীর্ঘ করিবার আবশ্যকতাও সেখানে যত অ কোথাও তত অধিক হইতে পারে না।

অতএব যেখানে হিন্দুর লয়তত্ত্ব সেইখানেই গৃহ ও সমাজ অপরিহ দীর্ঘ জীবন অত্যাবশ্যক, অন্য কোথাও নয়। আর তাহাই যদি হ যেখানে হিন্দুর লয়তত্ত্ব সেখানে সামাজিকতা প্রভৃতি গুণ যেমন অ জীবন সমাজ রক্ষা করিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা আয়ত্ত ও অ করাও তেমনি আবশ্যক। কিন্তু এই দুই প্রকার বস্তুর মধ্যে অনেক জি পড়িতেছে—কর্ম্মশীলতা, উদ্দেশ্যশীলতা, পরদুঃখকাতরতা, সঙ্গসুখপ্রিয়ত জ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, কৃষি, ব্যবসায়, বাণিজ্য অনেক জিনিসই পড়ি পড়িতেছে সকলই। কিন্তু এমন মাত্রায় পড়িতেছে যে কোনটিই ধ ও লয়ের পথে প্রবেশের অন্তরায় না হয়। ইহাতেই সকলগুলির সা ইহা ছাড়া মানুষের কার্য্যকারিণী চিত্তরঞ্জিনী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির অ সামঞ্জস্য নাই, বোধ হয় হইতে পারেও না। বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মতত্ত্ব প আহ্লাদ হইল, তিনিও এই এই কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু সক পড়ে বলিয়া কোন জিনিসই যে কখনও বাদ পড়ে না বা পড়িতে তাহা নয়। নানা কারণে নানা জিনিস বাদ পড়িয়া থাকে, প্রাচীন বাদ পড়িয়াও ছিল। কিন্তু কোন জিনিসকে বাদ পড়িতেই হই কোন কথা নাই, লয়তত্ত্বের এমন অর্থও নয় অনুরোধও নয়। জিনিস বাদ দিলে মনুষ্যের বা সমাজের জীবন বিপন্ন হয়, লয়তত্ত্ব সে জিনিস বাদ দেওয়ার ন্যায় মহাপাতকও আর নাই। প্রাচীন অন্নসমস্যা উপস্থিত হয় নাই, সেই জন্য বাহ্য উদ্যমও কম হইয়াছিল। তখন তাহাতে দোষও হয় নাই, পাপও হয় নাই। এখন ভারতে অ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এখন বাহ্য উদ্যমও আবশ্যক হইয়া এখন জীবনরক্ষার্থ বাহ্য উদ্যমের ত্রুটী হইলে যথার্থই আমাদের

পূর্ব্বকালে জীবনরক্ষার্থ আমাদের বাহ্যোদ্যম যে ছিল না তাহা
িন্তু এখন ভিন্ন প্রণালীর ও অধিক পরিমাণের বাহ্যোদ্যম আবশ্যক
য়াছে। সেই ভিন্ন প্রণালী ও বর্দ্ধিত পরিমাণ আমাদিগকে
িতে হইবে। নহিলে আমাদের মরণ ও মহাপাতক সুনিশ্চিত।
নূতন প্রণালী ও বর্দ্ধিত পরিমাণ আয়ত্ত করিতে গিয়া যেন
ছাড়াইয়া যাওয়া না হয়, জীবনের সেই চরম উদ্দেশ্য যেন ভুলিয়া
না হয়, মুক্তির পথ হইতে মোহের পথে আসিয়া যেন পড়া না হয়।
ার অবস্থায় আমাদিগকে যে পথে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী অগ্রসর হইতে
সেটা মোহেরই পথ—সে পথে বেশী গেলে বিষম বিপদ। অতএব সে
যতটুকু গেলে আজিকার অবস্থায় জীবন রক্ষা হয় যাহাতে তাহার বেশী
না হয় প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিতে হইবে। সে পথ বড় মনোহর,
াহকর, সে পথে বেশী গিয়া পড়িবারই কথা। সে পথে যাহারা
গিয়াছে তাহারা জড়ত্বে বড়ই জড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহারা পৃথিবীর
নলে ঠিক কীট পতঙ্গের ন্যায় পুড়িতেছে। তাই বলিতেছি, সে পথে
বেশী যাওয়া না হয় সকলের সমবেত হইয়া সেই চেষ্টা করিতে
চেষ্টা সফল হইবে কি না বিধাতাই জানেন। হিন্দুর ইতিহাসে
ঙ্কটাপন্ন কাল আর উপস্থিত হয় নাই। আর চেষ্টা যদি সফল হইবার
া হইলে হিন্দুর ইতিহাসে বিধাতার বিহিত বড় সুসময়ই উপস্থিত
। ভরসা করি বিধাতার মনে ভালই আছে।

একটি কথা। লয় যেমন বহু সাধনা সাপেক্ষ যে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত লয়
স ব্রহ্মজ্ঞানও তেমনি বহু অনুশীলনসাপেক্ষ। যাহা দেখিলে, যাহা
যাহা অনুভব করিলে, ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান
ানের উপায়। অতএব পদার্থবিদ্যা প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি যাহাতে
শল ব্যাখ্যাত হয়, বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা বর্ণিত হয়
কলই লয়প্রার্থীর অনুশীলনের জিনিস। আবার লয়ের পথে চলিতে
কঠোর প্রণালীতে ব্রহ্মচারীর ন্যায় জীবন যাপন করিতে হয়, বলিয়া
হ হইতে দূরে গমন করিতে হয় বলিয়া যে বিশ্বের সৌন্দর্য্য, কোম-
মনীয়তা রমণীয়তা মাধুর্য্য ত্যাগ করিতে হয় তাহা নয়। ত্যাগ করা
ক, সে সকল নহিলে চলে না। বিশ্বের সৌন্দর্য্য, বিশ্বের মাধুরী,
ধুময়তা ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মপিপাসু ব্রহ্মচারী যেমন অনুভব করিবেন

আর কেহই তেমন করিবেন না, যে ভাবে উপলব্ধি করিবেন আর
সে ভাবে করিবেন না। ঋষিরচিত রামায়ণে ভাগবতে, পুরাণে
শোভাসৌন্দর্য্যের কি অপূর্ব্ব সমাবেশ, কি পবিত্র ধ্যান!
তপস্বীর তপোবনেই না বেশী ফুল ফুটে, বেশী মৃগমৃগী খেলাই
বেশী কল্লোলিনীর কলকণ্ঠ শুনা যায়। প্রকৃত সৌন্দর্য্যে মোহ না
সৌন্দর্য্য মানুষকে ব্রহ্ম ভুলায় না, প্রকৃত সৌন্দর্য্য মানুষকে ব্রহ্মেই ম
দেয়। ব্রহ্মচারী ভিন্ন বিশ্বের সৌন্দর্য্যে প্রকৃত সৌন্দর্য্য আর কেহ
পায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখিও, একটু বেশী তলাইয়া দেখিও, দেখি
ব্রহ্মচারী নয় তাহার সৌন্দর্য্যের ভিতর একটু পাপ, একটু মলা, একটু
আছে এবং যেখানে ব্রহ্মচর্য্য নাই সেখানে জগতের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য—
রং সুন্দর স্বর সুন্দর সৌরভ—পাপের প্রবল পরিপোষক। হিন্দুর
এবং বিশ্বের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যতত্ত্বে বড়ই আত্মীয়তা।

আরো একটি কথা আছে। সে কথাটি না বলিলে বিশেষ ক্ষতি
কিন্তু বলাই বোধ হয় ভাল। লয়তত্ত্ব প্রভৃতি বুঝাইতে গিয়া আমরা
জাতির সহিত তুলনা করিয়া হিন্দুর গৌরববৃদ্ধি করি ইহার দুই একটি
আছে। প্রথম কারণ এই যে কাহারো শ্রেষ্ঠত্ব বা বিশেষত্ব বুঝাইতে
অন্যের সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইলে বিষয়টি যেমন পরিষ্কার হয় তু
করিয়া বুঝাইলে তেমন পরিষ্কার হয় না। স্বয়ং যীশুখৃষ্ট অখৃষ্টানদিগে
প্রণালীর সহিত তুলনা করিয়া খৃষ্টানের প্রার্থনাপ্রণালী বুঝাইয়াছিলে

"But when ye pray, use not vain repetitions, as the h
do: for they think that, t hey shall be heard for thei
speaking.

Be ye not therefore like unto them: for your
knoweth what things ye have need of, before ye ask hi.

মেথিউ, ৬—৭,

আর একটি কারণ এই যে আজ প্রায় এক শত বৎসর ধরি
রোপীয়েরা আমাদিগকে যাহা-ইচ্ছা-তাই বলিয়া গালি দিতেছে, কুৎ
তেছে, নিন্দা করিতেছে। যাহারা আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে, সমাজসম্বন্ধে
রই সম্বন্ধে কিছুই জানে না তাহারাও আমাদিগকে নানা অকথা কু
তেছে—নিষ্ঠুর বলিতেছে, পিশাচ বলিতেছে, বর্ব্বর বলিতেছে,

। কিন্তু তাহাতেও আমাদের তত রাগ বা ক্ষোভ হয় না। কিন্তু
ল আমাদের স্বদেশীয় স্বজাতীয়ের মধ্যে অনেকে যে বিষম স্বজাতি-
ষম হিন্দুবিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন, অন্য জাতির সমাজ শাস্ত্র বিদ্যা-
াতমতির যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিতেছেন এবং স্বজাতির শাস্ত্র ও
দিগকে নক্‌ড়া ছক্‌ড়া করিতেছেন ইহাতে একটু রাগও হইতেছে,
ইতেছে। স্বজাতিদ্রোহীকে দেখিলে কাহার না রাগ ও ক্ষোভ
এই কারণেও বোধ হয় এই তুলনা গুলা হইতেছে। কিন্তু এরূপ
ভাল কিন্তু ইহাতে অন্য জাতির প্রতি অনুদারতার লেশ মাত্র নাই।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

কালিদাস ও সেক্ষপীয়র।

(১)

আভাষ।

ষ্ট জগতে সকলই অদ্ভুত, সকলই রহস্যময়। মহত্তম আকাশ হইতে
 পরমাণু, কঠিনতম গিরিচূড়া হইতে কোমলতম যূথিকাফুল,
ই লীলাময়, সকলই অদ্ভুত। এই অতি তুচ্ছ বালুকাকণা—কোটি কল্প
নগণ্য হইয়া সাগরসৈকতে পড়িয়া আছে; পবন বাত্যারূপ ধরিয়া
 বিক্ষুব্ধ করিয়াছে, সমুদ্র তরঙ্গবাহু তুলিয়া ইহাকে বিপর্য্যস্ত করি-
কিন্তু মানুষ আজিও ইহার রহস্য বুঝে নাই। ইহা আজিও দুর্জ্ঞেয়,
, লীলাময়। আর মনুষ্য? সৃষ্টির ললাম, শেষ বিবর্ত্তন, চরম উৎকর্ষ
, তাহার রহস্য কে বুঝিবে? সে ক্ষুদ্র হইয়াও মহান্, কঠিন হইয়াও
ল, জড় হইয়াও চেতন, সান্ত হইয়াও অনন্ত, পশু হইয়াও দেবতা।
র রহস্য কে বুঝিবে? সে অজ্ঞেয়, অত্যদ্ভুত, অশেষ লীলাময়। ইহা ত
সামান্য মানুষ, যাহার তাহার কথা। আর যাঁহারা নরদেব, মনুষ্য-
পচয়, মানবচূড়া, যাঁহারা প্রজ্ঞানেত্র, কল্পনাচক্ষু, ভাবময়, ধীমান,

যাঁহারা মনীষী, কবি, মহাকবি, তাঁহাদের রহস্য কে বুঝিবে? প্রজ্ঞা তাঁ
দের ধারণা করিতে পারে না। কল্পনা তাঁহাদের ভাবনা করিতে
যোগিধী তাঁহাদের দূর হইতে প্রণাম করে। তাঁহারা চিরদিন সমা
ময়, রহস্যময়, বৈচিত্র্যময়।

যে দুই মহাপুরুষের নাম গ্রহণ করিয়া এই প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছে
দের প্রতিভার বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের বিষয়, তাঁহারা এইরূপ প্রজ্ঞা
চক্ষু ভাবময় ধীমান্ মনীষী, কবি মহাকবি, অর্থাৎ তাঁহারা অজ্ঞেয়
রহস্যময় বৈচিত্র্যময়। তাঁহাদের প্রতিভার স্বরূপ বুঝিব, আমার
নাই, তবে মহাকবির সঙ্গ নাকি বড় সুখশান্তিপ্রদ, সেই চিরদিনের
তাঁহাদের মনোহর কাব্যের অনুশীলন নাকি উৎকৃষ্ট কাব্যামোদকর,
দূরে দূরেও তাঁহাদের প্রতিভার অনুসরণ নাকি মাটীর ধরা ছাড়িয়া অ
ছায়া হৃদয়ে ধরিবার শ্রেষ্ঠ উপায়, তাই অকিঞ্চন হইলেও আমার
সমালোচনার অবতারণা।

আর এই প্রতিভা, ইহা কোন জাতীয় পদার্থ? অন্যান্য উন্মত্ত
মত ইহাও কি এক প্রকার দিব্যোন্মাদ? উনপঞ্চাশৎ বায়ুর মত, ই
কারণভূত কি এক জাতীয় বায়ুর অস্তিত্ব আছে? গ্রীক্ মন্দিরে (Ap
দেব-উপাসিকা যেমন সংজ্ঞা হারাইয়া উন্মাদিনী হইয়া অমরকণ্ঠে ত্রিকাল
সঙ্গীত গাহিত, প্রতিভার গানও কি তাই? অথবা ইহা কোন
আলো, পুণ্যবান্ নরের হৃদয়ে পড়িয়া তাহাকে দেব-নর করিয়া
সেই আলোকসাক্ষাতে সৃষ্টির আবরণ খসিয়া পড়ে, ত্রিকাল অনন্ত
ঘনীভূত হয়, স্বর্গ মর্ত্তের ব্যবধান মুছিয়া যায়, তাই সত্য ও সুন্দরের
প্রতিভার চক্ষে প্রতিভাত হয়। শেলি, হীন, বারন্স্, স্যাফো, ই
জীবন দেখিয়া মনে হয়, প্রতিভা দিব্যোন্মাদ। আর হোমর, গেটে,
পীয়র, কলিদাস, ইহাদের কাব্য পড়িয়া মনে হয়, প্রতিভা ত্রিদিবের অ
তা আলোই হউক আর উন্মাদই হউক, কবির প্রতিভা কবির মত অ
লীলাময় রহস্যময় বৈচিত্র্যময়। তবে এ প্রতিভার স্বরূপ বুঝিব কেমন ক
ইহার তুলনা দিব কাহার সহিত? আমার মনে হয়, জগতে প্রতিভার
দিবার পদার্থ একটি বই দ্বিতীয় নাই—সে পদার্থও প্রতিভাসৃষ্ট।
প্রতিভা-কল্পিত দেবজগতে প্রোতুস (Proteus) নামে এক জল
উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার স্বরূপের ইয়ত্তা নাই, ইনি 'বহুরূপী

র্ত্ত পরে ফিরিয়া দেখ, রূপান্তর! এই জলবালা, মোহিনী
অঙ্গ ঢাকিয়া, গলে মুক্তাহার পরিয়া, কর্ণে প্রবাল দোলা-
ক্ত লইয়া জলে কন্দুকক্রীড়া করিতেছে; চাহিয়া দেখ,
! ভীষণ নক্র, করালবদন ব্যাদান করিয়া, নররক্তে
প্রশান্ত সাগর বিলোড়িত করিয়া মৃত্যু-লীলার অভিনয়
, বহুরূপী, কে তাহার স্বরূপ বুঝিবে? কবির প্রতিভাও
, বহুরূপী। এই দেস্‌দিমনার হৃদয়ে পশিয়া, কোমলতার পর-
পারিণত হইয়া, বিবাহবাসরে কুসুমশয়নে কুসুমময়ী পতির কঠোর
। প্রাণপাত করিতেছে; আবার লিয়র সাজিয়া, কঠোরতার উচ্চ সীমায়
, বজ্রাগ্নি দগ্ধ ধারা তাড়িত হইয়া বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিজন বনে, পাষাণময়
হৃদয়ের শাপানল উদ্গীরণ করিতেছে। ফিরিয়া দেখ ফল্‌ষ্ট্যাফ,
সহিত মিশিয়া, অতিভোজনে মাংসপিণ্ড সাজিয়া, অতি-পানে বৃকোদর
করিয়া, পূতিগন্ধময় পান্থাবাসে কুৎসিত কামলীলা করিতেছে। সক-
তিভার সৃষ্টি, প্রতিভা বহুরূপী, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। আবার
। দেখ। বিজন বন, জনহীন লতাগৃহ, সেথায় বৃক্ষ নিস্পন্দ, ভ্রমর
পক্ষী নীরব, মৃগ গতিহীন। সেই স্তম্ভিত বিজনবনে প্রতিভা যোগী-
হাদেব সাজিয়া মহাধ্যানে নিমগ্ন, যেন বৃষ্টিক্ষোভরহিত জলধর, যেন
ান জলধি, যেন নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপ। আবার দেখ, রামগিরির জন-
ন্তর, আষাঢ়ের নবঘনে অন্ধকারিত; প্রতিভা, নির্ব্বাসিত বিরহবিধুর
জিয়া, অতি ক্ষীণ সন্তপ্তদেহে উৎকণ্ঠাব্যাকুল প্রাণে অশ্রুসিক্ত হইয়া
ার উদ্দেশে অশ্রুপাত করিতেছে, কখন শিলাতলে ধাতুরাগে কল্পনা-
তাহার মোহিনী মূর্ত্তি আঁকিয়া, মানিনীর চরণ ছুঁইয়া মান ভাঙ্গিতেছে;
। বহুকষ্টে প্রিয়তমার স্বপ্নে সন্দর্শন পাইয়া, আকাশে বাহু তুলিয়া
ঢ় গাঢ় আলিঙ্গন করিতে যাইতেছে। আবার দেখ, মালিনীতীরে
সাস্পদ সেই কণ্বাশ্রম, প্রতিভা এবার বনবালা শকুন্তলা সাজিয়া, দিব্যা-
অঙ্গপ্রসাধন করিয়া, শোকাকুলা, হর্ষান্বিতা, পতিগৃহাভিমুখে চলি-
স্নেহাসারে বর্দ্ধিত তরুলতা, শাখাবাহু প্রসারিয়া তাহাকে আলিঙ্গন
ছে, বনবাসসুহৃৎ বিহঙ্গকুল তাহাকে কোকিলকুহরণে সম্বর্দ্ধনা
ময়ূরী দর্ভকবল ভুলিয়া অনিমেষ চাহিয়া আছে, সযত্নরক্ষিত মৃগ-
ল টানিয়া গমনের প্রতিরোধ করিতেছে। তাই বলিতেছিলাম,

প্রতিভা বহুরূপী, তাহার ইয়ত্তা করিবে কে? আমি পূর্ব্বে
গ্রীক্ জলদেব প্রোতুসের তুলনা করিয়াছি; কিন্তু বুঝিয়া
বড় সমীচীন নহে। প্রবাদ আছে, প্রোতুস সাগরকূলে
করিতেন। তিনি বরুণদেবের মেষপালক ছিলেন,
মেষের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকিত। প্রত্যহ মধ্য
সংখ্যা গণিয়া তিনি (বোধ হয় শ্রান্তিবশতঃ) নিদ্রিত হই
সময় কেহ সাহসে ভর করিয়া, এই নিদ্রাবিভোর প্রোতুসকে বাঁ
পারিত, তাহা হইলেই তাঁহার 'বহুরূপিত্ব' ঘুচিয়া যাইত, তিনি ধরা
পরের করায়ত্ত হইয়া স্বরূপপ্রকটনে বাধ্য হইতেন। কবিপ্রতিভার
বাঁধনের কোন সদুপায় নাই? কোন অতর্কিত অচেতনের মুহূর্ত্তে, এইরূ
টিপিয়া নিভৃতে অজ্ঞাতে চাঞ্চল্যময়ী বহুরূপিনী প্রতিভামোহিনীকে
করিবার উপায় নাই? হায় এ দুরাশা! তন্ত্রে এমন মোহন ম
যাহাতে এই প্রতিভার চাঞ্চল্য প্রতিরোধ করা যায়, জগতে এমন স
গীতি নাই, যাহাতে ইহাকে মুহূর্ত্তের তরেও নিদ্রাবিভোরা করা যায়।
ইহাকে বাঁধিব কেমন করিয়া, তবে ইহার স্বরূপ প্রকটিত করিয়া বহুরূ
ঘুচাইব কেমন করিয়া? প্রতিভা যে বহুরূপিনী, প্রতিভার যে ইয়ত্ত

এই প্রতিভার ফল কাব্য, অশরীরী প্রতিভার ফল শরীরী কাব্য,
বহুরূপিনী, সুতরাং তাহার ফল কাব্যও বহুরূপী।

তাই কাব্যের সমালোচনা নানাভাবে হইতে পারে; ভাব, ভাষা,
কৌশল, চরিত্রসৃষ্টি, শব্দবিন্যাস, ছন্দের ঝঙ্কার, এ সকল কথাই
করিয়া আলোচিত হইতে পারে। 'কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থ
ইহা এক ধরণের সমালোচনা। আবার 'ভারতের কালিদাস জগতে
ইহা আর এক ধরণের সমালোচনা। কিন্তু আমার মনে হয়, সমালোচ
শয়েরা সময়ে সময়ে একটা ক্ষুদ্র ভুল করেন। তাঁহারা ভাবেন যে, ভাব,
উপমাকৌশল, চরিত্রসৃষ্টি, শব্দবিন্যাস, ছন্দের ঝঙ্কার, ইহাদের পৃথক্
কল্পনা করা যায়, অতএব ইহারা বাস্তবিক পৃথক্। ইহারা এক মূলের
প্রশাখা, এক দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ইহারা যে এক অদ্বিতীয় কারণসম্ভূত,
তাঁহারা সময়ে সময়ে ভুলিয়া যান। বহুদিন পূর্ব্বে শ্বেতকেতুর ঋষি
সরল শিশুকে শিখাইয়াছিলেন যে, ঐ মহান মহীরুহ-কাণ্ডে শাখ
পত্র, ফল, মূল—সকলই গুটাইয়া, অতি ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে লুক্কা

শিশু বীজ ভাঙ্গিয়া দেখিল, শূন্য, কিছুই নাই; তাহার ভিতর যে
রা উৎপাদিনী মহাশক্তি—যাহা সাকার মহত্তম মহীরুহের জননী—
ছে, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। আমরাও এইরূপ সময়ে সময়ে
ই যে, মহাকবির প্রতিভার অভ্যন্তরে নিরাকারা উৎপাদিনী মহা-
হা সাকার ভাষা, ভাব, উপমাকৌশল, চরিত্রসৃষ্টি, শব্দবিন্যাস, ছন্দের
ভৃতির জননী—প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রতি বীজে শক্তির স্বরূপ বিভিন্ন,
গতে এত বৈচিত্র্য। প্রতি প্রতিভায় শক্তির স্বরূপ বিভিন্ন, তাই
ত এত বৈচিত্র্য। এই শক্তিই প্রতিভার মূলতত্ত্ব, ইহা লইয়াই
াতন্ত্র্য; তাই কালিদাস সেক্ষপীয়র নহেন। এক জন বিজ্ঞ ইংরাজ
চক এই ধরণের গুটিকয়েক কথা বলিয়াছেন। কথাগুলিতে আমার
াবশ্যক আছে, তাই উহার ভাবার্থ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—
াচক * প্রথমে ধীরভাবে সমালোচ্য কাব্যের সকল লক্ষণ পরীক্ষা
-ঘটনা পরম্পরার অনুধাবন করেন; তাহার পর মূল তত্ত্বে উপনীত
গ্রসর হন। কারণ ঐ ঘটনাপরম্পরা পরস্পরসম্পৃক্ত, সজীব, একতা-
তাহারা এক মূল কারণের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই মূলতত্ত্ব কি
একতা বিধান করে? ইহা কোথায়ও হৃদয়ব্যাপী ভাব, কোথায়ও

'hen the student of literature has obtained a faithful
ion of the object he * * darts forward to discover
governing the phenomena which he has observed.
: not isolated phenomena; they belong to an organic
hey are determined by the law of its life. What then
.w? Sometimes the unity of a work of literature or
und in a single dominant conception; sometimes in a
ıt passion; sometimes in a single lawtoned mood of
* * * In each case we form a hypothesis as to
ve of the composition and endeavour to colligate the
er that hypothesis. Should our hypothesis fail to
...eject it and to try another and yet
pretation of Literature.

উৎকট বাসনা, কোথায়ও অকঠোর ঔদাস্য, ইত্যাদি। সকল সমালোচক একটা কল্পনাসিদ্ধান্ত hypothesis এই মূল তত্ত্বরূপে করেন; যদি এই কল্পনাসিদ্ধান্তের সহিত সকল ঘটনার, সক সমাবেশ হয়, ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত, ইহাই যথার্থ মূলতত্ত্ব; অন্যথা কল্প

কালিদাস ও সেক্ষপীয়রের মহাপ্রতিভারও মূলতত্ত্ব আছে তাঁহাদের প্রতিভাপ্রসূত কাব্যেরও ঘটনাপরম্পরা পরস্পরসংপৃক্ত একতাবিশিষ্ট, অর্থাৎ এক মূল কারণের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই মূ ইহাই এই প্রবন্ধের বিষয়।

কোনও তত্ত্বে উপনীত হইতে হইলে, প্রধানতঃ দুইটি প্রণালীর করিতে হয়। (ক) অধিরোহণপ্রণালী (Induction); (খ) অবরোহ (Deduction)। প্রথম প্রণালীর অবলম্বনে ঘটনাপরম্পরার ভিতর সামঞ্জস্য ধরিতে হয়, পরে সৌসাদৃশ্যগুলি একদিকে করিয়া বিশে অন্যদিকে স্থাপন করিতে হয়; তাহার পর এই সকল হইতে একটা উপনীত হওয়া যায়। ইহাই অধিরোহণপ্রণালী। বিজ্ঞানে এই ভূয়ঃপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়। অবরোহণপ্রণালী ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অনুমান ও যুক্তির সাহায্যে একটা কল্পনাসিদ্ধান্ত খাড়া করিতে ইহার সহিত সকল ঘটনার সমাবেশ ও অবিরোধ লক্ষিত হয়, তবে এ সিদ্ধান্ত স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। দর্শনশাস্ত্রে এই প্রণাল আদৃত। আর ইতিপূর্ব্বে যে ইংরাজ সমালোচকের কথা উদ্ধৃত তিনিও এই প্রণালীরই বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ, তাঁহার মতে ভার মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে হইলে, এই অবরোহণপ্রণালীর করিতে হয়।

আমার মনে হয়, কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি; তাঁহার প্রতি অমানুষী সৌন্দর্য্যদৃষ্টি; আর সেক্ষপীয়র মানুষতার কবি; তাঁহার মূলতত্ত্ব অমানুষী কল্পনাশক্তি। এ সকল কথার অর্থ কি, আমরা প্রস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীহীরেন্দ্র

সহজাত-সংস্কার।

২

াসের 'সাহিত্যে' সহজাতসংস্কার-সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছি,
এইরূপ বুঝায় যে, সহজাতসংস্কারবাদীরা জীবের যে সকল কার্য্য
নির্দ্দিষ্ট প্রবৃত্তি বা সংস্কারমূলক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, সে সকল
ন শিক্ষার ফল, এবং কতক প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-সিদ্ধ। সহজাত-
াদীরা ইহাতে একটা আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন, মনুষ্যই যেন
গৃহনির্ম্মাণ করিতে অন্যের কাছে শিখে, পাখী ত আপন নীড়নির্ম্মাণ
কাহারও কাছে শিখে না। স্বজাতীয় কোন পক্ষীকে নীড়রচনা
দেখিয়া থাকুক বা না থাকুক, স্বজাতীয় নীড় পর্য্যন্ত দেখিয়া থাকুক
কুক, প্রত্যেক পক্ষী আপন জাতীয় নীড় অবিকল নির্ম্মাণ করিয়া
স্বজাতীয় কাহাকেও নীড়রচনা করিতে দেখে নাই বলিয়া,
কোন নীড় দেখে নাই বলিয়া, কোন পাখীর নীড়রচনায় জাতীয়তার
ত ঘটে না। সহজাত-সংস্কার-কল্পনা ব্যতীত এ বিষয়ের অন্য ব্যাখ্যা
হইতে পারে?

বিক যদি এইরূপ হইত, তাহা হইলে ইহার দ্বারা সহজাত-সংস্কারের
য প্রমাণীকৃত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ যে হইয়া
াহার প্রমাণ কৈ? বিষয়টাকে পরীক্ষাধীন কখন করা হয় নাই।
াত-সংস্কারবাদীরা বিনা-পরীক্ষায় বিনা-প্রমাণে কথাটা স্বীকার্য্যই
রিয়া লইয়া থাকেন। পক্ষীজাতির সম্বন্ধে যে দুই চারিটা কথা জানা
তাহা কিন্তু এরূপ অনুমানের বিরুদ্ধ। যে সকল পক্ষী ডিম্ব-কাল
খাঁচার ভিতরে পরিপোষিত হইয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের জাতীয়
র্ম্মাণোপযোগী উপকরণ দিলেও, তাহারা স্বজাতীয় নীড়-রচনা করে
না। অনেক সময়ে আদৌ নীড়-নির্ম্মাণ করে না;—উপকরণগুলি কোন
প্রকারে স্তূপীকৃত করিয়া, এক প্রকার কদর্য্য রকম শয্যা রচনা করে মাত্র।
যাঁহারা পক্ষী-চরিত্র বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচনা করিয়াছেন,

তাঁহাদের মধ্যে অনেকের মত এই যে,কোন শ্রেণীর পক্ষীর সকলেই ঠি
প্রকার নীড় নির্ম্মাণ করে না। মারকীন পক্ষীতত্ত্ববিদ্ উইলসন
বলেন যে, একই শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন পক্ষীর নীড়ে রচনার তারতম্য প
হইয়া থাকে। বয়সের তারতম্য অনুসারে নীড়ের উৎকর্ষাপক
থাকে। নবীন পাখীদিগের রচিত নীড় অপেক্ষা, প্রাচীন পাখীদে
নীড় অধিকতর উৎকর্ষসমন্বিত হয়। সুইজরলণ্ড-দেশীয় বিখ্যাত জী
পণ্ডিত লেরয় সাহেব লিখিয়াছেন—"অল্প বয়সের পাখীর রচিত নীে
পকর্ষ স্পষ্ট দেখা যায়। যে সকল শ্রেণীর পক্ষীর শাবক অধিক ি
মধ্যে যাপন করে, সুতরাং নীড়ের গঠন পর্য্যবেক্ষণ করিতে অধিক সম
তাহারাই উৎকৃষ্টতম নীড় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। নবীন পাখীর
নীড়ের অবস্থান ও গঠন প্রায়শঃই ভাল হয় না; ক্রমে অসুবিধা ভোগ
যেমন যেমন তাহারা শিক্ষালাভ করে, তেমনি নীড়েরও উৎকর্ষ সাধি
ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যনির্ম্মিত গৃহের ন্যায়, একই শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন পক্ষীর
নীড়েও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আমরা ভাল করিয়া দেখি না বলিয়
কালব্যাপী ধারাবাহিক পর্য্যবেক্ষণ করি না বলিয়া, নীড়রচনায় উন্নি
দেখিতে পাই না।"

এই সকল পণ্ডিতদিগের কথা যদি সত্য হয়—মিথ্যা মনে করিবা
কারণ দেখা যায় না—উইলসন্, লেরয়, পূশে প্রভৃতি প্রাণীতত্ত্বা
দিগের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পক্ষীর নীড়রচনা সম্বন্ধে
সংস্কার-কল্পনার স্থল ত থাকে না। যে কার্য্যের উৎকর্ষাপকর্ষ ব
শিক্ষাধীন, সে কার্য্যকে সহজাত-সংস্কারমূলক বলি কি বলিয়া?

এক্ষণে কথা এই যে, পক্ষীর কুলায়রচনা যদি শিক্ষাধীনই হয়,
শিক্ষা তাহারা পায় কোথা হইতে—পায় কাহার কাছে—পা
করিয়া? ইহার উত্তরে প্রথমতঃ বলা যাইতে পারে যে,
নীড়ে অবস্থানকালে নীড়ের আকার, গঠন, অবস্থান, উপকরণ,
ভাল করিয়া দেখিবার যথেষ্ট সময় পায়। তাহার পর, পরবর্ত্তী বস
যখন কুলায়-রচনার প্রয়োজন হয়, আহার্য্যের অনুসন্ধানে নীড়নির্ম্মাণের
করণ সহজেই প্রাপ্ত হয়, কেন না যে পক্ষীর পক্ষে যাহা সহজলভ্য, সে পক্ষ
সেই উপকরণেই নীড় রচনা করিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখাইয়াছি।
তার পর, ইহাই খুব সম্ভব যে, বসন্তাগমে বয়োধিক পক্ষীগণই অগ্রে কুলায়

করিতে আরম্ভ করিবে, কেন না ডারউইনের প্রদর্শিত হিসাবে
াই অগ্রে সঙ্গিনীলাভ করিবে, সুতরাং নীড়নির্ম্মাণের প্রয়োজন
াই আগে হইবে। এই সকল বয়োধিক পক্ষীর অনুষ্ঠিত পদ্ধতি
নবীনেরা নীড়ের ভিত্তিসংস্থাপন এবং উপকরণ-বিন্যাসের কৌশল
ই শিখিয়া লইতে পারে। সম্ভবতঃ করেও তাই।

য়টার ব্যাখ্যা আরও একরূপে করা যাইতে পারে। এই ব্যাখ্যাকল্পে
রিচার্ডস্‌প্রাশের কতকগুলি কথা এইখানে উদ্ধৃত করা যাউক।
াখিয়াছেন ঃ—আমেরিকার পেরু এবং ইকুইয়েডর প্রদেশের আদিম
াসীদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে প্রাচীনা স্ত্রীলোকের
যুবা পুরুষের এবং যুবতী স্ত্রীলোকের সহিত প্রাচীন পুরুষের
হয়। এই প্রথার ব্যাখ্যা স্বরূপ তাহারা বলিয়া থাকে যে, দম্পতীর
উভয়েই সংসারানভিজ্ঞ হইলে সংসারযাত্রা সুচারুরূপ নির্ব্বাহিত হইতে
না; পক্ষান্তরে, সুচারুরূপে সংসার-ধর্ম্ম-পালনের জন্য উভয়েই সংসারা-
হওয়া নিষ্প্রয়োজন। ইতর জীবদিগের মধ্যেও অনেক স্থলে এইরূপ
ঘটিয়া থাকে। যে সকল জীবের পুরুষেরা স্ত্রীলাভের জন্য পরস্পর যুদ্ধ
তাহাদিগের মধ্যে ত ঘটেই, কেন না যুবতী এবং সুন্দরীলাভের জন্যই
; সুতরাং যাহারা বয়োধিক, সুতরাং পুষ্টদেহ ও অপেক্ষাকৃত সবলকায়,
আপনাদের মনের মত যুবতীদিগকে বাছিয়া লয়; আর যাহারা অল্প-
সুতরাং অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলকায়, তাহারা হয় সঙ্গিনীলাভে একেবারে
হয়, না হয় বিগতযৌবনা স্ত্রীর সহিত মিলিত হইতে বাধ্য হয়। গৃহ-
কুক্কুট, ব্ল্যাক-বার্ড প্রভৃতি অনেক শ্রেণীর পক্ষীর মধ্যে এইরূপ
-সংঘটন ঘটিয়া থাকে। পেরু ও ইকুয়েডর প্রদেশের আদিম অধি-
গর মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপে বিবাহবন্ধনের যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্য এ সকল
সংসিদ্ধ হয়। প্রত্যেক মিথুনের এক জন জ্ঞাতরহস্য বলিয়া অপরের
া-ধর্ম্ম-শিক্ষা সহজেই ঘটে। পক্ষীর নীড়-নির্ম্মাণ-শিক্ষা এই উপায়েও
পারে। সম্ভবতঃ হইয়াও থাকে।

সহজাত-সংস্কার-মূলক কার্য্যের আর একটি চলিত উদাহরণ—পাখীর
গান। প্রত্যেক পক্ষী আপন জাতীয় গানই গাহিয়া থাকে, অতএব আমরা
ধরিয়া লই যে, ইহাও সহজাত-সংস্কারমূলক। পাখীর গান সম্বন্ধে অনেক
পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ইহা পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে,

জন্মাবধি না শুনিলে পাখী আপন জাতীয় গান গাহিতে শিখে না ; যে জ
পক্ষীর সহিত লালিত হয়, সেই জাতীয় পক্ষীর গানই শিখিয়া গ
অনেরবল্ ডেনিস্ ব্যাংরিটন এ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা (Experi
করিয়াছিলেন। পরীক্ষা করিয়া তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত
ছেন ;—পাখীর গানকে যদি সহজাত-সংস্কার-মূলক বলিতে হয়, তাহা
মানুষের ভাষাকেও তাহাই বলিতে হয়। মানুষ আপনার ভাষা যেমন
শিখে, পাখীও তাহার গান তেমনি শুনিয়া শিখে—যাহা গোড়া হইতে
তাহাই শিখে। ইনি কতকগুলি 'লিনেট' পক্ষীকে চাতকের সঙ্গে
করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাহারা চাতকের গানই শিখিয়াছে, স্বজা
গানের কিছুমাত্র অনুকরণ করে নাই। ইহার পর সেই 'লিনেট' পা
তিন মাস কাল তাহার স্বজাতীয় পাখীর সংসর্গে রাখা হইয়াছিল, তথাপি
চাতকের গানই ধরিয়া রহিয়াছে, স্বজাতীয় গানের ত্রিসীমায় যায় নাই।
একটা লিনেট পাখীর বয়স যখন দুই তিন দিন মাত্র, তখন তাহাকে
হইতে সরাইয়া মনুষ্যাবাসে রাখা হইয়াছিল। সে আপনার জাতীয় গা
বিন্দুবিসর্গও কখন উচ্চারণ করে নাই ; কেবল মনুষ্য-ভাষার "বেশ ছে
(Pretty boy) এবং আরও দুই চারিটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য ব্যবহার ক
একটা চড়াই পাখীর বৃত্তান্ত আরও আশ্চর্য্য। সে, একটা 'লিনেট'
একটা 'গোল্ডফিঞ্চ' পাখীর সহিত রক্ষিত ও লালিত হইয়াছিল। ব
হইয়া এই চড়াই পাখীটা 'লিনেট' ও 'গোল্ডফিঞ্চের' গানই গাহিত।
মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, চড়াই পাখী স্বাভাবিক অবস্থায়
গান করে না, কেবল কিচির মিচির করে মাত্র। এ সকল অপেক্ষা
সুন্দরতর পরীক্ষার কথা হার্বার্ট সাহেব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন
বুলের (Nightingale) মতন মধুর গান ত আর কোন পাখীর নাই
বুলবুলও অতি শৈশবকাল হইতে অন্য পাখীর সহিত লালিত হইয়া ত
গান শিখিয়াছে ; স্বজাতীয় অমন মোহন গানেরও কখন আবৃত্তি কা
চেষ্টা করে নাই। আরও অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারিতাম,
তাহা নিষ্প্রয়োজন। যে সকল কথা বলা হইল, তাহাতেই বুদ্ধিমান পা
বুঝিতে পারিবেন যে, পাখীর গান সহজাত-সংস্কার-মূলক নহে।

ইতর জীবের বন্যাবস্থার অনেক সংস্কার, তাহারা গৃহপালিত হইলে, পরি-
বর্ত্তিত হইয়া যায়। গৃহপালিতাবস্থায় তাহারা এই নূতন অবস্থার উপযোগী

সংস্কারও উপার্জ্জন করে। কুক্কুট, মেষ এবং শূকরশিশুকে আক্রমণ
া কুকুরের স্বভাব। গৃহপালিত কুকুর প্রায় কখন ইহাদিগকে আক্র-
। না। এ স্থলে অবশ্যই বলিতে হয় যে, কুকুরের বন্যাবস্থার সংস্কার
।তাবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কুকুরের মনুষ্য-প্রীতি যে একটা
ত সংস্কার, তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না—মনুষ্যের সংসর্গে আসি-
অবশ্যই এই সংস্কার উপার্জ্জন করিয়াছে। আবার দেখা যায় যে,
।বং বিড়ালকে ভয় করা বন্য কুক্কুটের স্বাভাবিক সংস্কার। গৃহপালিত
।হারা এই সংস্কার হারাইয়াছে। তাহারা যে একেবারে ভয়শূন্য
.ছ, তাহা নহে; কেবল কুকুর ও বিড়ালকে আর ভয় করে না। এই
দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, অবস্থার পরিবর্ত্তন নিবন্ধন পুরাতন
র পরিবর্ত্তিত হয়, এবং নূতন সংস্কার উপার্জ্জিতও হয়। সহজাত-সংস্কার-
রা, বোধ হয়, এগুলিকে সহজাত-সংস্কার বলিবেন না, কেন না, তাঁহাদের
কথাই এই যে, সহজাত-সংস্কার অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু ইতর জীবের যে
কার্য্যকে তাঁহারা সহজাত-সংস্কারমূলক বলেন, তাহাতেও যে পরিবর্ত্তন
থাকে, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে।

তর জীবে, এ সকল ছাড়া কতকগুলি বিশেষ সংস্কার দেখা যায়। এক
পিপীলিকা আছে, তাহারা অন্য পিপীলিকাকে আপনাদের দাসত্বে
করে। এমন কি, দাস-পিপীলিকা ব্যতীত এই সকল প্রভু-পিপীলিকা-
জীবনযাত্রা নির্ব্বাহও হইয়া উঠে না। ইহা অবশ্যই একটি বিশেষ
। কোকিল এবং আরও কোন কোন পক্ষী, আপনাদের ডিম্ব অন্য
বাসায় রাখিয়া দেয়;—তাহাদের শাবক অন্য পক্ষীর দ্বারা লালিত
বিশেষ সংস্কারের ইহা আর একটি উদাহরণ। এই সকল বিশেষ
র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; সেরূপ বিচারের
।রণা করিলে, পাঠকবর্গের বোধ হয় ভালও লাগিবে না। সেই জন্যই
ত প্রবৃত্ত হইলাম না। অথচ, এই সকল বিশেষ সংস্কারের কিঞ্চিৎ
।বিবৃতি না দিলে, প্রবন্ধ বোধ হয় অঙ্গহীন হয়। একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাউক্।
কোকিল যে আপনার ডিম্ব অন্য পক্ষীর বাসায় রাখিয়া দেয়, ডার-
উইন সাহেব প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন নিয়মের দ্বারা এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করিবার
প্রয়াস পাইয়াছেন। কোকিল মাত্রই কিছু পরের বাসায় ডিম্ব রাখিয়া দেয়
না। মারকীন কোকিল নিজে নীড় নির্ম্মাণ করে, এবং আপন অপত্য আপনি

লালন করে। ডারউইন সাহেবের মত এই যে, সকল কোকিলই গে
এই প্রকৃতির ছিল, অর্থাৎ আপন শাবক আপনি পালন করিত। এ
কর, চপলতাবশতঃ বা ঘটনাক্রমে কোন কোন কোকিল সময়ে স
একটা ডিম্ব অন্য পাখীর বাসাতে রাখিয়া দিয়াছে। এইরূপ করা
লাভ হইয়াছে। কোকিল দিন দিন ডিম্ব প্রসব করে না, দুই তি
অন্তর এক একটি ডিম্ব প্রসব করে; সুতরাং একই সময়ে ডিম্ব এব
লইয়া বিব্রত হইতে হয় বলিয়া, প্রচুর আহার্য্যসংগ্রহের হয় ত ব্যাঘা
অন্য পক্ষীর নীড়ে ডিম্ব রাখায় হয় ত শাবক প্রচুর আহার্য্য পায়,
হিসাবে কোকিলের এইরূপ কার্য্য অবশ্যই লাভজনক। লাভজনক
প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন-নিয়মে এই প্রবৃত্তির পুষ্টিসাধন এবং স্থায়িত্ববিধান
থাকে, এবং সম্ভবতঃ ঘটিয়াছে। বিশেষ সংস্কারের একটিমাত্র দৃষ্টান্ত ও
করিলাম। সকলগুলির উল্লেখ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্য

যোধপুরের পত্র।

ভগবানের কৃপায়, বড় সুখে বড় সম্মানে, যোধপুর দর্শন করিয়া আ
কাল যে কার্ড লিখিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছ, যোধপুরের এঃ সুপারি
পণ্ডিত জীবানন্দের সহিত লাহোর যাইবার সময়ে রেলে সাক্ষা
আর একটি লোক আম্বালার কামীশরিয়েটের ছিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার ং
পের পর, তাঁহারা এত প্রীত হন যে, উভয়ে আমাকে আম্বালা ও যো
যাইতে নিতান্ত অনুরোধ করেন। আম্বালায় যাইতে পারিলাম না।
যোধপুরে পণ্ডিত জীবানন্দের কাছে টেলিগ্রাফ করি। ষ্টেসনে পৌছিয়া
দেখি, রাজার বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বাবু হরীশচন্দ্র মিত্র, মান্দ্রাজ 'এথিনিয়ম'
পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, আমার অপেক্ষা করিতেছেন। পণ্ডিতের বাড়ী
পঁহুছিয়া দেখি, আমার অভ্যর্থনার জন্যে একটি কক্ষ সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া

রাখিয়াছেন। তিনি এবং রাজার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হরদয়াল সিংহ—ইনি কাউনসেলেরও মেম্বর—এক বাড়ীতে থাকেন। ইঁহারা দু'জন যে কি আদর করিলেন, বলিতে পারি না। দুই বেলা পরিপাটি আহার। বসিতে হয় আসনে, কিন্তু থাল থাকে একখানি অতি সুন্দর চৌকির উপর। থাল রূপার, তাহার উপর সমুদয় রূপার বাটি সাজান রহিয়াছে। চামচ দিয়া তরকারী লইয়া খাইতে হয়। রান্না পাঞ্জাবী ধরণের। কারণ, ইঁহারা পাঞ্জাবী।

সন্ধ্যার সময়ে, হরদয়াল সিংহ আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, রাজার ভ্রাতা ও মন্ত্রী কর্ণেল সার প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান। আমরা জানিতাম যে,কেবল নরাধম সিবিলিয়ানগুলোই বুঝি খোসামুদির প্রিয়। কিন্তু দেখিলাম, এ রাজাদের কাছে তাহারা কোথায় লাগে। হরদয়াল সিংহ আমাকে ইহার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। আমি যদিও একার্য্যে অনভ্যস্ত, তথাপি সেই সুরে বীণা বাঁধিয়া আলাপ করিলাম। তিনি এত সন্তুষ্ট হন যে, অপরাহ্ণে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যায়াম দেখিতে বলেন। আমি নূতন রাজবাড়ী দেখিতে যাই। সম্মুখের একটি বাড়ীতে—এটিই শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা—শুনিলাম, রাজার উপপত্নী থাকেন এবং রাজা দিন রাত্রি এখানেই পড়িয়া থাকেন। তাহার পশ্চাতে অন্তঃপুর মহল। তাঁহার মহিষী কয়েক জন তাহাতে আবদ্ধ আছেন। রাজকার্য্যের সম্যক ভার প্রতাপসিংহের হস্তে, তিনিই প্রকৃত রাজা। নূতন রাজবাড়ী, আমাদের চক্ষে কিছুই লাগিল না। তবে নূতন যে একটি কার্য্যালয়বাড়ী হইতেছে, তাহা অতি জাঁকাল রকমের। ফিরিয়া আসিয়া প্রতাপসিংহের কাছে বসিয়া অশ্বক্রীড়া দেখি। মাড়ওয়ার রাজ্যের সর্দ্দারদিগের শিশুদিগকে পর্য্যন্ত তিনি অশ্বারোহণে শিক্ষা দিতেছেন। খোকার অপেক্ষা ছোট ছোট শিশুরাও নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটাইতেছে। প্রতাপসিংহকে দেখিলে, রাজপুতকুলতিলক হিন্দুগৌরবসূর্য্য প্রতাপ সিংহকে মনে পড়ে। লোকটি দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু তেজ যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। শুনিলাম, ইনি জীবন্ত ব্যাঘ্রের দন্ত উৎপাটন করেন! তাঁহার ডান হাতে এক ব্যাণ্ডেজ এবং ডান পায়ে অন্য ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে। তদ্রূপ তাঁহার পারিষদবর্গেরও হস্তে, পদে, চক্ষে, ব্যাণ্ডেজ শোভা পাইতেছে। সকলেই ঘোড়া হইতে পড়িয়া আহত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিবে যে, ইহারা কিরূপ অশ্বারোহণে ব্রতী। সন্ধ্যার পর, জ্যোৎস্নালোকে আবাসে ফিরিয়া আসি।

পরদিবস প্রাতে যোধপুরের দুর্গ দেখিতে যাই। একটি প্রায় চন্দ্রনাথের

মত উচ্চ শৈলের সর্ব্বাঙ্গ এবং এক পার্শ্বের উপত্যকা আবৃত করিয়া দুর্গ-প্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। উপত্যকায়, যোধপুরের গৃহাবলী অসংখ্য হংসমালার মত শোভা পাইতেছে। শৈলশৃঙ্গ ব্যাপিয়া দুর্গের অট্টালিকা। এই দুর্গ ও নগর, তুমি জান, যোধাসিংহ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাই ইহার নাম যোধ-পুর। শৈলশেখর যেরূপ স্তরে স্তরে উর্দ্ধে উঠিয়াছে, সেইরূপ স্তরে স্তরে অট্টা-লিকা নির্ম্মিত হইয়াছে; তলার উপর তলা উঠিয়া গগনস্পর্শী বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া,মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিতেছে। ইহার কক্ষগুলি অনতি-বিস্তৃত, কারণ তাহারা পুরাতন, কিন্তু সুচিত্রিত ও সুসজ্জিত। তবে ইংরাজি সাজ সজ্জার তত বাড়াবাড়ি নাই! একটি কক্ষে একটি রজত-দোলা রজত-শৃঙ্খলে দুলিতেছে। তাহার পশ্চাতে এক বিরাট আরসি। যখন যোধ-পুরাধিপতি এই দোলায় দুলিতে থাকেন, ভুবনমোহিনী মহিষীগণ কেহ বা অঙ্কে বসিয়া আছেন, কেহ বা চন্দ্রকে ঘেরিয়া তারামালার মত চারিদিকে দোলা আলো করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ বা অলঙ্কার-ঝনৎকারে কক্ষ পূর্ণ করিয়া তালে তালে দোলাইতেছেন; দুলিতেছে রূপসী, দোলাইতেছে রূপসী, তখন কি প্রতিবিম্বই না জানি আরসীতে প্রতিভাত হয়! ইচ্ছা হয়, আরসী হইয়া একবার সে রূপতরঙ্গের প্রতিবিম্বমাত্রও অনুভব করিয়া জীবন সার্থক করি। চটিতেছ না ত? কিন্তু কি নরকুলাঙ্গারই যোধার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। এহেন রাজপুরীতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি কতকগুলা অশ্বশালার মত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে উপপত্নী লইয়া বিরাজ করিতেছেন, রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কও নাই।

দুর্গদ্বারে কি পবিত্র দৃশ্য! রাজপত্নীগণ সহমরণে যাইবার সময় হস্তে যে চন্দন মাখিয়া স্বামীর শবের সঙ্গে দুর্গের বাহিরে শ্মশানে যাইতেন, দুর্গের বাহির হইবার সময়ে, তাহার দুই পার্শ্বের প্রাচীরে পবিত্র করপদ্মের চিহ্ন রাখিয়া যাইতেন। আমাদের সঙ্গে 'পাওনিয়ারের' সংবাদদাতা একটি সাহেব ছিলেন। তিনি গণিলেন, এরূপ ৩২টি কর-চিহ্ন আছে। কিন্তু আহা! কি অযত্নে পড়িয়া আছে। আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। আমি সাহেব-টিকে বলিলাম—"তোমার 'পাওনিয়ার' পত্রিকা আমাদিগকে অজস্রধারায় গালি দিতে পারে, কিন্তু এই যে পুরাতন ঐতিহাসিক কীর্ত্তি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে; এই যে পবিত্র আত্মবিসর্জ্জনের নিদর্শন সকলের একটি টেবলেট্ মাত্রও নাই, ইহার প্রতি কি তোমাদের কখনও চক্ষু পড়ে না? কোন্ কোন্

সাধ্বী এরূপে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাদের নামের একটি তালিকা ও ঘটনার কাল, এস্থানে কি রাখা কর্ত্তব্য নহে? এস্থানটি একটি পবিত্র তীর্থের মত কি রক্ষিত হওয়া উচিত নহে? এই দুর্গে কত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার অঙ্গে কি সে সকল লিখিত থাকা উচিত নহে?* সাহেব লজ্জিত হইয়া বলিলেন,এই প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, যে এরূপে তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিল। তিনি ১৩ বৎসর ভারতে কাটাইয়াছেন, কই কেহ ত এরূপ কথা বলেন নাই। তিনি এখন ভারত ছাড়িয়া যাইতেছেন, তথাপি ইহা ভুলিবেন না। তিনি এত প্রীত হইলেন যে, বরদার সহকারী মন্ত্রীর কাছে, আমার সাহায্যের জন্যে, এক পত্র দিলেন, এবং বম্বে গেলে, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে অনেক করিয়া বলিলেন। রাজার জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারী, এরূপ কথা শুনিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং এবিষয়ে তিনি মনোযোগী হইবেন, বলিলেন। তাহার পর, সেই তিন সহস্র ফুট উচ্চ শৈল-শেখরের উপরে অশ্বপদাঘাতে প্রস্তরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুলিয়া, আমরা রাজার প্রকাণ্ড একখানি যুড়িতে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

আসিবার সময়ে, পণ্ডিত জীবানন্দ, শ্বেত-প্রস্তরের দুই সেট চার পেয়ালা ও রেকাবি দিলেন। তাঁহার এবং হরদয়াল সিংহের ফটোগ্রাফ দিলেন। উক্ত সাহেব এবং হরিশ বাবু রাজার যুড়িতে আমাদিগকে ট্রেণে উঠাইয়া দিলেন। ষ্টেসনে আবার প্রতাপ সিংহের সঙ্গে দেখা। তাঁহার এক জন শরীররক্ষককে দিল্লীর সৈন্য-ব্যায়ামে যোগ দিবার জন্যে পাঠাইতে আসিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, তুমি যোধপুরে অতি অল্প সময় থাকিয়া চলিয়া যাইতেছ, আবার আসিও। আমি বলিলাম, আপনার অনুগ্রহ থাকিলে

---

* ইংরাজেরা কি আমাদের জাতীয় গৌরবের স্মরণ-চিহ্ন রক্ষা করিতেও বাধ্য? যোধপুরের দুর্গে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছে, কি আমাদের গৌরব করিবার মত কিছু আছে, সে সকল জিনিস গুছাইয়া রাখা, আমাদেরই কর্ত্তব্য। সে জন্য, অন্য জাতির কাছে আবদার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তবু ইংরেজের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, কেন না তাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া ভারতের অনেক কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছেন। আর ইংরেজ ঐতিহাসিক টডের কল্যাণেই আমরা আমাদের প্রতিবাসী রাজপুত জাতির ইতিহাস জানিতে পারিয়াছি। "যাহাদের নিজের জাতীয় গৌরব রক্ষা করিবার ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি নাই, তাহাদের সে জন্য বিজেতার কাছে ভিক্ষা করা কেন?"—'পাওনিয়রের' সংবাদদাতা এ কথা বলিলে, আমাদের ভ্রমণকারী মহাশয় নিশ্চয়ই নিরুত্তর হইতেন।—সাহিত্য-সম্পাদক।

আসিতে পারি। যাহা লিখিলাম, তাহাতে বুঝিবে, কি সুখে ও সম্মানে ভারতের পশ্চিম প্রান্তের যোধপুর দর্শন করিয়া গেলাম।

তারাচরণ বলিতেছেন, আমি লিখিতে ভুলিয়াছি যে, যোধপুর দুর্গে এক সুবর্ণরঞ্জিত কক্ষ ও সুবর্ণ ও রজতে নির্ম্মিত সিংহাসন দেখিয়াছি।

জীব-প্রকৃতি।

অনেকে পশু পক্ষী পুষিতে ভাল বাসে, অনেকের একেবারেই পছন্দ হয় না। যাহারা পুষে, তাহারা কি কেবল লাভের আশায় পুষে? গোরু, ঘোড়া, হাঁস, মুরগী পুষিলে লাভ আছে বটে, কুকুর পুষিলে গৃহরক্ষা বা শিকারে সাহায্য হয় বটে, প্রভাতে পাখীর গানে হৃদয় তৃপ্ত হয় বটে, নির্জ্জন-চিন্তার সময় স্বজাতির সহবাস সহিতে পরাঙ্মুখ প্রকৃতিতে কেনারীর মধুর রব দূরপ্রবাহিত কুসুমগন্ধের ন্যায় হৃদয় পুলকিত করে বটে, তথাপি কেবল লাভের আশায় সকলে ইহাদিগকে প্রতিপালন করে না। টিকেট, ফটোগ্রাফ, প্রস্তর বা মুদ্রার ন্যায়, অসাধারণ লব্ধ পশুপক্ষী সংগ্রহে কাহারও অনুরাগ জন্মে। এ অনুরাগ চিন্তামূলক, ভাবমূলক নহে। পশু পক্ষীর আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণের জন্যও কেহ এ সকল প্রতিপালন করেন, তাহাও চিন্তামূলক। কিন্তু এ প্রকার চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎসু লোকের সংখ্যা অতি অল্প। শিশুরা অনেকেই পক্ষীপ্রিয়—সে প্রিয়তা ভাবমূলক। বন্ধ্যা-নারীর অনুরাগও এইরূপ। ইহারা হৃদ্‌গত স্নেহ প্রয়োগ করিবার পাত্র অভাবে পশু পক্ষী পালন করিয়া আনন্দলাভ করে। মুনি ঋষির মৃগপক্ষী প্রতি ঐকান্তিক স্নেহ ও মুগ্ধানুরাগ এইরূপেই উদ্দীপিত হয়। আবার কোনও কোনও সংসারীর ভাবপ্রবণতা এত অধিক যে, পুত্র কন্যা ভ্রাতা ভগিনীতে তাহা পর্য্যাপ্ত হয় না। বস্তুতঃ পশুপক্ষীপ্রিয়তা সাধারণতঃ ভাব-প্রবণতার পরিচায়ক, আত্মম্ভর, স্বার্থপর, কঠোরপ্রকৃতি, স্বজাতির সহবাস সহিতে পরাঙ্মুখ প্রকৃতিতে পশুপক্ষীর স্থান কোথায়?

বন্ধ্যা নারী প্রায়ই বিড়ালপ্রিয় হয়। গৃহপালিত পশু শ্রেণীতে বিড়াল শেষসন্নিবিষ্ট বলিয়া তাঁহাদের ইহার প্রতি স্নেহ জন্মে, বোধ হয় না। প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য হেতু এই অনুরাগ। বিড়ালের মত অকর্ম্মণ্য স্বার্থপর বিলাসপ্রিয় জীব, বোধ হয়, আর নাই। সুখে খাইবেন, সুখে শুইবেন, আলস্য বিলাসে দিন অতিবাহিত হইবে, সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্যে অঙ্গ ঝক্‌মক্ করিবে, উভয়ের নিরন্তর বাসনা। খাইলেন কি না খাইলেন, মুখে কিছু লাগুক বা না লাগুক, বিড়াল অবসর পাইলেই কোমল হস্তে একবার মুখখানি পরিষ্কার করিয়া লন। পালঙ্কে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায়, দিনে নিশীথে উভয়ের বিশ্রাম। ঘন দুগ্ধ ও সুমিষ্ট মৎস্য ব্যতীত কাহারও আহার হয় না, আবার অন্যের সংসর্গ উভয়েরই ঘৃণিত। বালকবালিকার কল কাকলি, পরিজনের প্রফুল্ল হাস্য, আনন্দ সঙ্গীত সঙ্গতি কাহারই রুচিকর নহে। বিশাল প্রাসাদে নির্জ্জনে দুই জনে দাস দাসীর সেবায় আলস্যে দিনপাত করিতে পাইলে বড়ই সৌভাগ্য মনে করেন—শীতের বাতাস, বর্ষার কাদা উভয়েরই পরিত্যজ্য, ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে না হইলেই দুইজনে সুখী হয়; বোধ হয়, চক্ষু মেলিয়া স্পষ্ট করিয়া চাহিবার কষ্টও উভয়ের দুর্ব্বহ।

উভয়েই সমান প্রাচীনতাপ্রিয়। পরিবর্ত্তন, নূতনতা উভয়েরই অসহ্য। মানুষ কুকুরকে যথেচ্ছভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। কুকুর মানুষের মত খোসামুদী করিতে জানে, সুখ, দুঃখ চীৎকার করিয়া প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে, বলবান শত্রুর নিকট সাষ্টাঙ্গে অবনত হইয়া প্রাণ ভিক্ষা করিতে শিখিয়াছে, এবং দুর্ব্বল শত্রু পাইলেই তাহার প্রাণহরণে উদ্যত হয়। মানুষের মত সেও মান লজ্জা ঘৃণা ভয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, এবং সুবিধা পাইলেই প্রতারণা করে। বিড়ালে এ সকল পরিবর্ত্তনের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিসরের রাজ-প্রাসাদে তাহার যে চাল-চলন ছিল আজিও বাঙ্গালার পর্ণগৃহে তাহাকে তেমনি দেখা যায়। কুকুর উত্তেজনাপ্রিয়, আদরপ্রিয়, সংসর্গপ্রিয়। দু'দণ্ড একাকী থাকিতে হইলেই তাহার কষ্ট হয়। দশজনের একজন হইয়া আগে আগে চলিতে, দশজনের সুখ দুঃখে অংশ লইতে তাহার বড় সাধ। বিড়াল আত্মপ্রিয়, আপনাতেই নিমগ্ন, তোমার যাহা হয় হউক, তাহার দুধভাত ও বিশ্রামে ব্যাঘাত না হইলেই সে পরিতৃপ্ত। কখন যদি বসিবার ঘরে আসিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে তোমার গায় দু'বার লেজ বুলাইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, সে তাহার কোন মৎলব সিদ্ধি করিবার জন্য,

তোমার হর্ষ বিষাদে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য নহে। হয় ত লোকের বরাত, তাহার আদরের অভাব হইয়াছে, তাহাই জানাইবার জন্য ; না হয়, তোমার কোলে উঠিয়া দু'দণ্ড ঘুমাইবার জন্য। কুকুরকে লোকে মানুষের নাম বলিতে শিখাইয়াছে, তাসের রং চিনাইয়াছে, আপনার মুখ দেখিতে শিখাইয়াছে, ক্ষুধা বা তৃষ্ণা প্রকাশ করিতে শিখাইয়াছে। তামাসা দেখাইতে লোকে কুকুরের সাহায্য লইয়াছে, কিন্তু বিড়ালের সাহায্য কখন পায় নাই।

বিড়ালের আহার, নিদ্রা ও ক্রীড়ার সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। একটি কাজের সময়ও সে কখনও অন্য কাজ করিবে না। বন্ধ্যার তাসখেলা কি দিবা-নিদ্রার এক দিন ব্যাঘাত হইলে সে দিন পৃথিবীতে আর কাহারও রক্ষা নাই। অহঙ্কৃত আত্মম্ভর বিড়ালের নবাবী চাল-চলন, বিপদ সম্পদ কিছুতেই বিগ-ড়াইবার নহে। যতক্ষণ তুমি বিড়ালের ক্রীড়াসামগ্রী, বিড়াল তোমার সহিত খেলা করিবে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে বুঝিতে পারিবে,তুমি তাহাকে লইয়া খেলা করিতেছ, সে তোমার দিকে একবার কঠোর ঘৃণার সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া খেলা বন্ধ করিয়া দিবে। আপনার গর্ব্বের উপর দাঁড়াইয়া বলিবে, তুমি কুলীনকুমারীর মর্য্যাদা জান না, বড় ঘরের সংসারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

বিড়াল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। পৃথিবীর সুখ দুঃখে সে টলে না। লজ্জা ভয় মান অপমানে তাহার ঘৃণা ভক্তি লোভ দ্বেষ কিছুই নাই। সে কখন দুঃখ প্রকাশ করে না, তাহার চক্ষের জল কেহ কখন দেখে না। মারিলেও সে কাঁদে না, আদর করিলেও সে হাসে না। হাসি কান্না পরিব্রাজক ভিক্ষুর নহে, মোহাচ্ছন্ন মনুষ্যের জন্য। অবলার একমাত্র পুত্র বিনাশে বন্ধ্যার কখন দীর্ঘশ্বাস পতিত হয় না, চক্ষের জল অনেক দূরের কথা।* এই গুণেই মিসরের দার্শনিকেরা বিড়ালকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত।

---

* লেখক মহাশয়, বন্ধ্যা নারী ও বিড়ালের প্রকৃতির তুলনা করিয়া, আমার মতে, বন্ধ্যা নারীর প্রতি অবিচার ও সমবেদনার অভাব প্রকাশ করিয়াছেন। বন্ধ্যা নারী মাত্রের প্রকৃতিই যে স্বার্থপরতা ও আত্মসুখকামনায় পূর্ণ, ইহা কখনও স্বীকার করা যায় না। বিড়াল জাতির যেমন কতকগুলি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম আছে, নারী বন্ধ্যা হইলেই যে তাহার স্বভাবেও কতকগুলি সেইরূপ ধর্ম্ম আরোপিত হইবেই, স্বভাবের এমন কোনও বিধি নাই। সাধারণ মানব-প্রকৃতির সহিত, ব্যক্তিগত বিশেষত্বের প্রভেদ দেখা যায়, কিন্তু ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে কখনও মানব-প্রকৃতির সাধারণ ধর্ম্ম বলা যায় না। অনেক পুত্রবতী নারীও বন্ধ্যার অপেক্ষা অধিক স্বার্থপর হইতে পারেন। এ তুলনাটা অনেক দিন চলিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু ইহার মূলে যে কোনও সত্য আছে, তাহা বোধ হয় না। কাহারও

বালকে বিড়ালকে কুকুরের অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। বোধ হয়, কুকুর সকল শ্রেণীর সকল জাতির নিকট স্নেহ পায়। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে কুকুর সর্ব্বপ্রাচীন। প্রাচীন ভৃত্যের ন্যায় এমন প্রভুভক্ত জীব আর নাই। কুকুর মনুষ্যের সেবার জন্য আপনার সকলি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে গৃহপ্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত, কুকুর সর্ব্বত্র মনুষ্যের সাহায্য করিয়াছে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে প্রহরীকার্য্যে, এটিলা, স্বজাতীয় হুনদিগের অপেক্ষা কুকুরদিগকে অধিক বিশ্বাস করিতেন। সৈন্যগণ পাহাড়িয়াদিগকে পর্ব্বতগহ্বর হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে অক্ষম হইলে, মাকিদানপতি ফিলিপ কুকুরদিগকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, আমেরিকার বন্যদিগকে পরাজয় করিতে স্পেনবাসীরা সৈন্য অপেক্ষা কুকুরের নিকট অধিক সাহায্য লাভ করিয়াছিল। রাজ্ঞী এলিজা-বেথের রাজত্বকালে, আরল অব এসেক্স আট শত কুকুর লইয়া আইরিশ বিদ্রোহিদিগকে দমন করিয়াছিলেন। জার্ম্মান ও রুষেরা, কুকুরদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদিগের ন্যায় রীতিমত প্রহরীকার্য্যে অদ্যাবধি নিযুক্ত করিয়া থাকে।

গৃহপালিত পশুদিগের অধিকাংশ অলস ও উত্তেজনাশূন্য। আহারে উদর পূর্ণ করিয়া এক জায়গায় পড়িয়া জাগর কাটিতে বা ঝিমাইতে তাহা-দের জীবন অতিবাহিত হয়। যা কিছু উদ্যম বা পরিশ্রম, সে কেবল আহার ও পানীয় সংগ্রহ করিতে। কুকুর ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন নিরলস ভৃত্য সংসারে আর নাই। আর কোন কাজে পরিশ্রম এবং উত্তেজনার সুবিধা না থাকিলে, সে অপর কোন একটি জীবকে অবলম্বন করিয়া ক্রীড়া করিবে। কিছু না পাইলে, একটা কাঠি বা এক খণ্ড শুষ্ক পত্র পাইলেও তাহার চলে।

বিড়ালের ন্যায় কুকুরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে—তবে বিড়াল যেমন অবিবাহিতা কুমারী কি বন্ধ্যা রমণীর মত নিরন্তর টাউয়েল ও

পুত্রের মরণে বন্ধ্যা নারীর বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না, ইহা কোনও সাধারণ সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে। আমাদের দেশের অনেক বন্ধ্যা নারীকে, পরের ছেলে লইয়া, নিজের ছেলের মত, মানুষ করিতে দেখা যায়। কোনও কোনও বন্ধ্যা নারী লেখকের কল্পিত বন্ধ্যা নারীর আদর্শ হইতে পারেন, তাহা বলিয়া, বন্ধ্যা নারীমাত্রের প্রতি হৃদয়হীনতার আরোপ করা, কিম্বা স্বার্থপরতা ও হৃদয়হীনতাকে বন্ধ্যা নারী মাত্রের প্রকৃতির সাধারণ ধর্ম্ম বলা, অন্যায় ও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।—সাহিত্য-সম্পাদক।

ব্রুস লইয়া নাক কান মুখ সর্ব্বদেহ পরিষ্কার করে, কুকুরের তত সৌখিনতা নাই, এই গুণেই বিড়ালের নাম মার্জার হইয়াছে। কুকুর, পুরুষ মানুষের মত চলনসই পরিচ্ছন্ন হইলেই তৃপ্তি বোধ করে। বিধাতা, পরিচ্ছন্নতার জন্য সকল জীবকেই এক একটি উপায় করিয়া দিয়াছেন। বিড়ালের, খরগসের ও আপোশমের থাবা টাউয়েলের ও স্পঞ্জের কার্য্য করে, এতদ্ভিন্ন জিহ্বা চিরুণীর মত আঁচড়াইতে ব্যবহৃত হয়। পক্ষীচঞ্চু, চিরুণী ও তৈলাধারের কার্য্য করে। ইহারই সংযোগে পক্ষীরা পালকগুলি ঝাড়িয়া বাছিয়া তৈল দিয়া চক্‌চকে করে। সিলদিগের সম্মুখের পায়ে এক একখানি চিরুণী আছে। ইহা কখনও তাহারা পাখার ন্যায় ব্যজনকার্য্যে ব্যবহার করে। বারনম একটি সিলকে তানপুরা বাজাইতে শিখাইয়াছিলেন, সে ইহা দিয়াই তালে তালে তানপুরার তারে আঘাত করিত। সিংহ ও ব্যাঘ্র, বিড়ালের মত জলে থাবা ভিজাইয়া স্নান করে। বালহাঁসেরা লোণা জল খায়, কিন্তু স্নানের জন্য অলবণ জল মনোনীত করে, এবং তজ্জন্য বহুদূরে যাইতেও কুণ্ঠিত হয় না। চকোরীরা স্নানের জলের একটু বেশী বাছাবাছি করে, সদ্যসিঞ্চিত বৃষ্টিজলে তাহাদের বিশেষ অনুরাগ।

মহম্মদ ব্যবস্থা দিয়াছেন, জলের অভাবে বালুকায় স্নানাদি নির্ব্বাহ হইতে পারে। ভরদ্বাজ, চকোর, চটক ও শ্যেন পক্ষী ধূলায় স্নান করে। কাক ও কপোতেরা অতি প্রত্যূষে স্নানকার্য্য সমাপন করিয়া অন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। শ্যেন পক্ষী অতি লজ্জিত ও সঙ্কুচিতভাবে স্নান করে, যেন কেহ দেখিলে সে বে-আবরু হইয়া যাইবে। যাহারা ধূলায় স্নান করে, তাহারা সযত্নে পরিষ্কার ধূলা বাছিয়া লয়। কুকুরেরা জিহ্বা দ্বারা দেহ পরিষ্কার করে, কখন কখন খড় ও শুষ্ক পত্রও ব্যবহার করিয়া থাকে। স্নানের জন্য ইহারা কখন জল, কখন বা পরিষ্কার ধূলা ব্যবহার করিয়া থাকে। পীড়িত বা পরিশ্রান্ত না হইলে, কোন কুকুর অপরিষ্কার থাকে না।

বিড়াল প্রতারণা করিতে জানে না, এমন নহে। তুমি যখন সাবধান হইয়া আহারে নিযুক্ত থাক, বিড়াল তখন কাছে বসিয়া এমনি ভাবে থাকে, যেন বড় নিদ্রাতুর, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তুমি অন্যমনস্ক হইবে, সে তোমার পাতের মাছখানি লইয়া অন্তর্দ্ধান করিবে। হরিহরছত্রের সন্ন্যাসীর মত তাহার মুদিত চক্ষু আড়চাহনীশূন্য নহে। একজন ভদ্রলোক একটি বৃহৎ পারস্যদেশীয় বিড়াল পুষিয়াছিলেন। পাড়ার বিড়ালেরা বড় বিরক্ত করিত। এ জন্য

ভদ্রলোকটি মাঝে মাঝে তাহাদিগকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন—এই সময় ঐ পারসিক বিড়ালটি গায়ের লোম ফুলাইয়া ভালুকের মত তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দিত; দেখিলে বোধ হইত, যেন ধরিতে পারিলে সে তাহাদিগকে ছিঁড়িয়া ফেলে। এটি সব ফাঁকী, ভদ্রলোকের বাড়ী হইতে প্রতিদিন আহার্য্য লইয়া শম্ভু খুড়ার মত সে প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে গোপনে সেই দরিদ্রদিগকে খাওয়াইয়া আসিত। এরূপ সদয় ব্যবহার বিড়ালের প্রায় দেখা যায় না। আর একটি বাটীতে, একটি সজারু ও একটি বিড়াল থাকিত। সজারু ইঁদুর খায়, বিড়াল পূর্ব্বে জানিত না। বিড়ালধৃত একটি ইঁদুর গৃহস্বামী যখন প্রথম দিন সজারুকে খাইতে দেন, বিড়াল বড়ই রাগ করিয়াছিল। তাহার পর সে ইঁদুর ধরিলেই সজারুকে খাইতে দিয়া আসিত। ইহাতে বিড়ালের অহঙ্কার ও স্বরক্ষণস্পৃহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

বিড়াল যখন গায়ে লেজ বুলাইয়া পায়ের কাছে মেও মেও করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, আমার দেখিলে বোধ হয়, যেন কায়স্থের বাড়ী ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন, তবু কুলীনতা ছাড়েন নাই। পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন, "দেহি পদপল্লব" বলিবেন না—ভিক্ষা চাহিবেন না; বলিবেন, এক সের চাউল ধার দেও।

বিড়ালের ব্যবহারে ভদ্রতার বড় অভাব। কুকুরের তোষামুদীও যেন ভদ্রতামিশ্রিত। সে ভিক্ষা চাহিতে স্পষ্ট চাহিবে, পরাজয় স্বীকার করিতে স্পষ্ট স্বীকার করিবে—আধখানা পেটে আধখানা মুখে নহে। যখন পথে যাইতে যাইতে একটা কুটা কি একটা পাতা মুখে করিয়া আনিয়া তোমার পায়ের কাছে রাখিয়া মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবে—মনে হইবে, ক্যালের নয় জন বীর গলায় কুঠার বাঁধিয়া দেশের স্বাধীনতা প্রার্থনা করিতেছে। কুকুরেরা প্রভুর নিকট অপরিষ্কার অবস্থায় দেখা করিতে লজ্জা করে, প্রভুভক্তির সহিত তাহার আত্মসম্মান-জ্ঞান থাকে। হার্পার সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার একটি কুকুর আছে, সে কখনও প্রভুর আগে আহার করে না; তিনি বাড়ী না থাকিলে কি অন্য কোন কারণে আহারে বিলম্ব হইলে, কুকুরকে খাইতে দিলেও সে খায় না, প্রভুর অপেক্ষায় বসিয়া থাকে। তাঁহার আহার শেষ হইলে, তবে সে আহার করে।

কুকুরের উপস্থিতবুদ্ধি সামান্য নহে। এক রেলওয়ে কর্ম্মচারীর একটি

কুকুর ছিল; সে প্রভুর সঙ্গে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে যাইত। এক দিন কুকুরটি একটি পুলের উপর বেড়াইতেছে, এমন সময় একটি ট্রেন আসিয়া পড়িল। পলাইবার পথ না দেখিয়া কুকুরটি ট্রেনের নীচে শুইয়া পড়িল। তাহার উপর দিয়া ট্রেন চলিয়া গেলে সে উঠিয়া পলাইল। সেই অবধি সে সহজে পুলের উপর যায় না।

ফ্রান্সদেশে একটি দরিদ্রাশ্রমে দরিদ্রদিগকে খাইতে দেওয়া হইত। যথা-সময়ে দরিদ্রেরা আসিয়া, একটি দড়ি ধরিয়া ঘণ্টা বাজাইলে, একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়া একসরা আহার্য্য ভিতরের লোকেরা বাহির করিয়া দিত। সেখানে একটি কুকুর ছিল। সে উচ্ছিষ্টের প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিত। কিন্তু দরি-দ্রের উচ্ছিষ্ট সুলভ নহে। তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইত না। অবশেষে এক দিন কুকুরটিও দাঁড়াইয়া মুখে দড়ি ধরিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া এক সরা আহার্য্য সংগ্রহ করিল। সেই অবধি সে নিত্য এইরূপ করিত। অবশেষে গৃহস্বামী জানিতে পারিলেও, তাহার চতুরতায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকেও দরিদ্রশ্রেণীতে গণ্য করিয়া লইয়াছিলেন।

স্পেক্টেটার নামক বিলাতী সংবাদপত্রে কুমারী কব লিখিয়াছেন, বালা-মগরের নিকট বিরলস গ্রামে শ্রীমতী প্রাইসের দুটি কুকুর আছে, তাহারা মা ও মেয়ে। সম্প্রতি একদিন সেই বড় কুকুরী শ্রীমতীর নিকট যাইয়া এত কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল ও কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল যে, তিনি তাহার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, প্রায় এক পোয়া পথ আসিতে একটি খরগসের গর্ত্ত হইতে তিনি ছোট কুকুরীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাই-লেন। সে খরগস অন্বেষণে প্রবেশ করিয়া গর্ত্তমধ্যে চাপা পড়িয়াছিল। তখন সেই বিবি চাকর ডাকিয়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া কুকুটিকে রক্ষা করিলেন। বড় কুকুরটি তাঁহাকে অমন করিয়া ডাকিয়া লইয়া না যাইলে, ছানাটির পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবনা ছিল না।

কুকুর অন্য জন্তুকেও স্নেহ করে। একটি সাহেব মারিয়া ফেলিবার জন্য একটি বিড়াল ছানাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। নিকটে তাঁহার কুকুর ছিল, সে অমনি জলে ঝাঁপ দিয়া ছানাটিকে তুলিয়া আনিল। সাহেব আবার তাহাকে ফেলিয়া দিলেন, সে আবার তাহাকে তুলিল। সাহেব পুনরায় ফেলিয়া দিলে, সে ছানাটিকে লইয়া অন্য পারে তুলিয়া, মুখে করিয়া একেবারে বাড়ী পলাইয়া উনুনের আগুনের ধারে লইয়া গরম

করিল এবং রাত্রে আপন বিছানায় শোয়াইল। তদবধি তাহারা দু'জনে একত্র থাকে।

কুকুরের বুদ্ধি ও স্নেহ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা শুনিয়াছেন। সুতরাং আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

প্রাইভেট টিউটার।

বিজয়ের প্রথম পত্র।

১

মন্মথ,

আমি বোসজার মেয়েকেই পড়াচ্ছি। মাসে ১২৲ বারটি টাকা মাইনে পাই, তাতেই একরকম চলে যাচ্ছে।

কেমন আছি, জিজ্ঞাসা করেছ। আছি ভাল;—তোমার মত ভগিনী-পতি, এই সুখের চাকরী; দুঃখ কিসের বল? তবে এক অভাব এই যে, কিছুতেই আমি তোমাদের মত কবি হতে পাল্লেম না। যাই হোক্, এবার থেকে চেষ্টা করে দেখ্‌ব,—যদি কারও প্রেমে পড়্‌তে পারি,—কবি হতে পারি। প্রেমিক জীবনটা যদিও সুখের বলে মনে হয় না, তবু তোমাদের সহানুভূতি পাবার আশায়, আমি বিরহের যন্ত্রণা সহিতেও রাজী আছি।

আমার ছাত্রীটি বড় শান্ত মেয়ে। বয়স বছর বার তের হবে। কায়েত বামুনের ঘরে আজ কাল মেয়ে বড় হয়েও আইবুড় থাকে,—নীলাম ডেকে বর না কিন্‌তে পাল্লে ত আর মেয়ের বিয়ে হয় না। তা', বসুজার টাকার অভাব নাই বটে, কিন্তু পছন্দমত বরও ত জোটা চাই?

আমি যে ঘরে পড়াই, তার সুমুখের ঘরেই সরলার দাদারা পড়ে,—পাশের ঘরে বসুজার বৈঠকখানা। সকালে তিনি এই ঘরে বসে নিরিবিলি খবরের কাগজ পড়েন, মাঝে মাঝে ছেলেদের ও মেয়েটির পড়াশুনার খবরও নিয়ে থাকেন। আমি এই তিন বছর সরলাকে পড়াচ্ছি। এর মধ্যে সে বেশ উন্নতিও করেছে।

আচ্ছা, মন্মথ, তুমি কি মনে কর? সরলার মত শান্ত শিষ্ট সুন্দর মেয়েটির কি রকম বর হবে? আমার ভাই ধ্রুব বিশ্বাস, সরলা যার হাতে পড়্‌বে, সে বাস্তবিকই কপালে পুরুষ। শুধু রূপ বলে নয়, আমি রূপের তত পক্ষপাতী নই,—কিন্তু গুণ ও হৃদয় যাকে বলে,—তা' ভাই! সরলার যেমন আছে, এমন আর কারও আছে কি না, জানি নে।

আজ এখনও সরলা পড়্‌তে আসে নি; তাই বসে বসে তোমায় চিঠি লিখ্‌ছি। রোজ ত এমনই সময়েই সে আসে, আজ এত দেরী কর্চ্ছে কেন, কে জানে।

তুমি কেমন আছ হে? আমাদের কথা মনে পড়ে—না, সংসারের কোলাহলে পড়ে ক্রমে সব ভুলে যাচ্ছ?

তোমার বিজয়।

সরলার প্রথম পত্র।

২

শ্রীচরণকমলেষু—

বড় দিদি, তুমি চিঠি লিখিতে বলিয়াছ, আর এত দিন লিখি নাই বলিয়া রাগ করিয়াছ। কিন্তু ভাই আমি যে মনের দুঃখে আছি, তাহা আর কি বলিব। বাঙ্গালীর ঘরে কেন মেয়ে হয়? দেখ ভাই, মেয়ে না হলে মা-বাপের এত ভাবনা হইত না। আচ্ছা দিদি, বিয়ে কি না হলেই নয়? মা আমার বিয়ের ভাবনা ভেবে ভেবে শুকিয়ে যাচ্ছেন, বাবারও এক তিল বিশ্রাম কি সোয়াস্তি নেই। আমার মরণ হলেই বাঁচি।

তোমার পায়ে পড়ি, তুমি একথা যেন আর কাকেও বলিও না। ভুবন বাবুকেও এ চিঠি দেখিও না, তিনি যেন এ চিঠি না পড়েন। তোমার পায়ে পড়ি, পড়েই ছিঁড়ে ফেল। তোমরা কেমন আছ, লিখিবে। খোকা কেমন আছে, নূতন ঝি কেমন আছে, তাহা লিখিবে। তোমার শাশুড়ী কি এখনও তোমায় তেমনই বকে? তুমি বল, তোমার শাশুড়ীর বকুনির জ্বালায় তুমি ঝালাপালা হয়েছ; আমার কিন্তু বুড়ীর বকুনির কথা মনে পড়লেই হাসি পায়। তুমি আমার প্রণাম জানিবে।

অধিনী

সরলা।

সুমতির প্রথম পত্র।

৩

সরলা,

তোর চিঠি পড়ে হেঁসে মরি। আগে বিয়ে হোক, তখন তাকে চিঠি লিখে, অভাগিনী বলে নাম সই করিস্। বড় বোনকে চিঠি লিখে নাম সই করিবার সময় কি লিখিতে হয়, জানিস্ নি?—তুই অত বড় বিদ্বানী, বাবা বাড়ীতে মাষ্টার রেখে পড়াচ্ছেন, আজও এক খানা চিঠি লিখ্‌তে শিখ্‌লি নি? কেবল ইংরাজী পড়ে মেম হচ্ছিস্ বুঝি?

তোর বিয়ে হতে দেরী হচ্চে বলে কত দুঃখই করেছিস! হবে লো হবে, অত ব্যস্ত কেন? মা-বাপের কাজ মা-বাপ কর্‌বেন, তোর অত মাথাব্যাথা কেন? স্পষ্ট কথা বল্ যে এখনও আইবুড় আছিস্, তাই দুঃখ করে চিঠি লিখেছিস্। তোমার ভাবনা নেই বোন, শীগ্‌গির তোমার বিয়ে দিতে, আমি মাকে চিঠি লিখ্‌ছি।

তোমার ভগিনীপতি যে রসিক, তাঁকে আর চিঠি দেখাব কি? প্রাণটা গেল, এমন লোকের হাতেও পড়েছিলাম। এত দিনের পর, এই বুড়ো বয়সে, একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়ম কিনে রাত দিন বাজান হচ্ছে, তার ক্যাঁ-কোঁ-শব্দে পাড়া শুদ্ধ লোকেই অস্থির, তা' খোকাকে ঘুম পাড়াব কি? আবার আমাকেও বলেন শিখ্‌তে। মুখে আগুন!

ও সরলা, তোর মাষ্টারের ভগিনীপতি মন্মথ বাবু, পরিবার নিয়ে এসে, আমাদের বাড়ীর পাশে বাসা করেছেন। আমার সঙ্গে তোর মাষ্টারের বোনের ভাই! বড় ভাব হয়েছে। কিন্তু জানই ত তোমার ভগিনীপতি কেমন সদালাপী, তিনি গম্ভীর হয়েই জন্ম কাটালেন,—লোকের সঙ্গে আলাপ প্রণয় তাঁর অদৃষ্টে আর এ জন্মে ঘটিল না। এঁর সঙ্গে মন্মথবাবুর তেমন মেশামিশি হয়নি, আলাপ আছে, এইমাত্র।

খোকার কাল থেকে গা গরম হয়েছে। তোরা সকলে কে কেমন আছিস, লিখিস্। বাবা, মা, দাদাদের আমার প্রণাম জানাইবে, তোমরা আশীর্ব্বাদ জানিবে।

আশীর্ব্বাদক,

সুমতি।

মন্মথ বাবুর প্রথম পত্র।

৪

প্রিয় বিজয়চন্দ্র,—

তোমার চিঠি পাইলাম। তুমি "কবি" হবে বলে ভয় দেখাইয়াছ, কিন্তু তাহার আর বাকি কি? তোমার পত্রে রূপবর্ণনার দৌড়টা কিছু বেশী; আর তোমার অন্তর্দৃষ্টিটাও যেন কিছু অধিকমাত্রায় বেড়েছে বলে বোধ হচ্ছে। আর একটা কথা এই যে, "প্রেম" নিয়ে অত রঙ্গ করিও না। তোমার কঠিন মন, নহিলে তুমি প্রেম লইয়া উপহাস করিতে না। আজ হেসে উড়িয়ে দিচ্ছ বটে, কিন্তু কাল তুমি ধরা পড়্‌তে পার। রবীন্দ্রবাবুর "মায়ার খেলা" দেখেছ? তাতে বেশ একটি গান আছে,—

"প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
কে কোথায় ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সরব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।"

বড় ঠিক কথা। অতএব, প্রেমিক কি বিরহবিধুর হবার জন্যে তোমায় বড় একটা চেষ্টাচরিত্র করিতে হইবে না। হয় ত সে আপনি হবে, আর তোমায় ভরসা দিতেছি যে, তখন আমাদের কাছে তুমি সহানুভূতি পাবে। কেন না, মানবপ্রকৃতির প্রতি আমাদের তত বিরুদ্ধভাব নেই।

আচ্ছা, তোমার চিঠিতে, তোমার ছাত্রীর অত কথা কেন? আমাদের কাছে সেই কুমারীর রূপগুণের অত বিস্তারিত বিবরণ পাঠানই বা কেন? এখন, সূর্য্যমুখী, কমলমণি, কুন্দ, শান্তি, এমন কি দেবী চৌধুরাণী (সেই ব্রহ্মচর্য্য ও ঘড়া ঘড়া মোহর সমেত) প্রভৃতি বঙ্কিম বাবুর মানসী মেয়েদের যদি বিয়ের কনে বলে, আমাদের কাছে কেউ নিয়ে আসে, তা' হলেও আমরা ফিরে চাইনে। আমাদের যা আছে, তাই ভাল। কুমারীদের বর্ণনা আর আমাদের কাছে কেন?

যা হোক্—এবার তোমাদের বাড়ীর খবর সব স্পষ্ট করিয়া লিখিবে। তোমার ছাত্রীর কথা আমরা শুন্‌তে চাইনে।

আমার চিঠিখানা তোমার নিতান্তই অপছন্দ হবে। নূতন যায়গায় এসেছি, কিছু নূতন খবরের আশা তুমি করিতে পার। এখানে একটি নূতন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তিনি তোমার ছাত্রীর ভগিনীপতি

ভুবন বাবু। যা তুমি বলেছিলে সত্য হে! কেবল থ্যাকারের গল্প,—অসহ্য! —অসহ্য!—থ্যাকারে না হলে যেন দুনিয়া চল্‌তো না। কিন্তু থ্যাকারে ধন্য যে, তাঁর এমন ভক্ত পাঠক জন্মেছেন! ভুবন বাবুর প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যও দেখা আছে, বিদ্যাপতির কিছু কিছু মুখস্থ। আর তাঁর বিদ্যাপতি পড়িবার ভঙ্গীটুকুও একটু নূতনতর। যাই হোক, এই মেড়ুয়া-মহলে ভুবনবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়ে, ভাই বাঁচা গেছে। কথা ক'য়ে, আর সুদীর্ঘ সমালোচনা শুনে, এই প্রবাসে বিকেল বেলাটা এক এক দিন এক রকম কেটে যায়।

তোমার মন্মথ।

সরলার দ্বিতীয় পত্র।

৫

শ্রীচরণকমলেষু,—

দিদি, তোমার রঙ্গ দেখে মরিতে ইচ্ছা করে। তোমার বিয়ের আগে বুঝি তুমি "বিয়ে বিয়ে" করে পাগল হয়েছিলে? সত্যই বুঝি তুমি ওসব কথা মাকে কিছু লিখেছ! মা কাল বলিতেছিলেন,—"মেয়ে এত বড় হয়ে উঠ্‌লো, আজও বিয়ে হোল না, ভেবে ভেবে, সরলা আমার শুকিয়ে যাচ্ছে।" কি লজ্জা! তুমি কেন এমন কাজ কল্লে? তোমায় আমি আর চিঠি লিখ্‌বো না।

আমি, না হয় ইংরেজী পড়ে মেম হয়েছি; "অধিনী" লিখে দোষ করেছি। তুমি যদি লোহারামের বাঙ্গালা ব্যাকরণ থানাও মাষ্টারের কাছে পড়্‌তে পেতে, তা হলে "আশীর্ব্বাদক" না লিখে "আশীর্ব্বাদিকা" লিখিতে। আর লেখা পড়া শিখ্‌লেই বুঝি "বিদ্বানী" বলে ঠাট্টা কত্তে হয়। তোমাদেরও ত মাষ্টারনী পড়িয়ে যেত। আমার মত মাষ্টার পেতে ত তুমিও বেঁচে যেতে। পাওনি, তাই বুঝি হিংসা হয়েছে?

মাষ্টার মহাশয়ের বোনের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে শুনে, মাষ্টার মহাশয় কত আহ্লাদিত হ'লেন। তার নাম হরিদাসী, নয়? আচ্ছা দিদি, হরিদাসী কেমন দেখ্‌তে? বোনের মুখে যদি ভাইয়ের মুখের আদল এসে থাকে, তা' হলে বোধ হয়, হরিদাসী ভাইয়ের মত বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ, ছোট্ট কপাল খানি, পাতলা ঠোঁট, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল পেয়েছে। এদিকে

কেমন?—হরিদাসী, মাষ্টার মহাশয়ের মত সাদাসিদে ও শান্ত-শিষ্ট কি না, লিখিবে।

আমরা সকলে ভাল আছি। তোমরা কেমন আছ লিখিবে। খোকা কি সারিয়াছে?

সরলা।

ভুবন বাবুর পত্র।

৬

সরলে!

তোমার সরল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে তুমি সুমতিকে যে পত্র লিখেছিলে, তাহা দৈবাৎ আমার হস্তগত হয়। বলা বাহুল্য যে আমি তাহা পড়িয়াছি।

"পহিল হি বরষ না পুরল সাধ।"

তোমার অতৃপ্ত হৃদয়ে অনেক আশা জাগিতে পারে। কিন্তু সরলে! সাবধান, এ পৃথিবীতে সকলের সব আশা পূর্ণ হয় না।

থ্যাকারের —নভেলে একটি চরিত্র আছে। সেও তোমার মত প্রথমে তাহার মাষ্টারকে স্নেহচক্ষে দেখিত। শেষে তাহাকে ভাল বাসিয়া বেচারী কি কষ্টই না সহ্য করিল। সে তবু বিলেতে। আমাদের এই পতিত ভারতে, বিশেষ এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে, প্রেম ত জন্মগ্রহণ মাত্রেই প্রেমিকের প্রাণসংহার করে। তাই বিদ্যাপতি বলিয়াছেন,—

"হরি হরি পীরিতি না কর জনি কোই।"

তুমিও মাষ্টারকে স্নেহচক্ষে দেখিতে দেখিতে চাই-কি ভাল বাসিতে পার। কিন্তু তোমাদের মিলন অসম্ভব। আমার সন্দেহ হয় যে, হয় ত তুমি নিজের অজ্ঞাতসারে, মাষ্টারকে ভাল বেসে ফেলেছ। কিন্তু তোমার বাপ তোমায় কখনও গরীবের হাতে সমর্পণ করিবেন না। অতএব সাবধান! লক্ষ্মি, তুমি নিজের মন বাঁধিতে চেষ্টা কর।

আমিও প্রথম বয়সে প্রাইভেট টিউশন কত্তে গিয়ে, একটি ছাত্রের ভগিনীকে ভাল বাসিয়াছিলাম। কখনও কখনও তাহাকে চকিতের মত দেখিতে পাইতাম, এই মাত্র। তাহার সহিত কখনও কথা পর্য্যন্ত কহি নাই। কিন্তু সে অতৃপ্তি এখনও হৃদয়ে জাগিতেছে। পুরুষের কঠিন প্রাণে যে প্রেম এত দাগ রাখিয়া যায়, নারীর কোমল প্রাণ যে তাহাতে ক্ষত-

বিকৃত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? আমার কথাগুলি অপ্রীতিকর বোধ হইতে পারে, কিন্তু সরলে! "হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ।"

তোমার হিতকাঙ্ক্ষী

শ্রীভুবনচন্দ্র মিত্র।

বিজয়ের দ্বিতীয় পত্র।

৭

প্রিয় মন্মথ,

তোমার পত্র পাইয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। তুমি চিঠিপত্রে আবার তর্ক তুলিতে চাও। কিন্তু আমি তাতে নারাজ, জানিবে। কেন না, আজ কাল আমি তর্কে বড় প্রস্তুত নই। আটঘাট বেঁধে কথা কওয়া, এখন বড় কষ্টকর বলে মনে হয়। সেই যখন প্রথম বয়সে, আমাদের "সাহিত্য-সমাজে" তর্ক শুনতে যাওয়া যেত, সেই এক দিন, আর এই এক দিন! আমার সেই তখনকার তর্কযুদ্ধ মনে পড়িলে, এখনও বেশ আমোদ হয়। ক—বাবু অনর্গল বক্তৃতা-ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে যুক্তির লৌহপথ বাহিয়া সবেগে চলিয়াছেন, আর সভ্যগণ নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত স্থির হয়ে বসে আছেন। আমি এক কোণে সিগারেটের ধূমজালে আচ্ছন্ন হয়ে বসে আছি, এবং মধ্যে মধ্যে তোমাদের সভার সম্পাদক, সেই কুঞ্চিতকুন্তল নবীন কবি বন্ধুর কানে কানে গল্প করিতে গিয়া, "সভায় নীরবে শোনাই বিধি," এই অমূল্য উপদেশ শুনে আবার স্বস্থানে ফিরে বস্‌ছি। আর খ—বাবুর সঙ্গে ক—বাবুর কি প্রতিদ্বন্দ্বিতাই ছিল,—মনে পড়্‌লে এখনও হাসি পায়। তোমার মনে পড়্‌ছে কি,—যেই খ—বাবু ধীরললিতে দু'টি একটি কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছেন, ক— অমনি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ নোট বই বের করে টুক্‌তে বস্‌তেন। তার পর, সেই নোট দেখে দেখে সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদ-বাণ বর্ষণ করা হোতো। আর, তোমাদের সমিতির এক জন সভ্য, এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কি যুগ্ম নাম দিয়েছিল, মনে পড়ে?—ওসমান ও জগৎসিং। কিন্তু এখনও জানা গেল না,—দু'জনের মধ্যে ওস্‌মান কে? ক—বাবুকে তোমরা বক্তা বল্‌তে, কিন্তু যদি মাপ কর ত বলি,—আমার ত ভাই তাঁকে কমবক্তা ছাড়া আর কিছু মনে হোতো না।

তুমি দেখ্‌ছি, এখনও "সাহিত্যসমাজের" ঝোঁক কাটাতে পার নি!

পত্রেই প্রেম নিয়ে ঝগড়া আরম্ভ কত্তে চাও, আমি দু কথা লিখি, তার পর তুমি পাঁচ পাতায় ক্রমাগত আমাকে আক্রমণ কর আর কি?

আমি ধীরে সুস্থে দুই চারিটি কথা বলিয়া যাইব মাত্র। এখন কেমন এক রকম হয়ে পড়েছি,—কেবল বহুদিনের গত কথা ভাবিতে ভাল লাগে, বর্ত্তমান যেন বিষের মত বোধ হইতেছে। কেন জান?

মনটাও তত ভাল নয়। কেমন যেন অবসন্ন ও বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছি। আজ আর তোমায় মনের কথা লিখে কষ্ট দেব না। যদি তুমি অনুমতি দাও, তা'হলে নয় আমি তোমায় জব্দ করিবার জন্য, বারান্তরে যা খুসী লিখিতে আরম্ভ করিব।

আচ্ছা, কে বল্লে যে, আমি কঠিন? আমি কখনও এমন কথা বলি নি যে, প্রেম পাগলামী। আমার বক্তব্য এই যে, ভালবাসা নিয়ে অত নাড়া-চাড়া কেন? এই যে কাগজে সব দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে পলিতকেশ বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, নানাবিধ কবির রকমারী প্রেমের খেয়াল পড়া যায়, সে সব কবিতা, সে সব সেণ্টিমেণ্ট্যাল্ জিনিস জগতে ছড়িয়ে লাভ কি? আমি যদি ভাল বেসে থাকি,—ভাল বেসে নিরাশ হয়ে থাকি,—কি ভাল বেসে সুখী হয়ে থাকি,—সে সব সুখ-দুঃখ আমার হৃদয়ের ভিতরেই বন্দী থাক্ না কেন? তা নিয়ে সমস্ত দুনিয়া ওলট্ পালট্ করিবার কিছু গুরুতর প্রয়োজন আছে, এমন ত বোধ হয় না। তবে বল্‌তে পার, বন্ধুবান্ধব, যাঁরা হৃদয়ের অংশভাগী, লুকোচুরি কত্তে গেলে তাঁদের কাছেও কপটাচরণ কত্তে হয়। কিন্তু আমি বলি, দু দলে কপটাচার না করে, এক পক্ষেই সেটা সংযত করে রাখা কি সঙ্গত নয়? আমি যদি আজ তোমার কাছে আমার হৃদয়ের দ্বার খুলে দি,—তুমি কি সেখানে বিচরণ করে বিন্দুমাত্র সুখ পাবে? অথচ সেই বৃথা শ্রমের বিরক্তি টুকু কি সাধ্যমত আমার কাছে লুকোবে না? আন্তরিক সহানুভূতি জগতে বড় অল্প, সেই দুর্ল্লভ রত্ন লাভ করিবার জন্য যদি উপহাস মাথায় করিয়া বহিতে হয়, তবে এ বিড়ম্বনায় কাজ কি?

বাড়ীর খবর আর কি দেব? প্রাণে প্রাণে সকলে বেঁচে আছে মাত্র। কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া শিখিবার জন্য মাসে প্রায় ত্রিশ টাকা বাসা খরচ করিয়াছি—এখন মাসে সেই টাকাটাও আদায় করিতে পারা অসম্ভব! ঝক্‌মারী আর কাকে বলে?

সরলার দিদি সুমতির সঙ্গে হরিদাসীর আলাপ হয়েছে, শুনে সত্যই বড়

আহ্লাদ হলো। আমি ভাই তোমার কাছে আর সরলার নাম করবো না। শেষে তুমি মনে করবে, আমি সরলার প্রেমে পড়েছি। তোমাদের অসাধ্য নেই,—বিশেষতঃ, মানুষের মন না মতি, কিসে কি হয়, কে জানে?

তোমায় চিঠি লিখ্ছি, না প্রবন্ধ করে তুল্ছি, বুঝ্তে পাচ্ছি নি। যদি প্রবন্ধ হয়ে থাকে,—ত যা হোক একটা নূতন বাঙ্গালা মাসিকের সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিও—লুফে নেবে।

আজ আর "ইতি" দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। যাই, সরলাকে পড়াইয়া আসি। তুমি কিছু বিরুদ্ধ ভেব না,—নিতান্ত অশান্তির সময়েও, সরলাকে যখন পড়াতে যাই, তখন আমি থাকি ভাল। হে কবিবর! তুমি কি ইহার মধ্যে একটা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারিবে না?

বিজয়।

মন্মথ বাবুর দ্বিতীয় পত্র।

৮

প্রিয় বিজয়চন্দ্র,

তোমার পত্র পড়ে এবার বড় সন্দেহ হোলো! তোমার মনটা যেন বড় চঞ্চল, কত কি যে লিখেছ,—তার হিসেব করা ভার। তোমার মনের ভিতর যেন একটা কি গোলমাল চল্ছে—বলিতে ইচ্ছা করিতেছ,—কিন্তু পারিতেছ না;—সাধ্যমত ঢাকিয়া রাখিতেছ। ব্যাপার কি? বিজয়! আমার কাছে ভাই লুকোচুরি কেন? তুমি ত কোনও কালেই সহানুভূতির প্রার্থী ছিলে না। আজ সে জন্য এত ওকালতী কেন? মনের যে অবস্থায় মানুষ একলা দাঁড়াইতে পারে না,—এক জনের কাঁধে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে চায়, তোমারও যেন সেই দশা বলিয়া মনে হইতেছে।

উপহাস ভাবিওনা,—ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিওনা। একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি যথার্থ উত্তর দাও—তুমি কি সরলাকে ভাল বাস?

তোমার মন্মথ।

বিজয়ের তৃতীয় পত্র।

৯

মনু,

তুমি সত্যই মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তল দেখিতে পাও—আমায় একবার তোমার সেই শক্তি দিতে পার—দেখি, সে আমায় ভাল বাসে কি না।

তোমার কাছে লুকাইব না, আর লুকাচুরি চলিতেছে না। আজ বলিবই—

"———পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি
যবে বাহিরায় নদী, সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?"

আমারও প্রেমের স্রোত চলিল,—এই আগ্নেয় নিঃস্রব ছুটিল—মন্মথ, তুমি দেখ, কেহ ইহার গতি রোধ করিতে পারিবে না! তোমার অনুমান সত্য, সত্যই আমি ভাল বাসি—আমার নাকে কানে খৎ, আমার ঘাট হইয়াছে,—আমি ঝক্‌মারী করিয়াছি—হে প্রেম! তোমার আর নিন্দা করিব না। তুমি আমার—এই দীন দরিদ্র গো-বেচারী প্রাইভেট টিউ-টারের ঘাড় হইতে নামিয়া যাও—আমি বাঁচি। কে বলে, প্রেম করা পাগলামী? কে বলে, প্রেমের কবিতা, কাব্য, সব ছাই। এত দিনে বুঝি-লাম, আর শিখাইবার দরকার নাই। হে প্রেম, তুমি রূপজ, গুণজ, মোহজ, রোগজ যাই হও, আমায় ছাড়। তুমি সকাম, নিষ্কাম, অকাম; সহেতুক, অহেতুক যাই হও না কেন, আমায় অব্যাহতি দাও। তুমি আমায় পাক্‌ড়াও করিলে কেন? বারটি টাকা মাহিনা পাই, চারিটি টাকা দেশে পাঠাইয়া আটটি টাকায় কথঞ্চিৎ কলিকাতার বাসায় দগ্ধোদর পূর্ণ করি, আর বাঁচিয়া মরিয়া থাকি, আমার উপর তোমার এ জারিজুরী কেন? 'সান্‌কীর উপর বজ্রাঘাত' কেন? প্রেম! তুমি অন্ধ কে বলে? তাহা হইলে দেখিয়া শুনিয়া আমার মত এমন দুর্ব্বল শিকার বাছিয়া লইলে কিরূপে? আমি কি পারিব? আমার কি সহিবে? আমি কেমন করিয়া "প্রেমের পাগল" হই বল? আমারপক্ষে লম্বা লম্বা চুল রাখা অসম্ভব,—তেল যোগাইব কেমন করিয়া? রাস্তার ধূলায় ও বিনা তৈলে প্রেমিকের কুন্তলজাল দু দিনে সন্ন্যাসীর জটা হইয়া যাইবে। সোণার চশমা নাই যে চোখে দিয়া চোখের জল ঢাকিয়া রাখিব। আমায় হাঁটিয়া সহর মাথায় করিয়া উমেদারী করিতে হয়,

—লোকের সামনে পড়িলেই যদি আমাকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইতে হয় ত আমি গাড়ী চাপা পড়িয়া মরিব। তবে কবিতা লিখিতে বল ত পারি; কিন্তু হাতে কিছু নাই যে ছাপাইয়া শেষে বিনা মূল্যে বেচিব। আমার এমন সঙ্গতি নাই যে, নিরাশ হইয়া,শেষকালে, চন্দন কাঠের পাখা ভাঙ্গিয়া চিতা করিয়া, প্রিয়তমার পত্র কি প্রথম সম্ভাষণের কবিতাগুলি পোড়াইব, তার পর, পিণোর ফরাসী সৌরভ ঢালিয়া চিতা নিভাইব। হে প্রেম, তোমায় দুঃখের কথা বলিব কি, আমি যে জামার একটি বোতাম খুলিয়া রাখিয়া একটু কবিতা করিব—আমার সে গুড়েও বালি। কেন না আমার শ্লেষ্মার ধাত। এই জন্যই 'রাতে চাঁদের পানে চাহিয়া বারে বার কাঁদিতে' পর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। আমি নিতান্ত নালায়েক কম্‌বক্ত; আমার প্রতি তোমার এ জুলুম কেন? সৌখীন বাবুদের কাছে যাও, আমায় ছাড়—কেন এই দীন দুঃখীর ইহকাল পরকাল নষ্ট কর, বল?

মনু, কি পাগলের মত বকিলাম, কিছু মনে করিও না। আমাতে আর আমি নেই। বিজয় অনেক দিন গেছে, আমি তার প্রেত। আচ্ছা মনু, আমার কেন এ দুরাশা? যাহাকে পাইব না, জানি; প্রাণ কেন তাহাকে চায়, বলিতে পার? সরলা, সরলা।—তোমাকেও বুঝি তাহার কথা লিখিয়াছি? তা হবে।—সেই যে এখন আমার জ্ঞান, ধ্যান, সব।

তুমি ভাই! আমায় দোষ দিও না। প্রেম অন্ধ, তা' ত জান। কে কবে বুঝিয়া শুঝিয়া, হিসাব করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রেম করিয়াছে। প্রেম কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। আমিই না হয়, রূক্ষকেশ, ছিন্নবেশ প্রাইভেট টিউটার, পরাধীন দাস, কিন্তু আমার হৃদয় ত স্বাধীন!

দারিদ্র্য এত দুঃখের! দারিদ্র্য বাঞ্ছিতকে কাড়িয়া লইয়া যায়! আগে ভাই আমার সন্তোষ ছিল, কিন্তু এখন আমি ঘোর অসন্তুষ্ট; কি করিলে পয়সা হয়, বলিতে পার? হায়, আমার মরণের জন্য এ পাপ দারিদ্র্য কোথা হইতে আসিল?—এক প্যাক বাহারে কাগজ কিনিবার সঙ্গতি নাই যে, তাহাকে চিঠি লিখিয়া মনের জ্বালা জুড়াই। এই ছাই-ভস্ম কাগজগুলাতে কি প্রণয়িণীকে চিঠি লেখা যায়? কত কবিতা লিখিয়াছি, কিন্তু পয়সা কই যে ছাপাইয়া মাত্র "তুমি নাথ" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দি, প্রাণটা

দিকে চাহিয়া থাকে, আমি চাহিলেই চোক ছুটি অবনত করিয়া, নখ দিয়া খাতার উপর দাগ টানে, নয় ত আঁচলের খুঁট লইয়া আঙ্গুলে জড়ায়। ভাল না বাসিলে সে বড় মানুষের মেয়ে আমার দিকে চাহিবে কেন? সে ত আমার মত মুখাপেক্ষী উমেদার নয় যে, সদা সর্ব্বদা আমার মুখ প্রতি কাতর দৃষ্টি সন্ধান করিয়া দিনরাত মুখ চাহিয়াই বসিয়া থাকিবে? তবে সেও আমায় ভাল বাসে? হায়, হায়! এই সুন্দর বালিকাফুল, একি এ যাতনা সহিয়াও ফুটিয়া উঠিবে, না ঝরিয়া যাইবে?

আমারও তোমার মত রবি ঠাকুরের গানটি মনে পড়িতেছে—

"মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।"

এখন মরণ! তুমিই আমার সুহৃৎ সহায়, সব। এস, এই দারুণ অতৃপ্ত বাসনা তুমিই পূর্ণ কর, আমায় শান্তি দাও।

আর কি লিখি, বল। আর কি লিখিয়া তোমায় বুঝাইব যে, আমি—প্রেমের নিন্দুক নহি—একটি শিকার—

শ্রীবিজয়।

সরলার তৃতীয় পত্র।

১০

শ্রীচরণকমলেষু—

দিদি, তোমরা দু'জনেই কি পাগল হয়েছ? আমি মাষ্টার মহাশয়ের কথা কি লিখিয়াছি যে, ভুবনবাবু আমায় অমন করিয়া পত্র লেখেন? ভুবন বাবুর চিঠি পাঠাই, দেখিবে। তোমরা সব করিতে পার। এই চিঠি যদি আর কাহারও হাতে পড়িত, তাহা হইলে মাষ্টার মহাশয়ের সর্ব্বনাশ হইত; আমারও লজ্জারও সীমা থাকিত না। তিনি পূজনীয়, গুরু; আমার জন্য তাঁর অনিষ্ট হইলে কি আমার পাপ হইবে না? আমি না হয় আর তাঁহার কাছে পড়িব না। তোমাদের পায়ে পড়ি, এমন ক'রে আর আমার কলঙ্ক রটিও না। মা এ সব মিছে কথা শুন্‌লে একে আর বুঝ্‌বেন, হয় ত গলায় দড়ি দিবেন। আমরা মরিলেই কি তোমরা বাঁচ?

সরলা।

মন্মথ বাবুর তৃতীয় পত্র।

১১

প্রিয় বিজয়,—

তোমার পত্র পড়িয়া প্রথমটা মনে করিতেছিলাম, তুমি ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছ। কিন্তু শেষভাগ পড়িয়া বুঝিলাম, তুমি নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিয়াছ। কিন্তু ভাই, এই প্রাণের যন্ত্রণার কথা যে আমায় খুলিয়া লিখিয়াছ, ইহাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। এখন আমি তোমায় উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারিব। তুমি এই পত্রপাঠমাত্র চাকরী ছাড়িয়া দিবে, আর বসুজার বাড়ীর ত্রিসীমায় যাইবে না। সরলা তোমার হইবার নয়, ইহা স্থির জানিবে। শুধু তাহাকে দেখিবার আশায় পড়াইতে গিয়া, নিজে মজিও না। এখন তুমি আমার কাছে এস। আমি প্রাণপণে তোমার মন ফিরাইতে চেষ্টা করিব। আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিবে, অন্যথা করিও না, পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে।

তোমার মন্মথ—

বিজয়ের চতুর্থ পত্র।

১২

প্রিয় মন্মথ,—

তবে নাকি আমি কবি নই, তবে নাকি আমি প্রেম বুঝিনি! তুমি যাই বল, আর আমি ফিরিব না। হয় সরলা, নয় মরণ, এ দুয়ের এক নহিলে আমার শান্তি নেই। উঃ কি কষ্ট! কি বিরহ! কি যন্ত্রণা! হা দগ্ধোস্মি! হা হতোস্মি! তুমি গোটাকতক নলিনী-পত্র পাঠিয়ে দিও; আমার ষোল আনা বিরহ!—নলিনীপত্রের শয্যায় শুয়ে থাক্‌বো, বিছানায় যে ছারপোকা, রাত্রে ঘুম হয় না।—যদি বিরহিদের শয়নে শুয়ে একটু ঘুমাইতে পারি ত চাই-কি স্বপ্নেও মিলন হতে পারে!

তুমি কি পাগল? ঠাট্টা করে একখানা চিঠি লিখিয়াছি, তুমি সত্য মনে করিয়া লইলে! তোমরা কবিতাই পড়ে থাক, একখানা চিঠি পড়ে বুঝ্‌তে পার না! আ আমার অদৃষ্ট!

তোমার কথায় এই বার টাকা মাহিনার চাকরীটি ছেড়ে দিয়ে উপোস করে মরি আর কি?

তুমি নিশ্চিন্ত থেক। আমি বেশ আছি;—শারিরীক ও মানসিক, আমার সার্ব্বাঙ্গীন কুশল। আর আমার পূর্ব্ব পত্র খানি ছিঁড়ে ফেল, যদি দৈবাৎ কারও হাতে পড়ে, একটা গুজব রটিতে পারে। ভদ্রলোকের মেয়ের নামটা করে ভাল হয়নি। এখন পস্তাচ্ছি। বেশ জেন, পত্রে বিন্দুমাত্র সত্য নেই, আমি আগাগোড়া ঠাট্টা করে লিখে গেছি। "ভালবাসার ধার ধারিনে, ভালবাসা কে বা জানে?"

তোমার বিজয়।—

সরলার চতুর্থ পত্র।

১৩

শ্রীচরণকমলেষু—

দিদি, তোমাদের মনে এই ছিল? তোমাদেরই বা দোষ কি? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। নইলে তিল থেকে তাল হবে কেন? তোমাদের কে বল্লে যে, আমি মাষ্টারকে ভালবাসি। তুমি দাদাকে কি লিখেছ, তুমিই জান। দাদা বউকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন, বউদিদি আমায় ঘরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, "ছি! মাষ্টারকে কি ভালবাস্‌তে আছে?" আমি ত অবাক, পৃথিবী দ্বিধা হও, আমি লুকাই। আমি কি অপরাধ করেছি যে, আমার এই কলঙ্ক রটালে। আমি গলায় দড়ি দিয়া না মরিলে আর তোমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছ না। তাই হবে।

সরলা।—

বিজয়ের শেষ পত্র।

১৪

নাগপুর।

প্রিয় মনু,—

আমি এখানে একজন তুলাব্যবসায়ীর ফারমে একটি ভাল চাকরী পেয়েছি। মাসে ১২৲ টাকা থেকে একবারে ১৫০৲ টাকা। বসুজার বড় ছেলে আমার জামীন, তিনি নিজে চেষ্টা করে, আমায় এই চাক্‌রী করে দিয়েছেন। আমি ত প্রথম অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে তোমার

তোমার চিঠি Re-direct হইয়া এখানে আসিয়াছে। কাজেই অনেক দেরীতে পাইলাম।

তুমি লিখিয়াছ যে, আমি ঠাট্টা করিয়া তোমায় যে চিঠি লিখিয়াছিলাম, সেই চিঠি দু'খানি হরিদাসী চুরি করিয়া পড়িয়া বালিশের নীচে রাখিয়া দিয়াছিল, তার পর আর পাওয়া যায় নাই। সেই দিন সরলার বোন সুমতি, তোমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল, এবং অনেকক্ষণ সেই ঘরে ছিল, তাই ভয় করিয়াছ যে, হয় ত সুমতিই চিঠি খানি দেখ্‌তে পেয়ে নিয়ে গেছে। তোমার শেষ অনুমান এই যে, যদি সে চিঠি সত্যই সুমতির হস্তগত হয়ে থাকে, তাহা হইলে সে হয় ত চিঠিখানি বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে; এবং বস্তুজা, শিক্ষক-ছাত্রীর মধ্যে এ ভাবটা বড় গৌরবজনক না মনে করাতে, আমার চাকরীটি গেছে। তোমার অনুমান সত্য—চাকরীটি গেছে, কিন্তু তার চেয়ে ভাল চাক্‌রী হয়েছে। আর তোমার আশঙ্কাও সত্য, চিঠিগুলি, সরলার বোন সুমতিই দেখিতে পাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তার পর বাপের বাড়ীতে পাঠাইয়াছিল; সেখানেও সকলে ঘটনাটা সত্য মনে করিয়াছে। কেন না, পরবর্ত্তী ঘটনায় তা ছাড়া আর কিছু ত অনুমান করা যায় না। কিন্তু এই প্রহসনের শেষে যে উত্তম মধ্যম জলযোগের ব্যবস্থা হয়নি, সেটা আমার ভাগ্য। আমি সরলার দাদার চিঠিখানি নকল করিয়া দি, পড়িলে বুঝিতে পারিবে, ব্যাপারখানা কি?

"প্রিয় বিজয়,

"তোমার ও সরলা, উভয়ের মঙ্গলের জন্য, তোমার স্থানান্তরিত হওয়া আবশ্যক। তুমি আজ রাত্রেই নাগপুরে রওনা হও, সেখানে,——ফারমে গিয়া দেখা করিও। তুমি সেখানে চাক্‌রী পাইবে। এই সঙ্গে যে খানকত নোট রহিল, তদ্দ্বারা নাগপুরে যাইবার আয়োজন করিও। আমি তাদের টেলিগ্রাম করিলাম; নাগপুরে গিয়াও তোমার কোনও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

"তুমি টাকা লইতে সঙ্কুচিত হইও না। তুমি চাকরী করিতে চলিলে, অনায়াসে এই সামান্য টাকা পরিশোধ করিতে পারিবে। বাবা না থাকিলে আমি প্রাণপণ করিয়াও সরলার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতাম। কিন্তু তাহা হইবার নয়,—দুঃখিত হইও না,—না বলিলে নয়, তুমি কুলীন নও, ধনী নও। বাবার আদরের ছোট মেয়ে, তিনি কিছুতেই রাজী হইবেন না।

"ফাষ্টবুক থেকে আমরা এক সঙ্গে পড়ে আস্‌ছি। তুমি কি আমার

একটি কথা রাখিবে না? সরলার কোনও সংস্রবে তুমি থাকিও না। তাকে চিঠি লিখিও না, যদি তার চিঠি পাও, পড়ো না।

"একথা যেন কর্ণান্তর না হয়, একটি পরিবারের সম্মান, আশা করি, তুমি রক্ষা করিবে।

"আমার সঙ্গে দেখা করো না। আজ রাত্রেই চলিয়া যাইও, অন্যমত করিও না।

"পুরুষের মন অনেক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত রাখিতে পারিবে। আশা করি, 'প্রতাপের' মত সংযমী হইয়া সংসার-রণে অগ্রসর হইবে।

সোদরাভিমানী, জগদীশ্বর রায়।"

এই ত জগদীশ্বরের চিঠি। চিঠি পাইয়া, নোট ক'খানি লইয়া, সেই দিন রাত্রেই নাগপুরে রওনা হইয়াছিলাম। তার পর, এখানে আসিয়া, এই নূতন চাকরীতে অধিষ্ঠান করিয়াছি। জগদীশ্বরের ৪০০৲ টাকা লইয়াছি বলিয়া কিছু মনে করিও না। চার পাঁচ মাসের মধ্যেই আমি পরিশোধ করিব। আমি কমিশন পাই, তা ছাড়া আপ্‌কেওয়াস্তে রাজাদের দরখাস্ত ও চিঠিপত্র লিখিয়াও কিছু পাইব। আমার টাকা জমিবে, তখন ঋণমুক্ত হইব।

আর, সরলা!—তুমি চিরকাল সুখে থাক। আমি জানি, তোমার অমল মনে বিন্দুমাত্র দাগ পড়েনি। বালিকার প্রেম, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর মেয়ের পূর্ব্বরাগ, ও সব বঙ্কিম বাবুর গাঁজাখুরি।

আর মনু, আমাকেও ত তুমি চেন? যার পেটে ভাত নেই, তার প্রেমে পড়িবার অবসর বড়ই কম, এটা অবধারিত জানিবে।

আমি জগদীশ্বরকে সব স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছি। এ সব যে কিছুই নয়, খুব সম্ভব, সে তাহা বুঝিতে পারিবে। সরলার নাম এই রহস্যের ব্যাপারে না জড়াইলে আমার চাকরী হইত না বটে, কিন্তু এটা বড় ভদ্রোচিত হয় নাই। এজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি। জগদীশ্বরের কাছে ক্ষমা চাহিয়াছি, সে কি আমায় ক্ষমা করিবে না?

এখন এক কাজ কর দেখি, নাগপুরে বেড়াতে এস না। সন্ধ্যার সময় বাহিরে বসিয়া, এই পর্ব্বতময় প্রদেশের হরিত ছবি দেখিতে দেখিতে, নাগপুরের কমলালেবু খাওয়া যাবে। প্রেমের চেয়ে এখানকার লেবু ভাল, আমি তোমায় তা শপথ করিয়া বলিতে পারি। সফল প্রেমিক বিজয়।

দুটি কবিতা।

ঘোমটা-খোলা।

১

কথা কও; হাঃ হাসি; চাও আঁখি মেলি—
মানিনি, সখের মান বল কোথা পেলি?
কনকের কাজ করা,
সোণার কুসুমে ভরা,
সারা দেহে ছিল তোর বারাণসী চোলি;
আমি শুধু ঘোমটাটি দূরে দিনু ঠেলি!
ক্ষুদ্র রোষ জেগে উঠে,
রাঙা তোর ওষ্ঠপুটে
আরো রাঙাইয়া দিল! করি রঙ্গকেলি,
কে যেন সিন্দুর দিল লাল পুষ্পে ফেলি!
দোহাই, তুহার কিরে,
আমি কভু জানিনি রে
শরত মেঘের কোলে চমকে বিজলি!
মানিনি, সখের মান বল কোথা পেলি?

২

লাবণ্য কি উথলায়
কনক শশীর গায়,
জলধর-রাশি যবে পড়ে আসি হেলি?
আমি বড় ভাল বাসি
মুক্তাকাশে মুক্ত শশী;
ঢালি দেয় সারানিশি কনক-অঞ্জলি!
মানিনি, সখের মান বল কোথা পেলি?
জাগি সখি, সারানিশি,
মুক্তাকাশে মুক্ত শশী
দেখিবারে সাধ, আশা আমার কেবলি!
মানিনি, সখের মান বল কোথা পেলি?
কালো প্রজাপতিগুলি,
সুশ্যাম ভ্রমরাবলি,
দেখ দেখ একরাশ পড়িয়াছে হেলি!
গোলাপ কুসুমগুলি উঠিছে আকুলি!
ফুঁ দিয়া উড়ায়ে দাও,
ঘোমটা খুলিয়ে চাও,
পিয়াও সৌন্দর্য্য-সুরা পুরিয়া অঞ্জলি!
মানিনি, সাধের মান বল কোথা পেলি?

রাধা।

কবি-ভগিনী শ্রীমতী বিনয়কুমারীর "কৃষ্ণ"-শীর্ষক কবিতাটি আমার এত মধুর লাগিয়াছে যে, আমি তাঁহার পদানুসরণ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আসলে ও নকলে অনেক তফাৎ, সুতরাং বহু চেষ্টাতেও আমার এ চিত্রটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারি নাই। তবে আমার ভরসা আছে যে, সাহিত্যের পাঠক পাঠিকা সমুদয় দোষ আমার ঘাড়ে চাপাইবেন না, কারণ,—

"It seems, as I retrace the ballad line by line,
That but half of it is hers, and one half of it is mine".

১

বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায়!
বহে বকুল বাস দখিণা বায়।
আকাশে পাখী সব, করিয়ে কলরব,
গোষ্ঠ-মাঠ-শিরে চলিছে হায়।
গলে ঘুঘুঁর গুলি, কাঁপয়ে দুলি দুলি,
গাভীরা চলে যায়, শোনা গো যায়—
রব থামিয়ে গেল! ক্রমে নিঝুম্ হ'ল,
গোধূলি-আলো লেগে যমুনা ভায়!
বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায়!

২

বেলা যে পড়ে এল, এল না শ্যাম!
কোথা গো কোথা সেই মুরতি ঠাম?
সখীরা একে একে, আমারে একা রেখে,
রুষিয়ে গেল চলি আপন ধাম!
হরিণী আসিল না, শিখিনী নাচিল না,
মুরলী ডাকিল না রাধার নাম!
পুলকে তনু ভোর, নয়নে স্থলো ার,
প্রাণেতে ঘুমঘোর, শুনে সে নাম,
হবে না বুঝি আজ? কোথা রাখ ল-রাজ?
হায় গো শ্যাম তুমি হলে কি বাম?

৩

চলন মৃদু মৃদু, অঙ্গ বাঁকা!
মানস প্রাণ হরা, তনুতে পীতধড়া,
মোর চুনরি মাঝে সে আ ভা মাখা!
আজি আসিবে যবে, ধৈর্য্য নাহি রবে,
লুকায়ে শ্যাম-জলে, শ্যামেরে দেখা!
আজি আসিবে যবে, "রাধিকা,রাধা" রবে,
ডাকিবে বাঁশি যবে, যমুনা-তীরে;
কোমল রাঙা পায়, জড়ায়ে ধরি হায়,
মুছাব পদধুলা নয়ন-নীরে!

৪

গভীর কালো নীরে, লুকায়ে দেহ,
সভয়ে দরশন দেখে বা কেহ!
আজি গো দ্বার দিয়া, ভিতরে চলি গিয়া,
হেরিব মাধবের রূপের গেহ!

৫

হেরিব শ্যামদেহে, হরষে সারা,
প্রীতি-কালিন্দীর রজত ধারা!
পুলিনে সারি সা উচ্চারি,
ঋষিরা স্তু
কুঞ্জে নিধুবনে, ত মদন সনে,
ভুজেতে বাঁ হারা
বাঁশরি বেজে ওঠে লহরি ছোটে,
শিহরে বারি তারা!
শ্যামের দেহক ভন!
নব বৃন্দাব ন তমাল
কুম্ভে ভরি নীর, ই কালিন্দীর,
হবে কলু ষহারা রাধা-জী ন!

৬

সুধাব বাঁ শীটিরে, সোহাগ করে,
"সদা ' রাধা রাধা' কেন সে করে?"
"কি হবে ' রাধা' বলি? রাধা যে গেছে চলি;
এবে গো শ্যাম সুধু রাধা অন্তরে!

৭

বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায়!
তিমির ঘনাইয়ে ধরারে ছায়!
স্বচ্ছ জলময়, আহা যমুনা বয়,
তবু ভরিল না মোর গাগরি!
কোকিল কুহরিছে, তনুয়া শিহরিছে;
আমার চিতে জাগে, বাজে বাঁশরি!
তীরের তরু হ'তে, পড়িছে পাতা স্রোতে;
আমার মনে জাগে, এল শ্রীহরি!

৮

বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায়!
চক্রবাকী কাঁদে, লুটি বেলায়!
ক্ষুদ্র জলপাখী, উড়িছে থাকি থাকি;
যমুনা কুলু কুলু বিলাপ গায়!
সলিলে যায় ভাসি, ছড়ান কেশরাশি,
তনু শিহরি উঠে তরঙ্গ ঘায়!
কলসি ভরি জলে, সখীরা গেল চলে;
আমারি জলভরা হ'ল না সায়!
জলে কুমুদী সম আছি গো; নিরুপম
কোথা সে চাঁদ মম? কোথা সে হায়?
বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায়!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

কোঁচার কথা।

গদা চাকর যখন আমায় সাজাইতেছিল, তখন আমার মনে মনে বড় রাগ হইতেছিল। একে ত চাকরের হাতে পড়াই অপমানের কথা, কিন্তু যখন একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর ফেলিয়া, আমার বুকে পা দিয়া, আঙ্গুল দিয়া গলা টিপিয়া গদা আমার সজ্জা করিতে লাগিল, তখন আমি লজ্জায়, রাগে, দুঃখে, অপমানে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলাম। আমি কোঁচা, আমি বাবুর অঙ্গের ভূষণ, আমার গায় কি না একটা সামান্য ইতর চাকর পা দেয়! আর সে যখন আমায় কুঞ্চন করে, তাহার হাতের তামাকের গন্ধে আমার নাড়ী উথলিয়া উঠে। কি করি, কাপড়খানি ফর্‌সা, ইস্ত্রী করা, আমাকেও ফর্‌সা থাকিতে হয়, কাজেই নাক টিপিয়া কোন রকম করিয়া চুপ করিয়া থাকি।

মনের দুঃখ যায়, যখন বাবুর অঙ্গে উঠি। যখন তাঁর মোটা সোটা ঘৃত-নবনীতপুষ্ট ভুঁড়িখানি জড়াইয়া, তাঁহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়ি, তখন প্রাণ একটু শীতল হয়। বাবু যখন নানাবিধ গন্ধসামগ্রীতে তাঁর কোমল দেহ সুবাসিত করেন তখন দুই এক ফোঁটা আমারও গায়ে পড়ে, আমি তখন গদার হাতের দগ্ধ গন্ধ ভুলিয়া যাই। বাবু হাতে করিয়া আমাকে একবার ঝাড়িয়া লইলে, আমি আনন্দে বুক ফুলাইয়া আবার তাঁর পদাশ্রিত হই। বাবু নহিলে কোঁচার মর্য্যাদা বুঝিবে কে?

যে আমায় জানে, সেই আমার মর্ম্ম বুঝে। যখন বাবু পথে চলেন, আমি দোদুল্যমান হইয়া কত তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি করি। পথে লোকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া আমার সুখ্যাতি করে। বলে, 'কোঁচার বাহারখানা দেখিয়াছ?' এই যে শান্তপ্রসাদ বাবু, একবার মাত্র বিবাহ করিয়াছেন, বয়স চল্লিশের নীচে, তিনি ইহারই মধ্যে বুড়াইয়া গেলেন কেন, আর রসময় বাবু, তিন সংসার, বয়স ষাটের কাছাকাছি, তিনি বা এমন রসিক যুবা পুরুষ কেন? কারণ শান্তপ্রসাদ বাবু মোটা থান ধুতি পরেন, কখন কাপড় কোঁচাইয়া পরেন না, এবং রসময় বাবুর সিমলার কালাপেড়ে কাপড় খুব ভাল কোঁচান। কাপড় কোঁচাইবার তাঁহার আলাদা লোক আছে। সে অতি সাধু ব্যক্তি, পেয়ার্সের সাবান দিয়া হাত ধুইয়া তবে কাপড় কুঞ্চন

জন্মের ফলভোগ কেমন করিয়া এড়াই? তাই লক্ষ্মী সরস্বতীর ন্যায় আমায় বাড়ী বাড়ী ফিরিতে হয়। রসময় বাবুও কোঁচা ছাড়েন না, যৌবনও তাঁহাকে ছাড়ে না।

তোমরা যদি যথার্থ বাবু হও ত বুঝিতে পারিবে যে, আমি কেবল তোমাদের নটবর বেশের শোভা সম্পাদন করি না। আমি না থাকিলে তোমাদের কি হইত? খোট্টাদের মত কি ধড়া বাঁধিয়া বেড়াইতে, না মুসলমানের মত ইজার পরিতে? তাহা হইলে এই ঝুরু ঝুরু বসন্তের বাতাস, এই ভুরু ভুরু কামিনী ফুলের গন্ধ ত একেবারে মাটি হইত। দেখ, আমি তোমাদের স্বভাবের অনুযায়ী, সর্ব্বদা তোমাদের বিঘ্ন বাধা হইতে রক্ষা করিয়া থাকি। দেখ, এই কোমল বঙ্গদেশে, এই কোমল বাঙ্গালী, কোঁচার অভাবে কত বিপদেই পড়িত। এখন বাবু কোঁচা দোলাইয়া ধীরে ধীরে মরালগমনে চলেন, ভয় পাছে কোঁচার ফুল খারাপ হইয়া যায়। যদি আমি না থাকিতাম, তাহা হইলে এ ধীরচলন কোথায় থাকিত? হয় ত বাবু বেগে চলিতেন, হয় ত কখন দৌড়িতেন, ও দেশ সুদ্ধ লোক হাসিত। বাবু যেমন, আমি তেমনই। বাবু শীতাতপকাতর, নিদ্রালসপ্রিয়, স্বল্পপ্রাণ; আমি পবনের বেগে অস্থির, বলপ্রয়োগে বিনষ্ট, এবং আকর্ষণে ধরাশায়ী হই।

স্ত্রী এবং পুরুষে প্রথম বন্ধন আমি। অঞ্চলে এবং কোঁচায় গ্রন্থি পড়িলে, ক্রমশঃ হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হয়। প্রবাসে প্রস্থানোন্মুখ স্বামীকে নিবারণকালে সুন্দরী কোঁচাই ধারণ করে। সেই কোমল হস্ত যখন আমার অঙ্গ স্পর্শ করে, তখন আমি পুলকে শিহরিয়া উঠি। অদৃষ্টের খেলা দেখ! গদার সেই কঠিন দুর্গন্ধময় হস্তে সৃষ্ট হইয়া সুন্দরীর পদ্ম-হস্তে উঠি।

ধুতি সর্ব্বত্র আছে, কিন্তু বঙ্গদেশ ছাড়া আর কোথাও কোঁচা দেখিয়াছ? পশ্চিমাঞ্চলে, মহারাষ্ট্র প্রদেশে, মাদ্রাসে ধুতি অনেকেই পরে, কিন্তু কোথাও কোঁচার চলন নাই। বাঙ্গালীর মত বাবু, নিশ্চেষ্ট ও শান্তপ্রকৃতি আর কোথায় আছে?

আমি ভাবি, কৃষ্ণের ব্রজলীলা কালে আমার সৃষ্টি হইল না কেন? কৃষ্ণ রসিকচূড়ামণি, কোঁচার বাহার দিতে তাঁহাকে কেহ শিখাইল না কেন? কদম্বতলে বংশীধ্বনি, বিচিত্র নিকুঞ্জলীলা, ধড়া বাঁধিয়াই সম্পন্ন হইল! কৃষ্ণের পীতধড়া না হইয়া, দুগ্ধফেননিভ কোঁচা হইল না কেন? কোঁচা করিয়া কাপড় পরিতে শিখিলে, হয় ত কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য

কর্ম্ম করিতে পারিতেন না, কোঁচা জড়াইয়া সর্ব্বদা বিব্রত হইতেন। বাঙ্গালী বাবুর যুদ্ধের বালাই নাই, বেগ অথবা তেজ প্রকাশের প্রয়োজন নাই, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। নহিলে আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি হইত।

আমি বাবুদিগের বিলাস, আলস্য, শৈথিল্যের চিরকামনা করি, কারণ তাহা হইলে আমি চিরজীবী হইব। তোমরাও সকলে কোঁচার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা কর।

বৈদিক সোম।

৩

বিগত মাঘ ও ফাল্গুন মাসের সাহিত্যে, বৈদিক "সোম" কি পদার্থ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি। যে কয়েকটি বেদসূক্তের সবিস্তার অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, যদি পাঠকবৃন্দ প্রণিধানসহকারে তাহা পাঠ করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, লতারসরূপ যে "সোম" যজ্ঞে দেবতাদিগকে উপহার প্রদান করা হইত এবং যাহা যজ্ঞে ঋত্বিকগণ ও যজমানগণ পান করিতেন, তাহা একটি আধ্যাত্মিক ভাবের বাহ্যিক চিহ্নস্বরূপ। উহা বাহ্য "সোম"। প্রকৃত "সোম" পানের সামগ্রী নহে। স্পষ্টাক্ষরে বেদমন্ত্রে বলা হইয়াছে—"ব্রাহ্মণেরা যাহা প্রকৃত সোম বলিয়া জানেন—তাহা কেহই পান করিতে পায় না।"—ঋগ্বেদ ; ১০।৮৫।৩। উহা আমাদের হৃদয়ের "সোম"। আমরা হৃদয়ের দ্বারা—জিহ্বা দ্বারা নহে—সেই অমৃতময় সোমের আস্বাদন করিতে পারি। উহা পৃথিবীর সামগ্রী নহে, স্বর্গের সামগ্রী। যেমন সোমরসে মত্ততা জন্মে—তেমনি এই প্রকৃত "সোম" মনুষ্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিলে—মনুষ্য পাগল হয়। বেদের উপদেশ এইরূপ যে, স্বয়ং পরমেশ্বর স্বর্গ হইতে এই "সোম" আহরণ করিয়া মনুষ্যের হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন। ইন্দ্র শ্যেন পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া, স্বর্গ হইতে সোম লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন বলিয়া যে বৈদিক উপাখ্যান শুনা যায়, তাহার ইহাই সরল অর্থ।

এক্ষণে যদি পাঠকবৃন্দ জিজ্ঞাসা করেন যে, হৃদয়ের "সোম" আবার কি

পদার্থ, তাহা হইলে প্রথমে ঋষি বামদেবের একটি মন্ত্র আলোচনা করিলে হয় ত তাঁহারা আপনারাই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন। ঋষি বামদেব ব্রহ্মজ্ঞানী ঋষিদের মধ্যে একজন প্রধান ঋষি বলিয়া পরিগণিত। ঋগ্বেদের সমগ্র চতুর্থ মণ্ডল তাঁহার রচিত। তদীয় মন্ত্র সকল যেমন মধুর, তেমনি পবিত্র।

প্রবাদ আছে—ঋষি বামদেব ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই মাতৃগর্ভ-বাসকালে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই এক স্থলে বলিয়া গিয়াছেন—

"গর্ভে নু সন্ নন্বু এষাম্ অবেদম্
"অহং দেবানাং জনিমানি বিশ্ব।"

অর্থাৎ, আমি গর্ভবাসকালেই এই সমুদায় দেবতাদের (যাঁহাদের উদ্দেশে আমি স্তোত্র রচনা করিয়াছি)—জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। সাধারণ পাঠক এই কথা উপহাসের যোগ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিবেন, সন্দেহ নাই। বাস্তবিক যদি শব্দের প্রতীয়মান স্থূল অর্থ গ্রহণ করা যায়—তাহা হইলে বামদেবকে বাতুল ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। কিন্তু যাঁহারা বেদার্থপরিগ্রহে যত্নবান, তাঁহারা এস্থলে সূক্ষ্মার্থের অন্বেষণ করিবেন। ফলতঃ এ স্থলে গর্ভবাসের অর্থ, এই কষ্টময় সংসারে জীবনধারণ। সাধারণ লোকে যাহাকে মৃত্যু বিবেচনা করে,ঋষি বামদেবের মতে তাহাই আমাদের স্বর্গে ভূমিষ্ঠ হওয়া। আর সাধারণ লোকে যাহা "জীবন" মনে করে, ঋষি বামদেবের মতে তাহাই আমাদের মাতৃগর্ভবাস। আমরা যৎকালে স্বর্গে ভূমিষ্ঠ হইব, তখন আমরা সকল দেবতাকে (অর্থাৎ সকল দেবতার সমষ্টির স্বরূপ পূর্ণ পরমাত্মাকে) সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বুঝিতে ও দেখিতে পাইব। এই ভাবকে অবলম্বন করিয়াই.

"অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম
"আগ্নে জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্।"

"আমরা সোমকে পান করিব ও অমর হইব, দ্যুতিমান্ স্বর্গে গমন করিব এবং পূর্ণ পরমাত্মাকে অবগত হইব," এই প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্র রচিত হইয়াছে। বামদেব বলিতেছেন—"ভাই সকল! তোমরা কি বলিতেছ? দ্যুতিমান স্বর্গে জন্মলাভ করিয়া পরমাত্মাকে অবগত হইবে? আমি বলি যে, তাদৃশ জন্মলাভের পূর্ব্বে এই গর্ভবাসকালেই (মাংসময় দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াই) আমি পরমাত্মাকে অবগত হইয়াছি।" ইহাই মাতৃগর্ভে বাস করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভের রহস্য।

বামদেব বড়ই দুঃখী ছিলেন। যদি ঐহিক সুখ এই জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে বামদেবের ন্যায় হতভাগ্য লোক এই সংসারে অল্প জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তিনি হিয়ালী ছন্দে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া, একটি অতি অদ্ভুত "সূক্ত" রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সূক্তের প্রথম মন্ত্র এই—

"অয়ং পন্থা অনুবিত্তঃ পুরাণো
যতো দেবা উদজায়ন্ত বিশ্বে।
অতশ্চিদা জনিষীষ্ট প্রবৃদ্ধো
মা মাতরম্ অমুয়া পত্তবে কঃ।"

ইন্দ্রের (প্রভু পরমেশ্বরের; ইদি পরমৈশ্বর্য্যে, এই ধাতু হইতে ইন্দ্রপদ হইয়াছে) সহিত বামদেবের কথাবার্ত্তা হইতেছে। বামদেব যখন ভূমিষ্ঠ হয়েন নাই, সেই মাতৃগর্ভবাসসময়েই তাঁহার সহিত ঐ কথাবার্ত্তা হইতেছে। বামদেব ভাবিতেছেন—"সকল লোকে যে দ্বার দিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, আমি সে দ্বার দিয়া বাহির হইব না। আমি মাতার উদর বিদীর্ণ করিয়া বাহির হই।" অর্থাৎ এই যন্ত্রণাময় সংসারে আর আমি ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না; আমি মাতার উদরকে (মাংসময় দেহকে) বিদীর্ণ করিয়া অর্থাৎ আত্ম-হত্যা করিয়া,স্বর্গধামে যাইবার চেষ্টা করি। যখন বামদেবের মনে এই দুর্ম্মতির আবির্ভাব হইল, তখন বামদেব শুনিতে পাইলেন,—ইন্দ্র বলিতেছেন;—

"অয়ং পন্থা অনুবিত্তঃ পুরাণো।"

"ঋষি, তুমি যে দ্বার দিয়া ভূমিষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করিতেছ না, ইহাই চির-প্রসিদ্ধ বিধাতৃবিহিত জন্মলাভের পথ।"

"অতো দেবা উদজায়ন্ত বিশ্বে।"

"যত মনুষ্য স্বর্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবত্বলাভ করিয়াছেন, সকলকেই এই দ্বার দিয়া ভূমিষ্ঠ হইতে হইয়াছে।"

"অতশ্চিদা জনীষীষ্ট প্রবৃদ্ধঃ।"

"এখনও তোমার অবয়ব সকল পুষ্ট হয় নাই, তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্দ্ধিত হইলে, তুমিও এই পথেই ভূমিষ্ঠ হইবে।"

"মা মাতরম্ অমুয়া পত্তবে কঃ।"

"বিদীর্ণ হইয়া বাহির হই বলিয়া যে পথের চিন্তা করিতেছ, এই পথের অনুসরণ করিয়া তোমার মাতার (দেহের) পতন সাধন করিও না। উদর

এই কথা শুনিয়া বামদেবের চৈতন্য হইল। তিনি আত্মহত্যা স্বর্গের পথ নহে বুঝিয়া, সেই বিকৃত বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানের আনন্দে আপনার সাংসারিক ক্লেশ বিস্মৃত হইলেন। বুঝিলেন, যেমন গর্ভযন্ত্রণার মধ্যে শিশুর অবয়ব পুষ্টি হয়, তেমনি সাংসারিক ক্লেশপুঞ্জের মধ্যে ব্রাহ্মণের আত্মা দিন দিন পরিপুষ্ট হইয়া স্বর্গে জন্মলাভের উপযুক্ত হয়। বুঝিয়া পরমেশ্বরের অনেক স্তুতি করিলেন। অবশেষে এই কথা বলিলেন—

"অবর্ত্ত্যা শুন আন্ত্রাণি পেচে
ন দেবেষু বিবিদে মর্ডিতারম্।
অপশ্যম্ জায়াম্ অমহীয়মানাম্
অধা মে শ্যেনো মধু আজভার।"

"আমি উদরান্নের অভাবে কুক্কুরের অন্ত্র পাক করিয়া ভক্ষণ করিয়াছি, দেবতার উপাসনা করিয়া ধন লাভ করিতে পারি নাই। (সে যাহা হউক) প্রভু পরমেশ্বর শ্যেন পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে আমাকে 'মধু' (সোম) আনিয়া দিয়াছেন।"

এই মধু বা "সোম" আমাদের হৃদয়ের ব্রহ্মজ্ঞান, ঈশ্বরপ্রেম, ভগবদ্ভক্তি। আর যিনি সেই জ্ঞানের বিধাতা, প্রেম ও ভক্তির পাত্র, বেদে সেই স্বর্গীয় সুপর্ণের পথও "সোম"। রাহুগণের পুত্র গোতম সেই "সোমের" উদ্দেশেই বলিয়াছিলেন—"হে সোম! তুমি স্বর্গের প্রাপক, তুমি বৃষ্টিজলের ন্যায় সকলের অনুগ্রাহক, তুমি শক্তির রক্ষাকর্ত্তা, তোমার বাসস্থান রমণীয়, তোমার কীর্ত্তি অদ্ভুত, ত্রিভুবনে তোমার জয় জয় শব্দ। তোমার এই প্রকৃতি চিন্তা করিয়া আনন্দে ভাসিতেছি।"

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

নব বধূ।

এস, তুমি এস ঘরে, দাঁড়ায়ে আছি গো দ্বারে
সমাদরে করিতে বরণ।
এক নেত্রে অশ্রু, আর অপরে আনন্দভার;
হাসিকান্না, অপূর্ব্ব মিলন!

জ্বলন্ত তাহার স্মৃতি আজি বিদারিছে হৃদি,
মনে পড়ে সেই মুখখানি—
বাসরে উজল গেহ বিবর্ণ মলিন দেহ,
অশ্রুমাখা বিদায়ের বাণী।
শোকাচ্ছন্ন এ নিলয় করিতে আলোকময়
এস তুমি এস উষারাণি!
জীর্ণ প্রাসাদের গায় যেমন স্নেহেতে তায়
শ্যামা লতা বিকাশি মাধুরী,
করে তারে শোভমান, জুড়ায় নয়ন প্রাণ;
হও তথা, আশীর্ব্বাদ করি।
বিকাশিয়া ফল ফুলে মধুর সৌরভ তুলে
পুলকিত করহ নিলয়।
প্রেম পরিমলে ভুলি আকুল মানস-অলি
যেন চিরবিমোহিত রয়।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

বিবিধ।

১

ভিক্টর হ্যুগো এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। সেই ঘটনাটি পাঠ করিলে মনে নানা ভাবের উদয় হয়। সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। ফ্রান্সের জগদ্বিখ্যাত সচিব তালেরঁ (Talleyrand) পারিসে যে অট্টালিকায় বাস করিতেন, তাহার নাম Hotel Talleyrand। সেই অট্টালিকার নিকট সহরের একটি নর্দ্দামা ছিল। তালেরঁ চল্লিশ বৎসর সেই গৃহে বাস করেন, কিন্তু সম্ভবতঃ সেই নর্দ্দামার দিকে কখনও দৃক্‌পাত করেন নাই। চল্লিশ বৎসর তিনি ফ্রান্সকে, এমন কি ইয়োরোপকে মুঠার ভিতর রাখিয়াছিলেন। ফ্রান্সের রাজা গেল, নেপোলিয়ন বন্দী হইলেন, নূতন বংশের রাজা হইল, তালেরঁ সকল দেখিলেন; সকলের নিকট তাঁহার সম্মান, সকলে তাঁহার বশীভূত। তালেরঁ চতুর, রসিক, অসাধারণ দূরদর্শী ও ঘোর অহঙ্কৃত।

অট্টালিকায় বসিয়া, মাকড়সার মত জাল পাতিয়া কত মাছি ধরিতেন। তাঁহার জালে যত মক্ষিকা পড়িয়াছিল, তাহার কতকগুলির নাম শুনিলে তাঁহার ক্ষমতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বোনাপার্ট, রুসিয়ার সম্রাট আলেক্‌জাণ্ডার, অষ্ট্রীয়ার সম্রাট ফ্রান্সিস, সিয়েস (Sieyes), মাদাম দে স্তাল (Madame de Stael), শাটোব্রিয়ঁ (Chateau briand), কোনস্তঁ (Benjamin constant), অষ্টাদশ লুই (Louis XVIII) লুই ফিলীপ (Louis Phillip) ইত্যাদি সেই জালে ধরা পড়িয়াছিলেন। যে চল্লিশ বৎসর তালেরঁ স্বদেশের রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহার তুল্য বুদ্ধিমান ইয়োরোপে কেহ ছিল না।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে, মে মাসের ১৭ই তারিখে, সেই অট্টালিকায় তালেরঁর মৃত্যু হয়। প্রাচীন মিসরদেশে যে কৌশলে মৃতদেহ সহস্র বৎসর রক্ষিত হইত, এখন সে বিদ্যা লুপ্ত হইয়াছে, তথাপি চিকিৎসকেরা মৃতদেহের মধ্যে ঔষধি দিয়া, কিছু দিন শবের বিকার নিবারণ করিতে পারেন। ঔষধি-প্রয়োগের পূর্ব্বে মস্তক হইতে মস্তিষ্ক ও উদর হইতে অন্ত্র বাহির করিতে হয়। তালেরঁর মৃতদেহেও সেইরূপ করা হইল। তৎপরে শব কাষ্ঠের বাক্সে রক্ষিত হইল। ডাক্তারেরা চলিয়া গেলে একজন ভৃত্য সেই গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, মস্তিষ্ক ও অন্ত্র বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে। ভৃত্য তালেরঁর মস্তিষ্ক লইয়া—যে মস্তিষ্কের বলে সমগ্র ইয়োরোপ চমৎকৃত ও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল—অট্টালিকার নিকটস্থ আবিল জলপ্রণালীতে নিক্ষেপ করিল।

২

সিন্ধু ও কচ্ছ প্রদেশের মধ্যে বালুকারণ্যের ভিতরে কতকগুলি বলিষ্ঠ ও সুন্দর জাতির বাস। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে সেই স্থানে এক জাতি বাস করিত। তাহারা নিজে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিত। আচার ব্যবহার কতক রাজপুতের মত, কতক মুসলমানের মত। তাহাদিগের মধ্যে একটা বড় অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল।

একটা কেন, দুই প্রথা। প্রথা দুইটি এই। পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করিবার নিয়ম ছিল না। নূতন বস্ত্র ক্রয় করিয়া যতদিন না জীর্ণ হয়, সেই অবস্থায় পরিধান করিতে হইত। অত্যন্ত মলিন অথবা জীর্ণ হইলে ত্যক্ত হইত। জলে কাচিয়া পরিষ্কার করিলে অথবা রজকগৃহে পাঠাইলে বস্ত্র অপবিত্র

ত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিবার নিয়ম ছিল। এক সন্তান উৎপন্ন হইলেই স্ত্রী অপবিত্রা ও অস্পৃশ্যা হইত। পুরুষের পক্ষে এ প্রথায় কোন আপত্তি না থাকিলেও, স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা বড় অমঙ্গল ও যন্ত্রণার কারণ হইত।

ইহাদের মধ্যে এক দম্পতীতে বড় প্রীতি ছিল। কিছু দিন পরে স্ত্রী গর্ভবতী হইল। স্বামী স্ত্রীকে বড় ভালবাসে, ত্যাগ করিতে ইচ্ছা নাই, কিন্তু দেশ ও জাতির আচরণবিরুদ্ধ গর্হিত কর্ম্ম কেমন করিয়া করিবে? তাহার স্ত্রী ভয়ে ও শোকে মর্ম্মাহত হইল, কিন্তু সে বুদ্ধিমতী, ভাবিয়া একটা উপায় উদ্ভাবিত করিল। স্বামীর বস্ত্র মলিন হইয়াছে বলিয়া তাহাকে বস্ত্র ত্যাগ করিতে কহিল। স্বামী কহিল, "নূতন বস্ত্র ঘরে আছে?" স্ত্রী কহিল- "ঘরে নাই। তুমি আমার একখানি নূতন কাপড় পরিয়া এ কাপড়খানা ছাড়িয়া দাও। আমি বাজার হইতে নূতন বস্ত্র আনিতেছি।" স্বামী তাহাই করিল। তাহার সেই মলিন বস্ত্র লইয়া যুবতী চলিয়া গেল। বাজারে গিয়া একখানি নূতন কাপড় কিনিল। পরে অলক্ষ্যে এক রজকের গৃহে গিয়া স্বামীর মলিন বস্ত্র ভাল করিয়া ক্ষারে কাচিয়া শুকাইয়া লইল। দুইখানি বস্ত্র একত্র লইয়া বাড়ী আসিল। নূতন কাপড় খানি স্বামীকে পরিতে দিল।

স্বামী কিছুই জানে না, নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে কাপড়খানা পরিল। আশ্চর্য্য! এমন নরম, পরিষ্কার, আরামের নূতন কাপড় ত সে কখন পরে নাই! স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এমন চমৎকার কাপড় কোথায় পাইলে?"

"তুমি এমন কাপড় কখন পরিয়াছ?"

"পরা দূরে থাকুক, কখন চক্ষেও দেখি নাই।"

স্ত্রী মুখ টিপিয়া হাসিল, "যদি নূতন না হয়?" রহস্যখানা কি! সেই পুরাতন কাপড়! স্বামী কিছুতেই বিশ্বাস করিল না। তখন স্ত্রী নূতন কাপড় বাহির করিয়া দেখাইল। স্বামী চিন্তিত হইল—তবে ত জাতিপাত হইল! স্ত্রী রাগিয়া কহিল, "জাতি কি কাপড়ে? এখানে লোক সব মূর্খ, তাই এমন করিয়া কাপড় পরিতে জানে না।" স্বামী ভাবিতে লাগিল, মাঝে মাঝে কাপড়ে হাত দিয়া কহিতে লাগিল, "বেশ কাপড়, বেশ নরম।" স্ত্রী তখন কাছে আসিয়া কহিল, "আমায় ত্যাগ করিবে?" স্বামী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, "আমার কি ইচ্ছা? এ পাপ দেশে বাস করিতে নাই।" স্ত্রী তখন

হইলেও তেমন হয়। দুই সংস্কার। সন্তান হইলে স্ত্রীলোক কোমল ও সুন্দর হয়, অপবিত্র হয় না।”

স্বামী লাফাইয়া উঠিল। একটা কি ভাব যেন বিদ্যুতের মত তাহার মনে স্ফুরিল। বেগে ঘরে প্রবেশ করিয়া তরবারি হস্তে বাহির হইল। তরবারি হস্তে গ্রামের পথে পথে ফিরিতে লাগিল ও চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, “আমি কাচা কাপড় পরিয়াছি, আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না। যে ইহার বিরুদ্ধে একটি কথা কহিবে, তাহার মাথা কাটিব।”

সেই রাত্রে গ্রামে একটা ভারি গোলযোগ হইল। রাত্রে গৃহে গৃহে স্বামী স্ত্রীতে অনেকক্ষণ এই দুই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। পর দিবস আরও দুই এক জন কাচা কাপড় পরিল। সেই অবধি সে অঞ্চল হইতে এই দুই প্রথা লুপ্ত হইয়াছে।

৩

একটা গল্প আছে, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র ও সওদাগরপুত্র, এই চারি মিত্র দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া, মন্ত্রীপুত্রের বুদ্ধিতে নানা বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, অবশেষে এক নূতন দেশে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, অত্যুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত একটা স্থান। ভিতরে কি আছে, কেহ জানে না, কোন দিকে প্রবেশ পথ নাই। ভিতরে কি আছে জানিতে তাঁহারা অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। অনেক কৌশল করিয়া একটা সিঁড়ি প্রস্তুত হইল। সওদাগরপুত্র প্রথমে সিঁড়িতে উঠিলেন। প্রাচীরে উঠিয়া সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া, বন্ধুদিগকে ফিরিয়া দেখিয়া, উচ্চ হাস্য করিয়া, লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অদৃশ্য হইলেন। অপর বন্ধুগণ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তাহার পর একটা ভৃত্য উঠিল, তাহারও ঐ দশা। তখন কোটালপুত্র প্রাচীরে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তিনিও যদি ভিতরে পড়িয়া যান, এই ভয়ে মন্ত্রীপুত্রের পরামর্শমতে তাঁহার কোমরে রজ্জু বাঁধা হইল। রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র সেই রজ্জু নীচে ধরিয়া রহিলেন। তিনিও প্রাচীরে উঠিয়া, সেইরূপ হাসিয়া লাফাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু বন্ধুদ্বয় রজ্জু আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। পরে অনেক কষ্টে দু’জনে মিলিয়া তাঁহাকে অবতরণ করাইলেন। রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিলে? উত্তরে কোটাল পুত্র কোন কথা কহিলেন না,

মতা আছে। তখন প্রাচীরের উপর আর কেহ উঠিতে সাহস করিল রবেষ্টিত কি রহস্য ছিল, কেহ জানিতে পারিল না। যে জানিল, রিল না, কিম্বা ফিরিয়া আর কাহাকেও জানাইতে পারিল না। ক একবারে নিরর্থ? যাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য, আনন্দজনক ও যাহাই কি ভাষা ও বর্ণনাকে অতিক্রম করে না?

সঙ্ক্ষিপ্ত সমালোচনা।

জমীন্দারী পঞ্চায়ত পত্রিকা;—আমরা পঞ্চায়তের প্রথম হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত, ছয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রিকা, জমীন্দারী পঞ্চায়তের মুখপত্র, সুতরাং জমীন্দারী পঞ্চায়তের উদ্দেশ্য না জানিলে, পাঠক এই পত্রিকার উদ্দেশ্যও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবেন না। অতএব, আমরা প্রথম সংখ্যা হইতে জমীন্দারী পঞ্চায়তের উদ্দেশ্য উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে এই পত্রিকার উদ্দেশ্যও বিবৃত হইবে। "জমীন্দারী পঞ্চায়তের নিয়মাবলীতে পঞ্চায়তের এই পাঁচটি উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। (১) বিবাদমীমাংসা। (২) সর্ব্বপ্রকার ভূম্যধিকারী শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব সংস্থাপন। (৩) জমীন্দারী কার্য্যপ্রণালীর উন্নতি। (৪) কৃষি সম্পত্তির এবং ভূম্যধিকারীবর্গের অবস্থার উন্নতি। (৫) ভূম্যধিকারীবর্গের সন্ততিগণের অবস্থোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা। উল্লিখিত পাঁচটি বিষয় এই পত্রিকার প্রধান আলোচ্য এতদ্ভিন্ন ইহাতে ভূস্বত্বভোগী শ্রেণীর হিতকর এবং প্রয়োজনোপযোগী অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাও করা হইবে। এতদ্দেশের প্রাচীন জমীন্দারবংশের ইতিবৃত্ত, এবং যে সকল স্বনামখ্যাত মহাত্মা স্বীয় চেষ্টা এবং অধ্যবসায়বলে বৃহ জমীন্দারীর অধীশ্বর হইয়া অপরের শিক্ষাস্থানীয় হইয়াছেন, তাঁহাদে জীবনী সংগ্রহ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিবার পক্ষে এই পত্রিক পরিচালকগণ সর্ব্বক্ষণের জন্য যত্নবান্ থাকিবেন।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জমীন্দারী পঞ্চায়তের উদ্দেশ্য মহৎ গুরুতর। পঞ্চায়ত যে উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সিদ্ধ করিতে পারিলে, দেশের অনেক গুরুতর অভাব বিদূরিত হইবে।

পঞ্চায়ত পত্রিকার প্রবন্ধ সকল শিক্ষনীয় বিষয়ে পূর্ণ ও উৎকৃষ্ট হইবে

কুশলতার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা শশিশেখরেশ্বর র ন্দারী কার্য্যপদ্ধতি ও পঞ্চায়ত প্রথা, শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরে রোগের কবিরাজী চিকিৎসা, ভারতে আর্য্যজাতির সমাজগঠন প্রণালী প্রভৃতি প্রবন্ধ, লেখকগণের বিশেষ নিপুণতার পরিচায় মাসিকে সচরাচর এরূপ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক প্রবন্ধ দে যায় না।

প্রথমে শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু, এম্-এ, বি-এল, পঞ্চায়তে প সম্পাদক ছিলেন। ষষ্ঠ সংখ্যা হইতে, শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র দাস মহাশয় সম্পাদকতার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি, দাস মহাশয়ের সম্পাদকতায়, জমীন্দারী পঞ্চায়ত পত্রিকা উত্তরোত্তর অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিবে।

সুলভ দৈনিক ;—এখানি দৈনিক পত্র। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য আধ পয়সা মাত্র। এত সুলভ দৈনিক পত্র এদেশে আর কখনও দেখা যায় নাই। ইহাতে সংক্ষেপে সকল বিষয়েরই কিছু কিছু লিখিবার চেষ্টা করা হয়। লেখাও বেশ হইতেছে। বড় বড় প্রবন্ধ দিয়া পত্রিকা পূর্ণ না করিয়া চুম্বকে মতামত ব্যক্ত করা হয় বলিয়া, পত্রখানি বেশ আরামে পড়া যায়। আমরা আশা করি, উৎসাহী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু কুমার কিষণ চট্টোপাধ্যায়, এই দুরূহ কার্য্যে সফলতা লাভ করিবেন। এই পত্র সাধারণের উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

আক্ষেপ ;—পদ্যগ্রন্থ। শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিক প্রণীত। আমরা এই ই খানির প্রশংসা করিতে পারিলাম না। লিখিতে আরম্ভ করিলেই ছাপিতে ইবে, লেখকদের এ সংস্কার কবে যাইবে?

"শৈশবের সুখস্বপ্ন সকলই ভেঙ্গেছে।
স্মৃতির স্বপন সম কোথায় গিয়াছে?"

ইত্যাদি পুরাতন কাঁদুনি অনেক পড়া গিয়াছে, আর ভাল লাগে না। কের হাত এখনও কাঁচা। গ্রন্থখানি পদ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাকে তা বলা যায় না। লেখকের ভাষায় অধিকার আছে, অনুশীলন করিলে হইতে পারে। আমরা আশা করি, তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার না া, উপযুক্ত বিষয়ে তাহার নিয়োগ করিবেন।

"বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবার জন্যই 'সাহিত্যের' জন্ম হইয়াছে।"—সাহিত্য।

সাহিত্য।

সুলভ মাসিকপত্র ও সমালোচন।

তৃতীয় বর্ষ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বাঙ্গালার প্রায় অধিকাংশ প্রসিদ্ধ লেখক "সাহিত্যে" লেখেন।

"সাহিত্যে," প্রতিমাসে, উপন্যাস, গল্প, সমালোচনা, ইতিহাস, জীবনচরিত, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন, সমাজনীতি, সাহিত্য, কবিতা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, রহস্য প্রভৃতি বিষয়ে, সুন্দর ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হয়।

"সাহিত্যের" আকার ডিমাই আট পেজী ৭ ফর্ম্মা, ৫৬ পৃষ্ঠা। আবশ্যক হইলে, অতিরিক্ত ফর্ম্মাও দেওয়া হয়। প্রথম সংখ্যা ৮॥০ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৬৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা খুব সুন্দর। মূল্যও সুলভ। বাঙ্গালা দেশে এমন সুন্দর কাগজ আর নাই।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, মায় ডাকমাশুল সর্ব্বত্র ২৲ দুই টাকা মাত্র।

যাঁহারা গ্রাহক হইতে চান, নিম্নলিখিত ঠিকানায়, নাম ও ঠিকানা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা পাঠাইবেন। অর্ডার পাইলে ভ্যালুপেবলে "সাহিত্য" পাঠাইয়া থাকি, গ্রাহককে ২৵০ দুই টাকা দুই আনা পোষ্ট আফিসে দিয়া কাগজ লইতে হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য।০ চারি আনা মাত্র। নমুনা চাহিলে, এক সংখ্যার মূল্য মাশুল সমেত সাড়ে চারি আনা পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য না পাইলে, কাহাকেও "সাহিত্য" পাঠান হয় না।

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী।
২৫ নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
কলিকাতা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

☞ "সাহিত্য" সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

'সাহিত্য'-সম্বন্ধে সম্পাদকগণের মত।

বঙ্গবাসী ;—"সাহিত্য—মাসিকপত্র ও সমালোচন। ২য় ভাগ ; ১২শ সংখ্যা। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত। কলিকাতা ২৫নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এই সংখ্যায় সাহিত্যের দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইল। সাহিত্য উত্তম চলিতেছে। সাহিত্যের আকারটি সুন্দর ও মুদ্রাঙ্কন উজ্জ্বল। সাহিত্য প্রতি মাসের প্রথমেই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়। সাহিত্যের লেখকগণ লিপিকুশল ও সাধারণ্যে সুপরিচিত।" —বঙ্গবাসী ৭ই চৈত্র, ১২৯৮।

দৈনিক ;—"সাহিত্য—২য় ভাগ ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত। "সাহিত্য" সবে মাত্র দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে ; কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ যোগ্যতার পরিচয় দিতেছে। ইহার একটি বিশিষ্ট সুখ্যাতির কথা এই যে, অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নব্য যুবক ইহাতে নিয়মিতরূপে লিখিবার ভার লইয়াছেন। ইহা অতি আহ্লাদের কথা। নব্য লেখকগণ বেশ যোগ্যতার পরিচয়ও দিতেছেন। আশা করি, তাঁহারা অধিক করিয়া দেশের কথায় মনোযোগী হইবেন। এতদ্ভিন্ন রজনীকান্ত গুপ্ত, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি প্রবীণ ও সুপ্রতিষ্ঠ লেখকগণও সম্পাদকের সাহায্য করিতেছেন। সুতরাং "সাহিত্য" যে উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে। পত্রিকাখানির আকারও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ছাপা কাগজ ভাল। মূল্য বৎসরে ২৲ টাকা। প্রকাশকের সুখ্যাতির বিষয় এই যে, তিনি পত্রখানি বেশ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত করিতেছেন।"—৩০শে কার্ত্তিক, ১২৯৮।

সঞ্জীবনী ;—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রায় দুই বৎসর হইল, 'সাহিত্য'-নামে একখানি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিতেছেন। বাঙ্গলাদেশের গণ্য মান্য নরনারীগণ এই পত্রিকাতে লিখিতেছেন। ইহার মধ্যেই 'সাহিত্য' একখানি উচ্চ শ্রেণীর মাসিকপত্রিকা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আমরা সময়ান্তরে এই পত্রিকাসম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা করিব।"—১২ই বৈশাখ ; ১২৯৯।

হিতবাদী ;—"সাহিত্য—৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। বয়োবৃদ্ধির সহিত সাহিত্যের সারবত্তা বাড়িতেছে। সমালোচ্য সংখ্যা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই সংখ্যায় অনেকগুলি সারবান্ ও মনোরম প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বরচিত প্রভাবতীসম্ভাষণ প্রবন্ধটী বিশেষ প্রীতিকর। ইহাতে সেই মহাত্মার স্নেহময় হৃদয়ের একটী পূর্ণ চিত্র সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রেমের স্বর্গীয় মধুর প্রভা এবং সরল শোকের বিষাদ ছায়া একত্রে মিলিত হইয়া হৃদয়কে অভূতপূর্ব্বভাবে আকুলিত করিয়া তুলে।"—৫ই বৈশাখ, ১২৯৯।

প্রকৃতি ;—"সাহিত্য—মাসিক পত্র। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র। সাহিত্য দ্বিতীয় বর্ষে দ্বিগুণ উৎসাহে নবসাজে পরিচালিত হইতেছে। 'প্রকৃতি'র পাঠক মাত্রেই বিজ্ঞাপনস্তম্ভে দেখিয়াছেন, সাহিত্যের লেখকবৃন্দ কোন্ শ্রেণীর। বঙ্গের এরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের সহায়তায়, পণ্ডিতপ্রবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্রের সম্পাদকতায়, সাহিত্য যে মাসিক-পত্র-জগতে প্রথম শ্রেণীর আসন অধিকার করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমরা সাহিত্যের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।"—২৬শে পৌষ, ১২৯৮।

সময় ;—"সাহিত্য—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের সংখ্যা। ২৫ নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এই দুই সংখ্যায় বাবু চন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক গণ্য মান্য লেখকই এই পত্রিকায় নিয়মিতরূপে লিখিয়া থাকেন, সুতরাং এখানি যে উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। এরূপ সারবান পত্রিকার সংখ্যা দেশে যতই বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গল। ইহার লেখা সুরুচি-সংগত এবং শিক্ষা-প্রদ। ভাষা সরল ও ভাব-ব্যঞ্জক। ছাপা অতি পরিষ্কার। আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘায়ু কামনা করি।"—১৮ই পৌষ, শুক্রবার, ১২৯৮।

সারস্বত পত্র ;—"সাহিত্য।—মাসিকপত্র ও সমালোচনা। কলিকাতা, ২৫নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন হইতে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। এই পত্রিকাখানি কিঞ্চিৎ অধিক ছয় ফর্ম্মা আকারে মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে উচ্ছ্বাস ও যে নূতন তরঙ্গ উঠিয়াছিল, জানি না কোন্ দৈবদুর্ব্বিপাকে, কি নিদারুণ গ্রহ-বৈগুণ্যে অকালে তাহা থামিয়া গিয়াছে। এখন সে বঙ্গদর্শনও নাই, সে বান্ধবও নাই, সে আর্য্যদর্শনও এখন অতীতের পুরাতন কক্ষায় চিরনিদ্রিত! বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকা সংখ্যায় যদিও এখন পূর্ব্বাপেক্ষা কম

নহে, বরং বেশী, তথাপি বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের কথা যে, একখানি পত্রিকাও বঙ্গদর্শন কি বান্ধবের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই শোচনীয় দুর্দ্দিনে, এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশে, আজি আমরা 'সাহিত্যে' সাহিত্যের জ্যোতিঃ দেখিয়া সুখী হইয়াছি। এবং ভবিষ্যতের জন্য আশা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। 'সাহিত্যে' বাঙ্গালার অনেক প্রসিদ্ধনামা লেখক লেখনী ধারণ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গ্রাডুয়েট, আগ্রহ-সহকারে বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিয়া 'সাহিত্যের' কলেবর পুষ্ট করিতেছেন। ইংরেজী-অভিজ্ঞ সম্প্রদায় যাবৎ বাঙ্গালায় প্রবন্ধলেখা গৌরবের কথা মনে না করিবেন, যাবৎ ইংরেজী-অভিজ্ঞ সম্প্রদায় উৎসাহের সহিত বাঙ্গালা গ্রন্থাদি পাঠ করিতে ইচ্ছুক না হইবেন, তাবৎ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি হইবে না, সাহিত্য-প্রকাশকের যত্নে আজ কিয়ৎপরিমাণে এই অবস্থার অনুকূল কর্ম্ম হইতেছে দেখিয়া, আমরা ভবিষ্যতের জন্য আশান্বিত হইতেছি। পত্রিকা খানি উৎকৃষ্ট কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত হই-তেছে। ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও মধুর। বিষয়গুলি সারগর্ভ ও চিত্ত আকর্ষক। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে 'সাহিত্য'কে বর্ত্তমান বাঙ্গালা মাসিকপত্রনিচয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত।"—১২ই পৌষ, ১২৯৮।

সোমপ্রকাশ;—"সাহিত্য—মাসিকপত্র ও সমালোচন। উক্ত কয়েক খণ্ড মাসিক পত্র পাঠে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। সাহিত্যসমাজে "সাহিত্য" দ্বারা যে অনেক উপকার সাধিত হইবে, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। এ মাসিক পত্রখানি যে একখানি প্রধান শ্রেণীর মাসিক পত্র হইবে, তাহা এই কয়েক খণ্ড পাঠ করিয়াই অনুমান করিতে পারা যায়। বাঙ্গালার কয়েক জন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকগণ সাহিত্যে লিখি-তেছেন। আমরা আশা করি, নবীন সহযোগী দীর্ঘজীবন লাভ করিবেন এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবেন।"—২৯শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৮।

পৃথিবী;—"সাহিত্য।—মাসিক পত্রিকা। ২৫নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সহরে মফঃস্বলে ২৲ টাকা মাত্র। আমরা সাহিত্যের ৩য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুযোগ্য দৌহিত্র বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সাহিত্য সম্পাদক এবং তদীয় পুণ্য ভবনই সাহিত্যের কার্য্যালয়, সুতরাং সাহিত্য যে বাঙ্গালা সাহিত্যকাননে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যায় 'ওয়াল্ট হুইটম্যান' এবং 'ফুলদানী' গল্পটী অতি

সুন্দর হইয়াছে। 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনী'ও সাহিত্যকে আরও অলঙ্কৃত করিয়াছে। বাঙ্গালার কৃতী সুলেখকগণ সাহিত্যের সেবক ও উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সম্পাদকতা-ভার সমর্পিত; সুতরাং আশা আছে, 'সাহিত্য' দীনহীন বঙ্গসাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে সফলকাম হইবে। আমরা সাহিত্যের দীর্ঘজীবন কামনা করি।"—১০ই অগ্রহায়ণ; ১২৯৮।

পৃথিবী;—"সাহিত্য।—এবারকার সাহিত্য পাঠে আমরা বড়ই তৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী' শীর্ষক প্রবন্ধ বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। দেশীয় মহিলারা এরূপ সারবান ও চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতেছেন, ইহা গৌরবের সামগ্রী বটে। এতদ্ভিন্ন 'ঈশার পুনরাবির্ভাব,' 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি প্রবন্ধও দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে। এক কথায় বলা যাইতে পারে, সাহিত্য কালে বাঙ্গালা-সাহিত্য-কাননের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবে।"—১৬ই পৌষ, বুধবার, ১২৯৮।

বৰ্দ্ধমান-সঞ্জীবনী;—"সাহিত্য, মাসিকপত্র ও সমালোচন। কলিকাতা ২৫নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন হইতে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। এই মাসিক পত্রখানির ছাপা ও কাগজ বড় সুন্দর; কিন্তু বাহিরের চাক্‌চিক্যই ইহার প্রশংসার বিষয় নয়। ইহার লেখকগণ মধ্যে বাবু চন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, প্রভৃতি কয়েক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক আছেন। যে সকল প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই সুপাঠ্য। ইহাতে প্রায়ই উচ্চ দরের প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার ভাষাও সুললিত ও সুমিষ্ট। ইহা একখানি বঙ্গ-সাহিত্যের আদরের ও গর্ব্বের বস্তু। ইহার উন্নতি আমরা একান্ত প্রার্থনা করি।"—২০শে মাঘ, ১২৯৮।

প্রতিকার;—"বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' সাহিত্য-জগতে উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বঙ্গ-সাহিত্যের দুরদৃষ্টবশত: বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শনের অদর্শন ঘটিয়াছে, জ্ঞানাঙ্কুর অঙ্কুরেই শুখাইল, প্রচারের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হইতে না হইতেই শেষ হইয়া গেল। নবজীবনও জীবনহারা, কেবল নব্য-ভারত বিদ্যমান। এ দুর্দ্দিনে "সাহিত্যের" ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর মাসিকপত্র দেখিয়া প্রকৃতই আমাদের আশার সঞ্চার হইয়াছে। সাহিত্যপরিচালনের ভার উপযুক্ত হস্তেই ন্যস্ত, কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ই তাহার পরিপোষক, সুতরাং তাহার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি আশা করা অন্যায় হইবে না।" * * *—৯ই মাঘ, ১২৯৮।

নব্যভারত ;—"সাহিত্য।—মাসিক পত্রিকা, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত। পত্রিকাখানির বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। 'সাহিত্যের' এই দ্বিতীয় বৎসর। সুরেশ বাবুর চেষ্টা ও শক্তিকে শত শত ধন্যবাদ। বহু লেখক এই পত্রিকায় লিখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সকলে যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, সাহিত্যের কলেবরে কুলাইবে না বলিয়া আশঙ্কা হয়। যাহা হউক, সাহিত্য যেরূপ দক্ষতার সহিত মাতৃসেবা করিতেছেন, আশা করি, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"—৯ম খণ্ড—১১শ সংখ্যা।

পরিচারিকা ;—"সাহিত্য—ইহা একখানি মাসিকপত্রিকা, স্ত্রী পুরুষে ৬৬ জন ইহার লেখকশ্রেণীভুক্ত। পত্রিকাখানি যে কেবল দৃশ্য মনোহর, তাহা নহে ; ইহার ভাষা অতি বিশুদ্ধ এবং মিষ্ট, পড়িলে শ্রান্তি বোধ হয় না। স্বর্গগত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র কর্তৃক ইহা সম্পাদিত। এই পত্রিকার কয়েক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ। গত মাসের পত্রিকা পাঠে আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। সম্পাদকের লিখিত 'মেঘদূত' কাব্যের সমালোচনাটি অতীব সুপাঠ্য হইয়াছে। ইহাতে সমালোচকের লিপি-চাতুর্য্য, রসগ্রাহিতা, কাব্যরুচি এবং কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে লেখককে বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া নিজে ঘরে বসিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার ফল ফলিয়াছে। আশা করি, এই পত্রিকা খানি উক্ত মহাত্মার মুখ উজ্জ্বল করিবে। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর উৎকৃষ্ট রচনার কিয়দংশ স্থানান্তরে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। মাতৃভাষার উন্নতির গতি অবধারণ এবং তাহার প্রকৃত সমালোচনা করিয়া, বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন পূর্ব্বক 'সাহিত্য' দীর্ঘজীবী এবং দিন দিন হৃষ্টপুষ্ট হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।"

—আশ্বিন, ১২৯৮। ১৪ খণ্ড—৬ সংখ্যা।

ধর্ম্মপ্রচারক ;—"আমরা সাহিত্য-নামক নবপ্রকাশিত মাসিক পত্র দুই খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ইহার সম্পাদক। উপযুক্ত লোকের হস্তেই সম্পাদন-ভার অর্পিত হইয়াছে। বঙ্গের প্রধান প্রধান লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ ইহাতে লিখিয়া থাকেন। নানাবিধ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। কালে ইহা একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রে পরিণত হইবে, এরূপ আশা করা যায়।"—আশ্বিন, ১২৯৮।

সাহিত্য-কল্পদ্রুম ;—

* * * 'সাহিত্য' বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্রের কলঙ্ক দূর করিয়াছে। চতুর্থ বর্ষের 'প্রচার' ব্যতীত আর কোন পত্রিকাই এরূপ উৎকৃষ্ট ছাপায় কখন প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ছাপা, কাগজ ও প্রবন্ধাদি সাজাইবার প্রণালী দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। বাঙ্গালী দ্বারা মুদ্রণের এতটা উন্নতি দেখিয়া বাস্তবিক আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। ইহার জন্য মুদ্রাকর ও সম্পাদক, উভয়েই প্রশংসার্হ। 'সাহিত্যে' যে সকল লেখক লেখিকা লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রশংসা আর কি বলিয়া করিব? যাঁহারা আজকাল বাঙ্গালা ভাষার প্রধান সেবক, যাঁহাদিগের লেখা লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্য-জগৎ আজকাল গর্ব্ব করে, সেই সকল প্রথিত-নামা, গূঢ়বুদ্ধি প্রাচীন লেখকগণ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নব্য কৃতবিদ্য অনেকগুলি রত্ন, ইহাতে লিখিবার জন্য স্বীকৃত হইয়াছেন। * * * এ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি সুখপাঠ্য সৎ-প্রবন্ধ আছে। সম্পাদক মহাশয় সম্পাদকতায় দক্ষ বলিয়া আমরা আশা করি, 'সাহিত্য' কালে প্রথমশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইতে পারিবে। 'সাহিত্য' সকলের নিকট আদৃত হইয়াছে দেখিয়া বড়ই প্রীতি হইল। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।"—২য় বর্ষ; ৭। ৮ সংখ্যা; ১২৯৮।

সুলভ দৈনিক ;—"পুণ্য-শ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের মা-বাপ ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই মাসিক পত্রের সম্পাদক। তাঁহারই পবিত্র ভবন এই পত্রের কার্য্যালয়। যথার্থ পাত্রে, যথার্থ স্থানে ও যথার্থ সময়ে, বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ সেবা চলিতেছে। এখন এই মাসিক পত্রের নাম 'বঙ্গসাহিত্য' রাখিলেই যথার্থ নামকরণ হইবে।"—২১শে কার্ত্তিক, ১২৯৮।

সম্বলপুর হিতৈষিণী ;—"সাহিত্য-নামক খণ্ডিয়ে বঙ্গলা মাসিক পত্রিকা অনেক দিনরু আম্ভেমানে বিনিময়স্বরূপ পাই আসুঅছুঁ। বর্ত্তমান সাহিত্যের দ্বিতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা আম্ভমানঙ্কর হস্তগত হোইঅছি। পত্রিকার কলেবর বৃহৎ, কাগজ অত্যুত্তম, ছাপা অতি সুন্দর। লেখা গবেষণাপূর্ণ, মূল্য সুলভ। পুনশ্চ, এহি পত্রিকা খণ্ডি রীতিমত প্রকাশিত হেউঅছি। লেখকপদরে অনেক যোগ্য স্ত্রী পুরুষ নিয়োজিত হোই অছন্তি। আম্ভেমানে এহি পত্রিকার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করুঅছুঁ।"—৩০শে মার্চ্চ। ১৮৯২।

HOPE ;—"We have to make an apology to the publisher of the Bengali monthly magazine 'SAHITYA' for not having noticed it so long. The get-up as well as the contents of the Magazine are of superior order. The publisher has been fortunate enough to secure the help of all the prominent Bengali writers of the day, and with their help he will, we are sure, be able to make his magazine take its rank among the first-class periodicals of Bengal. One interesting feature of the Magazine is that the publisher has induced a number of our University graduates to write for it. The cultivation of Bengali literature by Young India is certainly a happy sign, and the growing literary excellence of the magazine is a proof that the worker and the field are not ill-suited for each other, as used to be supposed."—13.—12.—91.

INDIAN MASSENGER ;—"SAHITYA : a Bengali monthly edited by Sures Chandaa Samajpati. We have been receiving this Bengali periodical regularly for some months past. Its 'get up' is excellent, better than all its older rivals. It is being ably conducted. we are glad to see that along with some well-known Bengali writers many graduates have been contributing to its pages. Liberality of spirit marks many of the editorial utterances."—10.—1.—92.

Indian Nation.—SAHITYA, a Bengalee literary magazine issud every month, edited and published by Babu Suresh Chunder Samajpati It is one of the best of its kind. It yields to none in the quality of its articles and deserves encouragement.
—1. 2. 72.

Amria Bazar Patrika ;—"SAHITYA—a Bengalee Monthly Magazine Vol 11, No. 8. Agrahayana, 1298. The present number furnishes, as usual, a good deal of instrvctive and delightful reading. Among others, Babu Chandra Nath Bose M. A. Rabindra Nath Tagore, Rajani Kant Gupta, Chandra-Sikhar Mnkerjee and Nagendra Nath Gupta have written in the nnmber before us. We commend Babu Chandra Nath's thoughtful article on "Food" to our young men. The several short poems are all well written. We need hardly speak of the excellent get-up of the magazine ; in this respect, it has also throughout maintained a high place among Bengalee periodical publications."—17.—12.—91.

Indian Mirror ;—"SAHITYA : We have before us the Poas and the Magh numbers of the above named literary magazine. In an article, written tn the former number by Babu Rabindro Nath Tagore, the style and mode of reasoning of the so called "antiquarians" are very amusingly taken off. In the latter number, appears an interesting account of Jeypore and Amber. The Sahitya seems to be getting on very well so far as its literary contents and punctuality of issue are concerned.
—17.—2.—92.

মালা।

ভালবাসার জয়।

বৃথা ও ঘৃণার হাসি, বৃথা ও কথার ছল;
রবির কিরণ আমি তুমি মালঞ্চের ফুল!
বৃথা তব উপহাস, শাণিত কথার শূল;
রূপের পতঙ্গ তুমি আমি শ্যাম দুর্ব্বাদল!
জান না কি রবিরশ্মি যেই পুষ্পে গিয়ে পড়ে;
সেই পুষ্প হয়ে যায় কিরণে কিরণময়?
জান না কি প্রজাপতি যেই শষ্পে বসে উড়ে,
আহরিয়া তারি বর্ণ হয় গো সুবর্ণময়?
আমার সোহাগকুঞ্জে বসিয়া বসিয়া তুমি;
ভুলে যাবে ঘৃণা হাসি, হবে শেষে সোহাগিনী!
জান না কি, ভালবাসা ধরার পরশমণি?
ঘৃণার নিজস্ব হরে দিবানিশি চুমি চুমি!
আজি তুমি মন-সাধে, হেসে লও ঘৃণা হাসি;
কালি এ বক্ষেতে শোবে আপনা আপনি আসি!

তুমি।

"কোথা তুমি? কোথা তুমি? কোথা তুমি?" বলি,
জীবনের দীর্ঘ দিবা করি পর্য্যটন!
আমারি কণ্ঠেতে দোলে নব রত্নাবলী,
"কোথা হার" বলি তবু করি অন্বেষণ!
কস্তুরি-সৌরভাকুল মৃগের মতন,
হে বাঞ্ছিত! তোমা লাগি ছুটিয়া ছুটিয়া,
ক্লান্ত অবসন্ন দেহে প্রদোষে ফিরিয়া,
হেরিলাম, গৃহে শোভে অমূল্য রতন!
এস, তোমা চিনিয়াছি শৈশবসঙ্গিনি;
কূলে কূলে জলখেলা তোমাতে আমাতে,
ফুল তোলা, তারা গোণা, বাসন্তী নিশাতে,
ছাদেতে, চাঁদনি রাতে শৈশব-কাহিনী!
এই সব স্মৃতিপুষ্প অঞ্চলেতে পুরি,
তুমি আছ দ্বারে বসি; আমি ঘুরে মরি!

বঙ্গবধূ।

আজি কত হাসি খুসি! আমার বদনে
এত চাও, তবু যেন নাহি উঠে মন!
সেই বালিকার কথা নাহি কি স্মরণে,
থমকি চমকি যেই মুদিত নয়ন?
আগে কত কাঁদাকাঁদি! কত সাধাসাধি!
পড়িলে দীপের ছায়া উঠিতে শিহরি!
আজি শুধু হাসাহাসি! গলে বাঁধাবাঁধি!
প্রদীপ জ্বালিয়ে কাটে সারা বিভাবরী!
দুপুরে যে কলিগুলি (চাও আঁখি মেলি)—
তুলে এনে, ভেবেছিনু ফুটিবে না আর;
শাখী-ছাড়া, পাখী-হারা, একি চমৎকার!
সায়াহ্নে ফুটিয়া তারা হয়েছে চামেলি!
এমনি কি বৃন্তচ্যুত কুসুম-কলিকা,
স্বামী-গৃহে, ফুটে উঠে নবোঢ়া বালিকা!

মালিনী।

খোঁপায় গোলাপ চাঁপা দিলাম বসায়ে;
গলে পরাইয়া দিনু মালতীর মালা;
সিঁতিটি অশোক পুষ্পে দিলাম সাজায়ে;
দু করে পরায়ে দিনু অতসীর বালা;
উরস-কলস-যুগে নাগেশ্বর হার,
হেসে হেসে সযতনে দিলাম জড়ায়ে;
শ্রীভুজে গোলাপ পদ্ম দিলাম ধরায়ে;
কাঞ্চনের চন্দ্রহারে মরি কি বাহার!
দুইটি কদম্ব নিয়ে কর্ণে দিনু দুল—
তার পর, ধীরে ধীরে, থোকা-পুষ্প দিয়া,
সুন্দরীর চারু অঙ্গ দিনু সাজাইয়া,
লোচন ভ্রমর যুগে করিয়া আকুল!
আমার এ রূপতৃষ্ণা, হইয়ে মালিনী,
মালঞ্চের মধ্য ভাগে বসিল ভামিনী!

যাব না, যাব না!

আজি একাদশী; বৈশাখী মধ্যাহ্ন। রৌদ্রের উত্তাপে কাট ফাটিয়া যাইতেছে। ওই শোন, একাকিনী, নির্জ্জন কক্ষে, উর্দ্ধে মুখ তুলিয়া, বঙ্গবিধবা কি বলিতেছে।

তুমি ত চলিয়া গেলে, দাসীরে একেলা ফেলে,
তাহে খেদ নাহিক আমার।
সুধু এই খেদ নাথ, মৃত্যু বসি শিয়রেতে,
অভাগীরে ডাকে বারে বার।

যাব না, যাব না—
এখনো সময় মোর, হয় নাই হে মরণ,
সাধ মোর আছে বাঁচিবার;
ফুরায় নি সব আশা, এক ছাদ রোদ আছে,
কত মালা আছে গাঁথিবার!

যাব না, যাব না—
পাছে অভাগীর প্রাণে, যাতনা কি কষ্ট হয়,
হায় সেই ঋষিব্রত-ধারী,
রোগে জর জর তবু, মুখ টিপি হাসিতেন,
লুকাতেন নয়নের বারি!

যাব না, যাব না—
সে যে এত করে গেল, সে যে এত সহে গেল,
আধা তার সহিলাম কই?
দুই চারি একাদশী, করি বহে অশ্রু বারি,
আমাতে আমি গো যেন নেই!

যাব না, যাব না—
সারা দিন তুমি নাথ, মাথে করি ঝঞ্ঝাবাত,
শেল সম নিষ্ঠুর বচন,
কর্ম্মক্ষেত্রে মোর তরে, বিসর্জ্জিলে ক্ষীণ তনু,
আমারি কি সখের জীবন?

যাব না, যাব না—
হাত তুলে হেসে হেসে, অমন—অমন করে,
হে মরণ, ডেক না, ডেক না—
আমারে পরাতে বাস, সাজাতে সুন্দরী সাজ,
সে সহিত কতই লাঞ্ছনা!

যাব না, যাব না—
পীরানে বোতাম নাই! পাদুকাটি অর্দ্ধ ছিন্ন!
মোর হস্তে পরাত বলয়,
বুকে ধরিত না সুখ!—আমারি কি যত দুখ,
চেঁটি পরি দিন দুই ছয়!

যাব না, যাব না—
বৃথা এই জারি জুরি! নারীর ছলনা বাক্য,
বুঝে, ওই হাসিছে মরণ!
যাই! যাই! হাত ধরে, বুকেতে টানিয়া লও,
কোথা তুমি অমূল্য রতন?

একি নাথ, আজো তব অধরে মলিন হাসি,
মসী কালি সুবর্ণ তোমার!
এত নাথ খাটিয়াছ, শরীর ভাঙ্গিয়া গেছে!
শক্তি নাই কাছে আসিবার!

বল নাথ, বল বল, কোথায় বেঁধেছ ঘর?
খাটিতে হবে না তোমা আর!
কোলে তুলি, বুকে ধরি, প্রাণনাথ, প্রাণধন,
মুছাইব নয়ন আসার;
ফুটাইব হাসি রাশি অধরে তোমার,
সর্ব্বস্ব আমার!

কাঁদিতেছ? তোমরা তোমাদিগের পার্থিব রক্তজবা ও ধুতুরা তুলিয়া রাখ। দেখ, দেখ; বিধবার শবদেহে এক রাশি পারিজাত, মন্দার, নাগেশ্বর, সন্তানক, হরিচন্দন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

প্রকৃতির পরিচয়।

বালকের সহিত বৃদ্ধের তুলনা হয় না। বৃদ্ধের যে বিচার ও বিবেক শক্তি আছে, বালকের তাহা নাই ; বৃদ্ধের নিকট যে সৌন্দর্য্যানুভাবকতা শক্তি ও সৎপ্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, বালকের নিকট তাহা পাওয়া যায় না। যুবার স্মৃতিশক্তি ও কল্পনাশক্তি অতি প্রবল—বালকের স্মৃতিশক্তি প্রখর নহে, কল্পনাশক্তি অঙ্কুরিত মাত্র। বালককে দেখিয়া মানবজাতির দোষ গুণ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, মীমাংসা দুষ্ট হইবে।

অসভ্য ও সভ্যের তুলনা হয় না। অসভ্য মানবসমাজে বালক মাত্র। বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি আছে, কিন্তু আলোক ও তাপ না দিলে,নিহিত শক্তি বীজ হইতে অঙ্কুরিত হয় না। শিক্ষা ও সাধনায় সভ্য মানব সৎ-প্রবৃত্তির কর্ষণ করিয়াছে ও অসৎ প্রবৃত্তি উৎপাটিত করিয়াছে। কর্ষিত ক্ষেত্রের সহিত পতিত ভূমির তুলনা অসঙ্গত। ভূমির নিহিতশক্তি পরীক্ষা করিতে হইলে, উদ্যান ছাড়িয়া প্রান্তর পরীক্ষা করিতে হইবে। মানবজাতির আদিম প্রকৃতির অনুসন্ধান করিতে হইলে, অকর্ষিত আদিম অসভ্যদিগকে পরীক্ষা করিতে হইবে। এই জন্য মানব-প্রকৃতি নামক গ্রন্থে আমি অসভ্য জাতির এত অধিক পরিচয় দিয়াছি।

সাধনার ফল দেখিতে হইলে, সভ্যসমাজ ও উদ্যান পরীক্ষা করিতে হয়। মৌলিক প্রকৃতির সন্ধান করিতে হইলে, অসভ্য সমাজ ও প্রান্তর পরীক্ষা করিতে হয়। কিন্তু এ পরীক্ষা দুরূহ। অসভ্যের মনোভাব সভ্যের আয়ত্ত নহে ; ভাষার জটিলতা পরিহার করিলেও, এক জনের মনোভাব অন্যের বুঝা কঠিন—অসভ্যভাষা অপ্রসর। সে ভাষায় সকল ভাব প্রকাশ হয় না, অসভ্য সকল সময়ে সভ্যের সকল প্রশ্ন বুঝিতে পারে না। তাহার উপর, সে বিশ্বাস করিয়া সভ্যের নিকট সকল কথা বলিতে চাহে না। এই জন্য, একই জাতি সম্বন্ধে, একই পর্য্যটক ভিন্ন পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচারকেরা কুড়ি পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত অসভ্য সমাজের মধ্যে বাস করিয়াও, অসভ্যের সকল

তথাপিও, অনেকের চেষ্টার সমবেত ফলে, আমরা অসভ্য সমাজ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। যে সকল গুণে পশু ও মানব সমাজের বৈশেষিকত্ব স্থাপিত হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে। আমরা অতঃপর সেই সকল গুণের কিরূপ নিদর্শন অসভ্য সমাজে লক্ষ্য করা যায়,—দেখাইয়া,তাহার সহিত পশুপক্ষীর ঐ সকল গুণের তুলনা করিব।

বর্ব্বরপ্রকৃতিও ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে এবং সমীপবর্ত্তী সভ্য প্রকৃতি কর্ত্তৃক কিয়ৎপরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে মানব-জাতির যে প্রকৃতি ছিল, এখন কুত্রাপি তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না—পশু-প্রকৃতি বর্ব্বরসমাজেও নাই। স্বতই মানবপ্রকৃতি উন্নততর, শারীরিক গঠনে মনুষ্য যেমন পশু অপেক্ষা উন্নততর, মানসিক প্রকৃতিতেও সেইরূপ উন্নততর। যে দিন মনুষ্য সোজা হইয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে, সেই দিন তাহার প্রকৃতি, জীবপ্রকৃতির শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। মনুষ্য জীবরাজ্যের উৎকৃষ্ট শেষ ফল—পূর্ব্বতন সকল জীবের অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারী; সুতরাং মানবপ্রকৃতির বিবর্ত্তনক্ষমতা যে অন্য সকল জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহা বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু, তাই বলিয়া মানব ও পশুপ্রকৃতিতে প্রকারভেদ নাই, পরিমাণভেদ আছে মাত্র।

এখানে আর একটি কথার বিচার আবশ্যক। পশুদিগের মানসিক ব্যাবৃত্তির পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহা প্রতিপাদন করা আবশ্যক যে, পশু পক্ষীর মানসিক ক্ষমতা আছে। মনের সত্বা প্রমাণ না করিলে, তাহার ব্যাবৃত্তির আলোচনা অকর্ত্তব্য। অনেকের বিশ্বাস, পশু পক্ষীর কোন প্রকার বুদ্ধি নাই। বুদ্ধির যাহা নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় তাহাদের সহজাত। সহজাত বা স্বাভাবিক সংস্কার যে দেহজ ক্ষমতা নহে, এবং অপরিবর্ত্তনীয় নহে, ইহা বন্ধু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় গত দুইবারের 'সাহিত্যে' প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সে বিষয়ের পুনরালোচনা করিবার আবশ্যক নাই। তথাপি, দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার পার্থক্য কোথায়, উভয়ের লক্ষণ কি, এবং সেই লক্ষণানুসারে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের মানসিক ক্ষমতা আছে কি না, সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করা আবশ্যক।

বায়ু বহে—ভিন্ন দিক হইতে ভিন্ন সময়ে বহে—দিক ভিন্ন গতির পরিমাণ ভিন্ন। বায়ুর কি মানসিক ক্ষমতা আছে?—না। মনোবৃত্তি সজীব পদার্থে

ও নির্জীব পদার্থের বন্ধনী, বর্ত্তমান আলোচনায় তাহাদিগকে মনোবৃত্তিশূন্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, নিরভিপ্রায় কার্য্য মনোবৃত্তি-সূচক নহে। একবিধ অবস্থায় একবিধ কার্য্য অভিপ্রায়সূচক নহে। কার্য্যের বিভিন্নতা অভিপ্রায় সূচনা করে। সুতরাং বুদ্ধিসাধ্য কর্ম্মের নির্ণয় করিতে হইলে, সজীবতা ও অভিপ্রায়, এই দুইটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বায়ু সজীব নহে, সাভিপ্রায়ও নহে, সুতরাং বায়ুর গতি মনোবৃত্তি-সূচক নহে।

অভিপ্রায় কার্য্য দেখিয়া নিরূপণ করিতে হয়। কোন কোন ফুলে এমন কৌশল আছে যে, মক্ষিকা প্রফুল্ল হইয়া তাহাদের নিকট যায়, এবং যাইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের দেহসংশ্লিষ্ট পুংপরাগে কুসুমের জননক্রিয়া সাধিত না হয়, ততক্ষণ তাহারা নিষ্কৃতি পায় না। অন্যে, মধুভ্রমে প্রতারিত হইয়া রাক্ষসীর আলিঙ্গনে একবার আবদ্ধ হইলে প্রাণান্ত ঘটে, তাহাদের মাংসে লতিকার ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এরূপ কার্য্য অভিপ্রায়সিদ্ধ নহে—কেবল মাত্র শারীরিক সঙ্কোচন বিকোচন সঞ্জাত, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? বৃক্ষলতা সজীব ও সাভিপ্রায় বলিয়া বোধ হয়। অভিপ্রায় না থাকিলে, সন্ধ্যার সময় বক, তিন্তীড়ী প্রভৃতি বৃক্ষ, মানুষের চক্ষুর ন্যায়—পত্র মুদিত করিয়া নিদ্রা যায় কেন? কিন্তু এরূপ কার্য্যকেও আমরা অভিপ্রায়সিদ্ধ বলিব না। জড় হইতে অজড়ের উৎপত্তি কোথায়? ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণে কোথায় একটির অন্ত,—অন্যটির আরম্ভ—কে নির্ণয় করিতে পারে? অথচ, শ্বেত কৃষ্ণের প্রভেদ কে না জানে? অচেতন ও চেতনের পর্য্যায়ে, বন্ধনীশ্রেণীতে কোনটি চেতন, কোনটি অচেতন, বলা যায় না,—তেমনি চৈতন্যের ক্রমবিকাশে কোথায় মনোবৃত্তির আরম্ভ, তাহা নিশ্চিত হয় না।* পুরুভুজ ও প্রবাল, চেতন কি অচেতন যেমন বলা যায় না—সূর্য্যকিরণে কীটাণুকে প্রসারিত, অন্ধকারে আকুঞ্চিত—শ্বেতবৃন্তের নিকটে লতিকা নতাগ্র ও কৃষ্ণবৃন্তে লালায়িত দেখিয়া, লতাপ্রতানকে আশ্রয় অন্বেষণে অন্ধের মত চতুষ্পার্শ্বে হস্ত সঞ্চালন করিতে দেখিয়া আমরা বলিতে পারি না,—তাহাদের মনোবৃত্তি আছে কি না। যেখানে সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা নাই, এমন ক্ষেত্রে আমরা মনোবৃত্তি নির্দ্ধারণ করিব। এজন্য, জীবন ও অভিপ্রায়ের সঙ্গে মনোবৃত্তি নির্দ্ধারণে, আমরা চৈতন্যের অনুসন্ধান

করিব। অর্থাৎ, যে জীবের চৈতন্য আছে, এবং অভিপ্রায়ে চালিত হইবার ক্ষমতা আছে, আমরা তাহাকেই মনোবৃত্তিসম্পন্ন বলিয়া নিরূপণ করিব।

চৈতন্য দেখিয়া অভিপ্রায় অনুসন্ধান করা যায়। কিন্তু অভিপ্রায় দেখিয়া চৈতন্য অনুমান করা যায় না। অভিপ্রায় আছে, চৈতন্য নাই; এমনও অনেক কার্য্য দেখা যায়। তাহা মানসজনিত বলিবার আমাদের অধিকার নাই। এ সকল কার্য্যকে প্রতিস্যান্দিত বা প্রতিক্ষিপ্ত কার্য্য, বা সংক্ষেপে প্রতিষেক বা প্রতিক্ষেপ, বলা যাইতে পারে। ভেকের মস্তিষ্ক নিষ্কাশিত করিয়া চরণে স্থচিকা বিদ্ধ করিলে, সে চরণ অপসারিত করে—চক্ষুর নিকটে কীট উড়িয়া আসিলে চক্ষু স্বতই মুদ্রিত হয়, নিদ্রাবস্থায় পার্শ্ববেদনা হইলে লোকে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করে, আমার অজ্ঞাতে হৃদয় ধক্ ধক্ করে, এইরূপ কার্য্যকে আমরা প্রতিক্ষেপ বা প্রতিষেক কার্য্য বলি।

প্রতিক্ষেপক্রিয়া যন্ত্রক্রিয়ার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যন্ত্রকারের কৌশল অনুসারে, যন্ত্রের এক একটি অংশ, এক একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করে; উত্তেজনার পরিমাণানুসারে, সে অংশটি কতক্ষণ কি প্রকার কর্ম্ম করিবে, আমরা পূর্ব্বেই বলিতে পারি। সেইরূপ উত্তরাধিকার বা জন্মবৃত্তান্ত অবগত থাকিলে, কোন্ জীবের প্রতিক্ষেপক্রিয়া কিরূপ হইবে, ইহাও বলা যায়। যন্ত্র যেমন অভিজ্ঞতাবলে আপন কার্য্য পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, জীবও তেমনি অভিজ্ঞতাবলে যখন আপন ক্রিয়া পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না, তখন তাহার কার্য্যকে আমরা প্রতিক্ষেপ কার্য্য বলি। উত্তেজনাবিশেষের ফল কি হইবে, যখন আমরা বলিয়া দিতে পারি না, একইবিধ উত্তেজনায় জীব যখন আমাদের গণনার অতীত নূতন নূতন কার্য্য করে, অর্থাৎ আপন অভিজ্ঞতায় কার্য্য পরিবর্ত্তন করে, তখন তাহাকে আমরা মনোবৃত্তিসম্পন্ন জীব এবং তাহার কার্য্যকে মনোবৃত্তিপরিচালিত কার্য্য বলি। স্থতরাং, অপরিবর্ত্তনীয় সহজাত-সংস্কার যান্ত্রিক ক্রিয়া মাত্র, তাহাকে প্রতিক্ষেপ বলা যায়। তাহা মানস ক্রিয়া নহে। প্রকৃতপক্ষে যে সকল কার্য্যকে সহজাত-সংস্কার নাম দেওয়া হয়, তাহা অপরিবর্ত্তনীয় নহে—জীব অভিজ্ঞতা বলে তাহা পরিবর্ত্তন করিতে পারে ও করে। স্থতরাং সে সকল কার্য্য প্রতিক্ষেপ কার্য্য নহে। যে সংস্কার চিরদিন অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাকেই প্রতিক্ষেপ কার্য্য বলিতে বাধ্য হইব। বস্তুতঃ, সহজাত-সংস্কার অন্যান্য গুণের ন্যায় উত্তরাধিকারস্থত্রে লব্ধ হইলেও, তাহা অপরিবর্ত্তনীয়ও নহে, প্রতিক্ষেপক্রিয়াও নহে। যে সকল

মানসিক কার্য্য দূরদর্শনে অধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয় না, লোকে তাহাকে সহজাত-সংস্কার বলিয়া থাকে। স্নায়ুমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কারণসাপেক্ষ কার্য্য যখন গণনা করিতে পারি না—অভিজ্ঞা যখন গণনা পণ্ড করিয়া দেয়, তখন সে কার্য্যকে মানসিক কার্য্য বলিতে হয়। সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না। জীবপর্য্যায়ে উন্নত জীবের মনোবৃত্তির এইরূপ স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। বনবাসী বর্ব্বরেও কার্য্য মনোবৃত্তির পরিচায়ক, পশু পক্ষীর কার্য্যেও মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ঊর্ণনাভ, মক্ষিকা ও পিপীলিকার কার্য্যে মনোবৃত্তি কে সন্দেহ করিবে। স্নায়ুমণ্ডলের প্রকৃষ্টতার পরিমাণ যত অধিক, মানসিক ব্যাবৃত্তি তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। স্নায়ুমণ্ডলের ব্যাবৃত্তি সভ্য লোকের যত দেখিতে পাওয়া যায়, অসভ্যের তত নহে। বয়স্কের যত, বালকের তত নহে। এখন অসভ্যের মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া যাউক।

মনুষ্য ও পশুবুদ্ধির তুলনা করিবার জন্য, বৈশাখ মাসের প্রবন্ধে আমরা যে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একটির—পশুবুদ্ধি যে অপরিবর্ত্তনীয় নহে—বন্ধু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, মানুষের মত পশুবুদ্ধিও ক্রমবিকাশসাপেক্ষ—সুতরাং, সে বিষয়ে নূতন আলোচনা করিবার আবশ্যক নাই। ১ স্মৃতি, ২ কল্পনা, ৩ সৌন্দর্য্যানুভাবকতা, ৪ দয়া, বিনয়, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি, ৫ বিচার, ৬ বিবেকশক্তি এবং ৭ ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা, পশুপক্ষী অপেক্ষা বর্ব্বরদিগের কত অধিক, তুলনা করিয়া দেখা যাউক।

স্মৃতি—"স্মৃতি বা চিন্তাশক্তি খাটাইতে হয়, এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, অসভ্যের মন টলমল করিতে থাকে। ব্রাজীলের অসভ্যেরা দু'একটি কথার উত্তর দিয়া অধীর হইয়া পড়ে এবং নির্ব্বোধের মত কত কথা বলিতে থাকে। দামারা জাতি পাঁচটির অধিক গণিতে হইলে বিষম গোলে পড়ে। একটি ভেড়ার দুই আঁটি তামাক দাম হইলে, দুইটা ভেড়ার দাম কত হইবে, হিসাব করিতে পারে না। একবার দু আঁটি তামাক দিয়া ভেড়াটি লুকাইয়া আবার একটি কিনিতে হয়। অথচ, এক পাল গরুর মধ্যে একটি হারাইলে অনায়াসে বুঝিতে পারে। কারণ, ভিন্ন ভিন্ন গরুর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতে থাকে।"—মানব-প্রকৃতি ; প্রথম খণ্ড।

ইহা দ্বারা প্রমাণ হইল না যে, বর্ব্বরদিগের স্মৃতিশক্তি নাই। তাহারা

ঘটনা সকল তাহাদের স্মৃতির অতীত নহে। ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি যখন তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে থাকে, তখন দৃষ্ট পদার্থের রূপ, শ্রুত ঘটনার বিবরণ, দৃঢ়রূপেই তাহাদের স্মৃতির উপর বসিয়া যায়। সুতরাং, স্মৃতির গাঢ়ত্বের তাহাদের অভাব নাই। কিন্তু জটিলতা ও সূক্ষ্মতার অভাব আছে। স্মৃতির বিভিন্ন অংশ আছে, দু'একটি অংশে বর্ব্বরেরা সভ্যদিগেরও শ্রেষ্ঠ। তাহারা বালুকার উপর পদচিহ্ন দেখিয়া বলিতে পারে,কোন্ জাতীয় লোকের চিহ্ন, সভ্যলোকে তাহা পারে না। কিন্তু স্মৃতির অন্য অংশে তাহারা নিতান্ত হীন। স্মৃতির উৎপত্তি ও প্রকারভেদ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিলে প্রবন্ধ নিতান্ত কর্কশ হইবে—সাময়িক পত্রিকার উপযুক্ত হইবে না।

লন্সডেল সাহেব দু'টি শম্বুক লইয়া একটি বাগানে রাখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটি দুর্ব্বলতর ছিল। সে বাগানে শম্বুকের উপযোগী খাদ্য দ্রব্য অধিক ছিল না। এক দিন সাহেব দেখেন, ভাল শম্বুক নাই। তাঁহার মনে হইল, পীড়িত সহচরকে পরিত্যাগ করিয়া, সে পলায়ন করিয়াছে। প্রাচীরে চিহ্ন দেখিয়া বোধ হইল, সেই পথে সে গিয়াছে। পর দিন দেখা গেল, সে সেই দেয়াল দিয়া ফিরিয়া আসিয়া, পীড়িতকে কি বলিল,এবং উভয়ে প্রাচীর উত্তীর্ণ হইয়া, দূরে খাদ্যপূর্ণ এক ক্ষেত্রে এক সঙ্গে চলিয়া গেল। কোন্ পথে সে গিয়াছিল, শম্বুক চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তাহা স্মরণ রাখিয়াছিল।

পিপীলিকারা গোলাম পোষে, অনেকেই জানেন। ফোরেল সাহেব দেখিয়াছেন, বৃহৎ পিপীলিকারা চারি মাস পরে স্থানান্তরীকৃত গোলামদিগকে চিনিতে পারিয়াছিল। সার জন লবক দেখিয়াছেন, স্থানান্তরীকৃত কোন আত্মীয় ফিরিয়া আসিলে, এক বৎসর পরেও পিপীলিকারা তাহাকে চিনিতে পারে। রোমানিস সাহেব বলেন, পুরাতন বাসস্থানের কথা ইহারা এক বৎসর স্মরণ রাখিতে পারে।

এক জাতীয় সকল মক্ষিকার স্মৃতিশক্তি সমান নহে। সার জন লবক বলেন, কোন কোন মক্ষিকা তিন মাস, কেহ এক বৎসর পর্য্যন্ত কোন স্থানে কোন দ্রব্যবিশেষ সঞ্চিত থাকে, তাহা স্মরণ করিয়া ফিরিয়া আসে। একটি মৌমাছি নয় মাস পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিলেই হুল গুটাইয়া তাঁহার হাতে বসিয়া আহার অন্বেষণ করিত। হুবার সাহেব বলেন,শরৎকালে তিনি জানালার উপর একটু মধু রাখিয়া দিতেন, খাইবার লোভে নিত্য সেখানে মক্ষিকা

রাখিয়াছিলেন, বসন্তকালে একদিন জানালা খুলিবামাত্র দলে দলে অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও তিনি সেখানে মধু রাখেন নাই।

মৎস্য ও ভেক ব্যক্তিবিশেষের স্বর স্মরণ রাখিতে পারে। একটি ভদ্রলোক একটি ভেককে টমি বলিয়া ডাকিতেন। পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া তিনি টমি বলিয়া ডাকিলে, সে জঙ্গল হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া,সাঁতরাইয়া পুকুর পার হইয়া তাঁহার নিকট আসিত, এবং হাতের উপর উঠিয়া বসিত। প্রাতঃকালে তিনি তাহাকে একবার মাত্র আহার দিতেন। কিন্তু দিনে রাত্রে তিনি যখন তাহাকে ডাকিতেন, সে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিত। পেনেণ্ট সাহেব বলেন, একটি ভেক তাঁহার বাড়ীতে ছত্রিশ বৎসর ছিল। সে বাড়ীর সকলকে ও তাঁহার বন্ধুদিগকে চিনিত।

একটি বৃদ্ধা রমণী ত্রিশ বৎসর একটি কচ্ছপ পুষিয়াছিলেন। সে দূর হইতে তাঁহাকে দেখিলে তাড়াতাড়ি উঠিতে পড়িতে আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। অন্যকে গ্রাহ্য করিত না। একটি ভদ্রলোক নাম ধরিয়া ডাকিলেই, তাঁহার কচ্ছপ তাঁহার নিকট আসিয়া মুখ দিয়া পায়ের উপর আঘাত করিত, তাঁহার বন্ধু বান্ধব ডাকিলে সে গ্রাহ্য করিত না। একবার কয়েক সপ্তাহের জন্য তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয়—তিনি ফিরিয়া আসিয়া ডাকিবামাত্র কচ্ছপ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।

গত শতাব্দীতে মাদ্রাজে ডাক্তার বিগট একটি সাপ পুষিয়াছিলেন। ফরাসীরা মাদ্রাজ অধিকার করিয়া সেই সাপটিকে একটি গাড়ী করিয়া পণ্ডিচেরীতে লইয়া গিয়াছিল। সেখান হইতে সে কয়েক দিন পরে পলাইয়া আপন পুরাতন বাসস্থানে আসিয়াছিল।

লর্ড রসেল দেখিয়াছেন, একটি ভদ্রলোক কয়েকটি সাপ পুষিয়াছিলেন। তাহারা তাঁহার পরিবারের কাহাকেও দেখিলে, হাতে পায়ে অলঙ্কারের মত জড়াইয়া আদর করিত। তাহাদিগকে আপন বাসস্থানে যাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে অনুমতি করিলে, আজ্ঞা পালন করিত। দেড় মাসের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হওয়ায়, সাহেব বোড়া সাপটিকে পশু-বাটিকায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেখানে সে বড়ই বিমর্ষ হইয়াছিল। দেড় মাস পরে পশুবাটিকায় সাহেবকে দেখিয়া, সে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া নানাপ্রকার অতুল আনন্দের পরিচয় দিয়াছিল।

অংশ ভুলিয়া গেলে, দু একবার চেষ্টা করিয়া, সেই বিস্মৃত অংশ স্মরণ করিয়া লইবার ক্ষমতা তাহাদের আছে। নিম্নতর জীবে এই শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। একটি ভদ্রলোক একটি কাক পুষিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে সে পলাইয়া যায়। এগার মাস পরে সাহেব যখন বন্ধুদিগের সঙ্গে বেড়াইতেছিলেন, একটি দলের মধ্য হইতে সহসা একটি কাক উড়িয়া আসিয়া সাহেবের কাঁধের উপর বসিয়া পাখা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল। সাহেব চিনিতে পারিলেন, এ সেই পোষা কাক। খানিকক্ষণ আদর করিয়া, কাক দলে মিশিয়া দূর দূরান্তে চলিয়া গেল।

অশ্বেরা আট বৎসর পরে প্রাচীন বাসস্থান স্মরণ করিতে পারে, দেখা গিয়াছে। পলায়িত হস্তীকে পনর বৎসর পরে ধরিয়া দেখা গিয়াছে, বিভিন্ন আদেশের শব্দ তাহার স্মরণ আছে। কুকুরেরা পাঁচ বৎসর পরে প্রভুকে চিনিয়াছে, দেখা গিয়াছে। বানর মরণ পর্য্যন্ত প্রাচীন প্রভুকে বিস্মৃত হয় না। এ সকল জীবের স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করিবার অবসর সকলেরই আছে, সুতরাং ইহাদের স্মৃতিশক্তিসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। শম্বুক, ভেক, সরীসৃপের যখন এত উচ্চদরের স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া গেল, তাহাদের অপেক্ষা উন্নততর জীবের স্মৃতিশক্তির ব্যাবৃত্তি যে অধিক হইয়াছে, ইহা যেমন অনুমান করা যাইতে পারে, তেমনি পরীক্ষা করিয়াও সকলে দেখিতে পারেন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

কাশ্মীরের বর্ত্তমান অবস্থা।

সর জেম্‌স্‌ লায়েল যে সময় পঞ্জাবের আধিপত্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, সে সময় পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীনস্থ রাজা ও নবাবের দল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে কাশ্মীরের মহারাজা ও তাঁহার

পাতের অভ্যাস না রাখিলে বন্দুকে ও সাঙ্গীনে মরিচা পড়িবার ভয়, আর উপাধি-সম্মানের স্রোতও শুষ্কপ্রায় হয়। লর্ড সল্‌স্‌ব্রী বলিয়াছেন যে, সমুদ্রের উপকূলে যেরূপ সর্ব্বদা তরঙ্গোচ্ছ্বাস হয়, সভ্যতার উপকূলেও সর্ব্বদা সেইরূপ ছোট ছোট যুদ্ধের তরঙ্গাঘাত করে। সম্প্রতি হুঞ্জা-নগরের কয়েক জন প্রধান ব্যক্তিকে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগর নগরী প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহারা দেশে ফিরিয়া গিয়া সেই সব গল্প করিবে ও তাহাদের স্বজাতীয়েরা ইংরাজের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য অবগত হইয়া গবর্মেণ্টের শরণাপন্ন হইবে। হুঞ্জা-নগরের যুদ্ধ বর্ণনা, কর্ণেল ডিউরাণ্ডের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে। সে বৃত্তান্ত এ স্থলে বর্ণনীয় নয়। গিলগিট্‌ কিরূপে অধিকৃত হইয়াছে, তাহাই বলা আবশ্যক। গত ৬ই জানুয়ারি তারিখে, গবর্মেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, সেক্রেটরি অব্‌ ষ্টেটকে হুঞ্জা-নগর যুদ্ধ সংক্রান্ত এক পত্র লেখেন। এক দিকে পত্র যেমন সম্পূর্ণ, অপর দিকে সেইরূপ অসম্পূর্ণ। যুদ্ধবিবরণ যথেষ্ট আছে, কিন্তু গিলগিটে গবর্মেণ্ট কেন সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। গিলগিট্‌ শ্রীনগরের উত্তরে, গিলগিট্‌ ও হুঞ্জানগরের পথে চল্‌ট্‌ নামক দুর্গ। গিলগিট্‌ পূর্ব্বে স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, কিন্তু বহুকাল হইতে কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত। যেমন জম্বু ও শ্রীনগরে গবর্ণর নিযুক্ত ছিল, গিলগিটেও সেইরূপ গবর্ণর ছিল। কাশ্মীরের উত্তরে মহারাজের অধীনস্থ ও করপ্রদ অনেকগুলি প্রদেশ। গিলগিটের গবর্ণর এই গুলিকে শাসন করিতেন। নগর প্রদেশের রাজা, হুঞ্জার রাজাকে জয় করিবার মানসে, কাশ্মীর দরবারের সহিত ১৮৭৭ সালে সন্ধি স্থাপন করেন। সেই বৎসর হইতে কাশ্মীরের সৈন্য চল্‌ট দুর্গ অধিকার করে। ১৮৮৮ সালে হুঞ্জা ও নগর জাতিরা মিলিত হইয়া চল্‌ট দুর্গ হইতে কাশ্মীর-সৈন্যদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, ও গিলগিট আক্রমণ করিবার উপক্রম করে। তাহাদিগকে দমন করিবার নিমিত্ত, কাশ্মীর দরবার সাত সহস্র সৈন্য প্রেরণ করেন। পরে পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হয় ও কাশ্মীর-সৈন্য পূর্ব্বের ন্যায় চল্‌ট্‌ দুর্গ অধিকার করে। কিছু দিন পরেই ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট গিলগিটে এজেন্সি স্থাপন করেন। ১৮৮০ সালের পর, গিলগিটে ব্রিটিশ এজেণ্ট কেহ ছিল না। সহসা নয় বৎসর পরে আবার কেন এজেন্সি স্থাপিত হইল, তাহার কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। গবর্মেণ্টের পত্রেও কোন কারণ লিখিত নাই। ১৮৮০ সালে রণবীর সিংহ জীবিত ছিলেন। গিলগিটে ব্রিটিশ এজেন্সি সম্বন্ধে তাঁহার আপত্তি

থাকিতে পারে। তাঁহার জীবিতাবস্থায় সে কথা আর উত্থাপিত হয় নাই। রণবীর সিংহ অনেকটা তেজের সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনিও চক্ষু বুজিলেন, আর কাশ্মীরের রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন। একদিকে প্রতাপ সিংহকে লইয়া টানাটানি আরম্ভ হইল, অপর দিকে গিলগিটে এজেন্সি স্থাপিত হইল। কারণ কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাশ্মীর দরবার হঞ্জা-নগর জাতির বিপক্ষে গবর্মেণ্টের নিকট সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। স্বীয় সৈন্যবলে চণ্ট্ দুর্গ পুনরায় অধিকার করিয়াছিলেন। গিলগিটে এজেন্সি স্থাপন করিবার কারণ এই যে, সে দিকেও রুসাতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। রুসের ভয়ে ডরাইয়া ডরাইয়া গবর্মেণ্ট্ প্রায় মারা গেলেন। গিলগিটে আর কাশ্মীরীয় গবর্ণরের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। ১৮৮৯ সালে কাপ্তেন ডিউরাণ্ড এজেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার নিকট হঞ্জা ও নগরবাসীরা গবর্মেণ্টের প্রভুত্ব স্বীকার করিল। কিছু দিন পরে তাহারা আবার গোলযোগ করিতে লাগিল। গিলগিটের পথ কাশ্মীর দরবার বিপুল ব্যয়ে নির্ম্মিত করিতেছেন। হঞ্জা-নগরের সহিত যুদ্ধ হইল, অধিকাংশ সৈন্য কাশ্মীরের। কাশ্মীর দরবার রসদ যোগাইলেন, সমস্ত ব্যয় বহন করিলেন। পুরস্কার ও উপাধি পাইলেন—গবর্মেণ্টের সৈন্যাধ্যক্ষগণ। মহারাজা ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ পাইলেন—গবর্মেণ্টের ধন্যবাদ। সহজ বুদ্ধিতে দেখিতে গেলে এই স্থানে বড় গোল ঠেকে। গবর্মেণ্ট কাশ্মীর দরবারকে ধন্যবাদ দিবেন না মহারাজা গবর্মেণ্টকে ধন্যবাদ দিবেন? গিলগিট সম্পত্তি কাহার? গবর্মেণ্ট পত্রে স্পষ্ট লিখিতেছেন, গিলগিট কাশ্মীর রাজ্যের অংশ। তাহা হইলে গবর্মেণ্ট কাশ্মীর দরবারকে ধন্যবাদ দেন কেন? যদি কেহ তোমার সম্পত্তি রক্ষা করে বা তোমার সম্ভ্রম বজায় রাখে, তাহা হইলে তাহাকে তোমারই ধন্যবাদ দিবার কথা। সে কিসের জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিবে? গিলগিট গবর্মেণ্টের না মহারাজা প্রতাপ সিংহের? ভাবে বোধ হয়, গিলগিট গবর্মেণ্টের হাতেই রহিল। হয় ত কোন দিন গিলগিটে কোয়েটার ন্যায় দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মিত হইবে। কোয়েটা বেলুচিস্থানের অন্তর্গত। গবর্মেণ্ট বেলুচিস্থানের যে প্রদেশ অধিকার করিয়াছেন, তাহার জন্য খাঁকে বার্ষিক লক্ষ টাকা কর দেন। কিন্তু কেলাতের অধিপতি যদি আবার কোয়েটা ফেরত চান, তাহা হইলে হয় ত কোয়েটার

গিলগিটের অভিমুখে রুস-ভয় আছে, তাহা হইলে তাঁহারা গিলগিট ত্যাগ করিবেন না। দুর্গনির্ম্মাণে, বর্ত্ম প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হইবে, তাহা মহারাজাকেই দিতে হইবে, কারণ রুস হইতে গবর্মেণ্টের যে আশঙ্কা, তাঁহারও সেই আশঙ্কা। এমন স্থলে ইংরাজ একাউণ্টেণ্ট জেনেরল নিযুক্ত হইলে কত সুবিধা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

কাশ্মীরে এখন মহারাজা প্রতাপ সিংহের কোনই ক্ষমতা নাই। এ দিকে গবর্মেণ্টের ন্যায়পরায়ণতার বিস্তর সুখ্যাতি হইতেছে। সেক্রেটারি অব ষ্টেট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইয়াছে, অথচ প্রতাপ সিংহ যেমন ক্ষমতাশূন্য ছিলেন, সেইরূপই রহিয়াছেন। তিনি আর কখন মাথা তুলিতে পারিবেন না। কাশ্মীরের শাসন প্রকৃত পক্ষে এখন গবর্মেণ্টের হাতে। ক্রমে সেই শাসন বাড়িতেই থাকিবে। পারিবারিক কলহ সেইরূপই আছে। অমর সিংহ যতক্ষণ মহারাজার নিকট থাকিবেন, চক্রান্ত কখনও থামিবে না। গবর্মেণ্টের যদি মহারাজার হস্তে রাজ্যভার দিবার বাস্তবিক ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে অমর সিংহকে তাঁহার জাগীরে পাঠাইয়া দিতে হয়। কিন্তু সে কথা কখন হয় নাই। রাজা অমর সিংহের রাজ্য পাইবার আশা সম্বন্ধে একটা গোপনীয় কথা আছে। মহারাজা রণবীর সিংহ পিতার তৃতীয় পুত্র ছিলেন। অমর সিংহও পিতার তৃতীয় পুত্র। এক জন গণককার তাঁহাকে কহিয়াছিল যে, জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা স্বত্বেও তিনি রাজত্ব পাইবেন। রণবীর সিংহও অমর সিংহকে বড় ভাল বাসিতেন। এই জন্য তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে, তিনি রাজত্ব প্রাপ্ত হইবেন। আরও দুই একটি পারিবারিক ঘটনার উল্লেখ করা উচিত। মহারাজা প্রতাপ সিংহের অনেক দিন পর্য্যন্ত সন্তানাদি হয় নাই। সম্প্রতি তাঁহার একটি কন্যা হইয়াছে। অতঃপর পুত্রসন্তানও হইতে পারে। তাহা হইলে ভ্রাতৃবিরোধ আরও বাড়িবে। রাজা অমর সিংহের একটি পুত্র হইয়াছিল, সেটি বিনষ্ট হইয়াছে। গৃহে কলহ, বাহিরে বলশূন্য,—কাশ্মীর রাজবংশের অধঃপতনের বাকি রহিল কি? মোটে তিন পুরুষ হইতে ইহাঁরা রাজ্যভোগ করিতেছেন। গুলাবসিংহ ইংরাজের সহায়তা করেন, প্রচুর অর্থ প্রদান করেন, বিনিময়ে ইংরাজেরা তাঁহাকে কাশ্মীর প্রদান করেন। প্রদানই বা কিরূপ। কাশ্মীর লইয়া ইংরাজেরা

অধীন ছিল না যে, তাঁহারা নিজের রাজ্যাংশ দান করিলেন। গুলাবসিংহ আপনার বলে কাশ্মীর অধিকার করিলেন, রাজ্য স্থাপন করিলেন। তাহার পর কাশ্মীরের প্রতি নজর পড়িল। এমন রম্যপ্রদেশ, মর্ত্ত্যে স্বর্গতুল্য, দেখিয়া শুনিয়া ইংরাজেরা ছাড়িয়া দিলেন। দুই পুরুষ গেল। কাশ্মীরের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিবার অবসর হইল না। এপর্য্যন্ত কাশ্মীর অধিকার করিবার গবর্মেণ্টের কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। মহারাজা কিছু দিন অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি আবার রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্তই যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে। তবে, গবর্মেণ্ট, মহারাজার শুভানুধ্যায়ী, এজন্য, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার জন্য কর্ম্মচারী মনোনীত করিয়া দিয়াছেন। গিলগিটে মহারাজার আশঙ্কার কারণ আছে, এজন্য গিলগিটের ভার গবর্মেণ্ট গ্রহণ করিলেন। মহারাজা এখন নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। রাজ্যের জন্য তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইবে না। ভ্রাতাদিগের সহিত কলহ রহিয়াছে, একান্তচিত্তে মহারাজা সেই কলহ মিটাইবার চেষ্টা করিতে পারেন।

কাশ্মীরের এই অবস্থা। এতদিন যে আশঙ্কা ছিল, তাহা প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হইতেছে। কাশ্মীরের রাজবংশ কতদিন টিকিবে, বলিতে পারি না। এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে, সেরূপ অনেক দিন থাকিতে পারে। কিন্তু কাশ্মীরের যথার্থ শাসনকর্ত্তা কে, তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছে, গুলাবসিংহ ও রণবীরসিংহের কাশ্মীর আর নাই।

এই প্রবন্ধ লিখিত হইলে পর, মহারাজা প্রতাপ সিংহ ভারত-সাম্রাজ্ঞীর জন্মতিথি উপলক্ষে জি. সি. এস্. আই. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই উপাধি তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই প্রাপ্য, এতদিন গবর্মেণ্টের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন বলিয়া পান নাই। তাঁহাকে এই উপাধি দিয়া গবর্মেণ্ট উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ত্যাগ বা পরিবর্ত্তন করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। যদি গবর্মেণ্ট প্রতাপ সিংহের আচরণে ও তাঁহার রাজভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, তাঁহার হস্তে রাজ্যশাসন ভার প্রত্যর্পণ করেন, ও গিলগিট্ কাশ্মীর কর্ম্মচারীর অধীন করেন। যে পর্য্যন্ত এরূপ না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত প্রতাপ সিংহ নামমাত্র মহারাজা রহিবেন।

সংসারে শিশু।

সকলেই জানেন, গৃহে ছেলে না থাকিলে সংসার কি বিমর্ষ বোধ হয়, বাড়ী কেমন ফাঁক ফাঁক দেখায়। ঘরে হাজার লোক থাকিলেও, একটি শিশুর অভাবে উহা যেন ঘোর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ মনে হয়। সেই জন্যই বোধ করি, আমাদের দেশের লোকে 'আঁটকুড়া' গালাগালিতে অত্যন্ত মনঃপীড়া পাইয়া থাকেন। কিন্তু,বাস্তবিক, ওরূপ তিরস্কারে সকল দেশের লোকেই সমান দুঃখ অনুভব করে। কি আসিয়িক মাতা, কি ইউরোপীয় জননী, কি আফরিক রমণী—প্রথম সন্তান বুকে ধরিতে সকলেরই একরূপ উল্লাসে প্রাণ ভরিয়া উঠে; শিশুর মুখে 'বাবা' ডাক শুনিলে সকল পিতারই হৃদয়ে একরূপ স্নেহের উৎস ছুটে!

কিন্তু,এই যে আমাদের সংসারের অলঙ্কার, এত আদর ও যত্নের ধন শিশু, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের জন্য আমরা কি করিয়া থাকি? নিঃসন্দেহ সন্তানকে সুখে রাখিতে বা সুখী করিবার বাসনায়, কোন পিতামাতা আপনাদের প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু কেবল ঐ প্রাণ দিয়া ভালবাসাতে শিশুকে সমস্ত জীবন সুখী করিতে পারা যায় না। উহার জন্য পিতামাতার অসীম জ্ঞান চাই, শিক্ষা চাই, স্নেহপূর্ণ হৃদয়ের ন্যায় বুদ্ধিপূর্ণ মস্তিষ্ক চাই। সন্তানের শারীরিক যত্নের ন্যায় নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা চাই। কিন্তু এ জগতে কয় জন লোক ঐরূপ শিক্ষার উপযোগিতা বুঝেন? বিশেষ, আমাদের দেশের পিতামাতারা উহার আবশ্যকতা স্বীকারই করেন না। সেই জন্যই বোধ হয়, আমাদের বাঙ্গালা দেশে এত হৃদয়হীন যথেচ্ছাচারী যুবক দেখা যায়। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি,কত মাবাপ প্রাণপণ যত্নে যে পুত্রদিগকে পালন করেন,সেই ছেলেরা আবার বড় হইয়া পিতামাতার অপমান করিতে ছাড়ে না। এস্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাপমায়েরা যদি বাল্যকাল হইতেই, শিশুদের শরীরের ন্যায়, মনের এবং হৃদয়েরও পুষ্টিসাধন করিতে যত্নবান হন, তাহা হইলে, ওরূপ দুঃখময় ঘটনা সংসার হইতে একেবারে তিরোহিত হয়। কিন্তু ঐ শিশুশিক্ষা প্রকৃতরূপে বুঝিতে হইলে, আগে আরও দুই একটি বিষয় জানা আবশ্যক।

আজকাল ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্রই, সংসারে শিশুদের স্বত্ব ও সন্তানের উপর পিতামাতার অধিকার লইয়া মহা আন্দোলন চলিতেছে; ঐ আন্দোলনের স্রোত ক্রমে আমাদের ভারতেও আসিয়াছে, সুতরাং এ স্থলে, সে বিষয়ে দু'একটা কথা বলাও অসঙ্গত হইবে না। আমাদের দেশীয় পিতামাতারা ত কখন মনেও ভাবিতে পারেন না যে, শিশু তাঁহাদের প্রাণের ধন হইলেও সে একটি স্বতন্ত্র জীব, ঈশ্বর তাহাকেও অন্যান্য লোকের ন্যায় মানসিক বৃত্তিনিচয় ও তৎসমুদায় পরিচালন করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে তাহাকে নিজের পথ দেখিয়া চলিতে হইবে, সুতরাং বাল্যাবস্থা হইতেই তাহাকে অল্প অল্প স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এমন কি, ইউরোপের অনেক পিতামাতারাও এপর্য্যন্ত ঐ প্রকৃতবাদের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। তবে ইউরোপের সর্ব্বত্রই যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তাহাতে পিতামাতার ঐরূপ ভ্রান্ত সংস্কার যে অল্প দিনের মধ্যেই বিদূরিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অনেকে বলিতে পারেন যে, শিশুর জীবনধারণোপযোগী সমস্ত দ্রব্যের যোগাড় করিয়া পিতা মাতা সন্তানের সহিত যে সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ হন,সে সম্বন্ধ, অন্যান্য লোকের পরস্পরের প্রতি সম্বন্ধ হইতে অনেক বিভিন্ন, অতএব উহার উপর জগতে মানুষের সমস্বাধীনতার আইন খাটান যাইতে পারে না। কিন্তু উহার উত্তর এই যে—ঐরূপ লালনপালনের দ্বারা পিতামাতা সন্তানের উপর কতকটা বশ্যতা স্থাপন করিতে পারেন বটে, আর তাঁহাদের ঐ স্বাভাবিক দাবী আছে বলিয়াই, যখন তাঁহারা অক্ষম হন, তখন সন্তানের দ্বারা সযত্নে পালিত হইবার তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। অথচ, সন্তানের উপর বাপমার প্রভুত্বস্থাপনের কিছুমাত্র অধিকার নাই। কেন না, ঐ শিশু ও পিতামাতা সম্বন্ধে যদি একদিকে উপকার ও অন্যদিকে বাধ্যতার দ্বারা শিশুর প্রতি জনকজননীর প্রভুত্ব করিবার অধিকার জন্মায়, তবে অন্যান্য বিষয়েও ঐরূপ হওয়া উচিত। তাহা হইলে, যে কোনও ব্যক্তি আর এক জনের কোন উপকার করেন, তিনি ঐ উপকৃত ব্যক্তির উপর নিজ প্রভুত্ব খাটাইবার অধিকার পান। কিন্তু ওরূপ সিদ্ধান্তের উপযোগিতা স্বীকার করা যায় না। আরও কথা এই যে,যদি পিতার সম্বন্ধ অনুসারে তিনি সন্তানের সকল প্রকার স্বাধীন ইচ্ছা, বৃত্তি বা কাজ দমন করিয়া রাখিবার অধিকার পান,

আর ঐ অধিকারের সীমাই বা কতদূর ও তাহার শেষই বা কোথায়? ইহা স্থির করা ত আমাদের অসাধ্য বোধ হয়।

সেই জন্য ঈশ্বর প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ন্যায়, শিশুদিগকেও বৃত্তিসমূহ দিয়াছেন, এই স্বাভাবিক বিধানেই আমরা শিশুর স্বত্বের মূল দেখিতে পাই। ঈশ্বরদত্ত এই সকল বৃত্তির চালনায় কিছুমাত্র বাধা না দিয়া, বরং উহার অবাধে পরিচালনের নিমিত্ত নানাপ্রকার সুবিধা ও উপায় করিয়া দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য। কিন্তু, তাহার পরিবর্ত্তে, পিতামাতা যদি সন্তানের সকল স্বাধীন ইচ্ছা ও বৃত্তিসমূহ দমন করিয়া রাখিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলে তাঁহারা ঈশ্বরের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করিয়া, জগতের মহা অপকার সাধন করিবেন, বলিতে হইবে।

আমরা যেমন সচরাচর বলি, যে কোন ব্যক্তির সঙ্গীর দ্বারা আমরা তাহার চরিত্র কিরূপ, তাহা বলিতে পারি, সেইরূপ, কোনও ধারণার সত্যতার বিচার করিতে হইলে, তাহাও কেবল সেই সত্যের নৈতিক গুণের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা দেখিলেই বলা যায়। জগতের যত নীচপ্রবৃত্তি ও অসভ্য লোকদের মধ্যে যদি এমন কোনও ধারণা থাকে যে, মার্জ্জিতবুদ্ধি লোকেরা সেই ধারণার তত পক্ষপাতী নন, এবং ক্রমে ক্রমে সমাজের উন্নতির সহিত সে ধারণায় মানুষের বিশ্বাস কমিয়া আসে—তাহা হইলে সেরূপ ধারণাকে আমরা স্বচ্ছন্দে মিথ্যা বলিতে পারি। অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায়, অল্প দিন হইল, নারীজাতির অধীনতাসম্বন্ধীয় ধারণাও ইউরোপীয়দিগের মন হইতে অপসৃত হইয়াছে। আর যে সকল সাধারণ ঘটনার দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে, কেবল অমার্জ্জিত সামাজিক জীবনেই সচরাচর স্ত্রীজাতির দাসত্ব দেখা যায়, এবং স্ত্রীলোকেরা যে দেশে পুরুষের সহিত সমান বলিয়া পরিগণিত হয়, সেইখানেই তাহাদের উন্নতি ও মার্জিত জ্ঞানবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়—সুতরাং এই সব দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা স্পষ্ট বলিতে পারি যে, স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীন থাকিবে, ইহা প্রকৃতই অন্যায়। শিশুদের সম্বন্ধেও সেইরূপ প্রমাণ ও উদাহরণ দেখা যায়; আর উহা হইতে যথার্থ সিদ্ধান্ত অবগত হইতেও অধিক বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। মানুষ, কাল ও শিক্ষাভেদে, স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের অত্যাচার ও প্রভুত্বের যেমন তারতম্য ঘটিয়া থাকে; সেইরূপ, শিশুদের উপর পিতার প্রভুত্বও দেশ, কাল ও শিক্ষানুসারে, অতি

উচ্চগতির সহিত নারীজাতির দাসত্বমুক্তির পথ পরিষ্কার হওয়া যেমন একটি স্বাভাবিক ঘটনা, সেইরূপ উহার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের উপর পিতামাতার যথেচ্ছাচার ব্যবহারের হ্রাস হওয়াও, সমাজের উন্নতির পক্ষেও অতি আবশ্যক ও উপযোগী উপায়।

শ্রীকৃষ্ণভাবিনী দাস।

বিবিধ।

আয়ু পূর্ণ হইলে কেহই মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পায় না, এ সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। একটা এই—দক্ষিণ আমেরিকায় এক পল্লীগ্রামে এক ঘর গৃহস্থ বাস করিত। বাড়ীতে কর্ত্তা ও গৃহিণী। দুই জনের অত্যন্ত মৃত্যুভয় ছিল। গৃহিণীরা কর্ত্তাদিগের অপেক্ষা সকল দেশেই অধিক বুদ্ধিমতী। গৃহিণীর শীঘ্র সন্তান হইবার সম্ভাবনা ছিল। স্বামীর সহিত পরামর্শ করিবার সময় এক দিন গৃহিণী কহিল, "দেখ, আমার ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় যমকে নিমন্ত্রণ কর। আসিলে পর তাহার সহিত মিতা পাতাইও। তাহা হইলে আর কোন ভয় থাকিবে না।" স্ত্রীর বুদ্ধিমত ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় যমকে নিমন্ত্রণ করা হইল। আহার সমাপন হইলে সে ব্যক্তি যমকে কহিল, "অদ্য হইতে তুমি আমার মিতা হইলে। আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। আর কেহ থাকিতে আমাদের কাহাকেও লইয়া যাইওনা।" যম বলিল, "আমার সাধ্য কি যে, তোমায় ছাড়িয়া দিই। যখন আমার প্রতি যে আদেশ হয়, আমাকে সেই আদেশ পালন করিতে হয়। তবে তুমি যখন আমার মিতা হইলে, তোমার কিছু উপকার করা আমার কর্ত্তব্য। অন্য ব্যক্তিকে যখন লইয়া যাই, তখন তাহাকে পূর্ব্বে কোন সংবাদ দিই না। একেবারে আসিয়া লইয়া যাই। তোমাদের কাহারও সময় উপস্থিত হইলে, এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া যাইব। বন্ধুত্বের অনুরোধে এই টুকু মাত্র করিতে পারি।" এই বলিয়া যম বিদায় হইল।

কয়েক বৎসর গেল। গৃহস্থেরা স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিল। গৃহস্বামীর উপার্জ্জন বাড়িতে লাগিল, পুত্র বেশ লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। এমন সময় যম একদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, "মিতা, এবার তোমার পালা আসিয়াছে। প্রতিজ্ঞা মত তোমায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।" গৃহস্বামী বড়ই বিপদে পড়িল। কহিল, "মিতা, তুমি বড় অসময়ে আসিয়াছ। এখন আমার যাইবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই। আমি এখন বেশ উপার্জ্জন করিতেছি, গ্রামে দিন দিন সম্মান বাড়িতেছে। পৃথিবীতে এত লোক থাকিতে আমায় লইতে আসিলে কেন? মিতা, তুমি বন্ধুর কাজ কর নাই। বড় অসময়ে আসিয়াছ।" যম উত্তরে বলিল, "মিতা, এ তোমার অন্যায় কথা। আমি কি তোমায় ইচ্ছা করিয়া লইতে আসিয়াছি? আমি আজ্ঞার দাস। যখন যাহার কাল পূর্ণ হয়, আদেশ হইলেই তাহাকে তখন লইয়া যাই। তোমাকে একেবারে না লইয়া গিয়া এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। এ জন্য কোথায় আমায় ধন্যবাদ দিবে, না বলিতেছ—অসময়ে আসিয়াছি। এ তোমার বড় অন্যায় কথা।" যম তামাকু পর্য্যন্ত খাইল না, অন্যত্র কর্ম্ম আছে বলিয়া, তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

গৃহস্থ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া স্ত্রীর নিকট সকল কথা বলিল। স্ত্রী কহিল, "তাহাতে ভাবনার কথা কি? এখনও এক সপ্তাহ আছে। সপ্তাহ পরে যম যখন আসিবে, তখন বাড়ী না থাকিলেই চলিবে।" গৃহস্থ কহিল, "বাড়ী না থাকিলে কি রক্ষা পাইব? যেখানে থাকিব, সেই খান হইতেই লইয়া যাইবে।" স্ত্রী বলিল, "আর এক উপায় আছে। আমাদের যে বুড়া চাকর আছে, তাহাকে সে দিন আর কোথাও পাঠাইয়া দিব। তুমি তাহার মত সাজিয়া থাকিও, তাহা হইলে যম তোমায় চিনিতে পারিবে না।" নির্দ্দিষ্ট দিবসে যম আসিয়া উপস্থিত। গৃহিণীকে সম্মুখে দেখিয়া কহিল, "মিতা কোথায়?" গৃহিণী বলিল, "বাড়ী নাই।" যম কহিল, "এত বিষম মুস্কিলের কথা। আমি সে দিন বলিয়া গেলাম, আর আজ আসিয়া দেখি, মিতা বাড়ী নাই। এই কি বন্ধুর কাজ! দেখ দেখি মিতার অন্যায়! আমি যদি এখন ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে কি আর আমার মাথা থাকিবে? কি করি এখন বল দেখি? বাড়ীতে আর কে আছে?" গৃহকর্ত্রী কহিল, "আমাদের সেই বুড়া চাকর আছে। আর কেহ নাই।" যম কহিল, "তাহাকে লইয়া গিয়া কি হইবে?

তাহার পশ্চাৎ চলিল। পাকশালায় গৃহস্বামী ভৃত্যের বেশ ধরিয়া, হাতে মুখে কালি মাখিয়া গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল। তাহাকে দেখিয়া যম মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "তাই ত! আর কেহই বাড়ীতে নাই! এ বুড়াকে লইয়া গিয়া কি হইবে? আমিই বা কেমন করিয়া শুধু হাতে ফিরিয়া যাই! তা আর কি করিব, এই বুড়াকেই লইয়া যাই।" বলিয়া যম হস্ত প্রসারিত করিল। "কি কর! কি কর!" বলিয়া গৃহিণী চেঁচাইল। কিন্তু যম হস্ত প্রসারিত করিবা মাত্র গৃহস্বামী গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইল। যম গৃহের বাহিরে গেল।

হাঁচির তত্ত্ব লইয়া যে এত আন্দোলন হয়, সেটা নিতান্ত বিদ্রূপের কথা নয়। হাঁচি শরীরের একটি প্রধান প্রক্রিয়া, প্রায় সকল দেশেই এ সম্বন্ধে একটা না একটা সাধারণ বিশ্বাস আছে। আফ্রিকার ডাহোমি (Dahomy) প্রদেশে রাজা হাঁচিলে সভাসদগণ ভূমিতে ললাট স্পর্শ করে। সেনার প্রদেশে, রাজা হাঁচিলে পারিষদবর্গ মুখ ফিরাইয়া দক্ষিণ উরুতে করাঘাত করে। পুরাকালের লেখকগণ বর্ণনা করিয়াছেন, মনোমোটাপা (Monomotapa) প্রদেশের রাজা হাঁচিলে দেশ শুদ্ধ লোক ব্যতিব্যস্ত হইত। যাহারা রাজার নিকটে থাকিত, তাহারা চীৎকার পূর্ব্বক রাজাকে অভিবাদন করিত। সেই শব্দ রাজপ্রাসাদের যাবৎ লোক শুনিয়া সেইরূপ চীৎকার করিত, তৎপরে নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, সেই বিকট চীৎকার প্রতিধ্বনিত হইত। দেশে প্রকাণ্ড হুলস্থূল পড়িয়া যাইত।

আমাদের দেশে হাঁচিলে যে 'জীব' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করে, একজন সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তি তাহার নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্ব্বে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের বড় প্রকোপ ছিল। এবং হাঁচি উক্ত রোগের সাংঘাতিক লক্ষণ ছিল। এই জন্য কেহ হাঁচিলে লোকে 'জীব' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত। ইউরোপেও একটা ঐরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। মূল ইংরাজি উদ্ধৃত করিতেছি। "In Europe the superstition is, that St. Gregory instituted a benediction upon the sneezer, because during a certain pestilence the unseemly act was a fatal symptom." রোগটা সম্ভবতঃ ইনফ্লুয়েঞ্জা। আমাদের দেশের প্রথায় ও ইউরোপীয় প্রবাদে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া হাঁচিতত্ত্ববিৎ নিঃসন্দেহ পুলকিত

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ভিন্ন দেশে ভিন্নরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে। শব দাহ ও প্রোথিত করা বহুল প্রচলিত। পার্সিরা মৃতদেহ মাটিতে ফেলিয়া রাখে, গৃধ্র শকুনি তাহার মাংস আহার করে। কিন্তু সাইবিরিয়ায়, তঙ্গজ নামক অসভ্য জাতির মধ্যে এক অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত আছে। ইহারা শব দাহ বা প্রোথিত করে না, মাটিতে ফেলিয়া রাখে না। একটা খোলা কাঠের বাক্সে মৃতদেহ রাখিয়া, মাটিতে চারিটা বাঁশ পুতিয়া, তাহার উপর সেই বাক্স স্থাপন করে। গ্রামের চারিদিকে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন শব গলিতে ও পচিতে থাকে, চারিদিক দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে, হয় ত গ্রামে রোগ উপস্থিত হয়, কিন্তু ইহারা এই প্রথা পরিত্যাগ করে না। ইউরোপবাসী কোন ব্যক্তি দেশপর্য্যটনে বাহির হইয়া এই কাণ্ড দেখেন। তিনি গ্রামের প্রাচীন ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে এই সম্বন্ধে অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলেন। তাহারা তাঁহার সকল কথা স্বীকার করিল। দুর্গন্ধে জীবিত ব্যক্তিদিগের রোগ জন্মিতে পারে ও জন্মিয়া থাকে, এ কথাও মানিল। অবশেষে কহিল, "মানুষ কি কেবল স্বার্থ অন্বেষণ করিবে? পরের জন্য কি আত্মত্যাগ করিবে না? যাহাদিগকে আমরা ভালবাসি, তাহাদিগের প্রেতাত্মার মঙ্গল সাধন করিব না? মৃতদেহ যদি প্রোথিত করি, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির আত্মা চাপা পড়িবে, বাহির হইতে পারিবে না। আমরা যেরূপ করিয়া মৃত দেহ রাখি, তাহাতে আত্মার মুক্তির সুবিধা হয়। শব যেমন পচিতে থাকে, অমনি আত্মা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া শ্বেত দেবতায় মিলিত হইয়া যায়।" শ্বেত ও কৃষ্ণ, দুই দেবতায় ইহাদের বিশ্বাস। শ্বেতদেবতা মঙ্গলময়, কৃষ্ণ দেবতা সকল অমঙ্গলের মূল। এই কথা শুনিয়া পথিক নিরুত্তর হইলেন।

প্রসবকালে প্রসূতিকে অশুচি বিবেচনা করা অনেক দেশের প্রথা। বড় অধিক দিনের কথা নয়, আমাদের দেশে প্রসবোন্মুখী রমণীকে উঠানে চালা বাঁধিয়া রাখিত। বোধ করি, পল্লীগ্রামে কোথাও কোথাও এ প্রথা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। তঙ্গজ জাতি প্রসূতিকে একটা শূন্য কুটীরে বাস করিতে দেয়, যে পর্য্যন্ত প্রসব না হয়, কেহ কুটীরের নিকট গমন করে না। তাহাকে আহার্য্য বা পানীয় পর্য্যন্ত প্রদান করে না। অনেক সময়, প্রসবযন্ত্রণায় কিম্বা তৃষ্ণায় ছটফট্ করিয়া প্রসূতি প্রাণত্যাগ করে,

কোনরূপ সাহায়তা করে না। ফিলিপাইন দ্বীপবাসীরা প্রসবযন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হইলে বিশ্বাস করে, প্রসূতিকে ডাইনে পাইয়াছে। ডাইনীকে দূর করিবার জন্য একটা বাঁশের চোঙ্গে বারুদ পুরিয়া প্রসূতির মাথার নিকট চোঙ্গা রাখিয়া তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে বাতাসে ফেলিয়া রাখে ও তাহার শরীর হইতে অশান্তি দূর করিবার জন্য, তাহার গণ্ডদ্বয়ে ও চিবুকে তিনটা মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখে। তপ্ত মোম গলিয়া শিশুর শরীরে পতিত হইয়া কখন কখন বিপদ ঘটে।

যে বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করে, সে নিশ্চিন্ত হইয়া দাঁড়ায়, যে সংশয়ান্বিত, তাহার অণুক্ষণ অন্ধকার অতলে ডুবিবার ভয় থাকে। সংশয়ের সমুদ্র সন্তরণ করিয়া, অবিশ্বাসের তরঙ্গ ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসের সৈকতে উঠিতে হয়। সংশয় কি, না অপরাজিত চিত্তবৃত্তি। এই জন্য, আত্মজয়ের তুল্য জয় নাই। বোধিবৃক্ষতলে শাক্যমুনির ধ্যান—আত্মজয়। আপনার হৃদয়ে জ্ঞানের আলোক ধারণ করিয়া প্রখর প্রভাশালী বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে ডাকিলেন। তাহারা সেই আলোক দেখিল। ক্রমে সেই সঞ্চিত আলোক ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, দেশ হইতে দেশান্তরে, জাতি হইতে জাত্যন্তরে সেই আলোক প্রবাহিত হইল, কোটী কোটী জীব সেই আলোকমার্গ অনুসরণ করিল। খৃষ্টদেবের পদানুসরণ করিয়া ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়াছে। এই সকল মানবকুলকেশরী জীবিতাবস্থায় জীবনকে অতিক্রম করিতেন। জীবনের উন্নতি সাধন করাই ইহাঁদের উদ্দেশ্য, অথচ ইহাঁরা সকলেই জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। জীবনে লোকে যাহা বাঞ্ছনীয়, স্পৃহনীয় মনে করে, সকলই ইহাঁরা পরিত্যাগ করিতেন, কিন্তু ইহাঁদিগকেই কেন্দ্রস্থানীয় করিয়া মনুষ্যজীবন প্রদক্ষিণ করিতেছে। মানুষ অনবরত জীবনকে ক্ষুদ্র করে, সঙ্কীর্ণ করে, ইহাঁরা আবার জীবনকে প্রশস্ত করেন। জীবন কিছু দিনে কূপসদৃশ হইয়া পড়ে, ইহারা আবার প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বিনী লইয়া আইসেন। ভগীরথের শঙ্খনাদ লক্ষ্য করিয়া, ললিত তরল গমনে পুলকিতকণ্ঠে যেমন জাহ্নবী প্রবাহিতা হইয়াছিলেন, জীবন-জাহ্নবী সেইরূপ বর্দ্ধিতকলেবরা হইয়া এই সকল মহাত্মার কণ্ঠধ্বনি অনুসরণ করে।

লর্ড বায়রণ।

মানবের জীবন দুই রকম ভাবে চলিয়া যায়—এক, যেমন যাইতেছে, সেই ভাবে; দ্বিতীয়, সংগ্রামের ভাবে। আমার যদি অন্নসংস্থান থাকে, আর যদি আমি নির্ব্বিরোধী হই, তাহা হইলে আমার জীবন প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইবে। কিন্তু যদি আমার অন্নসংস্থান না থাকে, তবে আমাকে পরিশ্রম করিয়া অন্ন-সংগ্রহ করিতে হইবে এবং পরিশ্রম করিতে গেলেই অন্যান্য শ্রমজীবীদিগের সহিত আমার দ্বন্দ্ব বাধিবার খুবই সম্ভাবনা ঘটিবে। এই দ্বন্দ্বকারীদিগের মধ্যে যে যতটা আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিবে, সে-ই খুব সম্ভবতঃ জয়লাভ করিবে। এই কারণে, দ্বন্দ্ব করিতে গেলেই বুদ্ধিবৃত্তি সকল বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয়।

অন্নসংস্থানের দৃষ্টান্ত দ্বারা এই দেখাইলাম যে, সংগ্রাম করিতে গেলেই বুদ্ধিবৃত্তি সকল পরিস্ফুট হয়। অন্নসংস্থানের জন্য সংগ্রাম করা শারীরিক সংগ্রাম; এই শারীরিক সংগ্রাম ব্যতীত আমাদিগের মানসিক সংগ্রাম আছে, আধ্যাত্মিক সংগ্রাম আছে। আমি যদি জ্যামিতির উপপাদ্য লইয়া সংগ্রাম করি, তাহাই হইল মানসিক সংগ্রাম; আর আমি যদি পাপবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করি, তাহাই হইল আধ্যাত্মিক সংগ্রাম। কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল প্রকার সংগ্রামেই সকলের সমান জয় হয় না। কেহ বা বারংবার পরাজিত হইয়া থাকে, কেহ বা একবারেই জয়লাভ করে। যে ব্যক্তি আপনার বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে যতটা প্রস্ফুটিত করিয়া যে প্রকার সংগ্রা-মের উপযোগী করিয়া লইয়াছে, সেই ব্যক্তি সেই প্রকার সংগ্রামে অধিকতর জয়লাভ করিবে।

এই যেমন প্রতি মানবের বিষয় বলিলাম, সেইরূপ এক এক জাতির মধ্যেও শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক সংগ্রাম চলিতে পারে—বিশেষ-গুণবিশিষ্ট কতকগুলি মানবের সমষ্টির নাম-ই ত জাতি। এই জাতীয় সংগ্রামেও যে ব্যক্তি বা যে জাতি জ্ঞানধর্ম্মে অধিকতর উন্নত হইবে, তাহারই জয় হইবে।

যখন আর্য্যেরা ভারতে প্রথম আসিয়া বসতি করিতে লাগিলেন, তখন অন্নসংস্থানের নিমিত্ত প্রাচ্যদিগের সহিত তাঁহাদিগকে কঠোর শারীরিক সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। আর্য্য ও প্রাচ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা উন্নত ছিলেন, যাঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক অন্যের অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্টরূপে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারাই জয়লাভ করিয়া সুখে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। এই জাতীয় শারীরিক সংগ্রামের মধ্য হইতেই আর্য্যগণ প্রকৃতরূপে প্রকাশিত হইলেন।

আবার কলিযুগের প্রারম্ভে কুরুপাণ্ডবের যে ভীষণ সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাকে আমরা জাতীয় আধ্যাত্মিক সংগ্রাম বলিতে পারি। সেই সংগ্রাম প্রকৃতপক্ষে ভূমিলাভ করিবার সংগ্রাম নহে—তাহা অধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে পাণ্ডবগণ ধর্ম্মের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই জয় হইল। এই পাণ্ডবগণের যিনি বন্ধু, সেই কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সকলের অপেক্ষা জ্ঞানধর্ম্মে অধিকতর উন্নত হইয়াছিলেন, তাই কবি তাঁহাকে দেবতার আসন প্রদান করিয়াছেন।

আরও আধুনিক কালে ভারতবর্ষ যখন শাক্তদিগের প্রভাবে হিংসা, মদ্যপান প্রভৃতি নানা পাপাচারে ডুবিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে চৈতন্যদেব অহিংসা-সংগ্রামের, প্রেম-সংগ্রামের উন্মাদক জয়ধ্বনিতে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিলেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটি সংগ্রামের সমসাময়িক ঘটনা আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে এক এক কবিসম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রথমোক্ত সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ঋগ্বেদের কবিগণ উঠিলেন; দ্বিতীয়োক্ত সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণের ব্যাসগণ উঠিলেন; শেষোক্ত সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব কবিসম্প্রদায়, ভারতবর্ষকে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশকে, কোমলতার অমৃতে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন।

এই বারে একবার ইউরোপের দিকে চাহিয়া দেখি, সেখানেই বা কি প্রকার নিয়ম। সেখানে শারীরিক সংগ্রাম অনেক হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার সহিত অনেক সাময়িক কবিও প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; সেখানে আধ্যাত্মিক সংগ্রামের বীজ পড়িতেছে মাত্র, সুতরাং সে বিষয়ে আমরা এখন আলোচনা করিব না। কিন্তু ইউরোপে মানসিক সংগ্রাম বহুদিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ইংলণ্ডে এলিজেবেথের রাজত্বকালে এক বিরাট মানসিক সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিছু পূর্ব্বে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া সমস্ত ইউরোপে এক আন্দোলন তুলিয়া দিয়াছেন—সকলেরই মনে নূতন ভাব, নূতন আশার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। এদিকে আবার পোপের অধীনতাশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ইংলণ্ডের শিরায় শিরায় স্বাধীনতার খরস্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছে; এমন কি, এই স্বাধীনতার উত্তেজনাতেই, যখন স্পেনদেশের রাজা পোপের পক্ষ অবলম্বন করিয়া এক মহতী নৌ-সেনা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, তখন ইংলণ্ডীয় নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষগণ অতি অল্পমাত্র সৈন্যের দ্বারা সেই মহতী নৌ-সেনাকে একেবারে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিতে পারিয়াছিলেন; অবশ্য, অন্যান্য কারণও তাঁহাদের সহায় ছিল। এইরূপে তখন সমস্ত ইংরাজজাতির মধ্যে এক প্রবল মানসিক সংগ্রাম চলিয়াছিল। এই মানসিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সেক্ষপীয়রের অপূর্ব্ব দৃশ্যকাব্য সকল প্রকাশিত হইল। ইংলণ্ডে এমন ঘোরতর মানসিক সংগ্রাম, বোধ হয়, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই—পরে আর একবার হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় সংগ্রামের ফলেই খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয় হইয়াছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, এই তুমুল মানসিক সংগ্রাম সমস্ত ইউরোপকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সংগ্রামের সূত্রপাত হয় ফরাসি-বিপ্লব হইতে। ফ্রান্সের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজারা প্রজাদিগের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। এই অত্যাচারের ফলে প্রজাগণ উন্মত্ত হইয়া শেষ রাজা ষোড়শ লুইর মস্তকচ্ছেদন করিল। ক্রমে ফরাসিগণ পুরাতন যাহা কিছু, তাহাই নষ্ট করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে নূতন ভাব, নূতন প্রণালী স্থাপন করিতে উদ্যত হইল। ফরাসিবিপ্লপ শারীরিক সংগ্রাম হইতে মানসিক সংগ্রামে পরিণত হইল,এবং সেই সংগ্রামের ভাব সমস্ত পৃথিবীময় রোপণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, ফ্রান্সের মানসিক সংগ্রামের ঢেউ ইংলণ্ডের উপকূলে অনায়াসে পৌঁছিতে পারে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সমুদ্র ব্যবধান থাকাতে, ফ্রান্সের শারীরিক সংগ্রাম ইংলণ্ডকে ততটা স্পর্শ করিতে পারে নাই; কিন্তু মানসিক সংগ্রামের ভাব মুদ্রাযন্ত্র থাকিতে

সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডে অনেকগুলি কবির উদয় হইয়াছে,—সেলি, বায়রণ, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রভৃতি। ইহাঁদিগের সকলেরই কবিতার মধ্যে এক প্রকার বিশেষ সাংগ্রামিক ভাব আছে। এই সাংগ্রামিক কবিদিগের মধ্যে বায়রণ কিছু অতিরিক্ত ধ্বংসপ্রিয়, সেলি অপেক্ষাকৃত মধ্যপথাবলম্বী এবং ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ রক্ষণশীল।

এখন আমরা প্রথমে বায়রণকেই সম্মুখে আনয়ন করি। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বায়রণ সাংগ্রামিক এবং কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ধ্বংসপ্রিয় ছিলেন। ধ্বংসবিষয়ে তিনি একজন মহারথী ছিলেন—একাকীই সমস্ত জাতির বিপক্ষে দণ্ডায়মান। একাকী সমস্ত জাতির বিপক্ষে—ইহা কম সাহসের কথা নহে। আবার তিনি সাংগ্রামিক কেবল লেখায় নহেন, কথায় নহেন, কার্য্যেও বটে। তিনি আপনার কার্য্যকলাপেও এই প্রকার ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক, কোনও কার্য্যেই আইন কানুন মানিয়া চলিতেন না—কোন প্রকার বদ্ধভাব তাঁহার ভাল লাগিত না। বেনিস রাজ্যে সামাজিক বন্ধন কিছু কম বলিয়া, তাঁহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই যে, এই প্রকার ঔদ্ধত্য পরিশেষে তাঁহাকে স্বেচ্ছাচারে লইয়া গিয়া অকালে কালগ্রাসে পাতিত করিল।

বায়রণের সমসাময়িক ইংলণ্ডের অবস্থা সকল তাঁহার সাংগ্রামিক ভাব উত্তেজিত করিবার পক্ষে সহায় হইয়াছিল। সেই সময়ে বাহির হইতে ফরাসি বিপ্লব নির্ব্বীর্য্যকেও বীর্য্যবান করিয়া তুলিতেছিল ; ভিতরেও পিউরি-টানদিগের (Puritan) বাঁধাছাঁটা সংযত নিয়মের সঙ্গে যুবরাজ চতুর্থ জর্জ্জের নেতৃত্বে সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের অশ্লীল বিলাসিতার তুমুল সংগ্রাম চলিতে-ছিল। বায়রণের সংযম ভাল লাগিল না ; তিনি অশ্লীল বিলাসিতার নিতান্ত অশ্লীল ভাগটুকু বাদ দিয়া, বিলাসিতাকে খেয়ালের (Sentimental) চক্ষে দেখিয়া, ভ্রমপূর্ব্বক বিলাসস্রোতে গা' ভাসাইয়া দিলেন। তাঁহার এইরূপ গতি ভাল লাগিবার কারণ এই যে, ইহাতে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য্যতঃ অস্ত্রধারণ করা হয়।

যাই হৌক্, বায়রণের কবিতায় এইরূপ সাংগ্রামিক ভাব থাকাতেই তাঁহার সময়ে তিনি অদ্বিতীয় কবি হইয়া উঠিলেন--তখন কেবল ইংলণ্ডে নহে, সমস্ত ইউরোপে যে এক বিরাট বিধ্বংসিভাব রাজত্ব করিতেছিল। বায়রণ তাঁহার 'ডন জুয়ান'এর (Don juan) প্রথম দুই সর্গ যখন প্রকাশিত করি-

লেন, তখন তাঁহার যশ দিগ্বিদিকে বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিয়া চলিল; এমন কি তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, "আমি একদিন প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই দেখি যে, আমি বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছি।" শুনিয়াছি যে, কয়েক মাসের মধ্যে ন্যূনাধিক লক্ষ পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, বায়রণের কবিতা অশ্লীলতাপূর্ণ এবং ছেলেমানুষী রকমের—তাহা কবিতাই নহে। আমি অবশ্য তাঁহার দোষ সমর্থন করিব না; কিন্তু এত অল্প সময়ে এত অধিক পুস্তক মুদ্রিত হইতে দেখিলে, হৃদয়ে কি এই প্রশ্ন উত্থিত হয় না যে, লক্ষাধিক লোকে বায়রণের কবিতার কি গুণে মুগ্ধ হইল? ইহাও কি সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, এতগুলি লোকে হৃদয়ে অশ্লীলতা-সর্পকে পোষণ করিবার জন্য বায়রণ পড়িত? তাহারা নিশ্চয়ই বায়রণের কবিতার মধ্যে মুগ্ধ করিবার মত কোন জিনিস পাইয়াছিল—সে জিনিস কবিত্ব—সরলতার কবিত্ব ও সবলতার কবিত্ব।

সরলতারই বা কবিত্ব কি আর সবলতারই বা কবিত্ব কি? একজন লোকের সরলতা দেখিয়া আমাদের হৃদয় কেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সরলতার মধ্যে এক বিশেষ মাধুরী—কবিত্ব আছে, যাহার জন্য আমরা সরলতাকে এত ভালবাসি; এই কারণে আমি পল্লীগ্রামবাসীদিগকে এত ভালবাসি; এই কারণে আমি বসন্তের প্রভাতে কোকিল-কুহরিত মুক্ত গগন ও সুগন্ধসেবী মুক্ত মলয়বায়ুকে এত ভালবাসি। সেইরূপ সবলতার মধ্যেও এক অপূর্ব্ব কবিত্ব আছে। সেই কবিত্ব আছে বলিয়াই সেই মার্কিন সৈনিক কবি ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যানকে আমি এত ভালবাসি; যদিও প্রবল ঝটিকা বৃক্ষ অট্টালিকা প্রভৃতি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেয়, তথাপি সেই কবিত্ব আছে বলিয়াই ঝটিকার সবল স্পর্শলাভ করিতে আমি এত ভালবাসি; যদিও ভূমিকম্প অভাবনীয় দারুণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিতে থাকে, তথাপি সেই সবলতার কবিত্ব আছে বলিয়াই ভূমিকম্পের মধ্যেও এক সভয় আনন্দ-নৃত্য অনুভব করি।

ম্যাথিউ আর্ণল্ড (Matthew Arnold) বলেন যে কবিতার কার্য্যক্ষেত্র দুই—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ। কোন কবিতা বহির্জগতের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিতে সপ্রয়াস; কোন কবিতা বা অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিতে সপ্রয়াস। এখানে একটি কথা এই যে, অন্তর্জগতের যে কোন ভাব

তাহার কারণ, অনেকেরই কাছে অন্তর্জগতের ভাব সকল একটু রহস্যময়। বায়রণের কবিতা বহির্জগৎ সম্বন্ধেও আছে, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধেও আছে। তাঁহার বহির্জগতের কবিতায় সবলতা আছে; তাঁহার অন্তর্জগতের কবিতায় সরলতা আছে, এবং সরলতায় সবলতাও আছে।

প্রথম প্রকারের কবিতা দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি। তিনি গ্রীসের দুরবস্থা এবং গ্রীকদিগের স্বাধীনতা লাভের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়া গ্রীকদিগকে ভৎর্সনা করিতেছেন—কেমন বলিষ্ঠ ভাষায়:—

Approach, thou craven crouching slave!
Say, is not this Thermopylæ?
These waters blue that round you lave,
Oh servile offspring of the free—
Pronounce what sea, what shore is this?
The gulf, the rock of Salamis!
These scenes, their story not unknown,
Arise, and make again your own;
Snatch from the ashes of your sires
The embers of their former fires;
And he who in the strife expires
Will add to theirs a name of fear
That Tyrany shall quake to hear,
And leave his sons a hope, a fame,
They too will rather die than shame:
For Freedom's battle once begun,
Bequeath'd by bleeding Sire to Son,
Though baffled oft, is ever won.

ইহার প্রত্যেক কথা কি গ্রীকদিগের হৃদয়ে তীক্ষ্ণ তীরের ন্যায় গিয়া বিদ্ধ হইবে না? বায়রণ একটি হ্রদে ঝড়ের মধ্যে পড়িয়া কেমন সুন্দর বলিয়াছেন—

* * * let me be
A sharer in thy fierce and far delight,
A portion of the tempest and of thee!

এই দুইটি ছত্র পড়িয়া আমরা ঝড়ের উন্মত্ত নৃত্য কেমন উপলব্ধি করিতেছি এবং ঝড় দেখিয়া কবির ঝড়ের অংশ হইবার ইচ্ছা কেমন সুন্দররূপে অনুভব করিতেছি—ইহাতে কেমন সবল ভাব!

দ্বিতীয় প্রকারের—অন্তর্জগতের কবিতা উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহার কবিতার অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি আপনার অত্যাচার অনাচারের কথা কিম্বা সেই অনাচারের দরুণ ভুক্ত কুফলের কথা, কোন বিষয়ই লুকাইয়া রাখিতে যান নাই। দু একটি ছত্র উদ্ধৃত করিলে পাঠকগণ যে তাঁহার সরলতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবেন, তাহার আশা করি না, এই কারণে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। বায়রণের কবিতা যে এই সরলতা ও সবলতার কবিত্ব গুণে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

বায়রণের কবিতা তাঁহার সমসাময়িক লোকের ভাল লাগিবার আরও একটি কারণ ছিল। বায়রণ একজন ধনীসন্তান হইয়া যে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে লিখিতেন এবং কার্য্যও করিতেন, তাহাও তাঁহার খ্যাতির অন্যতম কারণ। তখন সকলেই প্রচলিত বাঁধাছাঁটা নিয়মের অধীনে থাকিয়া মৃতপ্রায় হইতেছিল, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কেহই কথা কহিতে সাহস করে নাই; সেই চলিত প্রথার বিরুদ্ধে কথা উঠিয়াছে ও কার্য্য হইতেছে এবং সেই সকলের নেতা হইয়াছেন লর্ডদিগের একজন—এই কারণে সকলেই উৎসুক হইয়া বায়রণের কবিতা পড়িতে লাগিল।

এইবারে বায়রণের কবিতার দোষের কথা দুএকটি বলা যাউক। তাঁহার কবিতার প্রধান দোষ দুইটি—কোমলতার অভাব এবং স্থানে স্থানে অশ্লীলতা। এই দুইটিরই মূল কারণ বলিতে গেলে একই—গৃহে অশান্তি। বায়রণ শৈশবকাল অবধি কাহারও নিকট প্রকৃত ভালবাসা প্রাপ্ত হন নাই। শৈশবকালে তাঁহাকে মাতার নিকট বিশেষ অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। পরে যৌবনকালে তিনি যাঁহাকে বিবাহ করিলেন, তাঁহার সহিত মনের মিল হইল না। এদিকে আবার যখন তাঁহার প্রথম রচনা (Hours of Idleness) প্রকাশ করিলেন, তখন কোন সমালোচক তদানীন্তন প্রসিদ্ধ এক পত্রিকায় রচনার গুণের দিকে মোটেই লক্ষ্য না রাখিয়া দোষের ভাগ লইয়াই এক তীব্র সমালোচনা বাহির করিলেন। এই সকল কারণে তাঁহার মন যে বিকৃতভাব ধারণ করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ইহাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ঘৃণা না হইয়া বরং তাঁহার জন্য দুঃখ হওয়া উচিত। এই সকল কারণে তাঁহার প্রীতি কোমলতাশূন্য হইয়া অশ্লীলতা দোষে দূষিত হইল; তাঁহার অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল গৃহমুখী না হইয়া কিছু অতিমাত্রায় বহির্মুখী

হইয়া পড়িল। কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারে চলিয়া অনেক দিন পরে বুঝিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়সুখই আমাদিগের সর্ব্বস্ব নহে, এবং চঞ্চলতায়, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতায় মানবের প্রেম চরিতার্থ হয় না। তাই তিনি বড়ই অবসন্ন স্বরে বলিতেছেন—

Alas! our young affections run to waste,
Or water but the desert; whence arise
But weeds of dark luxuriance, tares of haste,
Rank at the core, though tempting to the eyes,
Flowers whose wild odours breathe but agonies,
And trees whose gums are poison; such the plants
Which spring beneath her steps as passion flies
O'er the world's wilderness, and vainly pants
For some celestial fruit forbidden to our wants.

সেলি, বায়রণ এবং ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, এই তিন কবির কবিতায় সাধারণ-ভাবে যেমন সাংগ্রামিকভাব বিদ্যমান দেখি, সেইরূপ ব্যক্তিগত ভাবও দেখিতে পাই। এই তিন কবিই আপনাদিগের কবিতায় আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন; আপনাদেরই কথা, আপনাদিগেরই প্রেম, আপনাদেরই অতৃপ্তি কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। এক কথায় তাঁহারাই কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছেন। কিন্তু এই কবিগণের মধ্যে বায়রণ সর্ব্বাপেক্ষা আত্মহারা। এই কারণে বায়রণের কবিতা সারল্যপূর্ণ, এবং এই কারণেই তাঁহার কবিতায় আমরা অনেক স্থলে চঞ্চল বিলাসভাব, অনেক স্থলে বীরত্বের উচ্ছ্বাস এবং (দুঃখের বিষয়) দুএকটি স্থলে অশ্লীলতা দোষও দেখিতে পাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বায়রণ স্বাধীনতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ঘটনাক্রমে স্বেচ্ছাচারের পথে গিয়াছিলেন; এবং ইহাও বলিয়াছি যে, স্বেচ্ছাচার, অনাচার করিতে করিতে অতৃপ্তিও অনুভব করিয়াছিলেন। এইরূপ অতৃপ্ত হইয়া, অতৃপ্তির উপাদান কারণ স্ত্রীলোকের প্রতিও যে বায়রণ দু'একটা কটু কথা বলিতে বিরত হন নাই, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। তিনি বলিতেছেন—

Yea! none did love—not his lemans dear—
But pomp and power alone are woman's care,

* * * *

Maidens, like moths, are ever caught by glare,
And Mammon wins his ways where seraphs might despair.

তিনি বলিতেছেন যে, তাঁহাকে কেহই ভাল বাসে নাই; তিনি নিজে যখন

কাহাকেও স্থির প্রেম দিতে পারিলেন না, তখন অন্যের নিকটে কিরূপে স্থির প্রেমের আশা করিলেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

যাহাই হউক, বায়রণ যদি তাঁহার ক্ষমতা কেবল ভাঙ্গনের কাজে না লাগাইয়া গঠনকার্য্যে প্রযুক্ত করিতেন, তাহা হইলে জগতের কত উপকার হইত, তাহা কে বলিতে পারে? কেবল ভাঙ্গনের দিকে গিয়া, অবশেষে আপনিই অকালে ভাঙ্গনের স্রোতে পড়িয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বায়রণের দোষ প্রদর্শন বা তাহার সমর্থন, আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার বক্তব্য এই যে, মোটের উপর বায়রণ এক জন যথার্থ কবি ছিলেন, এবং তাঁহার কবিতার মধ্য হইতে অশ্লীল অংশ পরিত্যাগ করিলেও, অতি উচ্চ অঙ্গের অনেক কবিতা পাওয়া যাইতে পারে। সজ্জনের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা ভালমন্দে মিশ্রিত বস্তু হইতে মন্দভাগ পরিত্যাগ করিয়া ভালটুকু গ্রহণ করেন।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সোনার বাঁধন।

বন্দী হয়ে আছ তুমি সুমধুর স্নেহে,
অয়ি গৃহলক্ষ্মি, এই করুণ-ক্রন্দন
এই দুঃখ দৈন্যে ভরা মানবের গেহে;
তাই দুটি বাহু পরে সুন্দর-বন্ধন
সোনার কঙ্কণ দুটি বহিতেছ দেহে
শুভ চিহ্ন, নিখিলের নয়ন-নন্দন।

পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ক-কঠিন
সংসার সংগ্রামে, সদা বন্ধনবিহীন;
যুদ্ধ দ্বন্দ্ব যত কিছু নিদারুণ কাজে
বহ্নিবাণ বজ্রসম সর্ব্বত্র স্বাধীন।
তুমি বদ্ধ স্নেহ প্রেম করুণার মাঝে,—
শুধু শুভকর্ম্ম, শুধু সেবা নিশি দিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি,
দুইটি সোনার গণ্ডী, কাঁকন দু'খানি!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রভা।

(গল্প)

আমি যখন ছেলে মানুষ, প্রভা তখন আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিত। পাশাপাশি বাড়ী—দুই পরিবারে খুব আত্মীয়তা ছিল, প্রভা আমায় দাদা বলিত।

ছেলে বেলা আমি বড় দুষ্ট ছিলাম; রাগিলে আর রক্ষা থাকিত না। বদরাগী বলিয়া কেহ আমায় দেখিতে পারিত না। কিন্তু সে জন্য আমার দুঃখ ছিল না। ছোট ছোট ভাই বো'নগুলি আমায় দেখিলে ভয়ে পলাইত, কিন্তু প্রভা আমায় ভয় করিত না। আমি কাহারও কথা শুনিতাম না, কিন্তু প্রভার কথা আমি কখনও অগ্রাহ্য করিতে পারিতাম না।

আমার বেশ মনে পড়ে, প্রভা আমার খাতা বাঁধিয়া না দিলে, আমার লেখা হইত না। প্রভার সঙ্গে গল্প না করিলে, দিনটা যেন বৃথা গেল, মনে হইত।

২

কিছু দিন যায়। আমার বয়স তখন ষোল বৎসর হইবে।

আমি এখন বাঙ্গলা নভেল পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। ভালবাসা বড় ভাল লাগে, ভাল বাসিতে ইচ্ছাও করে। কিন্তু ভাল বাসি কাহাকে, প্রথমটা ঠাহর করিতে পারিতাম না। আর, আমার যে রকম স্বভাব, তাহাতে খুব সহিষ্ণু না হইলে, কেহ আমার ভালবাসার অত্যাচার সহিয়া উঠিতে পারিত না।

এই সময়ে আমার মানস-পটে প্রভার অস্পষ্ট ছবি যেন একটু উজ্জ্বল হইয়া জাগিয়া উঠিল। আমায় কেহ ভাল বাসে না, কিন্তু প্রভা ত আমায় স্নেহ করে। তাহাকে কত বকিয়াছি, তাহার পুতুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছি, চুল ধরিয়া টানিয়াছি, তাহার চুলের কাঁটা লইয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছি, সে ত কখন রাগ করে নাই। প্রভা সব হাসি মুখে সহিত; যখন বড় রাগ করিতাম, তখনও একটি কথা কহিত না; কেবল প্রশান্ত নয়নে আমার পানে

চাহিয়া থাকিত। শেষে, প্রভার উপর আমি আর রাগ করিতে পারিতাম না। কেমন লজ্জা করিত। মনে করিতাম, আমি কি প্রভার মত হইতে পারি না?

৩

এক দিন ঘন ঘোর বর্ষায় আমরা দু'জনে জানালায় বসিয়া বৃষ্টি দেখিতে-ছিলাম। আমার মা ঘরে বসিয়া সুপারি কাটিতেছিলেন। একটু পরে আমি উঠিয়া গিয়া ছাদে দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলাম—মা বারণ করিলেন;—কিন্তু আমি শুনিলাম না। প্রভা দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; মা আমাকে খুব বকিতেছিলেন, আমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করি নাই, কিন্তু দেখিলাম, প্রভার চোক ছল ছল করিতেছে। আমি বলিলাম, "প্রভা, কি হয়েছে?"

প্রভা বলিল, "তুমি ঘরে এসো! মা কত বকিতেছেন, তোমারই তো দোষ!"

আমার বড় রাগ হইল। প্রভাও আমার দোষ দেখিতে আরম্ভ করিল! আমি দিব্য করিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতে লাগিলাম, ছাদের নল দিয়া খুব জল পড়িতেছিল, সেইখানে গিয়া দাঁড়াইলাম, প্রভা আবার ডাকিল, আমি শুনি-য়াও শুনিলাম না। খানিকক্ষণ ডাকিয়া ডাকিয়া, প্রভা শেষে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেল। আর কেহ হইলে কি করিতাম, বলিতে পারি না; কিন্তু প্রভাকে কিছু বলিতে পারিলাম না।

৪

সেই দিনই আমি জ্বরে পড়িলাম। অনেক দিন মরণাপন্ন হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিলাম;—কত দিন, ঠিক মনে নাই। ভাল হইয়া যখন বিছানায় উঠিয়া বসিতে পারিলাম, তখন দেখিলাম, প্রভা আমার কাছে বসিয়া আছে। আমি বলিলাম, "প্রভা!"

মা বলিলেন, "প্রভা ত বাবা রাত দিনই তোমার বিছানায় বসিয়া আছে!"

তার পর যখন শুনিলাম, বিকারের ঘোরে কেবল "প্রভা! প্রভা!" করিয়াছি, প্রভা ভিন্ন আর কেহ ঔষধ দিলে ফেলিয়া দিয়াছি, তখন নিতান্তই লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। প্রভা আমার কে? পৃথিবীতে আমার নিজের খেয়াল ভিন্ন আর কিছু ত আমার ভাল লাগিত না। মাঝে হইতে, আমার এই অদমনীয় স্বেচ্ছাচারের স্রোতের মাঝে, শৈলকাননকুন্তলা ক্ষুদ্র উপলভূমির মত, প্রভা কোথা হইতে আসিয়া দাঁড়াইল? আমি বালিশে মাথা রাখিয়া

শুইয়া পড়িলাম। আমার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতেছিল, প্রভা তাড়াতাড়ি পাখা রাখিয়া, অঞ্চল দিয়া ঘাম মুছাইয়া দিল। মা পাখা লইয়া বাতাস করিতে আসিতেছিলেন, কিন্তু প্রভা তাঁহার হাত হইতে পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। মা একটু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। কে জানে কেন, আমার বড় লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু কি সুন্দর স্পর্শ! আমার কঠোর প্রকৃতি, যেন কোমল হইতে কোমলতর হইয়া আসিতেছিল।

৫

শরীর সুস্থ হইতে লাগিল, কিন্তু অজ্ঞাতসারে যে আমায় অন্য রোগে ধরিতেছিল, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। শেষে যখন বুঝিতে পারিলাম, তখন আর প্রতীকারের পথ রহিল না।

প্রভাকে এখন আর ছাড়িতে ইচ্ছা করিত না। সন্ধ্যার সময় যখন সে বাড়ী চলিয়া যাইত, আমার হৃদয়েও সন্ধ্যার ছায়া পড়িত। তরুণ অরুণের আলোর সঙ্গে সঙ্গে যেই প্রভা আসিয়া আমার সুমুখে দাঁড়াইত, আমার হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিত।

এখন রাত দিন প্রভা আমার কাছে কাছে থাকে। কিন্তু শীঘ্রই আমাদের মাঝে ব্যবধান আসিয়া দাঁড়াইল।

আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম, সে বাড়ীতে আর আমাদের থাকা হইল না। আমরা আর এক পাড়ায় চলিয়া গেলাম। কিন্তু প্রভা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিত।

হৃদয় কেমন শূন্য বোধ হইত। আমার আর কেহ সঙ্গী ছিল না। কাহারও সহিত মিশিতে পারিতাম না। নিজের উদ্ধত স্বভাব ও সকলের অনাদর লইয়া, অতি কষ্টে কাল কাটিতে লাগিল।

কখনও কখনও প্রভাদের বাড়ী বেড়াইতে যাইতাম। কিন্তু কেমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িতাম। অসঙ্কোচে প্রভার সহিত কথা কহিতে, গল্প করিতে পারিতাম না। পূর্ণ আশা লইয়া গিয়া, নিতান্ত শূন্য অবসন্ন হইয়া ফিরিয়া আসিতাম।

৬

প্রভা এখন বড় হইয়াছে। তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে।—বর জমীদারের ছেলে, বড় মানুষ। সকলে আহ্লাদ করিতেছে। আমি মুখে কিছু বলিতে পারিতাম না,—কিন্তু অন্তরে অশান্তির সীমা ছিল না।

আমাদের অবস্থা ভাল নয়। আমি শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলাম,—পিতাও সঙ্গতিশালী ছিলেন না। এক এক বার মনে করিতাম, মুখ ফুটিয়া একবার প্রভাকে চাহিয়া দেখি,—কিন্তু নিজের নিঃস্ব দশা মনে পড়িলে আর সাহস হইত না। তখন অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া ভাবিতাম, কেন পরের জন্ত ভাবিয়া মরি। পরক্ষণে প্রভাকে মনে পড়িত, তখন আর কিছু ভাবিতে পারিলাম না। এই প্রথম আমার শুষ্ক হৃদয়ের উৎস উৎসারিত হইল,—আমার চিরশুষ্ক নেত্রে অশ্রু দেখা দিল।

এক দিন গোপনে শুনিলাম, আমাদের বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু প্রভার পিতা সম্মত হন নাই। মা ও দিদিমায় কথা হইতেছিল। দিদিমার বড় সাধ, প্রভার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। কিন্তু মা বলিলেন, তাহা হইবার নয়। কেন নয়, তাহা আমি জানিতাম। হায়, কেন আমি প্রভার উপযুক্ত হই নাই।

৭

সে দিন প্রভার সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। পত্র হইবে। আমাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। 'আমি প্রভাকে অত ভাল বাসি, প্রভা আমাকে আপনার দাদা বলিয়া জানে, অতএব আমাকেও যাইতে হইবে,'—প্রভাদের বুড়ী ঝি আসিয়া আমায় হাতে ধরিয়া বলিয়া গেল। কি মিষ্ট সম্ভাষণ!

আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রভাদের বাড়ীতে চলিলাম! অন্য মনে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। পাত্র পক্ষের সকলে আসিলে, প্রভাকে সেখানে আনিতে গেল।

ধীরে ধীরে প্রভা সেই ঘরে আসিল। আমি চাহিয়া দেখিলাম,—প্রভাকে এত সুন্দর আমি কখনও দেখি নাই। একখানি গোলাপী বম্বে-শাড়ী পরিয়া নত নয়নে প্রভা দাঁড়াইল, আমি নিতান্ত নির্লজ্জের মত অনিমেষনয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। প্রভা একবার চকিতে চাহিল,—আমার ক্ষুধিত দৃষ্টি বুঝি সে দেখিতে পাইল। আমি লজ্জায় মুখ ফিরাইলাম। প্রভা যেন একটু বিষণ্ণ। হয় ত এত লোকের সম্মুখে একটু জড়সড় হইয়া পড়িয়াছে—নহিলে তাহার বিষণ্ণতা কেন?

আশীর্ব্বাদ শেষ হইল। আমার প্রভা, কাহার হইল? এখন তোমাতে আমাতে কত ব্যবধান! আমি সকলের অজ্ঞাতে বাড়ীতে ফিরিতেছিলাম। দরজায় সরকার মহাশয় দাঁড়াইয়াছিলেন,—তিনি বলিলেন,—"তাও কি হয়,

আজ আহ্লাদের দিন, এক সঙ্গে সব আমোদ আহ্লাদ কর, তার পর বাড়ী যেও।" আহ্লাদের দিনই বটে।

আমায় "আমোদ আহ্লাদও" করিতে হইল। বসিয়া আছি, প্রভার ভাই আসিয়া বলিল, "হেম দা'! তোমায় মা ডাক্‌ছে।" নিতান্ত অনিচ্ছায় তাহার সহিত বাড়ীর ভিতর চলিলাম। প্রভা একটা ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়াছিল, আমায় দেখিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। এই প্রথম আমি প্রভার পর হইলাম।

প্রভার মাকে প্রণাম করিয়া, একটা আলমারী ধরিয়া দাঁড়াইলাম। প্রভার মা বলিলেন, "এই বার বাবা! তুমি একটি বউ নিয়ে এস।" ভাল করিয়া উত্তর দিবার বড় ইচ্ছা হইল, কিন্তু একটাও কথা জুটিল না।

একটু পরে বলিলাম, "প্রভা কোথায়?" প্রভার মা বলিলেন, "ঐ ঘরে। দেখে এস,—প্রভাকে এর মধ্যেই কনের মত দেখাইতেছে। আমি তোমার জন্যে খাবার নিয়ে আসি।"

কিন্তু চলিতে পা উঠিতেছিল না। তবু চলিলাম। প্রভা খাটের কাছে বসিয়া কি করিতেছিল—আমায় দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রভাকে দেখিয়া আমার বাসনা আবার জাগিল, অভূতপূর্ব্ব ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইল,—আমি সব ভুলিলাম। সে কি ভাব, বলিতে পারিব না; কিন্তু সে রকম আমি আর কখনও হই নাই। আমি ডাকিলাম "প্রভা!"

প্রভা চমকিয়া উঠিল। কিন্তু কথা কহিল না। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে গিয়া প্রভার হাত ধরিয়া আবার ডাকিলাম, "প্রভা!" অশ্রুজলে আমার দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। প্রভা চলিয়া যাইবে বলিয়া দ্বারের অভিমুখে যাইতেছিল; আমি তাহাকে আর কিছু বলিতে পারিলাম না, হৃদয়ের প্রবল বেগ সংবরণ করিতে পারিলাম না,—তোমরা কিছু মনে করিও না,—আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না,—আমি এই সর্ব্ব প্রথম প্রভার অধরে অধর দিয়া চুম্বন করিলাম।

এই প্রথম ও এই শেষ চুম্বন।

উষ্ণ নিশ্বাসে আমি মলয় স্পর্শ অনুভব করিলাম, কিন্তু এক মুহূর্ত্ত। প্রভা নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের মত স্থির,—আর তাহার সেই আয়ত কমললোচনে অশ্রুকণা।

সেই মুহূর্ত্তে মনে হইল, আমি কি করিতেছি! পর মুহূর্ত্তে চাহিয়া দেখি, প্রভা তাড়াতাড়ি আমার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

৮

পর দিন আমি মাকে বলিলাম, "আমি বৈদ্যনাথে যাইব।" মা বলিলেন,—"প্রভার বিয়ে না দেখিয়া কি যাওয়া হয়।" আমি কাহারও কথা শুনিলাম না। সেই দিনই বৈদ্যনাথে চলিয়া গেলাম।

ঘনশ্যাম তরুশ্রেণী,—উপলবন্ধুর তরঙ্গায়িত তৃণশূন্য শুষ্ক প্রান্তর, দূরে মেঘের মত নীল পর্ব্বতের ছবি, অন্যমনে তাহাই দেখিতাম।

আজ ২৭ শে ফাল্গুন; প্রভার বিবাহ; বড় অস্থির হইয়া উঠিলাম। দূরে নিকটে, সবই সমান। নিজে দাঁড়াইয়া কেন নিজের বলিদান দেখিলাম না?

২৮ শে ফাল্গুন, বসিয়া কত কি ভাবিতেছি, এমন সময়ে এক টেলিগ্রাম পাইলাম। টেলিগ্রাম পাইয়া চমকিয়া উঠিলাম। পড়িতে পড়িতে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল,—আবার পড়িলাম—'প্রভা বোধ হয় বাঁচিবে না, তুমি শীঘ্র এসো।'

প্রভা! প্রভা! আমার হৃদয়ের দেবতা! তুমি কি এত শীঘ্র চলে যাবে?

আমি সেই দিনই রওনা হইলাম। এমন উদ্বেগ আমি জীবনে আর কখনও সহি নাই। ট্রেণে সমস্ত রাত্রিটা যেন দুঃস্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। এ কাল রাত্রি কি পোহাইবে না?

৯

প্রত্যুষে হাবড়ায় মেল ট্রেণ পঁহুছিল। আমি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া এক খানা গাড়ী করিলাম। গাড়ী চলিল।

কত যাত্রী হাসিতে হাসিতে বাড়ী চলিয়াছে। কয়টা মুটে রাস্তায় দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে গল্প করিতেছে। পোলের উপর হইতে দেখিলাম, জাহ্নবী হাসিতে হাসিতে কলতান তুলিয়া বহিতেছে; ঘাটে কত নর-নারী সানন্দে স্নান করিতেছে; ছেলেরা সাঁতার দিয়া বয়ায় উঠিয়া বসিতেছে, নৌকা ধরিয়া উঠিতে যাইতেছে। সকলেই ব্যস্ত, আনন্দে উৎফুল্ল! এত আহ্লাদ কিসের? তোমরা কি আর আহ্লাদের সময় পাও নাই? লোকের আনন্দ যেন আমার বিষ বলিয়া বোধ হইতেছিল।

প্রভাদের বাড়ীতে গিয়া গাড়ী হইতে নামিলাম। বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় কতকগুলা হাঁড়ি পড়িয়া আছে! তবে——

বাড়ীর ভিতর ঢুকিলাম। সম্মুখেই দেখিলাম, সরকার মহাশয়। বুড়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল। তবে—তবে—সে আর নাই!

বিবাহের পরে,বিবাহের বাসরেই প্রভার কলেরা হইয়াছিল। রোগশয্যায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রভা অন্য কথা কহে নাই। যখন ঘোর বিকার, তখনও প্রথমে ঘন ঘন, তার পর ক্রমে অনেকক্ষণ অন্তর, অবসন্ন কণ্ঠে প্রভা কেবল ডাকিয়াছে,—"হেম! হেম!"

যাও প্রভা, আবার আমরা মিলিব। জীবনের পর পারে তুমি আগে গিয়াছ,—বর্ত্তমান এখনই অতীতে মিশিবে, তখন এই জীবনস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে,—এখানে ঘুমাইয়া সেখানে গিয়া জাগিব—তার পর আর কখনও কি তোমায় হারাইব?

সোহাগা।

সৌভাগ্যং টঙ্কণং ক্ষারো ধাতুদ্রাবকমুচ্যতে।—সোহাগা শব্দটি,বোধ হয়, পারস্য ভাষা হইতে উৎপন্ন। ইহার সংস্কৃত প্রসিদ্ধ নাম টঙ্কণ। "টঙ্কণ" বলিলে অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না, সুতরাং, "সোহাগা" শব্দই ব্যবহৃত হইল। অতি প্রাচীন কাল হইতেই হিন্দুরা সোহাগার ব্যবহার জানিতেন। সুশ্রুত ইহাকে অনেক স্থলে ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। পূর্ব্বকালে হিমালয়ের পর পার ও নেপাল হইতে ব্যবসায়ীরা সোহাগা আনিত। তিব্বত হইতে আনীত সোহাগা ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে প্রেরিত হইত। তখন ইহাকে টিঙ্কল (Tinkal) বলিত; এখনও অনেকে ঐরূপ বলিয়া থাকেন। বোধ হয়, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ হইতে বাবিলোনে (Babylon) এবং তথা হইতে পাল্‌মায়রায় (Palmyra) বণিকেরা সোহাগা লইয়া যাইত। কারণ, সেই সময়ে সোহাগা আর কোন স্থানেই পাওয়া যাইত না। বৈদ্যশাস্ত্রমতে সোহাগাকে যদি কাঞ্জিতে এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখিয়া পরে শুখাইয়া লওয়া

ইহা তিব্বত, কাশ্মীর, ইতালি, মার্কিন, তুরস্ক এবং চিলি দেশে পাওয়া যায়।

১। কাশ্মীরের অন্তঃপাতী পুগা উপত্যকায় ইহা পাওয়া যায়। তথাকার উষ্ণপ্রস্রবণের জল যে স্থান দিয়া বহিয়া যায়, তাহার তীরে লবণের সহিত সোহাগা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যবসায়ীরা ভূমির উপরিস্থ এই সমস্ত লবণমিশ্রিত সোহাগার কঠিন আচ্ছাদন কাটিয়া গৃহে লইয়া আইসে, পরে পরিষ্কার করিয়া বিক্রয় করে।

২। তিব্বতে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যেমন দেওয়ালে নোনা লাগিলেই এক প্রকার সাদা সাদা গুঁড়া দেখিতে পাওয়া যায়,সেইরূপ তিব্বত দেশে কোন কোন হ্রদের তীরে এক প্রকার সাদা গুঁড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দেশের কোন কোন শ্রেণীর লোকে উহা মাটি হইতে আঁচড়াইয়া একত্রিত করে। জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত এইরূপে একত্রিত করিয়া থাকে। সকলেরই ইহার ব্যবসা করিবার অধিকার আছে, কিন্তু প্রত্যেককেই লামাকে (Lama) লাভাংশের দশভাগের এক ভাগ দিতে হয়। ভুটিয়ারা তিব্বতবাসীদিগের নিকট ক্রয় করিয়া, অধিক লাভের আশায় ভারতবর্ষে লইয়া আইসে। এক্ষণে তাহারা রামনগরের বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে। রামনগরস্থ বণিকেরা এই অপরিষ্কার সোহাগা ক্রয় করিয়া পরিশুদ্ধ করিয়া বিক্রয় করে। ইহারা প্রথমতঃ এই অপরিষ্কার সোহাগা বিলক্ষণ গুঁড়া করিয়া ছোট ছোট নলের ভিতর ঢালিয়া দেয় এবং তৎপরে কিঞ্চিৎ জল দেয়। পরে গুঁড়া চূণ জলে মিশাইয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ক্রমাগত ছয় ঘণ্টা কাল নাড়িতে থাকে। প্রতি দশ মণ অপরিষ্কার সোহাগায় এক সের চুণ আবশ্যক। তৎপর দিন কাপড়ে করিয়া ছাঁকিয়া লয়। পুনরায় প্রায় আড়াই গুণ গরম জলে মিশায় এবং প্রায় আট সের চুণ দেয়। শেষে ছাঁকিয়া রৌদ্রতাপে জল শুখাইবার জন্য রাখিয়া দেয়। সর্ব্বশেষে এই ঘন জল কাঁসার (Brass) ঠোঙ্গাতে, যেমন মিছ্রির রস কুঁদাতে ঢালে, সেইরূপ ঢালিয়া দেয়। কিছু দিন পরে ঐ ঠোঙ্গার (Funnel) আকারবৎ সোহাগার খণ্ড সকল একত্রিত করিয়া অধিক দরে বিক্রয় করে। এইরূপ করিয়া পরিষ্কার করিতে, প্রায় শত করা কুড়ি ভাগ সোহাগা নষ্ট হয়। (১)

---

(১) যাঁহার অধিক এবিষয় জানিবার ইচ্ছা আছে তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া Economic

৩। ইতালি দেশের অন্তঃপাতী টস্কানি (Tuscany) প্রদেশের অনেক স্থানে গরম জল-বাষ্প নির্গত হইতে দেখা যায়। এই বাষ্পের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে বোরেসিকদ্রাবক (Boracic acid) নির্গত হয়। দ্রাবক বলিলেই সকল সময়ে তরল পদার্থ বুঝায় না, ইহা যেন সকলের স্মরণ থাকে। ইংরাজী এসিড্ (Acid) শব্দের অর্থ দ্রাবক, ইতালি ভাষায় ইহাকে সফোনি (Soffoni) বলে। বড় বড় পাত্রে জল রাখিয়া ঐ সমস্ত বাষ্প তাহার ভিতর প্রবেশ করাইয়া জমাইতে থাকে। এই নিমিত্ত জল-বাষ্প উক্ত পাত্রস্থ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া জলাকার প্রাপ্ত হয়। তৎপরে উত্তপ্ত বাষ্প দ্বারা উক্ত পাত্রস্থ বোরেসিক-দ্রাবক-মিশ্রিত জল শুখান হয়; সুতরাং পরিশেষে কেবলমাত্র বোরেসিকদ্রাবক অবশিষ্ট থাকে। এইরূপ করিয়া বোরেসিক এসিড্ এবং তৎপরে সোহাগা প্রস্তুত করিতে বিস্তর খরচ হয়। ত্রিশ মণ বোরেসিকদ্রাবক প্রস্তুত করিতে প্রায় আড়াই শত টাকা খরচ হয়।

৪। দক্ষিণ আমেরিকাস্থ চিলি দেশে চূর্ণযুক্ত একপ্রকার সোহাগা (Borate of lime) পাওয়া যায়। ইহারা দেখিতে ঠিক রেশমের সূতার ন্যায়। ইহা বিশুদ্ধ হইলে বিশেষ লাভজনক হইত। কিন্তু ইহার সহিত লবণ, খাঁড়িলবণ (Sulphate of soda) এবং অন্যান্য নানা পদার্থ মিশ্রিত থাকে। কিন্তু ঐ দেশবাসী ব্যবসায়ীরা, ইহাতে হতাশ না হইয়া, ইহা হইতে পরিষ্কার করিয়া সোহাগা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। প্রতি বৎসরে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার মণ সোহাগা এইরূপে প্রস্তুত হয়।

৫। মার্কিন দেশে সোহাগার সকল প্রকার আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিশেষতঃ, কালিফর্ণিয়া (California) এবং নেভেডা (Neveda) প্রদেশে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সমস্ত প্রদেশে প্রায় দশ স্থানে সোহাগা পাওয়া যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় এখানকার সোহাগা ঈষৎ হরিদ্রা-বর্ণ। বড় বড় লোহার কড়াতে এই অপরিষ্কার সোহাগা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, পরে ছাঁকিয়া অগ্নির তাপে ঘন করিয়া লওয়া হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই জলস্থ সোহাগা স্ফটিকাকার (Crystalline state) প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাপ দিতে হয়। কিছু সময় স্থির হইয়া থাকিলে স্ফটিকাকার সোহাগা সকল যুক্ত হইয়া প্রকাণ্ড খণ্ডাকার ধারণ করে। ঐ দেশস্থ আদিম

৬। তুরস্কদেশে বোরেসাইট (Boracite) নামক আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলিকাতার যাদুঘরে (Asiatic museum) ধাতুবিদ্যাবিষয়ক আদর্শ সকল যে ঘরে আছে, সেইখানে এই বোরেসাইট্ (Boracite) দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই ইচ্ছা করিলে ইহা দেখিতে পারেন। এই বোরেসাইট্ (Boracite) হইতে অতি সহজেই সোহাগা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ইহার আবিষ্কার হইতেই তিব্বতদেশের সোহাগার আর পূর্ব্বের মত আদর নাই। আমাদের দেশের সোহাগার ব্যবহার অতি অল্প। সুতরাং আমাদের দেশে প্রায়ই তিব্বতদেশীয় সোহাগা ব্যবহৃত হয়। ইউরোপে সোহাগার আবশ্যক অতিরিক্ত, কেন না, সেখানে সকল ব্যবসাতেই প্রায় সোহাগার প্রয়োজন হয়। এক তুরস্ক দেশ হইতে বৎসর বৎসর আড়াই লক্ষ হইতে তিন লক্ষ মণ পর্য্যন্ত রপ্তানি হয়।

বোরেসিক দ্রাবক (Boracic acid) হইতে সোহাগা প্রস্তুত করা অতি সহজ। কেবলমাত্র দ্রাবককে সর্জ্জিকা ক্ষার (Carbonate of soda) মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিলেই হইতে পারে। কিন্তু পরে দুই তিন বার তাহাকে ছাঁকিয়া পরিষ্কার এবং স্ফটিকাকার করিয়া লওয়া উচিত। চিলি দেশে যে সোহাগার আকর পাওয়া গিয়াছে, তাহা কেবলমাত্র বোরেট অভ লাইম (Borate of lime) অর্থাৎ চূর্ণযুক্ত সোহাগা। ইহা হইতে সোহাগা প্রস্তুত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সর্জ্জিকাক্ষারের (Carbonate of soda) সহিত সিদ্ধ করিলে সোহাগা কিঞ্চিৎ পরিমাণে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এই প্রকারে ব্যবসা করা কেবল অর্থ ক্ষয় করা মাত্র। বহুকাল রসায়নবিদ্ পণ্ডিতেরা কি প্রকারে ইহা হইতে সোহাগা প্রস্তুত করা যায়, তাহার চেষ্টা করিয়া অবশেষে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। যদি সলফিউরিয়স্ দ্রাবক (Sulphureous acid) এই জলের সহিত মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত বোরেসিক দ্রাবক ইহা হইতে কণার আকারে পাওয়া যাইতে পারে, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যখন গন্ধক অম্লজানে পোড়ান যায়, তখনই উক্ত দুই মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়। ইহাকে সলফিউরিয়স এসিড্ গ্যাস (Sulphureous acid-gas) বলে। উক্ত গ্যাস জলের সহিত যুক্ত হইলেই সলফিউরিয়স্ দ্রাবক হয়। গন্ধক যখন বায়ুমণ্ডলীতে (Atmosphere) পোড়ান যায়, তখন উক্ত গ্যাস প্রস্তুত হয়। কারণ বায়ুমণ্ডলীস্থ অম্লজান গন্ধকের ধূমের সহিত

সোহাগার বাহ্যিক ও রাসায়নিক গুণ।—সোহাগা শ্বেতবর্ণ স্ফটিকাকার খনিজ পদার্থ বিশেষ। ঈষৎ ক্ষারগুণযুক্ত থাকা সত্ত্বেও মুখে দিলে বেশ মিষ্ট বোধ হয়। মনুষ্যশরীরে কোন অপকার করে না। জলে যথেষ্ট পরিমাণে দ্রব হয়। সোহাগামিশ্রিত জলে রজন (Resin) চাঁচগালা (Shellac) এবং নানাপ্রকার ব্যূঢ় পদার্থ (Organic substances) গলিয়া মিশাইয়া যায়। সুতা, চামড়া, ত্বক্, তন্তু ও ঝিল্লির উপর ইহার কোন রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না। অথবা ইহার সহিত মিশ্রিত হয় না। যখন স্ফটিকাকার অবস্থায় থাকে, তখন অতি সহজেই সামান্য সামান্য দ্রাবক দ্বারা বিশ্লিষ্ট (Decomposed) হয়, যখন ইহা জলশূন্য অবস্থায় (Dehydrated state) থাকে, তখন সোহাগাস্থিত বোরেসিক দ্রাবক (Boracic acid) অতিশয় তেজের সহিত মিশ্রিত পদার্থ সকলকে বিশ্লিষ্ট করে। সোহাগা যখন স্ফটিকাকার অবস্থায় থাকে, তখন ইহাতে প্রায় শতকরা আটচল্লিশ ভাগ জল থাকে। এই জলকে সহজে তাড়ান যায় না। জলের ফুটনাঙ্কে (Boiling point) অতি অল্প মাত্রই জল ইহাতে বহিষ্কৃত হয়। কিন্তু হঠাৎ যদি তাপ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে ইহা ফুলিয়া উঠে; এবং কেবলমাত্র এক প্রকার সচ্ছিদ্র লঘু পদার্থ অবশিষ্ট থাকে। ইহাকে অতি সহজে গুঁড়া করা যায়। আমাদের দেশে ইহাকে সোহাগার খৈ বলে। তাপমান যন্ত্রের (Thermometers) চারি শত পঞ্চাশ ডিগ্রির (Degree) উপরে ইহা গলিয়া গিয়া কাঁচের ন্যায় হয়। শীতল হইলেও ইহা ঠিক কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ থাকে। সুরাসারপূর্ণ কাঁচের প্রদীপের (Spirit lamp) আলোকশূন্য অগ্নিতে সুরাসারমিশ্রিত (Alcoholic solution) সোহাগা জ্বালাইলে বেশ হরিৎবর্ণ দেখা যায়।

এখন ইহার ব্যবহার বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে। প্রায় সকল প্রকার ব্যবসায়ে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সর্ব্ব কার্য্যে ব্যবহারোপযোগী, অথচ বিষাক্ত নহে; এরূপ পদার্থ অতি বিরল। এই বিরল শ্রেণীর মধ্যে সোহাগা অন্যতর।

১। স্বর্ণকার, তাম্রকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি সকলেই সোহাগা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। বাজারে সচরাচর যে সোহাগা বিক্রয় হয়, তাহা স্বর্ণকারেরা সকল সময়ে তাহা ব্যবহার করে না। বাজারে সোহাগা

দিগের নিমিত্ত এক প্রকার বিশেষ সোহাগা প্রস্তুত করিয়া থাকে। স্বর্ণ গলাইতে হইলে যে সোহাগার আবশ্যক, তাহা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন।

স্বর্ণকারেরা যখন স্বর্ণের অলঙ্কার জোড় দেয়, তখনও ব্যবহার করে। প্রথমতঃ, পাথরে সোহাগা জলের সহিত ঘষিয়া একপ্রকার ক্ষীরবৎ তরল পদার্থ প্রস্তুত করে। তুলি দিয়া অলঙ্কারের যে দুই অংশ জোড় দিতে হইবে, তাহাতে মাখায়। এইরূপ মাখানর পর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝাল (Solder) সকল উহাদের উপর বসায়, পরে বাঁকনল (Blowpipe) দিয়া ফুঁ দিতে থাকে। ঝাল সকল সোহাগাতে অতি শীঘ্র গলিয়া যাওয়ায় ত্বরায় অলঙ্কারের দুই মুখে জোড় লাগে। তাম্রের পাত্রাদিতে জোড় দিতে হইলে, ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। তাম্রপাত্রাদির গাত্রে নানাপ্রকার যৌগিক পদার্থ দৃষ্ট হয়। কারণ তাম্র বায়ু কিম্বা অম্লযুক্ত পদার্থের সহিত একত্রিত থাকিলে নানারূপ যৌগিক পদার্থরূপে পরিণত হয়। আমাদের কাঁসার পাত্রে অম্ল রাখা নিষিদ্ধ কেবল ইহার জন্য। কাঁসাতে তাম্রের ভাগ অধিক, সুতরাং কিছু রাখিলে এক প্রকার সবুজ বর্ণের যৌগিক পদার্থ পাত্রের গাত্রে দেখা যায়। এমন কি, কাঁসা কিম্বা পিত্তল পাত্রে ঘৃত কিম্বা তৈল রাখিলেও ঐরূপ সবুজ বর্ণের যৌগিক পদার্থ দৃষ্ট হয়। ঘৃত তৈলাদি অম্লজানের সাহায্যে নানাপ্রকার যৌগিক পদার্থে বিশ্লিষ্ট হয়। বায়ুমণ্ডলীতে অম্লজানের অভাব নাই। এই সমস্ত যৌগিক পদার্থের মধ্যে কতকগুলি দ্রাবক (Acids); ইহারা তাম্রের সহিত সহজেই যুক্ত হয়। এপ্রকার তাম্রযুক্ত ঘৃত তৈলাদি ভক্ষণ করা কখনই উচিত নহে; যেহেতু তাম্র বিশেষ বিষাক্ত দ্রব্য। তুঁতে খাইলেই ক্রমাগত বমন হয়, তাহা সকলেই জানেন। তুঁতে তাম্রযুক্ত পদার্থবিশেষ। অধিক মাত্রায় খাইলে মৃত্যুও হইতে পারে। এই জন্যই পাথরের পাত্রাদির ব্যবহার। এখন তাম্রের গাত্রে যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ হয়, তাহা তুলিয়া না ফেলিলে তাম্রপাত্রে ঝাল লাগে না। সোহাগাতে এই সমস্ত দ্রব্য সহজেই দ্রব হয়। এই নিমিত্ত ঝাল দিবার পূর্ব্বে সোহাগা দিয়া তাম্রের গাত্র সমুদায় পরিষ্কার করা হয়। লৌহ এবং ইস্পাত (Steel) একত্র যোড় দিতে হইলে (Welding) সোহাগার প্রয়োজন হয়। লৌহযন্ত্রকে পান (Tempering) দিতে হইলেও সময়ে সময়ে সোহাগা দিয়া
[illegible] লৌহ (Cast iron) ইস্পাত কিম্বা তাম্রের পাত্রের উপর

"অনামিল" বা "মিনে" (১) করিতে হইলে (Eenamelling) প্রথমতঃ একটি পাত্রে সোহাগা, চিনার বা চিক্‌নিমাটি (Kaolin), ফেলস্পার (Felspar) এবং কোয়ার্জ (২) (Quartz) পাথর একত্র করিয়া গলাইয়া পাত্রের গাত্রে লাগাইতে হয়। পরে সোহাগার দ্বারা চক্‌চকে (Glazing) করিতে হয়। আজকাল লৌহের উপর "অনামিল" বা "মিনের" কাজ করা নানাপ্রকার পাত্রের অভাব নাই। বোধ হয় এমন পরিবার নাই, যেথানে ইহা দৃষ্ট হয়, না। অগ্নিসহ (Fireproof) বাক্‌স নির্ম্মাতারাও সময়ে সময়ে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা ইন্‌ফুসোরিয়াল আর্থ্‌ (Infusorial earth) নামক মৃত্তিকা বিশেষের সহিত সোহাগা মিশ্রিত করিয়া বাক্সের গাত্রে লাগায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সোহাগাতে জলের ভাগ অধিক ; শতকরা প্রায় আটচল্লিশ ভাগ জল। অতিরিক্ত তাপ বৃদ্ধি না করিলে সোহাগা জলশূন্য হয় না। প্রজ্বলিত গৃহে এইরূপে প্রস্তুত বাক্সস্থিত কাগজপত্রাদি ঐ জল শোষণ করায় সহসা নষ্ট হয় না। এই নিমিত্ত সোহাগা ফট্‌কিরি (Alum) অপেক্ষা ভাল ; কারণ লৌহের উপর ফট্‌কিরির রাসায়নিক ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। অতিরিক্ত তাপে সোহাগাস্থিত বোরেসিক দ্রাবক (Boracic acid) গলিয়া যাওয়ায় ধাতুদিগের অক্‌সাইড (Silica) দিগের সহিত যুক্ত হইয়া এক প্রকার সহজ-গলনীয় কাঁচ হয়। (যৌগিক পদার্থ সকল অম্লজানের সহিত যুক্ত হইলে যে যৌগিক পদার্থ হয়, তাহাদিগকে ইংরাজিভাষায় অক্‌সাইড বলে) সোহাগার এই বিশেষ গুণ থাকায়, ধাতুনির্যাতনকার্য্যে অন্যান্য ফ্লক্স (Flux) (৩) এর সহিত ব্যবহার করা হয়। এই গুণ থাকায় সোহাগার এক নাম ধাতুদ্রাবক। কাঁচ, চিনামাটির পাত্রাদি এবং কৃত্রিম মণিমাণিক্য-নির্ম্মাতারা ইহা প্রচুর ব্যবহার করে। কৃত্রিম মণি প্রস্তুত করিতে হইলে

---

(১) ৺আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয় তৎকৃত অভিধানে Enamel কথার প্রতিশব্দ অনামিল লিখিয়াছেন। সাধারণতঃ ইহাকে মিনেকরা বলে। মিনে শব্দ পারস্য কিম্বা আরব্য ভাষা হইতে উৎপন্ন।

(২) বরাকর, মধুপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যাঁহারা বেড়াইতে গিয়াছেন, তাঁহারা পাহাড়ের নিকট কাচখণ্ডের ন্যায় একপ্রকার পাথর বিস্তর দেখিতে পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই। ইহাদিগকে ইংরাজীতে কোয়ার্জ বলে। কিন্তু ইহারা বিশুদ্ধ বালুকা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

(৩) ... সহিত গলাইবার সময় মিশ্রিত করিলে শীঘ্র

প্রথমতঃ একটি মুচিতে (Crucible) সোহাগা, বিশুদ্ধ বালুকা (Powdered Quartz) যবক্ষার (Carbonate of Potash) এবং সফেদা (Carbonate of Lead) একত্রিত করিয়া অগ্নির উপর চব্বিশ ঘণ্টা রাখিতে হয়। অগ্নির তাপ এত অধিক হওয়া উচিত যে, কাঁচ দিবামাত্র গলিয়া যায়। এই তাপে উক্ত মিশ্রিত দ্রব্যগুলি জলের ন্যায় তরল হয়, সুতরাং যখন শীতল করা যায়, তখন সকলগুলি বেশ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এমন কি, তখন উহা মিশ্রিত পদার্থের ন্যায় দেখায় না। এই মিশ্রিত পদার্থ বা কাঁচকে ইংরাজী ভাষায় ষ্ট্রাস্ (Strass) বলে। তৎপরে যে বর্ণের মণি প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই বর্ণপ্রস্তুত করিবার উপযোগী ধাতু সকলের অক্সাইড (Oxide) বিশেষরূপে গুঁড়া করিয়া, বর্ণের তারতম্য অনুসারে মিশ্রিত করিতে হয়। এইরূপ মিশ্রিত করিয়া পুনরায় অগ্নির তাপে গলাইয়া ধীরে ধীরে শীতল করিতে হয়। তাহা হইলেই কৃত্রিম মণি প্রস্তুত হইল। কাঁচ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রং করিতে হইলেও সোহাগার আবশ্যক হয়। দূরবীক্ষণ কিম্বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রাদির নিমিত্ত যে সমস্ত মুকুরের (Lenses) প্রয়োজন, সেই সকল প্রস্তুত করিতে আজকাল সোহাগামিশ্রিত কাঁচ ব্যবহৃত হয়। কারণ, সোহাগা-মিশ্রিত কাঁচের বিবর্ত্তনশক্তি (Refractive power) অত্যধিক। চিনা-মাটির পাত্রাদি চক্‌চকে (glazing) করিতে হইলে সোহাগামিশ্রিত কাঁচের গুঁড়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাত্রাদির গাত্রে দিয়া অতিশয় উত্তপ্ত করিলে, ইহারা গলিয়া গিয়া পাত্রাদির গাত্রে লাগিয়া যায়। ইহা লাগাইতে হইলে প্রথমতঃ পাত্রগুলি কেবল শুকাইয়া লইতে হয়। বাঙ্গালায় ওসানসি সাহেব (Dr. O'shanghnessy) চূর্ণযুক্ত সোহাগার এই-রূপ ব্যবহার করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে মাদ্রাজের শিল্পবিদ্যালয়ে এখন পর্য্যন্তও সুন্দর সুন্দর মাটির বাসন প্রস্তুত হয়। গবর্মেণ্ট সাহায্যকৃত হাঁসপাতালে যে সমস্ত মলমের জন্য লালবর্ণের কৌটা (gallipot) ব্যবহৃত হয়, তাহা এই ডাক্তার সাহেব মহাশয়ের চেষ্টায়। সর্ব্বপ্রথমে ইনি নিজে এইরূপ বাটি প্রস্তুত করেন; তৎপরে গবর্মেণ্টের চক্ষু ফুটিয়াছে।

সময়ে সময়ে সোহাগা আঠার (cement) কার্য্য করিয়া থাকে। এই সময়ে সোহাগা দ্বারা প্রস্তুত আঠার কার্য্য বড়ই পরিষ্কার দেখায়। সাবান,

আজ কাল বহুপ্রকার সোহাগামিশ্রিত সাবান দেখিতে পাওয়া যায়। কিছু বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপের কোন কোন দেশজাত বস্ত্রাদি অতিশয় শুক্লবর্ণ দেখা যাইত। পরে প্রকাশ পাইল যে, উক্ত দেশস্থ বস্ত্রব্যবসায়ীরা বস্ত্র পরিস্কার করিবার নিমিত্ত (Bleaching) সোহাগামিশ্রিত সাবানের গুঁড়া ব্যবহার করে। এখন অনেক গাত্র পরিস্কার করণার্থ সাবানে সোহাগা দেখিতে পাওয়া যায়।

রং-ব্যবসায়ীরা সোহাগার ব্যবহার যথেষ্ট করে। পূর্ব্বে সাম্বলক্ষার বা শঙ্খবিষ বা দারমুচ (Aresenious oxide or white arsenic) যুক্ত হরিৎ বর্ণের রং ব্যবহৃত হইত। অনেক সময়ে ইহার নিমিত্ত অনেকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। ইহার পরিবর্ত্তে এখন সোহাগাযুক্ত ক্রোমিয়ম্ অক্সাইড এবং কপার অক্সাইড্ ব্যবহৃত হয়। (Borate of chromium and copper) একবারে যে দারমুচযুক্ত রং উঠিয়া গিয়াছে, তাহা নহে ; তবে যেরূপভাবে কমিয়া আসিতেছে, তাহাতে বোধ হয়, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইহা একবারে উঠিয়া যাইবে।

সোহাগাযুক্ত লেড্ (সীসক) অক্সাইড এবং মাঙ্গানিজ অক্সাইড (Borate of lead and manganese) বার্ণিসের সহিত ব্যবহৃত হয়। কারণ, বার্ণিস সকল উক্ত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে যে কোনটির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে শীঘ্র শুখাইয়া যায়। ইউরোপের স্ত্রী ও পুরুষদিগের অনেক সৌখীন (cosmetics) পদার্থের মধ্যেও সোহাগার ব্যবহার দেখা যায়।

আলোকালেখ্য-শিল্প-বিদেরা (Photographers) ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন। যখন চিত্রখানি রং করিবার জন্য হরিতালযুক্ত স্বর্ণ (chloride of gold) মিশ্রিত জলে রাখা হয়, তখন বিশেষ সাবধান না হইলে চিত্রখানির বর্ণ কখনই ভাল হয় না। বেশীর ভাগ চিত্র এইরূপে নষ্ট হয়। এই নিমিত্ত এখন উহার সহিত সোহাগা মিশ্রিত করা হয়। চাঁচগালা (Shellac) এবং সোহাগা সুরাসারের (Alcohol) সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহারা বার্ণিসের ন্যায় ব্যবহার করেন।

কাষ্ঠ সকল রৌদ্র ও বৃষ্টিতে শীঘ্র নষ্ট হয়। ইহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সোহাগামিশ্রিত জলে উহা কিছু সময় ডুবাইয়া রাখিয়া ব্যবহার করা হয়, কারণ কাষ্ঠে শীঘ্র পচনশীল যে সমস্ত পদার্থ আছে, তাহারা সোহাগা-

কেসিন্ নামক (Casein) পদার্থের সহিত সোহাগা মিশ্রিত করিয়া আঠার ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। দুগ্ধে কেসিন্ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। অপরিষ্কার রেশমে এক প্রকার চট্‌চটে পদার্থ থাকে, তাহা কেবল-মাত্র সোহাগামিশ্রিত জল দ্বারা পৃথক করা হয়।

ছিট্ (calico printing) ছাপিবার সময়ে সোহাগার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ সোহাগামিশ্রিত রং সকল বেশ পাকা হয়।

রেশমী ফিতা, এবং মলমল প্রভৃতি সমস্ত সুতার দ্রব্য সকল যদি সোহাগা-মিশ্রিত জলে কিছু সময় ডুবাইয়া রাখা হয়, তাহা হইলে তাহারা অগ্নিসহ (fire-proof) হয়।

বিলাতের টুপি-প্রস্তুতকারীরা পালকের টুপী (felt hat) প্রস্তুত করিবার সময়ে সোহাগা ব্যবহার করে। সোহাগার জলে চাঁচগালা শীঘ্র গলিয়া যায়, এই চাঁচগালা ও সোহাগামিশ্রিত জল দ্বারা পালকগুলিকে ভিজাইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিলে বেশ শক্ত হয়।

বাতি পোড়াইবার সময় দেখা যায় যে, পলিতা (wicks) ক্রমশঃ বক্র হয়, শীঘ্র ভস্ম হইয়া যায় না, এবং বাতিটির পলিতা শীঘ্র শীঘ্র পুড়িয়া যায় না। এই সমস্তের কারণ কেবল সোহাগা। বাতিপ্রস্তুতকারীরা পলিতাগুলিকে সোহাগামিশ্রিত জলে কিছুক্ষণ রাখিয়া পরে শুকাইয়া লয়। এই নিমিত্ত বস্ত্রাদি পুড়িলে যে অসহ্য গন্ধ নির্গত হয়, বাতির পল্‌তে পুড়িলে তাহা হয় না।

বিলাতের বস্ত্রব্যবসায়ীরা যখন বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিয়া ইস্ত্রি করে, তখন মাড়ের সহিত সোহাগা মিশ্রিত করিয়া থাকে। এইরূপ করিলে দেখিতে বেশ চক্‌চকে হয়। এই নিমিত্ত ধৌত বিলাতি কাপড় এত চক্‌চকে। কেবল যে চক্‌চকে হয়, এমত নহে; অধিকন্তু মাড় পূর্ব্বের ন্যায় অধিক পরিমাণে প্রয়োজন হয় না।

কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য, কাগজব্যবসায়ীরা প্রথমতঃ যে মণ্ড (pulp) প্রস্তুত করে, তাহাতে সোহাগা মিশ্রিত করিয়া থাকে। সোহাগা মিশাইবার উদ্দেশ্য কেবল কাগজগুলি চক্‌চকে করিবার নিমিত্ত।

চামড়া ব্যবহারোপযোগী করিবার এবং রং করিবার সময়, চর্ম্মব্যবসায়ীরা সোহাগা ব্যবহার করিয়া থাকে। সোহাগার সহিত রং দিয়া রং করিলে বেশ পাকা হয়। আবার দেখিতেও বেশ চক্‌চকে হয়।

বিলাতের খাদ্যদ্রব্যপ্রস্তুতকারী এবং বিক্রেতারাও সোহাগা ব্যবহার করিয়া থাকে। টিনের কৌটা করিয়া যে বিলাতি মাছ ও মাংস বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহাতে সোহাগার গুঁড়া ছড়াইয়া দেওয়া হয়। বহুপ্রকার খাদ্যদ্রব্যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধ অবিকৃত রাখিতে হইলে, সোহাগা ব্যবহার করা যায়।

ডাক্তার এবং বৈদ্যেরা ইহার খুব ব্যবহার করিয়া থাকেন। বৈদ্য-শাস্ত্রমতে, অগ্নিমান্দ্য, কাশি, শূল, অজীর্ণ এবং চর্ম্মরোগে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। সচরাচর আমাদের দেশে অনেকেই মুখের ভিতর ঘা হইলে সোহাগার খৈ এবং মধু ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পরিশেষে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে,—

১। আমাদের দেশের কুম্ভকারেরা যদি সোহাগামিশ্রিত জলে কিঞ্চিৎ গুঁড়া চূণ যোগ করিয়া মৃৎ-পাত্রাদিতে লেপন করিয়া পোড়ায়, তাহা হইলে পাত্রগুলি দেখিতেও বেশ সুন্দর হয়, অধিকন্তু পাকপাত্রস্থ বালুকা প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের সহিত আর আহার করিতে হয় না। পাত্র বিলক্ষণ তাত-সহও হয়।

২। রজকেরা কাপড়, জামা ইত্যাদি ইস্ত্রি করিবার সময় মাড়ের সহিত কিঞ্চিৎ সোহাগা মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে বস্ত্রাদি বিলক্ষণ চক্‌চকে হয়, সুতরাং নয়নরঞ্জক হইতে পারে।

শ্রীকুলভূষণ ভাদুড়ী।

প্রায়শ্চিত্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মকাল। বেত বনের নীচে দিয়া পদ্মা ছুটিয়া চলিয়াছে। স্রোতের আর সে তীব্র বেগ নাই। পূর্ব্বে যেখানে প্রখর স্রোত বহিত, এখন সেখানে বালির চর্ পড়িয়াছে। নদীর জল স্থির ও শান্ত। সান্ধ্য-বায়ু-স্পর্শে মধ্যে মধ্যে ছোট ঢেউ উঠিয়া কূলে আসিয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়ায় তীর হইতে ভগ-

জেলেরা ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সকলেই বাড়ী গিয়াছিল। চারিদিক জনমানবহীন ও নিস্তব্ধ। কেবল একজন বৃদ্ধ একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় বসিয়া জাল বুনিতেছিল। তাহার এগার বার বৎসরের নাতিনী বাটী হইতে যে পাত্রে দাদার জন্য ভাত আনিয়াছিল, সেই পাত্রগুলি মাজিতে ব্যস্ত। বাতাসে একরাশ কাল চুল উড়িয়া একশ'বার চোখে ও মুখে পড়ায়, সে ভারি জ্বালাতন হইতেছিল। "আঃ কি জ্বালা—মাগো! পোড়ারমুখো বাতাসের জ্বালায় যে গেলাম" এই বলিয়া হাত খানি বাঁকাইয়া বার বার স্থানভ্রষ্ট চুলগুলি মাথার উপর তুলিয়া দিতেছিল। কিন্তু বাতাস বালিকার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করায় সে রাগিয়া তাড়াতাড়ি হাত ধুইয়া বেশ করিয়া চুলগুলি মাথার উপর আঁটিয়া বাঁধিল। এবার কাজেকাজেই সেই ক্ষুদ্র বালিকার ভ্রূকুঞ্চনের নিকট পবনদেবকে হার মানিতে হইল।

একখানি ছোট জালিবোট আসিয়া ঘাটে লাগিল। জালি-বোটে এক জন মাত্র আরোহী। রাধাকান্ত বাবু কলিকাতার এক জন প্রসিদ্ধ ধনী। পাটের ব্যবসায় তাঁহার অনেক টাকা খাটিত। তিনি ভ্রমণ-উপলক্ষে ও সেই সঙ্গে কিছু কাজ কর্ম্ম দেখিবার জন্যও বটে, একখানি ক্ষুদ্র ষ্টীমার করিয়া সীরাজগঞ্জের দিকে যাইতেছিলেন। সঙ্গে একমাত্র কন্যা, তাঁহার এক পিস্তুতো ভাই ও পিস্তুতো ভায়ের গুটিকতক ছেলে মেয়ে। রাধাকান্ত বাবুর শীকারে সক্ ছিল। দুই তিন মাইল তফাতে সকলকে ষ্টীমারে রাখিয়া একলা জালি-বোট বাহিয়া একটি চরে শীকারে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় ষ্টীমারে ফিরিতেছিলেন, কিন্তু আকাশে মেঘ দেখিয়া নৌকাখানি নিকটবর্ত্তী ঘাটে লাগাইলেন। ঘাটে একজন লোককে দেখিয়া বলিলেন,—"ওহে ভাই! একটু তামাক খাওয়াতে পার? সমস্ত দিনটা ঘুরে ঘুরে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্চে। একটা লোকের মুখ দেখ্বার যো নাই।"

মাণিক তাড়াতাড়ি জাল বোনা রাখিয়া ঘাট হইতে মেয়েটিকে ডাকিল। সে বাসন মাজা শেষ করিয়া একটা কলসী বুকে দিয়া খুব পা ছুড়িয়া সাঁতার দিতেছিল। বালিকার শুভ্র অঞ্চল, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশির সহিত জড়াইয়া নদী-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিল। তাহার দাদার কথায় ভ্রূক্ষেপ নাই। সে এক্ষণে আগন্তুককে গ্রাম্য বালিকার স্পর্দ্ধার সামগ্রী সন্তরণকৌশল দেখাইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। দাদার এই রকম অন্যায় ডাকের উপর ডাক শুনিয়া বড় চটিয়া উঠিল। সে জল হইতে মুখ ভার করিয়া উঠিয়া

বলিল,—"কেন, কি কর্‌তে হবে ? আমি এতবার বাড়ী আর ঘাট করিতে পারিনে। আমার বুঝি আর পা ব্যথা করে না।" আমরা জানি, সে কিন্তু বাটীতে এক দণ্ড স্থির থাকিতে পারে না। দিনের মধ্যে দুশ'বার কোন না কোন কাজের অছিলা করিয়া ঘাটে আসে। কিন্তু আজ সে দাদার এই সঙ্গত হুকুম শুনিতেও অসম্মত। বহু কষ্টে অভ্যস্ত সন্তরণবিদ্যাটা দেখাইবার সে বড় একটা লোক পায় না, আজ যদি ভাগ্যক্রমে একজন ভাল দর্শক মিলিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধিহীন ঠাকুরদাদার জ্বালায় কোন কামনাই সফল হইবার উপায় নাই। সকল লোকেরই সহিষ্ণুতার একটা সীমা আছে। বালিকারও কি নাই ? তোমরা এ রকম করিয়া যখন তখন তাহার স্বাধীন ইচ্ছার উপর হস্তক্ষেপ করিলে, সে ছোট মেয়েটি বাঁচে কি প্রকারে বল!

মাণিক বলিল, "ক্ষেমা, লক্ষ্মী দিদি, এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে এস ত।"

ক্ষেমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রতার খাতিরে ঘর হইতে তামাক সাজিয়া আনিতে গেল। মাণিকের ঘর পদ্মার মধ্যে এক চরের উপর। চরটিতে কয়েক ঘর জেলে ও চাষা ব্যতীত আর কোন লোক বাস করিত না। চরটি বাবলা গাছে ও উলু খড়ে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে কাঁটা গাছ ও ঝোপ। ঝোপের মধ্যে অনেক পাখীর বাসা থাকায় অনেক দূর পর্য্যন্ত বালকদিগের মধ্যে চরটির খ্যাতি আছে। মধ্যে মধ্যে ডোবা এবং ডোবার ধারে একটু পরিষ্কৃত স্থলে পটলের বা আলুর ক্ষেত। মাণিকের ঘর খানি নদী হইতে বেশী দূর নয়। উঠানে দাঁড়াইয়া পদ্মার সফেন ঊর্ম্মিরাশি দেখা যায়।

রাধাকান্ত বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এত মাছ ধরিয়া কি কর ? কাছে ত লোকালয় দেখিতে পাই না, এত খদ্দের কোথায় পাও ?"

মাণিক এতক্ষণ সমস্ত জিজ্ঞাসার ছোট ছোট উত্তর দিয়া আপন মনে জাল বুনিতেছিল। তাহার অপরিচিতের সহিত কথা কহিবার বড় বেশী ইচ্ছা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু নিজের ব্যবসার কথা শুনিয়া তার একটু ঔৎসুক্য জন্মিল। সে বলিল, "আমরা মাছ ধরিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া থাকি।"

"বোধ হয়, সেখানে তোমার কোন মহাজন আছে ?"

"হাঁ হাঁ, আজ্ঞা, আপনি বোধ হয় মনোহর দাসকে চেনেন, সে আমার

ঠকাইতে পারিলে ছাড়ে না। সে ভাবে, পাড়াগাঁয়ের ভূত্‌গুলা আর সহরের কি দর দস্তর জানে!"

মাণিক ভাবিল, মনোহর দাসের ন্যায় একজন ধনী মহাজনকে না চেনা খুব একটা অসম্ভব কথা।

রাধাকান্ত বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন,—"না বাপু! তোমার মহাজনকে চিনি না। কিন্তু তোমার এত দিনের পুরাণ মহাজনকে ত্যাগ করা কি ভাল?"

মাণিক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না ছাড়িয়া কি করি বলুন। আমার এই নাতিনীটির বিয়ে দিতে হবে। আমার নাতজামাই নন্দ এক-খানা নৌকা কিন্‌বে, তাকে পঞ্চাশটাকা না দিলেই নয়। আর আমাদের ব্যবসার ত এই দশা—এত খেটেও পেট্ ভরে না। তা ছাড়া মরণ ত সঙ্গে সঙ্গে ঘুর্‌চে।" এই কথা বলিতে বলিতে মাণিকের মুখ একটু ম্লান হইয়া আসিল। তার একমাত্র পুত্র ক্ষেমার বাপ্ নবীনের জলে ডোবার কথা মনে পড়িল। দুই বৎসর পূর্ব্বে, এই রকম একদিন সন্ধ্যার সময়, ভয়ানক ঝড় বৃষ্টির পর, মাণিক নদীর ধারে লণ্ঠন লইয়া কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল। কাহার নাম ধরিয়া বার বার ডাকিয়াছিল, কিন্তু বাতাসের শব্দ ও উত্তাল নদীতরঙ্গের কোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পায় নাই। কাহার জন্য সেই তামস অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুদা-লোকে ক্ষণপ্রভাসিত নদীসৈকতে দাঁড়াইয়া সতৃষ্ণনয়নে চারি দিক্ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিল। এই সমস্ত স্মৃতি চকিতের মত তাহার হৃদয়টা উলটিয়া পাল্‌টিয়া দিয়া গেল। সেই দিন হইতে মাণিকের জগতের উপর কেমন একটা অনাস্থা জন্মিয়াছে। কেবল ক্ষেমাকে যা একটু ভাল-বাসে, এবং তাহাকে সুখী দেখিয়া মরিবার কামনা যখন তখন করিয়া থাকে। লোকে বলিত, সে আদর দিয়া নাতনিটির মাথা খাইতেছিল। একবার পূজার কাপড় ক্ষেমার পছন্দ না হওয়ায়, সে সকলের সম্মুখে কাপড় উনুনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল। তাহার মা তাহাকে মারিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু তাহার ঠাকুরদাদা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "আহা, ওরকম ছেলেমানুষে করিয়াই থাকে।" তাহার মা তাহাকে একটুও আঁটিতে পারিত না। ... তার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সে বাড়ী আসিত। গ্রামের মেয়েদের সহিত

কিন্তু তাই বলিয়া সে ছেলেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যাচার সহ্য করিতে পারিত না। মেয়েদের উপর ছেলেদের স্বাভাবিক প্রভুত্বের সীমা কিছু বাড়িলে, সে ঘোর বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইত, এবং ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া নিজে এক ক্ষুদ্র দল বাঁধিত। ক্ষেমার আর একটা বড় দোষ, সে কিছু মুখরা। কেহ দুকথা বলিয়া ক্ষেমার কাছে শীঘ্র পার পাইত না। লোকে বলিত, ক্ষেমা যাঁর অঙ্কলক্ষ্মী হবেন, তাঁর প্রতি গৃহলক্ষ্মীর বড় একটা শুভ দৃষ্টি থাক্‌বে না। কিন্তু লোকের অভ্রান্ত মতই কি মানুষ চিনিবার একমাত্র উপায়! কারণ, তার ঠাকুরদাদার মতে, তার মতন লক্ষ্মী মেয়ে ত দেশের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া ভার।

একটু একটু করিয়া মেঘ কাটিয়া গেল। সে দিন পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নায় চারিদিক ছাইয়া গেল। রজতমুকুট পরিয়া ছোট ছোট ঢেউগুলি নৌকার গায়ে আসিয়া পড়িতেছিল। চন্দ্রকিরণ বক্রভাবে জলের উপর পড়ায় বোধ হইতেছিল, কে যেন চন্দ্রলোকে যাইবার জন্য পদ্মার উপর একটি রজতময় পথ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। রাধাকান্ত বাবুর সেই স্ফটিকনিভ জল দেখিয়া স্নান করিতে ইচ্ছা গেল। তিনি বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মাণিক! তুমি আমার জন্য একটা বড় মাছ নিয়ে এসো দেখি, আমি এখানে স্নান করি। তোমার মহাজনের দেশের লোক বলে নেহাৎ কম দাম দিব না।"

মাণিক হৃষ্টচিত্তে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কিন্তু অর্দ্ধ পথ যাইতে না যাইতেই নদীকূল হইতে কাতর কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া ফিরিয়া আসিল। রাধাকান্ত বাবুকে না দেখিয়া সে একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, স্রোতের বেগে হয় ত তিনি অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছেন, তীরে ফিরিবার হয় ত তাঁর শক্তি নাই। সে কি করিবে, মনে মনে ভাবিতেছে, এমন সময় দূরে জলের উপর একখানি হাত দেখিতে পাইল। বিপন্ন ব্যক্তি যেন নীল আকাশের দিকে হাত বাড়াইয়া ঈশ্বরের নিকট শেষ সাহায্য ভিক্ষা চাহিতেছিল। কিন্তু পরক্ষণেই পদ্মার জ্যোৎস্নাধৌত বহুদূরপ্রসারী জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। চারিদিক শূন্য। শীতল চন্দ্রকিরণে চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছিল।

মাণিক তাড়াতাড়ি আগন্তুকের ক্ষুদ্র নৌকা খানিতে উঠিয়া সেই হস্তনির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে বাহিয়া চলিল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া জল-

চারিদিক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল, কিন্তু কোন সজীব পদার্থই তাহার নয়নপথে পড়িল না, সে অগত্যা কূলে ফিরিল।

চারিদিকের নীরবতা আজ মাণিকের পক্ষে অসহ্য বোধ হইতেছিল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সে এক দৃষ্টে অসীম জলরাশির দিকে চাহিয়াছিল। রাধাকান্ত বাবুর মৃত্যুর বিষয় সে কোন রকমে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। যে এই মাত্র তাহার সহিত হাসিয়া কথা কহিতেছিল, সে যে এই অসীম সাগরাম্বরা ধরিত্রীর আর কেহ নহে, সে কথা সে কোন মতে মনে স্থান দিতে পারিতেছিল না।

হঠাৎ তাহার দৃষ্টি নৌকার খোলে একটি উজ্জ্বল সামগ্রীর দিকে আকৃষ্ট হইল। তাড়াতাড়ি জিনিসটি তুলিয়া লইয়া দেখিল, সেটি একটি সুন্দর আঙ্‌টি। অঙ্গুরীসংলগ্ন এক খণ্ড হীরক চন্দ্রালোকে জ্বলিতেছিল। মৃতের আঙ্‌টিটি হাতে করিতেই তাহার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল। তাহার ক্ষেমার বিবাহের কথা মনে পড়িল। ক্ষেমার মতন সুশ্রী মেয়ে জেলের ঘরে খুব কম্ দেখা যায়। তার ডাগর চোক ও কোমর পর্য্যন্ত কাল কোঁকড়ান চুল দেখিলে সকলেরই ভুলিয়া যাইবার কথা। তার দাদামহাশয়ের বড় দুঃখ যে, এমন সুন্দর নাতনীর বিবাহে কিছু ভাল যৌতুক দিতে পারিবে না। সে ভাবিল, এই অঙ্‌টিটি হাতে দিলে বিবাহের রাত্রে রক্তাম্বরপরিহিতা ক্ষেমাকে কেমন সুন্দর দেখাইবে। আর এমন একটি বহুমূল্য জিনিস লইয়া গেলে শ্বশুরবাড়ীতেও কনের আদরের অপ্রতুল হইবে না। লোকেও মাণিকের বদান্যতার ও ভালবাসার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিবে। আর যে মরিয়া গিয়াছে, তারই বা এ আঙ্‌টির কি দরকার! এই রকম ভাবিতে ভাবিতে মাণিক আঙ্‌টিটি কোঁচার খুঁটে বাঁধিয়া লইল। তার গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল। সে চারিদিকে দেখিল, কেহ তাহাকে দেখিতেছে কি না।

তীরের সন্নিকটে একটি ভাঙা শিবের মন্দির ছিল। সেখানে কোন দেব-মূর্ত্তি ছিল না, মন্দিরটি একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ মাথায় করিয়া কেবল কোন এক প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গের সমৃদ্ধিশালী বংশের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছিল। মাণিক তীরে উঠিয়া মন্দিরের এক কোণে আঙ্‌টিটি পুঁতিয়া রাখিয়া আসিল। মন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, মাণিকের রকম দেখিয়া কেহ না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। সে দশ হাত পথ চলিতে পঁচিশ বার পিছন দিকে

বসিল। যেখানে রাধাকান্ত বাবু ডুবিয়াছিলেন, মাণিক কোনমতে সে দিকে চাহিতে পারিতেছিল না। রাধাকান্ত বাবু স্নানের পূর্ব্বে নৌকার উপর যে কাপড়গুলি ছাড়িয়াছিলেন, সে সেইগুলি লইয়া গ্রামের অপর লোকদিগকে খবর দিতে চলিল। জামার মধ্যে ঘড়ি, সোনার চেন ও গুটিকতক টাকা ছিল, কিন্তু সেগুলি আত্মসাৎ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

পদ্মা কুলু কুলু স্বরে বহিয়া যাইতেছিল। পরিষ্কার রাত্ বলিয়া দু একটি গ্রাম্য বধূ শাশুড়ী বা ননদের সহিত নদী হইতে জল লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল। পদ্মা এখন এম্‌নি স্থির ও শান্ত যে, তাহার গর্ভে এই মাত্র যে একটি সজীব মানব আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহা শীঘ্র কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার দুই দিন পরে বৈকালে নন্দ একটা বড় মাছ লইয়া মাণিকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। রাধাকান্ত বাবু জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন, এ কথা গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। নন্দও সে কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিল।

মাণিক একখানি নৌকায় গাব্ দিতেছিল, নন্দকে দেখিয়া ঘর হইতে একখানি টুল আনিয়া বসিতে দিল। পাশের হুঁকাটি লইয়া নন্দ তামাক খাইতে লাগিল।

ক্ষেমা ও তার মা উঠানে বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছিল। ক্ষেমা নন্দকে দেখিয়া একবারে এক দৌড়ে তার সই সরস্বতীদের বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল। সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "কি সই এত হাঁপাচ্চিস্ কেন? ভয় পেয়েছিস্ নাকি!" ক্ষেমা আর কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "কি জানি ভাই! অশথ্ তলা দিয়ে আস্‌তে কেমন গা ছম্ ছম্ করে এল।" সরস্বতীর মা প্রভৃতি সকলে হাসিয়া উঠিল, কারণ ক্ষেমার মাথায় কাপড় দেখিয়া কারণ জানিতে এতক্ষণ আর বাকি ছিল না। সকলকে হাসিতে দেখিয়া ক্ষেমা একটু অপ্রতিভ হইল। সইয়ের উপর তার মনে মনে ভারি রাগ জন্মিল; কারণ, সরস্বতী ইঙ্গিত করিয়া প্রশ্ন না করিলে ত সে এত বিপদে পড়িত না।

নন্দ মাণিককে রাধাকান্ত বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু সে কথা উঠিতেই মাণিকের মুখ শুকাইয়া আসিল।

উত্তর দিয়া ক্ষেমার বিবাহের কথা পাড়িল। মাণিক ক্ষেমার বিবাহ যাহাতে শীঘ্র হয়, সে বিষয়ে জেদ করিতে লাগিল, এবং নিজের মত সমর্থনের নিমিত্ত গুরুতর কারণ দেখাইতেও ত্রুটী করিল না। সে ক্ষেমাকে আঙ্গটিটি দিতে পারিলেই যেন নিশ্চিন্ত হয়, তার মন হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া যায়। ইহার মধ্যেই সে একটা বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। মাণিক মৃত ব্যক্তির কাপড়ের সহিত সোণার ঘড়ী, চেন ও টাকা ফিরাইয়া দেওয়ায় লোকে তাহার বরং সুখ্যাতি করিতেছিল, কিন্তু তবুও তাহার মনের ভিতর শান্তি ছিল না। এক একবার আঙ্গটিটি ফিরাইয়া দিবার জন্য ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু তাহার বিশ্বাস, কলিকাতার লোক ভারি নিষ্ঠুর, যদি তাহারা তাহাকে পুলিসের হাতে চোর বলিয়া ধরাইয়া দেয়, তাহা হইলে ক্ষেমার ও তার মার কি দশা হইবে।

নন্দ দুটি ডাগর চোখের অন্বেষণে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। কিন্তু কোনওখানে নিবিড় অলকবেষ্টিত একখানি কচি মুখের সন্ধান না পাইয়া তাহাকে অগত্যা সেদিনের জন্য বিদায় লইতে হইল। কিন্তু তাহাকে বেশী দূর অতৃপ্ত হৃদয়ে যাইতে হইল না। সরস্বতীদের বাড়ীর দুয়ারেই বাঞ্ছিতের দর্শন মিলিল।

ক্ষেমা নন্দকে দেখিয়াই পলাইবার উপক্রম করিতেছিল! কিন্তু তাহার সই তাহাকে ছাড়ে কই। সরস্বতী ক্ষেমার আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নন্দ সমুখে আসিতেই, ক্ষেমাকে ধাক্কা দিয়া নন্দর গায়ে ফেলিয়া দিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। ক্ষেমা পড়িয়া যাইতে যাইতে রহিয়া গেল। ক্ষেমার এ তামাসা ভাল লাগিল না। তাহার চোক মুখ লাল হইয়া উঠিল। মাথার চুলগুলি কুপিত ফণিনীর ন্যায় গণ্ডের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। রাগে ও লজ্জায় তার চোকে জল আসিল, সে রাগিয়া বলিল—"চল দেখি, সইমার কাছে। তুমি ভারি বেহায়া হয়েছ।" সরস্বতী ত এই চায়। সে সইকে রাগাইয়া চোকে জল দেখিতে ভালবাসিত। ক্ষেমার একটা বদ্ রোগ, তাহার একটু সামান্য কারণেই চোক দিয়া জল পড়িত। সরস্বতী ক্ষেমাকে ঝাঁজরাচোকি বলিয়া যখন তখন ঠাট্টা করিত। "আ-হা-হা মেয়ের অমনি চোক দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়্চে। নন্দ ত চিরকালই চোকের জল মুছিয়ে দেবে, আমি না হয় একবার মুছাইয়া দি।" এই বলিয়া সে কাপড়ের

ছুড়িয়া দিয়া বলিল, "যাও, আর আদর দেখাতে হবে না।" সরস্বতী দেখিল, রাগটা কিছু বিষম, শুধু কথায় হইবে না, অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু উপায়ান্তরের আর আবশ্যক হইল না। একজন ভদ্রলোক নিকটে আসায় দুজনে দূড়্ দুড়্ করিয়া বাড়ীর মধ্যে পলাইয়া গেল। তার পর, দুজনের মধ্যে যে কি প্রকারে মিলন হইল, তা আমরা জানি না; তবে এইমাত্র বলিতে পারি, ক্ষেমা তার সয়ের সঙ্গে দুদিন ভাল করিয়া কথা কহে নাই।

ভদ্রলোকটি রাধাকান্ত বাবুর একজন আত্মীয়। তিনি, মাণিককে ষ্টীমারে রাধাকান্ত বাবুর কন্যার কাছে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন। রাধাকান্ত বাবুর কন্যার, পিতার মৃত্যুর আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শুনিবার একান্ত ইচ্ছা। মাণিক প্রথমে কিছুতেই যাইতে রাজী হইল না। কিন্তু নন্দর ও প্রতিবেশী দু একজনের নিতান্ত অনুরোধে, সে যাইতে স্বীকৃত হইল।

মাণিককে দেখিয়া মেয়েটি ষ্টীমারের ডেকের উপর আসিল। তাহার চোক দুটি জবাফুলের মত লাল। মাণিকের সমভিব্যহারী ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"সরলা তুই বুঝি আবার কাঁদছিলি। কেন মা! আমাদের আর যন্ত্রণা দিস্। দাদা কি আর ফিরিবেন?" "কই কাকামশায় আমি ত আর কাঁদছিনে।" কিন্তু এই কটি কথা বলিতে বলিতে তার চোক্ দুটি আবার জলে পুরিয়া গেল। যিনি সান্ত্বনা করিতেছিলেন, তাঁরও চোকের পাতা ভিজে ভিজে ঠেকায়, তিনি মুখ ফিরাইয়া পদ্মার উর্ম্মিরাশি দেখিতে লাগিলেন।

মাণিক, মেয়েটির সুন্দর অশ্রুপ্লাবিত ম্লান মুখ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। রাধাকান্ত বাবুর মত সেই চোক, সেই চাহনি, সেই ভ্রূকুঞ্চন। এত মৃতের দ্রব্য অপহরণ করা নয়—এ যে এই জীবন্ত লক্ষ্মীরূপিনী মেয়েটিকে ঠকান। মাণিকের মুখে আর বাক্য সরিল না।

পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটি মাণিককে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু মাণিক একটি কথারও জবাব দিতে পারিল না।

"কাকা মহাশয়! আহা ও বুড়া মানুষ, ও হয় ত ভয়ে থতিয়ে যাচ্চে। ওকে একটু বস্‌তে দাও।" এই বলিয়া মেয়েটি একটি মোড়া সরাইয়া দিল। কিন্তু মাণিক মোড়ায় না বসিয়া ডেকের এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সেদিনকার ব্যাপারটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় এক প্রকার করিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শত বার এই কাহিনী সে গ্রামের লোককে শুনাইয়া-ছে কিন্তু আজ যেন শত চেষ্টাতেও একটিও কথা ভাল করিয়া মুখ হইতে

বাহির হইতেছিল না। মেয়েটির স্থির দৃষ্টির দিকে মাণিক চাহিতে পারিতে-ছিল না। সে অবনত দৃষ্টিতে থামিয়া থামিয়া বক্তব্য বিষয়টি কোন প্রকারে শেষ করিল। তাহার কথার ভঙ্গীতে বোধ হইতেছিল, যেন তাহার দোষেই এই শোকাবহ ব্যাপার ঘটিয়াছে। সেই যেন একমাত্র অপরাধী—এবং তাহার জন্য বার বার মার্জ্জনা ভিক্ষা চাহিতেছিল। "তা আমি আর কি করব—আমার এই বুড়া বয়েস, যেটুকু শক্তি আছে—সেই শক্তিতে নৌকা বাহিয়া চলিলাম। কিন্তু আমার যাবার পুর্ব্বেই বাবুমশায় ডুবিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে আমার আর দোষ কি বল।"

সরলার কাকা বলিলেন "তা সত্যি—তোমার আর কি দোষ। যাহাকে নিয়ত টানিতেছে, তাহাকে কি আর মানুষে ধরিয়া রাখিতে পারে। আমরা কি কুক্ষণেই বাড়ী হইতে যাত্রা করিয়াছিলাম। যা হোক মাণিক, তুমি যে দাদাকে বাঁচাইতে এত চেষ্টা করিয়াছিলে, আমরা তাহা কখনও ভুলিব না।"

সরলার অভিপ্রায়ানুসারে, যেখানে রাধাকান্ত বাবু ডুবিয়াছিলেন, সেই-খানে ষ্টীমার লইয়া যাওয়া হইল। মাণিক এক এক বার অপাঙ্গে মেয়েটির দিকে চাহিতেছিল। মেয়েটির প্রশান্ত দৃষ্টি যেন আর এ জগতে নাই। শৈশবের ও যৌবনের স্মৃতির অস্পষ্ট ছায়া তাহার চোখের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। শৈশবেই সে মাতৃহারা, পিতার একমাত্র দুহিতা বলিয়া পিতৃ-গৃহে তাহার আদর ধরিত না। পিতার স্নেহের বাণী এখনো যেন সে শুনিতে পাইতেছিল। বিবাহের পর কন্যাকে কনকাঞ্জলি দিয়া বিদায় দিবার সময় রাধাকান্ত বাবু স্ত্রীলোকের মতন কেমন করিয়া কাঁদিয়াছিলেন—সে সকল কথা তাহার মনে পড়িল। এক দিন সরলা তাহার খোকাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করায় রাধাকান্ত বাবু সরলাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছিলেন। সরলা রাগ করিয়া সমস্ত দিন কিছু খায় নাই। তার পর সন্ধ্যার সময়, বাবার অনেক সাধ্য সাধনার পর সে চাট্টি ভাত খাইয়াছিল। সে ঘটনা যেন কাল হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে আর রুদ্ধ অশ্রুপ্রবাহ বাধা দিয়া রাখিতে পারিল না। ষ্টীমারের রেলিং ধরিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। "আঃ, কি ছেলেমানুষি করছিস্। তোর আবার সেই অসুখ হবে। আর তুই ত লেখা পড়া শিখেছিস্, তোর কি এত অধৈর্য্য

লইয়া গেলেন। লেখাপড়া শিখিয়া অশ্রুপাত করা একটা অতি গর্হিত কাজ্ বলিয়া লোকের যেন কেমন একটা ধারণা!

মাণিক এই অবসরে বিদায় লইবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সরলার কাকা আসিয়া তাহাকে বাধা দিলেন। তিনি গুটি কয়েক টাকা মাণিকের হাতে দিয়া বলিলেন, "এ যৎসামান্য পুরস্কার। তোমার নাতনীর বিবাহের সময় সরলার আরো কিছু দিবার ইচ্ছা আছে। বুড়া! পিতৃমাতৃহীন বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করিও।"

মাণিক টাকার কথা শুনিয়া মরমে মরিয়া গেল। যাহার সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছে, তাহার কাছে আর সে কোন্ লজ্জায় উপহার গ্রহণ করিবে। এত পাপের ভার কি তাহার সহিবে! "না মশা'য়, আপনাদের এমন কি উপকার করিয়াছি যে,তাহার জন্য টাকা লইতে যাইব" এই বলিয়া সে ষ্টীমার হইতে লাফাইয়া নৌকায় উঠিল। তীরে উত্তীর্ণ হইয়াই ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। ষ্টীমারে মাণিকের প্রতিবেশী ও অন্যান্য সকল লোকে অবাক্ হইয়া গেল। বিশেষতঃ, মাণিকের গ্রামের লোকেরা তাহার এই প্রকার নিঃস্বার্থ স্বভাবের উদাহরণ কখন দেখে নাই। সকলেই ভাবিল, লোকটার একটু মস্তিষ্কের বিকৃতি হইয়াছে।

ক্ষেমা নদীর ধারে দাঁড়াইয়া বিস্মিতনেত্রে ষ্টীমার দেখিতেছিল। সরলার কাকা তাহাকে ডাকিয়া সরলার কাছে লইয়া গেলেন। ক্ষেমার সপ্রতিভ ভাব দেখিয়া সরলার শোকের কিছু উপশম হইল। নূতন কচি হৃদয়ের কি এক শান্তিপ্রদ শক্তি আছে। নূতন হৃদয়ের সংস্পর্শে পৃথিবীর কত শোকাশ্রু থামিয়া যায়।

ক্ষেমাকে পাইয়া মণিবাবুর, (সরলার খোকার) আর আহ্লাদের সীমা ছিল না। সে কান্নাকাটিতে ভারি জ্বালাতন হইয়া গিয়াছিল। দুই তিন দিনের পর, অশ্রুজলবিরহিত একটি সহজ মানুষকে দেখিয়া, তার মনটা একটু ঠাণ্ডা হইল। আর আদর করিবারও একটি লোক মিলিল। এ দুই দিন তার দৈনিক আদরের ভাগ কিছু কম হওয়ায় সে বড় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। সে ক্ষেমাকে লইয়া কিছুক্ষণ ডেকের চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়াইল। তার পর, নিজের ক্ষুদ্র জগতের সুখদুঃখের কাহিনী বলিতে বলিতে ক্ষেমার কোলে ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্ষেমার বাড়ী যাইবার সময় হইলে সরলা একখানি ছেলির কাপড় ও

কয়েকটি টাকা হাতে দিয়া বলিলেন, "এই কাপড় খানি শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় পরো। আর টাকা ক'টি তোমার ঠাকুরদাদার হাতে দিও, তিনি বিবাহের সময় তোমার একখানি গহনা গড়াইয়া দিবেন। আমায় কি আর কখনো মনে পড়বে?"

ক্ষেমা ভাবিল,—মনে আর পড়িবে না?—জীবনের কত মুহূর্ত্ত এই অমরপ্রার্থিতা দেবীর স্বপ্নে ভরিয়া থাকিবে।

তার পর দিন সেই ক্ষুদ্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া ষ্টীমার খানি কলিকাতাভি-মুখে যাত্রা করিল। দিন কয়েক পরেই গ্রামের লোকেরা এসব কথা ভুলিয়া গেল। কেবল ক্ষেমার হৃদয়ে এক মধুর বাসন্তী স্মৃতি জাগিয়া রহিল।

অনেক সময় চকিতের জন্য বিদেশে কাহাকেও দেখিয়া বা কাহারও সহিত আলাপ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। কিন্তু যখনি ভাবি,হয় ত সারা জীবনের মধ্যে তাহার সহিত আর কখনও দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই, জীবনে সে এক পথ ধরিয়া চলিয়াছে—আমি স্বতন্ত্র পথে ছুটিয়াছি—তখন মন কেমন উতলা হইয়া উঠে। আমরা অপরিচিতকে দিবাস্বপ্নের মধ্যে আনিয়া, আত্মীয় কুটম্ব করিয়া গড়িয়া লইতে চাই। হয় ত প্রখর গ্রীষ্মের দুপুর বেলায় ক্ষেমা পদ্মার চঞ্চল ঊর্ম্মিরাশি দেখিতে দেখিতে সরলাকে লইয়া এই রকম কত স্বপনের মালা গাঁথিত!

ফুরাল ।

১

জাগিয়া রয়ে'ছে আঁখি
আরো কত বর্ষ বাকি
কোথা মোর দুঃখময়ী চিন্তা তরঙ্গিণী ।
কোথা আজ সুখস্মৃতি
কোথা তুমি সে পীরিতি
স্মৃতিময়ী, প্রীতিময়ী জীবন-সঙ্গিনী ।
আমি চির অমানিশি
তুমি পূর্ণিমার শশী
সম্মুখে দাঁড়াও আসি, পূর্ণিমা রজনী ।
হৃদিপিণ্ড মর্ম্মস্থল
জ্বলে উঠে দাবানল
প্রেমের শ্মশানে বালা যৌবনে যোগিনী ।
নিরাশায় ঘুরে ঘুরে
কত শত প্রাণ-পুরে
জীবন-সরসী মাঝে স্বর্ণ-কমলিনী !
শুখালে, লুকালে মুখ
পাষাণে বাঁধিলে বুক,
বিষধর হলাহল, তাও সঞ্জীবনী ।

২

এত ঘৃণা পরিহাস
তবু মুখে নাহি ভাষ
তবু চেয়ে অনিমিখ আঁখি-মন্দাকিনী !
বসন্তের তুমি ছবি
আমিও প্রেমের কবি
জুড়াও জুড়াও, শুষ্ক প্রাণ মরুভূমি ।
গ্রহে গ্রহে ঘুরে ঘুরে
শত বজ্র বুকে ধ'রে
সমাজ সংসার দ্বারে, নাম "কলঙ্কিনী ।"
বহুক কলঙ্ক শ্বাস
কোথা হেথা সে বাতাস
দুনিয়া পিছনে থাক্, চল বিষাদিনি !

৩

ভেবেছিনু উপকথা
বাসি ফুলে মালা গাঁথা
ছেলেখেলা করে যাবে, শুধুই রজনী ।
প্রভাত না হ'তে রাতি
নিভিল প্রেমের বাতি
আঁখিজল ছলছল ভাসিল ধরণী ।
জগতের এক কোণে
তব প্রেম-আরাধনে
আজীবন কাঁদি কাঁদি যাপিব যামিনী ।
অগাধ বিশ্বাস ভরে
দেছ' প্রেম হাতে ক'রে
ডুবেছি, ডুবেছি ওগো—বাসি ভাল আমি ।

৪

দোঁহারি এ সর্ব্বনাশ,
কাঁদিয়া পুরাব আশ,
শিয়রে জাগিয়া বসি, থেক, প্রণয়িনি ।
তৃপ্ত হবে তায় প্রাণ
পূর্ণ হবে মনস্কাম,
জীবনের অবসান হ'ক না তখনি ।
এ নহে মিলন স্থান
প্রণয়ের অপমান,
কথা, ব্যথা, শুধু হেথা—কলঙ্ক-কাহিনী ।
মর্ম্মে মর্ম্মে শুধু বওয়া
শুধু কেঁদে ফিরে চাওয়া,
বেঁচে থাকা, মরে থাকা, পরাণপোড়ানি ।

সমুদ্রযাত্রা ও জন্মভূমি পত্রিকা।

১। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের মতে ধর্ম্ম দুই প্রকার; শাস্ত্রোক্ত ও আচারগত। তন্মধ্যে আচারগত ধর্ম্মই প্রধান; যথা, "যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞঃ সিন্ধুসংহরণক্ষমঃ। তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ।" যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে, অথচ আচারে নাই, তাহা মৃত হইয়াছে। কিন্তু যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে নাই, অথচ আচারে আছে, তাহা শাস্ত্রার্থের বিপরীত হইলেও অনুসরণীয় হইয়া থাকে। "দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ" অর্থাৎ ভর্ত্তার অভাবে দেবরের দ্বারা সুত উৎপাদন করা যায়, এ ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত হইলেও কখন সম্যক্‌রূপে আচরিত হয় নাই, সুতরাং ইহা মৃত হইয়াছে; অর্থাৎ ইহা কোন কালেই প্রকৃতরূপে অনুসৃত হয় নাই। রাম মারীচের অনুসরণে গমন করিলে পর, সীতা লক্ষ্মণের প্রতি যে সকল কুবাক্য * প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবর্ত্তমানে তৎ-পত্নীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করা দেবরের পক্ষে অসঙ্গত ছিল না; তথাপি লক্ষ্মণ সীতার কুবাক্য সমূহের উত্তরে তাঁহাকে 'দৈবতং' † বলিয়া সম্বোধন ও প্রণাম

---

* সুদুষ্টস্ত্বং বনে রাম মেকমেকোঽনুগচ্ছসি।
মম হেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা॥ ২৪॥
তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে তবাপি ভরতস্য বা।
কথমিন্দীবরশ্যামং রামং পদ্মনিভেক্ষণম্॥ ২৫॥
উপসংশ্রিত্য ভর্ত্তারং কাময়েয়ং পৃথগ্ জনম্।
সমক্ষং তব সৌমিত্রে প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্॥ ২৬॥

রামায়ণ; অরণ্যকাণ্ড, ৪৫ সর্গ। ২৪, ২৫, ২৬ শ্লোক

দুষ্ট! তুই ভরতের নিয়োগে বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবে আমার জন্য রামের একাকী অনুসরণ করিতেছিস্। রে সৌমিত্রে! তাহা সিদ্ধ হইবে না, আমি ইন্দীবরশ্যাম রামকে ভর্ত্তা স্বীকার করিয়া কিরূপে অন্যকে কামনা করিব। এক্ষণে তোর সমক্ষে আমার প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

† অব্রবীল্লক্ষ্মণঃ সীতাং প্রাঞ্জলিশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
উত্তরং নোৎসহে বক্তুং দৈবতং ভবতী মম॥ ২৮॥

ঐ কাণ্ড, ঐ সর্গ, ২৮ শ্লোক।

সুশীল লক্ষ্মণ, জানকীর এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্যে!

করিয়াছিলেন। ফলতঃ শাস্ত্রে আছে যে, দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ ইত্যাদি, অথচ আচারে দেখা যায় যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে মাতৃ সম্বোধন করাই সকল যুগের ধর্ম্ম হইয়া আসিতেছে। আবার দেখ, পিতামহ বা মাতামহ, যুক্তি-মতে ও শাস্ত্রানুসারে পিতার অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, নাতি-নীরা তাঁহাদিগকে কিরূপ সরস ভাষায় আদর করিয়া থাকেন। অথচ, তাহাতে তাঁহাদের অধর্ম্ম হয় না।

২। শাস্ত্রে আছে,মানুষের অস্থি স্পর্শ করিলে অশৌচ হয়। যথা, মানুষাস্থি স্নিগ্ধং স্পৃষ্ট্বা ত্রিরাত্রমশৌচং। অস্নিগ্ধে ত্বহোরাত্রম্ ইতি প্রায়শ্চিত্তবিবেক। যখন মৃত মহাত্মা ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজে প্রথম প্রবেশ করেন, তখন দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা উচ্চৈঃস্বরে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিল। ব্যবস্থাপক ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিবার নিমিত্তে পরামর্শ দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ হতাশ্বাস হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, মধুসূদন কখনই সমাজ-বন্ধন পরিহার করিয়া শবচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন না। এমন কি, শোনা যায় যে, যেদিন মধুসূদন কলেজের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথম শবচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সে দিন কেল্লা হইতে তোপধ্বনি হয়। অদ্যাপি কলেজগৃহে মধুসূদনের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত রহিয়াছে। এই ব্যাপার ত্রিংশৎ বৎসরের বড় অধিক পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু আজি দেখ, সমাজের কি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন হিন্দু সন্তানেরা মেডিকেল কলেজে দলে দলে প্রবেশ করিতেছে। এখন আর গবর্ণমেণ্ট তোপধ্বনি করেন না, তোপধ্বনি করা দূরে থাকুক, ছাত্রদিগকে প্রবেশকালে বৃত্তিদানও স্বীকার করেন না। বৃত্তিদান করা দূরে থাকুক, ছাত্রেরা ভূরি পরিমাণে বেতন স্বীকার করিলেও তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। মধুসূদন গুপ্তকে জাতিচ্যুত করিবার জন্য হিন্দু সমাজ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন ডাক্তারেরাই দেশের সমাজপতি হইয়াছেন; এমন কি, বোধ হয়, নব-দ্বীপের সর্ব্বপ্রধান ব্যবস্থাপক পণ্ডিত মহাশয়ও বিনা মূল্যে ডাক্তারের দর্শন লাভ করিতে সাহস করেন না। আমরা এই জন্যই বলিতেছি যে, কালে আচারই বলবান্ হয়। এখন যাঁহারা ইংলণ্ডে যাইবার পথ অবরোধ করিতে-

---

ততস্ত সীতামভিবাদ্য লক্ষ্মণঃ কৃতাঞ্জলিঃ কিঞ্চিদভিপ্রণম্য ইত্যাদি। ৪০ শ্লোক। অনন্তর লক্ষ্মণ

ছেন,ইহার পর হয় ত তাঁহারাই আবার আপনাদের পুত্র পৌত্রদিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিবেন। আচার শাস্ত্রের অনুসরণ করে না, ইহা যুক্তি ও প্রয়োজনের অনুসরণ করে। কয় জন লোক রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্ব দেখিয়া তদনুসারে চলিয়া থাকে ? কেবল আজি কালি নহে, রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্ব, হিন্দুয়ানীর ঘোরতর প্রাদুর্ভাবকালেও বাঙ্গালায় সম্যক্‌রূপে অনুসৃত হয় নাই। বোধ হয়, রঘুনন্দনের লিখিত ব্যবস্থাসমূহের শতকরা ৯০ ভাগ চিরকালই পরিত্যক্ত বা অপালিত হইয়া আছে। ঋতুমতী ভার্য্যাকে কয় জন লোক কোন্ কালে ভূশয্যায় ফেলিয়া রাখিয়াছে, কোন্ বৈদ্য সূতিকাকে স্পর্শ করিয়া কোন্ কালে অশৌচগ্রস্ত হইয়াছে, বালকের বিষ্ঠা স্পর্শ করিয়া কোন্ গৃহিণী কোন্ কালে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ অসম্পূর্ণ রাখিয়াছে, কয় জন লোক বার ও তিথি দেখিয়া নিম্বাদি ভক্ষণ করিয়াছে ? কয় জন লোক মদ্যপান করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে ? ফলতঃ, এ সকল কথার আলোচনা করাই বাহুল্য বোধ হয়।

৩। আর হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় স্থিতিস্থাপক। ইহা গোমেধ যজ্ঞেরও বিধি দেয়, আবার সামান্য মশকবধ করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে কহে। ইহা পুতুলপূজা নিষেধও করে, আবার পুতুলপূজার বিধিও দেয়। ইহা যে মুখে বলিতেছে যে, অজ্ঞদিগের জন্য পুতুলপূজা বিধি, সেই মুখেই বলিতেছে, প্রাজ্ঞদিগের পক্ষে নিরাকারপূজাই বিধি। ইহা মানবের অবস্থা,প্রয়োজন ও প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া তাহাকে উপদেশ দেয়। ইহা সমস্তই নিষেধ করে, আবার কিছুই নিষেধ করে না। তুমি সরল বুদ্ধিতে যখন যাহা উপযুক্ত বোধ কর, ইহা তোমার নিকট তখনই তাহার অনুমোদন করে।

৪। ভগবদ্গীতা পাঠ করিয়া দেখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম সকলই সমান বোধ হইবে।* যে হিন্দু সামান্য মশকবধ করিলেও প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন বলিয়া বোধ করে, সে দেখ, গুরুহত্যা করাকেও অপরাধ বলিয়া ভাবিতেছে না। কৃষ্ণ যে মুখে বলিয়াছেন, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, সেই মুখেই আবার বলিয়াছেন যে, গুরুহত্যা করা সময়বিশেষে অপরাধ নহে। ফলতঃ যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম

---

* অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়াভূতেষলোলুপ্তং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥

অনুসরণ করিতে চান্ তাঁহারা শাস্ত্রের বাক্যার্থমাত্র গ্রহণ করিলে অনেক স্থানে অপরাধী হইবেন, হিন্দুধর্ম্ম যে স্থিতিস্থাপক ধর্ম্ম, ইহা তাঁহাদের সকলেরই মনে রাখিয়া কার্য্য করা উচিত।

গল্প আছে যে, শঙ্করাচার্য্য এক দিন কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট পথভ্রষ্ট যবনান্ন ভক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার এক জন শিষ্যও তাহা ভক্ষণ করিতে বসিয়া গেল। শঙ্করাচার্য্য তাহাকে তখন কিছু না বলিয়া জলপানার্থ নিকটবর্ত্তী একজন কাঁসারীর গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। শিষ্যও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রবিষ্ট হইল। কাঁসারীরা পিত্তল গলাইতেছিল, নিকটে একটা হাতা পড়িয়াছিল, শঙ্করাচার্য্য তাড়াতাড়ি হাতা লইয়া সেই জ্বলন্ত পিত্তলের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন এবং ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিয়া কহিলেন, "অহো তৃপ্তিঃ।" পরে তিনি সেই পানপাত্র শিষ্যের হস্তে প্রদান করিয়া, তাহাকে সেই জ্বলন্ত পিত্তল পান করিতে সঙ্কেত করিলে,সে ভয়বিহ্বল ও ইতিকর্ত্তব্যতাবিমূঢ় হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। শঙ্করাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন যে, যে হেতু তুমি তত্ত্বজ্ঞান ভান করিয়া আমার সহিত যবনান্ন ভক্ষণ করিয়াছিলে, অথচ এক্ষণে আমার সহিত জ্বলন্ত পিত্তল পান করিতে সাহস করিলে না, অতএব তুমি পতিত হও। গল্প এই যে, তদবধি আমাদের দেশে "যোগী" জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই গল্পের সত্যতা যাহাই হউক, ইহার মর্ম্ম এই যে, তুমি সরল ভাবে যে কর্ম্ম করিবে, হিন্দুধর্ম্ম তাহাতে তোমাকে পতিত করিতে ইচ্ছা

অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অনিষ্ঠুরতা, সর্ব্বভূতে দয়া, লোভহীনতা, মৃদুতা, লজ্জা, অচঞ্চলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ, নিরভিমানিতা, এই সকল, হে ভারত! দৈবী সম্পদ।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥
যদৃচ্ছয়াচোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥
অথচেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥

ভগবদ্গীতা; ২ অধ্যায়, ৩১, ৩২, ও ৩৩ শ্লোক।

আপনার ধর্ম্ম বুঝিয়াও তোমার এরূপ কম্পিত হওয়া উচিত নহে। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ অপেক্ষা অন্য শ্রেয়ঃ আর নাই। যদৃচ্ছালব্ধ স্বর্গ দ্বার অবারিত রহিয়াছে। হে পার্থ।

করিবে না। আমাদের একজন বন্ধু কহেন যে, আমি এক দিন বাল্যকালে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, বাবা! এই যে সন্ন্যাসীটি উলঙ্গভাবে রাস্তার ধারে বসিয়া আছে, বড় বড় কুলকামিনীরাও উহাকে প্রণাম করিয়া থাকে, আর এই যে বাবুটি পরিচ্ছন্নবেশে ও অলঙ্কৃতকেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, উনি এক দিন অমুক বড়লোকের জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন, এইজন্য পল্লীশুদ্ধ লোক একত্র হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিল। পিতা কহিলেন যে, সন্ন্যাসী সরলভাবে উলঙ্গ হয়, এই জন্যই তাহার আদর, এ বাবুটি অসরলভাবে বেশভূষা করে, সেইজন্য তিরস্কৃত হইয়াছিল।

ফলতঃ হিন্দুশাস্ত্রে সাত্বিকতার আদর আছে, তামসিকতার আদর নাই। সাত্বিকতার নামান্তর সরলতা ভিন্ন আর কিছু নহে। আমরা দেখিয়াছি,এক জন পরমহংস একটা মড়ার মাথার খুলিতে দই ও মুড়কি ভিজাইয়া ফলার করিতেছে, এবং চারিদিকে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতির লোক দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছে। অথচ কাহারও জাতি যাইতেছে না। এক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, প্রয়োজনবশতঃ সরলভাবে বিলাত যাত্রা করিলে শাস্ত্রানুসারে আমাদিগের জাতি যাইতে পারে কি না? আমাদিগের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, যদি বিলাত যাওয়া আমাদের নিত্য আচার হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাদের জাতি যায় কি না?

উল্লিখিত উভয় প্রশ্নের উত্তরই আমরা নিজে দিতেছি। আমাদের উত্তর এই যে, উল্লিখিত কোন কারণেই জাতি যাইতে পারে না।

যাহা নিত্য প্রয়োজন হয়, তাহাই আচার পড়ে এবং যাহা আচার, তাহাই ধর্ম্ম। যদি জন্মভূমির সম্পাদক কহেন যে, তাহা কখনই ধর্ম্ম নয়, তবে আমরা স্পষ্ট করিয়া কহিব যে, জন্মভূমির সম্পাদক যুক্তি ও আচরণের বিরুদ্ধে কথা বলিতেছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, জন্মভূমির সম্পাদক বর্ত্তমানে যে আচার অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সে আচার অবলম্বন করিয়া চলিলে, পতিত হইতে হইত কি না? অথবা, আমরা এক একটি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, জন্মভূমির সম্পাদক তাহার প্রতিবাদ করুন্।

১ম প্রশ্ন। জন্মভূমির সম্পাদক ভূর্জপত্রে লেখেন, না ইংরাজের প্রস্তুত কাগজে লিখিয়া থাকেন?

৩য় প্রশ্ন। তাম্রপাত্রে জলপান করেন্, না কাচপাত্রে করিয়া থাকেন ?

৪র্থ প্রশ্ন। ইংরাজের হস্ত স্পর্শ করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করেন্, না ইংরাজের ছায়া পরিহার করিয়া থাকেন ?

৫ম প্রশ্ন। ইংরাজী ভাষায় কথা কহিবার সুবিধা পাইলে আত্মাকে কৃতার্থ বোধ করেন্, না বাঙ্গালাভাষায় কথা কহিয়া সন্তুষ্ট থাকেন ? ছেলেকে ইংরাজী পড়ান্, না টোলে দেন্।

৬ষ্ঠ প্রশ্ন। পেণ্টুলেন পরেন্, না নামাবলী ব্যবহার করেন ?

আমরা আর অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিব না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমানের ন্যায় আচরণ করিলে আমাদিগকে পতিত হইতে হইত। এখন অধিকাংশ খাদ্য ইংরাজী, অধিকাংশ ঔষধ ইংরাজী, অধিকাংশ পরিধান ইংরাজী, অধিকংশ পানীয় জল ইংরাজী, অতএব এ সময়ে সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করা সঙ্গত হয় না।

একটি গল্প আছে যে, সিরাজুদ্দৌলা একদিন কয়েকজন বাঙ্গালী সভাসদকে ডাকিয়া কহিলেন, "মহরম উপস্থিত, তোমাদিগকে 'হাসেন হোসেন' বলিয়া বুক্ চাপড়াইতে হইবে, নতুবা প্রাণদণ্ড করিব।" তখন সভাসঁদদিগের মধ্যে বিষম সমস্যা উপস্থিত হইল, অনন্তর স্থির হইল যে, বুক্ চাপ্ড়াইব, অথচ "হাসেন হোসেন" বলিব না। এইরূপ স্থির হইলে বুক্চাপ্ড়ান হইতে লাগিল, এবং "হাসেন হোসেন" না বলিয়া, তৎপরিবর্ত্তে "যখন যেমন তখন তেমন" বলা হইতে লাগিল। বাঙ্গালীরা বুঝিল যে, "যখন যেমন তখন তেমন" বলিয়া আক্ষেপ করা হইতেছে, মুসলমানেরা বুঝিল যে, "হাসেন হোসেন" বলিতেছে। আমাদের জন্মভূমি পত্রিকা বুক্ চাপ্ড়াইতে ছাড়েন না, কিন্তু "হাসেন হোসেন" বলিতে কুণ্ঠিত হন্। শুধু জন্মভূমির দোষ নহে, আমাদের দেশের হাওয়াই এইরূপ হইয়াছে। আমরা করিতেছি একরূপ, বলিতেছি আর এক রূপ। কার্য্য কালে ইংরাজের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতেছি, কিন্তু মুখে বলিতেছি, "হিন্দু ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম, যাহা আমাদের আছে, তাহা কাহারও নাই।" এই ধুয়া ধরিয়া দেশের মুরুব্বী বলিয়া ভান করা এক সম্প্রদায় লোকের কু অভ্যাস হইয়াছে। জন্মভূমি সম্প্রদায়ের সেইরূপ কু অভ্যাস বিষম প্রবল বলিয়া বোধ হয়।

জন্মভূমির প্রতি আমাদের ভাষা কর্কশ হইতেছে, কিন্তু কর্কশ হইলেও

জন্মভূমি হিন্দু শাস্ত্রে অন্যায় গঠন আরোপ করিতেছেন। হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় স্থিতিস্থাপক, উহা কখনই সমুদ্রযাত্রার বিরোধী নহে। উহার মতে "দশ জনে মিলিয়া যখন যেরূপ আচরণ করিবে, তখন তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে।" তুমি যে ধর্ম্ম ইচ্ছা গ্রহণ কর, পতিত হইবে না, সংস্কার গ্রহণ করিলেই পতিত হইবে, সমাজ ছাড়িলেই পতিত হইবে, ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের অর্থ। আপনার ঘরে বসিয়া যীশুই ভজ, আর হরি নামই কর, কেহই তোমাকে জাতিচ্যুত করিবে না। তবে জর্ডানের জল গ্রহণ পূর্ব্বক সংস্কার লইয়া সমাজকে তাচ্ছিল্য করিলে সমাজও তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। দেখ, উইল্‌সন্ হোটেলের রুটি আজি কালি অনেক হিন্দু পরিবারে চলে। দেখ, ডাক্তারের অনুরোধে প্রকাশ্যে মুরগীর ঝোল রন্ধই করিয়া অতি বড় হিন্দুর ঘরের অসূর্য্যম্পশ্যা রোগিনীকেও খাওয়ান হইতেছে। কেহ প্রতিবাদ করিতেছে কি? পাগলকে ব্যাঙ, যক্ষ্মা রোগীকে কুকুরের মাংস, এবং রোগবিশেষে গো শূকরের ত কথাই নাই—অন্যান্য মাংসও খাওয়ান হইয়া থাকে, অথচ হিন্দুশাস্ত্র তাহার বিরোধ করে না। মনু বলেন যে, চাল্ ডাল্ ঘি প্রভৃতি শূদ্রের নিকট গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণের জাতি যায় না, এবং চাকর, রাঁধুনী, গোয়ালা প্রভৃতির সহিত কথা কহিলে অন্তঃপুরিকাদিগের অপরাধ হয় না—অর্থাৎ যাহা নিতান্ত না হইলে চলে না, তাহা করিতেই হইবে। শাস্ত্রে কহে যে, ম্লেচ্ছ গুরুর নিকটেও পাঠ অভ্যাস করা যাইতে পারে, চণ্ডাল মিত্রের গৃহেও আতিথ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে, তবে আর শাস্ত্রে বারণ করে কি?

যদি এ কথা স্থির হয় যে, বিলাতে না গেলে শাস্ত্রাধ্যয়ন সম্পূর্ণ হয় না, তবে অবশ্যই বিলাত যাইতে হইবে। আর যদি ইহা স্থির হয় যে, বিলাতে না গেলেও শাস্ত্রাধ্যয়ন সম্পূর্ণ হইতে পারে, তবে বিলাতে যাওয়া অনাবশ্যক বটে। যদি বল, এককালে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল, তবে তাহা আমরা অসম্ভব বলি না। যে কালে দেশের রাজা হিন্দু ছিলেন, এবং হিন্দু ভিন্ন অপর জাতি বর্ব্বর ছিল, সেকালে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ থাকা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু যেকালে দেশের রাজা ইংরাজ, এবং ইংরাজ আমাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত, সেকালে ইংরাজের দেশে গমন করা নিষিদ্ধ, ইহা বলিলে, নিতান্তই প্রলাপ বলা হয়। মনু কহেন যে, রাজা যে জাতিই হউন, তিনি ঈশ্বর, তাঁহার আজ্ঞা পালন করা উচিত, এরূপ স্থলে যদি ইংরাজ আমাদিগকে এরূপ আজ্ঞা করেন যে, আমাদিগকে বিলাতে গিয়া পাঠাভ্যাস করিতে হইবে, তবে তাহার বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া কি পাপ নহে? প্রভুর বেতন গ্রহণ করিব, কিন্তু প্রভুর গৃহে অন্ন গ্রহণ করিব না, প্রভুর পাল্কী বহন করিব, কিন্তু প্রভুর স্পৃষ্ট জল খাইব না, এরূপ চিন্তাকে মনোমধ্যে স্থান দিলে ধর্ম্মাভিমান চরিতার্থ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এ সকল চিন্তা কাপুরুষোচিত, এ সকল চিন্তা কখনই শাস্ত্রসঙ্গত নহে। যদি পাল্কীই বহিতে হইল, তবে জলখাওয়ার বাকী রহিল

কি? দেখ, সেদিন বঙ্গবাসী সম্প্রদায় রাজদ্বারে মুক্তিলাভের জন্য অনায়াসে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন যে, আমরা "কন্‌সেণ্ট বিল" সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা প্রকৃতই অন্যায়, ও আমরা দণ্ডার্হ বটে। অথচ বঙ্গবাসী সম্প্রদায় তাহাতে লজ্জা বোধ করিলেন না। আমাদের দেশের লোক প্রাণের দায়ে না বলিতে পারে, না করিতে পারে,এরূপ কথা বা কর্ম্ম নাই। বিলাতে যাওয়া দূরে থাকুক্, যদি ইংরাজ বলে যে,তোমাকে দশ রাত্রি সপরিবারে আঁস্তাকুড়ে বসিয়া থাকিতে হইবে, তবে তাহাই থাকিতে হয়। ফলতঃ আমাদিগের জাতি ও বল ইংরাজের আয়ত্ত ; কারণ, ইংরাজ আমাদের রাজা,কেবল রাজা নহে, ইংরাজ আমাদিগের শিক্ষক ও গুরু, অতএব ইংরাজের দেশে গিয়া পাঠাভ্যাস করা কিরূপে শাস্ত্র বা রাজনীতির বিরুদ্ধ হইবে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না।

আমরা কহিয়াছি, আমাদের শাস্ত্র স্থিতিস্থাপক, তুমি সরলভাবে যে দিকে যাইতে চাহিবে, শাস্ত্রও সেইদিকে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে। কারণ শাস্ত্র জানে, এ জগতে সকলই অলীক, লোকাচার প্রয়োজনের অনুরূপ মাত্র। সুতরাং শাস্ত্র দুই দিকেই যায়। বিধবাবিবাহ 'বিধীয়তে' বল, তাহাই পাইবে ; আবার 'অবিধীয়তে' বল, তাহাই পাইবে। সমুদ্রযাত্রা 'বিধীয়তে' বল, তাহাই পাইবে ; আবার 'অবিধীয়তে' বল, তাহাই পাইবে। যদি বল যে তাহা নয়, তবে দুই দিকেই শাস্ত্র হইতে মতবাদ ও প্রমাণপ্রয়োগ উদ্ধৃত হয় কেন? আবার দেখুন, ইচ্ছা করিলে একই শ্লোক বিপরীতরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যথা—

"অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্ যস্য বেশ্মনি।
স বৈ জ্ঞাত্বা তু কালেন কুর্য্যাৎ তত্র বিশোধনম্।"

চলিত জৈষ্ঠ্যের জন্মভূমি, ৩৬৩ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ অন্ত্যজাতি অজ্ঞাত হইয়া যাহার বাটীতে বাস করিবে, সে তাহা জানিতে পারিলে, সময়ে প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। আবার এরূপও অর্থ হয়, "ন কুর্য্যাৎ তত্র বিশোধনম্" অর্থাৎ অন্ত্যজাতি অজ্ঞাত হইয়া যাহার বাটীতে বাস করিবে, সে তাহা কালে জানিতে পারিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না! আশ্চর্য্য দেখুন যে, কিঞ্চিৎ কষ্ট কল্পনা করিলে সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে "প্রাজ্ঞ" শব্দের অর্থ প্র + অজ্ঞ অর্থাৎ অতি মূর্খ এইরূপ হয়, আবার সাধারণতঃ অতি পণ্ডিত অর্থ হইয়া থাকে। আমাদিগের একজন পণ্ডিত বন্ধু ভরসা করিয়া বলিয়াছেন, জন্মভূমি-সম্পাদক সমুদ্রযাত্রার বিরুদ্ধে যে কোন বচন উদ্ধার করিবেন, তিনি তাহাই সমুদ্রযাত্রার অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়া দিবেন। ফলতঃ, আমাদিগের শাস্ত্রের গঠন, মর্ম্ম ও ব্যাকরণ সমস্তই স্থিতিস্থাপক। যাহা আচার ও প্রয়োজন,অথচ যাহাতে অসরলতা নাই, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম।

৩১এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯ সাল।

শ্রীশ্যামলাল মিত্র।
হাইকোর্টের উকিল,

মধুচ্ছন্দার সোমযাগ।

ইতিপূর্ব্বে সাহিত্যের কয়েক সংখ্যায় বেদের "সোম" কি সামগ্রী, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। "সোম" এক প্রকার লতার নাম ছিল, এবং সেই লতার রসের নামও ছিল। যজ্ঞে সেই লতার রস দেবতাদিগকে আহুতিস্বরূপ প্রদত্ত হইত, এবং ঋত্বিকগণ ও যজমান তাহা পান করিতেন। এই রস পানের পক্ষে আদৌ উপাদেয় নহে,—বরঞ্চ উহা অতি বিস্বাদ। উহা পান করিলে মত্ততা জন্মে। কাহারও কাহারও এরূপ সংস্কার আছে যে, মত্ততা উৎপাদনের জন্যই সোমরস পীত হইত; উহা এক প্রকার অসভ্য সময়ের সুরা মাত্র। যেমন আধুনিক বন্যজাতীয় লোক আপনাদের দেবতাদিগকে সুরা প্রদান করে, তেমনি সেকালের ব্রাহ্মণেরা স্বকীয় দেবতাগণকে সোমরস প্রদান করিতেন। আমার বিবেচনায়, এই সংস্কারটি নিতান্ত ভ্রান্ত। যজ্ঞে ভিন্ন অন্য কুত্রাপি সোমরসপানের উদাহরণ দেখা যায় না। সুরার যেমন সচরাচর ব্যবহার হয়—সোমরস যে তদ্রূপ মাদকতার জন্য কস্মিনকালে ব্যবহৃত হইত, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, সোমরসের মাদকতাশক্তির প্রতীকারের জন্য, ঋত্বিকেরা উহা দধি মিশ্রিত করিয়া পান করিতেন। ঐরূপে পীত হইলে মত্ততা জন্মিত না। ইহাতে প্রতীয়মান হইবে—ব্রাহ্মণেরা মত্ততা কামনা করিয়া সোমরস পান করিতেন না।

বস্তুতঃ সোমরসপান সর্ব্বাংশে কেবল যজ্ঞকার্য্যের অঙ্গমাত্র ছিল; লৌকিক কোন কার্য্যে সোমের ব্যবহার ছিল না। বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়া, তাহাতে "সোম" পান করিতে পারিলে স্বর্গে যাওয়া যায়—ইহা সাধারণ লোকের তৎকালে বিশ্বাস ছিল। এই বিশ্বাসের মূল কি?

এই প্রশ্নের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া পাঠকগণকে দেখাইয়াছি যে, বৈদিক ঋষিদের মধ্যে "মধুবিদ্যা" নামে একটি গোপনীয় বিদ্যা ছিল। সাধারণ লোকে তাহার রহস্য অবগত ছিল না—কিন্তু জ্ঞানী ঋষিগণের মধ্যে এই বিদ্যার প্রচার ছিল। "মধু" শব্দের অর্থ সোম, এবং মধুবিদ্যার প্রকৃত অর্থ সোমরহস্য। যখন প্রগাথ ঋষি বলিয়াছিলেন, "সমুদয় দেবতাগণ ও মনুষ্যগণ যে স্বাদু অন্নকে 'মধু' এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তদভিমুখে গমন করেন, আমি

জনসমাজে অধীতশাস্ত্র ও জ্ঞানী বলিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াও যেন সেই অত্যন্তপূজিত অন্নের আস্বাদন করিতে পারি।" (ঋগ্বেদ ৮।৪৮।১) তখন কি বিবেচনা করিতে হইবে যে, তিনি কোন লতার রসকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিলেন? প্রগাথ ঋষিকে, তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা, ইনি অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, ইনি বড় জ্ঞানী বলিয়া ভক্তি করিত; কিন্তু তাহাতে ঋষির হৃদয়ের তৃপ্তিলাভ হয় নাই। তিনি সংসারের খ্যাতি প্রতিপত্তিকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া, এক পার্শ্বে ঠেলিয়া, ঐশ্বর্য্যসুলভ পানভোজন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, অত্যন্তপূজিত কোন এক অন্নের আস্বাদনের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। পাঠক কি মনে করিতে পারেন যে, সে অন্ন এক প্রকার অতিবিস্বাদ লতার রস ভিন্ন আর কিছু নহে? ইয়ুরোপীয় বেদবিৎ পণ্ডিতাগ্রগণ্য মার্টিন হোগ সাহেব, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণদের দ্বারা সোমরস প্রস্তুত করাইয়া পান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"It is a nasty drink." এক্ষণে পাঠক কি বিবেচনা করিবেন যে, পণ্ডিত ও জ্ঞানী বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইয়া, কেবল এই nasty drinkএর জন্য আমাদের প্রগাথের মন পাগল হইয়াছিল? যে সোমকে লক্ষ্য করিয়া ঋষি পরক্ষণেই বলিতেছেন,—"তুমি আমাকে মথিত অগ্নির ন্যায় সম্যকরূপে দীপ্ত কর—আমাকে প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞানসম্পন্ন কর, আর আমাদিগকে স্বর্গধামের অধিকারী কর। হে সোম! ত্বদীয় আনন্দ হৃদয়ে অনুভব করিয়া, আপনাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী বলিয়া মনে করি।" ঋগ্বেদ (৮।৪৮।৬) সে সোম কি অতি বিস্বাদ একপ্রকার লতার রস ভিন্ন আর কিছুই নহে? শাস্ত্রাধ্যয়নজনিত জ্ঞানের সহিত ঋষি "সোমের" তুলনা করিতেছেন। জ্ঞানই মনুষ্যাত্মার উৎকৃষ্ট পানভোজন, শ্রেষ্ঠ তৃপ্তিসাধন। শাস্ত্রাধ্যয়নজনিত জ্ঞান যেমন আত্মার অন্নপানস্বরূপ, "সোম" তাদৃশ এক প্রকার অন্ন। প্রগাথ ঋষি সেই অন্নের আস্বাদনের জন্যই লালায়িত। এই ত গেল প্রগাথের কথা। ঋষি বামদেব প্রগাথের ন্যায় সৌভাগ্যশালী ছিলেন না। উৎকৃষ্ট পানভোজনের কথা দূরে থাকুক, তিনি উদরান্নের অভাবে কুক্কুরের অন্ত্র পাক করিয়া খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার সাংসারিক ক্লেশের ইয়ত্তা ছিল না। তিনি অশেষদুঃখসহকারে বলিয়া গিয়াছেন,—"অপশ্যং জায়াম্ অমহীয়মানাং" অর্থাৎ আমি প্রাণসমা ভার্য্যাকে জনসমাজে অর্থকৃচ্ছ্রবশতঃ লাঘব প্রাপ্ত হইতে দেখিলাম। যে বামদেব-

প্রবৃত্ত হয়েন এবং সহসা দিব্যজ্ঞানের উদয় হইলে, সকল ক্লেশ ভুলিয়া গিয়া অপার আনন্দসহকারে বলিয়া উঠেন,—"অধামে শ্বেণো 'মধু' আজভার" সে মধু বা সোম কি লতার রস? না স্বর্গ হইতে পরমেশ্বর লতার রস আনয়ন করিয়া পরম পদার্থ বলিয়া মনুষ্যকে দান করেন? কুক্কুরের অন্ত্রভক্ষণের পর এক লতার রসপানে (অতি অখাদ্যমধ্যে পরিগণিত এক লতার রসপানে) বামদেব কি ক্ষুধা তৃষ্ণার ক্লেশ ভুলিতে পারিয়াছিলেন?

বুদ্ধিমান পাঠক এই সকল প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিতে চেষ্টা করিবেন। লেখক বিশেষ অনুধাবনের পর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, "মধু-বিদ্যা"-বিশারদ বামদেব, প্রগাথ, গোতমাদি ঋষিরা দুই প্রকার সোমের বিষয় অবগত ছিলেন। একটি আধ্যাত্মিক, যাহা তাঁহারা স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন—"ব্রাহ্মণেরা যাহা প্রকৃত সোম বলিয়া জানেন, তাহা কেহ পান করিতে পায় না" (ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৩) আর দ্বিতীয়টি সেই আধ্যাত্মিক সোমের বাহ্য চিহ্নস্বরূপ। ইহাই লতাবিশেষের রস। প্রগাথ যে অত্যন্তপূজিত "মধু" নামক স্বাদু অন্নের কথা বলেন, তাহা আত্মার অন্ন; তাহাই আধ্যাত্মিক "সোম।" বামদেব যে "মধু" নামক অন্নের আস্বাদন করিতে পাইয়া, উদরান্নের ক্লেশ ভুলিতে পারিয়াছিলেন—তাহাও সেই মনুষ্যাত্মার অন্নস্বরূপ আধ্যাত্মিক 'সোম' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, উভয়বিধ সোমের সদৃশ্য কি? তাহার উত্তর এই যে, যেমন মাদক সোম পান করিলে দেহের মত্ততা—ইন্দ্রিয়ের সজীবতা জন্মে,—যেমন, ক্ষীণ দেহেও ক্ষণকালের জন্য শক্তিস্রোত আসিয়া পড়ে—তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে, নির্জীব হৃদয় সজীব হয়, যেন মৃত্যু ঘুচিয়া প্রাণের প্রবাহ আসিয়া দেহকন্দরে প্রবিষ্ট হইল বলিয়া বোধ হয়, আত্মা উল্লাসে আনন্দে মাতিয়া উঠে। ইহাই বাহ্য সোমের সহিত আধ্যাত্মিক সোমের সাদৃশ্য। অধিকন্তু, বাহ্য সোম যেমন কল্পিত দেবখাদ্য অন্ন, তেমনি আধ্যাত্মিক সোম "মরণশীল মনুষ্যের অমৃত" অন্নস্বরূপ। মনুষ্যাত্মা সেই অন্ন ভোজন করিয়া ক্রমশঃ দেব-জন্মে অধিকারী হয়। ইহাই বৈদিক মত। ইহাই সোমযাগের রহস্য। এই আধ্যাত্মিক সোম ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবদ্‌ভক্তি ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। পাঠক এই ব্যাখ্যা লেখকের স্বকপোলকল্পিত বলিয়া মনে করিবেন না। যদি বৈদিক যজ্ঞশাস্ত্রের অনুশীলন করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন—ইহাই প্রাচীন মত।

সমগ্র ঋগ্বেদকে "সোম"-বেদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঋগ্বেদের যেস্থান উদ্‌ঘাটন করিবে, সেই স্থানেই সোমযাগের, সোমপানের বা সোমঘটিত অন্য কোন কথার উল্লেখ দেখিতে পাইবে। ঋগ্বেদ যে দশ ভাগে বিভক্ত—তাহার একটি ভাগ (নবম মণ্ডল) আদ্যন্ত কেবল সোমের স্তুতি। জ্যোতিষ্টোম, অগ্নিষ্টোম আদি যে প্রাচীন সোমযাগ এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল, ঋগ্বেদের মন্ত্র সকল সেই যাগেরই অঙ্গ। দেশীয় যে কোন বেদবিৎ পণ্ডিতের কাছেই যাও না, তিনি বলিবেন, "ঋগ্বেদ" কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। আর যদি কর্ম্মকাণ্ড কি জানিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিবে যে, অগ্নিষ্টোমনামক সোমযাগই, দর্শপূর্ণমাস ও চাতুর্ম্মাস্য ইষ্টি ব্যতিরেকে—অন্যান্য প্রায় সকল প্রকার শ্রৌত্য ক্রিয়ারই প্রকৃতিস্বরূপ। অতএব, যদি পাঠকের বেদার্থ বুঝিবার স্পৃহা থাকে—তাঁহাকে সোম ও সোমযাগের বিষয় কিঞ্চিৎ অবগত হইতে হইবে। ঋগ্বেদে সোমযাগের কিরূপ চিত্র, এক্ষণে পাঠককে তাহাই দেখাইবার যত্ন করিব।

ঋগ্বেদের প্রথমেই মধুচ্ছন্দা নামক এক ঋষির কয়েকটি মন্ত্র আছে। সেই মন্ত্রগুলির আদ্যন্ত আলোচনা করিলে, মধুচ্ছন্দার সোমযাগ কিরূপ ছিল, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

প্রথমতঃ কৌতূহল জন্মিতে পারে—মধুচ্ছন্দা কে ?—তিনি কোন দেশে বাস করিতেন—কোন সময়ের লোক ছিলেন—তাঁহার পিতা মাতার নাম কি ? তাঁহাকে মধুচ্ছন্দা বলিত কেন ? তিনি কি অশিক্ষিত লোক ছিলেন, না, বহুবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের দ্বারা বিদ্যালয়ে রীতিমত বিদ্যাভ্যাস করিয়া সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন ? কিরূপে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত ? তিনি কি হলচালনা করিতেন, না বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন, না সমর-ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় ছিলেন, অথবা ব্যবসায়ী-যাজক ছিলেন ? মন্ত্রকৃৎ মধুচ্ছন্দা ঋষির বিষয়ে এই সকল কথা জানিতে সহজেই কৌতূহল জন্মে।

আর্য্য প্রক্রিয়া অনুসারে মধুচ্ছন্দা-শব্দের এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে, "যাঁহার ইচ্ছা (ছন্দ) মধুময়", যিনি সকলের শুভাকাঙ্ক্ষা করেন, কাহারও অশুভ কামনা করেন না। অপর অর্থ এইরূপ হইতে পারে,—"যাঁহার পদ্য (ছন্দস্) মধুর।" তৃতীয় এক অনুমান,—"মধুকে (সোম) লক্ষ্য করিয়া যাঁহার ছন্দস্ বা মন্ত্র সকল রচিত হইয়াছে।" যদি এই শেষ দুইএর কোন অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে "মধুচ্ছন্দা" এইটি নাম না হইয়া উপাধি হওয়াই

সম্ভব। কেন না, তিনি পদ্য বা মন্ত্র রচনার পূর্ব্বে ঐরূপ নাম প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবে না। তবে হইতে পারে, অন্যান্য লোকও মধুর ছন্দে পদ্য রচনা করিয়া, বা মধুবিষয়ক মন্ত্র রচনা করিয়া মধুচ্ছন্দা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মধুচ্ছন্দা ক্রমে একটি সাধারণ নাম হইয়াছিল, পরে পিতা মাতা সাধ করিয়া ভাবী ঋষির নাম মধুচ্ছন্দা রাখিয়াছিলেন। আর যদি প্রথম অর্থটি ঠিক হয়, তাহা হইলে পিতা মাতা "আমাদের এই অপত্যটি যেন সর্ব্ব জীবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়েন," যেন এইরূপ কামনা করিয়া সন্তানের নামকরণ করিয়াছিলেন।

ফলতঃ, বেদশাস্ত্রে মধুচ্ছন্দা বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়া বিখ্যাত। বিশ্বামিত্র অর্থাৎ বিশ্বমিত্র।* সকল জীবে যাঁহার মৈত্রভাব, তিনি বিশ্বমিত্র। বিশ্বমিত্র বা বিশ্বামিত্রের পিতার নাম গাথী, তিনি পুরাণে গাধি বলিয়া বিখ্যাত। গাথীর একজন পূর্ব্বপুরুষের নাম কুশিক। কুশিক একজন ভোজবংশীয় প্রসিদ্ধ অধিনায়ক ছিলেন। তিনি আপনার পৌরুষে প্রাধান্য লাভ করিয়া, একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার বংশধর যোদ্ধারা পরে "কুশিকাসঃ" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র স্বরচিত মন্ত্রে আপনার আত্মীয় স্বজনকে "কুশিকাসঃ" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কুশিক যেমন যোদ্ধা ছিলেন, তেমনি একজন মন্ত্রকৃৎ ঋষিও ছিলেন। তাঁহার রচিত মন্ত্রের মধ্যে কেবল একটি মাত্র সূক্ত ঋগ্বেদসংহিতায় সংরক্ষিত হইয়াছে। কেহ কেহ আবার সন্দেহ করিয়া, ঐ একটি মাত্র সূক্তকে বিশ্বামিত্রেরই রচিত বলিয়া অনুমান করেন।

বিশ্বামিত্রের পিতা গাথী একজন প্রসিদ্ধ মন্ত্রকৃৎ ঋষি ছিলেন। তাঁহার নামের ভঙ্গীতে বোধ হয়, যেন গাথারচনায় কুশল বলিয়া তাঁহার "গাথী" এই নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। তৎপ্রণীত অনেকগুলি সূক্ত বেদে সংরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তৎপুত্র বিশ্বামিত্র আপনার প্রতিভায় পূর্ব্বপুরুষগণকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্তই বিশ্বামিত্রের রচিত। তাঁহার মন্ত্র সকল অতি গম্ভীরভাবে পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল স্বর্গীয় আলোকে :বিভাসিত। তাঁহার আত্মীয় পরিবারবর্গ রাজ্যশাসন আদি

---

* বেদে পরমেশ্বরের এক নাম "মিত্র"। কেন না, পরমেশ্বর জীবের পরম মিত্র। যাঁহারা পরমেশ্বরকে এই ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ, তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। মনু বলেন, "মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে।"

ক্ষত্রোচিত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তিনি আপন জীবন ব্রহ্মচর্য্যে নিয়োজিত করিয়া সমকালীন ব্রাহ্মণদের অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সাহাবাদ জেলায় ভবুয়া মহকুমায় তাঁহার আশ্রম ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। ঋগ্বেদ পাঠ করিলে, এই কিম্বদন্তী অমূলক বলিয়া বোধ না হইয়া বরং তাহার পোষক প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি যে বীরপুরুষগণের মধ্যে বাস করিতেন, যাঁহাদের যাজন করাইতেন, তাঁহাদিগকে "ইমে ভোজাঃ" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিম্বদন্তী যে স্থানে তাঁহার আশ্রমের কথা বলে—তাহা একালেও "ভোজপুর" নামে বিখ্যাত। ইংরাজ সৈন্যের মধ্যে আজিও অনেক "ভোজ-পুরীয়া" দেখিতে পাইবে। তাঁহার লেখার ভঙ্গীতে বোধ হয়, বিশ্বামিত্র একজন "ভোজপুরীয়া" ছিলেন। তিনি একস্থানে আবদার করিয়া ইন্দ্রকে বলিতেছেন—

"কিং তে কৃণ্বংতি কীকটেষু গাবঃ"

"প্রভু! এই কীকট দেশের গো সকল তোমার কোন উপকারে আইসে?"

"না শিরং দুহ্রে, ন তপন্তি ঘর্ম্মং"

"দেখ, ইহারা না তোমার 'আশির' দোহন করে—না তোমার 'ঘর্ম্ম'কে উত্তপ্ত করে।"*

"আনোভর প্রমগন্দস্য বেদঃ"

"অতএব তুমি 'প্রমগন্দ' রাজার ধন আমাদিগকে দাও।"

"নৈবাশাখং বন্দর" ইত্যাদি

"আর (প্রমগন্দের অধিষ্ঠিত) 'নৈবাশাখ'-নামক জনপদকে আমাদের বশে আনয়ন কর।"†

---

* সোমরসের মাদকতানিবারণের জন্য তাহার সহিত দধি মিশ্রিত করা হইত। সেই দধির নাম "আশির"। আর সোমযাগে এক প্রকার মৃণ্ময় কলসের ন্যায় পাত্র ব্যবহৃত হইত, তাহার নাম "ঘর্ম্ম"। ইহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে দুগ্ধ নিক্ষিপ্ত হইত। উহা সোম-যাজীরা পান করিতেন। মূলের তাৎপর্য্য এই যে, কীকটভূমির গাভীগণ যজ্ঞে কাযে আসিবার নহে। তাহাদের দুগ্ধে আশির উৎপাদন করে না,এবং তাহা ঘর্ম্মেও নিক্ষিপ্ত হয় না। তবে কেন ইন্দ্র তাহা-দিগকে রক্ষা করেন? তবে কেন ভোজেরা তাহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হইতেছে না?

† এ স্থলে পাঠক না অনুমান করেন যে, বিশ্বামিত্র নিরীহ প্রতিবেশীর ধনলুণ্ঠনকামনায় ইন্দ্রের নিকট ঐরূপ প্রার্থনা করিতেছেন। কীকটবাসী প্রমগন্দ রাজার অনুচর দস্যুদলের আক্রমণ ও উৎপীড়নের জ্বালাতেই বোধ হয় তৎকালীন "ভোজ"-বংশীয়েরা তাহাদিগকে দমন

কীকটভূমির অন্য নাম "মগন্দ" বা মগধ রাজ্য। ইহাতে মগধের সীমান্তেই বিশ্বামিত্রের বাস ছিল, বোধ হইতেছে। অন্যথা, মগধের দস্যুগণের সহিত বিশ্বামিত্রের যজমানগণের বিরোধের কারণ কি? মগধের পশ্চিম পার্শ্বেই ভোজপুর। ইহাতেও বিশ্বামিত্রকে ভোজপুরীয়া বলিয়া অনুমান হয়।

যদি এই অনুমান অপ্রকৃত না হয়, তাহা হইলে বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দাও বর্ত্তমান বিহারপ্রদেশের কোন এক স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; সম্ভবতঃ, পিতার ন্যায় তিনিও ভোজপুরীয়া ছিলেন। পাশ্চাত্যবিদ্যালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয়, পাশ্চাত্য মতের অনুসরণ করিয়া, এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, সমগ্র ঋগ্বেদ, সুতরাং মধুচ্ছন্দা-কৃত ঋগ্বেদাংশও পঞ্জাবদেশে বিরচিত হইয়াছিল। লেখক এই সিদ্ধান্ত প্রামাণিক বলিয়া বিবেচনা করিতে অসমর্থ।

(১) প্রথমতঃ, এই সিদ্ধান্ত নিরবচ্ছিন্ন কল্পনাবিজৃম্ভিত।

(২) দ্বিতীয়তঃ, এই সিদ্ধান্ত সমূলক হইলে—আর্য্যগণের এতদ্দেশে উপনিবেশস্থাপনের অল্পকাল পরেই, "ঋক্" সকল রচিত হইয়াছিল, মনে করিতে হইবে। এরূপ স্থলে, আর্য্যগণ যে দেশ হইতে এ দেশে আইসেন, তাহার স্পষ্ট নামোল্লেখ—অন্ততঃ কোন না কোন স্মৃতিচিহ্ন, বহুল পরিমাণে বেদে থাকিত। কিন্তু তাহার চিহ্নমাত্র বেদে নাই। আর্য্যেরা যে কোন দেশে কখনও ছিলেন—তাহার স্মৃতিমাত্র ঋগ্বেদে নাই।

(৩) ঋগ্বেদে যে অগস্ত্য ঋষির সূক্ত পাওয়া যায়, তিনি দাক্ষিণাত্যে বৈদিক ধর্ম্ম লইয়া যান—এই চিরপ্রসিদ্ধ সর্ব্বজনীন ঐতিহাসিক বার্ত্তা, এই সিদ্ধান্তের বিপরীত।

(৪) রহূগণ ঋষি বিদেহরাজ মাধবের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র গোতমের অনেক সূক্ত ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। এই গোতমেরা পরবর্ত্তী বিদেহরাজাদের পরম্পরাগত পুরোহিত বলিয়া রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাদিগকে "মৈথিল" না বলিয়া থাকা যায় না।

করিতে উদ্যত হয়েন। এবং তাঁহাদের ঋষি, দস্যুদমনের জন্যই ইন্দ্রকে অনুরোধ করিতেছেন। ভাবে বোধ হয়, ভোজগণ প্রমগন্দের দস্যুদলের হস্তে বিস্তর নির্য্যাতন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং সহজে তাহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

(৫) আমূলক বিবেচনা করিলে প্রতীয়মান হইবে, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে ও এমন কি দাক্ষিণাত্যপ্রদেশীয় মহারাষ্ট্রেও আর্য্যাধিকার বদ্ধমূল হইবার পরে, ঋগ্বেদের কোন কোন অংশ রচিত হইয়াছিল।

(৬) যদি বিশ্বামিত্র পঞ্জাবে থাকিতেন—তিনি যে ভাবে কীকটের কথা কহিয়াছিলেন—তাহা কিছুতেই তাঁহার মুখে ব্যক্ত হওয়া সম্ভব হইত না। কোথায় পঞ্জাব, আর কোথায় কীকট! পঞ্জাব হইতে বিশ্বামিত্রের যজমানেরা কীকটে গোধন পরাজয় করিতে আসিবেন? বিশ্বামিত্রের যজমানেরা যদি পঞ্জাবে থাকিতেন—কীকটের দস্যুদল কর্ত্তৃক তাঁহাদের নির্যাতিত হওয়া কি সম্ভব? এই এক কথাতেই, বিশ্বামিত্রের সময়ে পঞ্জাব হইতে কীকটভূমি পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান যে আর্য্যাধিকৃত হইয়াছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

(৭) বিশ্বামিত্রের যশঃ সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তে বিকীর্ণ হইয়াছিল। কোন পঞ্জাবদেশীয় রাজার (সম্ভবতঃ সুদাস রাজার) যজ্ঞে তিনি ঋত্বিকের বরণ পাইয়া, বলীবর্দ্দযুক্ত শকটারোহণে তথায় গিয়াছিলেন বলিয়া বেদে বর্ণনা আছে। ইহাতেই তাঁহার "শতদ্রু" নদীর সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তিনি যে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর বর্ণনা করিয়া মন্ত্র রচনা করেন—তাহা প্রণিধান-পূর্ব্বক পাঠ করিলে বোধ হয়—তিনি দেশভ্রমণে প্রথমে ঐ অগাধতোয়া বেগবতী নদী দুইটি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। শতদ্রুবর্ণনা সেই বিস্ময়েরই ফল। উহা শতদ্রুতীরে বিশ্বামিত্রের বাসের পরিচায়ক নহে।

ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শুনঃশেপের উপাখ্যানে বিশ্বামিত্র ও মধুচ্ছন্দার বিষয় কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া যায়। বিশ্বামিত্রের এক শত পুত্র ছিল। এই পুত্রগণ সকলেই তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন। যদি পাঠক বিশ্বামিত্রকে একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন "টোলের" অধ্যাপক বলিয়া মনে করেন—তাহা হইলে, তাঁহার বিশেষ ভ্রম হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বিশ্বামিত্রের "টোল" বা পরিষদে, তাঁহার সন্তানগণ ভিন্ন, দেশদেশান্তর হইতে অন্যান্য বিদ্যার্থীগণও বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালে শিখিবার ও শিখাইবার প্রধান সামগ্রী "বেদ"ই ছিল। ইহাই "বিদ্যা" নামে পরিচিত ছিল। যিনি "বিদ্যা"বান্ হইতেন—অর্থাৎ কোন গুরুর নিকট হইতে বেদবিদ্যা লাভ করিতেন—তিনি বিশেষ যত্নসহকারে একটি শিষ্য বাছিয়া লইয়া তাহাকে সরহস্য স্বকীয় সমুদায় বিদ্যা প্রদান করিতেন। কেন না, তৎকালে পুস্তক বা মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। পণ্ডিতগণের স্মৃতির ফলকে বেদ

অঙ্কিত থাকিত। বেদবিৎ পণ্ডিত যত দিন না উপযুক্ত পাত্রে আপনার বিদ্যা স্থাপন করিতে পারিতেন, তত দিন তাঁহার জীবনের একটি অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সাধন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া ভাবিতেন। কেন না, তিনি মরিয়া গেলে বিদ্যা বিলুপ্ত হইবে। তিনি যে ধনের অধিকারী হইয়াছেন, তাহা আর রাখিয়া যাইতে পারিলেন না। আর যদি অপাত্রে সেই ধন ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে তাহা বিকৃত ও মলিন হইবার সম্ভাবনা। গুরু শিষ্যে এইরূপ নিয়ম হইত, যেমনটি পাইবেন, তেমনিটি রক্ষা করিবেন, কোন পরিবর্ত্তন করিবেন না। এই অদ্ভুত প্রণালীর ফলেই বেদ রক্ষিত হইয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

বিশ্বামিত্রের সময়ে, সম্ভবতঃ বেদের অবয়ব পূর্ব্বাপেক্ষা স্ফীত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং তিনি অনেক চেষ্টাতেও উপযুক্ত শিষ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। তিনি আবার প্রাচীন বেদে স্বরচিত নূতন বেদ সংযুক্ত করেন। কিসে স্বরচিত বেদ অনন্তকাল বর্ত্তমান থাকিবে, তাঁহার এইরূপ চিন্তা জন্মে। আপনার এক শত পুত্রের মধ্যেও তিনি স্বীয় অভিপ্রায়সাধনের উপযুক্ত পাত্র দেখিতে পান নাই।

অবশেষে তাঁহার পরিষদে একটি প্রকৃষ্ট মেধাবী ছাত্র উপস্থিত হয়। ঐতরের ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকা অনুসারে, এই ছাত্র অঙ্গিরাগোত্রজাত, তাঁহার নাম শুনঃশেপ। শুনঃশেপের পিতা অজীগর্ত্ত এতই দরিদ্র ছিল যে, অর্থের জন্য সে শুনঃশেপকে বিক্রয় করিয়াছিল। এইরূপ উপাখ্যান আছে যে, * শুনঃশেপ এক যজ্ঞে হত হইবার জন্য নীত হয়; কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহাকে রক্ষা করিয়া স্বকীয় পরিষদে আনয়ন করেন।

শুনঃশেপের বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া ক্রমে বিশ্বামিত্র এতই প্রীত হয়েন যে, অবশেষে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল যে, ঈশ্বর তাঁহাকে তাদৃশ উপযুক্ত শিষ্য আনিয়া প্রদান করিয়াছেন। তিনি যেরূপ শিষ্য খুঁজিতেছিলেন, তাহাই পাইয়া, পরম আহ্লাদে তাহার "শুনঃশেপ" এই কদর্য্য নাম ঘুচাইয়া, তাহাকে "দেবরাত" (দেব-দত্ত) এই নূতন নাম প্রদান করিলেন। অবশেষে তিনি

---

* পাঠক মনে করিবেন না, যজ্ঞে নরবলি হইত। এটি উপাখ্যানমূলক অর্থবাদ। শুনঃশেপের উপাখ্যানে যে ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায় বলিয়া লেখক বিবেচনা করেন, তাহা মূলে দেওয়া হইয়াছে।

দেবরাতকে আপনার পুত্রস্বরূপ গ্রহণ করেন, এবং আপনার এক শত ঔরস পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎসগণ! দেখ আমি এই দেবরাতকে আপন জ্যেষ্ঠ-পুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিলাম। দেবরাত জ্যেষ্ঠের সমুদায় অধিকার প্রাপ্ত হইবে। আমার ব্রহ্মবিদ্যা এই দেবরাতে স্থাপিত হইবে। ইনি তোমাদিগকে সত্যের পথ প্রদর্শন করিবেন। আমার ইচ্ছা, তোমরা সকলে জ্যেষ্ঠের ন্যায় দেবরাতের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিবে।" তখন বিশ্বামিত্রের পুত্রেরা দুই দলে বিভক্ত হইলেন। পঞ্চাশ জন একবাক্যে বলিলেন, আমরা দেবরাতকে কদাচ জ্যেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিব না; পিতঃ! এ আজ্ঞা ন্যায়মূলক নহে। তখন বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আপন পরিষদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পিতৃদেশ হইতে তাড়িত হইয়া, ইহারা পুণ্ড্র, অন্ধ্র, প্রভৃতি জনপদবাসী নিকৃষ্টজাতীয় লোকের যাজক হইল। আর, অপর পঞ্চাশ জন একবাক্যে পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, দেবরাতের জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল। মধুচ্ছন্দা, এই পঞ্চাশ জনের মধ্যে প্রধান ছিলেন; ইঁহারা পিতার আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়া পিতৃভবনে ও পিতৃদেশে বাস করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

উপাধি-উৎপাত।

বৎসরে দুইবার করিয়া, ভারতসম্রাজ্ঞীর জন্মদিনে ও ইংরাজি নববর্ষদিনে, উপাধি-বৃষ্টি হইয়া থাকে। দেবতার বৃষ্টিতে কখন কখন নিয়ম ভঙ্গ হয়; কোন বৎসর বা সুবৃষ্টি, কোন বৎসর বা অনাবৃষ্টি হয়। কিন্তু ইংরাজের উপাধি-বৃষ্টির নিয়ম লঙ্ঘন হইবার নহে। তবে দেবতার বৃষ্টি যেমন সর্ব্বত্র সমান পতিত হয়, ক্ষেত্রাক্ষেত্রের বিচার করে না, ইংরাজের উপাধি-বৃষ্টি সেরূপ নহে। পাত্রাপাত্রের বিচার আছে, যোগ্য অযোগ্য ব্যক্তির বিবেচনা আছে। যেমন লোকে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে, সেইরূপ বিস্তর উপাধি-উমেদার রাজদ্বারে দণ্ডায়মান থাকে।

কেহ তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করে, কেহ তাঁহাদের পদতলে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন করে, কেহ পাদোদক লইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কেহ ভক্তিভরে স্বর্ণরজতপুষ্পরাশি তাঁহাদের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করে। সকলেই উপাধি-প্রার্থী; সকলেই ভক্তিরসে পরিপ্লুত। সকলে সকল সময়ে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হয় না; কেহ বা আশার অতিরিক্ত উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হয়। কেহ বা যতটা আশা করে, ততটা সম্মান প্রাপ্ত হয় না; কোন কোন মন্দভাগ্য, হয় ত একেবারে নিরাশ হয়। যাহারা দেবতাকে তুষ্ট করিতে জানে না কিম্বা পারে না, তাহারা মুগ্ধলোচনে এই দ্বিবার্ষিক উপাধি-বৃষ্টি দর্শন করে।

একবার একজন নিরীহ দোকানদার খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেচারি কিছু জানে না, সাহেব মহলে সোডালেমনেড, হুইস্কি বিক্রয় করিত, মেমসাহেবদিগের ফরমায়েশ খাটিত, ঘোড়ার দানা, গরুর ঘাস যোগাইত। সাহেবদিগের অনুকম্পায় মিউনিসিপাল কমিশনর হইয়াছিল। সভাস্থলে তাঁহাদের ইঙ্গিত মত হাত তুলিত, তাঁহাদের ইঙ্গিত মত হাত নামাইত। ক্রমে অনরারি মাজিষ্ট্রেট হইল। মকদ্দমা উপস্থিত হইলে বাদী, প্রতিবাদী ও সাক্ষীদিগের নিকট মুর্গিটা, তরকারীটা কিম্বা জ্বালাইবার কাঠ আদায় করিত। খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইলে অনেকে মোবারকবাদী দিতে আসিল। খাঁ বাহাদুর তাহাদের কথা শুনিয়া ঊর্দ্ধনয়নে, আকাশের দিকে হাত তুলিয়া কহিলেন, "খোদানে দিয়া!" তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস হইয়াছিল যে, খোদা যেমন ছেলেটি মেয়েটি টাকাটি দেন, উপাধিও সেইরূপ তাঁহার প্রদত্ত। খোদা নিজে হাতে করিয়া কিছুই দেন না। ছেলেটি যেমন বিবির মারফতে ও টাকাটি খরিদ্দারের মারফত পাঠান, উপাধিটিও সেইরূপ ইংরাজ সরকারের মারফত পাঠাইয়াছেন।

মুখে প্রকাশ করুন আর নাই করুন, মনের ভাব অনেকের এই রকম। 'ভারতনক্ষত্র' যাঁহারা বুকে বাঁধেন, আকাশ হইতে নক্ষত্র পাড়িয়া তাঁহাদের গলায় গাঁথিয়া দিলে তাঁহারা অধিকতর প্রীত হন কি না সন্দেহ। উপাধি একবার পাইলে আর রক্ষা নাই। সে কালের ব্রহ্মার বর বড়, কি একালের উপাধি বড়, নিরূপণ করা দুষ্কর। উপাধিধারীর কিছুমাত্র অসম্মান হইলে তিনি হাতে মাথা কাটিতে উদ্যত হন। যিনি কাল রাজা ছিলেন, আজ রাজা-বাহাদুর হইয়াছেন, তাঁহাকে শুধু রাজা বলিয়া সম্ভাষণ করিলে হয় ত তিনি

বাহাদুর হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সাবধান! যদি ভ্রমক্রমে পত্রের শিরোনামায় নূতন উপাধি লিখিতে কেহ বিস্মৃত হয়, তাহা হইলে চিঠি ফেরত যাইবে—ঠিকানা ভুল হইয়াছে। গেজেটে যখন উপাধি-সমন্বিত নামাবলী প্রকাশিত হয়, তখন চিত্রগুপ্ত তদ্দর্শনে আপনার খাতা সংশোধিত করেন কি না জানিতে অত্যন্ত কৌতূহল হয়, এবং নক্ষত্রখচিত রাজা, মহারাজা ও রায়বাহাদুরগণ গাদাগাদি করিয়া, উপাধিশূন্য ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনুষ্যগণের সহিত যখন যমরাজের দক্ষিণ দ্বারে উপস্থিত হইবেন, সে সময় যমদূতগণ তাঁহাদিগের উপাধিকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে নরকে স্থান দিবে কি না, জানিতে ইচ্ছা করে।

ইংরাজ রাজা ইংরাজি উপাধি প্রদান করিলে বিশেষ অসঙ্গত বোধ হয় না। কিন্তু এদেশীয় হীনবীর্য্য, ক্ষীণযষ্টি, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় ফুৎকার-অসহিষ্ণু নাইটগুলিকে দেখিলে, আর্থরের নাইটসমূহ ও সিংহ-হৃদয় রিচার্ড ও তাঁহার যোদ্ধৃবর্গকে স্মরণ হয়। নাইট উপাধি কি রূপে সৃষ্ট হইল ও এখন তাহার দুর্দ্দশা মনে করিলে, একটু দুঃখ হয়। কিন্তু রাজা মহারাজা উপাধির ছড়াছড়িতে হিন্দুর অধিক দুঃখ হইবার কথা। যাঁহাদিগের কোন পুরুষে কেহ কখন রাজা ছিল না, যাঁহাদিগের বর্ত্তমান রাজত্ব গৃহের দাসদাসী ও পরিবারবর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাঁহাদিগকে রাজা বলিয়া অভিবাদন করিতে কি মনে মনে কিছু আপত্তি হয় না? তুমি রাজা, তুমি মহারাজা বলিলেই, কি কেহ রাজা মহারাজা হইয়া যায়? না জাতিতে রাজা, না ক্ষমতায় রাজা, না ক্রিয়াকর্ম্মে রাজা—কেবল বৎসরে বৎসরে নামে মাত্র রাজা মহারাজার দল বাড়িতেছে। কিন্তু ইঁহারা কি কোন অংশে আপনাদিগকে রামচন্দ্র অথবা বিক্রমাদিত্যের অপেক্ষা ন্যূন মনে করেন? এইরূপ শূন্যউপাধিধারী কোন মহারাজাকে যখন সূর্য্যবংশীয় রাজপুত বিশ্বস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনার রাজত্ব কোথায়?' তখন তিনি এই নূতন ছলনা অবগত ছিলেন না। রাজত্ব নাই, অথচ রাজা কেমন করিয়া হয়, সকলে এ কথা সহজে বুঝিতে পারে না। এ দিকে রাজা যেমন, অপর দিকে নবাবের দল তদনুরূপ। আগে নবাবী দেখিয়া লোকে আশ্চর্য্য হইত, আর এখন নবাবী গ্রন্থিভেদের বিচারে পর্য্যবসিত হয়। যাঁহারা প্রকৃত রাজা, তাঁহারা রঙ্গ দেখেন। তাঁহারা কতকগুলি শান্ত শিষ্ট হৃষ্ট পুষ্ট ভদ্রলোককে ধরিয়া

লাঙ্গূল সমুচ্ছ্রিত করিয়া হর্ষগর্ব্বভরে নৃত্য করে ও রাজপুরুষেরা করতালি-ধ্বনিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে থাকেন।

সে দিনকার উপাধি-সত্র মনে পড়ে। বেলভেডিয়ারে সভাগৃহে দরবার বসিয়াছে। চোব্‌দারেরা আসাসোঁটা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মহারাজা-বাহাদুর, রাজাবাহাদুর, নবাব বাহাদুর, রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর খিলতের আশায় বসিয়া আছেন। বঙ্গাধিপ বক্তৃতা করিলেন, উপাধিধারীদিগের সুখ্যাতি করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। লোকের দৃষ্টি সেই সমবেতমণ্ডলীর মধ্যে এক জনের উপর পড়িল। তিনি আর কেহ নহেন—রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। অত রাজা মহারাজা নবাব থাকিতে, এক জন রায়-বাহাদুরের প্রতি যে সকলের নজর পড়িল, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। রাজপ্রসাদে কেহ ধন্য হয় না, নিজগুণে মানুষ ধন্য হয়, এ কথা আমরাও—উপাধিলোভা জাতি—জানি। যদি কখন আমাদের জাতীয় গৌরব হয়, যদি কখন আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে অপর জাতিকে প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত রত্ন সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃভূমিকে লোকে স্বর্ণগর্ভা বলিবে। তত দিনে, রাজা মহারাজা নবাবের দল কে কোথায় বিস্মৃতি-সাগরে তলাইয়া ডুবিয়া যাইবে, কে বলিতে পারে? এই কথা বুঝিতে পারিয়া সকলে বলিয়াছিল যে, রায় বাহাদুর উপাধি দিয়া বঙ্কিম বাবুর প্রতি অবমাননা প্রকাশ করা হইল।

আর এক দিনের কথা মনে পড়ে। বিতণ্ডাপ্রিয়, গর্ব্বিত পাদ্‌রি হেষ্টী, ছদ্মনামধারী বঙ্কিম বাবুর রচনা ও তর্ককৌশলে বিস্মিত হইয়া, তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছিল, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। তখন বঙ্কিম বাবু সদর্পে বলিয়াছিলেন যে, তিনি সে সম্মানপ্রার্থী নহেন, স্বজাতির সুখ্যাতিই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট সম্মান।

ইংরাজ রাজার নিকট তিনি এরূপ তেজের কথা বলিতে পারিতেন না, কারণ তিনি ইংরাজের কর্ম্মচারী। কিন্তু যদি তিনি বুঝাইয়া, মিনতি করিয়া কহিতেন, "দোহাই তোমাদের! তোমাদের কর্ম্ম করিয়াছি, তোমরা আমায় বেতন দিয়াছ। কর্ম্মত্যাগ করিয়াছি, এখন তোমরা পেন্সন দিতেছ। আমার মাথায় উপাধি চাপাইয়া আর আমায় বিড়ম্বিত করিও না। আমি [illegible] তোমাদিগকে অমনি আশীর্ব্বাদ করিতেছি। দোহাই তোমাদের,

রাজা মহারাজা রায় বাহাদুরদিগের সমভিব্যাহারে রাজদ্বারস্থ হইতে হইত না। যদি এ কথা প্রকাশ পাইত যে, বঙ্কিম বাবু রায়বাহাদুর উপাধিগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা হইলে আজ সে কথা লইয়া আমরা স্পর্দ্ধা করিতে পারিতাম।

মনে হয়, যেন বাদ সাধিয়া রাজপুরুষেরা বঙ্কিম বাবুকে এই উপাধি দিয়াছেন। যেন তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই লোকটাকে পাক্‌ড়াও করিলে আর কাহারও কিছু বলিবার থাকিবে না, উপাধিসম্মান লইয়া কেহ বিদ্রূপ করিতে পারিবে না। "লোকরহস্য" যাঁহার তীব্র ব্যঙ্গময়ী লেখনী-প্রসূত, যিনি "ইংরাজ স্তোত্রের" রচয়িতা, বিধিবিড়ম্বনায় তিনিই কি না আজ রায় বাহাদুর! যাঁহার তেজস্বিনী, রসময়ী প্রতিভায় বঙ্গদেশ অদ্যাবধি মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যিনি দুর্গোৎসব ছলে অভাগিনী বঙ্গভূমির কলঙ্কমোচনের দিন গণনা করেন, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা জননী জন্মভূমির বন্দনা করিয়া যিনি বাঙ্গালীর চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত করাইয়াছেন, তাঁহার প্রতি এ অত্যাচার কেন? বঙ্কিমচন্দ্র উপাধিপ্রার্থী, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? কিন্তু তিনিও ত অব্যাহতি পাইলেন না। যাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে কিছু লুক্কায়িত থাকে না, বাগ্‌দেবীর কৃপায় যাঁহার লেখনী অমৃতনিঃষ্যন্দিনী, যিনি মিথ্যা সম্মানউপাধি অন্তঃকরণের সহিত ঘৃণা করেন, যাঁহার প্রণীত "রায় মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত" সে ঘৃণার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক, ইংরাজের কৌশলে তিনি স্বয়ং ধরা পড়িলেন। অতঃপর আমরা কোন্ মুখে বলিব যে, বাঙ্গালী জাতিতে এমন কেহ আছে যে, রাজপ্রসাদস্বরূপ উপাধিগ্রহণে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরাঙ্মুখ থাকিতে পারে? যদি কেহ উপাধিগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে তদুত্তরে শৃগাল ও দ্রাক্ষা সম্বন্ধীয় উপকথা কাহার মনে বা মুখে না আসিবে?

পুরাকালের যে মুনি ঋষি মহাত্মাদিগের কথা লইয়া আমরা এত গৌরব করি, যাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা এ পর্য্যন্ত হিন্দু জাতিতে বর্ত্তমান আছে বলিয়া স্পর্দ্ধা করি, তাঁহাদিগের নিকট কি আমরা এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি? সে কালে উপাধিরই বালাই ছিল না। মনুষ্যের মহত্ত্ব কর্ম্মে ছিল, নামে ছিল না। উপাধির সংযোগ ও বিয়োগে মানুষ মহৎ ও ক্ষুদ্র হইত না। স্বনামে

তেন না। যাহার যে প্রকৃত গুণ, তাহার সেই উপাধি। অমুক রাজা শার্দ্দূল-বিক্রান্ত, অমুক তপস্বী ক্ষমাশীল বা ক্রোধন-স্বভাব, এই পর্য্যন্ত। রায় দ্বৈপায়ন বেদব্যাস বাহাদুর, অথবা স্যর বাল্মীকি শর্ম্মা শুনিতে কেমন? যাঁহাদিগের প্রতিভা, তেজস্বিতা, অলৌকিক ক্ষমতা আমরা সম্যক্ কল্পনা করিয়া উঠিতে পারি না, তাঁহারা ত উপাধির জন্য লালায়িত হইতেন না। সকল দেশেই এইরূপ ছিল। সক্রেটিস, সীজার, হানিবাল, সেক্ষপীয়র, গেটে, কালিদাস স্বনামে জগদ্বিখ্যাত। ইঁহাদিগের নামে কোন উপাধি জোড়া লাগে না।

শুধু পুরাকালে কেন? রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের কালে আমাদের দেশে এই অভিমান ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র একজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের দীনাবস্থা শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ইচ্ছা, পণ্ডিতের কিছু সাহায্য করিবেন। রাজা ইঙ্গিতকৌশলে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন মতে কোন অভাব প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে রাজা স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। অধ্যাপক কহিলেন, "আমার কোন অভাব নাই। ব্রাহ্মণী ভাত ও তেঁতুল পাতার ঝোল রাঁধিয়া দেন, আমি তৃপ্তি পূর্ব্বক খাই।" এমন লোকের কাছে উপাধির কথা উল্লেখ করিলে তাঁহার লুব্ধ হওয়া অসম্ভব।

যে ইংরাজকে বিষয়ী বলিয়া, অধ্যাত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ বলিয়া আমরা অনেকটা সন্তোষ লাভ করি, তাহাদিগের মধ্যেও ত এত উপাধিকণ্ডূতি নাই। গ্লাড্ষ্টোন কি ইচ্ছা করিলে এত দিনে লর্ড হইতে পারিতেন না, না উপাধি পাইবার তাঁহার কখন সুবিধা হয় নাই? কিন্তু লর্ড উপাধি গ্রহণ করিলে কি তিনি এমন যশস্বী থাকিতেন? কার্লাইল দুর্ব্বাসা বিশেষ ছিলেন, উপাধির ত্রিসীমায় যাইতেন না। ডিজ্রেলীর মন্ত্রিত্বকালে, একবার কার্লাইল ও টেনিসন, দুই জনকেই লর্ড উপাধি দিবার প্রস্তাব হয়। কার্লাইল ডিজ্রেলীকে গালি পাড়িতেন; তাহার প্রতিদানস্বরূপ ডিজ্রেলী তাঁহাকে উপাধি দিতে চাহিলেন। কার্লাইল ও টেনিসনে সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হইত। কার্লাইল ডিজ্রেলীর পত্র পাইয়াই উপাধিগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সে পত্র তখন পাঠাইলেন না ও সে বিষয়ে টেনিসনের সহিত কথোপকথন করিলেন না। কয়েক দিবস পরে যখন শুনিলেন যে, টেনিসন উপাধিগ্রহণে অসম্মত হইয়াছেন, তখন আপনার পত্রখানি পাঠাইয়া দিলেন। পূর্ব্বে

টেনিসন উপাধি গ্রহণ করেন নাই। যে জাতির মধ্যে এত ঔদার্য্য আছে, তাহারা জগতে ধন্য হইবে না কেন?

স্বজাতীয় ও বিজাতীয় রাজায় অনেক প্রভেদ। ইংরাজ স্বজাতীয় রাজার নিকট সম্মানিত হইলে নিন্দার কোন কারণ নাই। রাজা যে জাতি, প্রজাও সেই জাতি। রাজ্য প্রজাতন্ত্র। কিন্তু আমরা কোন্ সুখে উপাধি প্রার্থনা করি? রাজ্যভারের সহিত যাহাদের কোন সংস্রব নাই, যাহারা সকল ক্ষমতায় বঞ্চিত, তাহাদের আবার সম্মান কি? ঘৃণিত, চরণদলিত প্রজাজাতির মধ্যে আবার রাজা মহারাজা কি? যে সকল উপাধি বৎসরে দুইবার করিয়া বিতরিত হইতেছে, সেগুলি সর্ব্বৈব মিথ্যা, অর্থশূন্য। রাজকার্য্যে যাহার কোন ক্ষমতা নাই, রাজ্যরক্ষার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, সে হয় রাজা; যে সেলাম করিতে ও যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইতে পটু, সে হয় বাহাদুর। তিন বৎসরের কর্ম্মচারী, অজাতশ্মশ্রু সিবিলিয়ানের রাঙ্গামুখ দেখিলে রাজা মহারাজা থরহরি কাঁপিতে থাকেন, সেই সিবিলিয়ানের বাড়ীর বারান্দায় দেড় ঘণ্টা কাল বসিয়া সাহেবের চাপরাসীর সহিত সদালাপ করিতে পাইলে রায় বাহাদুর আপ্যায়িত হন। একে ত আমাদের দুর্দ্দশার সীমা নাই, তাহাতে উপাধি-লোভে লুব্ধ হইয়া আমরা দিন দিন আরও অন্তঃসারশূন্য ও অপদার্থ হইয়া যাইতেছি, আমাদের প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হইতেছি।

উপাধি প্রার্থনা না করিয়া যদি আমরা ইংরাজের নিকট আর কিছু প্রার্থনা করি, তাহা হইলে আমাদের কোনও কালে মঙ্গল হইতে পারে। হে ইংরাজ! আমরা রাজা নই, আমরা বাহাদুর নই, আমরা তোমার অধমাধম প্রজা। আর আমাদের মাথা খাইও না, ক্রীড়নক দেখাইয়া বালকের মত আর আমাদিগকে ভুলাইও না, অর্থশূন্য উপাধি লোভে আমাদিগকে নাচা-ইয়া জগৎ হাসাইও না। তুমি কুপিত হইলে তোমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আমরা ধরালুণ্ঠিত হই। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের মস্তকে উপাধিকন্দুক নিক্ষেপ করিলে, কৃতজ্ঞহৃদয়ে আমরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। ক্রমাগত এই-রূপ বুকে হাঁটিয়া আমরা উরগ সরীসৃপের মত হইয়া যাইতেছি। ইহাতে তোমাদের কি গৌরব বাড়িবে? আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমরা যাহাতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারি, আমাদিগকে সেই শিক্ষা দাও। তোমাদের জাতীয় মহত্ত্বের বীজমন্ত্র আমাদিগকে শিখাও। যে অধ্যবসায়বলে

প্রদান কর। যে দুর্জ্জয় তেজবলে তোমরা সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতেছ, সেই তেজাংশ আমাদিগকে দাও। যে স্বদেশানুরাগ তোমাদের হৃদয়ে অহরহ বিরাজ করিতেছে, সেই অনুরাগ যেন আমাদের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়। যে অনুসন্ধিৎসা ও ঐকান্তিকতা তোমাদিগকে বিজ্ঞানরাজ্যের দূরদেশে লইয়া গিয়াছে, সেই মনোবৃত্তি যেন আমরাও পাই। হে ইংরাজ! আমাদিগকে রাজা, রায় বাহাদুর সঙ্ সাজাইয়া নিজে হাসিও না, লোক হাসাইও না।

বন্ধু।

(গল্প)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"খোজত ফিরুঁ সারি বন বন,
কতহুঁ ন মিলে যদুকে নন্দন,
কওন সওয়ত ১ বশ কিহ্ন মোহন!"

কাননের অপর প্রান্ত হইতে আর একজন গায়িল,

"মোরা স্বজন হয় ফুল গুলাবী,
মৈকলিয়া ২ চম্পেকে স্বজন,
কওন সওয়ত বশ কিহ্ন মোহন!"

যে পুর্ব্বে গায়িতেছিল, সে আর একটু কোমল সুরে গায়িল,

"মল্‌কে থাক্ বিভুতি রমায়েঁা, ৩
ওঢ় লিয়েঁা গেরুয়া বস্তর্,
তেরে কারণ ময় ভয়হুঁ যোগীন্।"

কানন প্রতিধ্বনিত করিয়া উত্তর আসিল,

"বালাপন্ কি লাগ লগন,
ছোড়ত নাহি কর কোটি যতন,
স্বজন মুখড়া ন দেখলা যা মনমোহন!"

দুই জনে কণ্ঠ মিলাইয়া আনুপূর্ব্বিক গায়িল,

"স্বজন মুখড়া দেখলা যা মনমোহন !
ফুক বাঁশিয়া বাজা যা-রে, হিয়া তপত বুঝা যারে,
মহারাজা হো !
বালা পন্ কি লাগ লগন,
ছুটত নাহি কর কোটি যতন।
মল্‌কে থাক বিভূতি রমায়েঁা,
ওঢ় লিয়েঁা গেরুয়া বস্তর্,
তেরে কারণ ময় ভয়হুঁ যোগীন্।
খোজত ফিরেঁা সারি বন বন,
কতহুঁ না মিলে যহুকে নন্দন,
কওন সওয়ত বশ কিহ্ন মোহন !
মোরা স্বজন হয় ফুল গুলাবী,
মৈকলিয়া চম্পে কে স্বজন ;
কওন সওয়ত বশ কিহ্ন মোহন !"

শ্রাবণের গঙ্গা স্ফীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গঙ্গাতীরে কাননে গরু মহিষ চরিতেছে। সেই কাননে দুই যুবক গান করিতেছিল।

পর পারে চড়া ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইয়াছে। কোন স্থানে জল উঠিয়াছে, ছোট ছোট ঝাউগাছের মাথা জাগিয়া আছে। প্রয়াগ হইতে কিছু পূর্ব্বে একটি ছোট গ্রামের সম্মুখ দিয়া গঙ্গা বহিতেছে। বর্ষা সবে আরম্ভ হইয়াছে, এখনও গঙ্গা ও বর্ষার জল মিশিয়া চারিদিক জলাকীর্ণ হয় নাই। ক্ষেত্রের স্নিগ্ধ শ্যাম শোভা এপর্য্যন্ত জলমগ্ন হয় নাই। চারিদিকে পুলকিত প্রকৃতি-মূর্ত্তি। তরঙ্গের উচ্ছ্বাসে আনন্দ, আবর্ত্তে নৃত্য। ধরণীর অঙ্গে উজ্জ্বল শ্যাম অম্বর। আকাশে জলভরা মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন। প্রাণী পুলকে মগ্ন ; নরনারী উল্লসিত। গ্রামে বৃক্ষে বৃক্ষে হিন্দোলা ঝুলিতেছে ; বালক বালিকা, যুবক যুবতী দোল খাইতেছে। স্ত্রীলোকেরা মিলিয়া শ্রাবণের কজরি গাহিতেছে—"অইলে সাওয়ন কি মহীনওয়াঁ সব সখী খেলেঁ কজরি।"

রোশন ও মোহন বাল্যবন্ধু। উভয়ে জাতিতে আহীর। রোশন কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ। বাল্যকাল হইতে সে ব্যায়ামপটু। মোহন বুদ্ধিমান, কিন্তু তাদৃশ বলবান ছিল না। দুই জনে একত্রে গোচারণ করিত, জলে সন্তরণ

করিত, দুগ্ধ দধি বিক্রয় করিতে যাইত। আজ এই শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে, গঙ্গাতীরশোভী কাননে উভয়ে গীত গাহিতেছিল। সেই কাননের সহিত কত বাল্যক্রীড়া, কৌতুকের স্মৃতি বিজড়িত ছিল।

প্রথম বর্ষাবারিসিঞ্চনে তপ্ত ধরণী হইতে মৃত্তিকার গন্ধ নিঃসৃত হইতেছিল। আকাশে মেঘ ঘনীভূত হইতেছিল, গম্ভীর মেঘনির্ঘোষে চারিদিক ধ্বনিত হইতেছিল। গীত সমাপ্ত হইলে, রোশন ও মোহন কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইল। নবীন বর্ষাগমে গঙ্গার জল স্ফীত হইয়া কল কল করিয়া ছুটিতেছিল। রোশন কহিল, "মোহন, মনে পড়ে,—এক দিন তুমি এইখানে আর একটু হইলে ডুবিয়া যাইতে। আমি তোমায় রক্ষা করিয়াছিলাম।"

মোহন রোশনের হাত ধরিয়া কহিল, "আমি কি ভুলিয়া গিয়াছি ? কখন কি ভুলিতে পারিব ?"

দুই জনে লাঠি হাতে দাঁড়াইয়াছিল। রোশনের লাঠিতে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তৈলনিষিক্ত ছিন্ন বস্ত্র জড়িত ছিল। বহু যত্নে রোশন সেই লাঠি রক্ষা করিত। লাঠির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া সঙ্গীকে কহিল, "আমার লাঠি কেমন হইয়াছে দেখ।"

মোহন লাঠি হাতে করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। লাঠি পাকা বাঁশের, অত্যন্ত কঠিন ও ভারি। মোহন কহিল, "খুব মজবুত লাঠি।"

রোশন লাঠি লইয়া মাটীতে ঠুকিতে লাগিল। কহিল, "একবার দাঙ্গা হয় ত লাঠির গুণ দেখাই।"

মোহন হাসিয়া কহিল, "লাঠি থাকিলেই কি দাঙ্গা করিতে হয় না কি ?"

রোশন বিরক্তভাবে কহিল, "এখনকার লোকগুলা কোন কাজের নয়। আগে দুই গ্রামে প্রায় দাঙ্গা হইত। লাঠি মাঝে মাঝে না চালাইলে অভ্যাস থাকে না।"

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে দুই জনে গ্রামে ফিরিল। কাননের ভিতর দিয়া সঙ্কীর্ণ পথ। রোশন অগ্রগামী হইল, মোহন তাহার পশ্চাতে চলিল। বৃক্ষশাখায় বহুবিধ পক্ষী কোলাহল করিতেছিল। রোশন তাহাদিগকে দেখিতে দেখিতে, গাহিতে গাহিতে চলিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে রোশন তাহার হস্তধারণ করিয়া ভীত হইয়া কহিল, "খবরদার !"

হস্ত দূরে, একটা গোক্ষুরা সর্প যাইতেছিল, সে দেখিতে পায় নাই। সম্মুখে মনুষ্য ও তাহার হস্তে লাঠি দেখিয়া সর্প ফোঁস্ করিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকাল বিলম্ব হইলেই রোশন দংশিত হইত। কিন্তু সর্প যেমন ফণা তুলিল, অমনি পশ্চাৎ হইতে মোহন তাহার মাথায় লাঠি মারিল। চূর্ণমস্তক হইয়া সর্প পতিত হইল। মৃত সর্প দেখিয়া রোশন হাসিল। মৃত্যুভয় তাহারা জানিত না। কহিল, "মোহন, আমি একবার তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। আজ তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলে। ঋণ শোধ হইয়া গেল।"

মোহন কিঞ্চিৎ বিষণ্ণ হইয়া কহিল, "তোমার যেমন ইচ্ছা হয় মনে কর, কিন্তু আমি জানি, কখন ঋণমুক্ত হইতে পারিব না। বন্ধুত্বে কি সামান্য উপকার ঋণ মনে করিতে আছে?"

রোশন কহিল, "আমি যাহা বলিলাম, সেই কথাই ঠিক।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নবীন বর্ষা চঞ্চল। মেঘ জলভারে অবনত কিন্তু চঞ্চল, চঞ্চল বিদ্যুৎ, বায়ু চঞ্চল, জলস্রোত চঞ্চল। স্বদেশে প্রবাসে মানুষের মন চঞ্চল, পৃথিবী চঞ্চলা। শাখাবিলম্বিত ঝুলনা মনের মত চঞ্চল।

বিশাল অশ্বত্থ বট গাছ গ্রামের চারিদিকে; নব বর্ষাসারে ধৌত উজ্জ্বল শ্যাম; শাখায় হিন্দোলা ঝুলিতেছে। গান গাহিয়া গাহিয়া গ্রামের যুবক যুবতী, বালক বালিকা দুলিতেছে। বৈকাল বেলা রোশন ও মোহন গ্রামের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। হাসিতে হাসিতে, যৌবনের বেগদর্প আনন্দে লঘুগতি, বেগে গমন করিতেছিল। সমবয়স্ক কাহারও সহিত দেখা হইলে দুই একটা আমোদের কথা কয়। কখনও কোন বালকের হিন্দোলা ধরিয়া বেগে দোলাইয়া দেয়, সে ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠে, দুই বন্ধু হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। স্ত্রীলোক হইলে দূর হইতে তামাসা করে, হিন্দোলায় হাত দেয় না।

গ্রামের এক প্রান্তে একটা আম্র বৃক্ষে একটা হিন্দোলা দুলিতেছিল। সে দিকে লোক জন বড় ছিল না। দুলিতেছিল একটি যুবতী, দোলাইতেছিল আর দুই জন যুবতী। তাহাদিগকে দেখিয়া মোহন থমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "ওদিকে আমরা যাইব না, ফিরিয়া চল।"

মোহন কহিল, "সুভাগীয়া ভাল স্ত্রীলোক নয়। তাহার নামে লোকে অনেক কথা বলে।"

রোশন কহিল, "সেই জন্য কি এ পথ দিয়াও চলিতে বারণ ?"

মোহন কহিল, "তা না হউক, এখন ওদিকে যাইবার আবশ্যক কি ?"

রোশন কহিল, "অন্যদিকে যেমন আবশ্যক, এ দিকেও সেইরূপ আবশ্যক।"

দুই জনের মাঝে যে বসিয়া দুলিতেছিল, সেই সুভাগী। দুই হাতে হিন্দোলার দড়ী ধরিয়াছিল। গোল, মসৃণ বাহুযুগল দোলনের সঙ্গে নামিতে-ছিল উঠিতেছিল, পূর্ব্বে যাইতেছিল, পশ্চিমে আসিতেছিল। পায়ের ঘুঙ্ঘুর মাঝে মাঝে বাজিতেছিল, দোলনের বেগে ওড়না পশ্চাতে উড়িতেছিল। রোশন ও মোহনকে দেখিয়া সে হাসিল। হাসি ফুটিল না, মুখে হাসির শব্দ হইল না। চক্ষু ঈষৎ মুদ্রিত হইয়া আসিল; অপাঙ্গ হইতে দুই চারি বার বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, ঘুঙ্ঘুর দুই চারি বার মৃদু মৃদু বাজাইল।

রোশন কহিল, "কেমন হাত! কেমন চোক!"

মোহন কহিল, "মাগীর মুখ দেখিতে নাই।"

সুভাগীর অঙ্গভঙ্গী, তাহার চক্ষের কটাক্ষ দেখিয়া, রোশনের পা জড়াইতে লাগিল, পূর্ব্বে যেমন বেগে গমন করিতেছিল, তেমন আর পারিল না। হিন্দোলায় উপবিষ্ট যুবতীকে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল। যাহারা সুভাগীকে দোলাইতেছিল, তাহারা কজরি গাহিতেছিল। রোশন ও মোহন তাহাদের দর্শনাতীত হইতেই, সুভাগী কজরির সুর ভঙ্গ করিয়া অন্য সুরে গাহিল,

"শ্যামলিয়া কি লটকী চাল জিয়া মে মেরো বস গইরে!
তন মন হিয়া মে বস গই রে!"

রোশন হাসিয়া মোহনকে জিজ্ঞাসা করিল, "শ্যামলিয়া কে ?"

মোহন রাগিয়া কহিল, "ওই জানে। ওর ভাবনা কি ?"

কিছু দুর গিয়া রোশন কহিল, "ফিরিয়া চল।"

মোহন বলিল, "কোথায় ?"

রোশন কহিল, "যে পথে আসিয়াছি, সেই পথে।"

মোহন কহিল, "ঐ মাগীকে তোমার দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, একেলা

রোশন কহিল, "কেন, তোমাকে ধরিয়া রাখিবে না কি? তোমার মত ভ আমি লোক দেখি নাই। আইস।" বলিয়া মোহনের হাত ধরিয়া তাহাকে বল পূর্ব্বক ফিরাইল। মোহন বলপ্রকাশ না করিয়া তাহার সঙ্গে চলিল।

সুভাগী পূর্ব্বের মত দুলিতেছিল। যুবকদ্বয় ফিরিয়া আসিতেছে দেখিয়া সে নিজের আহ্লাদ গোপন করিবার চেষ্টা করিল না। তাহাদিগকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলে পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগের পশ্চাতে গীতখণ্ড নিক্ষেপ করিল।

"কদ অইঁহে শ্যাম বংশীওয়ালা হমরি ওয়রিয়া ১ না!"

রোশন পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিতেছিল। তাহাকে দেখিয়া সুভাগী ঈষৎ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আলিঙ্গনের ভঙ্গী করিল। রোশন হৃদয়ের আবেগে গাইয়া উঠিল,

"তুনে আঁখ বতাকে মারা মুঝে,
দিয়া পলক পলক ইশারা মুঝে!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রামের বাহিরে একখানি চালাঘরে সুভাগী একা বাস করিত। কোথা হইতে আসিয়াছিল, কেহ জানিত না। কিছুদিন পূর্ব্বে গ্রামে আসিয়া, অল্প জমি লইয়া, গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। রকমে বোধ হইত, অর্থের তেমন অভাব নাই। বিধবা বলিয়া পরিচয় দিত। কিন্তু তাহাদের জাতিতে দ্বিতীয় বার বিবাহে কোন বাধা ছিল না। সগাই না করিয়া সে এমন একা থাকে, তাহাতে লোকের মনে সন্দেহ হইত। তাহার রকম সকম দেখিয়া আরও সন্দেহ হইত। সুভাগী যুবতী, একা থাকে, যাহাকে দেখে, তাহার সহিত ঠাট্টা তামাসা করে, গ্রামের মন্দ স্ত্রীলোকদিগের সহিত গল্প গান করে। এ পর্য্যন্ত আর কিছু কেহ দেখিতে পায় নাই; কিন্তু তাহার ব্যবহারে সকলেই তাহাকে সন্দেহ করিত।

মোহন, রোশনকে এই সকল কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিল। সুভাগীর সঙ্গে কথা কহিলেও লোকে নিন্দা করিবে। রোশন যুবা পুরুষ, তাহারই বা মনের ঠিক কি? রোশন সকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিত। গ্রামের লোকে

কি বলে, সে জন্য তাহার ত বড় ভয়! দু'টা কথা কহিতে দোষ কি? মোহন যেমন, স্ত্রীলোককে পর্য্যন্ত ভয় করে!

এক দিন মোহন ও রোশন গঙ্গায় স্নান করিতেছিল। একটানা স্রোত, বেগ বাড়িয়াছে। দূরে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিতেছিল। মোহন ও রোশন অনেকক্ষণ হইতে জলে ছিল। অন্যান্য স্নানকারীরা উঠিয়া যাইতেছিল। স্ত্রীলোকেরাও উঠিয়া গিয়াছিল। একজন কেবল জলের মধ্যে গ্রীবা পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া বসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া মোহন জল হইতে উঠিয়া যাইতে চাহিতেছিল। রোশন উঠিতে চায় না। সুভাগী তাহাদিগকে দেখিয়াও যেন দেখিতেছিল না। যখন আর সকলে উঠিয়া গেল, সুভাগী সন্তরণ করিয়া গভীর জলে গেল। রোশন মোহনকে কহিল, "আইস, আমরাও যাই।" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রোশন জল ঠেলিয়া সুভাগীর অভিমুখে চলিল। মোহন তাহাকে তিরস্কার করিয়া কহিল, "তোমার কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই? মাঝ গঙ্গায় উহার সহিত সাঁতার দিতে যাইতেছ!" রোশন ফিরিল না। মোহনও তাহার সঙ্গে চলিল।

কিছু দূর গিয়া সুভাগী ফিরিয়া তাহাদিগকে দেখিল। কপট ক্রোধ করিয়া কহিল, "তোমরা যে আমার পিছনে আসিতেছ?"

রোশন কহিল, "অধিকক্ষণ পিছনে থাকিব না। এখনি তোমার পাশে যাইতেছি।"

সুভাগী একটা গালি দিল। কূলের দিকে চাহিয়া দেখিল, গ্রাম হইতে অপর স্নানকারীরা আসিতেছে। আর কিছু না বলিয়া ডুব দিল। অনেক দূরে গিয়া তীরের নিকট উঠিল। জল হইতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে গেল। রোশন ও মোহন তীরে ফিরিয়া আসিল। গৃহে যাইতে পথে মোহন কহিল, "এত করিয়া তোমায় বুঝাইতেছি, তুমি বুঝিতেছ না? তুমি খেলা মনে করিতেছ, কিন্তু সে ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমি তোমায় বলিতেছি, সুভাগী সাক্ষাৎ সর্পিণী।"

রোশন যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল। অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে কহিল, "তাহা হইলে আমি তাহার বিষদাঁত ভাঙ্গিব।"

মোহন রোশনের হাত ধরিয়া কহিল, "তোমার কাজ কি ভাই? ও কেবল তোমাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছে। তুমি উহার ছলনায় ভুলিও না।

সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিবে। বাল্যকাল হইতে আমি কখন তোমায় অপ্রিয় কথা বলি নাই। এখন তুমি নিজের হৃদয় বুঝিতে পারিতেছ না, সেই জন্য আমার কথা ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু যাহা বলিলাম, তাহা মনে রাখিও।"

রোশন কহিল, "তোমার কথায় জ্বালাতন হইয়াছি। হয় চুপ কর, না হয় আমার সঙ্গ ছাড়।"

মোহন নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চুপ করিল।

সেই দিন সন্ধ্যার সময় বৃষ্টি পড়িতেছিল। শ্রাবণের বৃষ্টি চাপিয়া আসিয়াছিল। বৃষ্টির পূর্ব্বে বজ্র, বিদ্যুৎ বিলসিয়া গর্জ্জিয়া গিয়াছিল। অন্ধকার হয় নাই। সুভাগী আপনার দরজার ভিতরে দাঁড়াইয়াছিল। সম্মুখে এক বট-গাছের তলায় রোশন দাঁড়াইয়াছিল। বৃষ্টি দেখিয়া যেন সেই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহার সঙ্গে মোহন ছিল না। বৃষ্টি ক্রমে ছাড়িয়া আসিল; কয়েক বার মেঘ ডাকিল, বিদ্যুৎ চমকিল; বজ্রনির্ঘোষ ও বিদ্যুৎপ্রভা ক্রমে দূরে চলিয়া গেল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সেই অবকাশে রোশন একটা কজরির এক কলি গাহিল,—

"কঁতনেকে বেচবে মছুইনীয়া সিঙ্গিয়া এ মছরিয়া, কতনেকে বেচবে বালা যোবনওয়া?"

সুভাগী হাসিয়া তৎক্ষণাৎ পরের কলিতে উত্তর দিল,

"আনিয়া দুআনিয়া রাজা সিঙ্গিয়া এ মছরিয়া, লাখ ত রূপইয়া বালা যোবনা!"

সেই বৃষ্টি বাদলের সন্ধ্যার সময় বিকিকিনি হইয়া গেল। কিনিল সুভাগী, বিকাইল রোশন। বিনামূল্যে, সাধিয়া, নিজে উপযাচক হইয়া, বিকাইল। আর লক্ষ মুদ্রা মূল্যের সুভাগীর বালা যৌবন কে কিনিয়াছিল, কে জানে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই অবধি রোশন উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। পথ চলিতে পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুদিগের সহিত কথা কয় না, মোহনের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ করিল। নির্লজ্জ হইয়া প্রকাশ্যরূপে সুভাগীর সহিত বাস করিতে লাগিল। সুভাগী ব্যতীত পৃথিবীতে যেন তাহার আর কেহই রহিল না। সুভাগীর স্নানের সময় তাহার পিছনে পিছনে যাইত, সে দোলায় বসিলে তাহাকে

সুভাগী দৃষ্টির অন্তরাল হইলে পৃথিবী অন্ধকার দেখিত। যৌবনের দর্পতেজ গেল, মনের বল গেল, স্ফূর্ত্তি গেল, জীবনের অন্য বন্ধন গেল, রহিল কেবল সুভাগী। সুভাগী মায়াপাশ বিস্তার করিয়া তাহার হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বন্ধন করিল, রোশন নিস্তেজ, নিশ্চেষ্ট হইয়া, তাহার পদতলে পড়িয়া রহিল। গ্রামের লোক বলিল, সুভাগী তাহাকে যাদু করিয়াছে।

সুভাগীর পক্ষে এ সকল শুধু খেলা। গ্রামের লোকে তাহাকে ঘৃণা করিত, তাহার অখ্যাতি করিত, তাহাতে তাহার একটু রাগ হইয়াছিল। এই জন্য যাহাকে গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, কান্তিবিশিষ্ট দেখিল, তাহাকে হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল। তাহার শরীরের মনের বল হরণ করিল, তাহাকে লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

কিছু দিন গেল। সুভাগী মোহনকে রোশনের সঙ্গে দেখিয়াছিল, কিন্তু আর বড় একটা তাহাকে দেখিতে পাইত না। রোশন তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, আর মোহন? মোহনের যে চিত্ত বিচলিত হয় নাই,সুভাগীর তাহা মনে হইল না। সে বুঝিল, রোশন তাহার নিকটে আছে বলিয়া, মোহন দূরে দূরে থাকে। সে মনে মনে হাসিল। রোশনের সঙ্গেই সে কি চিরকাল কাটাইবে না কি? এক দিন রোশনকে জিজ্ঞাসা করিল, "সেই যে বন্ধুটি তোমার সঙ্গে বেড়াইত, সে কোথায়?"

রোশন কহিল, "জানি না।"

সুভাগী হাসিয়া কহিল, "তুমি কি সকলকে ভুলিয়া গেলে না কি?"

রোশন স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখ দেখিয়া কহিল, "তোমাকে ত ভুলি নাই।"

সুভাগী কহিল, "যদি এমন বন্ধুকে ভুলিতে পার, তাহা হইলে আমাকে ভুলিতে কতক্ষণ?"

রোশন কহিল, "তোমার জন্যই সব ভুলিয়াছি। তোমাকে ভুলিব মনে করিলে ভুলিতে পারিব না।"

সুভাগী রোশনের স্কন্ধে হস্ত দিয়া, তাহার চক্ষে আপন চক্ষু হইতে তরল বৈদ্যুতী ঢালিয়া দিয়া কহিল, "দেখ, তোমার সঙ্গে তোমার কোন বন্ধু দেখা করিতে আসে না, ইহা আমার ভাল লাগে না।"

রোশন অনিমেষ নয়নে সুভাগীর মুখ দেখিতে দেখিতে কহিল, "আমি

সুভাগী কহিল, "তুমি চাও আর না চাও, সকলে তোমায় এরূপ করিয়া ত্যাগ করিলে আমার অপমান হয়।"

"কিসে ?" রোশন বিস্মিত হইল।

"কেন, আমার কাছে আছ বলিয়া কি কেহ তোমার ছায়া মাড়াইবে না ? আমি কি এতই অধম না কি ? যদি আমার জন্য তোমায় সকলে ত্যাগ করে, তাহা হইলে আমার কাছে তোমার না থাকাই ভাল।"

রোশন কিছু কর্কশ স্বরে কহিল, "ও কথা বলিও না," সুভাগী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, মুখ নাড়িয়া কহিল, "বলিব না কেন ? তুমি যদি আমার একটাও কথা না শুন, তাহা হইলে যাহা ইচ্ছা হয় বলিব, যাহা ইচ্ছা হয়, করিব।"

রোশন কহিল, "তোমার কি কথা শুনি নাই ?"

"এই যে কথা এখনি বলিতেছিলাম। তুমি এখানে থাকিলে তোমার সঙ্গে কেহ দেখা করিতে আসে না কেন ? যে বন্ধু তোমার সঙ্গে সর্ব্বদা বেড়াইত, সে কেন আসে না ? তাহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আনিতে হইবে।"

"তাহাই হইবে," বলিয়া রোশন উঠিল।

মোহন রোশনের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিল, কিন্তু সে কি করিবে ? পথে সাক্ষাৎ হইলে রোশন তাহার সহিত কথা পর্য্যন্ত কহিত না। রোশনকে সম্মুখে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল।

রোশন লজ্জিত হইয়া কহিল, "মোহন, আমি তোমার নিকট অত্যন্ত অপরাধী !"

মোহন কহিল, "আমার কোন অপরাধ কর নাই ; তুমি নিজের নিকট অপরাধী।"

রোশন কহিল, "তোমার কাছে একটি অনুরোধ আছে।"

মোহন কহিল, "কি অনুরোধ ?"

"তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

"কোথায় ?"

"যেখানে আমি থাকি।"

"সুভাগীর গৃহে ? তুমি কি পাগল হইয়াছ ?" মোহন বড়ই বিস্মিত হইল।

মোহন বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া কহিল, "তুমি ত জান, এ কথা আমি শুনিতে পারিব না। কেন বলিতে আসিয়াছ?"

রোশন কহিল, "আমি তোমায় মিনতি করিয়া কহিতেছি। এই কথাটি তোমায় রাখিতে হইবে।"

মোহন দেখিল, রোশনের চক্ষে জল আসিয়াছে। সেই গর্ব্বিত, উদ্ধত যুবক, তাহার এই দশা!

মোহন কহিল, "এ কথা কি তুমি নিজে মনে করিয়াছ?"

"না।"

"তবে কে?"

"সুভাগী।"

"কেন?"

"সে বলে, তুমি যদি পূর্ব্বের মত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না কর, তাহা হইলে তাহার অপমান হয়।"

"যদি না যাই?"

"আমি বলিয়াছি, তুমি আসিবে। তুমি না গেলে আমি মিথ্যাবাদী হইব।"

মোহনের মনে মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা হইল, কিন্তু রোশনকে কিছু বলিল না। তাহার সঙ্গে সুভাগীর গৃহে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মোহন যেমন শঙ্কিত হইল, তেমনি তাহার মনে একটু আশা হইল। রোশন এতদিন একেবারে হাতছাড়া হইয়াছিল। এখন তাহাকে বুঝাইবার অবকাশ হইবে। সুভাগীর মোহ চিরকাল থাকিবে না। যাহাতে তাহার হাত হইতে রোশন শীঘ্র শীঘ্র রক্ষা পায়, মোহন তাহাতে যত্নবান হইবে।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই মোহন নিজে বিপদে পড়িল। রোশনের অবর্ত্তমানে সুভাগী যেরূপ আচরণ করিত, তাহাতে মোহনের রাগও হইত, ভয়ও হইত। মোহন জানিত, সুভাগী মন্দ স্ত্রীলোক, কিন্তু সে ভাবিত যে, হাজার মন্দ হইলেও এরূপ ব্যবহার করিতে পারে না। মোহনকে একা দেখিলে অর্থপূর্ণ গান করিত। হাসি তামাসা করিত। ঘুরিয়া ফিরিয়া, তাহাকে শুনা-

অভিনয় বিপরীতরূপ হইল। মোহন যেন লজ্জাবতী, প্রেমরসানভিজ্ঞা কিশোরী, আর সুভাগা যেন আগ্রহপূর্ণ পুরুষ। মোহন পলায়ন করে, সুভাগী তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এরূপ লুকাচুরি অধিক দিন চলিল না। অবসর বুঝিয়া একদিন সুভাগী স্পষ্ট কথা পাড়িল। কহিল, "তুমি কি কিছু বুঝিতে পার না ?„

মোহন বলিল, "কি বুঝিতে পারি না ?"

সুভাগী কহিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি, দেখিতে পাও না ?"

মোহন কহিল, "তোমাতে আমাতে ও কথা হইতেই পারে না।"

"কেন ?"

"রোশন ও আমি এক রমণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইতে পারি না।"

সুভাগী কহিল, "রোশন কে ? তোমাকে পাইবার আশায়ই ত রোশনকে এখানে আসিতে দিই। তুমি বল ত আজই উহাকে বিদায় করিয়া দিব। উহার প্রতি আমি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি। তোমার সম্মুখে রোশন কোন্ ছার।"

মোহন কহিল, "রোশনকে ত্যাগ কর, সে তোমার ইচ্ছা। কিন্তু আমি কখন তোমার জার হইব না।"

সুভাগী কহিল, "তোমার মত কঠিন পুরুষ আমি ত দেখি নাই। সকলে আমায় সুন্দরী বলে, তুমি কি আমায় সুন্দর দেখ না। আমি তোমাতে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি, আমায় নিরাশ করিও না।" বলিয়া, অধীর হইয়া, সুভাগী মোহনের হাত ধরিল।

মোহন রাগিয়া, তাহাকে যাহা মুখে আসিল, তাহাই বলিল। হাত ছাড়াইয়া লইয়া বেগে চলিয়া গেল।

রোশন বাহিরে কোথায় গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সুভাগী ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে ?"

সুভাগী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তোমার জন্যই আমার এই অপমান হইল।"

রোশন কহিল, "অপমান ? কে তোমার অপমান করিয়াছে ?"

সুভাগী পূর্ব্ববৎ কহিল, "তোমার ঐ বন্ধু মোহন, দেখিতে ভালমানুষ, উহার মনে এই ছিল কে জানে ?"

সুভাগী মুখ আরও ঢাকিল। বলিল, "লজ্জার কথা তোমায় কি বলিব? আমাকে একেলা পাইয়া, এখানে আসিয়া, আমায় বেইজ্জত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বলিল, 'রোশন মূর্খ, পাগল, উহাকে দেখিয়া তুমি ভুলিয়াছ? রোশনকে তাড়াইয়া দিয়া আমার সহিত বাস কর।' আমি তাহার কথায় অসম্মত হওয়াতে বলপ্রকাশ করিতে উদ্যত হইল। আমি তোমার নাম ধরিয়া চীৎকার করাতে চলিয়া গেল। * আমি লজ্জায়, ঘৃণায় মরিয়া যাইতেছি।"

রোশন কোন কথা না কহিয়া, লাঠি তুলিয়া লইয়া বাহির হইল।

মোহন গ্রামের অপর যুবকদিগের সহিত কথোপকথন করিতেছিল। রোশন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে রুদ্ধ স্বরে কহিল, "পাপিষ্ঠ, ভণ্ড! বন্ধু হইয়া এই কাজ!"

মোহন অবাক্। জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ?"

রোশন কহিল, "তুমি মনে করিয়াছিলে, সুভাগী আমার কাছে কিছু বলিবে না; সেই ভরসায় তাহার অপমান করিতে গিয়াছিলে? যেমন কাজ করিয়াছ, তাহার প্রতিফল দিতেছি।" আর কিছু না বলিয়া, রোশন মোহনের মাথায় লাঠি মারিল।

চারিদিক হইতে লোক আসিয়া রোশনকে ধরিল। মোহনের মাথা ফাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গ্রাম হইতে কিছু দূরে আর একটি গ্রামে পুলিশের থানা ছিল। রোশনকে ধরিয়া থানায় লইয়া গেল। মোহন যাইতে অস্বীকৃত, একজন কনষ্টেবল আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। মোহনের মাথায় রক্তমাখা আর্দ্র বস্ত্রখণ্ড বাঁধা ছিল। থানায় নায়েব দারোগা চারপাইয়ের উপর বসিয়াছিলেন। মোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ফরিয়াদ কি?"

মোহন কহিল, "আমার কোন ফরিয়াদ নাই।"

দারোগা রোশনকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই ব্যক্তি তোমার মাথা ফাটাইয়া দিয়াছে, আর তুমি বলিতেছ, তোমার ফরিয়াদ নাই? তবে থানায়

মোহন কহিল, "আমি আসি নাই। তোমার লোক আমাকে লইয়া আসিয়াছে।"

দারোগা সাহেব মসীপাত্র, খাগড়ার কলম ও কাগজ খণ্ড বাহির করিলেন। বাম হস্তে কাগজ ধরিয়া, দোয়াতে কলম টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম?"

"মোহন।"

"বাপের নাম?"

"রঘু।"

"জাতি?"

"আহীর।"

"তুমি ফরিয়াদী?"

মোহন কহিল, "না, আমি ফরিয়াদী নই।"

দারোগা সাহেব কহিলেন, "আসামী তোমার মাথায় লাঠি মারিয়াছে কি না?"

মোহন কহিল, "মারিলেও আমি নালিশ করিতেছি না।"

দারোগা সাহেব কহিলেন, "বড়া তাজ্জব কি বাৎ। আসামীর সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

মোহন কহিল, "কিছু না।"

"তুমি উহার কিছু টাকা ধার?"

"এক পয়সা না।"

দারোগা সাহেব কিছু বুঝিতে পারিলেন না। গ্রামের অপর লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কেন ফরিয়াদ করিতেছে না, তোমরা কিছু জান?"

এক জন কহিল, "হুজুর, ইহাদের দোস্তি আছে।"

দারোগা কহিলেন, "এ কেমন দোস্তি? মাথা ভাঙ্গিয়া দিলেও ফরিয়াদ করিবে না?"

মোহন কিছুতেই ফরিয়াদ করিল না। অগত্যা দারোগা সাহেব কহিলেন, "এমন মকদ্দমায় ফরিয়াদ না করিলে চালান করিতে পারি না। আসামীকে ছাড়িয়া দাও।"

রোশন ফিরিয়া সুভাগীর গৃহে গেল। কিন্তু মোহনকে আর কেহ দেখিতে

বর্ষা গেল, শীত যায় যায়। রোশনের অবস্থা সেইরূপ—কোন কর্ম্ম করে না, কাহারও সহিত দেখা করে না। সুভাগীর আচরণে দিন দিন পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। রোশনের সঙ্গে পূর্ব্বের মত কথা কয় না, তাহাকে দেখিলে কখন বিরক্ত হয়, কখন তাহার নিকট হইতে উঠিয়া যায়। অপর পুরুষের সহিত হাসিয়া কথা কয়। রোশনের মনে নানারূপ সন্দেহ হইতে লাগিল। তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল, হাস্য গীতি বন্ধ হইয়া গেল। এক এক সময়, নিশাকালে বা সন্ধ্যার সময়, একাকী অস্থির হইয়া ভ্রমণ করিত। সেই সময় তাহার মনে হইত, যেন কে তাহার সঙ্গে ঘুরিতেছে, যেন কাহার ছায়া তাহার পদানুসরণ করিতেছে, কে যেন তাহার জন্য সর্ব্বদা জাগরূক রহিয়াছে। মোহন কোথায় গেল? সুভাগী কি সত্য কথা বলিয়াছিল? মোহনকে জিজ্ঞাসা করিল না কেন? তাহার মত বন্ধু আর কোথায় পাইবে?

এক দিন রোশন সুভাগীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি মোহনের নামে আমার কাছে যাহা বলিয়াছিলে, তাহা কি সত্য?"

সুভাগী কহিল, "এখন সে কথা মনে পড়িল কেন?"

রোশন কহিল, "মনে সর্ব্বদাই পড়ে, তোমাকে এত দিন জিজ্ঞাসা করি নাই। এখন করিতেছি।"

"তখন তোমার কাছে মিথ্যা বলিয়াছিলাম বলিলে যদি সন্তুষ্ট হও, তবে মিথ্যাই বলিয়াছিলাম।"

"এখন সত্য কথা বল।"

সুভাগী ভাবিতেছিল, "যদি এ আপনাআপনি আমায় ছাড়ে, তাহা হইলে আমি বাঁচি। তাহা হইলে আমায় আর তাড়াইতে হয় না।" মুখে কহিল, "মোহন আমায় প্রার্থনা করে নাই, আমিই তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছিলাম। সে আমার কথায় সম্মত হয় নাই, তাই তোমায় রাগিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম। সে সম্মত হইলে, তোমায় এত দিন এখানে থাকিতে হইত না।"

সুভাগী মনে করিয়াছিল, এই কথায় রোশন রাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু সে তখন গেল না।

আর একদিন রোশন দেখিল, সুভাগী আর একজন যুবকের সহিত ব্যঙ্গ করিতেছে। সুভাগীকে নির্জ্জনে পাইয়া রোশন কহিল, "তুমি একটু সাব-

সুভাগী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "অসহ্য হয়, এখান হইতে যাও না কেন? কে তোমায় এখানে থাকিয়া সহ্য করিতে কহিতেছে?"

রোশন কহিল, "তোমার জন্য আমি সব হারাইয়াছি। এখন আমার সম্মুখেই এই বাড়ীতে তোমার এই ব্যবহার!"

সুভাগী রাগিয়া কহিল, "এ কি তোমার বাপের বাড়ী? আমার বাড়ীতে আমার যাহা ইচ্ছা হয় করিব, তুমি বলিবার কে?"

রোশন মৃদু মৃদু, বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "এই কথা?"

"এই কথা কি? তোমার জন্য আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছি। একটু বুদ্ধি থাকিলে এত দিনে তুমি আপনি যাইতে। কিন্তু তোমাকে না তাড়াইলে তুমি ত যাইবে না।" রাগে সুভাগী গর্জ্জিতে লাগিল। মোহন বলিয়াছিল, সুভাগী সর্পিণী। রোশনের সেই কথা মনে পড়িল। আর কিছু না বলিয়া বাহিরে গেল।

গভীর রাত্রে সুভাগীর কুটীর হইতে একটা বিকট চীৎকার শ্রুত হইল। রোশন বেগে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অন্ধকার। গ্রাম নিদ্রামগ্ন। আকাশে ক্ষীণ নক্ষত্রালোক স্পন্দিত হইতেছে। শীতল পবন বহিতেছে। বৃক্ষ পত্র ঝর ঝর পত পত শব্দে শব্দিত হইতেছে। অন্ধকারে গ্রামের সম্মুখ দিয়া গঙ্গা বহিতেছে।

সেই অন্ধকার দিয়া রোশন বেগে চলিয়া যাইতেছিল। পথে আর এক জন দাঁড়াইয়াছিল। নক্ষত্রালোকে উভয়ে উভয়কে চিনিল।

"মোহন!"

"রোশন!"

রোশন চারিদিকে চাহিয়া সভয়ে কহিল, "তুমি এমন সময়ে কেন আসিয়াছ? এত দিন পরে আমার শাস্তি দেখিতে আসিয়াছ?"

মোহন কহিল, "না, আমি বন্ধুর কর্ত্তব্য করিতে আসিয়াছি।"

রোশন হতাশের মত কহিল, "এখন আসিয়া কি করিবে? আর কিছু দিন আগে আসিলে হইত।"

রোশন কহিল, "যাহা হইয়াছে, জানিতেই পারিবে। তুমি কি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছ?"

মোহন কহিল, "আমি কি সেই সময় মার্জ্জনা করি নাই?"

রোশন কহিল, "তাহা জানি। কিন্তু এখন আর একবার তোমার মুখে শুনিলে মনের একটা ভার লাঘব হয়।"

মোহন কহিল, "রোশন, তোমার মুখ দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে, কিছু দুর্ঘটনা হইয়াছে। কি হইয়াছে সত্য বল।"

রোশন কহিল, "গোপন করিয়াই বা কি হইবে? কতক্ষণ এ কথা চাপা রহিবে? আমি সুভাগীকে হত্যা করিয়াছি।"

সুভাগীর কুটীর হইতে সেই চীৎকার মোহনের শ্রবণে পশিয়াছিল। সে কহিল, "রোশন, তোমায় এতবার বলিয়াছিলাম, তুমি আমার কথায় কর্ণপাত কর নাই। অবশেষে স্ত্রীহত্যা করিলে। আমি গ্রাম ছাড়িয়া গিয়াও সদা সর্ব্বদা তোমার সন্ধান লইতাম। কিন্তু তোমার যে অবস্থা দেখিতাম, তাহাতে বুঝিতাম যে, তোমাকে কিছু বলিলে কোন ফল হইবে না। এখন কি করিবে?"

রোশন কহিল, "কি করিব, কিছুই জানি না। জীবনে সাধ নাই। থানায় গিয়া খবর দিব, কিম্বা গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।"

মোহন কহিল, "হত্যাকারীর দণ্ডে দণ্ডিত হইলে, অথবা আত্মহত্যা করিলে প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। জীবনের আশা ত্যাগ করিও না। তুমি যাহাতে রক্ষা পাও, আমি সে চেষ্টা করিব। আমার সঙ্গে আইস।"

মোহন রোশনকে সঙ্গে করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেল। পর দিবস প্রত্যুষে উঠিয়া গ্রামবৃদ্ধদিগের সহিত গোপনে অনেক কথাবার্ত্তা কহিল। ক্ষুদ্র গ্রাম, গ্রামের বৃদ্ধগণ কোন বিষয়ে একমত হইলে, তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

দ্বিপ্রহরের সময় গ্রামে অত্যন্ত গোলযোগ হইল। সুভাগীর মৃত দেহ তাহার গৃহে পড়িয়া রহিয়াছে। কে খুন করিয়াছে? গ্রামের পাটেল স্বয়ং গিয়া থানায় সংবাদ দিল। থানাদার আসিয়া তদারক আরম্ভ করিল। গ্রাম সুদ্ধ লোকের জবানবন্দী লওয়া হইল। সকলেরই এক কথা। সুভাগী অসচ্চরিত্রা, তাহার গৃহে অনেক রকমের লোক আসিত যাইত, অন্য গ্রাম

বলিল, আর সকলে যেমন যাইত, সেও সেইরূপ যাইত। কিছু দিন সুভাগীর সঙ্গে বাস করিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা। সম্প্রতি সে তাহার গৃহে প্রায় যাইত না। থানাদার অনেক ভয় দেখাইল, কিন্তু আর কোন কথাই প্রকাশ হইল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, সুভাগীর যেরূপ স্বভাব ও তাহার যেরূপ আচরণ, তাহাতে যে এতদিন খুন হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য। সেই অঞ্চলের পুলিশের সাহেব আসিয়া নিজে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহারও চেষ্টা বিফল হইল। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, গ্রামের বাহির হইতে আর কেহ আসিয়া খুন করিয়াছে।

কয়েক মাস পরে, পুলিশের হাঙ্গামা মিটিয়া গেল। সুভাগীর হত্যাকাণ্ড লোকে বিস্মৃত হইতে লাগিল। তাহার গৃহ ভূমিসাৎ হইল। তখন মোহন ও রোশন, গ্রামের লোকের নিকট প্রকাশ্য রূপে বিদায় গ্রহণ করিয়া, কর্ম্মের চেষ্টায় অন্যত্র গেল।

কত বৎসর অতীত হইল। একদিন শ্রাবণ মাসে, মোহন ও রোশন গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

শ্রাবণের গঙ্গা তেমনি বহিতেছিল, কদম্বকুসুম তেমনি ফুটিয়াছিল। শ্যামাঙ্গিনী প্রকৃতি তেমনি শীতস্নিগ্ধ হাসিতেছিল। চারিদিকে তেমনি আনন্দোচ্ছ্বাস, তেমনি চাঞ্চল্য। সেই আকাশে তেমনি মেঘ ছাইয়াছিল, তেমনি গুরু গুরু হুরু হুরু ডাকিতেছিল। কর্ষিত ক্ষেত্রে লাঙ্গলের পার্শ্বে বলদ তেমনি দাঁড়াইয়াছিল, ক্ষেত্রে বীজাঙ্কুর উদ্ভিন্ন হইয়াছিল, আলবালে বৃষ্টির জল তেমনি দাঁড়াইয়াছিল। জম্বুবৃক্ষে ফল পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে। আন্দোলিত হিন্দোলা হইতে গীতধ্বনি উঠিতেছে। রমণীর কণ্ঠধ্বনি, অলঙ্কৃত হস্তের করতালি, পূর্ব্বের ন্যায় শ্রুত হইতেছে। বর্ষার আগমনে সকলে নাচিতেছিল, গায়িতেছিল, হাসিতেছিল—হাসিল না কেবল রোশন। তাহার মুখে বিষাদগাম্ভীর্য্যের চিহ্ন অবিচলিত রহিল। মোহন ও রোশন গ্রামে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে কে গায়িল,

> "মন বনরা সে উদাস ভয়ে,
> কেয়া করুঁ মত বাঁওররিয়া!"[১]

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

প্রবাসের পত্র।

বরদা।

আমরা জয়পুর হইতে আজমীর,পুষ্কর, চিতোর, এবং যোধপুর—ইহাদের বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়াছি—দর্শন করিয়া, বরদায় যাই। বরদার সহকারী দেওয়ান খাঁ মন্ত্রা,আমাদিগকে তাঁহার অতিথির মত গ্রহণ করেন। তারাচরণ সঙ্গে বলিয়া, আমি আপা সাহেব রোডের ধর্ম্মশালায় অবস্থান করি। সহকারী মন্ত্রী মনিভাই যশোভাই, আমাকে অনেক অনুযোগ করেন যে, পূর্ব্বে তাঁহাকে কোনও সংবাদ দিই নাই। তাহা হইলে তিনি আমাদের জন্যে যথোচিত বাসস্থান নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন। রাজার গাড়ী, রাজার সিপাই ও কারকুন, আমাদের জন্যে নিয়োজিত হয়। আমরা অতি সম্মানের সহিত বরদা দর্শন করি।

বরদায় দেখিবার জিনিস দুই। রাজবাড়ী এবং গুর্জ্জরী। গুর্জ্জর ও গুজরাটের কামিনীকুসুমের সৌন্দর্য্যের গীত সময়ান্তরে লিখিব। বরদার মহারাজাকে গাইকোয়ার বলে। অর্থ, গাভীরক্ষক। গো ব্রাহ্মণ এক। অতএব, রাজার উপাধি গাভীরক্ষক বলিয়া এক জন ব্যাখ্যা করিলেন। আমার বোধ হয়, মহারাষ্ট্র ভূপতির গাভীরক্ষক ছিলেন বলিয়া, গাইকোয়ার নাম হইয়াছে। তেমনি তাঁহার মন্ত্রী বা পেশকার ছিলেন বলিয়া, সেতারা এবং পুণার রাজার নাম পেশোয়া ছিল। শিবজীর উত্তরাধিকারীরা হীনবল হইলে, পেশোয়া এবং গাইকোয়ার স্বাধীন নরপতি হন। আমার এ অনুমান কত দূর সত্য, জানি না। বর্ত্তমান রাজার নাম জিয়াজী গাইকোয়ার। ভূতপূর্ব্ব গাইকোয়ার জনৈক 'পলিটিকেলে'র বিষচক্ষে পড়েন, এবং তাঁহার চক্রান্তে রাজ্যচ্যুত হইলে, তাঁহার দূরসম্পর্কীয় একটি দরিদ্র বালককে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই বৃহৎ রাজ্যের অধিকারী করেন। ইনিই বর্ত্তমান গাইকোয়ার। বরদা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে 'মাখনপুরা' রাজবাটী নামক এক বৃহৎ রাজপুরী আছে। খাণ্ডেরাও গাইকোয়ার এখানে পাশাপাশি দুইটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান গাইকোয়ার তাহার পার্শ্বে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আর একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া এখানে বাস করিতেছেন। নগরের মধ্যে আর এক রাজবাড়ীতে অন্যান্য রাজমহিলারা বাস করেন। মাখনপুরার

অট্টালিকা হইতে পুরাতন অট্টালিকাতে যাইতে পারা যায়। পুরাতন দুটি বৈঠকখানামাত্র, এবং নূতনটি অন্তঃপুর। বহুমূল্য ইংরাজি উপকরণের দ্বারা সকল অট্টালিকা সজ্জিতা, বিশেষতঃ, অন্তঃপুরমহলের সজ্জা কল্পনাতীত। যে সকল রাজবাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি, ইহার তুলনায় কিছুই নহে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, মহারাজ সস্ত্রীক শৈলবিহারে গিয়াছিলেন। সমুদায় গৃহ জনশূন্য। সহকারী মন্ত্রীর আদেশে, আমরা মহারাজার শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত নয়ন ভরিয়া দেখিলাম। দেখিবে কি, যে দিকে নয়ন ফিরাইবে, চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। বোধ হইল, মহারাজা ইউরোপীয়ের মত থাকেন। স্নানাগার পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট মর্ম্মরের ইউরোপীয় উপকরণে সজ্জিত। নরচক্ষে যাহা দেখে নাই, তাহাও আমরা দেখিলাম। একটি কক্ষের প্রাচীরে এক বৃহৎ তৈলচিত্রে কি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! ইনি মহারাজার মৃতা রাণী লক্ষ্মীবাই। এই চিত্রখানির প্রতি আমরা বহুক্ষণ নিমেষশূন্য চিত্রবৎ চাহিয়া ছিলাম। চিত্রখানি মানুষের বলিয়া ত বোধ হইল না। কি মুখ, কি চোক্, কি শরীরের দীর্ঘগঠন, কি চম্পককোরক-নিভ বর্ণ, কি অতুলনীয়া অঙ্গভঙ্গি, কিছুই যেন মানুষের বলিয়া বোধ হইল না। আমাদের বোধ হইল, যেন একটি রূপের স্বপ্ন দেখিতেছি। মহারাষ্ট্রীয় বেশে চিত্রময়ী ভূষিতা। সম্মুখের কুঞ্চিত কোঁচাগ্র, সম্মুখ হইতে বঙ্কিমভাবে পদ মধ্য দিয়া অসাবধানে পশ্চাৎ দিকে পড়িয়া কি শোভারই বিকাশ করিতেছে। জয়পুরের আয় ৬০ লক্ষ, যোধপুরের ৪০ লক্ষ, এবং বরদা ১॥ ক্রোর! যদি বিধাতা আমাকে বলিতেন, তুমি এ সুন্দরীকে চাহ, কি বরদার সিংহাসন চাহ, আমি অম্লানবদনে এই পার্থিব রাজ্য না চাহিয়া, এই অপার্থিব রূপরাজ্য ভিক্ষা চাহিতাম। ভৃত্যেরা বলিল, চিত্রে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই। তাহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। আবার যেমন রূপ, তেমনই মন, তেমনই হৃদয়। ভৃত্যগণ এখনো তাঁহার জন্যে হাহাকার করিতেছে। তিনি একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। শিশুটিরও তৈলচিত্র অন্য কক্ষে দেখিলাম। যদিও মার সম্পূর্ণ রূপ পায় নাই, তথাপি মরি! মরি! কি রূপ! শিশু ত নহে, যেন একটি স্বর্গীয় কুসুমকোরক! কক্ষান্তরে মহারাজার বর্ত্তমান মহিষীর একখানি অসম্পূর্ণ তৈলচিত্র দেখিলাম। তিনিও কিছু কুৎসিতা নহেন। তথাপি, এই মোহিনীর ছায়াতে তাঁহাকে কি কুৎসিতই দেখাইল। ভৃত্যেরাও আমাদের

শিশুপুত্রের মুখখানি দেখিয়া, মহারাজা যে কি প্রকারে দ্বিতীয় রমণীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, আমি ত বুঝিতে পারি না। কর্ম্মচারীরা বলিলেন, রাজকার্য্যে অধিক পরিশ্রম নিবন্ধন গাইকোয়ারের শিরোরোগ হইয়াছে। তাই তিনি বারম্বার ইউরোপে ও শৈলে শৈলে এমন করিয়া বেড়াইতেছেন। মধ্যে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, তিনি উন্মত্ত হইয়াছেন। আমার মতে, কার্য্যাধিক্য ইহার কারণ নয় এই স্ত্রীবিয়োগই ইহার কারণ।

কিন্তু এ হেন ইন্দ্রপুরীতেও মহারাজার সাধ মিটিল না। আর একটি কি অপূর্ব্ব রাজবাটীই প্রস্তুত হইতেছে! ইহাতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ হইতে আরও ২৫ লক্ষ লাগিবে। যে ইহার কল্পনা করিয়াছিল, সে এক জন অদ্ভুত কবি। ময়দানব তাহার শিষ্য হইবার যোগ্য নহে। আমি ইহার কি বর্ণনা করিব। প্রথম একটি প্রকাণ্ড ত্রিতল উচ্চ হল। তাহার পর প্রাঙ্গণ বেষ্টিয়া গাইকোয়ারের বহির্মহল, তাহার পর অন্তঃপুরমহল। এই উভয় মহল, 'হলের' সমান উচ্চ, ত্রিতল। মহলে মহলে প্রাঙ্গণ বেষ্টিয়া অসংখ্য কক্ষ। এক একটি কক্ষ, এক একটি গৃহ বলিলেও চলে,—এত প্রশস্ত। চিতোরের 'কীর্ত্তিস্তম্ভে'র মত একটি স্তম্ভ, ত্রিতল ভেদ করিয়া গগনমার্গে উঠিয়া কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। স্তম্ভটি দশ কি দ্বাদশ তল। তবে, চিতোরের তলায় তলায় মধ্য কক্ষে এক একটি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। এখানে স্তম্ভারোহী রমণীদিগের বসিবার জন্যে তাহা শূন্য রাখা হইয়াছে। বোধ করি, উপযোগী উপকরণে সজ্জিত হইবে। এই বৃহৎ অট্টালিকার সমস্ত কক্ষগুলি—এমন কি প্রবেশ পথ পর্য্যন্ত—সুবর্ণমিশ্রিত বর্ণে বিচিত্র কৌশলে চিত্রিত হইতেছে। বিলাত হইতে শিল্পকর আসিয়া, ইহার চতুর্দ্দিকে উদ্যান সৃষ্টি করিবে, এবং উপযোগী সজ্জা ও উপকরণ প্রস্তুত করিবে। কাণ্ডখানা কি বুঝিতে পারিলে কি? এই রাজবাটীর নাম "লক্ষ্মীমহল"। কিন্তু যে লক্ষ্মীর জন্যে এই অতুলনীয় পার্থিব স্বর্গ সৃষ্ট হইতেছিল, তিনি আজ কোথায়? প্রজারাও, তাঁহার স্মরণার্থ, নগর মধ্যে একটি 'ঘটিকাস্তম্ভ' প্রস্তুত করিয়াছে। আজ সেই লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে।

আদর্শ সমালোচনা।

ভক্তিভাজন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর আচার্য্য মহাশয় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থের নাম "চিন্তা।"

ভালই হইয়াছে। উক্ত ভক্তিভাজন শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি, তাঁহার হস্তাক্ষরের প্রতি ও তাঁহার টিকির প্রতি, আমাদের যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। রামশঙ্কর বাবু চিন্তাশীল, বিদ্বান ও ক্ষমতাশালী। এইরূপ কেহ কেহ বলে। তিনি আরও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমরা কিছু পড়িয়াছি,কিছু পড়ি নাই। যাহা পড়ি নাই, তাহা পাঠ করিবার উপযুক্ত হইলে অবশ্য পড়িতাম।

গ্রন্থের নাম দেখিতেছি, "চিন্তা।" প্রভাত, সায়াহ্ন অথবা নিশীথচিন্তা, কিছু লেখা নাই। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, রামশঙ্কর বাবু প্রভাতে, সায়ংকালে ও নিশীথসময়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সমূহ ভাবনার বিষয়, এবং আমরা এইস্থলে রামশঙ্কর বাবুর আত্মীয় স্বজনকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। দিবারাত্রি চিন্তা করিলে মস্তিষ্কের দোষ জন্মিবার সম্ভাবনা। সাহিত্যসংসার হইতে রামশঙ্কর বাবু বাতুলালয়ে প্রেরিত হন, আমাদের সে ইচ্ছা নাই, এবং সে বিষয়ে তাঁহার আত্মীয়দিগেরও যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। যেমন আহার ও নিদ্রার একটা নির্দ্ধারিত সময় আছে, সেইরূপ চিন্তারও একটা নির্দ্ধারিত সময় থাকা আবশ্যক।

রামশঙ্কর বাবুর প্রতি, তাঁহার হস্তাক্ষরের প্রতি ও তাঁহার টিকির প্রতি, আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকিলেও, তাঁহার কোন কথা আমরা প্রমাণাভাবে স্বীকার করিতে পারি না। তিনি যখন এই গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, তখন বোধ হয় তাঁহার স্মরণ ছিল না যে, আমরা ইহার সমালোচনা করিব। তাহা হইলে তিনি এরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না। ভবিষ্যতে এই কথা স্মরণ রাখিলে অনেক উপকার হইতে পারে। কোন কথার বিচার না করিয়া মানিয়া লওয়া আমাদের স্বভাব নহে। তর্ক করিতে না পারিলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কি? আমরা একবার বজরায় করিয়া বেড়াইতে যাইতেছিলাম, নবদ্বীপের ন্যায়শাস্ত্রের টোলের বাতাস আমাদিগের গায়ে লাগিয়াছিল।

পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলাম। কুম্ভীরশাবক যেরূপ অণ্ড হইতে নির্গত হই-য়াই স্বতঃ সন্তরণ করিয়া থাকে, তর্কশাস্ত্রে আমরাও সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ।

শ্রদ্ধাস্পদ রামশঙ্কর বাবু লিখিয়াছেন, সমুদ্রের জল লবণাক্ত। হইতে পারে; সমুদ্রের জল লবণাক্ত, এ কথা আমরাও শুনিয়াছি। কিন্তু শোনা এক, বিশ্বাস করা আর। সমুদ্রের জল কেমন করিয়া লবণাক্ত হইল, কত দিন হইতে এরূপ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। আজকালকার দিনে প্রমাণ ব্যতীত কোন কথা লোকে গ্রহণ করিবে, লেখক মহাশয়ের যদি এরূপ ধারণা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রম। সমুদ্রের জল লবণাক্ত কেন হইল, কোথা হইতে সমুদ্রে লবণ আইসে, ইচ্ছা করিলে এ সকল বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ ও প্রচুর তর্ক সংগ্রহ করা যাইতে পারে। লেখক মহাশয় তাহার কিছুই করেন নাই। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তিনি পরিশ্রম করিতে পারেন না, যাহা লেখেন, পাঠকদিগকে তাহা বুঝাইতে পারেন না। তিনি লিখিয়াছেন বলিয়াই যে কোন কথা বিনা তর্কে ও বিনা প্রমাণে মানিয়া লইতে হইবে, এমন কোন কথাই নাই। আমরা স্বাধীনচেতা, বিজ্ঞানবাদী, সূক্ষ্মদর্শী, আমাদের নিকট বুজরুগি চলিবে না। যিনি প্রমাণ প্রয়োগে অপটু, তাঁহার পক্ষে গ্রন্থরচনা বিড়ম্বনা।

আর এক স্থলে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য মহাশয় লিখিতেছেন যে,শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ আছে ও শারীরিক প্রবৃত্তি সংযমিত করিলে মন সংযত হয়। লেখার ভাবে বোধ হয়, আচার্য্য মহাশয় দর্শন শাস্ত্রের সূত্র লিখিতেছেন। কিন্তু তাঁহার টীকাকার কোথায়? তিনি কি মনে করিয়াছেন, মূল পাঠ লিখিবেন তিনি, আর টীকা করিব আমরা? এমন ধৃষ্টতা ত কখন দেখি নাই! শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ আছে, এ কথাটা স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ রামশঙ্কর বাবু এ কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত হইলেও যে তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে হইবে, আমাদের এমন বিবেচনা হয় না। এ কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি কি বলিয়াছেন? কিছুই না। অতএব তাঁহার কথা অগ্রাহ্য। যদি দুই একটা প্রমাণ দেখাইতে পারিতেন, তাহা হইলেও না হয় তাঁহার কথায় একবার বিশ্বাস করা যাইত। নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই আচার্য্য মহাশয় এ কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। তাঁহার শরীর ত আছেই; বিনা প্রমাণে এ কথা স্বীকার

গ্রন্থ কিছু ন্যূন হইলে কোন ক্ষতি ছিল না। তাঁহার মনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এরূপ স্থূল ও অমোঘ প্রমাণ নাই। কিন্তু তিনি চিন্তা করিয়া থাকেন, এবং সেই চিন্তার ফলস্বরূপ এই গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার শরীরের সহিত মনের কিরূপ সম্বন্ধ জানিতে পারিলে তাঁহার কথার যাথার্থ্য বিবেচনা করা যাইত। চিন্তা ত করেন অনেক রকম দেখিতেছি। মনের অবস্থাভেদে তাঁহার শরীরের অবস্থার কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় কি না? রাত্রে যখন চিন্তা করেন, তখন তাঁহার ভূতের ভয় হয় কি না, ও তাঁহার শরীরে কাঁটা দেয় কি না? স্বদেশের বিষয়ে যখন তিনি চিন্তা করেন তখন তাঁহার শোণিত উষ্ণ হয় কিনা, এবং অন্যান্য জাতি কিরূপ রক্তপাত শরীরপাত করিয়া স্বদেশের গৌরব রক্ষা করে, স্মরণ করিলে তাঁহার শোণিত শীতল হইয়া যায় কি না? এবং প্রিয়জনবিরহে যখন তাঁহার মন কেমন কেমন করে, তখন তাঁহার গা কেমন কেমন করিয়া বমন আসে কি না?

আজ কাল দেখিতে পাই, কেহ কেহ লিখিতে বসিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এরূপ অন্ধ অনুরাগে লাভ ত কিছুই নাই, ক্ষতি যথেষ্ট আছে। ইহাতে সত্যের প্রতি অনাদর প্রকাশ পায়। সমুদয় সত্য বিজ্ঞানে নিহিত আছে। বিজ্ঞান কি বলে? না আমরা অধম, নীচ, মূর্খ, অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। সকলের প্রতি এ কথা প্রয়োগ করা যায় না। আমাদের দেশে দুই চারি জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা সাধারণ্যে পরিচিত, অতএব তাঁহাদের নামোল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।

শ্রদ্ধাস্পদ রামশঙ্কর আচার্য্য মহাশয়, প্রবীণতা ও চিন্তাশীলতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের হাসি পায়। তিনি স্বয়ং অশিক্ষিত হইয়াও শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হইবার প্রয়াসী হইয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহার মস্তকে পদার্পণ করিতেছি।

কালিদাস ও সেক্ষপীয়র।

(২)

(কালিদাস)

কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী সৌন্দর্য্যদৃষ্টি। এ কথার অর্থ কি ?

প্রথম বুঝিতে হইবে, সৌন্দর্য্য কি, সুন্দর কে? জগৎ অনন্ত, সীমাহীন; সৃষ্টি অশেষ বৈচিত্র্যময়ী। জগতে কি সকলই সুন্দর? দাব-দগ্ধ অরণ্যানী, বাত্যাবিকট অশনিনির্ঘোষ, জীর্ণ ভগ্ন পর্ণকুটীর, ইহারা কি সুন্দর? কুৎসিত মর্কটশিশু, পশু-মানব কালিবন (Tempest), শ্মশ্রু-জটিল পিশাচিনী, ইহারা কি সুন্দর? অতএব, সাকার জগতে সকলই সুন্দর নহে। নিরাকার জগতেই কি সকলই সুন্দর? দানব ইয়াগো (Othello), দানবী রিগণ (Lear), ইহারা কি সুন্দর? শকারের আত্মম্ভরিতা (মৃচ্ছকটিক) সয়তানের দেবদ্বেষ (Paradise lost), চার্ব্বাকের নাস্তিকতা, হব্‌সের স্বার্থবাদ, ইহারা কি সুন্দর? নিরাকার জগতেও সকলই সুন্দর নহে। তবে কে সুন্দর? তুষারমণ্ডিত গিরিচূড়া, পাদপসঙ্কুল গহনবন, কলনিনাদিনী নগ-নদী, কুমুদ-কহ্লারকমলশোভী সরোবর, ইহারা সুন্দর। অরুণরাগলোহিত বাল-তপন, কৌমুদীপ্রভাদীপ্ত নীলাকাশ, গগনবিহারী মলয় পবন, পত্রপুষ্পখচিত বসন্ত-লক্ষ্মী, ইহারা সুন্দর। যেখানে অভ্রভেদী প্রাসাদমালা মণিময় মস্তক তুলিয়া আকাশ স্পর্দ্ধা করে, যেখানে রমণীর নূপুরনিক্কণের সহিত সারসের মধুর কল-ধ্বনি মিশিয়া মধুরতর হয়, যেখানে কমলামোদবাহী গন্ধবহ ধীরে বহিয়া বির-হীর আতপতাপ নিবারণ করে, সেই পৃথিবীস্বর্গ উজ্জয়িনী সুন্দর; উগ্রপবন-বেগে সংক্ষুব্ধ মেঘখণ্ডের ন্যায় যথায় প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বিক্ষিপ্ত হইয়া রয়, যথায় মণিময় জীর্ণ দেবভবন হিংস্র বন্য পশুর আবাসভূমি হয়, যথায় শত শতাব্দীর অতীত সমৃদ্ধি পৃথিবীর মাটিতে মুখ লুকাইয়া রয়, সেই ইন্দ্রপ্রস্থ সুন্দর। যাহার বিবৃত মুখ হইতে অর্দ্ধভক্ষিত শষ্পাঙ্কুর ঝরিয়া পড়ে, শরাঘাত-ভয়ে দীর্ঘায়ত দেহ আকুঞ্চিত হয়, সেই "গ্রীবাভঙ্গাভিরাম", প্রাণভয়ে ধাবমান হরিণশিশু সুন্দর। ভস্মলাঞ্ছিত ললিত মধুর বীর অঙ্গে ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া মূর্ত্তি-

লব সুন্দর। যক্ষবনিতার প্রিয়ঙ্গুলতার ন্যায় অঙ্গসৌকুমার্য্য, চকিত হরিণী-প্রেক্ষণের ন্যায় অক্ষিপাত, শশধরের ন্যায় মুখশোভা, ময়ূরীর পুচ্ছভারের ন্যায় কেশকলাপ, পবনতাড়িত নদীর ক্ষুদ্র তরঙ্গহিল্লোলের ন্যায় ভ্রূবিলাস; যক্ষ বনিতার রূপ সুন্দর। ইহা গেল সাকার জগতের কথা। নিরাকার জগতেও এইরূপ। পলিতকেশ, বিকৃতমস্তক, নির্য্যাতনতৎপর, ধর্ম্মজ্ঞান-বিরহিত, নির্ব্বাসনকারী উন্মাদ পিতার রোগে শুশ্রূষা, স্বাস্থ্যে সান্ত্বনা, বিপদে প্রাণপাত করিয়া, কর্‌ডিলিয়া চরিত্র সুন্দর।* পিতার স্নেহ, জননীর আদর, প্রজার প্রসক্তি, অতুল বৈভব, অপার রাজভোগ, ধরণীর মুকুট ছাড়িয়া রামচরিত্র সুন্দর। যাহার কামকল্পিত শঠতায় জীবনের নন্দনবন মরুভূমি হইয়াছে, সতীসাধ্বী প্রাণের প্রণয়িনী ঈর্ষ্যা-দানবীর বলিস্বরূপ হইয়াছে, সুখ-স্বপ্নময় মধুর ধরা নরকের কাল অন্ধকারে বিলীন হইয়াছে, প্রতিদ্বন্দী দেশ-বৈরী পদানত শত্রুর পতি পস্‌থুমাসের (Cymbeline) ক্ষমাভাব সুন্দর। চিন্তাজাগরণে শরীর কৃশ হইয়াছে, উষ্ণ বিরহনিশ্বাসে অধর শুষ্ক হইয়াছে, বর্ষাজলতাড়িত তটভূমির মত মিলনাশা একে একে অন্তর্হিত হইয়াছে; বেশরচনায় আর স্পৃহা নাই, জগতের সুখে আর শান্তি নাই, প্রিয়তমার চিত্রপ্রতিকৃতিতে আর সান্ত্বনা নাই, বিধুর দুষ্মন্তের এই বিরহভাব সুন্দর। নীলাকাশের দীপ্ত তারকায়, অস্তোন্মুখ সূর্য্যের অরুণ কিরণমালায়, সঞ্চরণশীল মেঘবিতানে, গগনবিহারী বিহগগানে, সচল সাগরে, অচল ভূধরে, তরুলতার ফলে ফুলে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে, সর্ব্বত্র ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) যে এক মহাশক্তির চিন্ময় বিকাশ দেখিতেন, যাহার সত্তায় জীব ও জড়জগৎ সত্তাবান্, যাহার অমর কল্পনাসঙ্গীতে তাঁহার কবিতা প্রতিধ্বনিময়, সেই মহাশক্তি সুন্দর। গীতার মহাধ্যায়ে অর্জ্জুন আদি-অন্ত-মধ্য-হীন চরাচর বিশ্বব্যাপী যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, যাঁহার অনন্ত বদন, অনন্ত নয়ন, অনন্ত বাহু, অনন্ত উরু, যাঁহার দীপ্তি কোটীসূর্য্যপ্রভ, যাঁহার স্থিতি ত্রিকাল-ব্যাপী, দেব দৈত্য নর নাগ যাঁহার ভগ্নাংশে অন্তর্ভূত, প্রলয় সংক্ষুব্ধ যাঁহার বিশ্বোদরে, দংষ্ট্রা করাল যাঁহার কোটিমুখে, মুষ্টিমেয় কৌরবসেনা অদর্শন হইয়াছিল—নদীর প্রবাহনিচয় যেরূপ সাগরে অদর্শন হয়, চঞ্চল পতঙ্গনিচয় যেরূপ অনলে অদর্শন হয়, সেই বিশ্বরূপ সনাতন পুরুষ সুন্দর।

ইহারা সুন্দর। কিন্তু কেন সুন্দর? সৌন্দর্য্য কি? যাহাতে রূপেন্দ্রিয়-

ঐ বৃত্তির অনুভবই সৌন্দর্য্য। কথাটা একটু বুঝিয়া দেখা যাউক। ইন্দ্রিয় অর্থে জ্ঞানের সাধন। চক্ষুঃ দ্বারা রূপ জ্ঞান হয়, অতএব চক্ষুঃ ইন্দ্রিয়। কর্ণের দ্বারা শব্দ জ্ঞান হয়,অতএব কর্ণ ইন্দ্রিয়। এইরূপ নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্। মনের দ্বারা সুখ দুঃখ, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মানস বিকারের জ্ঞান হয়, অতএব মনও ইন্দ্রিয়। এইরূপ,বুদ্ধি সত্য জ্ঞানের সাধন—বুদ্ধি দ্বারা আমরা সত্যাসত্য নির্ণয় করি, যুক্তি তর্ক বিচার করি, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, জ্যামিতির তত্ত্ব উপলব্ধি করি; অতএব বুদ্ধি সত্যেন্দ্রিয়। বিবেক, নীতিজ্ঞানের সাধন, বিবেক দ্বারা আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করি, কি পাপ কি পুণ্য, ইহার নিশ্চয় করি,উচিত অনুচিত, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের তত্ত্ব উপলব্ধি করি, অতএব বিবেক ধর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়, মন অন্তরিন্দ্রিয়, বুদ্ধি সত্যেন্দ্রিয়, আর বিবেক ধর্ম্মেন্দ্রিয়। সকল কয়টিই ইন্দ্রিয়, সকল কয়টিই জ্ঞানের সাধন। চক্ষুরাদি দ্বারা বহির্জগতের জ্ঞান হয়, মনের দ্বারা অন্তর্জগতের জ্ঞান হয়, বুদ্ধি দ্বারা বৌদ্ধজগতের (Intellectual) জ্ঞান হয়, এবং বিবেক দ্বারা অধ্যাত্মজগতের জ্ঞান হয়। কিন্তু সৌন্দর্য্য কোন্ জগতের অন্তর্ভূত? বহির্ অন্তর্, বৌদ্ধ ও অধ্যাত্ম, এই চারি জগতের কোন্ জগতের অন্তর্ভূত? এই চারি বই ত আর জগতের ভেদ নাই। সৌন্দর্য্য যদি ইহাদের অন্তর্ভূত না হয়, তবে সে জগৎছাড়া, সৃষ্টিছাড়া। না, সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব সকল জগতেই অনুভূত হয়, সৌন্দর্য্যের সত্তা সকল জগতেই পূর্ণমাত্রায় দেদীপ্যমান। কি বহির্ কি অন্তর্, কি বৌদ্ধ, কি অধ্যাত্ম,সুন্দর নাই কোন্ জগতে? তবে সুন্দরের উপলব্ধি হয় কেমন করিয়া?

সৌন্দর্য্যের যে উপলব্ধি হয়, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ; অতএব সর্ব্ববাদিসম্মত। আর সৌন্দর্য্য যে রূপরসাদির ন্যায় বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, সুখদুঃখাদি মানসবিকারের ন্যায় অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে,সত্যাসত্যের ন্যায় সত্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের ন্যায় ধর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, ইহাও স্থিরসিদ্ধান্ত। অথচ সৌন্দর্য্যের জ্ঞান সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং এই জ্ঞানের সাধন—রূপেন্দ্রিয় অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। যেরূপ বহিরিন্দ্রিয়ের সংযোগে রূপাদির জ্ঞান হয়, অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযোগে সুখদুঃখাদির জ্ঞান হয়, সত্যেন্দ্রিয়ের সংযোগে সত্যাসত্যের জ্ঞান হয়, এবং ধর্ম্মেন্দ্রিয়ের সংযোগে ধর্ম্মাধর্ম্মের জ্ঞান হয়; সেইরূপ, রূপেন্দ্রিয়ের সংযোগে সৌন্দর্য্যের জ্ঞান হয়। রূপাদি সুখদুঃখাদি, সত্যাসত্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম,সৌন্দর্য্য, সকলই বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি, সুতরাং তাহাদের

ইন্দ্রিয় পাঁচটি সিদ্ধ হইল; কিন্তু জগতের ত চারিটি বই পাঁচটি বিভাগ নাই। বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ ও অধ্যাত্মজগৎ, এই ত চারিটি জগৎ। তবে সৌন্দর্য্যজগৎ কোন বিভাগের অন্তর্ভূত।

পূর্ব্বধৃত সৌন্দর্য্যের উদাহরণগুলি একবার স্মরণ করুন। গিরিচূড়া, গহনবন, নগনদী, সরোবর, বালতপন, নীলাকাশ, মলয়পবন, বসন্তলক্ষ্মী, উজ্জয়িনীর সমৃদ্ধি ও ইন্দ্রপ্রস্থের ভগ্নাবশেষ, ইহারা কি জড় বহির্জগতের অন্তর্ভূত নয়? অথচ ইহারা সুন্দর। এইরূপ গ্রীবাভঙ্গাভিরাম হরিণশিশু, কুবলয়দলশ্যাম বালক লব ও প্রকৃতির শোভায় শোভাময়ী যক্ষবনিতা, ইহারা কি চেতন বহির্জগতের অন্তর্ভূত নহে? অথচ ইহারা সুন্দর। এই জড় ও চেতন বহির্জগৎ মিলিয়া সাকার জগৎ। আর অন্তর্, বৌদ্ধ ও অধ্যাত্ম, এই অপর তিন জগৎ মিলিয়া নিরাকার জগৎ। আবার উদাহরণ স্মরণ করুন। পদানত শত্রুর প্রতি ক্ষমাভাব এবং বিধুর দুষ্মন্তের বিরহভাব, ইহারা কি অন্তর্জগতের অন্তর্ভূত নহে? অথচ ইহারা সুন্দর। এইরূপ ওযার্ডস্ওয়ার্থের বিশ্বময়ী চিন্ময়ী মহাশক্তি ও গীতার চরাচরব্যাপী বিশ্বরূপ সনাতন পুরুষ, ইহারা কি বৌদ্ধজগতের অন্তর্ভূত নহে? অথচ ইহারা সুন্দর। আবার, দেবীমানবী কার্ডিলিয়া-চিত্র ও নরনারায়ণ রামচরিত্র, ইহারা কি অধ্যাত্মজগতের অন্তর্ভূত নহে? অথচ ইহারা সুন্দর।

আবার দেখুন। দাবদগ্ধ অরণ্যানী, বিকট বজ্রনির্ঘোষ, জীর্ণভগ্ন পর্ণকুটীর, ইহারা জড় বহির্জগতের অন্তর্ভূত, কিন্তু সুন্দর নহে। মর্কটশিশু, কালিবন, পিশাচিনী, ইহারা চেতন বহির্জগতের অন্তর্ভূত, কিন্তু সুন্দর নহে। এইরূপ শকারের আত্মম্ভরিতা ও সয়তানের দেবদ্বেষ অন্তর্জগতের অন্তর্ভূত, কিন্তু সুন্দর নহে। চার্ব্বাকের নাস্তিকতা ও হব্সের স্বার্থবাদ, বৌদ্ধজগতের অন্তর্ভূত, কিন্তু সুন্দর নহে। আবার দানব ইয়াগো ও দানবী রিগণ, অধ্যাত্মজগতের অন্তর্ভূত, কিন্তু সুন্দর নহে। অতএব আমরা দেখিলাম, যাহাই সুন্দর, তাহাই বহির্জগৎ, কিম্বা অন্তর্জগৎ, কিম্বা বৌদ্ধজগৎ, কিম্বা অধ্যাত্মজগতের অন্তর্ভূত; কি যাহাই বহির্, অন্তর্, বৌদ্ধ বা অধ্যাত্মজগতের অন্তর্ভূত, তাহাই সুন্দর নহে। অর্থাৎ, এই চারি জগতের কতক অংশ সুন্দর ও কতক অংশ অসুন্দর। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, রূপেন্দ্রিয়ই সৌন্দর্য্যজ্ঞানের সাধন। রূপেন্দ্রিয়ের সংযোগেই সৌন্দর্য্য জ্ঞান হয়। অর্থাৎ বহির অন্তর

রূপেন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্ভব হয়, তাহাই সুন্দর—বহির্ অন্তর্ বৌদ্ধ অধ্যাত্ম, যে জগতেরই অন্তর্ভূত হউক, ঐ পদার্থই সুন্দর ; আর ঐ পদার্থ ও রূপেন্দ্রিয়-সংযোগে যে মানসিক বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি—তাহাই সৌন্দর্য্য। এখন আমরা পূর্ব্বকৃত সুন্দর লক্ষণ বুঝিব। "যাহাতে রূপেন্দ্রিয়-সংযোগে আমাদের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি উদ্রিক্ত হয়, তাহাই সুন্দর।"

অতএব আমরা দেখিলাম, কতক স্থলে একই পদার্থ বহির্জগৎ ও সৌন্দর্য্য-জগতের অংশভূত ; একই পদার্থ অন্তর্জগৎ ও সৌন্দর্য্যজগতের অংশভূত ; একই পদার্থ বৌদ্ধজগৎ ও সৌন্দর্য্যজগতের অংশভূত ; একই পদার্থ অধ্যাত্ম-জগৎ ও সৌন্দর্য্যজগতের অংশভূত। অর্থাৎ, কতক স্থলে যাহাই জড়, তাহাই সুন্দর ; যাহাই মানস, তাহাই সুন্দর ; যাহাই সত্য, তাহাই সুন্দর ;* যাহাই ধর্ম্ম, তাহাই সুন্দর। ইহা বড় বিচিত্রও নহে। একই পদার্থের দ্বৈতভাব (Duality), ইহার দৃষ্টান্ত অন্যত্রও পাওয়া যায়। দেখুন, একই নরসিংহ, একদিক্ হইতে দেখিলে নর, অন্যদিক্ হইতে দেখিলে সিংহ। এইরূপ একই ব্রহ্ম মায়ামুক্ত হইয়া পরিণামীরূপে সাকার জড়জগৎ, এবং মায়ামুক্ত হইয়া চিদাভাসরূপে নিরাকার অধ্যাত্মজগৎ। অতএব, একই পদার্থ বহির্ অন্তর্ সত্য ও ধর্ম্মেন্দ্রিয়সংযোগে, যথাক্রমে রূপাদি, সুখাদি, সত্য ও ধর্ম্ম ; কিন্তু রূপেন্দ্রিয়সংযোগে সেই পদার্থই সৌন্দর্য্য। বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়, সত্যেন্দ্রিয়, ধর্ম্মেন্দ্রিয়, রূপেন্দ্রিয়, প্রত্যেকই আত্মার এক একটি শক্তি। আত্মা এই পঞ্চশক্তিসমন্বিত হইলেও এক বই দুই নহে ; কিন্তু প্রতি ইন্দ্রিয়ের সহকারে এক একটি বিভিন্ন জগৎ উপলব্ধি করে—বহিঃ অন্তর্ সত্য ধর্ম্ম ও রূপেন্দ্রিয় সহকারে, যথাক্রমে বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধ জগৎ,অধ্যাত্মজগৎ ও সৌন্দর্য্যজগৎ।

ইন্দ্রিয় আত্মার শক্তিবিশেষ। শক্তিমাত্রেরই ক্ষুদ্রত্ব মহত্ত্ব পরিমাণভেদে ভেদকল্পিত হয়। ইন্দ্রিয়শক্তিরও এইরূপ। সকলের সকল ইন্দ্রিয়শক্তি সমান তীক্ষ্ণ নহে। প্রথম বহিরিন্দ্রিয়ের কথা ধরা যাউক। চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্, এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয়, সকল জীবেই সমান ভাবে বর্ত্তমান আছে ; কিন্তু সকলে সমান শক্তিশালী নহে। আমি হয় ত শত হস্ত দূরে দেখিতে পাইব না ; কিন্তু বাজপক্ষী আকাশে উড়িয়া এক ক্রোশ দূরে শিকার খুঁজিয়া

* ইংরাজ কবি কীট্স্ এই তত্ত্বের কতক আভাষ পাইয়া লিখিয়াছেন,—"Beauty is tru

লইবে। তুমি হয় ত বন্য পশুর পদচিহ্ন অনুভব করিতে পারিবে না; কিন্তু কুক্কুর তাহার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া নাসা কুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিবে। তিনি হয় ত সঙ্গীত শুনিয়া বিরক্তিতে মুখ ফিরাইবেন; কিন্তু হরিণী বংশিধ্বনিতে আপনা হারাইয়া ব্যাধের জালাবদ্ধ হইবে। এইরূপ অন্যত্র এ সকল স্থলেই শক্তির তারতম্যই কারণ; কাহারও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবল, কাহারও দুর্ব্বল। অন্যজাতীয় ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। শুনিয়াছি, যূথিকাশয্যায় শুইয়া এক সুন্দরীর গোলাপপাপ্‌ড়ীর পেষণে দুঃখানুভব হইয়াছিল; অথচ শ্রমকঠোর মানুষলোক ছাড়িয়া, আবেশময় পরীস্থানে যাইয়া, বটমের (Midsummer night's dream) খেয়ালে আসে নাই। ইহা আর কিছু নয়, অন্তরিন্দ্রিয়শক্তির তারতম্য।

এইরূপ অশিক্ষিত বালক পাসকাল্ (Pascal) অমার্জ্জিত বুদ্ধি বলে কত গণিততত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন; কিন্তু শত গুরুর তাড়নায় আজিও আমি একটা জ্যামিতির কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। ইহা সত্যেন্দ্রিয়ের তারতম্য বই আর কি? আবার দেখুন; শিশু প্রহ্লাদ, বিষ্ণুদ্বেষী পিতার পুত্র, দিক্‌হস্তিপদতলে, অপার জলধিজলে, হুতাশনের তীব্র দহনে ও কালসর্পের তীক্ষ্ণ দংশনে মধুর হরিনাম গাহিত, কিন্তু কত পাষণ্ড ধর্ম্মসমাজে লালিত হইয়া ঈশ্বরের নাম উচ্চারণে বৃশ্চিকযন্ত্রণা অনুভব করে। ইহার কারণ ধর্ম্মেন্দ্রিয়ের তারতম্য বই আর কিছুই নহে। এইরূপ রূপেন্দ্রিয়ও শক্তিবিশেষ; জীবভেদে ইহারও তারমত্য অবশ্যই আছে। কবি পোপ ঈশ্বরসৃষ্ট জগতে কেবল বাক্‌ছল ও অর্থবিন্যাসের উপাদান দেখিতেন; কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সেই জগতে চিন্ময়ী মহাশক্তির বৈচিত্র্যময় ক্রীড়া দেখিতেন। ইহাও সেই ইন্দ্রিয়শক্তির তারতম্য।

এই তারতম্য আবার প্রকৃতি ও অনুশীলনসাপেক্ষ। প্রকৃতি মুখ্য, অনুশীলন গৌণ। শতশিক্ষায়ও বোধ হয় তুমি রাসভকে সঙ্গীতের মোহিনী বুঝাইতে পারিবে না। কিন্তু অনুশীলনও নিরর্থক নহে। অসভ্যের অপেক্ষা সভ্যের, অশিক্ষিতের অপেক্ষা শিক্ষিতের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত।

ইন্দ্রিয়শক্তির তারতম্যফলে, আমরা দেখিতেছি যে, যে পদার্থ আমি রূপ বলিয়া উপলব্ধি করি না, বাজপক্ষী তাহা করে, যাহাকে তুমি গন্ধ বলিয়া উপলব্ধি কর না, কুক্কুরে তাহা করে। যাহাকে বটম সুখ দুঃখ বলিয়া উপলব্ধি করে না, পুষ্পশয্যা-শায়িতা সুন্দরী তাহা করে।

বলিয়া উপলব্ধি করে না, ধীমান তাহা করে। যাহাকে পাষণ্ড ধর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি করেন না, প্রহ্লাদ তাহা করেন। যাহাকে পোপ সুন্দর বলিয়া উপলব্ধি করেন না, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাহা করেন। আমরা আরও দেখিয়াছি, এই উপলব্ধির ইতরবিশেষ, প্রকৃতি ও অনুশীলন সাপেক্ষ। এখানে একটা সন্দেহ উঠিতে পারে যে, রূপ রস, সুখ দুঃখ, সত্য অসত্য, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, সুন্দর অসুন্দর, এই ভেদ হয় ত ইন্দ্রিয়শক্তির প্রবলতা দুর্ব্বলতা সাপেক্ষ। হয় ত সম্যক্ স্ফূর্ত্ত ইন্দ্রিয়ের পক্ষে রস ও রূপ, দুঃখ ও সুখ, অসত্য ও সত্য, অধর্ম্ম ও ধর্ম্ম, অসুন্দর ও সুন্দর। হয় ত ইহাদের ভেদ কাল্পনিক। এ আশঙ্কা অমূলক। যে হেতু চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যতই কেন স্ফূর্ত্তি হউক না, তাহাতে রূপ বই রসের জ্ঞান হইবে না। রসনেন্দ্রিয়ের যতই কেন স্ফূর্ত্তি হউক না, তাহাতে রস বই গন্ধের জ্ঞান হইবে না। এইরূপ অন্যত্র। অন্তরিন্দ্রিয়ের যতই কেন স্ফূর্ত্তি হউক, তাহাতে সুখ দুঃখ বলিয়া বোধ হইবে না। সত্যেন্দ্রিয়ের যতই স্ফূর্ত্তি হউক, তাহাতে অসত্য সত্য হইবে না। ধর্ম্মেন্দ্রিয়ের যতই স্ফূর্ত্তি হউক, তাহাতে অধর্ম্ম ধর্ম্ম হইবে না। আর রূপেন্দ্রিয় যতই স্ফূর্ত্ত হউক, তাহাতে অসুন্দর হইবে না। অতএব দাবদগ্ধ অরণ্য, বাত্যা-বিকট অশনিনির্ঘোষ, পশু-মানব কালিবন; আত্মম্ভরিতা, দেবদ্বেষ; নাস্তি-কতা, স্বার্থবাদ; ইয়াগো, রিগন; ইহারা অসুন্দর বই কিছুতেই সুন্দর হইবে না। বরং রূপেন্দ্রিয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তিতে ইহাদের অসুন্দরত্ব আরও অসুন্দর হইবে। তাই বলিতেছিলাম, আশঙ্কা অমূলক।

আমরা এ অবধি আলোচনা করিয়া এই কয়টি কথা পাইলাম। আত্মা ইন্দ্রিয়শক্তির আধার। এই ইন্দ্রিয়শক্তি বহির্ অন্তর্ সত্য ধর্ম্ম ও রূপ ভেদে পঞ্চবিধ। এক একটির সহকারে আত্মা যথাক্রমে বহির্জগৎ, অন্ত-র্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ, অধ্যাত্মজগৎ ও সৌন্দর্য্যজগৎ উপলব্ধি করে। এই সৌন্দর্য্যজগতের আর চারি জগৎ হইতে বিভিন্ন সত্তা নাই; কিন্তু ঐ জগৎ আর চারি জগতের অন্তর্ভূত। একই পদার্থ বহিরিন্দ্রিয়সংযোগে বহির্জগৎ, আবার রূপেন্দ্রিয় সংযোগে ঐ পদার্থই সৌন্দর্য্য জগৎ। পদার্থের এই দ্বৈত-ভাণ অবশ্যই স্বীকার্য্য। আর জগতে সকল পদার্থই সুন্দর নহে। সকল পদার্থই সুন্দর নহে, কেহ সুন্দর, কেহ অসুন্দর। যাহা রূপেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, রূপে-ন্দ্রিয়ের প্রিয়, তাহাই সুন্দর, যাহা অগ্রাহ্য অপ্রিয়, তাহাই অসুন্দর। সুন্দর

এই রূপেন্দ্রিয়ের আবার প্রকৃতি ও অনুশীলনবশে তারতম্য দৃষ্ট হয়। কোন জীবে ইহার শক্তি প্রবল, কোন জীবে দুর্ব্বল। যাহার রূপেন্দ্রিয়ের যত তীক্ষ্ণতা, সৌন্দর্য্যজগতের তত বেশী অংশ তাহার উপলব্ধি হয়। সুতরাং যাহা তুমি আমি সুন্দর বলিয়া অনুভব করি না, সে প্রবল ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যে তাহার সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। অতএব, সৌন্দর্য্যজগতের পরিমাণের তারতম্য, রূপেন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তির তারতম্যসাপেক্ষ। যদি ঐ ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ বিকাশ হয়, তাহার সাক্ষাতে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইবে।

কিন্তু মানুষে এই শক্তিবিকাশের, এই ইন্দ্রিয়স্ফূর্ত্তির একটা সীমা আছে; বিকাশ, স্ফূর্ত্তি ঐ সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। তুমি চক্ষুর যতই অনুশীলন কর, কিছুতেই শত যোজন দূরে দেখিতে পাইবে না। তুমি কর্ণের যতই অনুশীলন কর, কিছুতেই সূক্ষ্মতর গীতাংশ শুনিতে পাইবে না। এইরূপই যতই বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত কর, ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে না। অতএব, সকল ইন্দ্রিয়স্ফূর্ত্তিরই একটা সীমা আছে, মানুষে তাহার অতিক্রম করিতে পারে না। তবে মানুষ যদি মনুষ্যত্ব অতিক্রম করিতে পারে, মানব যদি দেবমানব হইতে পারে, তবে এই সীমানা-বিচার থাকে না। তখন চক্ষুর দূর-নিকট বিচার থাকে না, কর্ণের সূক্ষ্ম স্থূল বিচার থাকে না, বুদ্ধির ঈশ্বর-অনীশ্বর বিচার থাকে না; দূরত্ব, সূক্ষ্মত্ব, ঈশ্বরত্ব, সকলই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। এক ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, অন্য ইন্দ্রিয়সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। বুদ্ধিসম্বন্ধে যে কথা প্রযুজ্য, রূপেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযুজ্য। অর্থাৎ রূপেন্দ্রিয়ের শক্তিও সীমাবদ্ধ। ইহারও বিকাশস্ফূর্ত্তির সীমানা আছে, যাহা সাধারণ মানুষ অতিক্রম করিতে পারে না। যাহারা পারে, তাহারা মানুষ নয় অমানুষ, দেবমানব! তাহাদের সাক্ষাতে যেন সমগ্র সৌন্দর্য্যজগৎ অবভাত হয়, যেন, বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ ও অধ্যাত্মজগৎ, আপন আপন আবরণবসন ফেলিয়া দিয়া, আপনাদের নগ্ন সৌন্দর্য্যস্বরূপ প্রকট করিয়া শোভিত হয়। কালিদাসের সাক্ষাতে ঐরূপ হইয়াছিল। তিনি অমানুষ, দেবমানব। তাঁহার রূপেন্দ্রিয় সম্যক্ স্ফূর্ত্ত। "তিনি সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার সৌন্দর্য্যদৃষ্টি অমানুষী।" *প্রবন্ধান্তরে এ কথা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস করিব।*

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

আমার "স্বরচিত" লয়তত্ত্ব।

লয়বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধে বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রহ্লাদের একটি স্তব উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। সেই স্তবে প্রহ্লাদকে ব্রহ্মে লীন দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব লয় বা ব্রহ্মে লীন হওয়া কাহাকে বলে তাহা বোধ হয় সেই স্তবটি প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইতে পারে। প্রহ্লাদ বলিতেছেন—

মযান্যত্র তথা শেষভূতেষু ভুবনেষু চ।
তবৈব ব্যাপ্তিরৈশ্বর্য্যগুণসংসূচিকা প্রভো॥

"প্রভো! তুমি আমাকে, অন্য সকলকে এবং এই বিশ্ব সমুদায় ব্যাপিয়া আছ। তোমার এই ব্যাপ্তি দ্বারা সামর্থ্যাতিশয় ও সত্যসংকল্পতাদি গুণ সমুদায় সূচিত হইতেছে।"

ইহাতে অপরিমেয় ব্যাপ্তি ব্রহ্মের একটি লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

স্তবের শেষাংশ ঃ—

নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃপুনঃ।
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ॥
সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥

যাঁহাতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে, যাঁহা হইতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার, তাঁহাকে বার বার নমস্কার। সেই অনন্ত পুরুষ সর্ব্বগামী, সুতরাং তিনিই আমি। আমা হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, আমিই সমুদায়, আমাতেই সমুদায় আছে।

ব্রহ্ম কি ?—যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ।

ইহা সেই অপরিমেয় ব্যাপ্তি।

আমি প্রহ্লাদ কি হইয়াছি ?—মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং।

ইহাও সেই অপরিমেয় ব্যাপ্তি।

ইহাতেও যদি বুঝিতে কিছু বাকি থাকে তবে শুন—**প্রহ্লাদের সেই শেষ কথাটি—**

আমার নাম ব্রহ্ম ; আমি সৃষ্টির পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিলাম এবং মহাপ্রলয়ের পরেও বিদ্যমান থাকিব। আমিই পরম পুরুষ।

অতএব পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মে-লীন-প্রহ্লাদ একই পদার্থ। এই জন্যই বলিয়াছি যে ব্রহ্মে লয় হওয়া এবং ব্রহ্মের প্রকৃতি লাভ করা একই কথা।

কিন্তু ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মে-লীন-প্রহ্লাদ যখন একই পদার্থ তখন ব্রহ্মে যে অপরিমেয় ব্যাপ্তি আছে ব্রহ্মে-লীন-প্রহ্লাদেও সেই অপরিমেয় ব্যাপ্তি আছে। প্রহ্লাদের স্তবেও দেখিলাম, তাহাই বটে। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদের স্তব পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মানুষ ব্রহ্মে লীন হইলে ব্রহ্মের ব্যাপ্তি লাভ করে, অর্থাৎ জীবের সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া ব্রহ্মের ব্যাপ্তি বা বিস্তার লাভ করে। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত প্রহ্লাদের স্তব আমার "স্বরচিত" বলিয়া আমার মনে হয় না। সাধনার লেখকেরা কি বলেন বলিতে পারি না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে ব্যাপ্ত বা বিস্তৃত হওয়া আর প্রসারিত হওয়া, এ দুইয়ের মধ্যে অর্থগত কোন প্রভেদ আছে কি? আমার বোধ হয় কোন প্রভেদই নাই। কিন্তু প্রভেদ যদি না থাকে তবে লয়ের অর্থ আত্মব্যাপ্তি না বলিয়া আত্মসম্প্রসারণ বলিলে বিশেষ দোষ ভুল বা বেয়াদবি হয় কি? তাই আমি বলিয়াছি যে লয়ের অর্থ আত্মবিনাশ নয় আত্মসম্প্রসারণ। কিন্তু আত্মসম্প্রসারণ একটা বড় উচ্চ, বড় উদার ভাব, উচ্চ বা উদার ভাব হিঁদুগুলোর ভিতর একেবারেই থাকিতে পারে না, যত উচ্চ যত উদারভাব সব সাহেবদের একচেটিয়া, তাই "সাধনায়" রবীন্দ্র বাবু বলিতেছেন যে লয়কে যে আমি আত্মসম্প্রসারণ বলিতেছি সে কেবল ইংরাজি শিখিয়াছি বলিয়া বলিতে পারিতেছি, নহিলে হিঁদুগুলোর সাধ্য কি যে আত্মসম্প্রসারণ কাহাকে বলে তাহা বুঝে, তারা লয় বলিতে লয়ই বুঝে। অতএব, প্রতিপন্ন হইল যে, আমি যে লয়তত্ত্বটা লিখিয়াছি সেটা আমার "স্বরচিত"ই বটে।

তাহার পর শুনিতেছি যে আমি নাকি সগুণে নির্গুণে বড় একটা অপরূপ খিচুড়ি তৈয়ার করিয়াছি। আমি ত জানি যে বর্ষাকালের ঝুপ্ ঝাপ্ বৃষ্টির সময় খিচুড়ি খুব ভালই লাগে। তবে বোধ হয় যে এবারে বর্ষার ঝুপ্ ঝাপ্ বড় একটা নাই, তাই আমার খিচুড়িটা কিছু বেয়াড়া বোধ হইয়াছে। তা,

পারে। ইতিমধ্যে আমার পাকপ্রণালী সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া রাখি না কেন?

আমি বলি যে মানুষকে যদি ব্রহ্মরূপে সম্প্রসারিত হইতে হয় তাহা হইলে তাহার গৃহ ও সমাজের মধ্য দিয়া যাওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহার কারণ এই—সঙ্কীর্ণতা ও সম্প্রসারণ দুইটি পরস্পরবিরোধী জিনিষ। অতএব সম্প্রসারিত হইতে হইলে সঙ্কীর্ণতা কমাইতেই হইবে। সুতরাং সম্প্রসারণের পরিমাণ যত বাড়ান আবশ্যক হইবে সঙ্কীর্ণতার পরিমাণ তত কমান আবশ্যক হইবে। মানুষের প্রথমাবস্থা স্বার্থপরতার অবস্থা, মোহাচ্ছন্নাবস্থা। সে অবস্থায় মানুষ আপনাকে লইয়াই থাকে, আপনাতেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। সেটা মানুষের যারপরনাই অন্ধ ও সঙ্কীর্ণ অবস্থা। তাহা ব্যাপ্ত, বিস্তৃত, সম্প্রসারিত বা মুক্ত অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা, এবং সম্প্রসারিত বা মুক্ত অবস্থা হইতে তাহার দূরত্বের পরিমাণ হয় না বলিলেই হয়। গৃহী হইলে, অর্থাৎ, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিলে মানুষ আর আপনাতে তত মুগ্ধ, তত আবদ্ধ হইয়া থাকিতে [illegible] তাহার স্বার্থপরতা, মোহাচ্ছন্নতা ও সঙ্কীর্ণতা [illegible]ত্যা কমি[illegible] যায়। অতএব গৃ[illegible] তাহার অবস্থা কিঞ্চিৎ মোহমুক্ত সুতরাং কিঞ্চিৎ ব্যাপ্ত, কিঞ্চিৎ বিস্তৃত, কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত। আবার গৃহে থাকিলেই সমাজের সহিত সম্পর্ক দাঁড়াইয়া যায়, অর্থাৎ যাহারা আপনার নয় তাহাদের সংস্রবে আসিতে হয়। অতএব সমাজে পরার্থপরতা অনুশীলনের অবসর ও আবশ্যকতা বড় বেশী এবং পরার্থপরতার যত অনুশীলন হয় স্বার্থপরতামূলক মোহ ও সঙ্কীর্ণতা তত কমিয়া যায় এবং আত্মব্যাপ্তি, বিস্তৃতি বা সম্প্রসারণ তত বাড়িতে থাকে। এ সকল কথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, গৃহে এবং সমাজে পরার্থপরতার যতই অনুশীলন হউক না কেন, পরার্থপরতা যখন অনুরাগসাপেক্ষ তখন অনুরাগশূন্য ব্রহ্মপ্রকৃতিতে লীন হইবার জন্য গৃহ ও সমাজের ভিতর দিয়া যাওয়ার আবশ্যকতা কি তাহা ত বুঝিতেই পারা যায় না। অনুরাগ কেমন করিয়া নিরনুরাগে পরিণত হইবে? "হাঁ" কেমন করিয়া "না" হইয়া যাইবে? ইহার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা দুই-ই অনুরাগ বটে, কিন্তু স্বার্থপরতা মোহমূলক ও মোহবর্দ্ধক অনুরাগ, পরার্থপরতা

রাখে, আপনাতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, অপরকে দেখিতে দেয় না, ন্যায় অন্যায় বুঝিতে দেয় না, ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিতে দেয় না ইত্যাদি, সে মোহ স্বার্থপরতার সর্ব্বস্ব,পরার্থপরতার বিষম শত্রু। অতএব স্বার্থপরতা এবং পরার্থপরতা দুই-ই অনুরাগ হইলেও, স্বার্থপরতা যে প্রকার অনুরাগ পরার্থপরতা তাহা হইতে বড় ভিন্ন প্রকারের বা প্রকৃতির অনুরাগ। অর্থাৎ স্বার্থপরতা মোহময়, মোহকর, মোহবর্দ্ধক অনুরাগ; পরার্থপরতা মোহমুক্ত, মোহনাশক অনুরাগ। এবং পরার্থপরতা মোহনাশক ও মোহমুক্ত অনুরাগ বলিয়াই ব্রহ্মের নির্গুণ নিরনুরাগ প্রকৃতিলাভের অনুকূল। কারণ মনুষ্যে এবং ব্রহ্মে একটি প্রধান প্রভেদ এই যে মনুষ্য মোহ-উপহিত বা মোহমুগ্ধ চৈতন্য এবং ব্রহ্ম মোহমুক্ত চৈতন্য এবং সেইজন্য যাহা মানুষকে মোহমুক্ত বা হ্রস্বমোহ করে তাহাই তাহার ব্রহ্মত্বলাভের অনুকূল এবং ব্রহ্মত্বলাভের জন্য অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য্য। মানবত্ব হইতে ব্রহ্মত্বে যাওয়া শুধু অনুরাগ হইতে নিরনুরাগে যাওয়া নয়, মোহাচ্ছন্ন অবস্থা হইতে মোহমুক্তাবস্থায় যাওয়াও বটে। [illegible] নুশীলনে এই শেষোক্ত কার্য্যটা অনেক পরিমাণে [illegible]ধিত হয়। অতএব ছোট অনু[illegible] বড় অনুরাগে পরিণত হইতে পারে [illegible]ও নিরনুরাগে পরিণত হইতে পারে না, এই যে একটা কথা এ কথাটায় বেশী সারবত্তা আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ যখন দেখা যাইতেছে যে স্বার্থপরতা বা ছোট অনুরাগ স্বদেশানুরাগ লোকানুরাগ প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত প্রকৃতির বড় অনুরাগে পরিণত হইতেছে তখন বড় অনুরাগ নিরনুরাগে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে শাস্ত্রে বলে রজ ও তমোগুণ নষ্ট হইয়া সত্ত্বগুণ বেশী প্রবল হইলে ব্রহ্মত্ব লাভ বড় সহজ হয়। যোগ দ্বারা কি প্রণালীতে ব্রহ্মত্ব লাভ হয় বা ব্রহ্মে লীন হওয়া যায় তাহা বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতকার বলিতেছেন—

সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ বিধূয় নির্ব্বাণমুপৈত্যনিন্ধনং।

১১শ স্কন্ধ, ৯ অধ্যায়, ১৩।

অর্থাৎ উপশমাত্মক (অতিশয় শান্তিকর) সত্ত্বগুণ অতিমাত্র প্রবৃদ্ধ হইলে রজ ও তমের নাশ হওয়াতে মনের বিক্ষেপের কিছুমাত্র আশঙ্কা থাকে না সুতরাং মন স্বয়ং গুণ ও গুণকার্য্য রহিত হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ধ্যেয়াকারে অবস্থিতি প্রাপ্ত হয়।

ইহার অর্থ বা যুক্তি বুঝিতে হইলে একটি কথা প্রণিধান করিতে হইবে। সে কথাটি এই যে ব্রহ্মকে যে নির্গুণ বলা হয় তাহার অর্থ এই যে অবিমুক্ত মনুষ্যে যে সত্ত্ব রজ ও তম এই তিনটি গুণ আছে ব্রহ্ম তাহার অতীত। নহিলে তাঁহাতে যে কিছুই নাই তাহা নয়, কিছুই না থাকিলে তিনিই বা থাকিবেন কেমন করিয়া? শাস্ত্রে তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ নিত্য চিন্ময় ও আনন্দময় কহে। এ গুলিও ত গুণ বটে। অতএব তিনি যে একেবারেই নির্গুণ তা নয়, তাহা হইলে তাঁহাকে "নির্গুণায় গুণাত্মনে" বলিবে কেন? তবে তাঁহাকে নির্গুণ বলা হয় তাহার কারণ এই যে তিনি অবিমুক্ত মনুষ্যের রজ ও তম গুণের অতীত। কিন্তু তিনি সত্ত্ব রজ ও তমের অতীত হ[illegible] মনুষ্যের মোহমলা-মলিনতা-মুক্ত আক্ষেপ-বিক্ষেপ-পরিশূন্য নিতান্ত [illegible] সাত্ত্বিক অবস্থা তাঁহার সেই চিরচিন্ময়তা চিরানন্দময়তার কিছু অনুরূ[illegible] নিকটবর্ত্তী বটে। এবং সেই জন্যই পরমজ্ঞানী ভাগবৎকার ব[illegible]লিতেছে

সত্ত্বেন বৃদ্ধেন রজস্তমশ্চ বিধ[illegible]ং।

পরার্থপরতা প্রভৃতি বড় বড় অনুরাগ [illegible]জোগুণাত্মক নয়, সত্ত্ব-গুণাত্মক। অতএব যোগমার্গে যাইবার পূ[illegible] ও সমাজে থাকিয়া পরার্থ-পরতার অনুশীলন দ্বারা রজ ও তম নাশ বা খর্ব্ব করিয়া সত্ত্ব সংবর্দ্ধিত করা ব্রহ্মত্বের দিকে অগ্রসর হইবার পক্ষে একটি অপরিহার্য্য কার্য্য। সগুণ ও নির্গুণের প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হইলে আমি ঐ দুইয়ের যে খিচুড়ি প্রস্তুত করিয়াছি তাহা ভাল না লাগিবারই কথা। অতএব, আবার প্রতিপন্ন হইল যে আমার লয়তত্ত্বটা আমার "স্বরচিত" লয়তত্ত্বই বটে।

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—" 'সৃষ্টিকৌশলের' মধ্যে 'বিশ্বনাথের বিপুল বিচিত্র লীলা' দেখিয়া লয়প্রার্থী কি করিয়া যে ব্রহ্মের নির্গুণস্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'লীলা' কি নির্গুণতা প্রকাশ করে? 'লীলা' কি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাশক্তির বিচিত্র বিকাশ নহে? 'সৃষ্টিকৌশল' জিনিষটা কি নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত কোন যুক্তিসূত্রে যুক্ত হইতে পারে?"

কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন যে জ্ঞান অসীম সাধনাসাপেক্ষ অর্থাৎ ব্রহ্মের নির্গুণ স্বরূপ মনে করিলেই উপলব্ধি করা যায় না। সে স্বরূপ উপ-লব্ধি করিবার ক্ষমতা বহু অনুশীলনে লাভ করিতে হয়—সাকার পূজা এবং

দিকে অগ্রসর হইবার কোন ব্যাঘাত হয় না। যাহা তাঁহারই তাহা তাঁহাকে প্রতিরোধ করে না। যাহা তাঁহারই তাহা দেখিবার মতন দেখিতে পারিলে, বুঝিবার মতন বুঝিতে পারিলে, তাঁহারই কাছে লইয়া যায়। তুমি বলিবে যে, লয়তত্ত্ববাদীদের কাছে জগৎ যথার্থই অসৎ, মায়া, বিশ্বনাথের সৃষ্টিকৌশল ও লীলা নহে। কিন্তু বোধ হয় যে তাঁহারা যে জগৎকে অসৎ ও মায়া বলিয়াছেন, সে কেবল ব্রহ্মের তুলনায়। নহিলে বল দেখি কেন তাঁহারা এই অসৎটাকে, ই মায়াটাকে এত ভয় করিয়া গিয়াছেন, এই অসৎটাকে, এই মায়াটাকে ইয়া উঠিবার জন্য এত চেষ্টা এত সংযম এত সাধনা এত আরাধনার কতা বুঝিয়া ও দেখাইয়া গিয়াছেন? আর তাঁহারা যে সৌন্দর্য্য কদর্য্যের করেন নাই, সে কেবল জ্ঞানীর পক্ষে করেন নাই—যে জ্ঞান লাভ করে ার পক্ষে খুবই করিয়াছেন। কিন্তু যিনি বহু সাধনার পর জ্ঞানলাভ ছেন তিনি সৌন্দর্য্য কদর্য্যের প্রভেদ ভুলিয়া যে একটা বিশ্বব্যাপী রূপ সৌন্দর্য্য দে [illegible] রিমিত আভাষও আর কেহ কোথাও পায় না। আর ব্রহ্মের [illegible] শ' তাহা যদি ব্রহ্মের লীলা না হয়, তবে লীলা কাহাকে বলে তাহ [illegible] ত পারি না।

অতএব গৃহ সমাজ প্রভৃতি সকলই যখন রহিল তখন লয়তত্ত্ব মানিলাম বলিয়া পৃথিবীটা মরুভূমিই হইল কেন? পৃথিবীটা বিলাস ও স্বেচ্ছাচার ক্ষেত্র না হইলেই কি মরুভূমি হইয়া যায়? আর যদিই তাই হয় তাহা হইলেও ত ধর্ম্মের জন্য সত্যের জন্য অনন্তকালের অনুরোধে মরুভূমিটাকেই নন্দন-কানন করিয়া লইতে হইবে। ধর্ম্মের কাছে ত সখ্ সাধের আব্দার চলে না।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

প্রায়শ্চিত্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাসে চাঁপার গন্ধে সরস্বতীদের বাগান আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। ভোরের বেলা দুই স'য়ে আঁচল দিয়া চাঁপাগাছের ডাল নোয়াইয়া

দু'জনের মাথার উপর পড়িতেছিল। সরস্বতীর মার তিরস্কারের ভয়ে, ক্ষেমা গাছে উঠিতে সাহস করে নাই। গাছে না উঠিবার আর একটি কারণ, চাঁপা-গাছের একটি ডালে একখানি মৌমাছির চাক হইয়াছিল।

বেড়ার ধারে দাঁড়াইয়া, একটি ছেলে তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, এবং মেয়েদের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার বিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক তাহার মনে উঠিতেছিল। সে চেঁচাইয়া বলিল, "আঃ, ঐ ছোট গাছটায় আর উঠ্‌তে পারিস্ নে? আমি ওর চারগুনো গাছে উঠ্‌তে পারি।" ক্ষেমা বলিল, "রাধিকে দাদা, আমাদের এই ফুলকটা পেড়ে দিয়ে যাও না।"

সরস্বতী চুপি চুপি সইকে বলিল, "মৌমাছিতে যে ওকে কামড়ে খেয়ে ফেল্‌বে।"

"তুই একটু চুপ কর না। ও ডান্‌পিটে ছোঁড়ার বড়াইটা ভেঙ্গে দিচ্চি।"

রাধিকা পুনর্ব্বার আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়া, বেড়া ডিঙ্গাইয়া বাগানের মধ্যে আসিল। বেড়ার কাঁটায় তার গা ছড়িয়া গেল, কিন্তু তাহাতে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। সে নিজের সামর্থ্য দেখাইয়া বাহাদুরী লইবার জন্য মহা ব্যস্ত। কিন্তু দু একটি ফুল পাড়িতে না পাড়িতেই, মৌমাছিতে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। দু একটা মৌমাছি কামড়াইতেই সে অস্থির হইয়া গাছ হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িল। এতক্ষণ দু'জনে খুব হাসিতেছিল, কিন্তু তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া ও কাতরোক্তি শুনিয়া, ক্ষেমার সত্য সত্যই একটু দুঃখ হইল। সে বলিল, "রাধিকে দাদা, আমাদের বাড়ী চল, সোণা পুড়িয়ে দিইগে যাই, এখনি জ্বালা সেরে যাবে।"

"না, আমি এমনি মন্তর ও ওষুধ জানি যে, এ সবে আমার কিছুই হয় না। তোরা যদি দেখ্‌বি তো আমার সঙ্গে আয়!" এই কথা বলিয়া রাধিকা সমস্ত কষ্ট চাপিয়া নিজের সম্ভ্রম বজায় রাখিতে গেল।

বাগান হইতে বাহির হইয়া, তিন্ জনে পদ্মার তীরের দিকে চলিল। পথে একটা গাছের শিকড় লইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে রাধিকা মক্ষিকাদষ্ট স্থানের উপর বুলাইতে লাগিল। দুই স'য়ে এমন অত্যাশ্চর্য্য গাছের নাম জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রাধিকা দাদার অনেক পায়ে পড়িল, কিন্তু রাধিকা দাদা এই গুপ্তবিদ্যা প্রকাশ করিতে কোন মতে সম্মত হইল না। রাধিকা বলিল, "আমার গুরুর বারণ আছে। বেশি লোককে বল্‌লে এ মন্তর ও ওষুধ খাটে

ছিল না যে, ঔষধের গুণ ভাল ধরিয়াছে। রাধিকা সহস্র চেষ্টা করিয়াও আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে মান অপমান সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, পদ্মার পাহাড়ী হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এবার যেন জ্বালা কিছু নিবৃত্ত হইল।

"রাধিকে দাদা, তোমার মন্তর বড় চমৎকার!" এই বলিয়া ক্ষেমা হাসিয়া উঠিল।

রাধিকা দেখিল, তাহার মন্ত্রতন্ত্র ও নিজের প্রভুত্বটুকু সমস্ত মাটি হইয়া যায়। সে বলিল, "উঃ বাপ্‌রে, যে গরম পড়েছে, স্নান করে যেন বাঁচ্‌লাম।"

ক্ষেমা কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। অদূরে মাণিককে আসিতে দেখিয়া, রাধিকা "ওরে পাগ্‌লা আস্‌ছে!" বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। ক্ষেমার মুখখানি শুকাইয়া গেল।

মাণিকের এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে, সকল সময় বিড় বিড় করিয়া বকে। কাহারো সহিত ভাল করিয়া কথা কহে না। যেখানে বেশি লোক-জন থাকে, সেখান হইতে পলাইয়া যায়। অনেক রাত্রে চুপি চুপি বিছানা হইতে কোথায় উঠিয়া যায়। গ্রামের ছেলেরা তাহাকে "পাগল" "পাগল" বলিয়া জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। গালের ভয়ে ক্ষেমার সম্মুখে কেহ কিছু শীঘ্র বলিতে পারিত না। কেবল নন্দর সম্মুখে কেহ কিছু বলিলে তাহার লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া আসিত। তাহার মুখ হইতে তখন আর কোন কড়া জবাব বাহির হইত না। অশ্রুপূর্ণ আনত-নেত্র যেন সকলকে, একটু মহত্ত্ব দেখাইয়া মানুষের দুর্ব্বলতা উপেক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিত। নন্দ পাছে তাহার দাদামহাশয়কে একটা অপদার্থ পাগল বলিয়া বিশ্বাস করে, এই তাহার ভয়। অন্য লোকের মতামতে তাহার বেশী ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। কিন্তু তবুও অন্য লোককে মাণিককে লইয়া মজা করিতে দেখিলে, তাহার বড় রাগ ও অভিমান হইত। সে অনেক সময় যেন দাদামহাশয়কে আগলাইয়া বেড়াইত। কিন্তু সে বালিকা কি জানিত যে, জগতের মর্ম্মঘাতী শর হইতে ক্ষুদ্র হৃদয় দিয়া কাহাকেও ঢাকিয়া রাখা বড় কঠিন ব্যাপার!

মাণিককে দেখিয়া ক্ষেমা ছুটিয়া কাছে গেল। পূর্ব্ব রাত্রের ধৃত মৎস্য-গুলি মাণিক বাড়ী আনিতেছিল। বুড়া মাছের ভরে নুইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষেমা অর্দ্ধেক মাছ আর একটি পাত্রে ঢালিল, এবং বেশ করিয়া কোমর

লাগিল। এক একটা মাছ তখনও লাফাইতেছিল। মাছের কান্‌কোর এক এক বিন্দু রক্ত ক্ষেমার গায়ে ছিট্‌কাইয়া লাগিতেছিল।

রাস্তায় আসিতে আসিতে ক্ষেমা একটা মতলব আঁটিল। মাণিক রাত্রে উঠিয়া কোথায় যায়, সে আজ তার সন্ধান লইবে। অনেক দিন সে সন্ধান লইবে ভাবিয়াছে, কিন্তু বেশী রাত হইলেই সে ঘুমাইয়া পড়ে। আজ রাত্রে সে কোন রকমেই ঘুমাইবে না, এই প্রতিজ্ঞা করিল।

সে দিন রাত্রে খাওয়ার পর, ক্ষেমা মার কাছে শয়ন করিতে গেল। কিন্তু অনেক কষ্টে সে চোক হইতে ঘুম তাড়াইয়া, মাণিকের ঘরের দরজা খোলার শব্দ শুনিবে বলিয়া, কান খাড়া করিয়া রহিল।

গভীর নিশীথে মাণিক পদ্মার তীরের দিকে চলিল। রাস্তায় জনমানব নাই। দু' একটা কুকুর, লোক দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল, কিন্তু মাণিককে নির্ভয়ে যাইতে দেখিয়া, আপনাআপনিই শেষে চুপ করিল। ক্ষেমাও পশ্চাতে আসিতে আসিতে মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠিতেছিল। পদ্মার তরঙ্গস্পর্শী শীতল নৈশ বায়ুতে ক্ষেমার অলকদাম কাঁপিতেছিল। চলিতে চলিতে ধরালুণ্ঠিত অঞ্চলখণ্ড পায়ে জড়াইয়া যাইতেছিল। পথের মাঝখানে একটা বাঁশগাছ নুইয়া পড়িয়াছে—বাতাসে কড় কড় শব্দ হইতেছিল। ক্ষেমার ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেল, কিন্তু তবুও সাহসে ভর করিয়া, সেই সূচী-ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিল।

মাণিক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি আলো জ্বালিল, এবং লুক্কায়িত আঙ্গটিটি বাহির করিয়া, সতৃষ্ণ নয়নে বার বার দেখিতে লাগিল। দেখিয়াও তাহার যেন আশা মিটে না।

ক্ষেমা আস্তে আস্তে গিয়া মাণিকের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিল,"দাদাম'শায়।"

মাণিক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

ক্ষেমা বলিল, "দাদাম'শায়, তুমি এ আঙ্গটি কোথায় পেলে?"

মাণিক কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া ক্ষেমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বিদেশীর ভাষার মতন যেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। অল্পে অল্পে তাহার চোখে জল আসিল। সে ক্ষেমার হাত দুখানি ধরিয়া কাতরে তাহার পাপের কথা বলিল। জলনিমগ্ন ব্যক্তির মতন, সে ক্ষেমার ন্যায় ক্ষুদ্র তৃণেরও আশ্রয় লইতে লজ্জা বোধ করিল না। এই বিপদ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত,

ক্ষেমা বলিল "আঙ্গটিটি ফিরাইয়া দিলেই ত সমস্ত আপদ চুকিয়া যায়। আর আমায় ও আঙ্গটি হাতে দিতে দেখিলে, লোকে অন্য কিছু না বলুক, ঠাট্টা করিবে।"

"এখন তাহাদের কোথায় খুঁজিয়া পাইব ?"

ক্ষেমা মাণিকের গলা জড়াইয়া বলিল, "দাদাম'শায়! তুমি ত বলিয়াছিলে, আমায় একবার কালীঘাটে লইয়া যাইবে। এইবার আমাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া চল না কেন ? কলিকাতায় নিশ্চয় তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া যাইবে। শুনিয়াছি, কলিকাতায় তাঁহাদের বাড়ী।"

মাণিক একটু চিন্তা করিয়া দেখিল, একলা যাওয়া তাহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। আর অন্য লোকের সহিত যাইলে তাহারা সমস্ত জানিতে পারিবে, এবং গ্রামের লোকের নিকট তাহার অপমানের আর অবধি থাকিবে না। ইহা অপেক্ষা, ক্ষেমাকে সঙ্গে করিয়া লওয়াই ভাল। ক্ষেমারও অনেক দিনের একটা সাধ মিটিবে। এই সমস্ত ভাবিয়া, সে ক্ষেমার মতেই মত দিল।

কলিকাতায় যাইবার দিনস্থির হইলে, মাণিকের হৃদয়ে যেন একটু নূতন বলের সঞ্চার হইল। সে এখন অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল। কেহ বিদেশে যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "ক্ষেমা যখন ছোট, তখন আমি কালীঘাটের মাকে মানিয়াছিলাম যে, যদি ক্ষেমা বাঁচিয়া থাকে, আমি তাহার বিবাহের পূর্ব্বে মার পূজা দিয়া আসিব। এত দিনে বোধ হয় মা আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গোয়ালন্দ যাইবার জন্য ষ্টীমারের অপেক্ষায় মাণিক ও ক্ষেমা পদ্মার তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্ষেমার পরনে একখানি নীল রঙের কোরা সাড়ী। ক্ষেমার পাশে দাঁড়াইয়া সরস্বতী চোকের জল মুছিতেছিল। ক্ষেমা বলিল, "সইএর জন্য আর কান্না কেন, আমরা ত দুদিন পরে ফিরব।"

"কি জানি ভাই, আমার মনটা কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে। দেখিস্, যেন সেখানে গিয়া একবারে আমাদের ভুলে যাস্‌নে ?"

"ভুলতে পারলে তো ভুলব। সই আমি বিদেশে চলিলাম্, আমার মেয়ে-

সই নয়, সম্পর্কে বেয়ানও বটে। অনেক দিন হইল, ক্ষেমার পুতুলের সহিত সরস্বতীর পুতুলের বিবাহ হইয়াছিল।

সরস্বতী একটু হাসিয়া বলিল, "আমি অত বৌকাঁট্‌কী নয়; আর আমার বৌ তার মার মতন বড় লক্ষ্মী। যা হোক্, তোর মুখ খানা বড় নেড়া নেড়া দেখাচ্চে, আমার নোলকটা তোকে পরিয়ে দি আয়।" ক্ষেমা বলিল, "না ভাই, যদি হারিয়ে যায়।"

"ও একটা বিলিতি মুক্তার নোলক বই ত নয়। হারিয়ে গেলই বা।"

নোলক পরিয়া ক্ষেমার মুখখানি দিব্য মানাইল। স্বরস্বতী সয়ের মুখখানি নাড়িয়া দিয়া বলিল, "এমন মুখ না হলে কি গাঁয়ের ছেলেরা তোকে বিয়ে কর্‌বার জন্য এত পাগল।"

"নিজে খুব সুন্দরী কি না। তাই সে কথাটা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়। আমরা কাল বলে অত ঠাট্টা কেন?"

সরস্বতী বলিল, "সই! তোর কাছে কথায় পারিয়া ওঠা ভার। আমি না হয় চুপ করছি!"

ইতিমধ্যে ষ্টীমার আসিয়া ঘাটে পৌঁছিল। পদ্মার ধারে সাপ্তাহিক হাট বসিয়াছিল। অনেক ক্রেতা ও বিক্রেতা ছুটিয়া ষ্টীমার দেখিতে আসিল। গাঁয়ের নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা অনেকক্ষণ হইতে ষ্টীমারের অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারা গলা ধরাধরি করিয়া, সার হইয়া নদীর ধারে দাঁড়াইল। নিকটবর্ত্তী মাঠ হইতে গরু ফেলিয়া রাখাল লাঠি কাঁধে করিয়া বিস্মিত নেত্রে ষ্টীমার দেখিতেছিল, এবং যাহাতে গরুগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, সে জন্য মধ্যে মধ্যে দু'একটা গরুর নাম ধরিয়া ডাকিতেছিল। একটি মেয়ে এই প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিল, সে ষ্টীমার দেখিয়া তার ভায়ের কাপড় ধরিয়া বেশী করিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। সে কোন রকমে ভায়ের কাপড় ছাড়িতেছিল না। অগত্যা তাহার ভাইকে, ভগিনীর শ্বশুরালয় পর্য্যন্ত যাইবার অঙ্গীকার করিতে হইল। সিন্ধুবাদ নাবিকের বর্ণিত স্কন্ধারোহী খঞ্জ বৃদ্ধের মতন, সমস্ত পথ, বোনটি ভাইকে চোখের আড়াল করে নাই।

ঘাট হইতে কিছু দূরে ষ্টীমার লাগিয়াছিল। সকলে নৌকা করিয়া ষ্টীমারে উঠিতেছিল। মাণিককে ও ক্ষেমাকে নন্দ ষ্টীমারে তুলিয়া দিয়া আসিল। ক্ষেমা এক এক বার অপাঙ্গে নন্দকে দেখিতেছিল। নন্দ নৌকা

ক্ষেমাকে দেখিতে লাগিল। পদ্মার স্ফাটিক বারিরাশি ভেদ করিয়া ষ্টীমার চলিয়া গেল। যত দূর দেখা যায়, নন্দ ও সরস্বতী এক দৃষ্টে ক্ষেমার দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমে ক্রমে শেষ ধূমরেখা বনপ্রান্ত হইতে উঠিয়া আকাশে মিশাইয়া গেল। মুক্তার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিম্ব ক্ষেমার অলকান্তে শোভা পাইতেছিল। সেই শীকরসিক্ত নীলাম্বরীবেষ্টিত মুখখানি অনেকদিন পর্য্যন্ত উভয়ের হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল। অবসন্ন হৃদয়ে উভয়ে গৃহে ফিরিল। কিন্তু কে যেন বলিয়া গেল, সেই দুষ্টামি-মাখা হাসিভরা মুখ খানি আর তাহারা দেখিতে পাইবে না।

রাত্রে ষ্টীমার গোয়ালন্দে আসিয়া পৌঁছিল। সে রাত্রে কোন ট্রেন না থাকায়, সমস্ত আরোহী বাসার জন্য নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এক জন লোক মাণিককে ও ক্ষেমাকে সাদরে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া লইয়া গেল। তাহার ঘর নদীর ধারেই। সে বলিল, "তোমরা বিদেশী লোক কষ্ট পাবে বলিয়া আমার গৃহে তোমাদের থাকিতে বাসা দিব। ইহার জন্য আর তোমাদের কিছু পয়সা দিতে হইবে না।" মাণিক মনে মনে এই নব-পরিচিতের ভদ্রতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। এবং স্বদেশীয় লোকের বর্ব্বরতার কথা তাহার মনে আসিল। তাহারা বিদেশী অপরিচিত লোককে প্রাণান্তেও স্থান দিতে ভালবাসে না।

ভোর বেলায় শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিল, তাহাদের সমস্ত দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে। বাটীতে লোক জন নাই—নিস্তব্ধ। মাণিক একবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। রাধাকান্ত বাবুর আঙ্গটিটি মাণিকের কোঁচার খুঁটে বাঁধা ছিল বলিয়া, সেটি অপহৃত হয় নাই। মাণিকের হাতে একটি পয়সাও নাই যে, তাহা খরচ করিয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে পারে। বিদেশে এই প্রকার নিঃসম্বল হইয়া পড়া যে কি শোচনীয় ব্যাপার, মাণিক তাহা বেশ বুঝিতে পারিল। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সরলার প্রদত্ত চেলির কাপড়খানি মাণিকের পুঁটুলির মধ্যে ছিল, সেখানি চুরী যাওয়ায় ক্ষেমার বড় দুঃখ হইল।

ক্ষেমা বলিল, "দাদাম'শায় আমার চেলিখানিও চুরী গিয়াছে।"

"কি করব দিদি! আমি যে এ রকম বিপদে কখন পড়িনি। আমি না হয় ইহার পর আর এক খানি চেলি কিনিয়া দিব। কিন্তু এখন কলিকাতায়

ক্ষেমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কোন সৎ পরামর্শ যোগাইল না। সে চুপ করিয়া বসিয়া, ঘাটে লোক স্নান করিতে আসিতেছিল, তাহাই দেখিতে লাগিল।

মাণিক অনেক পরে বলিল, "এখানে অনেক বড় চাকূরে আছে, দেখি, যদি তাহাদের কাছে কিছু ভিক্ষা মিলে।" মাণিক অনেকের কাছে নিজের অভাবনীয় দুর্দ্দশার কথা বলিয়া ভিক্ষা চাহিল। কেহ বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। যাহারা বিশ্বাস করিল, তাহারা অর্থাভাব বলিয়া দুঃখ করিয়া চলিয়া গেল। যাহারা মাণিকের কথায় অপ্রত্যয় করিল, তাহারা "নিষ্কর্ম্মা, জুয়াচোর" ইত্যাদি দু-একটি মিষ্ট সম্বোধন করিয়া প্রস্থান করিল। ক্ষেমার বড় লজ্জা হইতেছিল। সে মাথা হেঁট করিয়া দাদামহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিল, এবং এই বিপদ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত কালী, দুর্গা প্রভৃতি দেবতাদিগের নাম মনে মনে স্মরণ করিতেছিল।

অবশেষে মাণিক রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটি ঘরে রেলওয়ের বাবুরা বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। রাত্রে কিঞ্চিৎ মধুপান করায় সকলেরই প্রায় আরক্ত লোচন। পূর্ব্ব রাত্রে রেলের গাড়ীতে তাঁহারা একটি সুন্দরী দেখিয়াছিলেন, তাহার সৌন্দর্য্যের সমালোচনা হইতেছিল।

এক জন বলিল, "খুড়ো, তোমার অত সুন্দরীর কথায় দরকার কি? এ বুড়ো বয়সে কি কঙ্কণের ঘা খেয়ে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে!"

"এ কালে আর কঙ্কণের ঘা নাই। হাল আইনে মেয়েরা কীল চড়েরই বন্দোবস্ত আগে করিয়া থাকে। পূর্ব্বে শুনিতাম, লোকে কথায় মরে, কথায় বাঁচে। এখন তার চেয়ে কিছু গুরুতর না হলে আর মানুষের কিছু হয় না।"

এই উত্তরে ঘরের মধ্যে একটা হাসির ঢেউ উঠিল। চারি দিক হইতে বাহবা পড়িতে লাগিল। উত্তরদাতা গম্ভীর ভাবে সট্‌কা মুখে দিয়া অর্দ্ধ-নিমিলীত নেত্রে তামাক টানিতেছিলেন।

এমন সময় মাণিক আসিয়া বলিল, "ম'শায় চোরে আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরী করিয়া লইয়াছে। আপনারা যদি কিছু ভিক্ষা দেন, তাহা হইলে কলিকাতায় বা বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারি। সঙ্গে এই ছোট মেয়েটি, এখন কোথায় দাঁড়াই।"

ঘরের মধ্যে সকলে মুখ চাওয়াচায়ী করিতে লাগিল। গৃহাভ্যন্তরে বজ্রাঘাত হইলেও সকলে এত আশ্চর্য্য হইত না। একজন বাবু, খালাসীকে

সাত গেঁয়ের কাছে আবার মামদোবাজী। আমাদের কাছে ঠকাইয়া পয়সা লওয়া ঢের দূরের কথা।"

খালাসী আসিয়া মাণিকের কাপড় ধরিল। মাণিক জোর করিয়া কাপড় ছিনাইয়া লইল। এই বৈধ আজ্ঞার অবমাননা দেখিয়া, বাবুটির আর সহ্য হইল না। স্বয়ং আসিয়া ধাকা দিয়া, মাণিককে গেটের বাহির করিয়া দিলেন। মাণিক উঁছট্ খাইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। ইটে কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

ক্ষেমার লজ্জায় ও অপমানে চোখ দিয়া জল আসিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে মাণিকের হাত ধরিয়া বলিল, "দাদাম'শায়! কেন, তুমি চল না, আমরা উপোস্ করিয়া বাড়ী যাইব। না হয় এই আমার কানের মাকড়ী হু'টি বেচিয়া ফেল।" সে জানিত না যে, মাকড়ী হু'টি গিল্টির।

এক জন রেলওয়ের যুবক কর্ম্মচারী নূতন কর্ম্ম পাইয়াছেন। এখনো, বাড়ী হইতে যে মায়া মমতা আনিয়াছিলেন, একবারে সমস্ত বিসর্জ্জন দেন নাই। তিনি ছুটিয়া আসিয়া মাণিককে হাত ধরিয়া তুলিয়া ক্ষেমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এস মা! আমার বাসায় এসো, তোমাদের আমি কলিকাতায় যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।"

মাণিক প্রথমে এই অপরিচিতের গৃহে যাইতে সঙ্কুচিত হইতেছিল। কিন্তু ক্ষেমাকে নির্ভয়ে যাইতে দেখিয়া, মনে আর কোন দ্বিধা করিল না।

যিনি বিপন্নের এই সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে অনেক প্রকারের বিদ্রূপ ও শ্লেষোক্তি শুনিতে হইল। এক জন রসিক বাবু বলিলেন, "কি হে চাঁদপানা মুখ দেখে ভুলে গেলে? আমি তো পূর্ব্বেই জানি যে, তুমি সকলের চেয়ে চালাক্। মিট্‌মিটে ডান্ ছেলে খাবার যম্।"

নরনারায়ণরূপে যিনি দুষ্টের দমন করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছিলেন, তিনি জলদনির্ঘোষ স্বরে বলিলেন, "এর জন্যই ত বাঙ্গালীর কিছু হয় না। এ দরিদ্রের দেশে দরিদ্রতার প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাপ। ইংরাজেরা কি সাধে আমাদের রাজা!" তবুও তাঁর ফিফ্‌থ ক্লাস্ পর্য্যন্ত পড়িয়া ইংরাজের ইতিহাসে ও অর্থবিজ্ঞানে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি! বাবুটি নীরবে সমস্ত শুনিয়া গেলেন। কোন উত্তর দিতে প্রবৃত্তি হইল না।

মাণিক ও ক্ষেমা সেই বিপন্ন বন্ধুর প্রতি...

কলিকাতায় যাত্রা করিল। যখন ট্রেন শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও তরঙ্গক্ষুব্ধ নদ নদী পার হইয়া চলিল, ক্ষেমা ভাবিল কি সুন্দর! ক্ষেমার মনে হইল, সমস্ত দিন এই প্রকার গাড়ী চড়িবার উপায় থাকিলে মানুষের বোধ হয় আর কোন দুঃখ থাকে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ছেলেবেলায় আমরা যাহা দেখি, সমস্তই ভাল লাগে। সমস্ত জগৎ আমাদের নিকট সুন্দর। সকল লোককেই সরল জ্ঞান হয় এবং সকলের কথাই মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বড় হইয়া যখন এক চমকে মানুষের সুখের ক্ষুদ্র পরিধি মাপিয়া লই, তখন পার্থিব সুখের দরিদ্রতা প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিতে পারি। শৈশবের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। ক্ষেমা কলিকাতায় যাহা দেখিতেছিল, সমস্তই তাহার চোখে নূতন ও সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছিল। ভাবিতেছিল, কত পুণ্যেই না জানি লোকে কলিকাতায় থাকিতে পায়।

মনোহরদাসের সহিত হিসাব পরিষ্কার করিয়া মাণিকের অনেক টাকা পাওনা হইল। একটি সিন্দুকে টাকাগুলি ও রাধাকান্ত বাবুর আঙ্গটিটি রাখিয়া, মাণিক ক্ষেমাকে সিন্দুকের চাবী দিল। মনোহরদাসের বাড়ীতেই তাহাদের বাসা। মাণিকের মহাজন অতি যত্নে অতিথি-সৎকার করিতেছিল।

মনোহরদাসের ছেলে চারু, মাণিকদের কলিকাতায় বেড়াইবার প্রধান গাইড্। আজ সে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় লইয়া যাইতেছে, কাল ইডেন্ গার্ডেন দেখাইতে লইয়া যাইতেছে, এই রকম করিয়া সে প্রায় অর্দ্ধেক মাস স্কুল কামাই করিল। ক্ষেমাকে সে বড় পছন্দ করিত। ক্ষেমার সরল ভাবে সে মুগ্ধ। ঘুড়ি উড়াইবার সময় ক্ষেমা ধরাই না দিলে তাহার ঘুড়ি উড়িত না। এক দিন ঘুড়ি ধরাই দিবার সময় ঘুড়িখানি ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, এই অপরাধে সে রাগ করিয়া ক্ষেমাকে এক চড় মারিয়াছিল। ক্ষেমা সে কথা কাহাকেও বলিয়া দেয় নাই। ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যেও সিভালরি (Chivalry) আছে। যাহারা কথায় কথায় ছুটিয়া বাড়ীতে নালিস করিতে যায়, তাহাদের বালকদিগের সমাজে অতি অল্প প্রতিপত্তি। ক্ষেমার এই গুণে, চারু ক্ষেমার সমস্ত কথা রাখিত।

রকমে চারুকে শাসন করিতে পারিত না। এক দিন মাষ্টারের পশ্চাতে ক্ষেমাকে দেখাইয়া চারু অঙ্গভঙ্গী করিতেছিল। মাষ্টারের চাদর চৌকির খুরার সহিত বাঁধিয়া দিতেছিল। ক্ষেমা প্রথমে খুব হাসিতেছিল, কিন্তু শেষে অন্যায় বুঝিয়া নিজেই অপ্রতিভ হইল। চারুকে বলিল, "তুমি মাষ্টারের সহিত এরকম করিলে তোমার সঙ্গে কথা কহিব না।" সেই পর্য্যন্ত চারু মাষ্টারকে মান্য করিয়া চলিত। ক্ষেমা মধ্যে মধ্যে চারুর ঘরে গিয়া চারুর বইগুলি গুছাইয়া রাখিয়া আসিত। চারুর কৃতজ্ঞতা, চোক মুখ দিয়া প্রতি মূহূর্ত্তে ফুটিয়া বাহির হইত।

এক দিন রবিবারে ক্ষেমাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর নিকট একটি বাগানে চারু বেড়াইতে গেল। সেখানে চারুর সমবয়স্ক আরো অনেক ছেলে খেলা করিতেছিল। চারুর সহিত এই নূতন মেয়েটিকে দেখিয়া সকলে আসিয়া উভয়কে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ক্ষেমার পরিচয় সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছিল। এক জন চেঁচাইয়া বলিল, "কিরে চারু! তোর সঙ্গে এর বিয়ে হবে না কি?"

চারু রাগে জ্বলিয়া গিয়া বলিল, "দেখ্ এ আমার সম্পর্কে বোন্ হয়। এ কথা যে বল্‌বে, তাকে ঘুসিয়ে লাস্ করে দেবো।" কিন্তু চারুর ভবিষ্যৎ প্রহারের বড় একটা ভয় না করিয়া সকলে আরো ক্ষেপাইতে লাগিল। চারু এ ক্ষেত্র হইতে পলায়নই শ্রেয়স্কর বুঝিয়া, আস্তে আস্তে বাগানের গেটের কাছে আসিয়া এক দৌড় দিল। ক্ষেমাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া আসিল। ক্ষেমা বলিল "চারু দাদা! আমায় ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিলে?"

"আমার বড় লজ্জা কর্‌ছিলো। আমাদের ক্লাসের গোষ্ঠ আমার সঙ্গে থাক্‌লে আজ ওদের সবগুলোকে মেরে গুঁড়া করিয়া দিয়া আসিতাম। আমি এমন ঘুঁসো—"

এই বলিয়া ক্ষেমার মুখের কাছে মুষ্টি সঞ্চালন করিল। ক্ষেমা হাসিয়া বলিল, "আমাকে আর কেন? আমার কিন্তু তোমার কথায় একটুও বিশ্বাস হচ্চে না।"

চারু বাড়ী পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা ক্ষেমাকে বুঝাইতে লাগিল যে, তাহার দৈহিক বলের অভাবের নিমিত্ত সে পলাইয়া আসে নাই, কেবল ক্ষেমা সঙ্গে থাকাতেই তাহাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিতে হইয়াছিল। ক্ষেমা গোষ্ঠ হইলে,

জ্বালা; পুরুষদের ভুজবিক্রম দেখাইবার অবসর থাকে না। এই জন্য চারু মেয়েদের লইয়া কোথাও যাইতে ভাল বাসে না।

এই রকম করিয়া কলিকাতায় দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও রাধাকান্ত বাবুর মেয়ের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। মাণিক ও ক্ষেমা এক প্রকার হতাশ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

আষাঢ় মাসে একদিন জানালায় বসিয়া ক্ষেমা বৃষ্টি দেখিতেছিল। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে যে শুধু কবিদের বিরহ জাগিয়া উঠে এমন নহে, এ ক্ষুদ্র বালিকারও মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। পদ্মার ধার, মায়ের মুখ, সরস্বতীদের বাড়ী, এই রকম কত কি তাহার মনে পড়িতেছিল।

রাস্তার ওপারে এক ধনীর প্রাসাদের সম্মুখে একখানি গাড়ী আসিয়া লাগিল। গাড়ী হইতে একটি যুবতী অবতরণ করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। সে মুখ দেখিয়াই ক্ষেমা চমকিয়া উঠিল। সে আর কেহ নহে, রাধাকান্ত বাবুর মেয়ে—সরলা। ক্ষেমা তাড়াতাড়ি রাধাকান্ত বাবুর আঙ্গটিটি সিন্ধুক হইতে লইয়া চারুর সহিত বড় বাড়ীর ফটকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভদ্র ও দয়ালু দ্বারবানেরা কোন মতে তাহাদিগকে বাটীর চৌকাঠ মাড়াইতে দিল না।

কিছুক্ষণ পরে যুবতী বাহিরে আসিয়া শকটারোহণ করিলে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। এবারেও শ্মশ্রুধারী দ্বাররক্ষকদিগের অসীম অনুগ্রহে কথা কহিবার কোন সুযোগ হইল না। চারু ও ক্ষেমা ডাকিতে ডাকিতে গাড়ীর পশ্চাতে ছুটিল। গাড়ী থামিল। কিন্তু থামিবার পূর্ব্বেই ক্ষেমা পা পিছলাইয়া রাস্তার পাথরের উপর পড়িয়া গিয়াছিল। পিছন হইতে আর একখানি গাড়ী আসিয়া ক্ষেমার ঊরুর উপর দিয়া চলিয়া গেল। বালিকা যন্ত্রণায় "মাগো, মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। যে গাড়ীর চাকা ক্ষেমার উপর দিয়া গিয়াছিল, সেই গাড়ীর ভিতর হইতে বাবু কোচম্যানকে বলিলেন, "জোর্‌সে হাঁকাও।" গাড়ী নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সরলা গাড়ীর বাহির হইয়াই ক্ষেমাকে চিনিতে পারিল। বালিকার শিথিল মুষ্টির মধ্যে আঙ্গটি দেখিয়া একবারে সমস্ত কথা বৈদ্যুতিক প্রভাবে তাহার মনের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই রক্তাপ্লুত

কাপড় ভিজিয়া যাইতেছিল। ক্ষেমার নিস্পন্দ জ্যোতিহীন নয়ন দুটি সরলার মুখের উপর স্থাপিত। যেন কত কথা বলিবার ছিল, কিন্তু কিছুই বলা হইল না। একটু একটু করিয়া চোকের পাতা দু'টি মুদিয়া আসিল। সরলার কোলেই পিঞ্জর হইতে ক্ষুদ্র প্রাণপাখিটি উড়িয়া গেল।

কে জানে, কার পাপে কত শুভ্র হৃদয় এ জগতে প্রত্যহ বলিদান হয়।

সমাপ্ত

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কবিবচনসুধা; সংস্কৃত কবিগণের বিচিত্র শ্লোকাবলী।—শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন সঙ্কলিত। সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট শ্লোক আছে, কোনও পুস্তকে তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। মুখে মুখে তাহারা বরাবর চলিয়া আসিতেছে। ইহাদিগকে "উদ্ভট" শ্লোক বলে। লিপিবদ্ধ ছিল না বলিয়া, এই সকল শ্লোকের অনেক পাঠান্তর ঘটিয়াছে। অনেক শ্লোক লুপ্ত হইয়াছে। পূজনীয় কবিরত্ন মহাশয়, এইরূপ অনেকগুলি শ্লোক ও সংস্কৃত সাহিত্যের কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক সংগ্রহ করিয়া, সুন্দর বাঙ্গালা কবিতায় তাহাদের অনুবাদ দিয়া, এই "কবিবচনসুধা" প্রকাশিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংগ্রহে, কবিরত্ন মহাশয়ের ভাবুকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে, পূজ্যপাদ স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মাতামহ মহাশয়, "শ্লোকমঞ্জরী" নাম দিয়া, তাঁহার অভ্যস্ত কতকগুলি উদ্ভট শ্লোক মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে মূলের বাঙ্গালা অনুবাদ ছিল না। কিন্তু কবিবচনসুধার বাঙ্গালা অনুবাদ থাকাতে, পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণের অধিগম্য হইয়াছে। আর কবিরত্ন মহাশয়ের বাঙ্গালা কবিতাও অতিশয় মনোহারিনী হইয়াছে। আমরা একটি কবিতা ও তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

মূল।

"কেতকে পতিতো ভৃঙ্গো
ধূলিগর্ভে সকণ্টকে।
যদক্ষতবপুর্য্যাতি
তদেব প্রচুরং মধু॥"

অনুবাদ।

"ধূলায় কাঁটায় ভরা কেতকীর ফুল,
তাতেই পড়েছ ভৃঙ্গ! একি তব ভুল;
তুমি যে এসেছ ফিরে লইয়া পরাণ,
ইহাই যথেষ্ট মধু কর তুমি জ্ঞান।"

এই অনুবাদ দেখিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কবিরত্ন মহাশয়ের পরিশ্রম সফল হইয়াছে। আমরা আশা করি, কবিবচনসুধা সাদরে গৃহীত হইবে।

বীরমালা ; প্রাচীন ও আধুনিক আর্য্যবীরগণের ধারাবাহিক বিবরণ।—শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত। বীরমালা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তকের প্রথম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রথম সংখ্যায় একটি অনুক্রমণিকা ও বিশ্বামিত্রের জীবনচরিতের আরম্ভভাগ আছে। যজ্ঞেশ্বর বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে জগতে পরিচিত। বরাট প্রেসের রাজস্থান তাঁহার একটি কীর্ত্তি। বীরমালা তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠাকে আরও উজ্জ্বল করিবে। ইহা, পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে, লেখককে নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বীরমালার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। অনুক্রমণিকায় লেখক জাতিভেদসম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে গভীর গবেষণা ও নিরপেক্ষ ভাবে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থের ভাষাও প্রাঞ্জল ও মনোরম হইয়াছে।

এদেশে জীবনচরিতের অস্তিত্ব নাই বলিলেও, বোধ হয়, অন্যায় হয় না। যজ্ঞেশ্বর বাবু যে স্বদেশের উপকরণ লইয়া, বাঙ্গালী [illegible]র ও বাঙ্গালা ভাষার এই গুরুতর অভাব মোচন করিবার চেষ্টা করি[illegible]ন, এ জন্য তিনি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। মুখপাতেই বোধ হইতেছে, লেখক এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু এদেশের পাঠকেরা কি যজ্ঞেশ্বর বাবুকে উৎসাহিত করিবেন?

এখন জগতের বরেণ্য আর্য্যজাতির গৌরব কীর্ত্তন করিতে গেলে, হয় ত "আর্য্যামি"-দোষে দুষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু আমাদের পিতৃপুরুষগণ হৃদয়ের বলে উন্নতির কত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, একবার তাহা ভাবিয়া দেখিলে কি আমাদের বর্ত্তমান অবনতি ও অপূর্ণতার কথা আমরা বুঝিতে পারিব না? তাহাতে কি ক্রম্‌ওয়েল ও সেণ্ট পলের জীবনী পাঠের অপেক্ষা অধিক সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই? অতএব, যদি যজ্ঞেশ্বর বাবু সাধারণের নিকট উৎসাহ না পান, তাহা বাঙ্গালাদেশের কলঙ্কস্বরূপ পরিগণিত হইবে। যাঁহাদের স্বজাতি ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি আছে, আশা করি, তাঁহারা বীরমালার লেখককে উৎসাহিত করিবেন।

অনাথ বালক—উপন্যাস। আমরা এই উৎকৃষ্ট গার্হস্থ্য উপন্যাসখানি পড়িয়া তৃপ্ত হইয়াছি। অনাথবালকের চরিত্র-চিত্র সুন্দর, ভাষা প্রাঞ্জল। গল্পটি সহজ ও মনোরম। বইখানি বেশ সুপাঠ্য হইয়াছে। আমরা

কবিতাকুঞ্জ।

সমর্পণ।

কচি মুখে মিষ্ট হাসি, কুমারী আনন্দ-রাশি,
গৃহের আলোক চির হৃদয়ের ধন,
প্রাণ ফাটে করিবারে তোর সমর্পণ।
আমাদেরি চিরদিন, তোরে সঁপি আজি দীন—
—হইনু কি স্নেহ-অধিকারে,
ভাবিলে গো এই কথা, হৃদয়ে যে বাজে ব্যথা,
নেত্র পূর্ণ হয় অশ্রু-ভরে!
এত দিন স্বতন্তর, তবে কি গো হ'বি পর,
(বাছা!) মা কখন ছেড়ে যায় চলে?
আমিয়া অমিয়-ঢালা, [illegible] দেখি বল্ বালা,—
—কোথা যা'বি আম[illegible] ফেলে?
তোর শুভ পরিণয়, আলয় উৎসব-ময়,
এই গো মুছিনু আঁখি-জল;
করি শুভ আশীর্ব্বাদ, চির পূর্ণ হ'ক্ সাধ,
গৃহে পূর্ণ হ'ক্ সুমঙ্গল!
শুভ্র কুসুমের মালা দিয়া চির বাঁধ বালা
পূত দুটি হৃদয়-বন্ধন;
স্বামী-অঙ্ক-লক্ষ্মী হয়ে, পতি-গৃহ সুখালয়ে,
কর বৎসে, জ্যোতিঃ বিতরণ।
আনত মস্তকে দোঁহে, প্রবিশ সংসার গৃহে,
সিদ্ধিদাতা সর্ব্বেশ্বরে স্মরি,
চিরদিনে সুখদাত্রী, হউক এ শুভ রাত্রি,
সুখে যা'ক্ শুভ বিভাবরী।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

সেই ফুল।

কবে যেন স্বপনেতে আধ-ভাঙ্গা ঘুম ঘোরে
যতনে কে দিয়েছিল একটি কুসুম মোরে,
ফুটন্ত লাবণ্য-মাখা সেই পারিজাত ফুলে
ভ্রমেতে ঘুমের ঘোরে রেখেছিনু হৃদে তুলে!
প্রভাতে ভাঙ্গিল ঘুম বিহগ কূজনে হায়,
দেখিলাম শূন্য হৃদি ভূমে গড়াগড়ি যায়!
কত দিন গেছে আজ, সে মাধুরী সেই ফুলে
আজিও হৃদয়ে মাখা, আজিও যাইনি ভুলে!
আজিও প্রভাতকালে মনে পড়ে সেই হাসি,
মনে পড়ে—সেই ফুলে ছিল কার অশ্রুরাশি!
বরিষার বারিধারা থেকে থেকে হয় ভুল,
পবিত্র নীহার-মাখা বসন্তের সেই ফুল!

শ্রীপ্রমীলা নাগ।

বঙ্গনারী।

স্বাধীনে অধীন তুমি, অধীনে স্বাধীন!
স্বাধীনে অধীন যথা করদ ভূপতি
এ জগতে; ছত্র, দণ্ড ঔজ্জ্বল্য-বিহীন
শোভে সাথে; কিন্তু সখি! দেবতা যেমতি
ভক্তের হৃদি-মন্দিরে পূজা ও আরতি
পান নিত্য, বন্দীরূপে অধীনে স্বাধীন
এই গৃহ-অন্তঃপুরে তুমিও তেমতি;
তব লাগি ধূপ ধুনা জলে নিশি দিন!
পাশ্চাত্য-ললনা-সম বিদ্যুৎ-বরণী
নহ তুমি; নহে তব অবারিত গতি
সজ্র বিদ্যুৎ সম; আদর্শ জননী,
সুভাগিনী, গৃহলক্ষ্মী, তবু তুমি সতি!
অবলা হয়েছে সখি! দেবত্বে বিলীন;
অধীন কথার কথা, তুমি গো স্বাধীন!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

কূর্গ-অধিকার।

রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে কূর্গপ্রদেশ। কূর্গ, ভারত গবর্মেণ্টের অধীন। মহীশূরের রেসিডেণ্ট কূর্গের চীফ কমিশনর। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কর্তৃক কূর্গ-জয়ের বিবরণ একটু কৌতুকজনক।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে মুসলমান গ্রন্থকার ফেরিস্তা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন যে, কূর্গ স্বাধীন রাজগণ কর্তৃক শাসিত হইত। এই পার্ব্বত্য প্রদেশ অনেক কাল হইতে স্বাধীন। ব্রাহ্মণেরা এই দেশে প্রবেশ করিয়া, ইহার ইতিহাস পুরাণের অন্তর্গত করেন। কাবেরীপুরাণে সেই ইতিহাস কথিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণের চারি অধ্যায়ে এই কাবেরীপুরাণ সমাপ্ত। কাবেরী নদীর মহিমা কীর্ত্তন করাই এই পুরাণের উদ্দেশ্য। কূর্গের পর্ব্বত হইতে কাবেরী প্রবাহিত হইয়াছে। কূর্গ প্রদেশে প্রচলিত কিম্বদন্তী অনুসারে, বর্ত্তমান কূর্গগণ কদম্বনামক রাজার বংশসম্ভূত। দক্ষিণ কূর্গে প্রাপ্ত প্রস্তরে খোদিত রচনা হইতে নির্ণীত হইয়াছে, নবম শতাব্দীতে গঙ্গাবংশীয় রাজগণ সেই প্রদেশ শাসন করিতেন। ইদানী ইংরাজী ১৮০৭ সালে, দোদ্দা বীর রাজেন্দ্র নামক রাজার আদেশ অনুসারে, কানাড়ী ভাষায় রাজবংশের আখ্যায়িকা রচিত হয়। ইতিহাসের নাম রাজেন্দ্র-নামা। ইংরাজী ১৬৩৩ সাল হইতে ১৮০৭ সাল পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছিল, এই গ্রন্থে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

কূর্গজাতি সাহসী, যুদ্ধবিশারদ এবং স্বাধীনতাপ্রিয়। হয়দর আলির প্রতাপে যে সময় সমগ্র দাক্ষিণাত্য তাঁহার অধীন হইয়াছিল, সেই সময় কূর্গদিগের শৌর্য্য প্রকাশ পায়। সে বৃত্তান্ত পাঠ করিলে রাণা প্রতাপ সিংহের কীর্ত্তি স্মরণ হয়। হয়দর আলি হয়দ্রাবাদ, মহীশূর ও সমুদয় দক্ষিণ ভারতবর্ষ অনায়াসে জয় করিলেন, কিন্তু কূর্গের দর্প একেবারে চূর্ণ করিতে পারিলেন না। তিনি কূর্গে প্রবেশ করিয়া রাজাকে সপরিবারে বন্দী করিয়া মহীশূরে লইয়া যান। হয়দর আলির পুত্র টীপু সুলতান পিতার মৃত্যুর পর কূর্গদিগকে সমূলে বিনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বহু সহস্র

সেখানে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ইস্‌লাম ধর্ম্মে ...
কূর্গপ্রদেশ মুসলমান ভূস্বামীদিগকে বণ্টন করিয়া দি...
দিগকে অন্বেষণ পূর্ব্বক হত্যা করা তাহাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য
হইল। কূর্গদিগের স্বাধীনতা ও তাহাদের অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায় হ...
রাজপরিবারের মধ্যে বীর রাজেন্দ্র একজন। ইনিও মহীশূরের বন্দী ...
এই সময় তিনি কারাগার হইতে পলায়ন পূর্ব্বক কূর্গে উপনীত হইলেন। রাজ-ধ্বজা আবার উড়িল। মুসলমানেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। টীপু পুনরায় সৈন্যবল প্রেরণ করিলেন। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইতে লাগিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস এই সময় কূর্গদিগের সহায়তা করেন। কূর্গের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল, শত্রুভয় নিবারিত হইল। টীপু সমরে নিহত হইলে, বন্দী ও নির্ব্বাসিত কূর্গগণ ফিরিয়া আসিল।

যথার্থ শত্রুভয় কোন দিকে, কূর্গরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। জয়োল্লাসে বীর রাজেন্দ্র অত্যন্ত অহঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইংরাজেরা বলেন, তিনি অত্যন্ত প্রজাপীড়ন করিতেন, কিন্তু প্রজারা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিত। মহীশূরের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট তাঁহাকে অনেক বার সাবধান হইতে বলিতেন, কিন্তু বীর রাজেন্দ্র তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেন না। বীর রাজেন্দ্রের উত্তরাধিকারী আরও দর্পিত ছিলেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে ইংরাজ গবর্মেণ্টের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার একজন আত্মীয় অত্যাচারভয়ে পলায়ন করিয়া মহীশূরের রেসিডেণ্টের শরণাপন্ন হন। কূর্গরাজ ইহাতে কুপিত হইয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিবার মনন করিলেন। এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ কূর্গ প্রদেশ আক্রমণ করিবার আজ্ঞা দেন। কিন্তু সৈন্যবল প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে, কূর্গরাজকে আর একবার বুঝাইবার চেষ্টা করা হয়। তাঁহার পরিচিত রসেল্ নামক মান্দ্রাজে এক জন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি এই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হন।

মের্কারা নামক নগরী কূর্গের রাজধানী। রসেল্ সাহেব রাজধানীতে উপনীত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন যে, ইংরাজ সরকারের সহিত বিরোধ করিলে রাজ্যনাশ নিশ্চয়। রাজার উদ্যানে বসিয়া কথোপকথন হইতেছিল। রাজা কহিলেন, "রসেল

আমার আজ্ঞা যেরূপ প্রতিপালিত হয়, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের আজ্ঞা সেরূপ প্রতিপালিত হয় না।" অনুচরেরা পার্শ্বে ও পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল। দুই জনকে ডাকিয়া একটা নারিকেল বৃক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ঐ গাছে উঠ।" দুই জনে তৎক্ষণাৎ গাছে উঠিল ও রাজার আদেশের জন্য নীচে চাহিল। রাজা আজ্ঞা করিলেন, "হাত পা ছাড়িয়া দাও।" আদেশ মত দুই জনে হাত পা ছাড়িয়া দিয়া ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রাজা কহিলেন, "ইহাদিগের পুত্র, কন্যা ও স্ত্রীদিগকে আনয়ন কর।" তাহারা নীরবে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাদিগকে মৃতদেহ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি হইয়াছে?" তাহারা উত্তর করিল, "মহারাজের শুভ আদেশ পালিত হইয়াছে।" রাজা আনন্দিত হইয়া রসেল্ সাহেবের প্রতি চাহিলেন।

আর এক দিবস ইংলণ্ডের রাজ্যসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। রাজা কহিলেন, "তুমি কহিতেছ, ইংলণ্ডেশ্বরী স্বেচ্ছামত সকল কার্য্য করিতে পারেন না। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে?" রসেল্ সাহেব কহিলেন, "তাঁহার উপর কেবল ঈশ্বর আছেন, আর কেহ নাই।" রাজা অত্যন্ত কুতূহলী হইয়া কহিলেন, "ঈশ্বর! ঐ নামটি কাগজে লিখিয়া দাও, আমি মনে করিয়া রাখিব।" রসেল্ সাহেব লিখিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার দৌত্য বিফল হইল। তিনি মাদ্রাজে ফিরিয়া গেলেন। কূর্গরাজের বিপক্ষে সৈন্য প্রেরিত হইল।

ছয় সহস্র সৈন্য, চারি অংশে বিভক্ত হইয়া, চারি পথ দিয়া কূর্গে প্রবেশ করিল। কূর্গরাজ অত্যন্ত পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিলেন। দুই দল ইংরাজ সৈন্য পরাজিত হইল, কিন্তু অপর দুই দল মের্কারায় প্রবেশ করিল। রাজা বন্দী হইলেন। রাজধানী অধিকৃত হইলে, নগরে শিবির স্থাপিত হইল। সৈন্যাধ্যক্ষগণ রাজপ্রাসাদে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। প্রাসাদের বৃহৎ সভাগৃহ তাঁহাদিগের ভোজনালয় হইল। সেই গৃহে তাঁহারা দেখিলেন, চারিদিকে কার্ণিশের নীচে কি লেখা রহিয়াছে। কূর্গভাষাজ্ঞ ব্যক্তির নিকট তাঁহারা জানিলেন যে, প্রথম পংক্তিতে রাজার নাম ও উপাধিসমূহ অঙ্কিত রহিয়াছে। নিম্নে ঈশ্বরের নাম এবং তাহার নীচে ইংলণ্ডেশ্বরীর নাম। কূর্গরাজ যে স্বর্গ মর্ত্তে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই কথা প্রমাণ করাই

কূর্গ গবর্মেণ্টের শাসনভুক্ত হইল। যে ঘোষণাপত্র দ্বারা কূর্গ অধিকৃত হয়, তাহাতে লিখিত হয় যে, কূর্গবাসীদিগের অভিপ্রায় অনুসারে উক্ত প্রদেশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন হইল। অথচ, ইংরাজেরা নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রজাগণ কূর্গরাজকে দেবতার ন্যায় সম্মান ও পূজা করিত। মধ্য এসিয়ার কোন প্রদেশ জয় করিবার পূর্ব্বে রুসীয় সেনাপতি ও কর্ম্মচারীগণ প্রচার করেন যে, তদ্দেশবাসী রুস রাজ্যের শাসনাধীন হইবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়াছে।

বন্দী হইয়া কূর্গাধিপতি কিছু দিন কাশী বাস করেন। তৎপরে গবর্মেণ্টের অনুমতি লইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৬২ সালে ইংলণ্ডেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার কন্যা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার ধর্ম্মমাতা।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

চৌকিদার।

ভুলু গোয়ালা মাতব্বর প্রজা, ২৫।৩০ বিঘার জোৎদার, এবং দুখানা লাঙ্গলের মালিক। বেশ সুখে ছিল। কিন্তু হঠাৎ কেমন তাহার একটা অভাব বোধ হইল। অভাবেই দুঃখ।—গণেশ ঘোষ গ্রামের মণ্ডল, ভুলুর চেয়ে এমনই কি মাতব্বর, অথচ তার চেয়ে তার কত বেশী মান। সরকারী বেসরকারী লোকজন যে কেহ গ্রামে আসে, সবাই গণেশের দ্বারস্থ—কি করিলে অমন মানটি ভুলুর হয়! ভুলু আজ কাল সদাই তাই ভাবে। এমন সময়ে বিশে বাগ্দী চৌকিদার, চৌকিদার-জন্মে খালাস পাইল। সরকার বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইতে পারিলে তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া ভুলু স্থির করিল, বিশের কাজে উমেদার হইবে।

ভুলু নিজে তেমন সাহসী নহে—সহসা কোন লালপাগ্ড়ীর কাছে ঘেঁসিতে পারে না। গ্রামের আইনবাজ হারু খুড়ো এ বিষয়ে তাহার সহায় হইল। হারু কখন অ, আ, পড়ে নাই এবং 'আইন' শব্দটাকে অধিকতর মুখরোচক করিয়া

দেখিয়া তুড়ি দিয়া বুঝাইয়া দিল, সবই রোপেয়ার কাজ। ভুলুর একটা নেশা হইয়াছে, অতএব সে চৌকিদারী ভাষায় বলিল—"কুছ্ পরওয়া নেই খুড়ো, না হয় এক মরাই ধান মানের খাতিরে বেচ্‌ব।" কাজেই পর দিন প্রাতে দুজনে থানায় গিয়া মুন্‌সীজীর সঙ্গে দেখা করিল।

মুন্‌সীজী খয়ের আলী সেথ সম্প্রতি এই গোবরডাঙ্গার থানায় বদলী হইয়া আসিয়াছেন—কাজেই হারু খুড়োর পরিচিত সে মুন্‌সীজী নহেন। তার উপর, মুন্‌সীজীর এক প্রবল পুলিস-সুলভ উপসর্গ—কেহ সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিলেই, মোকদ্দমার ফরিয়াদী স্থির করিয়া গালি দিয়া প্রথম চোটে তাহাকে ভাগাইবার চেষ্টা করেন। অতএব হারাধন কুণ্ডার ওরফে হারু খুড়ো, কেতা মাফিক সেলাম করিয়া, স্মিতমুখে মুন্‌সীজীর হুজুরে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে, খয়ের আলীর রোষকষায়িত লোচন ও দীর্ঘ শ্মশ্রু যুগপৎ তাহাকে জানাইয়া দিল যে, যাত্রাটা তেমন শুভ নহে। কিন্তু সেখ্‌জী নিষিদ্ধ পশুর সঙ্গে হারুখুড়োর বংশগত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা কীর্ত্তিত করিয়াও যখন প্রত্যুত্তরে সে "ট্যাঁক" হইতে ঝনাৎ করিয়া এক যোড়া টাকা তাঁহার দিকে ফেলিয়া দিল, তখন আর সে ভাব বড় রহিল না। বরং ফরিয়াদী মোকদ্দমা রুজু করিতে আসিলে প্রথম সম্ভাষণে এক টাকা বই বাহির করে না, কিন্তু এ ব্যক্তি ডবল হইতে আরম্ভ করায় সেখপুত্র একটু বিস্মিত হইলেন। মুখের গালি মুখেই রহিয়া গেল, কিন্তু তথাপি 'নথি দুরস্ত' রাখার জন্য বলিলেন—"ঝুটা মোকদ্দমা ফিন্ লে আয়া ?"

কথাটা হারু কানে তুলিল না। কতকটা তাচ্ছিল্য করিয়া উড়াইল, অমন কত চালাকী সে দেখিয়াছে, কত মুন্‌সেফ, কত দারোগা এই বয়সে সে দেখিল, তা' এত একটা দশ টাকা মাহিনার মুন্‌সী। মনে ততগুলো কথার উদয় হইলেও, মুখে হারু খুড়োর যথেষ্ট সপ্রতিভ ভাব। সে ভুলুকে ইঙ্গিত করিয়া নিকটে আসিতে বলিল, এবং তখন মুন্‌সীজীর সঙ্গে আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করিল।

তখন নিরীহ ভুলু, মুন্‌সীর ভাব ভঙ্গী দেখিয়া মহা শঙ্কিত হইয়াছিল। তার হিন্দী মিন্দী কথা শুনিয়া তাহার ধড়ে প্রাণটি ক্ষীণ মাত্রায় বহিতেছিল। তার উপর একটা সন্দেহ তার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। হারু খুড়ো তার কাছ থেকে লইয়াছিল চারি টাকা, কিন্তু দু'টো বই খরচ করিল না।

করিয়া রাখিল। ভুলুকে বড় একটা কথা কহিতে হইল না। মুন্সী জিজ্ঞাসিলেন, কত তার জমী জমা। ভুলু বলিল, পঁচিশ বিঘা। খুড়ো সঙ্গে সঙ্গে বলিল, দুখান লাঙ্গল, একখানা গাড়ী, আর আঁম কাঠালের বাগিচা আছে। গম্ভীর মুখকে গম্ভীরতর করিয়া মুন্সী মহাশয় হাসিলেন—"ওহো তুমি মাতব্বর প্রজা।" হারু খুড়ো অমনি ভুলুর হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল—"এজ্ঞে আপনাদের আশীর্ব্বাদ! ভুলুকে চৌকিদারীটে দিয়ে দিন, আপনাকে পান খেতে আরও কিছু দেবে।" তারপর মুন্সীজীর হুঁকা হইতে কলিকা লইয়া হারু তামাক সাজিল। ইহাতে সেখজীর প্রসন্নতা আরও বর্দ্ধিত হইল।

খয়ের আলী বুঝিলেন, এ লোকটাকে হাত করিয়া ভুলুকে এক চোট দোহন করার বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। অতএব একটা ওছিলা করিয়া ভুলুকে বিদায় দিয়া, হারুর সঙ্গে তাঁর দু' চারিটা কথাবার্ত্তার দরকার। দুই চারি বার হুঁকা টানিয়া আগুন হয় নাই বলিয়া, সেখজী কলিকাটি শূন্য করিলেন, এবং ভুলুকে ডাকিয়া একবার তামাক সাজিতে ফরমায়েস করিলেন। "ওহে মোড়ল, বলি এক ছিলিম তামাকই না হয় খাও। ঐ কামারের দোকান থেকে একটু আগুন আনো দেখি।"

গোয়ালাপুত্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া কলিকাটি লইল—"মোছলমানের" তামাক সাজা তার এই প্রথম, কেমন একটা ঘৃণা ও বাধ-বাধ করিতেছিল, কিন্তু নহিলে নহে। ভুলু, কামারের দোকানোদ্দেশে যাত্রা করিলে, মুন্সী চোক টিপিয়া হারুকে কাছে ডাকিলেন। হারু ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল।

মুন্সী বলিল—"ওহে বাপু, ও লোকটাকে কোথায় পাক্‌ড়ালে বল দেখি! তুমি ত দেখি লোকটা রকমসই। গোয়ালাটার শুনেছি বিস্তর ধানের মরাই, একটা আধটা বেচাও না।"

হারু হাসিল। মুন্সীটেকে হাতে করিতে পারিলে মোকদ্দমা মাম্‌লার বিস্তর কাজ পাওয়া যেতে পারে। বলিল—"হুকুম হলেই তা পারি! হাকিম হুকুমের আরদালিতেই ত আমার গুজ্‌রান্ হুজুর! তা কি হুকুম কর্‌তে হবে?"

হারু খুড়ো ন্যাকা সাজিল এবং রঙ্গ দেখিতে লাগিল। মুন্সীজী পুনশ্চ বলিলেন, "তোমাকে ত বেয়াকুব বলে বোধ হয় না হে মোড়ল! বলি, তোমা

হারুর বাপ পিতামহের ত্রিকুলের মধ্যে কেহ কখন "মোড়লী" করে নাই—কিন্তু খয়ের আলীর যখন কার্য্যসিদ্ধির আবশুক, হয় ত তখন তিনি এইরূপ এবং আরও হরেক রকমের উপাধি মুক্তহস্তে বিতরণ করিতেন। পুলিসের স্তোকবাক্যে ভুলিবার ছেলে আর যে হউক, কোঙারপুত্র হারু খুড়ো নহে। কিন্তু সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি—সে স্বীকার করিয়া গেল যে, জমাদারজীকে একটা বড় রকমের সিধা এই ভোলা গোয়ালার দ্বারা দেওয়াইবে।

ভুলু ফিরিলে মুন্সী সাহেব তাহাকে আদর করিয়া বসিতে বলিলেন। চৌকীদারী দিতে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমাকে আর এখানে আস্তে হবে না হে মোড়ল—তবে পরশু হাটবারের পরদিন ওনাকে (হারুকে নির্দ্দেশ করিয়া) বুঝ্লে কি না মোড়ল—ওনাকে একবার পেটিয়ে দিও। দারোগা সাহেব দোহাতে গস্তিতে গেছেন, কাল্ রাতে 'তসরিফ' নিয়ে আস্বেন। তার পর তোমার হুকুম হবে। তুমি কিন্তু ঐ মোড়ল মোশায়কে অবিশ্যি পেটিয়ে দিও—আর ওনার সলা নিয়ে কাজ কর্ম্মো। বড়া আক্কেল ওনার, অমন আদ্‌মী এখানে মেলা ভার।" হারু খুড়োকে ইসারায় বলিলেন—"পরশু আস্‌বের সময় পঞ্চায়েৎ বেটাদের দুটোকে ধরে এনো মোড়ল! নইলে হাকিম বুঝবে না, বোঝ্‌লে কি না!" হারু সেলাম করিয়া বলিল, "এটা আর বুঝিনে হুজুর—রায়েনের আমি না জানি কি, না বুঝি কি?" তখন দু'জনে বিদায় হইল।

রাস্তায় আসিয়া হারু বাকী টাকা দুটো ভুলুর অজ্ঞাতে "ট্যাঁক" হইতে সরাইয়া কাছার কাপড়ে বাঁধিল, এবং নিশ্চিন্ত হইয়া বলিল, "পুলিসের লোকের চোখে ধূলা দেওয়া মানুষের 'অসাধ্যি', সে দুটো টাকাও না নিয়ে ছাড়লে না শালা মোছলমান।" তার পর মুখ খাট করিয়া বিশ্বস্তভাবে একটা সিধা দেওয়ার সলাও দিল। ভুলু জিজ্ঞাসা করিতে না করিতে সিধার একটা ফর্দ্দও আওড়াইল—দুটো পাঁটা, দু'সের ঘী, ভাল চাউল ইত্যাদি। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ভুলু যে ১০।১৫৲ দশ পনর টাকার ফেরে পড়িল, ইহা বুঝাইয়া একটু আপ্‌সোস্ করিতেও ভুলুর এই পরম হিতাকাঙ্খী ভুলিল না।

সে রাতে আহ্লাদে ভুলুর ভাল নিদ্রা হইল না। গৃহিণীকে পদবৃদ্ধির খবরটা মহা হৃষ্টচিত্তে দিতে গিয়া কিন্তু একটা বিপদে পড়িল। "মরণ আর কি,

আগুরির সঙ্গে এত ভাব কিসের!" গৃহিণীর ভাষা নূতন বর্ষার মত এইরূপ স্বামীকুল ছাড়াইয়া উগ্রক্ষত্রিয়কুলে উছলিতেছিল—আসন্ন চৌকিদারের সেটা অসহ্য হইল। প্রথমে "ক্ষেপি বলে কি!" বলিয়া থামাইতে গেলে, "পুঁটির মা" যখন বাপের বাড়ীর অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া চৌকিদারীর দুর্গতি উজ্জ্বল ভাষায় গোপিনী-সুলভ অলঙ্কারের সঙ্গে চিত্রিত করিয়া যাইতেছিল, তখন নির্ব্বাক হইয়া শুনিলেও এক একবার বলিল, "বলি হা-দেখ্, মুখ সাম্‌লে কথা ক' বল্‌চি।" পুঁটির মা ইহা গ্রাহ্য না করিয়া সমানে বলিয়া চলিল, "চৌকীদারি ক'রে মান হবে! কনেষ্টবলের ঘোড়ার ঘাস কাট্‌তে কাট্‌তে, আর দারগা, মুন্‌সীর দুধ যোগাতে যোগাতে হাড় ভাজা-ভাজা হবে, চাষ বাস সব উল্‌টে যাবে, তখন বুঝ্‌বি মজা! তা যদি না হয় ত আমি গোয়ালার মেয়ে নই।" কথায় আঁটিতে না পারিয়া, ভুলু শেষে লাঠ্যৌষধের ভয় দেখাইল, কাজেই পুঁটির মার বক্তৃতা সে রাত্রের মত বন্ধ হইল।

ভোর হইতে না হইতে ভোলানাথ শয্যা ত্যাগ করিয়া হারু খুড়োর বাড়ী গেল এবং তাহাকে উঠাইল। মুখ হাত ধুইয়া এবং যথাবিধি তামাকুর সেবা করিয়া, খুড়ো মেরজাই কসিতে ও মাথায় চাদর বাঁধিতে ভুলিলেন না। আজ তাঁর সুপ্রভাত—হাটবারটা বটে, জিনিষ পত্তর কিনিলে দাম দেবার লোকের অভাব হইবে না। এখন দু'জনে প্রসাদপুরের হাটে রওনা হইল। বলিতে ভুলিয়াছি, ভুলু চৌকিদারীর সনন্দ না পাইয়া থাকিলেও, আজ এক গাছ বড় গোছের লাঠি বহন করিয়া চলিল।

প্রসাদপুরের হাট বিখ্যাত। সপ্তাহে দুইবার করিয়া বৈঠক, বুধবারের ও রবিবারের ও সাধারণতঃ তিনের ও পাঁচের হাট বলিয়া গণ্য। আজ রবিবার, পাঁচের হাটে বড় জাঁক। একটা অস্ফুট জন-কল্লোল বহুদূর হইতে সমুদ্র-গর্জ্জন-বৎ শুনা যাইতেছে, গাড়ী গাড়ী ধান চালে প্রবেশপথ আচ্ছন্ন, বলদেরা বহন করিয়া আনিয়া কেহ ক্ষুধিত কাতর দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া, কেহ গাড়ীর নীচে নামমাত্র ছায়াতলে শয়ন করিয়া, চক্ষু বুজিয়া গিলিত চর্ব্বণ করিতেছে। গাড়োয়ানের দল কেহ ঘর্ম্মাক্তদেহে কলিকা লইয়া মহাজনের দোকানের দিকে ছুটিতেছে, কেহ পাঁচন হস্তে মালের গাড়ী হইতে গরু খুলিতেছে। কেহ অসমর্থ, ভূপতিত গরুটাকে বেদম প্রহার ও কটূক্তি করিতেছে। জোড়ার গরুটি নিতান্ত ভালমানুষের মত সমস্ত ভার নিজ স্কন্ধে লইয়া,

সম্মুখে, যেখানে সেখানে দাঁড়ি বাটখারা লইয়া, "রামে রাম, রামে দুই" স্বরে ক্রমাগত ওজন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বস্তাবন্দী হইতেছে। মহাজন সেই রাশীকৃত বস্তার গদিতে বসিয়া, ছত্রছায়াতলে অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় তাহা দেখিতেছে। কাছে কাছে রবিশস্তের রাশি—বুট, গম, সর্ষপ, কলাই ক্ষুদ্র বৃহৎ স্তরে সজ্জিত।

তেলিনী তেল বেচিতেছে; মুদী বেচিতেছে—লবণ, ডাল, মসলা, আজ তার বড় ব্যস্তভাব। সুর করিয়া রামায়ণ পড়িবারও সময় হইয়া উঠে নাই। তরকারির হাটে অধিকাংশ স্থলে গ্রাম্য সুন্দরীগণ নথ নাকে শাঁকা হাতে কুমড়া, পটল, কদলী, থোড়, আলুর ডালি সাজাইয়া সংসার এবং রৌদ্রতপ্ত পুরুষ জাতিকে সুশীতল সম্বোধনে আকর্ষণ করিতেছেন, কোথাও এক মিন্‌সে কাবারি বিরলকেশ দাড়িটি লইয়া এক ঢাকি বেগুন সম্মুখে সে রূপের হাটে, 'হংস মধ্যে বকো যথা' বসিয়া আছে। মণিহারীর দোকানে—মনোহারিণীর দল মহা ভিড় লাগাইয়াছেন। সে স্থান তাঁদেরই একচেটিয়া। নবাব অন্তঃপুরিকাগণ যেমন দাসশ্রেণীবিশেষের সম্মুখে অনসংকোচে বিচরণ করেন, মণিহারী এবং কাঁসারীদের কাছে তাঁহাদের সেই ভাব। মণিহারী দর দাম করিবে কি, তার কথা ফুরাইয়া গেছে। কোন সুন্দরী কোমল হাতখানি তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া সঙ্গিনীর দিকে সলজ্জ নেত্রে বসিয়াছেন, কেহ চুড়ি পরিতে পরিতে কাঁদিতেছেন, অপর যুবতীরা "পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু" আপনাপন পালার প্রতীক্ষা করিতেছেন। কেহ ছেলের মুখে তেলে-ভাজা জিলিপি এবং বাসি-মুড়কি গুঁজিয়া দিতেছেন, কেহ বা ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন।

ভুলু, ধানের মহাজন ঠিক করিতে ব্যস্ত। তাহার এ সব দেখিবার শুনিবার অবসর নাই। কিন্তু হারু খুড়ো জুয়াখেলার ফন্দীতে ফিরিতেছিল। ভুলু পরিচিত মহাজনের কাছ হইতে টাকা সংগ্রহ করিতে না করিতে হারুর দুই বাজি খেলা হইয়া গেল, এবং ইহার মধ্যেই সে এক টাকা জিতিল। বাজার করিয়া বাড়ী ফিরিতে ইহাদের অপরাহ্ণ হইল। হারু নিজের জন্য যাহা কিছু কিনিল, ভুলু অনিচ্ছায় তাহার দাম দিল। ইহার উপর খুড়ো, তাঁহার শুঁড়ি ভ্রাতষ্পুত্র হলা সাহের দোকানে একবার গিয়াছিলেন। কিন্তু হারাধন বড় নির্লিপ্ত, কিছুতে আত্মহারা হয় না। এ কলিকালে তাহার মত

তার পর দুদিন পরে দারোগা সাহেব দস্তখৎ লইয়া হারু খুড়ো ভুলুকে চৌকিদার সাজাইয়া মহকুমায় গেল। লোকে বলে, ভুলুকে যাইতে হয় নাই, খুড়ো নিজে চৌকিদার হইয়া কোর্ট বাবুর সঙ্গে দেখা করে, তাহাতেই কার্য্যোদ্ধার হইয়াছিল। কিন্তু আমরা জানি, সত্য সত্যই ভুলু, লম্বা লাঠিতে বুঁচকি বাঁধিয়া হারুর সঙ্গে গিয়াছিল, তবে হাকিমের সঙ্গে তাহাকে কোন কথা কহিতে হয় নাই। হারাধনের চালাকিতে ভুলুকে কোন বিষয়ে কোন বেগ পাইতে হয় নাই। প্রথম দিন হারু যে বলিয়াছিল, সবই রোপেয়ার কাজ, ভুলু তা প্রত্যক্ষ দেখিল। ভুলু বলিয়াছিল, "কুছ্ পরওয়া নেই, এক মরাই ধান মানের খাতিরে বেচ্‌ব।" সে কথা ভুলুর মনে পড়িল। তখন দেখিল, মান রাখিতে ধান থাকিবে না। চৌকিদারীর মান-ইজ্জৎ যত, তিন দিনে ভুলু ঘোষ তাহা বুঝিল। রাতে গ্রামে চৌকি দিলেই কাজ শেষ হয় না, অহোরাত্র ফাঁড়িতে "হাজিরি" দিতে হয়। ক্রমে পুঁটির মার ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল। যে কেহ নূতন কনেষ্টবল কি নূতন জমাদার আসে, সেই, ভুলুকে মাতব্বর জানিয়া নজর আদায়ের ফন্দীতে প্রথমেই ২।৪ "থাপ্পড়" লাগাইয়া দেয়। "লে আও ঘাস, লে আও দুধ" শুনিতে শুনিতে ভুলুর কান ঝালাপালা হইয়া গেল। ভুলু ক্রমে আত্মমর্য্যাদা টুকু হারাইতে লাগিল। নিজের উপায়ে আর কুলায় না, যে পরিমাণে থানায় কুব্যবহার ও ফরমাইশ পায়, তাহার তিন গুণ সে গ্রামের গরিব দুঃখীর প্রতি প্রয়োগ করে। দু দিন, তিন দিন, ভূমি-কর্ষণ করিতে করিতেই লাঙ্গল ফেলিয়া তাহাকে কনেষ্টবলের বেগারিতে যাইতে হইল, চাষ আর চলে না। ২৫ বিঘার ভিতর কষ্টে সেবার দশ বিঘা আবাদ হইল। ক্রমে চৌকিদারী তাহার অসহ্য হইল।

শেষ রাত্রে একদিন চৌকি দিয়া সবেমাত্র গৃহে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় বাটীর বাহিরে ভুলু কনেষ্টবল মৈথুসিংহের চিরপরিচিত কণ্ঠ শুনিতে পাইল। "শালে রোঁদ ছোড়কে তুম্ আরাম্‌সে নিদ্ যাতা হ্যায়।" ভুলু সে বদনাম ক্ষালনার্থ মুহূর্ত্তে সম্মুখীন হইলে, কনেষ্টবলপ্রবর তাহাকে "বেটমের" ৪।৫ গুঁতো লাগাইলেন। এবং এক জরুরি খৎ হাতে দিয়া হুকুম করিলেন, "তখনই মহকুমায় রওনা হউক, ফের জবাব লইয়া রাতে ফিরিতে হবে।"

ভুলু সেই অবস্থায় চলিল। পুঁটীর মা তখনও শয্যা ত্যাগ করে নাই, কনেষ্টবলকে শুনাইয়া স্বামীকে বলিল, "কাল যদি চৌকিদারীতে ইস্তফা না

শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে গৃহে ফিরিতে ভুলু সন্ধ্যার পর একটা নদী পার হইতে-ছিল। মাঝি-মাল্লারা নৌকা বাঁধিয়া বারুইপুরের ঘাটে আহারাদির উদ্যোগ করিতেছে। এক জন সেই স্থির নদী-হৃদয় কম্পিত করিয়া গাহিতেছিল—

"চাষবাস করিয়া খাইত আবদুল,
তখন ছ্যালো ভাল;
জাহাজের খালাসী হয়ে আবদুল,
দরিয়ায় ডুবে মল।"

তখন গৃহিণীর কথা মনে করিয়া ভুলু স্থির নিশ্চয় করিল, চৌকিদারীতে ইস্তফা দিবে। রাত্রেই থানায় গিয়া "জরুরি খতের" জবাব দিল। দারোগা সাহেবের পায়ে ধরিয়া ভুলু আপনার দুঃখ দুর্গতি জানাইল, এবং ইস্তফা দাখিল করিল। ইস্তফা মঞ্জুর করাইতেও তার কিছু খরচ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

মধুচ্ছন্দার সোমযাগ।

---

(২)

এ স্থলে প্রসঙ্গতঃ বলিতেছি যে, অতি প্রাচীনকালে এতদ্দেশে গঙ্গাতীরে "পুণ্ড্র" নামে এক প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল। বারেন্দ্রকুলভূষণ শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, স্বরচিত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক প্রশংসনীয় গ্রন্থে বর্ত্তমান মালদহ-জেলাস্থিত "পাঁড়ুয়ার জঙ্গল"কেই প্রাচীন "পুণ্ড্র" বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। এই "পাঁড়ুয়া" মুসলমান ইতিহাসে "পাণ্ডুয়া" নামে খ্যাত গৌড়। বিজয়ী আফগান নরপতিগণের রাজত্বকালে, গৌড় ও পাণ্ডুয়া, উভয় নগরই বাঙ্গলা দেশের রাজধানী ছিল। পরে মোগল বাদশাহদের রাজত্বকালে, গৌড় ও পাণ্ডুয়া, উভয় নগরই বিধ্বস্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া যায়। পাণ্ডুয়ার নিকটে এক্ষণেও প্রাচীন নদীর চিহ্ন বর্ত্তমান, এবং পাঁড়ুয়ার ভগ্নাবশেষের বিষয় কৃত-বিদ্য পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। যে বিখ্যাত আদিনা-মসজিদ্ এখনও কিয়ৎপরিমাণে দণ্ডায়মান, তাহা পাঁড়ুয়ার প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরের মাল-মশলায় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

যদিও "পুণ্ড্র"-নামক নগর মালদহে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল, তত্রাচ পুণ্ড্রের আধিপত্য, বোধ হয়, আধুনিক সমুদায় বঙ্গদেশের উপরেই প্রচলিত ছিল। কেন না, সেনবংশীয় রাজাদের যে সকল তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা স্বীয় রাজ্যকে "পুণ্ড্র"-বৰ্দ্ধন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এই সেনবংশীয় রাজগণ গৌড় ও বঙ্গের অধীশ্বর ছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন—"গৌড়দেশের প্রাচীন নাম পুণ্ড্র। খ্রীষ্টাব্দের ৭০০।৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ভোজ গৌড় নামা নৃপতি গৌড়নগর স্থাপন করেন।" আমার বিবেচনায়, গৌড় ও বঙ্গ, এই উভয় দেশেরই প্রাচীন নাম "পুণ্ড্র" ছিল। পৌণ্ড্রগণই এ প্রদেশে প্রথমতঃ সভ্যতার অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারা এক সময়ে পরাক্রমে কৃষ্ণের সমকক্ষ ছিলেন বলিয়া মহাভারতে উল্লেখ আছে। মনুসংহিতাকার বলেন যে, পৌণ্ড্রেরা পতিত ক্ষত্রিয়। ক্রমে ক্রমে ইহাদের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়া লোপ পাওয়ায় এবং ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব হওয়ায়, ইহাদের পাতিত্য (১) দোষ ঘটে। সে যাহা হউক, পুণ্ড্রদেশে বৈদিক আচার ব্যবহার চলিত ছিল না। অথচ পৌণ্ড্রদিগকে যদি মনুর মতানুসরণ করিয়া আর্য্যবংশীয় বলিয়া গণ্য করা যায়,—এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণের লিপির সহিত তাহার মেলন করা যায়, তাহা হইলে, বঙ্গদেশে ও তৈলঙ্গদেশ পর্য্যন্ত আর্য্যাধিকারবিস্তারের পর, ঋগ্বেদের কোন কোন অংশ রচিত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য করিতে হয়। কেন না, বিশ্বামিত্র ও মধুচ্ছন্দার সময়েও পৌণ্ড্ররাজ্যের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। আর বিশ্বামিত্রের বিরুদ্ধাচারী পুত্রগণ যদি পিতৃদেশ হইতে তাড়িত হইয়া পৌণ্ড্ররাজ্যে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, তাহা হইলে বিশ্বামিত্রের দেশও পৌণ্ড্ররাজ্যের নিকটবর্ত্তী ছিল, মনে করিতে হয়। উক্ত পুত্রগণ কতক অন্ধ্রদেশে, কতক পুণ্ড্রদেশে, অর্থাৎ যাহারা দক্ষিণ দিকে গেল, তাহারা অন্ধ্রে, যাহারা উত্তরপূর্ব্বদিকে গেল, তাহারা পুণ্ড্রে আশ্রয় পাইয়াছিল। কীকটভূমিও (মগধ) তৎকালে পুণ্ড্রের অন্তর্গত থাকা অসম্ভব নহে। যাহা হউক, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ভোজবংশে বিশ্বামিত্রের জন্ম, সেই ভোজবংশীয় গৌড়নামা জনৈক অধিনায়কই

(১) মালদহে আজিও "পুণ্ডরী" (ভাষা পঁড়ো) নামক একটি জাতি বাস করেন। ইংরেজবাজারের একাংশের নাম "পঁড়োটুলী"। ইঁহারা এক্ষণে বৈষ্ণব হইয়াছেন।

অবশেষে পুণ্ড্র পরাজয় করিয়া গৌড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সমুদায় বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া বিবেচনা হয় যে, উত্তরভারতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত আর্য্যাধিকার বিস্তারের পরে, এবং তৈলঙ্গ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশেও আর্য্যাধিকার বিস্তারের পরে, এক্ষণে মগধের পশ্চিমে যে ভূখণ্ড ভোজপুর নামে বিখ্যাত—তথায় বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা নামক মহর্ষি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

ইহার পর বলা বাহুল্য যে, মধুচ্ছন্দা অশিক্ষিত কোন কৃষকবংশাবতংস ছিলেন না। তাঁহার মন্ত্র সকল কৃষকের গীত কি না, তাহা পাঠকবৃন্দ পরে দেখিবেন। তাঁহার অন্যূন তিন জন পূর্ব্বপুরুষ মন্ত্রকৃৎ ঋষি ছিলেন। তাঁহার কোনও কোনও ভ্রাতাও (কত-রেভ প্রভৃতি) তাঁহার ন্যায় মন্ত্রকৃৎ ঋষি ছিলেন, এবং তাঁহাদের রচিত মন্ত্র আজিও বর্ত্তমান। তাঁহার পুত্র জেতাও একজন 'ঋক্'-রচনাকারী ঋষি ছিলেন। ফলতঃ, তাঁহার বংশাবলী "ঋষি"। তাঁহার পিতা বিশ্বামিত্র কেবল ঋষি নহেন, একজন বিখ্যাত উপাধ্যায় বা অধ্যাপক ছিলেন। তৎকালে রীতিমত অধ্যাপকের পরিষদে অর্থাৎ "টোলে," বহুবর্ষ ব্যাপিয়া বাস করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিবার রীতি ছিল। বিশ্বামিত্র কি মধুচ্ছন্দা যে অশিক্ষিত লোক ছিলেন না, তাহা তাঁহাদের রচিত সূক্ত সকল পাঠ করিলেই বুঝা যায়। বিশ্বামিত্রের বহুসংখ্যক ছাত্রপূর্ণ পরিষদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনিও নিজে তাদৃশ অপর পরিষদে অগাধ পণ্ডিত কোন অধ্যাপকের নিকট বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র স্বয়ং আপনার গুরুর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই পরিচয়ে যদিও তাঁহার নিজ গুরুর নাম নাই, তত্রাচ স্থানান্তরে তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, "পলস্তি জমদগ্নি"র নিকট তিনি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। "পলস্তি"-শব্দের অর্থ পলিত পক্ককেশ বৃদ্ধ। পলস্তি বা বৃদ্ধ জমদগ্নিকে স্মরণ করিয়াই বোধ হয় বিশ্বামিত্র বলিয়া গিয়াছেন—(১)

"শতধারম্ উৎসম্ অক্ষীয়মানম্"

অর্থাৎ, আমার গুরুর বিদ্যা শতধারা-(২)-বাহিনী নদীর অগাধ স্রোতের ন্যায় কদাচ শুষ্ক হয় না।

---

(১) "শতধারং উৎসং" এই মন্ত্রব্যাখ্যাকালে ভাষ্যকার সায়ণ বলেন—"এই ঋকের দ্বারা বিশ্বামিত্র আপন উপাধ্যায়ের প্রশংসা করিতেছেন।" ভাষ্যকার উপাধ্যায়ের নাম দেন নাই; লেখক অনুমান করেন—উক্ত উপাধ্যায়ের নাম বৃদ্ধ জমদগ্নি। অবসরবিশেষে এই কথার পুনরালোচনা করা যাইবে।

"বি-পশ্চিতং পিতরম্———"

অর্থাৎ, যিনি অশেষশাস্ত্রজ্ঞ এবং যিনি মাদৃশ ছাত্রবৃন্দকে পিতার ন্যায় পালন ও স্নেহ করিতেন। (১)

"—————————বক্ত্বানাম্।

"মোনং—মদন্তং পিত্রোপস্থে।" (২)

অর্থাৎ, যিনি ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক, আপাততঃ বিসম্বাদী বলিয়া প্রতীয়মান, বাক্য সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য বা "মেলন" করিয়া, ব্যাখ্যা করেন। যিনি পৃথিবী এবং আকাশের অন্তরালে বর্ত্তমান থাকিয়া, বিশ্বপতির মহিমাসন্দর্শনে স্বকীয় ব্রহ্মজ্ঞানানন্দের আতিশয্যে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন।

"তং পিপৃতং রোদসী সত্যবাচম্॥"

যাঁহার বাক্য সত্যময়,—হে দ্যুলোক ও ভূলোকব্যাপী পরমেশ্বর! তুমি আমার সেই গুরুদেবের অভিলাষ পূর্ণ কর।

পাঠকবৃন্দের নিকট লেখকের সবিনয় অনুরোধ—তাঁহারা বিশ্বামিত্রের এই স্বহস্তাঙ্কিত গুরুচিত্র কিঞ্চিৎ অভিনিবেশসহকারে আলোচনা করুন।

ইহাতে অনেকগুলি কুসংস্কারের অপনোদন হইতে পারিবে। বিশ্বামিত্র বহু বর্ষ ব্যাপিয়া বৃদ্ধ জমদগ্নির পরিষদে বাস করিয়া, বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি গুরুর অগাধ বিদ্যার পরিচয় না পাইলে আর তাঁহাকে "শতধারম্ উৎসমিব অক্ষীয়মানম্"—"বিপশ্চিতম্" বলিয়া বর্ণনা করিতেন না। তাঁহার গভীর স্নেহময় প্রকৃতির পরিচয় না পাইলে, তাঁহাকে "পিতরং" বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। তাঁহার তর্কবিতর্কপূর্ণ, ন্যায়ানুগত, পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্তাদি না শুনিতে পাইলে, তাঁহাকে আর "বক্ত্বানাং মোনং" বলিয়া বর্ণনা করিতেন না। আর তাঁহাকে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী বলিয়া না বুঝিতে পারিলে, "পিত্রোঃ = দ্যাবা পৃথিব্যোঃ, উপস্থে = অন্তরালে, মদন্তং = জ্ঞানাতিশয়েন হৃষ্যন্তং" বলিয়া পরিচয় দিতেন না। অবশেষে সকল গুণের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ "সত্যবাচং" বলিয়া যে গুরুর পরিচয় দিয়াছেন—পাঠকবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যালয়ে এইরূপ কয় জন গুরু পাওয়া যায়? যে কালে বৃদ্ধ জমদগ্নির ন্যায় গুরু ও বিশ্বামিত্রের ন্যায় শিষ্য

---

(১) বলা বাহুল্য, সেকালে গুরুর বাটীতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত। গুরু পিতার

জন্মিত, সেই কালে ঋগ্বেদ রচিত হয়। ইহা অশিক্ষিত-বিদ্যালয়-বিদ্যার্থী ও গুরুবর্জ্জিত সময়ের সামগ্রী নহে।

উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, বিখ্যাত ঋষিবংশে, বিখ্যাত ঋষির ঔরসে মধুচ্ছন্দার জন্ম হয়। তিনি স্বকীয় পিতা ঋষি বিশ্বামিত্রের পরিষদে বিদ্যাভ্যাস করেন, এবং স্বয়ং একজন ঋষি বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। তিনি স্বরচিত এক মন্ত্রে বলেন—

"অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিঃ ঈড্যো নূতনৈরুত।"

অর্থাৎ, অগ্নি যেমন প্রাচীন ঋষিগণের উপাস্য ছিলেন তেমনি মাদৃশ নবীন ঋষিগণেরও উপাস্য। ইহাতে দেখা যায়, মধুচ্ছন্দা আপনাকে একজন নূতন "ঋষি" বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন যাজকগণের মধ্যে যাঁহারা সুললিত ছন্দে নূতন বেদবাক্য রচনা করিতে পারিতেন, তাঁহাদিগকে "ঋষি" বলিত। "ঋষি" শব্দের অর্থ "দ্রষ্টা"। অন্য লোকে যাহা দেখিতে পায় না, তাহা তাঁহারা দেখিতে পান। তাঁহারা অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি, তাই তাঁহাদের নাম "ঋষি"। সাধারণ যাজকের অপেক্ষাও তাঁহাদের অধিক গৌরব ও সম্মাননা ছিল। মধুচ্ছন্দার পিতা বিশ্বামিত্র ঋষি যে একজন যাজক ছিলেন, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। তিনি নানা দেশ হইতে বরণ অর্থাৎ নিমন্ত্রণপত্র পাইতেন। এইরূপ এক বরণ পাইয়া ভোজপুর হইতে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর তীরবর্ত্তী পঞ্জাবদেশীয় জনপদবিশেষে শকটারোহণে গমন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার স্বরচিত মন্ত্রেই প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে, মধুচ্ছন্দাও যাজক ছিলেন। এই অনুমান যে সুসঙ্গত, তাহা মধুচ্ছন্দার মন্ত্র সকল আলোচনা করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার সমুদয় মন্ত্রে যজ্ঞেরই কথা—ইহাতে কে তাঁহাকে যাজক না বলিয়া থাকিতে পারেন?

তাঁহার প্রথম সূক্তের প্রথম মন্ত্র এই—

"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম
যজ্ঞস্য দেবম্ ঋত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমং ॥"

এই মন্ত্রে যে আটটি শব্দ আছে, সকল গুলিই যজ্ঞঘটিত শব্দ। "ঋক্"-বেদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াই সর্ব্বপ্রথমে "পুরোহিত," "হোতা" এবং

জন। তিনি একবারে আমাদিগকে "যজ্ঞ"শালায় লইয়া গিয়া যজ্ঞীয় "অগ্নির," সম্মুখে উপস্থিত করিতেছেন, এবং কিরূপে জ্যোতির্ম্ময় ("দেব") পরমেশ্বরের "ইলা" বা উপাসনায় "রত্ন" সকল বিতরণ হইতেছে, তাহাই দেখাইতেছেন। অতএব মধুচ্ছন্দার মন্ত্র আলোচনার পূর্ব্বে এবং তাঁহার সোমযাগ কিরূপ ছিল, তাহা বর্ণনার পূর্ব্বে, অগ্রে "যজ্ঞ" বা "যাগ" কি পদার্থ ছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

"যজ্" ধাতুর অর্থ উপাসনা করা বা তৃপ্তি সাধন করা। যে উপাসনা-ক্রিয়াতে পরমেশ্বরের তৃপ্তি সাধন করা হয়, তাহার নাম "যজন" বা "যজ্ঞ," এবং যে বাক্যে সেই উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তাহার নাম "যজুঃ"। এই শব্দটি ঋক্‌বেদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। যজ্ঞশাস্ত্রের বিধান এইরূপ যে, যে ক্রিয়াতে যে দেবতার, অর্থাৎ যে নামে পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে, তৎপূর্ব্বে প্রাচীন প্রথা অনুসারে যাজককে এই দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়। যথা—

"যে যজামহে।"

এই দুইটি শব্দ একটি মন্ত্র বলিয়া পরিগণিত, এবং ইহার পারিভাষিক নাম "আগুঃ"। জেন্দভাষাবিৎ মার্টিন হোন সাহেব দেখাইয়াছেন যে, "আগুঃ" এই শব্দটি পারিভাষিক অর্থে কেবল ঋগ্বেদে নয়, জেন্দাবস্তায়ও তাদৃশ অর্থে ব্যবহৃত। "যজামহে" এই শব্দটিও পারশীকদের যজ্ঞশাস্ত্রে "যজামৈধে" এই আকারে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, আর্য্যাবর্ত্তে আগমনের বহুপূর্ব্বে, ভারতীয় ও পারস্য আর্য্যগণের পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন একত্র বাস করিতেন এবং এক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এই "আগুঃ" নামক মন্ত্র সেই সময়ের। সেই অতি প্রাচীন সময়েও আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা "যাজ্ঞিক" ছিলেন। তৎকালেও তাঁহাদের মধ্যে "যজন" বা "যজ্ঞ" ক্রিয়া স্পষ্টই প্রচলিত ছিল। তৎকালেও তাঁহারা "যে যজামহে" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া যাগ করিতে বসিতেন। কেবল ইহাই নহে, সেই অতি প্রাচীন সময়েও একটি "যাজক" সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল। ভারতবর্ষে যে ঋত্বিক বা যাজকের নাম "হোতা," প্রাচীন পারস্যে তাহারই নাম "জোতা"। ভারতবর্ষে যাহার নাম "অধ্বর্য্যু," প্রাচীন পারস্যে তাঁহারই নাম "রাথ্বী"। ইহাতে দেখা যায়, ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে অন্ততঃ দুই সম্প্রদায় যাজক বর্ত্তমান ছিলেন। এক সম্প্রদায়ের নাম

পূর্ব্বের কথা হইতেছে। তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে দেশে বাস করিতেন, ঋগ্বেদে তাহার নাম গন্ধ নাই; কস্মিনকালে যে কোন নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন দেশে বাস করিতেন, তাহার স্মৃতিমাত্র নাই। পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, ভারতবর্ষে আর্য্যাধিকার পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, বিশ্বামিত্রের মন্ত্র সকল রচিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কেবল যে যজ্ঞক্রিয়া ঋগ্বেদ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, তাহা নহে; যে যাজকসম্প্রদায় সেই যজ্ঞক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারাও তদপেক্ষায় অনেক প্রাচীন। তবে অতি পূর্ব্বকালে যেমন "হোতা" ও "অধ্বর্য্যু" নামক কেবল দুই শ্রেণীর যাজকের নাম শুনা যায়, ঋগ্বেদরচনাকালে অন্যূন ষোড়শ শ্রেণীভুক্ত যজমানসম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদরচনাকালে যাজকসম্প্রদায়ের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অনেক পূর্ব্বেও যাজকসম্প্রদায় বিদ্যমান ছিলেন।

"মন্ত্র" এই শব্দটিও ভারতীয় ও পারস্য আর্য্যগণের সাধারণ সম্পত্তি। জেন্দভাষায় ইহার আকার "মংত্র"। আমাদের সন্ধির নিয়মানুসারে "মংত্র" ও "মন্ত্র" শব্দে কোন ভেদ নাই। কশ্যপ ঋষি আপনাকে সম্বোধন করিয়া ঋগ্বেদে বলিতেছেন—

> "ঋষে মন্ত্রকৃতাং স্তোত্রৈঃ
> কশ্যপোদ্বর্ধয়ন্ গিরঃ।
> সোমং নমস্য রাজানং।" ইত্যাদি।

কশ্যপ ঋষি বৈদিক ঋষিগণের মধ্যে একজন প্রাচীনতম ঋষি বলিয়া পরিগণিত। উল্লিখিত ঋক্ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তিনিও তদপেক্ষা প্রাচীনতর মন্ত্রকৃৎগণের স্তোত্র অবলম্বন করিয়া, "সোমের" উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। জেন্দ ভাষায় জারথুস্ত্রের নাম "মংথ্রান্" বা মন্ত্রকৃৎ। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন হোতা ও অধ্বর্য্যু যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে "মন্ত্র" রচনা করিতেন। ইঁহারাই অস্মদ্দেশে "ঋষি" এই নাম প্রাপ্ত হয়েন এবং বর্ত্তমান অস্মদ্দেশীয় ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের মধ্যে কুলীনসম্প্রদায়ের ন্যায় যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি অবান্তর সম্প্রদায়বিশেষ হইয়া উঠেন। এই ঋষিদের মধ্যে যাঁহারা গোত্রের প্রবর্ত্তক, তাঁহাদেরই বংশাবলী এক্ষণে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া পরিচিত।

দেখা গেল, ভারতবর্ষে আসিবার অনেক পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ

প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা "মন্ত্র"কৃৎ ঋষি ছিলেন। যাজকেরা "মন্ত্র" উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিতেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, সেই যজ্ঞের প্রক্রিয়া ও উপকরণ কীদৃশ ছিল? অস্মদ্দেশীয় বেদশাস্ত্রের পারগামী কোন পণ্ডিত যদি প্রাচীন পারসীক জেন্দাবেস্তা শাস্ত্র বিশিষ্টরূপে অধ্যয়ন করিতে পারেন, তাঁহার দ্বারা এই গুরুতর প্রশ্নের সন্তোষজনক মীমাংসা হইতে পারে। লেখকের তাদৃশ বিদ্যা নাই। এই পর্য্যন্ত জানা আছে, পারসীকগণও অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যজ্ঞ করিতেন, এবং তাঁহারাও যজ্ঞে "সোমরস" দেবতাদিগকে উপহার দিতেন। আমরা যাহাকে "সোম" বলি, তাঁহারা তাহাকেই "হোম" বলিতেন। ইহাতে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে আসিবার অনেক পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা "সোম-যাজী" ছিলেন। যেমন মনুষ্যের আদি নির্ণয় করা যায় না, তেমনি "সোম" যাগেরও আদি নির্ণয় করা যায় না।

বেদে অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্মণভাগে, সোমযাগের যেরূপ প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহাতে "সোম"যাগের প্রধান অঙ্গ পাঁচটি ; যথা :—

(১) দীক্ষনীয় ইষ্টি। (২) প্রায়নীয় ইষ্টি বা আতিথ্য ইষ্টি। (৩) প্রবর্গ্যক্রিয়া। (৪) পশুযাগ। (৫) সোমযাগ। এই সমুদয় ক্রিয়ার একমাত্র লক্ষ্য যজমানকে "দ্বিজ" করা। যে জন্ম লাভ হইলে মনুষ্য স্বর্গধামে স্থান পাইবার যোগ্য হয়—তাহাই আমাদের "দ্বিতীয় জন্ম"। ইহার অপর এক নাম "ব্রহ্মজন্ম"। যাজ্ঞিক-গণ মনে করিতেন, দীক্ষনীয় ইষ্টিতে যজমানের ব্রহ্মজন্মের গর্ভাধান হয়। "সোম" গর্ভস্থ নূতন আত্মার অন্ন। প্রায়নীয় ইষ্টিতে সেই অন্নের আহরণ করা হয়। "সোম" অতিথির ন্যায় এই ক্রিয়াতে উপস্থিত হয়েন বলিয়া ইহার নাম "আতিথ্য" ইষ্টি। পরে প্রবর্গ্যক্রিয়াতে গর্ভগত নূতন "দ্বিজ" আত্মার অবয়বপোষণের উপযুক্ত কয়েকটি কার্য্য হয়। পশুযাগে "দ্বিজ" আত্মার পশুজন্মের বিনাশ হয়। অবশেষ "সোম" পান করিয়া নূতন আত্মা সজীব হয়। সে জীবনের আর মৃত্যু নাই। সংক্ষেপে ইহাই সোমযাগের মর্ম্ম।

ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, "দীক্ষনীয়" ইষ্টির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কালে লিখিত হইয়াছে,—

"পুনর্বা এতং গর্ভং কুর্বন্তি
যদ্দীক্ষয়ন্তি অদ্ভিরভিষিঞ্চন্তি।"

দীক্ষিত করেন, তখন তাঁহারা যজমানের দ্বিতীয় জন্মের গর্ভাধান করেন। আমাদের ঋত্বিকগণের এই প্রাচীন যজ্ঞদীক্ষার অভিষেকক্রিয়া, পরে শাক্যসিংহের অনুচরেরা "শ্রমণ" ধর্ম্মের দীক্ষার স্বরূপ গ্রহণ করেন। এবং বৌদ্ধদের এই অভিষেকক্রিয়াদর্শনে য়িহুদী "এসেনী" সম্প্রদায়ের তপস্বী "জহন্"ও স্বীয় অনুচরগণকে অভিষেকক্রিয়া দ্বারা দীক্ষিত করেন। খৃষ্টধর্ম্মের ঋষি যীশু, তপস্বী "জহনের" এক জন শিষ্য ছিলেন। তিনি "জহনের" দ্বারা অভিষিক্ত ও দীক্ষিত হইয়াছিলেন—এবং জহনের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া, আপনার শিষ্যদিগকেও জলের দ্বারা অভিষিক্ত করিতেন। আমাদের দীক্ষাভিষেক ও খ্রীষ্টানদের Baptism—তাৎপর্য্য তুল্য সামগ্রী। আর এই ক্রিয়া খৃষ্টানেরা পরম্পরায় ব্রাহ্মণদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন, দেখা যাইতেছে। "তোমাদের দ্বিতীয় জন্ম না হইলে তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না"—ঋষি যীশু যে এই মহাবাক্য প্রচার করেন—উহার প্রত্যেক বর্ণ আমাদের যজ্ঞশাস্ত্র হইতে গৃহীত। ইহাই আমাদের প্রাচীন "মধু" বিদ্যা। সোমযাগ করাইয়া আমাদের ঋষিরা মনুষ্যকে কিরূপে "দ্বিজ" করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা পাঠকবৃন্দ ক্রমশঃ দেখিতে পাইবেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

বিবিধ।

গোকর্ণ তীর্থের নিকট ইয়ানা নামক পর্ব্বত। যাত্রীরা গোকর্ণ হইতে এই পর্ব্বতে গিয়া থাকে। পর্ব্বতের নিকটে লোকালয় নাই। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে এমন নিরবলম্ব যে, পর্ব্বতে আরোহণ ও পর্ব্বত হইতে অবতরণ, দুই অসম্ভব। পর্ব্বতের মধ্যস্থলে, মনুষ্যের অগম্য স্থানে বহুসংখ্যক মধুচক্র। জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে সময়ে সময়ে গোকর্ণ ও অন্যান্য স্থান হইতে স্ত্রীলোকেরা আসিয়া পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিত। তাহাদের মধ্যে কোন অসচ্চরিত্রা রমণী থাকিলে, মধুমক্ষিকার দল তাহার মস্তকে পতিত হইয়া তাহাকে দংশন করিত। বলা বাহুল্য, সে প্রথা এখন প্রচলিত নাই।

অনেক দিনের কথা, গঞ্জাম জেলায় এস—সাহেব নামক একজন কলেক্টর ছিলেন। রম্ভা গ্রামের নিকট একটি হ্রদের তীরে তিনি প্রস্তরের এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে দুই লক্ষ মুদ্রার অধিক ব্যয় হইয়াছিল। অশ্বশালায় চব্বিশটি অশ্বের স্থান ছিল। হস্তীশালায় অনেকগুলি হস্তী থাকিত। গৃহের সজ্জা কলিকাতা হইতে আসিয়াছিল। এস—সাহেব এই গৃহে রাজার ন্যায় কাল কাটাইতেন। হ্রদে বজরা বাঁধা থাকিত, তিনি বন্ধুদিগকে লইয়া সর্ব্বদা আমোদপ্রমোদে নিরত থাকিতেন। এদিকে গঞ্জাম হইতে রাজকর মাদ্রাসে প্রায়ই যাইত না, কলেক্টর সাহেব হিসাবপত্রও বড় পাইতেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে গবর্মেণ্ট অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। হিসাব পত্রের জন্য তাগাদা আসিল। অবশেষে কলেক্টর সাহেব খাতাপত্র বজরায় বোঝাই করিয়া, একটা পাহাড়ে লাগাইয়া বজরা ডুবী করিলেন। গবর্মেণ্টকে জানাইলেন, বজরা জলমগ্ন হওয়াতে হিসাবপত্র সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে। গবর্মেণ্ট বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন ও তাঁহার স্থানে আর একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। নূতন কর্ম্মচারীর আসিতে এক মাস লাগিল। আসিয়া দেখেন, এস—সাহেব নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন। গবর্মেণ্টের আজ্ঞায় ভ্রূক্ষেপ নাই, কর্ম্মত্যাগের নাম করেন না। নূতন কর্ম্মচারী নিরুপায় দেখিয়া গবর্মেণ্টকে জানাইলেন। তখন এস—সাহেব বলপূর্ব্বক তাড়িত হইলেন। অনুসন্ধানে জানা গেল, তিনি গবর্মেণ্টের অনেক টাকা অপহরণ করিয়াছিলেন। গৃহ-নির্ম্মাণে যে টাকা ব্যয় করেন, তাহা দুর্ভিক্ষের সময় প্রজার অন্নকষ্ট নিবারণ না করিয়া, আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

কথায় বলে 'স্বভাব না যায় ম'লে।' সাইবিরিয়া প্রদেশে বরিয়াতী নামক এক অসভ্যজাতি বাস করে। ইহাদের আচার ব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণিত। ইহারা আলস্যপ্রিয়, অবিশ্বাসী, নিষ্ঠুর। পচা মাছ খায়, শরীরে বসা ও পঙ্ক লেপন করে। সাইবিরিয়ার নির্ব্বাসিত রুসিয়ান বন্দীদিগের ইহারা চির-শত্রু। কোন বন্দী পলাতক হইলে, ইহারা তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া হত্যা করে। কিছু দিন হইল, একজন প্রধান রুস রাজকর্ম্মচারী লোক জন সঙ্গে লইয়া, কর্ম্ম উপলক্ষে এই প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন।

একটি শূন্য কুটীর। কুটীরের সম্মুখে সপ্তবর্ষীয় বরিয়াতী বালক একাকী দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, "আমার কেহ নাই, সেই জন্য কাঁদিতেছি। কিছু দিন হইল, মাতার মৃত্যু হইয়াছে। এখন আমার পিতারও মৃত্যু হইয়াছে। কোথায় যাইব, কে আমায় খাইতে দিবে, ভাবিয়া কাঁদিতেছি।" পিতার মৃতদেহ কুটীরে পড়িয়াছিল, বালক দেখাইয়া দিল। রাজকর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পিতাকে তুমি ভাল বাসিতে?" বালক কহিল "না, পিতা আমাকে সর্ব্বদা মারিতেন।" রাজ-কর্ম্মচারী বালককে সঙ্গে করিয়া রুসিয়ায় লইয়া আসিলেন। তিনি স্বয়ং নির-পত্য, বালককে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন যে, বরিয়াতী জাতিরা আপনার স্বভাব ত্যাগ করে না, এই জন্য বালককে বিশেষ যত্ন ও আগ্রহের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বরিয়াতী বালক দ্রুত বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিল। তাহার উন্নতি দেখিয়া, রাজ-কর্ম্মচারী প্রীত হইয়া, তাহাকে ফ্রান্সে অধ্যয়নের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। পারি নগরীতে শিক্ষকগণ বালকের দৃঢ় অধ্যবসায়, মেধা ও স্মরণশক্তি দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন। কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া, পুরস্কার ও পদক প্রাপ্ত হইয়া, ফরাসীভাষায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া, বরিয়াতী যুবক রুসিয়ায় ফিরিয়া আসিল। রাজকর্ম্মচারী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। রাজধানীর সর্ব্বত্রে যুবককে পরিচিত করিয়া দিলেন। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ম্মচারী যুবককে সুখে রাখি-বার জন্য মুক্তহস্তে ব্যয় করিতে লাগিলেন। বরিয়াতী যুবক যেমন বিদ্যা-বিশারদ হইয়াছিল, আমোদপ্রমোদেও সেইরূপ একাগ্রচিত্তে যোগ দিল। মদ্যপানে, লম্পটাচরণে, জুয়াখেলায় অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল। এ সকল শিক্ষাও সেকালে বিদ্যার অঙ্গ ছিল, সুতরাং রাজকর্ম্মচারী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

এক দিন যুবক গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে যাইতেছে, এমন সময় একজন বরিয়াতী তাহার নয়নপথে পতিত হইল। সে রাজধানীতে পশম ও চর্ম্ম বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। যুবক গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু বরিয়াতী, যুবককে রুসিয়ান বিবেচনা করিয়া, কয়েকটি কথা কহিয়া ক্ষান্ত হইল। এতকাল পরে মাতৃভাষা শ্রবণ

ফিরিয়া গেল। কিন্তু সেই দিন হইতে তাহার চিত্ত উদাসীন হইল। প্রমোদের সঙ্গীদিগকে পরিত্যাগ করিল, একাকী কেবল চিন্তা করিত। কিছু দিন পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। রাজকর্ম্মচারী অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন, যুবক কয়েক জন বরিয়াতীর সহিত চলিয়া গিয়াছে।

তিনি স্বয়ং সেই গ্রামে গমন করিলেন। দেখিলেন, যুবক বসা পঙ্ক লেপন করিয়া, স্বজাতীয়দিগের সহিত স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে, অনবধানবশতঃ ফরাসী ভাষায় উত্তর দিল, কিন্তু আবার তখনি সাবধান হইয়া কহিল যে, সে মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা জানে না, রাজকর্ম্মচারীকে চিনে না, গ্রামের বাহিরে কখন যায় নাই, ফ্রান্স কোথায় তাহা জানে না। তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে, এ কথাও অস্বীকার করিল। এক জন বৃদ্ধ কহিল, এই যুবা আমার পুত্র। পিতা বর্ত্তমান থাকিতে পুত্রকে বলপূর্ব্বক বা কোন কৌশলে অন্যত্র লইয়া যাইবার নিয়ম ছিল না; কর্ম্মচারী নিরাশ হইয়া রুসিয়ায় ফিরিয়া আসিলেন।

সাইবিরিয়ায় ইয়াকুৎ নামক আর এক অসভ্য জাতি আছে। ইহারা শান্তিপ্রিয়, শ্রমজীবী, আতিথ্যসৎকারনিরত। সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য ইহাদিগের জাতিগত প্রধান লক্ষণ। রুসীয়দিগের মধ্যে একটা কথা চলিত ছিল যে,কোন ইয়াকুৎকে কেহ কখন রাগিতে দেখে নাই। সময়ে সময়ে রুসীয় বণিকদিগের কর্ম্মচারীগণ ইহাদিগের নিকট হইতে নানাবিধ সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য ইহাদিগের গ্রামে গমন করে। তাহারা মাতাল হইয়া নানাবিধ অত্যাচার করে, কিন্তু ইয়াকুতেরা সমস্তই হাস্যমুখে সহ্য করে। একবার কয়েক জন রুসীয় যুবক নদীপথে একটি ইয়াকুৎ গ্রামের অভিমুখে যাইতেছিল। গ্রামের সমীপবর্ত্তী হইয়া এক জন কহিল, "ইয়াকুৎকে রাগাইতে পারে, এমন লোক আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই।" আর একজন কহিল, "আচ্ছা, বাজি রাখ, আমি রাগাইব।" এ ব্যক্তি মাতাল, নির্দ্দয়, পাষণ্ড। আর সকলে তৎক্ষণাৎ বাজি রাখিল। যে ইয়াকুৎদিগের সহিত প্রথমে দেখা হইবে, তাহাদিগের একজনকে রাগাইতে হইবে। না পারিলে বাজি হারিবে। গ্রামে উপনীত হইয়া তাহারা দেখিল, কয়েক জন ইয়াকুৎ তীরে বসিয়া মাছ ধরিবার

ও অপর সকলের মাননীয়, তাহাকে ডাকিল। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ জাল ছাড়িয়া হাস্যমুখে উঠিয়া আসিল। "বুড়া, তোর নাক এমন খাঁদা কেন? আয়, তোর নাক একটু বড় করিয়া দিই," বলিয়া, যে বাজি রাখিয়াছিল, সে বুড়ার নাক খুব জোরে মলিয়া দিল। এইরূপে সম্ভাষণ আরম্ভ হইল। বুড়ার নাক লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে না রাগিয়া হাস্যমুখে এই বিষম বিদ্রূপ সহ্য করিল। তাহার পর, দুর্ব্বৃত্ত রুসিয়ান তাহার মুখে চোখে এক ঘড়া ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিল, তাহার মস্তকে খানিকটা আল্‌কাৎরা ঢালিয়া দিল, তাহার মুখের ভিতর এক মুঠা তামাক গুঁজিয়া দিল। বৃদ্ধ তবু রাগে না দেখিয়া ও বাজি হারিবার ভয়ে ক্রোধান্বিত হইয়া, রুসিয়ান বিদ্রূপচ্ছলে তাহাকে মর্ম্মান্তিক পীড়া দিতে লাগিল। বেদনায় ও যন্ত্রণায় বৃদ্ধের মুখ বিকৃত হইয়া উঠিল, মুখ খুলিয়া কি বলিবার উপক্রম করিল। পার্শ্ববর্ত্তী রুসীয়েরা কহিল "থাম, থাম। বুড়া বোধ হয় রাগিয়াছে, এইবার তোমায় গালি দিবে।" প্রথম রুসীয়ান বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার তামাসা বুঝি তোমার ভাল লাগে নাই?" বৃদ্ধ বিনীতস্বরে কহিল, "না, বেশ লাগিতেছিল। কিন্তু——" বাজি জিতিবার আশায় রুসিয়ানের মনে বড় আনন্দ হইতেছিল; বৃদ্ধকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু কি?" বৃদ্ধ কহিল, "আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমার সঙ্গে যদি আরও এইরূপ তামাসা করিবার ইচ্ছা থাকে ত আমাকে দুই একবার চীৎকার করিতে দিতে অনুমতি হউক।" চীৎকার করিলে যন্ত্রণাটা একটু কম হয়। তখন রুসীয়ান রাগিয়া কহিল, "আমি বাজি হারিয়াছি। ইহাদিগকে রাগাইবার কাহারও সাধ্য নাই।"

ফুলদানী।

ডায়মন্‌কাটা মল্‌।

(সে দিন শ্বশুরবাড়ী গিয়াছি। আমাদের সরকারী ঠান্‌দিদি, রাঙাদিদির সহিত গল্প করিতেছি; এমন সময়ে, নিমন্ত্রণ খাইয়া, বাড়ীর তিন বধূ (সুবাদে আমার শালাজ) ও বাড়ীর কন্যা (আমার গৃহলক্ষ্মী) ঝমর্ ঝমর্ ঝমাৎ শব্দে প্রত্যাগত হইলেন। রাঙাদিদির আদেশ হইল, "নাত্‌জামাই, বুঝিব, তুমি কেমন কবি। মলের শব্দে ঠাওরাও দেখি, কোন্‌টি কে?" তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।)

১

ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল!
উঠিছে পড়িছে কিরে, নামিছে উঠিছে কিরে,
রূপ-হর্ম্ম্যে সঞ্চারিণী রাগিণী তরল?
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে? কোকিল কি ঝঙ্কারিছে,
নিশুতির শান্তগৃহে খুলিয়ে অর্গল?
সুন্দরীর উচ্চ হাসি, পেয়ে প্রাণ অবিনাশী,
অবিরল ছুটে কিরে আনন্দে চঞ্চল?
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্,
কেন আজি প্রতিধ্বনি হরষে বিহ্বল?
মল্ বলে,—"আমি যার 'বধূ' সে গো নহে আর,
মাতৃভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল!"
বড় বধূ ওই আসে, শিশুরা পলায় ত্রাসে;
চঞ্চলচরণ দাসী সহসা নিশ্চল!
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে? কোকিল কি ঝঙ্কারিছে?
মুখর বিরহ বলে, "চল্ চল্ চল্"—
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্ বাজে ওই মল!

২

ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, বাজে ওই মল।
হ'ল নারে ঘুরাইতে, প্রেম চাবি ছুঁতে ছুঁতে,
না ছুঁইতে বাজে কেন সোহাগের কল?
ঝিল্লি সাথে নিশিবায় ঝাঁপতালে গীতি গায়;
নিশি মুখে ফুটে উঠে গোলাপের দল!
রাজহংস কি কহিল, প্রাণকর্ণে কি গাহিল,
লজ্জা গেল; দময়ন্তী তনু টল্‌মল!
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্ ঝমর্ ঝমর্ ঝম্
তেমতি বধূর পায়ে বাজে ওই মল!
মল বলে, "আমি যার, বধূ সে গো নহে আর,
ভগ্নী ভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল!"
"খোকার ঝিনুক কই?" মেজ বউ বলে ওই,
অধরে গরল তার নয়নে অনল!
কুহু কুহু কুহুরিত, অলি পুঞ্জ মুখরিত,
বধূর যৌবনকুঞ্জ মরি কি শ্যামল!
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্ ঝমর ঝমর ঝম্ বাজে ওই মল!

৩

ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুমুর ঝুমুর ঝুম্ বাজে ওই মল!
পদ্মদলে পরবেশি, হারাইয়া দশ দিশি,
ভ্রমরা গুঞ্জরে কিরে হইয়ে পাগল?
অতনু কি মৃদু ভাবে, লুকায় উমার বাসে?
পাছে ভাঙে তপ, জ্বলে হর কোপানল!
কেন, কেন ম্রিয়মাণ, হেমন্তে পাখীর প্রাণ?
বসন্তের সাড়া পেয়ে তবুও বিহ্বল?
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুমুর ঝুমুর ঝুম্,
যতনে লুকায় বধূ হিয়ার সম্বল!

মল বলে, "আমি যার, চির লজ্জা সখী তার ;
"ঢুলে পড়িয়াছে পিয়ে লাজ-হলাহল !
"চুম্বিয়ে চরণ তার, জাগাই গো বার বার ;
বধূর কেমন পণ, সকলি বিফল !"
ঘোমটা টানি মাথায়, সেজ বউ চলি যায় ;
পদ্মদলে বদ্ধ অলি হয়েছে বিকল !
ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্, ঝুমুর ঝুমুর ঝুম্ বাজে ওই মল !

৪

রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্, ঝম্ রুণু রুণু ঝুম্, বাজে ওই মল !

জল পড়ে ঝর ঝর, শীতে তনু থর থর,
ভাঙা-গলা কোকিলার সঙ্গীত তরল !
শুনে শ্যাম নাহি এল, কঙ্কণ খসিয়া গেল,
ছল ছল আঁখি রাধা চাহে ধরা...
মিলন লজ্জার বুকে, ম... ...ঘোমুখে,
কহে ধীরে, "হেথা হ'তে চল সখি চল !"
প্রগল্‌ভা হাসিতে চায় ; গুরুজন !—একি দায় !
চঞ্চল মুখর ওষ্ঠে ঝাঁপিল অঞ্চল !
রুণু রুণু ঝম্ ঝম্ ঝম্ রুণু রুণু ঝম্
মল বলে, "বল, ওরে সরে যেতে বল ;"
কবি বলে, "আসে ওই, আমার আনন্দময়ী,
সরমে শিথিল তনু, ভরমে বিকল ;
যামিনীতে দেখা হ'লে, সুধাব সোহাগ ছলে,
তরল-জোৎস্না-জলে ধুয়ে ধরাতল,
শারদীয়া শর্ব্বরী, সখি, তোর গলা ধরি,
এমনি কি গান গায় ? বল সখি বল !"
রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝম্ রুণু রুণু ঝুম্ ওই বাজে মল !

সোনার শিকলি।

(প্রিয় সাহিত্য ! বলা বাহুল্য, আমার এ সনেটটি রবি বাবুর "সোনার বাঁধন" কবিতার অনুকরণে লিখিত। প্রভেদ এই যে, তাঁহার খাঁটি সোনা, আর আমার Chemical Gold. তা' ভাই ! যার যেমন বাসাত !)

অয়ি গৃহলক্ষ্মী, তুমি নও গো বন্দিনী ;
এই মায়া-কারাগার তোমারই সৃজন !
নিখিলের দুঃখ দৈন্য করুণ ক্রন্দন
যাহে বদ্ধ চির দিন ; তুমি গো আপনি
দৌবারিক ; নেত্র দুটি জাগ্রত প্রহরী !
শ্রীভুজের ঐ দুটি সুন্দর কঙ্কণ,
কটীতে মুখর কাঞ্চী, নূপুর-শিঞ্জন—
ওরাও জাগিয়া থাকে দিবস শর্ব্বরী !
পুরুষের প্রাণ মন কিণাঙ্ক কঠিন,
পাপে রত, হায় শত লালসালোলুপ ;
তুমি বাহু প্রসারিয়া আগ্রহে স্বাধীন,
ধর তারে ; গৃহে পড়ে সোনার কুলুপ !
কি মধুর প্রায়শ্চিত্ত হ'য়ে কুতুহলী,
হেসে হেসে পরে নর সোনার শিকলি !

রূপার বাঁধন।

("সোনার বাঁধন" পাঠ করিয়া কাহারও যে "রূ... বাঁধন" ভাল লাগিবে, এ প্রত্যাশা করি না। ...কারা যে মুখ বাঁকাইবেন, এমন বোধ হয় না ; কারণ, পরম্পরায় শুনিয়াছি, তাহারা উভয় বাঁধনেরই পক্ষপাতী।)

পরেছ রজত বেড়ি, চরণে নূপুর,
বন্দীভাবে ; তবু তব উল্লসিত মন !
তবু তব হাস্যময়, প্রদীপ্ত আনন,
অতুলনা সহিষ্ণুতা মরি কি মধুর !
সলীল গমন তব ; চঞ্চল নয়ন
নহে ত্রস্ত ; পুষ্পরাশি ভরিয়া অঞ্চলে,
(স্বার্থপর নর গেছে প্রমোদের স্থলে !)
করিছ গৃহ-দেবের মঙ্গল-পূজন !
সোনার শরীরে কেন রজত বাঁধন ?
সুকুমার দেহে কেন সশব্দ কিঙ্কিণী ?
আমরা পুরুষ জাতি ; আবদ্ধ চরণ,
গৃহ ছাড়ি ধাই নিত্য ; তাই কি রমণি,
এ বেশে, এ অন্তঃপুরে, যাপিছ জীবন ?
গৃহ-শৃঙ্খলার লাগি কঠোর যতন !

লোহার বাঁধন।

ও দু'টি সোনার গণ্ডী কঙ্কণ দু'খানি
শোভিতেছে, অরবিন্দ মানস-সায়রে !
বলয়িত কেন দেবি তব বাম-পাণি
লোহের বন্ধনে ? কুঞ্জে, নন্দন-ভিতরে
বিল্ব-পত্র কে আনিল বল গো ইন্দ্রাণি ?
"সোনার রূপার কাটি" শুনেছি কাহিনী
রাজকন্যা মরে বাঁচে যাহার পরশে !
জীবনের উপন্যাসে, কোন্ দৈব-বশে,
ধরেছ সোনার দেহে লোহের বন্ধন ?
হাসি উত্তরিল বালা, "জীবন-কঙ্কণ,
জীবন-কবচ তব, করেছি ধারণ !
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর আমি, মরি কি ভূষণ !
চির মিলনের চিহ্ন, শোভার আধার ;
তুমি আমি, আমি তুমি, একি একাকার !"

নব্য লয়তত্ত্ব।

সাহিত্যে চন্দ্রনাথবাবু "লয়" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন, আমাদের মতের সহিত অনৈক্য হওয়াতে সাধনা পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের সমালোচনা-কালে আমরা ভিন্ন মত ব্যক্ত করি। তাহা লইয়া চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত আমাদের বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছে, তাহা সাহিত্য-পাঠকদিগের অগোচর নাই। বিষয়টা গুরুতর, [illegible]ব এ সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু উত্তরোত্তর আমাদের প্রতি রাগ করিতেছেন, ইহাতেই আমরা কিছু চিন্তিত হইয়াছি। চন্দ্রনাথ বাবুর যে একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে, তাঁহার মতের সহিত যখন [illegible]দের বিরোধ, তখন অবশ্যই আমরা হিন্দুমতদ্বেষী, এ কথাটা কিছু গুরুতর। [illegible] নানা ছলে আমাদিগকে সেইরূপ ভাবে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। হিন্দু হইয়া জন্মিলেই যে চন্দ্রনাথ বাবুর সহিত কোন মতভেদ হইবে না, এমন কথা কি করিয়া বলিব! বিশেষতঃ, ইতিহাসে যখন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ ভক্ত রামপ্রসাদ "লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে আপত্তি প্রকাশ করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন, "চিনি হতে চাইনে রে, ভাই, চিনি খেতে ভাল বাসি!" অর্থাৎ, "বিরাট হিন্দু"র "বিরাট লয়" তাঁহার নিকট প্রার্থনীয় নহে, এ কথা তিনি স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্য অহম্ব্রহ্মবাদীর প্রতি কিরূপ বিরক্ত ছিলেন, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারা ছাড়া ভারতে দ্বৈতবাদী হিন্দুর সংখ্যা বিরল নহে। পূর্ব্বোক্ত হিন্দু মহাপুরুষদিগের সহিত যখন চন্দ্রনাথ বাবুর মতের ঐক্য হইতেছে না, তখন ভরসা করি, আমার ন্যায় লোকের পক্ষেও তাঁহার সহিত মতবিরোধ প্রকাশ করা নিতান্তই দুঃসাহসের কাজ হইবে না।

চন্দ্রনাথ বাবু যে লয়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেটাকে আমি তাঁহার স্বরচিত লয়তত্ত্ব বলিয়াছি, ইহাতেই তিনি কিছু অধিক রাগ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। অতএব ও কথাটা ব্যবহার না করিলেই ভাল করিতাম, স্বীকার করি; কিন্তু তাহা হইলে আমাদের আসল কথাটাই বলা হইত না। শাস্ত্রে যে একটা লয়তত্ত্ব আছে, বিশেষরূপে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ করা বাহুল্য; কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু যে লয়তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা যে শাস্ত্রে নাই, ইহাই আমার বক্তব্য।

এমনতর স্বতোবিরোধী কথা শাস্ত্রে থাকিবেই বা কি করিয়া? লয় অর্থে আত্মসম্প্রসারণ, নির্গুণ অর্থে সগুণ, এ সব কথা নূতন ধরণের। প্রথমতঃ, আত্মসম্প্রসারণ বলিতে কাহার প্রসারণ বুঝায়, সেটা ঠিক করা আবশ্যক। ব্রহ্ম ত আছেনই; আমি যদি আপনাকে তাঁহার মধ্যে লুপ্ত করিয়া দিই, তাহাতে তাঁহার তিলমাত্র বৃদ্ধি হইবে না; তিনি পূর্ব্বে যেমন ছিলেন, এখনও তেমনি থাকিবেন। আর আমি? আমি তখন থাকিব না। কারণ, আমি যদি থাকি ত আমাতে ব্রহ্মেতে ভেদ থাকে; আর আমি যদি না থাকি, তবে সম্প্রসারণ হইল কাহার? ব্রহ্মেরও নহে, আমারও নহে।

প্রকৃত লয়তত্ত্ববাদীগণ, আত্মপ্রসারণ নহে, আত্মসংহরণ করিতে উপদেশ দেন। "ইহা নহে" "ইহা নহে" "ইহা নহে" বলিয়া, সমস্ত উপাধি হইতেই তাঁহারা আপনাকে প্রত্যাহার করিয়া, অবশেষে যে আমি ভাবিতেছে, তাহাকেও বিলুপ্ত করিয়া দেন; জ্ঞাতৃ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভেদ দূর করিয়া দেন;—

"নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ।
বিদ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।"

তাঁহারা স্পষ্টই বলেন, কর্ম্মের দ্বারা কখনই এই লয়সাধন হয় না, কারণ, কর্ম্ম এবং অবিদ্যা অবিরোধী। কর্ম্ম হইতে কর্ম্ম, অনুরাগ হইতে অনুরাগেই লইয়া যায়। এই জন্য শঙ্করাচার্য্য বলেন;—

"অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ।"

কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু যে লয়তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, সে লয় প্রাপ্তির পক্ষে কর্ম্মসোপান "একান্ত আবশ্যক।" তাহার কারণ, চন্দ্রনাথ বাবু ব্রহ্মকে মুখে বলেন নির্গুণ, ভাবে বলেন সগুণ; মুখে বলেন লয়, কিন্তু তাহার অর্থ করেন সম্প্রসারণ।

আবার বলেন, লয়তত্ত্ববাদীরা "যে জগৎকে অসৎ ও মায়া বলিয়াছেন সে কেবল ব্রহ্মের তুলনায়। নহিলে বল দেখি কেন তাঁহারা এই অসৎটাকে এত ভয় করিয়া গিয়াছেন!" অর্থাৎ চন্দ্রনাথ বাবুর মতে জগৎটা প্রকৃত পক্ষে অসৎ নহে। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, শুক্তিকাকে যেমন রজত বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। মোহমুদ্গরের নিম্নলিখিত শ্লোকটি সকলেরই নিকট সুপরিচিত;—

ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোক ॥

তাহা ছাড়া, "তুলনায় মিথ্যা" বলিলে বিশেষ কিছুই বুঝায় না। মিথ্যা মাত্রেই তুলনায় মিথ্যা। মিথ্যার যদি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত, তবে ত সে সত্যই হইত।

অতঃপর সগুণ নির্গুণ লইয়া তর্ক।

লয়তত্ত্ববাদীরা ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিত্য, নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন, নির্বিকার, নিরাকার, নিত্য, মুক্ত ও নির্ম্মল বলিয়া থাকেন। এই জন্য ব্রহ্মত্ব লাভের জন্য তাঁহারা উপদেশ দিয়া থাকেন—"ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং।" অর্থাৎ, অনুরাগ ছাড়িয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে ব্রহ্মের অনুরূপ হওয়া যায়।

এদিকে আবার অন্যমতাবলম্বীরা ঈশ্বরকে ভক্তবৎসল বলেন। সে ঈশ্বর উদাসীন নহেন, কারণ তিনি পাপীর প্রতি ভীষণ ও পুণ্যাত্মার প্রতি প্রসন্ন। তিনি দৈত্যকে দলন করেন ও প্রহ্লাদকে রক্ষা করেন। তিনি নানা অবতার রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে নানা বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। কেবল যদি তিনি চিদানন্দময় হন, কেবল যদি তাঁহার আপনাতেই আপনার আনন্দ হয়, তাঁহার যদি আর কোন গুণ, আর কোন স্বরূপ না থাকে, এবং তাঁহার নিকট তিনি ছাড়া আর কিছুই স্থান না পায়, (যথা—জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে। চিদানন্দৈকরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি॥) তবে ঈশ্বর রুদ্র, ঈশ্বর দয়াময়, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ্বর ভক্তবৎসল, এ সমস্ত কথাই মিথ্যা।

কিন্তু চন্দ্রনাথ বাবু জগৎকে ঈশ্বরের "সৃষ্টিকৌশল" "ভগবানের লীলা" বলিতে কুণ্ঠিত হন না। এবং ব্যাখ্যা করিবার সময় বলেন, যদি ইহা তাঁহার লীলাই না হইবে, যদি তাঁহার সৃষ্টিই না হইবে, যদি নিতান্ত মায়া এবং অসৎ হইবে, তবে ইহাকে পণ্ডিতেরা কেন এত ভয় করিতে বলিয়া গিয়াছেন? আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহা যদি ভগবানের লীলা হয়, সৃষ্টি হয়, তবেই বা ইহাকে ভয় করিতে হইবে কেন; তাঁহার লীলা কি দানবের লীলা? তাঁহার সৃষ্টি কি সয়তানের সৃষ্টি? জগৎ যদি তাঁহার ইচ্ছা হয়, তবে সে ইচ্ছা কি মঙ্গল ইচ্ছা নহে?

অতএব, যদি বল জগৎ তাঁহার ইচ্ছা নহে, জগৎ সত্য নহে, তবেই বুঝিতে পারি, মিথ্যা জগৎকে অতিক্রম করিবার জন্য সাধনা কর্তব্য। কিন্তু যদি

জগৎ তাঁহার লীলা অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা, তবে সে ইচ্ছাকে অবিশ্বাস করিলে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস করা হয়।

যাঁহারা প্রথমোক্ত মতাবলম্বী, তাঁহারা জগৎ হইতে জগৎবাসীদের মন ফিরাইবার জন্য ক্রমাগত বিভীষিকা দেখাইয়া থাকেন। জগতের যে অংশ হীন, তাহারই প্রতি তাঁহারা ক্রমাগত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এমন কি, সৌন্দর্য্যকে কদর্য্য বীভৎসভাবে আঁকিতেও চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, সংসারে প্রেম কপটতামাত্র; যে পর্য্যন্ত ধনোপার্জ্জনে শক্তি থাকে, পরিজনগণ সেই পর্য্যন্তই অনুরাগ দেখায়, জরাজর্জ্জর হইলে কেহ একটি কথাও জিজ্ঞাসা করে না। মানবহৃদয়ে যে অকৃত্রিম মৃত্যুঞ্জয় প্রেম আছে, সে প্রেমের ছবি তাঁহারা গোপন করিয়া যান। তাঁহারা বলেন,—

"অয়মবিচারিতচারুতয়া
সংসারো ভাতি রমণীয়ঃ।।"

অর্থাৎ, যে সকল চারুতা দ্বারা সংসারকে রমণীয় বোধ হয়, সে সকল চারুতা বিচারের চক্ষে তিরোহিত হইয়া যায়।

এই সকল লয়তত্ত্ববাদীরা জগতের মধ্য দিয়া আত্মসম্প্রসারণ করিতে চাহেন নাই বলিয়াই, জগৎ হইতে জগৎবাসীকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই, জগতের প্রতি বারম্বার এত কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। মানবের অকৃত্রিম প্রেমের মধ্যে, বিশ্ব জগতের চিরনূতন চারুতার মধ্যে জগদীশ্বরের প্রেম এবং ঐশ্বর্য্য নির্দ্দেশ করা তাঁহাদের তত্ত্বের বিরুদ্ধ। কারণ, তাঁহাদের ঈশ্বর নির্গুণ, তাঁহাদের জগৎ মায়া।

কিন্তু বৈষ্ণবেরা জগতের সৌন্দর্য্যকে সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিতে ভীত হন নাই, এবং তাঁহারা ঈশ্বরপ্রেমকে মানবপ্রেমের সহিত তুলনা করিয়াছেন; তাহার কারণ, তাঁহারা ঈশ্বরকে সুন্দর বলেন, ঈশ্বরকে প্রেমস্বরূপ বলেন। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য তাঁহার বংশিধ্বনি, তাঁহার প্রেমসঙ্গীত, আমাদের প্রতি তাঁহার আহ্বান। ভক্ত এবং ঈশ্বর যদি স্বতন্ত্র না থাকেন, তবে এ সৌন্দর্য্য কিসের সৌন্দর্য্য, কাহার কাছে সৌন্দর্য্য! চন্দ্রনাথ বাবু যে "বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ সৌন্দর্য্যের" কথা বলিয়াছেন, লয়তত্ত্বে সে সৌন্দর্য্যের স্থান কোথায়? কারণ, ভেদজ্ঞানমাত্রেই মায়া—ভেদজ্ঞান ব্যতীত সৌন্দর্য্যের কোন অস্তিত্বই থাকিতে পারে না, যে হেতু সৌন্দর্য্য অনুভবসাপেক্ষ। ঈশ্বরকে

বই আর গতি নাই। এই জন্য চন্দ্রনাথ বাবু ব্যতীত কোন লয়তত্ত্ববাদী ব্রহ্মকে সুন্দর বলেন না। তাঁহারা বলেন,—

অনণ্বস্থূলমহ্রস্বমদীর্ঘমজমব্যয়ং।
অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ।

যাহা হউক, চন্দ্রনাথ বাবু যাহাকে "বিরাট লয়" বলেন, তাহা লয় নহে, আত্মসম্প্রসারণ, অর্থাৎ লয়ের ঠিক বিপরীত। তাঁহার মতে নির্গুণ ব্রহ্ম নির্গুণ নহেন, প্রকৃত পক্ষে সগুণ এবং এই জগৎ তাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার লীলা। অসৎ জগৎ প্রকৃত পক্ষে অসৎ নহে, এবং বহু সাধনার পর চরম জ্ঞান লাভ করিলে একটা বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এরূপ লয়তত্ত্ব যে আমাদের মতের বিরুদ্ধ নহে, তাহা আমাদের প্রতিবাদ পড়িলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। কারণ, আত্ম হইতে পর এবং পর হইতে পরমাত্মার প্রতি আত্মার প্রসারণ—এবং জগৎ হইতে জগদীশ্বরের অসীম সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি, বোধ করি, জগতের সমুদায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মমতেরই লক্ষ্য। ঈশ্বরের প্রতি একান্ত আত্মসমর্পণ করিয়া স্বার্থপরতার বিনাশ সাধন, বোধ করি, খৃষ্টান ধর্ম্মেরও উপদেশ। ঈশ্বরচরিত্রকে আদর্শ করিয়া আপন ক্ষুদ্রতা পরিহার করা খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি প্রধান অনুশাসন, এবং সকল উন্নত ধর্ম্মশাস্ত্রেই সেই উপদেশ দেয়।

চন্দ্রনাথ বাবু যদি ইহাকে লয়তত্ত্ব নাম দেন, তবে তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে আমরা আপত্তি করিব, বলিব—লয়কে লয় অর্থে ব্যবহার না করিয়া তাহার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করিলে কোন ফল নাই, বরঞ্চ বিপরীত ফলেরই সম্ভাবনা; অতএব যখন তিনি "আত্মসম্প্রসারণ" নামক একটি শব্দ রচনা করিয়াছেন এবং উক্ত শব্দে তাঁহার মনোভাব যথার্থ ব্যক্ত হইতেছে, তখন ঐ শব্দটাকেই যথাস্থানে প্রয়োগ করিলে, সাধনার সমালোচক এবং সাহিত্যের পাঠকগণকে কোনরূপ বিভ্রাটে ফেলা হইবে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মিরিয়ম ও সোরাব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"সোরাব!"

শব্দ অনেক দূর গেল। সমুদ্রতীরসৈকতে মধ্যাহ্নের স্তব্ধতা ভেদ করিয়া শব্দ বহিয়া গেল। সমুদ্রগর্জ্জন মন্দীভূত হইয়াছে। নীল জলবিস্তার স্থির। যেখানে আকাশ জলের সহিত মিশিয়াছে, সেইখানে যেন একটু তরঙ্গচাঞ্চল্য, তাহার উপর ফেনের রেখা। সৈকতে জলের অলস উচ্ছ্বাস, শব্দ অস্পষ্ট সোহাগের তুল্য। কেবল পূর্ণতার চঞ্চলতা, অস্থিরতার নহে।

আর এক দিকে জলের মধ্যে, বেলাভূমির নিকটে কয়েকটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত। চারিদিকে জল ঘুরিয়া ঘুরিয়া আছড়াইতেছে—সে শব্দও এখন বড় মৃদু। যেন সেই পর্ব্বত ও সেই সমুদ্র ও সেই যোজনব্যাপী সৈকত, সন্ধি করিয়া, মনুষ্যকণ্ঠ শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে অন্য শব্দ স্থগিত রাখিয়াছে। একবার বায়ু ও সমুদ্র মিলিয়া গর্জ্জিলে সেখানে আর কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে পারে?

"সোরাব।" আবার মনুষ্যকণ্ঠ ডাকিল। স্বর কোমল, কিন্তু পূর্ণ ও উচ্চ। নিকটস্থ একটা পর্ব্বতে তরঙ্গের অবিরাম আঘাতে একটা প্রকাণ্ড গুহা রচিত হইয়াছিল। সেই গুহা হইতে তীক্ষ্ণ প্রতিধ্বনি আসিল—আব!

যে ডাকিতেছিল, সে থাকিয়া থাকিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া বিরক্ত হইয়া, মুক্ত কেশ কপাল ও চক্ষের উপর হইতে সরাইয়া ফেলিতেছিল।

এমন সময় দুইটি ক্ষুদ্র শৈলের মধ্যে একটি ছোট ডিঙ্গী দেখা দিল। ডিঙ্গীটি নিতান্ত ছোট, দুই জন লোক কষ্টে বসিতে পারে। ডিঙ্গীর ভিতর এক জন লোক দাঁড়াইয়াছিল। হাতে একটা ছোট লগী। কখন জলের তলে, কখন পার্শ্বস্থ পাহাড়ে লগী ঠেলিয়া বেগে আসিতেছিল। তীরে ডিঙ্গী ঠেকিতে না ঠেকিতে সে ব্যক্তি লাফ দিয়া বালুকায় পড়িল।

যে ডাকিতেছিল, সে ছুটিয়া জলের কাছে আসিল। কহিল, "সোরাব!"

সোরাব কহিল, "মিরিয়ম!"

আর কোন কথা হইবার এমন কোন বিশেষ আবশ্যক ছিল না। কিন্তু মিরিয়ম অনেক ক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়াছিল, বার কয়েক সোরাবকে ডাকিয়াছিল

বিশেষ, চুপ করিয়া থাকিবার তাহার বয়স নয়। কহিল "আমি তোমাকে ডাকিতেছিলাম, শুনিতে পাইতেছিলে?"

সোরাব হাত নাড়িয়া কহিল, "খুব শুনিতেছিলাম। সেই জন্য ত এত শীঘ্র আসিলাম। একদিন তুমি ডাকিতেছিলে, আমি কম্‌টি হইতে শুনিতে পাইয়াছিলাম।"

কম্‌টি সেখান হইতে চারি ক্রোশ দূরে একটি গ্রাম। মিরিয়ম বিরক্ত হইয়া কহিল, "তোমার ঐ কেমন স্বভাব। তুমি আমায় চিরকাল বিদ্রূপ কর।"

সোরাব হাসিয়া কহিল, "স্বভাবের দোষ, সে ত আর আমার নয়। আমায় ডাকিতেছিলে কেন?"

"তোমার কি খাওয়া দাওয়া মনে নাই? রুটি ঠাণ্ডা হইয়া গেল, বুড়ী বকিতেছে।"

বুড়ী সোরাবের পিতামহী। মিরিয়ম তাহাদের জ্ঞাতিকন্যা। মিরিয়মের বাপ মা কেহ ছিল না। সোরাবের মাতার কাল হইয়াছে। পিতা বর্ত্তমান, বয়স হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় বার বিবাহ করে নাই। মিরিয়ম ও সোরাব একত্রে প্রতিপালিত হইয়াছিল। মিরিয়মের বয়স সপ্তদশ বৎসর, সোরাব দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবক। এই দুই জনে বিবাহ এক প্রকার স্থির হইয়াছিল। সোরাবের পিতামহীর ইচ্ছা, তাহার জীবদ্দশায় বিবাহ হয়। সোরাবের পিতা বলিত, "বিবাহ ত হইবেই। সোরাব আর একটু বড় হউক।" তাহার চক্ষে সোরাব এখন ছেলেমানুষ।

সোরাব ও মিরিয়ম বিবাহের ভাবনা বড় ভাবিত না। দুই জনে এইমাত্র জানিত যে, তাহাদের কখন বিচ্ছেদ হইবে না। দুই জনে একত্রে খেলা করিত, একত্রে গল্প করিত।

মিরিয়ম যখন আহারের কথা বলিল, তখন সোরাব হাসিতে লাগিল, কহিল, "ক্ষুধা বোধ হইতেই আমি আসিয়াছি। আই ত চিরকাল বকে।"

বলিয়া সোরাব গৃহাভিমুখে চলিল। মিরিয়ম তাহার অনুবর্ত্তিনী হইল।

কাম্বোজ প্রদেশের দক্ষিণে মহাসাগরতীরে কেটি নামক গ্রামে ইহা-

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সোরাবের পিতা জাতিতে মুসলমান, ব্যবসায় কখন ধীবরের, কখন মাঝির। সোরাবও এই দুই কর্ম্মে বিলক্ষণ দক্ষ হইয়াছিল।

কুটীরে গিয়া সোরাব খাইতে বসিল। তাহার পিতামহী, বকিতে বকিতে তাহার সম্মুখে লোহিত তণ্ডুলচূর্ণের রুটি ও সদ্যধৃত ভর্জ্জিত মৎস্য রাখিল। ইহাই তাহাদিগের নিত্য আহার। যে দিন একটু চাট্‌নী হইত, কিম্বা হাটের দিন এক পয়সার আলু কিম্বা বেগুন আসিত, সে দিন একটা যজ্ঞের ব্যাপার হইত। তাহারা সেই তণ্ডুলচূর্ণ ও মৎস্য খাইয়াই সন্তুষ্ট, সেই আহারেই সোরাব অসুরতুল্য বলশালী। সমুদ্রের মুক্ত বাতাসে, সমুদ্রের তরঙ্গাঘাতে, ইহাদের দেহ গঠিত হইত।

বাল্যকালে সোরাব গ্রামের বালকদিগের দলপতি ছিল। সকল খেলার সেই নেতা। যেখানে সাহস ও বলের প্রয়োজন, সোরাব সেখানে সকলের আগে যাইত। সেই অবধি মিরিয়ম সোরাবকে অসাধারণ ক্ষমতাশালী মনে করিত। বালুকাস্তূপের উপর বসিয়া, অথবা সমুদ্রসলিলবেষ্টিত পর্ব্বতে বসিয়া, সোরাব মিরিয়মকে যে সকল গল্প শুনাইত, তাহাতে সে বালিকা বিস্মিত হইয়া সোরাবের দিকে চাহিয়া থাকিত। কখন অপরাহ্নকালে, পর্ব্বতজাত নারিকেলবৃক্ষতলে সোরাব মিরিয়মকে করীম নামক দস্যুর অদ্ভুত উপাখ্যান বলিত। করীম বড় বীর ছিল, কেটির সন্নিকটস্থ মোর্‌ছল গ্রামে তাহার জন্ম। মিরিয়ম তাহার কথা শুনিয়াছে? বালিকা বিস্ফারিতনেত্রে গম্ভীরভাবে মাথা হেলাইত। করীমের দলে দুই শত ডাকাইত ছিল, তাহারা কাহাকেও ভয় করিত না। একবার নবাবের সিপাহীদিগকে হারাইয়া দিয়াছিল। করীমের একটা ঘোড়া ছিল, তাহাকে অলঙ্কার পরাইয়া যখন লইয়া আসিত, তখন সেটা নৃত্য করিত। গল্প বলিতে বলিতে সোরাবের আত্মভ্রম জন্মিত, সে উঠিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া, পা ফেলিয়া ফেলিয়া নৃত্য করিত। মিরিয়ম অবাক্ হইয়া তাহাই দেখিত। দেখিতে দেখিতে তাহার ঠোঁটের ও চোকের কোণে হাসি ফুটিত। ক্রমে তাহার মুখখানি হাসিতে ছাইয়া পড়িত, কহিত, "তুমি কি করীমের ঘোড়া?"

সোরাব ভ্রূভঙ্গী করিয়া কহিত, "না, আমি করীমের মত ঘোড়ায় চড়িব। আমাকে সকলে ভয় করিবে। আমি দস্যু হইব। অনেক দূরে কারাঙ্গা পাহাড়ে গুহায় বাস করিব। লুট করিয়া সব জিনিস সেইখানে রাখিব।

পাঁচ শত ডাকাতের আমি সর্দ্দার হইব। নবাবের বেটীকে কাড়িয়া আনিয়া, তাহাকে বিবাহ করিব।"

বালিকার মুখের সেই আনন্দকৌতুকের একাগ্রতা নিমেষের মধ্যে লুপ্ত হইত ও একটা ঘোর বিষাদের মেঘ আসিয়া তাহার মুখ ঢাকিত। বালিকা কহিত, "সোরাব, তুমি নবাবপুত্রীকে বিবাহ করিবে?"

মিরিয়ম জানিত, সোরাবের অসাধ্য কিছুই নাই। সে মনে করিলেই নবাবপুত্রীকে বিবাহ করিতে পারে।

সোরাব বুঝিতে পারিত, ভুল হইয়াছে। বলিত, "আমি অন্য লোকের কথা বলিতেছি। আমি কখন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। দেখ, তোমাতে আমাতে দুই জনে মিলিয়া ডাকাইতি করিব।"

তাহাতে মিরিয়মের কোন আপত্তি ছিল না।

শঙ্কর বল্লাল নামক একজন বিখ্যাত বোম্বেটে ছিল। শঙ্করের গল্প করিতে করিতে সোরাব অত্যন্ত উৎসাহিত হইত। নাবিকদস্যু হইবার তাহার বড় সাধ। শঙ্করের মত বৃহদাকার সমুদ্রগামী নৌকা পাইলে, সোরাব আপনাকে নবাবের অপেক্ষা সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিত। কিন্তু, কেটীগ্রামে কতকগুলা জেলেডিঙ্গী ও ক্ষুদ্র নৌকা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। নৌকায় করিয়া কিনারা দিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে গমনাগমন চলিত। কিন্তু মুক্ত সমুদ্রে গমনের উপযোগী একখানাও নৌকা ছিল না।

এইরূপে দিন কাটিত। ডিঙ্গী করিয়া যখন সোরাব জাল ফেলিতে যাইত, তখন কখন কখন মিরিয়ম তাহার সঙ্গে যাইত। ডিঙ্গী কোন দিন উল্টাইয়া যাইত, দুই জনে হাসিতে হাসিতে হংস হংসীর ন্যায় সাঁতার দিয়া ডিঙ্গী ঠেলিয়া লইয়া তীরে উঠিত। ঝড়ের সময় সমুদ্রের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দুই জনে দেখিত। পর্ব্বতে সফেন তরঙ্গভঙ্গ দেখিত, আকাশপূরিত ভৈরব উচ্ছ্বাস শ্রবণ করিত। তরঙ্গের উপর মৎস্যলোলুপ পক্ষীর ক্রীড়া দেখিত। সমুদ্রসীমায় প্রতিদিন সূর্য্যাস্ত দর্শন করিত, পূর্ণচন্দ্রের নীচে জোয়ারের কল কল আগমন দেখিত। প্রশান্ত প্রসুপ্ত সমুদ্রতীরে বসিয়া থাকিত। নিশীথাগমে পর্ব্বতের গহ্বরসমূহ শব্দায়মান বিহঙ্গকুলে পরিপূর্ণ হইত। সৈকতভূমিতে টিট্টিভ ক্রীড়া করিত। কখনও সমুদ্রের মধ্যে বহু দূরে কোন জাহাজের আলোক গতিশীল নক্ষত্রের মত লক্ষিত হইত, কখনও আলেয়ার মত তরঙ্গান্তরালে লুক্কায়িত হইত ও পুনরায় নেত্রগোচর হইত। সন্ধ্যার সময় কোন

দিন তাহারা পর্ব্বতের উপর জলের নিকট বসিয়া সলিলান্তর্গত খদ্যোতিকার ন্যায় আলোক দেখিত। জলে আগুন লাগিয়াছে? সোরাব কখন বলিত—মৎস্যডিম্বের আলোক, কখন বলিত—সমুদ্রতলে নানাবিধ রত্নরাশি আছে, তাহারই রশ্মি! সে যখন যাহা বলিত, মিরিয়ম তাহাই বিশ্বাস করিত।

মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত নীল সমুদ্রকূলে, মুক্ত রৌদ্র বায়ুতে উভয়ে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সোরাব বিস্তৃতবক্ষ, দৃঢ়বাহু, তীক্ষ্ণচক্ষু, নির্ম্মল হৃদয়; মিরিয়ম পূর্ণায়তন, কর্ম্মক্ষম, সুন্দরী, অকপটস্বভাব। সমুদ্রতীরে মজনুঁ ও লয়লা থাকিলে যেমন হয়, সেইরূপ। ইহাদের প্রেম স্বতঃ বর্দ্ধিত, স্বাভাবিক বিকার ও ব্যাকুলতাবর্জ্জিত, দৃঢ়মূল। নিশ্চিন্ততাই তাহার বল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বর্ষাকাল এখনও আসে নাই। একটু বায়ুর বেগ বাড়িয়াছে, কিন্তু এখনও ঝড়ের ভয় নাই। অকস্মাৎ এক রাত্রে দূর হইতে সমুদ্রগর্জ্জন শ্রুত হইল। নৈশচারী সৈকতোপবিষ্ট পক্ষী কোলাহল করিয়া উড়িয়া গেল। গ্রামবাসীরা সে শব্দ জানিত। যাহারা জাগ্রত ছিল, তাহারা অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া আপন আপন ডিঙ্গী তুলিয়া বালুকার উপর রাখিল। যাহারা খোঁটায় বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা খোঁটা ভাল করিয়া পুঁতিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে ঝটিকা গর্জ্জিতে লাগিল। পর্ব্বতে পর্ব্বততুল্য তরঙ্গাভিঘাত হইতে লাগিল। ফেনরাশিতে চারিদিক শ্বেতবর্ণ হইয়া উঠিল। আকাশে ছিন্ন মেঘ, অস্পষ্ট চন্দ্রালোক। পর্ব্বতের অন্তরাল বলিয়া গ্রামের কুটীরগুলি তুফান হইতে অনেক রক্ষা পাইত। কিন্তু বাহিরে সমুদ্র বড় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। ঝড়ের গর্জ্জনে, তরঙ্গের আস্ফালনে, গ্রামবাসীরা পরস্পরের কথা শুনিতে পায় না। গ্রামবাসীরা জাগরিত হইয়া, কিছু ভীত হইয়া, সেই উৎপাত দর্শন করিতে লাগিল।

সহসা সেই সংক্ষুব্ধ সাগরগর্ভে আলোক দৃষ্ট হইল। তরঙ্গের উত্থানপতনের সহিত আলোক উৎপতিত ও অধঃপতিত হইতেছে। আলোক বহুদূর নহে, তীরাভিমুখে আসিতেছে। গ্রামবাসীরা বুঝিল, ঝঞ্ঝাবাতে পথহারা অথবা অবশীভূত হইয়া, কোন নৌকা অথবা জাহাজ সেই স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। পর্ব্বতে লাগিয়াই হউক, অথবা বালুকায় ঠেকিয়াই হউক, মারা যাইবেই। রক্ষা পাইবার কোন আশা নাই।

সোরাবও সেইখানে দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল, "নৌকার আরোহীদিগকে রক্ষা করিবার উপায় ?"

যাহারা পাশে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা কহিল, "উপায় কি ?"

সোরাব রাগিয়া কহিল, "আমরা এতগুলা লোক দাঁড়াইয়া আছি, আর আমাদের সম্মুখে মানুষগুলা মারা যাইবে ? আমার সঙ্গে কে যাইবে, আইস।"

সোরাবের সমবয়স্ক কয়েকজন যুবক তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল।

সোরাবের পিতা ধমক দিয়া কহিল, "এ রাত্রে নৌকায় কে যাইবে ? এ কি ছেলে মানুষের কাজ ?"

সোরাব কাহারও কথা শুনিল না। অগত্যা তাহার পিতা কহিল, "তাহা হইলে আমিও যাইব।"

বালুকার উপর কয়েকটা ডোঙ্গা পড়িয়াছিল। সোরাব ও আর কয়েক জন মিলিয়া, চারিটা ডোঙ্গা উল্টাইয়া লইয়া, দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিল। একটা ভেলার মত হইল। জলে নিমজ্জিত হইলেও ডুবিবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। কতকগুলা মোটা মোটা কাছি লইয়া, সোরাব ও আর পাঁচ জন যুবক ভেলার উপর আরোহণ করিল। সোরাবের পিতা একটা দাঁড় লইয়া হালের মত করিয়া ধরিল।

তরঙ্গ ও জলের বেগ তীরের অভিমুখে। অনেক পরিশ্রম করিয়া একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নিকটে ভেলা লইয়া গেল। যেরূপ ভয়ঙ্কর তরঙ্গাঘাত হইতেছিল, তাহাতে পর্ব্বতে লাগিলে সেই জীর্ণ ভেলা নিঃসন্দেহ চূর্ণ হইয়া যাইত, কিন্তু সোরাব ও তাহার সঙ্গীগণ লগী দিয়া ভেলা দূরে রাখিল। দ্বিতীয় তরঙ্গ আসিবার পূর্ব্বেই, সোরাব লম্ফ দিয়া সন্তরণপূর্ব্বক পর্ব্বতে উঠিল। তাহার কোমরে দড়ী বাঁধা ছিল। সেই দড়ী টানিয়া ভেলা পর্ব্বতে টানিয়া লইল। তখন সকলে মিলিয়া ভেলা টানিয়া তুলিয়া শুষ্ক স্থানে রাখিল।

পর্ব্বতে উঠিয়া সকলে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। অনতিদূরে একটা সমুদ্রগামী নৌকা, ভগ্নমাস্তল, ছিন্নপাল হইয়া তরঙ্গ ও বায়ুর তাড়নে বেগে পর্ব্বতাভিমুখে আসিতেছে। কয়েক জন অস্পষ্টাকৃতি মনুষ্যমূর্ত্তি নৌকার উপর লক্ষিত হইতেছে।

নিমেষের মধ্যে নৌকা প্রচণ্ড বেগে পর্ব্বতমূলে আহত হইল। সেই

আঘাতে নৌকা দ্বিধা হইয়া গেল। সেই শব্দ, ঝটিকা ও তরঙ্গগর্জ্জনের সহিত একটা হাহাকার রব উঠিল। পর্ব্বতের উপর যাহারা ছিল, তাহারা রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখিতে লাগিল।

সোরাব ও সন্তরণপটু আর কয়েক জন যুবক জলে লাফাইয়া পড়িল। সন্তরণপূর্ব্বক তাহারা ছয় জন আরোহীকে রক্ষা করিল। মাঝিরা সাঁতার দিয়া পূর্ব্বেই পর্ব্বতে উঠিয়াছিল। নৌকায় ছয় জন মাত্র আরোহী ছিল, তাহারা সকলেই রক্ষা পাইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গ্রামবাসীরা সেই কয় জন লোককে সাধ্যমত যত্ন করিতে লাগিল। দুই চারি দিনের পর, নাবিক ও আরোহীগণ স্বদেশে চলিয়া গেল। আরোহীদিগের মধ্যে ছত্রিশগড়ের সুবাদারের দুই জন নায়েক ছিল। সম্মান তাহাদিগেরই অধিক হইল। সুবাদার এক জন ক্ষুদ্র নবাব, তাঁহার নায়েকেরাও আপনাদিগকে বড় লোক মনে করিত। গরিব গ্রামবাসীরাও তাহাই মনে করিল।

তাহারা দুই জন যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সোরাবের অবর্ত্তমানে তাহার পিতার নিকট একটা গোপনীয় কথা পাড়িল। এক জন কহিল, "তুমি সুবাদার সাহেবের নাম শুনিয়াছ?"

সোরাবের পিতা জাতিতে ধীবর, গ্রামের বাহিরে কখন যায় নাই, সে কি জানিবে? লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিল।

নায়েক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ঘরে যে মেয়েটি আছে, সেটি কি তোমার কন্যা?"

সোরাবের পিতা কহিল, "না, জ্ঞাতিকন্যা।"

নায়েক কহিতে লাগিল, "কন্যাটি সুন্দরী। সুবাদার সাহেবের হুকুম আছে, সুন্দরী কন্যা কেহ পাইলে তাঁহাকে আনিয়া দিবে। তাঁহার জেনানা মহলে অনেক সুন্দরী আছে, কিন্তু এমন সুন্দরী আছে কি না সন্দেহ। সুবাদার সাহেব ইহাকে গ্রহণ করিলে তোমার পরম সৌভাগ্য। তোমার এ দুঃখের দশা মোচন হইবে, হয় ত তোমার পুত্র ভাল চাকরী পাইবে, আমরাও কিছু পুরস্কার পাইব। তুমি যদি বল ত আমরা গিয়া সুবাদার সাহেবকে খবর দিব, তিনি লোক জন পাঠাইয়া কন্যাটিকে লইয়া যাইবেন।

সোরাবের পিতা কহিল, "আমার পুত্রের সহিত মিরিয়মের বিবাহ হইবার কথা। সে এ কথা শুনিলে রাগ করিবে, হয় ত মিরিয়মও সম্মত হইবে না। আমাকে দিয়া এ কর্ম্ম হইবে না।"

নায়েক কহিল, "তোমার ইচ্ছা। কিন্তু আমরা যেমন দেখিয়াছি, সুবাদার সাহেবের নিকট আমাদিগকে সেইরূপ বলিতে হইবে। তিনি যদি এই কন্যাকে নিকা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তোমার আপত্তি থাকিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। ফল হইবে এই যে, তিনি ইহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইবেন, হয় ত তোমার শাস্তি হইবে, কিম্বা তোমায় বাঁধিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ রাখা হইবে। তোমার ছেলে রাগ করিবে, সেই ভাবনা তোমার বেশী হইল, আর সুবাদার সাহেব রাগ করিলে কি করিতে পারেন, সে কথা ভাবিতেছ না?"

বৃদ্ধ ভীত হইয়া কহিল, "আমি বড় বিপদেই পড়িলাম। কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

নায়েক কহিল, "আর কেহ হইলে বিশেষ সৌভাগ্যের কথা মনে করিত। তোমার বুদ্ধি অল্প, তাই বিপদ মনে করিতেছ।"

বৃদ্ধ কহিল, "তবে আমি একটু ভাবিয়া দেখি।"

"ভাবিবার কথাটা কি? আমরাও এখানে আর বিলম্ব করিতে পারি না। তুমি নিজের মঙ্গল বুঝিয়া একটা উত্তর দাও।"

নিরুপায় দেখিয়া বৃদ্ধ কহিল, "আমি গরিব মানুষ, সুবাদার সাহেবের সঙ্গে কি ঝগড়া করিব? যাহা তাঁহার ইচ্ছা ও তোমাদের পরামর্শ, তাহাই হইবে। কিন্তু সোরাব কিম্বা মিরিয়ম এ কথার কিছু যেন না জানিতে পায়।"

নায়েক হাসিয়া কহিল, "তাহাদিগকে বলিবার জন্য আমাদের ত বড় ভাবনা। পরে তাহারা আপনারাই জানিতে পারিবে।"

নায়েকদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ, সোরাব মিরিয়ম এ কথা জানিতে পারিল। মিরিয়ম কুটীরের বাহিরে কর্ম্ম করিতেছিল, ভিতরে চুপি চুপি কথা হইতেছে শুনিয়া, তাহার কৌতূহল জন্মিল। কুটীরের নিকট গিয়া কান পাতিয়া সকল কথা শুনিল। সোরাবের পিতামহী হাটে গিয়াছিল।

সকল কথা শুনিয়া, মিরিয়ম বেগে সমুদ্রতীরে উপনীত হইল। সোরাব বসিয়া ডিঙ্গী মেরামত করিতেছিল। মিরিয়মের মুখ দেখিয়া তাহার আশঙ্কা

মিরিয়ম কহিল, এখানে বলিতে পারিব না। যেখানে কেহ না দেখিতে পায়, সেইখানে চল।”

কিছু দূরে পর্ব্বতের পার্শ্বে নারিকেল বন। সেই বনচ্ছায়ায় ও পর্ব্বতের গুহায় গুহায়, বাল্যকালে মিরিয়ম ও সোরাব গল্প ও খেলা করিত। দুই জনে সেইখানে গেল।

মিরিয়ম সোরাবের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কহিল, “আমাকে উহারা এখান হইতে লইয়া যাইতে চায়।”

মিরিয়মের দর্পণবৎ স্বচ্ছ প্রাণে বিষাদের মলিনতা স্পর্শ করিয়াছিল। যে প্রেম এত দিন সুপ্ত সমুদ্রের ন্যায় স্থির ছিল, বিপদের আশঙ্কায়, আজ সেই প্রেম হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া উঠিল। সোরাব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কে লইয়া যাইতে চায়?”

“এই দুই জন নায়েক।” ক্রমে মিরিয়ম সকল কথা খুলিয়া বলিল। বলিতে বলিতে তাহার মুখ কখন লজ্জায়, কখন রাগে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কথা সমাপ্ত হইলে, সোরাব হাসিয়া উঠিল। “আমি থাকিতে তোমায় লইয়া যাইবে? আচ্ছা, দেখা যাইবে।”

তাহার পর যাহা কথা হইল, তাহা তেমন কাজের নয়। কিছু ব্যক্ত, কিছু অব্যক্ত; কিছু পরিস্ফুট, কিছু অস্ফুট; কিছু চক্ষের কটাক্ষে, কিছু ওষ্ঠাধরের মর্ম্মরে। প্রেমের আকুলতা আজ ইহাদের হৃদয়ে প্রথম জাগ্রত হইল। আজ বিরহবিচ্ছেদ আশঙ্কায় ইহারা প্রথমবার প্রণয়ের কথা কহিল।

মিরিয়মকে সান্ত্বনা করিয়া সোরাব এক জন সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিল। পরামর্শ গোপনীয়, কিন্তু পরামর্শান্তে দুই জন খুব হাসিতে লাগিল।

নায়েক দুই জন যখন বিদায় হইল, তখন সোরাব তাহাদিগকে পথ দেখাইতে চলিল। সোরাবের পিতা কুটীর হইতে কিছু দূর আসিয়া ফিরিয়া গেল। নায়েক দুই জন সোরাবের সহিত গল্প করিতে করিতে চলিল। পথে সোরাবের সেই বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সোরাব তাহাকেও ডাকিয়া লইল।

গ্রাম পার হইয়া তাহারা একটা মাঠে উপস্থিত হইল। সেখানে জন-

পথিক নাই দেখিয়া, পথের মধ্যে নায়েকদ্বয়ের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা আমার পিতার সহিত কি কথা কহিতেছিলে?"

নায়েক দুই জন অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। কি কথা? কথা ত অনেক হইয়া থাকিবে, কিন্তু রাগের কথা ত কিছুই হয় নাই। পথের মধ্যে সহসা এরূপ ভাবান্তর কেন?

সোরাব কহিল, "মিরিয়মের বিষয় কি বলিতেছিলে?"

নায়েকেরা তখন বুঝিতে পারিয়া একটু হাসিল। এক জন কহিল, "তোমার পিতা তোমায় কিছু বলিয়াছেন?"

সোরাবের রাগ বাড়িতেছিল। কহিল, "এত বড় স্পর্দ্ধা! জান না, মিরিয়মের সহিত আমার বিবাহ হইবে?"

নায়েক কৌতুক করিয়া কহিল, "সে কথা আমি ভাবি নাই। যে স্ত্রীলোক ছত্রিশগড়ের সুবাদারকে ছাড়িয়া ধীবরবালকের পত্নী হয়, সে ভাগ্যবতী বটে। আমি গিয়া——"

কথাটা শেষ হইল না। সোরাব নায়েককে সবলে পদাঘাত করিল। নায়েক ধূলায় পড়িয়া গেল।

এ সম্ভাবনা নায়েকদ্বয়ের মনে একবারও উদিত হয় নাই। তাহারা সুবাদারের লোক, তাহাদিগের অঙ্গে একজন নীচ ধীবরসন্তান যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে, এ কথা তাহারা কল্পনা করিতে পারে নাই।

এক বার পদাঘাত করিয়া সোরাব ক্ষান্ত হইল না। সে ও তাহার বন্ধু, দুই জনে মিলিয়া দুই নায়েককে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। নায়েক দুই জন প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু সেই বলিষ্ঠ যুবকদ্বয়ের তুলনায়, তাহারা নিতান্তই হীনবল। মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত ও পদাঘাতে ব্যাকুল হইয়া তাহারা দোহাই দিতে লাগিল। সোরাব হিসাব করিয়া, গণিয়া গণিয়া প্রহার করিতে লাগিল। "এই তোর জন্য"—মুষ্ট্যাঘাত। "এই তোর সুবাদারের জন্য"—মস্তকে পদাঘাত। "এই তোর বাবার জন্য"—আবার পদাঘাত। "সুবাদার বেটাকে দেখিতে পাই ত এমনি করিয়া দিই"—চপেট ও মুষ্টিবৃষ্টি। "জলে ডুবিয়া মরিলেই তোর ভাল ছিল"—প্রহার। "আবার এখানে কখন মুখ দেখাইবি?"—ধূলিতে মুখ-

মারি।" সুবাদারের মাথাটা সেখানে ছিল না, সুতরাং নায়েকেরই মাথার উপর লাথিগুলা পড়িল।

নায়েকদিগকে অবশেষে যখন ছাড়িয়া দিল, তখন তাহাদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয়। সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত, বস্ত্র ছিন্ন, গণ্ড বহিয়া অশ্রু বহিতেছে। নিষ্কৃতি পাইয়া, তাহারা আর কোন কথা না কহিয়া, ঊর্দ্ধ-শ্বাসে পলায়ন করিল। সোরাব ও তাহার বন্ধু হাসিতে হাসিতে গ্রামে ফিরিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ক্রোধোপশম হইলে সোরাব যখন ভাবিতে লাগিল, তখন কথাটা তেমন হাসির বোধ হইল না। নায়েক দুই জন মার খাইয়া চুপ করিয়া থাকিবে, ইহা অসম্ভব। সোরাব চিন্তা করিয়া, সমবয়স্ক কয়েক জন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিল। গ্রামের সকল যুবকই সোরাবের বশীভূত। এক দিন গ্রামের বাহিরে একটা বনের মধ্যে যুবকগণ সমবেত হইল। সোরাব তাহাদিগকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি কেহ বলপূর্ব্বক তোমাদের স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহা হইলে তোমরা কি কর?"

উদ্ধত যুবকমণ্ডলী সমস্বরে কহিল, "তাহার মাথাটা কাটিয়া লইয়া তাহার দেহ শৃগালকে দিই।"

সোরাব কহিল, "এক জন হইলে সকলেই পারে। কিন্তু অনেক লোক হইলে?"

"আমরা সকলে মিলিয়া, তাহাদিগকে হাঁকাইয়া দিব।"

সোরাব কহিল, "দেখ, বিপদের আশঙ্কা অনেক। শুধু আমার জন্য তোমরা সকলে বিপদে পতিত হও, এমন কথা আমি বলিতে পারি না। তবে যদি আমার অপমান, আমার বিপদ তোমরা নিজের অপমান, নিজের বিপদ মনে কর, তাহা হইলে আমি তোমাদিগের সাহায্যপ্রার্থী। আমাদের গ্রাম হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন রমণীকে কেহ অপহরণ করে নাই। এরূপ অপমান গ্রামের অপমান। তোমরা যদি এই রূপ মনে কর, তাহা হইলে আমার সাহায্য কর।"

সোরাবের গাম্ভীর্য্য ও বাক্যবিন্যাসকৌশল দেখিয়া, যুবকেরা চমৎকৃত হইল। প্রেমের বলে বলবান হইলে মানুষ কি না করিতে পারে? যুবকেরা

একবাক্যে কহিল, "তোমার অপমান আমাদের অপমান, তোমার বিপদ আমাদের বিপদ। তোমার যাহা অভিমত হয়, আমরা তাহাই করিব।"

সোরাব কহিল, "তবে সকলে শপথ কর। আরও শপথ কর যে, এ কথা প্রকাশ হইবে না। গ্রামের বৃদ্ধগণ আমাদের এ পরামর্শ কিছুই অবগত হইতে পারিবে না।"

সকলে সেই মত শপথ করিল। সেই দিন হইতে গ্রামের যুবকগণ প্রতিদিন কার্য্যসমাপনান্তে ব্যায়াম শিক্ষা করিত। সকলে লাঠি ঘুরাইতে শিখিল। তাহাদের নূতন সখ্ দেখিয়া বৃদ্ধেরা হাসিত ও জিজ্ঞাসা করিত, "তোরা কি যুদ্ধে যাইবি না কি?" যুবকেরা শপথভঙ্গভয়ে কাহাকেও কিছু বলিত না।

দুই মাস এইরূপে গেল। এক দিন নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে সংবাদ আসিল, ছত্রিশগড়ের সুবাদার দলবল সঙ্গে সেই দিকে আসিতেছেন। নায়েকদিগের কথা সোরাবের পিতার স্মরণ হইল, কিন্তু আশঙ্কার কারণ সে কিছু অবগত ছিল না। যুবকদিগের পূর্ব্ব সঙ্কল্প স্থির রহিল। এ সময় কথা গোপন করিলে কোন ফল নাই দেখিয়া, সোরাব তাহার পিতাকে কহিল, "নায়েকেরা মিরিয়মের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিল, তাহা আমি জানি।"

বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া চুপ করিল। পরে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তোমায় বলিল?"

"মিরিয়ম। সে আড়াল হইতে সকল কথা শুনিয়াছিল।" বৃদ্ধ কহিল, "তাহার পর?"

"আমি নায়েক দুই জনকে মারিয়া বিদায় করিয়া দিয়াছি।"

বৃদ্ধ ভয়ে অস্থির হইল। গোঁয়ার ছেলেটা সর্ব্বনাশ করিয়াছে! এখন উপায়? কহিল, "এখন কি হইবে?"

সোরাব দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "ইহাদিগকেও মারিয়া তাড়াইয়া দিব।"

বৃদ্ধ কহিল, "সুবাদারের সঙ্গে কত লোক আসিতেছে, জান?"

সোরাব কহিল, "আমাদেরও গ্রামে অনেক লোক আছে।"

ব্যায়ামশিক্ষা ও লাঠিখেলার উদ্দেশ্য, সোরাবের পিতা তখন বুঝিতে পারিল। একটু রাগিয়া কহিল, "সুবাদারের সঙ্গে লড়াই হইলে, এখানে

দিতে পারি। তোমার সহিত বিবাহ না হইয়া, সুবাদারের সঙ্গে বিবাহ হয়, সে আমার ইচ্ছা। মিরিয়মের জন্য ঝগড়া মারামারি করিবার তুমি কে ?"

সোরাবের মুখ মলিন হইয়া গেল। সে এমন কথা পিতার মুখে কখন শুনে নাই। কিছুক্ষণ নিরুত্তর রহিয়া কহিল, "সে কথা এখন বলিলে কোন ফল হইবে না। এখন ধর্ম্মতঃ মিরিয়ম আমার পত্নী। সেও আমাকে ত্যাগ করিয়া, অপর ভর্ত্তা স্বীকার করিবে না, আমিও তাহাকে ত্যাগ করিব না। মিরিয়ম এখন বালিকা নহে। আমিও বালক নহি।"

সোরাবের পিতা সোরাবের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মুখের স্থির প্রতিজ্ঞা, তাহার বলিষ্ঠ তরুণ দেহ দেখিয়া কে তাহাকে বালক বলিত ? পিতা মাতা চিরকাল সন্তানকে বালক না মনে করিলে, সংসারে কত অনর্থই নিবারিত হইত।

বৃদ্ধ কহিল, "আমি যদি আর কাহারও সহিত মিরিয়মের বিবাহ দিই, ত কে আমাকে বারণ করিবে ?"

সোরাব কহিল, "আমি করিব।"

বৃদ্ধ কহিল, "বটে ?" বলিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া বাহিরে আসিল। ডাকিল, "মিরিয়ম!"

মিরিয়ম বাহিরে কাজ করিতেছিল, কিছু জানে না। আহূত হইয়া আসিল। সোরাবের পিতা কহিল, "আমার সঙ্গে আইস।" বলিয়া বৃদ্ধ অগ্রসর হইল।

সোরাব কহিল, "মিরিয়ম! দাঁড়াও।"

মিরিয়ম থমকিয়া দাঁড়াইল। পিতা ও পুত্রের আদেশবৈপরীত্য শুনিয়া, বিস্মিত হইয়া, উভয়ের প্রতি চাহিয়া দেখিল। সোরাবের পিতার মুখ ও ললাট অন্ধকার, চক্ষু অঙ্গারের ন্যায়। সোরাবের মুখ একটু মলিন, কিন্তু অত্যন্ত দৃঢ়তাব্যঞ্জক। মিরিয়মের মনে নানা বিপদের আশঙ্কা হইতে লাগিল।

এমন সময় গ্রামের সম্মুখে অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলা উঠিল। ভেরী বাজিল। গ্রামবাসীরা জানিল, ছত্রিশগড়ের সুবাদার সাহেব আসিয়াছেন।

সোরাব কহিল, "মিরিয়ম, তুমি ভিতরে যাও।" সোরাবের পিতা হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল। মিরিয়ম কুটীরে প্রবেশ করিল। সোরাব বাহিরে গিয়া, দুই জন যুবককে ডাকিল। তাহারা, সোরাবের আদেশ মত লাঠি হাতে, কুটীরের প্রহরায় নিযুক্ত হইল।

গ্রামের সকল যুবক পূর্ব্বসঙ্কেতানুসারে লাঠি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সোরাব তাহাদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল। সকলে মিলিয়া গ্রামে প্রবেশের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধদিগের কথায় তাহারা কর্ণপাত করিল না।

সুবাদার সাহেব, অশ্বারোহী অনুচরগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। স্বয়ং অশ্বারোহণে ছিলেন। বয়ঃক্রম চল্লিশের উপর হইবে; শরীর স্থূল, আকৃতি খর্ব্ব, মুখ কুৎসিত। নায়েক দুই জন তাঁহার পশ্চাতে ছিল। অনুচরেরা সশস্ত্রে আসিয়াছিল। কাহারও হস্তে তরবারি, কাহারও হস্তে বন্দুক, কাহারও হস্তে বর্ষা। নায়েক দুই জন সোরাবকে দেখিয়াই চিনিল। সুবাদার সাহেব কহিল, "সরকার, কিব্‌লা, এই বদমায়েশ গোলামদিগকে অপমান করিয়াছিল।" সুবাদার সাহেব কহিলেন, "চুপ রও। ইহার বিচার পরে হইবে। ইহার বাপ কোথায়?"

সোরাবের পিতা অগ্রসর হইয়া, ঝুঁকিয়া দুই হাতে সেলাম করিল। সুবাদার সাহেব তাহাকে সস্মিত মুখে কহিলেন, "তোমার ঘরে একটি কন্যা আছে?"

"আছে।"

"তাহাকে একবার লইয়া আইস। আমি তাহাকে দেখিব।"

আদেশমত সোরাবের পিতা কুটীরাভিমুখে চলিল। সোরাব ও তাহার সঙ্গীগণ, পরস্পর মুখ চাহিয়া, মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ একাকী ফিরিয়া আসিল। মুখে বিস্ময়, বিষাদ ও ক্রোধমিশ্রিত। আসিয়া কহিল, "গ্রামের দুইটা ছোঁড়া আমাকে কুটীরে প্রবেশ করিতে দেয় না, মিরিয়মকেও বাহিরে আসিতে দেয় না।"

সুবাদার সাহেব কহিলেন, "এ বড় আশ্চর্য্য কথা। নিজের গৃহে তুমি স্বেচ্ছামত কার্য্য করিতে পার না?"

বৃদ্ধ সোরাবের দিকে চাহিয়া কহিল, "সমস্তই ইহার কাজ।"

সুবাদার সাহেব দাড়ীতে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কহিলেন, "বটে? বেয়াদব, অবাধ্য? ইহার কিছু শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আগে আমি সেই কন্যাকে দেখিব।" নায়েকদ্বয়কে সঙ্কেত করিয়া কহিলেন, "তোমরা ইহার সহিত গিয়া, সেই কন্যাকে লইয়া আইস।"

নায়েকেরা অশ্ব চালনা করিয়া বৃদ্ধের সহিত চলি...

অধিক যাইতে হইল না। সোরাব ও আর এক যুবক লম্ফ দিয়া লাঠি ঘুরাইয়া নায়েক দুই জনকে মারিল। লাঠি খাইয়া, তাহারা ভূতলে পড়িয়া গেল। অশ্ব দুইটা চকিত হইয়া, বেগে পলায়ন করিল।

দুই দলে যুদ্ধ বাধিল। ঝগড়া মারামারির সম্ভাবনা আছে জানিয়াই সুবাদার সাহেব এত লোক আনিয়াছিলেন। মারামারির আরম্ভ হইতেই, সুবাদার সাহেব ঘোড়া ফিরাইয়া অনুচরদিগের পশ্চাতে গমন করিলেন। দূর হইতে নানাবিধ আশ্বাস বাক্য ও উদ্দীপনা দ্বারা, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। গ্রামবাসী বৃদ্ধেরা সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু যুবকগণ অসীম পরাক্রম সহকারে, নির্ভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিল। দুই দল তুল্যবল হইলে, সুবাদারের অনুচরগণ নিশ্চিত পরাজিত হইত। কিন্তু সোরাবের দলে অস্ত্রের মধ্যে কেবল লাঠি। বন্দুকে, বল্লমে ও লাঠিতে সমান যুদ্ধ হয় না। অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিতে করিতে, গ্রামের কয়েক জন যুবক হত আহত হইল। অবশেষে, সোরাব স্বয়ং গুরুতর আহত হইয়া পতিত হইল। যুবকগণ তখন যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

সুবাদার সাহেবের আদেশ মত, মিরিয়ম তাঁহার সম্মুখে নীত হইল। তাহাকে দেখিয়া, সুবাদার সাহেব একজন অনুচরকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে সঙ্কেত করিলেন। সেই অশ্বে মিরিয়ম অনিচ্ছাপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে আরোহণ করিল। সোরাবকে বাঁধিয়া সঙ্গে লইতে হুকুম হইল। সোরাব বন্দী হইতেছে দেখিয়া, তাহার পিতা সুবাদারের সম্মুখে আসিয়া কহিল, "এখন ইহাকে বাঁধিবার আবশ্যক কি? ইহার ত শাস্তি হইয়াছে।"

সুবাদার সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার হুকুমের উপর কথা কহিবার তুমি কে?"

কথাটার অর্থ বৃদ্ধ ঠিক বুঝিতে পারিল না। কহিল, "আমি ইহার বাপ।"

সুবাদারের হুকুম হইল, "ইহাকে বাহির করিয়া দাও।" বৃদ্ধকে দুই চারি জন মিলিয়া মারিয়া খেদাইয়া দিল।

আহত ও বন্দী সোরাব এবং রোরুদ্যমানা মিরিয়মকে লইয়া, সুবাদার

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মিরিয়ম সুবাদারের হরমভুক্ত হইল, সোরাব বন্দী রহিল। পথেই তাহার প্রাণদণ্ড হইত, কিন্তু সে নিহত হইলে, মিরিয়ম আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিল। এই জন্য, এ পর্য্যন্ত সোরাব জীবিত ছিল। সুবাদার সাহেবের ইচ্ছা ছিল, আরোগ্য হইলে তাহাকে কোন রূপ শাস্তি দিবেন।

একদিন সংবাদ আসিল, বন্দী পলাইয়াছে। সুবাদার সাহেব রুষ্ট হইলেন, কারাধ্যক্ষকে অনেক ভয় দেখাইলেন। দুই চারি জন সিপাহীর শাস্তি হইল। কিন্তু সুবাদার সে কথা শীঘ্রই বিস্মৃত হইলেন। যখন মিরিয়মকে পাইয়াছেন, তখন আর কাহারও জন্য তিনি বড় ভাবিতেন না। পলায়ন করিয়া সোরাব নিরুদ্দেশ হইল।

কয়েক বৎসর অতীত হইল। কয়েক বৎসর পরে, সেই প্রদেশে দস্যুভয় বাড়িতে লাগিল। দস্যুদিগের সর্দ্দারের নাম সোরাব। তাহার প্রতাপে ও পীড়নে, লোক কাঁপিতে লাগিল। দস্যুরা কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া ডাকাইতি করিত। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিত না। গ্রামের যে মহাজন—গ্রাম সুদ্ধ যাহার নিকট ঋণী—তাহার বাড়ী লুট করিত। খাতাপত্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিত, মহাজনকে গর্দ্দভপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া গ্রামের বাহিরে হাঁকাইয়া দিত, তার সঞ্চিত অর্থ কতক আপনারা লইত, কতক গ্রামবাসীদিগকে বিলাইয়া দিত। কোন ধনী ব্যক্তিকে পথ চলিতে দেখিলে, তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিত। দস্যুদিগকে ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইত, কিন্তু রাজপুরুষেরা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। স্বল্পবল হইলে রাজপক্ষীয়েরা দস্যুদল কর্ত্তৃক পরাজিত হইত। বহুসংখ্যক সৈন্য এ কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে, দরিদ্র প্রজাগণ দস্যুদিগকে সংবাদ দিত, তাহারা দুর্গম দুরারোহ পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। সে সকল স্থানে, আর কেহ গমন করিতে সাহস করিত না।

দস্যুদিগের সংখ্যা ও বল ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ছত্রিশগড়ের সুবাদার একবার সন্ধান পাইয়া, দস্যুদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অনেক সৈন্য একত্রিত করিলেন। দস্যুগণ অধিক ক্ষণ যুদ্ধ করিল না। অল্পক্ষণ যুদ্ধ করিয়াই পর্ব্বতাভিমুখে পলায়ন করিল। সুবাদার সাহেবের সৈন্যসামন্ত জয়ধ্বনি করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

স্থির করিলেন, তাঁহার ভয়ে দস্যুরা দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। লোকের শঙ্কা দূর হইতে লাগিল।

এক রাত্রে সুবাদার সাহেবের বাড়ীতে ডাকাইত পড়িল। দস্যুগণ অলক্ষ্যে, নিঃশব্দে গৃহ বেষ্টিত করিয়াছিল। সিংহদ্বারে যে সকল প্রহরী ছিল, তাহারা বন্দী হইল। যাহারা বল প্রকাশ করিল, তাহারা হত হইল। সুবাদার সাহেব নিদ্রিত ছিলেন, গোলমালে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। গৃহের বাহির হইবামাত্র ধৃত হইলেন। অন্তঃপুরে দস্যুপতি একাকী প্রবেশ করিল। গৃহের দ্বারে দ্বারে ডাকিতে লাগিল, "মিরিয়ম, মিরিয়ম!"

সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া, মিরিয়ম ত্বরিত ঘরের বাহিরে আসিল। স্মৃতিমথিত চিত্তে, কম্পিত স্বরে কহিল, "সোরাব!"

উভয়েই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মিরিয়ম কোমলাঙ্গী, অন্তঃপুরবাসিনী সুন্দরী, মুখশ্রী বিষাদের চিহ্নে ঈষৎ মলিন। সোরাবের সেই প্রসন্ন, সরল মুখমণ্ডল কঠোর, শ্মশ্রু কর্কশ, চক্ষু লোহিতবর্ণ। মিরিয়ম চক্ষু নত করিল।

সোরাব কহিল, "মিরিয়ম, আমাকে দেখিয়া কি তুমি বিরক্ত হইতেছ?"

মিরিয়ম চক্ষু তুলিয়া সোরাবের প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিল, কহিল, "তোমাকে দেখিবার আশায় এত দিন জীবিত আছি।"

"আমার সঙ্গে যাইবে?"

"এখনি।"

"তবে আইস।"

বাহিরে আসিয়া, মিরিয়মকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া, সোরাব কয়েক-জন অনুচরকে তাহার রক্ষণে নিযুক্ত করিল। বন্দী সুবাদার দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। সোরাবের সঙ্কেত মত, সুবাদারকে সোরাবের পশ্চাতে পুনরায় অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া দস্যুগণ মশাল জ্বালিয়াছিল। একটা মশাল ধরিয়া সোরাব কহিল, "সাহেব চিনিতে পার?"

সুবাদার সাহেব মৌন রহিলেন।

সোরাব বলিতে লাগিল, "দেখ, আমি দরিদ্র ধীবরজাতি, স্বপ্নেও কখন তোমার অনিষ্টচিন্তা করি নাই। তোমার দুই জন ভৃত্য ডুবিয়া মরিতেছিল, তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলাম। তাহার ফলস্বরূপ, তুমি বলপূর্ব্বক আমার

দিয়া চোরের মত কারারুদ্ধ করিলে। সকল কথা মনে পড়ে? তোমার অত্যাচারে আমি দস্যু, শৃগাল শার্দ্দূলের মত বনে বাস করি, রাজদণ্ডভয়ে লোকালয়ে মুখ দেখাইতে পারি না। এখন তুমি আমার হস্তগত হইয়াছ। তোমাকে কি শাস্তি দিব?"

ভয়ে সুবাদারের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। অনেক কষ্টে কহিলেন, "আমি প্রথাবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করি নাই। আমার পূর্ব্বপুরুষেরাও এইরূপ করিতেন।"

"ভাল, সেই কথা মানিলাম। পরনারীহরণ করা যেমন তোমাদিগের প্রথা, অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করা সেইরূপ মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাব। আমি প্রতিদিন প্রতিশোধের শপথ করিয়াছি। আজ সেই দিন আসিয়াছে। শুন, তোমার গৃহে যত রমণী আছে, তাহাদিগকে লইয়া গিয়া দাসী করিব। যাহাকে ইচ্ছা হয়, নিজের সেবার জন্য রাখিব, অপর সকলে আমার অনুচরদিগকে ভজনা করিবে। তোমার ছিন্নমস্তক তোমার দ্বারে রাখিয়া যাইব।"

সুবাদার ধরা লুণ্ঠিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে লাগিল।

সোরাবের আদেশ মত, দস্যুগণ অন্তঃপুরবাসিনী যুবতীদিগকে বাহিরে আনয়ন করিল। যাহারা ভীত হইয়া চীৎকার করিতেছিল, তাহারা দস্যুদিগের মুক্ত অসি দেখিয়া ও তাড়না শ্রবণ করিয়া স্তব্ধ হইল।

গৃহ লুট করিয়া, দস্যুগণ মিরিয়ম ও সুবাদারের পুরস্ত্রীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলিয়া গেল। সুবাদারের ছিন্ন মস্তক তাঁহার সিংহদ্বারের উপর স্থাপিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ঘনচ্ছায় জটিল অরণ্য পথ দিয়া দস্যুগণ পর্ব্বতে আরোহণ করিল। স্থানে স্থানে পথ অত্যন্ত সংকীর্ণ। অশ্বসমূহ পথ চিনিত। অনায়াসে পথ চিনিয়া গমন করিতে লাগিল। অনেক দূর গিয়া পর্ব্বতের এক বৃহৎ গহ্বরের নিকট দস্যুগণ দাঁড়াইল। এই তাহাদের বাসস্থান। বন্দী রমণীগণ অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, প্রশস্ত প্রকোষ্ঠের ন্যায় আবাসস্থান। উপর হইতে পর্ব্বতরন্ধ্র ভেদ করিয়া আলোক প্রবেশ করিতেছে। দস্যুপতির গৃহ স্বতন্ত্র, তাহাতে সজ্জার কিছু বাহুল্য।

রমণীগণ আরও দেখিল, কয়েক জন দস্যু চারিদিকে প্রহরা দিতেছে। কয়েকটি স্ত্রীলোকও সেই স্থানে রহিয়াছে। নবাগতাদিগকে দেখিয়া, তাহারা কৌতুক করিয়া হাসিতে লাগিল। মিরিয়ম তাহাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। সোরাব স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল, কয়েক জন রমণী তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল।

দলপতি সিদ্ধমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে শুনিয়া, সেই নিভৃত পর্ব্বতালয়ে উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। এরূপ সর্ব্বদাই হইত, কিন্তু সোরাব এ পর্য্যন্ত এত বড় কীর্ত্তি করে নাই। সুবাদার সাহেবের অন্তঃপুর হইতে যে সকল সুন্দরী আসিয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া দস্যুগণ পরম আনন্দিত হইয়াছিল।

পান, আহার, নৃত্য গীতে দিবা অবসান হইল। সকল বিষয়েই সোরাব অগ্রণী। যখন সন্ধ্যা হইল, তখন সোরাব মিরিয়মকে আপনার গৃহে ডাকিল। সুরাপানে কণ্ঠ জড়িত, চক্ষু ঘূর্ণিত। মিরিয়মকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইল। মিরিয়ম সরিয়া গেল।

সোরাব মাতালের হাসি হাসিল। কহিল, "এ কি রঙ্গ? তুমি ত আমার সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক আসিয়াছ!"

মিরিয়ম কহিল, "তুমি ত আমাকে এ পর্য্যন্ত বিবাহ কর নাই।"

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ" হাসিতে হাসিতে সোরাব গড়াইয়া পড়িল। পরে টলিতে টলিতে উঠিয়া কহিল, "সুবাদার কি তোমায় বিবাহ করিয়াছিল?"

মিরিয়ম অত্যন্ত কোমল, অত্যন্ত ব্যথিত স্বরে কহিল, "সেখানে কি আমি ইচ্ছা করিয়া গিয়াছিলাম? তোমাকে দেখিবার আশায় জীবিত ছিলাম।"

সোরাব কহিল, "যেমন সেখানে ছিলে, সেইরূপ এখানে থাকিবে। সুবাদারের অন্দরমহলে যত রমণী ছিল, আমার কাছে তাহার অপেক্ষা অধিক আছে। সেখানে সেই বৃদ্ধ সুবাদারের দাসী ছিলে, এখানে দস্যুপতির প্রধানা মহিষী হইবে। আমার প্রতি তোমার বিরক্তিও কিছুই নাই। তাহা হইলে আপত্তি কি?"

মিরিয়ম কহিল, "যে কারণেই হউক, আমি তোমার অযোগ্যা।"

সোরাব রুষ্ট হইয়া কহিল, "তুমি বলিয়াই এতক্ষণ কথা কহিতেছি

করিলে কি তোমার গৌরব বাড়িবে? আর তুমি ত একেবারে অজ্ঞ বালিকা নও।" বলিয়া দস্যুপতি কঠোর হাস্য করিল।

ভয়ে মিরিয়মের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিল, শরীর কম্পিত হইল। ভয়ের ভাব গোপন করিয়া, কাতর স্বরে অনুনয় করিয়া কহিল, "আজ আমায় ক্ষমা কর। পূর্ব্ব কথা স্মরণ কর। যদি কখন আমায় ভাল বাসিয়া থাক, তাহা হইলে সেই ভালবাসা স্মরণ করিয়া আজ আমায় ক্ষমা কর।"

সুরাজনিত ব্যসন ভেদ করিয়া সোরাবের চিত্তে অস্পষ্ট পূর্ব্বস্মৃতি উদিত হইল। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিল, "স্ত্রীলোকের মন কে বুঝিবে? আচ্ছা, তোমার কথাই স্বীকার। আজ তুমি যাও, কিন্তু কাল কোন কথা শুনিব না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হইল, সূর্য্যোদয় হইল, কিন্তু সেই নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত পর্ব্বতে মিরিয়মকে কেহ দেখিতে পাইল না। রাত্রে প্রহরীগণ সুরাপানে মত্ত ছিল—তেমন সতর্ক ছিল না। কিন্তু সেই ভয়ঙ্কর পথ দিয়া রাত্রিকালে একাকিনী কোন্ রমণী গমন করিতে পারে? সোরাবের মনে প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস হইল না যে, মিরিয়ম পলায়ন করিয়াছে। কেন পলায়ন করিবে? পলায়ন করিয়া কোথায় যাইবে? মিরিয়ম অন্তঃপুরবাসিনী, কখন ঘরের বাহির হয় নাই, সে কেমন করিয়া এই বনে পথ চিনিয়া যাইবে? কিন্তু যখন অনেক অন্বেষণ করিয়া মিরিয়মকে পাওয়া গেল না, তখন তাহার পলায়নসম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। সোরাব প্রহরীদিগকে অনেক ভয় দেখাইল, কিন্তু তাহাদিগকে হত্যা করিলেও মিরিয়মকে পাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

কয়েক দিন চতুর্দ্দিকে সকলে মিরিয়মের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যখন তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন সোরাব স্বয়ং বাহির হইল। অনুচর দস্যুদিগকে সাবধানে পর্ব্বতে বাস করিতে আদেশ করিয়া গেল।

প্রচ্ছন্নবেশে সোরাব সেই সমুদ্রতীরবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রামে উপনীত হইল। সোরাবের পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু বৃদ্ধা পিতামহী জীবিত ছিল।

সোরাব যে এখন দস্যুপতি, তাহার পিতামহী সে কথা জানিত না। মিরিয়মও কিছু বলে নাই। তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধা কাঁদিতে লাগিল। মনে করিল, মিরিয়ম ও সোরাব দুই জনেই ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহাদের বিবাহ হইলে তাহাকে আর নিরাশ্রয় থাকিতে হইবে না।

বৃদ্ধার সাক্ষাতে মিরিয়ম ও সোরাব কোন বিশেষ কথা কহিল না। সোরাব একান্তে মিরিয়মকে ডাকিয়া পূর্ব্বপরিচিত নারিকেলবনে লইয়া গেল। বাল্যকালে দুই জনে যেখানে বসিত, সেইখানে বসিল। দুই জনে পূর্ব্বের মত দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সেই স্নিগ্ধগম্ভীর আকাশপরিপূরিত ধীর গর্জ্জন! সেই নীলশ্যাম ফেন-কিরীটী লবণাম্বুরাশি! সেই দীর্ঘ, কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস, সেই ক্রীড়াময়, শান্তিময়, অনিবার্য্য অস্থিরতা, সেই তরঙ্গবিহারী কেলিচঞ্চল পক্ষী, সেই উজ্জ্বল নীল আকাশ! সেই নির্ম্মল পবন, সেই বায়ুস্বনিত নারিকেলের সারি! আর সেই বায়ুবারিবনবিজড়িত বাল্যকৈশোর স্মৃতি! মিরিয়ম ও সোরাবও ত সেই! এতদিন তাহারা কি দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিল!

সেই পূর্ব্বস্মৃতিই তাহাদের স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। মিরিয়ম কহিল, "মনে পড়ে, তোমার দস্যুপতি হইবার বড় ইচ্ছা ছিল? এখন ত সে সাধ পূর্ণ হইয়াছে।"

সোরাব নিশ্বাস ত্যাগ করিল, কহিল, "সুখ ত কিছু পাই নাই। তুমি কেন আমায় ত্যাগ করিলে? কেন পর্ব্বত হইতে পলায়ন করিলে?"

মিরিয়ম কহিল, "সোরাব, আমাদের সে বাল্যস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি জানিতাম, আমরা দুই জনে পরস্পরের মুখ চাহিয়া বাঁচিয়া থাকিব। তোমার কি আর সে মনোভাব আছে? অপর স্ত্রীলোক এখন তোমার চক্ষে যেমন, আমিও তেমন। তোমার চক্ষে আমি পতিত। আর কেমন করিয়া সে ভাব ফিরিয়া আসিবে? কিন্তু আমি ছত্রিশগড়ে যেমন করিয়া ছিলাম, তেমন করিয়া তোমার কাছে থাকিতে পারিব না। তুমি আমাকে দু' দিন পরে ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আগেকার সেই সব কথা মনে করিয়া আমি এইখানে বাস করিব।"

সোরাব কহিল, "তোমাকে কখন ভুলিতে পারি নাই, পারিব না। আমি

নাই। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপাচরণ করিয়াছি। এখন দস্যুবৃত্তি ব্যতীত আমার অন্য উপায়ও নাই; মিরিয়ম, আমি এখন দুর্বৃত্ত, পাপাসক্ত, কিন্তু আমাকে ত্যাগ করিও না। তুমি কাছে থাকিলে পূর্ব্ব কথা মনে হইবে,—তোমার মুখ দেখিয়া অনেক লোভ সম্বরণ করিতে পারিব।"

সেই স্থানে বসিয়া, সেই সকল পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া, মিরিয়ম আত্মসংযম করিতে পারিল না। হৃদয়ের আবেগে কহিল, "সোরাব, সে সকল কথা ভুলিয়া কি আমরা থাকিতে পারি না? মনে কর না কেন, দুই জনে এইখানে বরাবর আছি। দুই জনে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি মাত্র। যেমন আমরা পূর্ব্বে ছিলাম, সেইরূপ থাকিতে এখন বাধা কি?"

সোরাব মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আর কোন বাধা নাই, কেবল পূর্ব্বে আমি ধীবর ছিলাম, এখন আমি দস্যু। এখন আমায় যে ধরাইয়া দিবে, সে পুরস্কার পাইবে। ধরা পড়িলে যাহা হইবে, তাহা ত জান। তোমার কি ইচ্ছা, আমি এখানে থাকি?"

"না, না, এমন কথা আমি কখন বলিব না। আমি যাহা বলিয়াছি, সে কোন কাজেরই কথা নয়। আমাদিগের একত্রে বাস এখন অসম্ভব।"

সোরাব কহিল, "আমি তোমাকে লইয়া যাইব। তুমি আমার সঙ্গে চল।"

মিরিয়ম অতি ম্লান হাসিল। "তোমার সঙ্গেই যদি যাইব, তাহা হইলে তোমায় ত্যাগ করিয়া আসিলাম কেন?"

"তোমার মনে তখন কি হইয়াছিল, জানি না। এখন তুমি বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না। আমার কথা রাখ, চল। নহিলে——"

"নহিলে কি, সোরাব?"

"নহিলে তোমায় বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব।"

মিরিয়ম স্থির দৃষ্টে সোরাবের মুখের প্রতি চাহিয়াছিল। কহিল, "একবার তুমি আমার প্রতি বলপ্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলে। আবার যদি বলপ্রকাশ কর, তাহা হইলে আমি মরিব। এ কথা তোমায় সত্য বলিলাম।"

তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। সমুদ্রবায়ু নারিকেলপত্র দোলাইয়া বহিতে-

সকল দেখিয়া মিরিয়মের মুখ দেখিল। চারিদিকে প্রকৃতি কোমল, কিন্তু মিরিয়মের মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। সোরাব কহিল, "মিরিয়ম, আমার কথা শুন। আমার সঙ্গে চল।"

মিরিয়ম কহিল, "আমি যাইব না।"

সোরাব আর কোন কথা কহিল না। ধীরে ধীরে উঠিল। বিষণ্ণচিত্তে পর্ব্বতে ফিরিয়া গেল।

মিরিয়ম সমুদ্রতীরে গ্রামপ্রান্তে কুটীরে বাস করিতে লাগিল। সোরাবের সহিত তাহার আর সাক্ষাৎ হইল না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

মুসলমান বৈষ্ণব কবি।

চৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম্মে ভারতবর্ষীয় অনেক অসভ্য জাতিকে সভ্য করিয়াছে। সাঁওতাল ও কোলদিগের অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রমে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। মুসলমান ধর্ম্মে পৃথিবীর বিভিন্ন খণ্ডে, আফ্রিকার মধ্য হইতে আসিয়ার প্রত্যন্ত পর্য্যন্ত সভ্যতা প্রচারের যে মহাকার্য্য করিয়াছে ও করিতেছে, ভারতবর্ষে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সেই ব্রত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভারতবর্ষের বাহিরে যায় নাই।

কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্ম কেবল অশিক্ষিত ও অসভ্যের মধ্যে আবদ্ধ নহে। স্মার্ত্ত ও নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক ও সাংখ্যকারের নীরস কঠোর জ্ঞান, শ্রীচৈতন্যের মাধুর্য্যরসে প্লাবিত হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে। তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ, পৈতৃক ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া, বৈষ্ণব মোহান্তের চরণপ্রান্তে মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিল। সার্ব্বভৌমিকতা বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহালক্ষণ।

মহম্মদের সন্ন্যাস ধর্ম্ম বৈষ্ণবের নিকট পরাস্ত হইয়াছিল। রূপসনাতন মুসলমান ছিলেন কি না সন্দেহ, থাকিলেও হরিদাস যে মুসলমান ছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইঁহারাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি স্তম্ভ। ইঁহা-দের পরেও অনেক মুসলমান বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ অতি সুন্দর পদ রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে মোহান্তের নিকট নূতন নাম পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস বা হরিদাস নামে পিতৃ-

করিবার উপায় থাকে না। গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের এরূপ নাম পরিবর্ত্তন হইলেও নানা কারণে তাঁহারা সংসারে পূর্ব্ব নামেই পরিচিত হয়েন। পদকল্পতরু হইতে গৃহস্থ বৈষ্ণব মুসলমানের রচিত দুইটি পদ আমরা পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

শ্রীরাধিকার রূপবর্ণন।

তুড়ি।

নাগরী নাগরী নাগরী।
কত প্রেমের আগোরী নাগরী॥
কনক কেতকী চম্পা তড়িত বরণী।
ইন্দীবর নীলমণি জলদ বসনী॥
মৃগজ পঙ্কজ মীন খঞ্জন নয়নী।
কামধনু ভ্রমর পাঁতি ভুরু ভুজঙ্গিনী॥
নাসা তিল ফুল খগ চম্পা কলি জীতা।
জামি দল বছস্তি বেণী ঝাঁপি অলকিতা॥
ভালে সে সিন্দুরবিন্দু শোভে কেশ শোভা।
জিনি ইন্দীবর বাহু তমালের আভা॥
ভালে বিরাজিত উরে মোতিম হারা।
হংস বক শ্রেণী গঙ্গাজল দুধ ধারা॥
কহে সাল বেগ হীন জগতে পামরা।
রসের কলিকা রাই কানুসে ভোওরা॥

গোষ্ঠ।

তুড়ি।

চলত রাম সুন্দর শ্যাম পাঁচনি কাচরি রে; বেণী মুরলী খুরলি গানরিরে।
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি, তরুণীতনয় তীরে কেলি,
ধবলি সাঙলি আওরি আওরি ফুকরি চলতি কানরি।
বয়েসে কিশোর মোহন ভাঁতি, বদন ইন্দু জলদ কাঁতি,
চারু চন্দ গুঞ্জাহার বদনে মদন ভানরি।
আগম নিগম বেদসার, লীলায় করত গোঠ বিহার।
নসির মামুদ করত আশ চরণে শরণ দানরি॥

মাধুর্য্য ও প্রগাঢ়তায়, ইঁহাদের পদ গোবিন্দ ও জ্ঞানদাসের পদাবলি হইতে নিকৃষ্ট নহে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বোম্বাই ভ্রমণ।

বরদায় এক দিন মাত্র থাকিয়া আমরা বোম্বাই যাই। বোম্বাই নাম সম্বন্ধে দুটি প্রবাদ আছে। ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন পর্ত্তুগিসেরা এ স্থানটি অধিকার করে ইহার 'বুয়ন বাহিয়া'—উৎকৃষ্ট বন্দর নাম রাখে। তাহা হইতে বোম্বাই হয়। দ্বিতীয় প্রবাদ—'মম্বাই' বলিয়া এক দেবী ছিলেন। তাঁহার নাম হইতে ইংরাজেরা বোম্বাই বা বম্বে করিয়াছেন। এখনো বম্বাই সহরের একটি অংশের নাম মম্বাই দেবী আছে। আর একটি অংশের নাম কাম-দেবী। বোম্বাইর অংশ বিশেষ প্রকৃতই কামদেবীর স্থান। সে কথা পরে লিখিব।

বোম্বাই আমার কাছে শ্যামা ভারতমাতার জিহ্বা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। জননীর পশ্চিমতীর ব্যাপিয়া উত্তর দক্ষিণ ঘাট গিরিমালা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরবৎ শোভা পাইতেছে।এই গিরিশ্রেণীই আমাদের কবিকল্পনার সম্বল 'মলয়াচল'। এই তীরের নাম 'মলয়াবার।' এই শৈলসমাচ্ছন্ন তীর হইতে জিহ্বার মত একটি ভূমি খণ্ড সমুদ্র বক্ষে ভাসমান। শ্যামার জিহ্বা রক্তবর্ণা। শ্যামা ভারতমাতার জিহ্বা শ্যামপত্র-সমাচ্ছন্ন সৌধ ও শৈলমালায় উদ্যানবৎ শোভিত। শ্যামার জিহ্বার চারিদিকে রক্ত ফোঁটা চিত্রিত হইয়া থাকে। এ শ্যামা জিহ্বার চারিদিকে ফোঁটার মত ক্ষুদ্র শৈল-দ্বীপরাশি নীল সমুদ্র-গর্ভে শোভা পাইতেছে। এখন বুঝিলে, বোম্বাই কি মনোহর উপদ্বীপ। ইহার তিন দিকে সমুদ্র পরিখার মত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এ সমুদ্রে তরঙ্গ নাই, লহরী নাই, গর্জ্জন নাই। শান্ত, স্থির, নীরব। যেন একখানি অনন্ত নীল আরসি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ যেন এক একটি সুন্দর ফুলের মত শোভা পাইতেছে। বোম্বাইর উভয় পার্শ্বে নানা স্থানে সমুদ্র-শাখা ভূমি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এ সকল শাখার উপর দিয়া রেলওয়ের দীর্ঘ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। গাড়ী এই সলিলরাশির উপর দিয়া, উভয় পার্শ্বে সুপারি, তাল, নারিকেল, খর্জ্জুর বৃক্ষ-শোভিত গিরিমালার মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে কি চঞ্চল চিত্ত-বিনোদন

আমরা প্রথমেই জিহ্বার অগ্রভাগস্থ পর্ব্বতস্থিত ইংরাজদিগের বসতিস্থান দেখিতে যাই। এই পর্ব্বতটির নাম "মেলেবার হিল," তাহার প্রান্ত সীমাগ্রে শৈবালসমাবৃত হংসের ন্যায় বোম্বাইয়ের গবর্ণরের রাজপ্রাসাদ সমুদ্রে ভাসিতেছে। এই পর্ব্বতটি ইংরাজদিগের গৃহাবলীতে সমাচ্ছন্ন। উভয় পার্শ্বের সমুদ্র সকল গৃহ হইতে দেখা যায়; পর্ব্বতটির সর্ব্বত্রে পথমালা এরূপ বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, সকলদিকে গাড়ী চলিয়া যায়। রক্তবর্ণ রাজপথসমূহ গিরি-অঙ্গে যেন প্রবাল হারাবলীর মত শোভা পাইতেছে। উভয় পার্শ্বে মনোহর সৌধ ও উদ্যানমালা, এবং তাহার বিরাম স্থান পথে সমুদ্রের নীল কান্তি দর্শন করিয়া শকটভ্রমণ কি মনোহর!

ফিরিবার সময়ে এই পর্ব্বতস্থিত পার্শিদিগের "নীরব মন্দির" বা সমাধি-স্থান দর্শন করি। মূল সমাধিস্থানটি একটি গোলাকার প্রাচীর মাত্র। তাহার অন্তর্বর্ত্তী স্থানটি চক্রাকারে তিন মণ্ডলে বিভক্ত করা হইয়াছে। কেন্দ্রস্থলে একটি কূপ। তাহাকে বেষ্টিয়া যে মণ্ডল, তাহাতে শিশুদিগের, তাহার বাহিরের মণ্ডলে রমণীদিগের, তাহার বাহিরের মণ্ডলে পুরুষদিগের শব রক্ষিত হয়। প্রাচীরের এক স্থানে একটি গবাক্ষ আছে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা এই গবাক্ষ পর্য্যন্ত শব লইয়া গেলে, সমাধিস্থ দুই জন ভৃত্য এখান হইতে শব ভিতরে লইয়া যায়। তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার পর শবটির বসন মোচন করিয়া উপযুক্ত মণ্ডলে রাখিয়া দেয়। অল্পকাল মধ্যেই শকুনে তাহা নিঃশেষ করিলে, ভৃত্যেরা অস্থি সকল মধ্য কূপের গর্ভে ফেলিয়া দেয়। কালে উহা চূর্ণে পরিণত হইয়া, কূপতলস্থ জলপ্রণালী দিয়া পর্ব্বতের উপত্যকায় গিয়া, ভূমির সঙ্গে মিশিয়া গিয়া উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। মানুষকে এরূপ শকুনের আহার্য্য করা আপাততঃ শুনিতে বড়ই নিষ্ঠুরতা বলিয়া বোধ হয়। তবে চক্ষের উপর পোড়াইয়া ফেলা, কিম্বা ভূমিগর্ভে অসংখ্য কীটের আহার করিয়া দেওয়াও কি নিষ্ঠুরতা নহে? যখন আর্য্যজাতিরা কেবল বৈদিক অগ্নির উপাসক মাত্র ছিলেন, তখন দুই ভাগ হইয়া উত্তর কুরু হইতে এক শাখা ভারতে প্রবেশ করেন, অন্য শাখা পারস্য দেশে গমন করেন, ইঁহারাই পার্সি। ভারতীয় আর্য্যদিগের ধর্ম্মের অনন্ত রূপান্তর ও উন্নতি হইয়াছে। পার্সিরা এখনো অগ্নি-উপাসক। উত্তর কুরু শীতপ্রধান দেশ, অতএব অগ্নি তথায় মনুষ্যের প্রধান

বৃক্ষ-বিরল শীতপ্রধান দেশে সম্ভব নহে। সে জন্যে উত্তর কুরুতে শব এরূপে পশু পক্ষীর আহারের জন্যে ফেলিয়া রাখা হইত, ইউরোপে এখনো ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। পার্সিরা সেই পূর্ব্ব নিয়ম রক্ষিত করিয়া আসিয়াছেন। ভারতে কাষ্ঠের অভাব নাই, কাযেই এই নিষ্ঠুর নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এরূপে দেশ, কাল ও অবস্থাই মানুষের জাতীয় আচার ব্যবহারের রূপান্তরের মূলীভূত কারণ।

তদ্ভিন্ন আর একটি গভীর তত্ব পার্সি ও হিন্দুদিগের অন্ত্যেষ্টীক্রিয়ার ভিতরে নিহিত আছে। উভয় জাতির ধর্ম্মনীতির মূল—সর্ব্বভূতহিত। শবটি পোড়াইয়া ফেলিলে কি কবর দিলে, আপাততঃ কাহারো হিতসাধন করা হয় না। কালে তাহা ভূমি, জল, ইত্যাদি পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া জীবহিত সাধন করে সত্য, তবে সে বহুকালসাপেক্ষ এবং তত্বটি জটিল। পার্সিদিগের শব তৎক্ষণাৎ পশু পক্ষীর আহার হইয়া প্রত্যক্ষ জীবহিত সাধন করে এবং অস্থিও কালে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। আমি ত মরিয়া গিয়াছি, সুখ দুঃখের অতীত হইয়াছি। অতএব আমার লোষ্ট্রবৎ জীবনশূন্য দেহটি আহার করিয়া যদি কয়টি প্রাণীর তৃপ্তি হয়, ক্ষতি কি? দেহটি ধ্বংস করা ও ভূগর্ভে পচিতে দেওয়া অপেক্ষা, এরূপ জীবহিতে নিয়োজিত হওয়া কি ভাল নহে?

পর দিবস নগর দর্শন করিতে করিতে আমরা খ্যাতনামা 'হস্তিগুম্ফা' দেখিতে যাই। বোম্বাই নগরটি দেখিতে অতি সুন্দর। কলিকাতার মত এমত বৃহৎ অট্টালিকা নাই, তবে অট্টালিকাগুলি বহুতলবিশিষ্ট এবং বড় কবিত্বপূর্ণ। প্রত্যেক গৃহ নানারূপ বারাণ্ডা ও নানারূপ কোণবিশিষ্ট। আকৃতি-বৈচিত্র্য বড় মনোহর। বোম্বাই নগরের দুইটি বিশেষ লক্ষণ। অধিকাংশ অট্টালিকার সর্ব্বোচ্চ তলার ছাদ খোলার, এবং ফুল অতি বিরল। সমুদ্রের লবণাক্ত বাতাসে ফুল বাঁচে না, বোধ হয়। সমুদ্রানিল সলিলসিক্ত বলিয়া বোম্বাই অঞ্চলে গ্রীষ্মের প্রখরতা নাই, এবং লবণাক্ত বলিয়া শীতেরও প্রবলতা নাই। এই পৌষ মাসের মধ্যভাগেও আমরা কিছুমাত্র শীত অনুভব করিলাম না। এ জন্যেই কবিরা মলয়াচলকে চিরবসন্তের আলয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এই জন্যেই মলয়ানিলের এত গুণগান। তবে এ বসন্ত পুষ্পহীন বোধ হইল, এবং এ মলয়াচলে চন্দন বৃক্ষ ও ভুজঙ্গ নাই বলিয়া তারাচরণের বিশ্বাস,—মলয়াচল ব্রহ্মদেশে। জানি না,

সেই চিরবসন্তের দেশে থাকিয়া তোমার ভায়া কি দারুণ বিরহযন্ত্রণাই ভোগ করিতেছেন!

আমরা একখানি 'জালিবোট' ভাড়া করিয়া, সমুদ্রগর্ভস্থ এলিফেণ্টা বা হস্তিগুম্ফা-দ্বীপ দেখিতে গেলাম। এই সমুদ্রবিহার আমি এ জীবনে ভুলিব না। স্থানে স্থানে খণ্ড-পর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে যেন এক একটি দোল কিম্বা এক একখানি রথের মত ভাসিতেছে। তাহার মধ্য দিয়া আমাদের তরণী ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। কোনো খণ্ড-শৈলে ইংরাজরাজ বোম্বাই রক্ষণার্থ অস্ত্রাগার, কোথাও বা বারুদাগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্বেত অট্টালিকাটি দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন একটি রাজহংস গিরিশিরে বসিয়া সমুদ্র শোভা দেখিতেছে। স্থানে স্থানে যুদ্ধযান এবং বৃহৎ বৃহৎ বাষ্পীয় যান সকল সগর্ব্বে ভাসিতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র তরণী হংসিনীর মত তাহার পার্শ্বে ক্রীড়া করিতে করিতে চলিয়াছে। বহু দূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম—অহো! কি দৃশ্য!

> "দূরে চক্রনিভ তন্বী, তমাল তালের লীলা,
> কলঙ্ক রেখার মত শোভে লবণাম্বু বেলা।"

তমাল দেখি নাই। কিন্তু তালজাতীয়-বৃক্ষশীর্ষ-বন-রাজি-মণ্ডিতা সৌধমালায় বিচিত্রিতা বোম্বাই নগরী কি শোভার ভাণ্ডারই লবণাম্বুতীরে খুলিয়া রাখিয়াছে, এবং কি মনোহর নীলদর্পণে কি মনোহর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব দেখিতেছে! যে ব্যক্তি একবার সমুদ্রগর্ভ হইতে, এই 'মলয়াধারের তীর সুবঙ্কিম' এবং এই মধ্যাহ্ন রবিকরে "মলয়াচলের-উজ্জ্বল-নীলিমা" নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে, সে কখনও উহা ভুলিতে পারিবে না।

এলিফেণ্টা দ্বীপের পর্ব্বতটি বিশেষতঃ বৃক্ষাবলীতে বড় সুন্দররূপে শোভা পাইতেছিল। এই পর্ব্বতের কটিদেশে 'হস্তিগুম্ফা,' তাহা হইতে ইহার নাম 'এলিফেণ্টা' হইয়াছে। এই গুম্ফা-দ্বারে পুরাকালে একটি প্রস্তরের হস্তী ছিল। সমুদ্রতীর হইতে গুম্ফা পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী উঠিয়াছে। জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও তাঁহার শ্বেতাঙ্গিনী প্রিয়া এখন গুম্ফার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহাদের পাশ লইয়া গুম্ফা দর্শন করিতে হয়। দুইটিই বেশ ভদ্র লোক। যদিও বহুতর শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীরা তখন গুম্ফাদ্বারে বিরাজ করিতেছিলেন, কেহ পান করিতেছেন, কেহ ভক্ষণ করিতেছেন, কেহ সমুদ্র শোভা চাহিয়া চাহিয়া বৃক্ষ-দোলা[illegible]লিতেছেন, তথাপি তাঁহারা

আমাদের প্রতি খুব ভদ্রতা দেখাইলেন। পর্ব্বতের প্রস্তর বক্ষ কাটিয়া, 'রাজগিরের' শোনভাণ্ডার কক্ষের মত, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক বড়, একটি কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। কক্ষ, প্রাচীর বড় সুচারুরূপে নির্ম্মিত নহে। 'বরাবরের' গুম্ফা সকল এতদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, তাহাদের প্রাচীরে মুখ দেখা যায়, এমনি মসৃণ! তবে কক্ষটির প্রাচীরের গায়ে বহুতর হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবী মূর্ত্তি স্থাপিতা রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি তত শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ না হউক, নিতান্ত মন্দ নহে। তাহার পার্শ্বে অসম্পূর্ণ আরো ২।৩টি ক্ষুদ্র গুম্ফা আছে। আমার বোধ হইল, এই গুম্ফা বৌদ্ধদের কর্ত্তৃক তপস্যার জন্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর হিন্দুরা অধিকার করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ, দুই স্থানে দুইটি শিবলিঙ্গ বসান হইয়াছে, দেখিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে, সেখানে অন্য কোনও মূর্ত্তি ছিল, তাহা উঠাইয়া শিবলিঙ্গ স্থাপিত করা হইয়াছে। গর্ত্তটি লিঙ্গ অপেক্ষা বড়। এই পর্ব্বত হইতে চতুর্দ্দিকস্থ সমুদ্রগর্ভে ভাসমান পার্ব্বত্য দ্বীপপুঞ্জ ও সমুদ্রশোভা দেখিলে চোক ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। মুহূর্ত্ত এই শোভা দেখিয়া আমরা ফিরিলাম। প্রতিকূল বাতাস নিবন্ধন অর্দ্ধ পথ আসিলেই সন্ধ্যা হইল, জ্যোৎস্না উঠিল; পটপরিবর্ত্তন হইয়া জ্যোৎস্নাপ্রোদ্ভাসিত, পর্ব্বত-দ্বীপ-খচিত, সমুদ্রের কি মনোমুগ্ধকর শোভা হইল। মনের আনন্দে সকলে মিলিয়া গাইতে গাইতে বোম্বাই ফিরিয়া আসিলাম। গীত যেন আপনি হৃদয় উচ্ছ্বসিত করিয়া বহিতেছে, তরণী যেন সেই গীতের তালে তালে মনের আনন্দে নাচিতেছে। পূর্ব্বদিন মলয় পর্ব্বত-শিরে দাঁড়াইয়া, এই সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, আমিও বাইরণের মত স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—

মলয় বোম্বাই বক্ষে;
বোম্বাই সমুদ্র তীরে;
তথা দাঁড়াইয়া একা দেখিনু স্বপন,—
ভারতের সুখসূর্য্য আসিবে রে ফিরে!

বাইরণের স্বপ্ন ফলিয়াছে;—গ্রীসের সুখের দিন ফিরিয়াছে। আমার স্বপ্ন ফলিবে কি?

উপাধি-উৎপাতে বঙ্কিম বাবু।

গত আষাঢ় মাসের সাহিত্যে "উপাধি-উৎপাত"-শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল,—তাহাতে লেখক দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, বঙ্কিম বাবু "রায় বাহাদুর" উপাধি গ্রহণ না করিলেই ভাল হইত। এ সম্বন্ধে আমরা একখানি বিশ্বস্ত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। এই পত্রপাঠে জানা গেল যে, নিজে উপাধির প্রার্থী হওয়া দূরে থাক, গেজেটে উপাধির তালিকা মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে, শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। উপাধি-উৎপাতের লেখককে এই কথা জানাইতে পত্রলেখক মহাশয় অনুরোধ করিয়াছিলেন। সেই পত্র পড়িয়া, উপাধি-উৎপাতের লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"এই সংবাদ অবগত হইয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই আহ্লাদিত হইবার কথা। উক্ত প্রবন্ধলেখকের এই মাত্র বক্তব্য যে, বঙ্কিম বাবু যে স্বয়ং উপাধিপ্রার্থী হইয়াছিলেন, এমন কথা প্রবন্ধে কোন স্থলে নাই। আমি বরং এই কথা বলিয়াছিলাম যে, তিনি যে এমন তুচ্ছ উপাধির প্রার্থী, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। উপাধি যে বঙ্কিম বাবুর অযাচিত, সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় ছিল না, তবে আমি যে মনে করিয়াছিলাম যে, উপাধি-প্রাপ্তিবৃত্তান্ত তিনি পূর্ব্ব হইতে অবগত ছিলেন, সেইটা আমার ভুল। এই ভ্রম সংশোধিত হওয়াতে আমি যেমন আনন্দিত হইয়াছি, ভর‍্‍সা করি, সাহিত্যের পাঠকগণ ও বাঙ্গালীমাত্রেই সেইরূপ আনন্দিত হইবেন। যে কারণে আমি এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলাম, তাহা বোধ করি, অনেকে অবগত আছেন। সকলের কপালে বিনা যাচ্ঞায় উপাধিপ্রাপ্তি ঘটে না। যাঁহাদের সে সৌভাগ্য হয়, তাঁহারা প্রায়ই আগে খবর পান। গবর্মেণ্ট তাঁহাদিগকে জানান না, কিন্তু যে মুরুব্বিদের জোরে উপাধি বণ্টিত হয়, তাঁহারা জানাইয়া রাখেন। রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর প্রায়ই জেলার মাজিষ্ট্রেটের হাত—তিনি যাহাকে সোপারিষ করিলেন, সে পাইল। কদাচ কখন কোন বড় কর্ম্মচারী সোপারিষ করেন। বঙ্কিম বাবুকে যেরূপ অযাচিতরূপে তাঁহার অজ্ঞাতসারে উপাধি দেওয়া হইয়াছে, এরূপ প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না। যাহারা পায়, তাহারা উপাধি চায়, বরঞ্চ যত লোকে চায়, তত লোকে পায়

না। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর প্রতি যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে, তাহাকে উৎপাত ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? জিজ্ঞাসাবাদ নাই, কোথাও কিছু নাই, লোকটা উপাধি পাইলে সন্তুষ্ট হয় কি না, তাহার খোঁজ খবর নাই, একেবারে গেজেটে নাম প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমবাবু যদি তাহার পর রায় বাহাদুরীর খেতাব গ্রহণে অসম্মত হইতেন, তাহা হইলে কেমন হইত! কিন্তু সেটা দেখিতেও ভাল হইত না, গবর্মেণ্টও বঙ্কিম বাবুকে ছাড়িয়া দিতেন না গবর্মেণ্টের কৌশলে যে তিনি ধরা পড়িয়াছেন, সে বিষয়ে সংশয় নাই। কিন্তু তাহা হইলে উৎপাতের আর কি বাকি রহিল?

'উপাধি-উৎপাত'-লেখক।"

এ বিষয়ে আমাদের একটা কথা মনে হয়। গবর্মেণ্ট কি বঙ্কিম বাবুকে উপাধি দিয়া সত্য সত্যই অত্যাচার করিয়াছেন? গবর্মেণ্ট যে বঙ্কিম বাবুকে উপাধি দিয়াছেন, তাহা সাহিত্য-সংসারে তাঁহার প্রভূত প্রতিষ্ঠা দেখিয়া দেন নাই। গবর্মেণ্ট একজন উপযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটকে, তাঁহার কর্ম্মপটুতা প্রভৃতির স্মরণ করিয়া, বিদায়কালে "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়াছেন। এক জন শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্য-সেবক এই প্রসঙ্গে যথার্থই বলিয়াছেন যে, "বঙ্কিম বাবুকে 'মহারাজ' করিলেই কি মানাইত?" যিনি চিরজীবন রাজকার্য্যে রাজসেবায় অতিবাহিত করিলেন, তাঁহাকে একটা উপাধি প্রদান করিবার ইচ্ছা গবর্মেণ্টের পক্ষে স্বাভাবিক,—এবং যিনি চিরদিন গবর্মেণ্টের বিশ্বাস রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন,—তিনিও তাহার প্রতিদানে একটা উপাধি লইলে যে অপরাধী হইবেন, এমনও বোধ হয় না। আজ কাল সকল বিষয়েই, উপলক্ষ ঘটিলেই, আমরা গবর্মেণ্টকে গালি দি—উপাধি-উৎপাতেও তাহার অবসর আছে,—কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, গবর্মেণ্ট সত্য সত্যই "রায় বাহাদুর" উপাধি দিয়া বঙ্কিম বাবুর প্রতি অত্যাচার করিয়াছেন কি না।—কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, সচরাচর যাঁহারা ডেপুটীগিরি করেন, তাঁহারা রায় বাহাদুরী লইতে কখনও অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। যাঁহারা পান নাই, তাঁহারাও পাইলে সুখী হন। এ অবস্থায়, গবর্মেণ্ট যদি মনে করিয়া থাকেন যে, বঙ্কিম বাবুর মত একজন কৃতকার্য্য উপযুক্ত ডেপুটীকে উপাধি দিয়া, তাঁহাকে পুরস্কৃত ও আর সকলকে উৎসাহিত করা উচিত, তাহা হইলে গবর্মেণ্টের সে ভাবকে অত্যাচার বলা সঙ্গত হয় না।

সমাজের রাজা, তাঁহাকে “রায় বাহাদুর” হইতে দেখিয়াই কানাকানি হইতেছে। সকল রাজশক্তিই সম্মান দান করিয়া আসিতেছেন, ও করিতেছেন। এ প্রথাকে অন্যায় বলা যায় না, আমাদের দেশে, ইংরেজ গবর্মেণ্ট যে প্রণালীতে উপাধি দান করেন, দোষ সেই প্রণালীর। সেকালেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে “রায়গুণাকর” উপাধি দিয়াছিলেন, মুকুন্দরামও “কবিকঙ্কণ” হইয়াছিলেন। স্বদেশীয় রাজার কাছে স্বদেশীয় উপাধিপ্রাপ্তি যেমন অনুরূপ বোধ হইত, এখন আর তেমন হইবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই, ইংরাজ গবর্মেণ্টের উপাধিদান দেখিলে, “গরু মারিয়া জুতা দানের” কথা মনে পড়ে। রাজা সূর্য্যকান্তের লাঞ্ছনা দেখিয়া কি মনে হয়? গবর্মেণ্টই ত ইহাঁকে রাজা করিয়াছিলেন! সেই স্বহস্তনির্ম্মিত বদান্য রাজার ফিলিপ্স্-কৃত এই লাঞ্ছনা দেখিয়াও গবর্মেণ্ট কি করিতেছেন? বিদেশীয় রাজার স্বভাবসুলভ অবিশ্বাসে ইংরাজ গবর্মেণ্ট পরিপূর্ণ, অথচ বিজিত পদদলিত জাতির মধ্য হইতে সেলামসিদ্ধ কাপুরুষদিগকে ধরিয়া, রাজা, মহারাজা করা হয়! তাই এই উপাধিদান বিসদৃশ ও বিড়ম্বনাময় বলিয়া বোধ হয়।

বঙ্কিম বাবু যে উপাধিবিভ্রাটে পড়িয়াছেন, তাহার জন্য আমরা দোষী। এ দেশে যদি সাহিত্যের আদর থাকিত, যদি স্বদেশীয় প্রতিভার প্রতি আমাদের ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে বঙ্কিম বাবুকে ডেপুটিগিরিতে জীবন কাটাইতে দেখিতাম না। যাঁহার লেখনীতে “বিষবৃক্ষের” সৃষ্টি, সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিয়া তাঁহার কলম ভোঁতা হইত না, যে প্রতিভায় কপালকুণ্ডলা, ভ্রমর প্রভৃতির জন্ম, সেই প্রতিভা রায়-রচনায় অপব্যয়িত হইত না। জীবিকার জন্য এত খাটিবার পরও বঙ্কিম বাবু যাহা করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্য। কিন্তু বঙ্কিম বাবু ও তাঁহার সমধর্ম্মী অন্যান্য সাহিত্যসেবকের প্রতি আমরা যে ব্যবহার করি, তাহা আরও আশ্চর্য্য। বঙ্কিম বাবুর “বিষবৃক্ষ” লক্ষখানা লক্ষ বাঙ্গালীর ঘরে থাকিলে তিনি রাজসেবা করিতে যাইতেন না। যখন সেরূপ কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এ দেশে বহু বিলম্ব আছে, তখন সাহিত্যসেবীদের সহিত রাজসংস্রব দেখিয়া বড় জোর দুঃখ করা যায়, সে জন্য রাজাকে অত্যাচারী বলা যায় না। বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে গবর্মেণ্টের বাধ্য-বাধক-সম্বন্ধ, গবর্মেণ্ট, প্রভু, তিনি ভৃত্য। আমাদের সঙ্গে বঙ্কিম বাবুর অন্য সম্বন্ধ, তিনি, রাজা, আমরা প্রজা। গবর্মেণ্ট তাঁহাকে যে ভাবেই দেখুন, আমরা তাহাতে কথা কহিতে গেলে অসঙ্গত হইবে, কেন না, তাহা সত্য। আমরা কেবল, সে ভাবে না দেখিয়া, তাঁহাকে রাজার মত মান্য করিতে পারি, এবং

কবিতাকুঞ্জ।

শূন্য-গৃহ।

কেহ নাই এ আলয়ে,
কার ভয়ে পরিজন যত
নিরুদ্দেশ হইয়াছে,
বুঝি ইহ জনমের মত।

সমভাবে দিন রাত
হইতেছে সন্ধ্যা বরষণ ;
বহিছে তুহিন বাত,
চারিধারে কেবল কম্পন।

স্বপনেরা দলে দলে
উঘাটিয়া সুখের কবর,
বার করে প্রতি পলে
আনন্দের কঙ্কাল নিকর।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

যাও।

আগে গেলে, যাও-যাও ফেলে রেখে গেলে, যাও,
ফিরে চাও, নাই চাও, কি ক্ষতি তাহায় ?
মরণের পর পারে মিলনের উপকূলে
চিরপরিচিত রূপে মিলিব দোঁহায়!

অনন্ত তৃপ্তির মাঝে বাসনা ডুবিয়া যাবে,
জীবন, স্বপন হ'বে, মরণ মিলন—
প্রেমের মন্ত্রের বলে তোমারে পাইব কাছে ;
ভালবাসা নহে জেনো শুধু আকর্ষণ !

সব গ্রহ ঘুরে ঘুরে অবশেষে সুরপুরে
যখন মিলিব গিয়া তোমায় আমায়,
কি অজানা সুখস্মৃতি ছাইয়া ফেলিবে এ
কি অনন্ত মন্দাকিনী বহিছে সেথায় !

তীরে তারি বসে মোরা কথা কব ধীরে ধী
বলিতে বলিতে দোঁহে সজল নয়নে,
থেমে যাবে হাসি খেলা, পড়ে রবে গাঁথা মা,
দিগন্তে মিশায়ে যাবে বাঁশরীর গান।

বসে রব প্রিয় সনে চেতনাবিহীন এ
সজল আঁখির ভরে কণ্ঠ রুদ্ধ হবে ;
মনে পড়ে-পড়েনাক হেথা তব সনে থে
স্নেহের বচন দুটি বলেছিনু কবে।

এ মিথ্যা জীবন, ছাই— যাও, তায় ক্ষতি না
শুধু ভালবেসো সখি বাসিতে যেমন ;
দেহান্তে আবার পুনঃ মিলন হইবে দোঁহে
সাক্ষী থাক দেবতার জাগ্রত নয়ন !

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দ

চোর-ধরা।

আঁধার-আড়ালে লুকাইয়া ছিলে
চাতুরী করিয়া মোরে।
বাহির করেছি খনির রতন
এখন কেমন ক'রে !

উৎসব-আনন্দে পূর্ণ এ জগৎ
বড় সুখ প্রাণে আজি ;
এত দিন পরে, আঁধারে আমার
'আমি'কে পেয়েছি খুঁজি।

তাই ভাবিলাম, কিসের লালসা
এতই দুরন্ত বুকে,
বাহিরে খুঁজেছি, হৃদয়-আঁধারে
রতন লুকায়ে রেখে।

খুঁজে পাই নাই, নিজে এসে চোর
আমারে দিয়েছে ধরা।
মগ শতদল কোমল মধুর
হাসি—পরিমল ভরা।

পূর্ণ তুমি নাথ, বাঞ্ছিত তুমি হে!
চির-আশা-চাওয়া নিধি;
আজ রতন কুড়ায়ে, কে যেন গো দিলে,
অঞ্চলে আমার বাঁধি।

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।

মোহ।

.বর জানালা দিয়ে নীরব নিজন ঘরে,
ান্তী চাঁদের হাসি প'ড়েছে পালঙ্ক 'পরে!
পরে অসীমাকাশ কি এক স্বপন পারা,
ক তার হেথা হোথা ঘুমায়ে পড়েছে তারা!
ালিঙ্গি কৌমুদী করে রজনীর রূপরাশি,
টছে চাঁদের মুখে আধ সোহাগের হাসি!
ক যেন নীরব প্রেম, কি যেন সরম ছায়া,
ক যেন সঙ্কোচে ভরা যামিনীর শ্যাম কায়া!
ালিন মু'খানি ঢাকি আধ আলো ছায়া মাঝে
একটি করুণ তানে ডাকে দূরে কোন্ পাখী,
লতা পাতা ফুলগুলি কেঁপে ওঠে থাকি থাকি।
স্তব্ধ স্থির জনপদ, পারশে প্রাসাদ-সার
জ্যোছনার বুকে শুয়ে স্বপন দেখিছে কার?
থেকে থেকে বহে আসে মৃদুল দখিণা বায়,
শুভ্র শ্বেত শয্যাখানি ভেসে যায় জ্যোছনায়!
শিয়রেতে বেলফুল বিতরে সুবাস হাসি,
কোথা কোন্ দূর হ'তে মধুরে বাজিছে বাঁশী!
কি যেন স্বপন মোহে, এ সুখ বসন্ত রাতে,
নয়নে আসিছে ঘুম মৃদুল মলয় বাতে!
কি যেন সুখের ছায়া জড়িত স্মৃতির গানে
স্বর্গের কল্পনা যেন ভাসিয়া আসিছে প্রাণে!
জ্যোছনা প'ড়েছে মুখে, বুকেতে রাখিয়া মাথা,
মৃদুল চুম্বন স্পর্শে মুদিত অধর পাতা!
চারিটি নয়ন স্থির আকাশের পানে চেয়ে,
অবশ বুকের 'পরে জ্যোছনা আলসে শুয়ে!
নয়নে নীরব প্রেম, বচন সরে না মুখে,
বিভল দুইটি প্রাণ কি যেন স্বপন সুখে!
উঠিছে প্রাণের মাঝে কি এক মিলনবাণী
ত্রিদিব অর্গল খুলে নামিছে স্বপন-রাণী!
কি যেন কল্পনা সুখে, কি যেন মদিরালসে,
ঘুমায়ে পড়িছে প্রাণ কি এক মোহের বশে।
মধুরে মধুরে মাখা কি যেন মধুর ধরা,
স্বরগে মরতে মিল কি এক মাধুরী ভরা!
সংসারের কোলাহল রাখি দূরে একবার
এ বুঝি ত্রিদিব বাস এক পল এ ধরার!
কল্পনা, স্বপনময়ী, একি সুখ চিত-হারা,
যেও না বাসন্তীনিশি, ভেঙ্গো না এ মোহকারা!

কালিদাস ও সেক্ষপীয়র।

(৩)

কালিদাস।

'কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি'—এ কথার অর্থ আমরা জানিয়াছি ; কিন্তু ইহার প্রমাণ কি ? প্রমাণ-প্রণালী ইতিপূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কথাটা একটা কল্পনা-সিদ্ধান্ত (Hypothesis) মাত্র। যদি এই কল্পনাসিদ্ধান্তের সহিত সকল ঘটনার সমাবেশ হয়, সকল বিষয়ের অবিবাদ হয়, তবে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত ; অন্যথা কল্পনা মাত্র। যদি আমরা দেখি,কালিদাসের সাক্ষাতে সমগ্র সৌন্দর্য্য-জগৎ অবভাত হয় ; বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ ও অধ্যাত্মজগৎ আপন আপন আবরণ বসন ফেলিয়া দিয়া, আপনাদের নগ্ন সৌন্দর্য্য-স্বরূপ প্রকট করিয়া শোভিত হয় ; যদি আমরা দেখি, সুন্দর শত মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার কাব্য আলো করিয়া থাকে, যাহা অসুন্দর অমধুর অসুকুমার, তাঁহার কাব্যে প্রবেশ লাভ করিতে পায় না ; তবে আমরা অবশ্যই মানিব যে, ঐ কল্পনা-সিদ্ধান্তই স্থির সিদ্ধান্ত, কল্পনা মাত্র নয়, তবে আমরা মানিব, 'কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী সৌন্দর্য্যদৃষ্টি।'

যাহা জানিতে পারি না, তাহা আমাদের পক্ষে থাকা না থাকা সমান ; তাহার অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। জ্ঞানের সাধন জ্ঞানেন্দ্রিয়—যাহার সহকারে আমরা জানিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি—বহির্ অন্তর্ সত্য ও ধর্ম্ম এই ভেদে জ্ঞানেন্দ্রিয়ও চার। সুতরাং জ্ঞেয় জগতও চারি ভেদে বিভিন্ন—যথা বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ ও অধ্যাত্মজগৎ। এই চার জগতের যে যে পদার্থ রূপেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাই সৌন্দর্য্যজগতের অন্তর্ভূত। এই জগৎ-চতুষ্টয়ের একে একে আলোচনা করা যাউক।

প্রথমেই বহির্জগৎ ; অর্থাৎ যে জগৎ চক্ষুঃ-আদি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। এ জগৎ আবার জড় ও চেতনভেদে দ্বিবিধ। জড় জগৎ দুই ভাগে বিভজ্য—প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ; যে জড় জগতে মানুষের ক্রিয়াশক্তি প্রযুক্ত হয় নাই,

জগৎ মনুষ্যের ক্রিয়াধীন, তাহাই কৃত্রিম জগৎ, যথা প্রাসাদ, মন্দির ইত্যাদি। চেতন জগতের এক দিকে নর নারী; অপর দিকে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ। জড়জগৎ ও জীবজগৎ, উভয়ই এক স্রষ্টার সৃষ্টি কার্য্য; সুতরাং গণনায় বিভিন্ন হইলেও অনুভবে মিশ্রিত হইয়া থাকে। সেই জন্য আমরা দেখি, প্রাকৃতিক জগতের সহিত জীবজগতের পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী অবিযুক্ত হইয়া আছে; আর কৃত্রিম জগতের সহিত জীবজগতের নর নারী সংশ্লিষ্ট হইয়া আছে। কালিদাসের কাব্যেও আমরা ইহাই দেখিব।

প্রাকৃতিক জগৎ অনন্ত বিস্তার; জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এই বিস্তৃতির সীমা নাই। কালিদাসের কাব্যে এই অনন্ত বিস্তার প্রকৃতির অনন্ত বিস্তার ছায়া বিদ্যমান। তাঁহার কাব্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনন্ত ভাণ্ডার; কোন পদার্থেরই অভাব নাই, যাহার সন্ধান করিবে, সেই সৌন্দর্য্যই মিলিবে। প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা, শর্ব্বরী; তপনারুণ, কৌমুদী-বিভাত তারকা-খচিত আকাশমণ্ডল; ইন্দ্রধনুরঞ্জিত, তড়িৎ-উন্মেষস্ফূরিত, মৃদুপবনচালিত, মধুরনাদী মেদুর মেঘমালা; আর ফলিত তরু, পুষ্পিতা লতা, নবীন শষ্পাঙ্কুর, উজ্জ্বল ওষধি, ফুল্ল ফুল, মধুর ফল, ভ্রমরস্পৃষ্ট মুকুল, স্ফুটোন্মুখ কিশলয়, ছায়াময় কুঞ্জবন, সুখময় উপবন, নিবিড় অরণ্য, অটল ভূধর, উত্তাল সাগর, উলসিত তটিনী, বীচিবিহ্বল সরোবর, ফেনিল প্রস্রবণ, কণবাহী সমীরণ, শীতল শিশির, হিম তুষার, কুসুমের সুবাস, জ্যোৎস্নার হাসি, মলয়ের বায়, তরঙ্গের হিল্লোল, মধুময় পরাগ, নীরদের নববারি; আর কত বলিব, যাহা খুঁজিবে তাহাই, পাইবে। দুই একটা উদাহরণ দিই। কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে কবি হিমালয় বর্ণন করিয়াছেন। সে বর্ণনা এইরূপ;—

"ভারতের উত্তরে হিমালয় নামে গিরিবর পৃথিবীর মানদণ্ডের মত অবস্থিত আছে। ইহার বিস্তৃতি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সাগর পর্য্যন্ত। মহার্ঘ মণি ও মহৌষধিতে মণ্ডিত হইয়া গিরি সকল পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠতম হইয়াছে। হিমালয় হিমের আলয়; কিন্তু অনন্ত রত্নের তুলনায় এক হিমদোষ লক্ষিত হয় না। গিরি,উচ্চ শিখরে নীরদে সংক্রামিত,অপ্‌সরার প্রসাধনভূত সন্ধ্যারুণ ধাতুরাগ ধারণ করে। ইহার সানুদেশে ভ্রাম্যমান মেঘের মেখলা; শৃঙ্গে ছায়াহীন সূর্য্যাতপ। সিদ্ধেরা ধারাক্লিষ্ট হইয়া ঐ শৃঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে করিশোণিত-সিক্ত কেশরীর রক্তপদ তুষারজলে ধৌত হয়; কেবল কুম্ভভ্রষ্ট মুক্তা-

লিখিত হইয়া বিদ্যাধরাঙ্গনার মদনলেখের সমাধান করে। এখানে কীচক বায়ুপূরিত হইয়া উচ্চতানে কিন্নর গায়কের সহকারিতা করে। এখানে সমীরণ করিকপোলকর্ষিত সরল তরুর রসে সুরভিত হইয়া প্রবাহিত হয়। এখানে কিরাতদম্পতী প্রদীপহীন গিরিগুহায় ওষধিপ্রভায় উদ্ভাসিত হয়। এখানে কিন্নরী ঘন তুষারে ক্লিষ্টপদ হইয়াও গুরু-নিতম্ব-পয়োধর-ভারে মন্দ গতিতে গমন করে। এখানে ঘনান্ধকার যেন দিবাকরভয়ে লুকাইয়া রয়। এখানে চমরী কৌমুদীধবল পুচ্ছ আন্দোলিয়া যেন গিরি-রাজকে চামর ব্যজন করে। এখানে মেঘ গুহা অবরোধ করিয়া বিবস্ত্রা কিন্নরীর লজ্জা নিবারণ করে। এখানে শীতল বায়ু গঙ্গাশীকর বহিয়া, দেবদারু কাঁপাইয়া, ময়ূরপুচ্ছ দুলাইয়া, মৃগয়াশ্রান্ত ব্যাধের শান্তি বিধান করে। এখানে শিখরসরোজলে নলিনী সূর্য্যের উন্মুখ কিরণে প্রস্ফুট হয়; সপ্তর্ষি মণ্ডল এই পুষ্প চয়ন করেন।”

মাঘ, ভারবি, ভবভূতি, বায়রণ, (Manfred) সেলি (Alastor, Prometheus) ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, সকলেই পর্ব্বত বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু রৈবতক, ইন্দ্রনীল, প্রস্রবণ, আল্‌প্‌ন্‌ (Alps) ককেসস্‌, স্কিড্‌ড; কেহই সৌন্দর্য্যে কালিদাসের হিমালয়ের সমকক্ষ নহে। তুলনা করুন—সেলির ককেসস্‌ বর্ণনা এইরূপ;—

> The ethereal cliffs
> Of Caucacus, whose icy summits shone
> Among the stars like sunlight, and around
> Whose caverned base, the whirlpools and the waves
> Bursting and eddying, irresistably
> Rage and resound for ever. * * *
> A howl
> Of cataracts from their thaw-cloven ravines
> Satiates the listening mind; continuous, vast,
> Awful as silence. Hark! The rushing snow
> The sun-awaken'd avalance.

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পর্ব্বতবর্ণনা এইরূপ;—

> I fixed my view
> Upon the summit of a craggy ridge

There was nothing but the stars and the grey sky.

* * *

When from behind that craggy steep, till then
The horizon's bound, a huge peak, black and huge
As if with voluntary power instinct,
Upreared its head.

অন্যত্র ;—

The rock like something starting from a sleep
Took up the lady's voice and laughed again.
That ancient woman seated on Helmerag
Was ready with her cavern. Hamman-scar
And the tall steep of Silver-how, sent forth
A noise of laughter; southern Laughrigg heard
And Fairfield answered with a mountain tone.
Helvellyn far into the clear blue sky
Carried the lady's voice—old Skiddaw blew
His speaking trumpet: back out of the clouds
Of Glaramara, southward came the voice.
And Kirkstone tossed it from his misty head.

বিস্তৃতিভয়ে অন্যান্য বর্ণনা উদ্ধৃত হইল না। এই সকল বর্ণনা তুলনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কাহারও পর্ব্বত ভীষণ, কাহারও গম্ভীর, কাহারও প্রশান্ত, কাহারও মহান্, কিন্তু কোন পর্ব্বতই কালিদাসের হিমালয়ের মত সুন্দর নহে। রঘুর সমুদ্রবর্ণনা-সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। কোন কবি (বাইরণ) প্রাকৃতিক জগতের ভীম প্রচণ্ডতায় আপনার উদ্বেল হৃদয়ের প্রতিকৃতি দেখিতেন; কোন কবি (ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ) প্রাকৃতিক জগতে এক বিশ্বময়ী মহাশক্তির চিন্ময় বিকাশ দেখিতেন; কোন কবি (ভবভূতি) প্রাকৃতিক জগতে প্রশান্ত গম্ভীরতার মহামূর্ত্তি দেখিতেন; কিন্তু কেহই কালিদাসের মত, প্রকৃতিতে সুষমার শোভার মধুরতার সুন্দরতার আবাসভূমি দেখিতে পাইতেন না।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। হিমালয়ের গিরিবনে বসন্তসমাগম হইল। "ফুলধনু হাতে রতিপতি রতির সহিত কাননে প্রবেশ করিলেন। অমনি মলয় পবন দিক্‌বালার নিশ্বাসের মত বহিতে লাগিল। অশোক অকালে

মত শোভিতে লাগিল। কর্ণিকার ফুটিয়া বর্ণশোভায় শোভিত হইল; হায় সে নির্গন্ধ! পলাশ বালেন্দুবক্র অর্দ্ধপ্রস্ফুট লোহিত কুসুম ধারণ করিল; যেন বসন্তলক্ষ্মী ভ্রমরের অঞ্জন-তিলক পরিয়া, অরুণ প্রবালরাগে ওষ্ঠ রঞ্জিত করিলেন। পিয়াল তরু পুষ্পিত হইয়া মঞ্জরীপরাগে মৃগের দৃষ্টি রোধ করিল। বনস্থল অনিলচালিত পত্রের মর্ম্মর রবে মুখরিত হইল। কোকিল চূত-মুকুল আস্বাদিয়া, মানিনীর মান টুটাইয়া, মধুর কুহরণ করিয়া উঠিল। কিন্নরীর বিপাণ্ডুর আননের পত্ররচনায় স্বেদজল শোভিতে লাগিল। বসন্ত-সমাগমে প্রাণিজগতে প্রেমরস উছলিয়া উঠিল। অনুরাগে মধুকর মধুকরীর সহিত এক ফুলে মধু পান করিল। মৃগ শৃঙ্গ দিয়া আবেশে মুদিতনয়না মৃগীর গাত্র কণ্ডুয়ন করিল। করিণী পদ্মপরাগসুরভি গণ্ডূষজল করীর মুখে তুলিয়া দিল। চক্রবাক্ অর্দ্ধভুক্ত মৃণালে চক্রবাকীর আরাধনা করিল। কিন্নর পুষ্পাসবপানে উদ্‌ভ্রান্তলোচনা, শ্রমজললুলিতা কিন্নরীর গীতাবসানে মুখ চুম্বন করিল। তরু নবপল্লবিতা স্তবকাভিনম্রা লতাবধূকে শাখাবাহু বেষ্টিয়া আলিঙ্গন করিল।"

কাব্যজগতে এমন সুন্দর প্রাকৃতিক বর্ণনা আর কোথাও আছে কি? দেখুন সেই পুরাতন তরু লতা, কুসুম পল্লব, মৃগ মৃগী ইত্যাদি; কিন্তু কি সুন্দর সমাবেশ! মিলটন্-কৃত স্বর্গোদ্যানের বর্ণনা, ইহার তুলনায় হটিয়া যায়। মিলটন্ ত্রিদিবের চিত্র আঁকিতে বসিয়া অবশ্যই সৌন্দর্য্যজগতের সকল উপাদান একত্র করিয়াছেন, কিন্তু এমন সুন্দর হইয়াছে কি?

> How from that sapphire fount the crisped brooks,
> Rolling on orient pearl, and sands of gold,
> With mazy error, under pendent shades
> Ran nectar, * visiting each plant, and fed
> Flowers worthy of Paradise * * *
> * * profuse on hill, and dale and plain,
> Both where the morning sun first warmly smote
> The open-field and where the unpierced shade
> Imbrowned the noontide bowers. Thus was this place
> A happy rural seat of various view.
> Groves whose rich trees wept odorous gums and balm;
> Others whose fruit, burnish'd with golden rind,

Betwixt them lawns, or level downs and flocks
Grazing the tender herb, were interposed,
Or palmy hillock ; or the flowery lap
Of some irriguous valley spread her store,
Flowers of all hue, and without thorn the rose ;
Another side umbrageous grots and caves
Of cool recess, o'er which the mantling vine
Lays forth her purple grape, and gently creeps
Luxuriant ; meanwhile murmuring waters fall
Down the slope hills, dispersed, or in a lake,
That to the fringed banks, with myrtle crown'd,
Her crystal mirror holds, unite their streams.
The birds their choir apply ; airs, vernal airs,
Breathing the smell of field and grove, attune
The trembling leaves, while universal Pan,
Knit with the Graces and the Hours in dance,
Led on the eternal Spring.

এ বর্ণনা অতিপ্রকৃত ; ইহাতে স্বর্ণরেণু, মুক্তারজঃ, অমৃত বারি, শোভা-বালা হোরাদেবী প্রভৃতির উল্লেখ আছে ; কালিদাসের বর্ণনা প্রকৃতের সীমা অতিক্রম করে নাই। অলকার বর্ণনায় কালিদাসও অতিপ্রকৃতের সাহায্য লইয়াছেন ; ঐ বর্ণনার সহিত স্বর্গোদ্যানের তুলনা হয় না। ভবভূতি-কৃত পার্ব্বত্য-জনস্থান-বর্ণনা এইরূপ ;—

"এই জনস্থান ; গিরি নদী বন আশ্রম তীর্থে সমাকুল হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। অরণ্য কোথায়ও স্নিগ্ধ শ্যাম, কোথায়ও ভীম কঠোর। স্থানে স্থানে নির্ঝর ঝরঝরে ঝরিয়া দিক্ শব্দিত করিতেছে। প্রান্তসীমায় লোমহর্ষণ দীর্ঘারণ্যে উন্মত্ত প্রচণ্ড শ্বাপদসংকুল গিরিগহ্বর বিস্তৃত রহিয়াছে। বন কোথায়ও নীরব নিস্পন্দ, কোথায়ও বনচরের বিকট রবাকীর্ণ ; কোথায়ও সুখসুপ্ত ভীমনাদী ভুজঙ্গের নিশ্বাসাগ্নিদীপিত। পল্বল রবিকরে প্রায় জলহীন, তাই তৃষিত কৃকলাসকুল অজগরের স্বেদজল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। অরণ্যের মধ্যভাগ প্রশান্ত গম্ভীর। ঐ মদকল ময়ূরের কোমল কণ্ঠ বর্ণ চিত্রিত পর্ব্বতমালা শোভিতেছে ; বিবিধ মৃগযূথ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে ; নীল নিবিড় তরুণ তরুরাজি ঘনসন্নিবিষ্ট রহিয়াছে ; শীতল

লতা হইতে সুরভি কুসুম খসিয়া পড়িতেছে। স্রোতঃ ফলভরশ্যাম জম্বু-নিকুঞ্জেপ্রতিহত হইয়া, মুখরিত হইতেছে। যুবা ভল্লুকের গভীর ফুৎকার-ধ্বনি গিরিগুহায় প্রতিধ্বনিগম্ভীর হইতেছে। শীতল সুরভি পবন করি-দলিত শল্লকীরসে সংস্পৃষ্ট হইয়া বহিতেছে; ময়ূরী কেকারব করিতেছে, হরিণ উন্মত্ত হইয়াছে; নদীতট সুন্দর বেতস লতা ও নিবিড় নীল নিচুল বৃক্ষে শোভিতেছে। দূরে মেঘমালার মত প্রস্রবণ গিরি দাঁড়াইয়া আছে, যথায় গোদাবরী প্রবাহিতা; যাহার জলে কূজনশীল বিহগসংকুল শ্যামবট তরু প্রতিফলিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে।”

ভবভূতির বর্ণনাও সুন্দর; কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যে ভীষণতার সমাবেশ আছে, কালিদাসের সৌন্দর্য্যে সুধুই সুন্দরতা। কালিদাসের প্রাকৃতিক বর্ণনার সমালোচনা, ঋতুসংহার সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিলে শেষ হয় না। গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত, এই ছয় ঋতু যথাক্রমে ঋতুসংহারে বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাসের কাব্যজগতের অন্যত্র যাহা, এখানেও তাহাই—সুন্দরের পর সুন্দর, তাহার পর সুন্দর। এই দাবানল বর্ণনা দেখুন।

“ঐ দাবানল! প্রবল পবনবেগে বনভূমে জ্বলিয়া উঠিল; ঐ বৃক্ষ হইতে লতাগ্রে পর্য্যন্ত হইয়া দিকে দিকে প্রসৃত হইল। ইহার দীপ্তি বিকচ কুসুম পুষ্পারুণ।

“ঐ বায়ু সংক্ষুব্ধ হইয়া গিরিগুহায় জ্বলিতেছে, ঐ তৃণরাশি বিদগ্ধ করি-তেছে। শুষ্ক বংশবন বিকট রবে স্ফুটিত হইতেছে; মৃগযূথ অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া ব্যাকুল পলাইতেছে।

“ঐ শাল্মলী বন জ্বলিতেছে; উঃ যেন অসংখ্য অগ্নি! বৃক্ষকোটরে যেন সুবর্ণ দীপিতেছে।

“দাবানল জ্বলিল! শুষ্কপত্র, জীর্ণ শাখা, উচ্চ পাদপ লঙ্ঘিয়া, দাবানল বন ছাইয়া জ্বলিল। বহ্নিদগ্ধ মৃগ করী কেশরী বৈরিভাব ভুলিয়া প্রাণভয়ে নদীজলে লুকাইল।”

ইংরাজ কবি টমসনও ঋতুসংহার লিখিয়াছেন। তাঁহারও কাব্যে ইংলণ্ডে বসন্তাদি চার ঋতুর বর্ণনা আছে। কিন্তু কবিতে ও কাব্যকারে কত প্রভেদ! তাঁহার কাব্যেও বর্ণনীয় ঋতুর সকল লক্ষণ আছে, কিন্তু কালিদাসের কাব্যের

প্রণালীর বর্ণনায় ও সূপকারের রন্ধনে যে ভেদ, * তাঁহার কাব্যে ও কবির কবিতায় সেই ভেদ। কবি সৌন্দর্য্যচক্ষু; কবি চুনিয়া চুনিয়া তিলোত্তমা রচনা করেন। এক কথায় টম্‌সন সা-ঋ-গা-ম সাধিতে শিখিয়াছেন, কালিদাস সেই সপ্ত স্বরে মধুর রাগিণী আলাপ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কালিদাসের বর্ষা বর্ণন পাঠ করুন।

"বর্ষাকাল রাজার মত সমৃদ্ধ; জলধর ইহার জয়কুঞ্জর, তড়িৎ ইহার জয়পতাকা, বজ্র নির্ঘোষ ইহার জয়ঢক্কা।

"আকাশ মেঘে সমাচ্ছন্ন হইল; মেঘ কোথায়ও নীলোৎপলকান্তি; কোথায়ও অঞ্জনকৃষ্ণ, কোথায়ও ঈষৎ ধূসরবর্ণ। মেঘ ধারাবর্ষী, জলভারে অবনত, মধুর রবে মন্থর গমনে আকাশে ভাসিয়া চলিল। তৃষাকুল চাতককুল চাহিয়া রহিল। শষ্পাঙ্কুর কন্দলীদল ও ইন্দ্রগোপকীটে মণিময় হইয়া ধরণী মোহিনী সাজিল। উৎসবে ময়ূর মধুর কেকারবে পুচ্ছ তুলিয়া নাচিতে লাগিল। নদী পূর্ণকায়ে তটতরু উপাড়িয়া, পঙ্কিল সলিলে সবেগে সাগরসঙ্গমে চলিল। মৃগ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া বিলোল নেত্রে বনস্থলে ধাবমান হইল। অভিসারিকা অনুরাগে মেঘমন্দ্রে অবহেলা করিয়া, ঘনান্ধকার রজনীতে বিদ্যুতপ্রভায় পথ খুঁজিয়া, প্রিয়সমাগমে চলিল। মানিনী বজ্রনির্ঘোষে চমকিয়া, অভিমান ভুলিয়া, প্রিয়কে আলিঙ্গন করিল। বিরহিনী মালা খুলিয়া আভরণ ফেলিয়া নয়নজলে সিক্ত হইল। নববারি ধূলিধূসর হইয়া বক্রগতিতে নিম্নাভিমুখে বহিয়া চলিল। ভেককুল আনন্দে কলরব করিতে লাগিল। ভ্রমর মধুহীন নলিনী ছাড়িয়া, মধুর গুঞ্জনে ময়ূরপুচ্ছে উড়িয়া বসিল। বনকরী মদমত্ত হইয়া গভীর গর্জ্জনে গণ্ডস্থলে মদবারি ক্ষরণ করিল। ভূধর শত প্রস্রবণে জলময় হইয়া, শ্বেতাভ নীরদ শিখরে ধরিয়া, ময়ূরসমাকুল হইয়া শোভিতে লাগিল। সুরভি সমীরণ কুসুমিত কদম্ব কেতকী বন কাঁপাইয়া, শীকরসম্পর্কে শীতল হইয়া বহিয়া চলিল। রমণী কদম্ব কেশর কেতকীর মালা পরিয়া, ককুভমঞ্জরীতে কর্ণাভরণ রচিয়া মোহিনী সাজিল। মেঘ ইন্দ্রধনু ধরিয়া, মৃদু পবনে বিধূত হইয়া, বিদ্যুদ্দামে মন হরণ করিল। বকুল মালতী কদম্ব যূথিকা, ফুল ফুটাইয়া কামিনীর অঙ্গ প্রসাধন করিল।

---

* "A recipe in the cookery book is as much like a good dinner, as this kind of stuff is to true word—painting. The poet with a real eye in his

"জলদকাল অনেক গুণে রমণীয় ; ইহা সকলের প্রীতিপ্রদ, ইহা প্রাণীর প্রাণভূত।"

আমরা দেখিয়াছি, জড়জগৎ দুই ভাগে বিভজ্য ; প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। প্রাকৃতিক জগতের বর্ণনা দেখিলাম ; এখন কৃত্রিম জগতের কিছু আলোচনা করা যা'ক। যে জড়জগৎ মনুষ্যের ক্রিয়াসিদ্ধ, তাহাই কৃত্রিম জগৎ। কৃতী মানুষ, শোভার উপর শোভা চাপাইয়া রুচি বাসনা কল্পনা অনুসারে ইহাকে সমৃদ্ধিময় করিয়াছে ; কৌশলে প্রকৃতিকে স্বেচ্ছানুসারিণী করিয়া সহকারিণী করিয়াছে। কিন্তু মানবের কৃত্রিমতার উপর আর এক জনের কৃতিত্ব আছে ; সে সর্ব্বধ্বংসী মহাকাল। মনুষ্যের শত যুগের সমৃদ্ধ নগরও কালে ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়াছে। এ পরিণতিও সুন্দর, মর্ম্মস্পর্শী ; ইহাও দেখিবার জিনিষ। পুরাতন দিল্লীর পরিণাম দেখিয়া সুকবি নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—"যেখানে সেই বিচিত্র রাজপুরী, সেই অতুলনীয় ময়দানবের নির্ম্মিত সভাগৃহ ছিল, আজ সেখানে দরিদ্রের কুটীর সমূহ বিরাজ করিতেছে। ভগবানের সেই অমানুষিক লীলার কেন্দ্রস্থান ইন্দ্রপ্রস্থের এই দশা! মসজিদের ছাদের প্রস্তরে বক্ষ রাখিয়া পুরাতন দুর্গের প্রাচীর দেখিয়া দেখিয়া আমি কাঁদিলাম। সকলই গিয়াছে, কেবল এখনও দুর্গের পদমূল ভক্তিভরে প্রক্ষালন করিয়া যমুনাদেবী শোকে নীরবে বহিয়া যাইতেছেন!" তাই বলিতেছিলাম, ভগ্নাবশেষও দেখিবার জিনিষ।

অতএব জড় কৃত্রিম জগতের দুই ভাব। প্রথম, শোভাময় সমৃদ্ধিময় দেউল প্রাসাদ ; দ্বিতীয়, শান্তিময় বিষাদময় ভগ্নাবশেষ। আমরা দেখিব, উভয়েরই বর্ণনায় কালিদাস অতুল্য।

কুবের নগরী অলকার বর্ণনা এইরূপ ঃ—"অলকা অদ্ভুতপুরী। এখানে মেঘ-গম্ভীর-মৃদঙ্গধ্বনি-মুখর অভ্রভেদী মণিময় সচিত্র প্রাসাদমালায় বিদ্যুৎবরণী ললিত ললনা বিহার করে। এখানে কালের শাসন না মানিয়া ছয় ঋতু একত্র বিরাজ করে ; তাই যক্ষবধূ ফুলসাজে সাজিয়া, লোধ্রপরাগে মুখরাগ করিয়া, চূড়ায় নবকুরুবক বাঁধিয়া, কুন্দ কুসুমে কেশ গাঁথিয়া, কর্ণে শিরীষ ধরিয়া, সীমন্তে কদম্ব দোলাইয়া, হস্তে লীলাকমল লইয়া ফুলময়ী সাজে। এখানে তরু নিত্য পুষ্পিত হইয়া মধুমত্ত ভ্রমরে মুখরিত হয় ; সরোবরে নিত্য নলিনী ফুটিয়া হংসসমাকুল হয় ; ময়ূর নিত্য পুচ্ছ তুলিয়া কেকারব করে ; প্রদোষে

জল, অন্য অশ্রুজল নাই; সুধু ফুলশরের তাপ, অন্য তাপ নাই; সুধু প্রণয়-কলহে বিরহ, অন্য বিরহ নাই; সুধু অনন্ত যৌবন, অন্য বয়স নাই। এখানে নিত্য মহোৎসব; কোথায়ও যক্ষদম্পতী মণিময় পানগৃহে পুষ্পাসব পান করে; কোথায়ও মণি-প্রদীপ উজ্জ্বলে জ্বলিয়া বিবস্ত্রা যক্ষবধূর লজ্জা বিধান করে; কোথায়ও শশিকরে চন্দ্রকান্তমণি ঝরিয়া যক্ষাঙ্গনার অনঙ্গ জ্বালা নিবারণ করে; কোথায়ও কিন্নরগণ মিলিয়া একতানে মধুর স্বরে ধনপতির যশোগান করে; কোথায়ও মন্দাকিনী-কণ-বাহী শীতল পবনে মন্দারছায়ায় যক্ষকন্যা মণি লুকাইয়া, কনকবালুকায় কন্দুক ক্রীড়া করে। এখানে নিশীথে উদ্‌ভ্রান্ত অভিসারিকা পথ চলিয়া যায়; তাহার কেশ হইতে মন্দার কুসুম খসিয়া পড়ে, কর্ণ হইতে কনক কমল ঝরিয়া পড়ে, কেশ হইতে মুক্তাজাল সরিয়া যায়, কণ্ঠ হইতে হারযষ্টি ছিঁড়িয়া যায়। এখানে ভয়ে কাম ফুলধনু গুটাইয়া থাকে, কিন্তু চতুর রমণীর ভ্রুকুটীকুটিল কটাক্ষ শরে তাহার অভাব দূর হয়। এখানে অপূর্ব্ব কল্পতরু বিরাজ করে; তাহাতেই যক্ষবধূর সকল প্রসাধন সিদ্ধ হয়, বিচিত্র বসন, বিচিত্র মধু, পুষ্পকিশলয়ে বিচিত্র ভূষণ, চরণ-কমলের বিচিত্র লাক্ষারাগ, তরু সকলই প্রসব করে।

"মণিহারে যেমন মধ্যমণি, সরোবরে যেমন প্রফুল্ল কমল, অলকায় তেমনি মনোহর যক্ষগৃহ। তাহার তোরণ ইন্দ্রধনু সুন্দর; সম্মুখে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল-ভারে নত তরুণ মন্দার তরু। অদূরে শোভাময় বাপী, বিকচ স্বর্ণকমলে সজ্জিত হইয়া মরকতসোপানমালায় শোভিতেছে। হংসকুল মানস সরঃ ভুলিয়া তাহার জলে বিচরণ করিতেছে; তীরে কনককদলীবেষ্টিত ক্রীড়া-শৈল। তাহার শিখরদেশ ইন্দ্রনীলমণিখচিত হইয়া বিদ্যুৎ-দীপ্ত নীরদ-খণ্ডের মত শোভিতেছে। নিকটে কুরুবকমণ্ডিত মাধবীমণ্ডপ, তাহার পার্শ্বে চঞ্চলদল রক্তাশোক ও মনোহর অশোক তরু। মধ্যে মণিখচিত স্ফটিকফলক কাঞ্চনের বাসযষ্টি, প্রদোষে যাহার উপর বসিয়া ময়ূর শিঞ্জিনীর তালে নৃত্য করে।"

নগরের সমৃদ্ধি বর্ণন অনেক কবিই করিয়াছেন, কিন্তু কালিদাসের মত কেহ করিতে পারিয়াছেন কি? মাঘের দ্বারকা, শ্রীহর্ষের ভীমপুর, বাণ-ভট্টের উজ্জয়িনী, মিলটনের রোম, কোন নগর অলকার মত সুন্দর? তুলনা করুন—মিলটন-কৃত রোমের বর্ণনা এইরূপ। চতুর সয়তান শিশু যিশুকে

Divided by a river, of whose banks
On each side, an imperial city stood,
With towers and temples, proudly elevate,
On seven small hills, with palaces adorned
Porches and theatres, baths, aqueducts,
Statues and trophies and triumphal arcs
Gardens and groves presented to his eyes
Above the hight of mountains interposed.
* * Great and glorious Rome, queen of the earth
So far renowned and with the spoils enrich'd
Of nations; there the capitol thou seest
Above the rest, uplifting his stately head
On the Tarpeian rock, her citadel
Impregnable, and there mount Palatine
The imperial palace, compass huge, and high
The structure, skill of noble architects
With gilded battlements conspicuous far
Turret and terraces and glittering spires.
* * pillars and roofs
Carved work, the hand of famed artificers
In cedar marble ivory or gold.

সমৃদ্ধ কৃত্রিমতার দৃষ্টান্ত দেখিলাম। এইবার সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষের একটা উদাহরণ দেখি; পরিত্যক্ত রঘুরাজধানী অযোধ্যার বর্ণনা এইরূপ;—

"অযোধ্যার অবস্থা অতি শোচনীয়! কোথায়ও প্রাসাদ ভগ্নাবশেষ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে; কোথায়ও প্রাকার ভাঙ্গিয়া ভূতলশায়ী হইয়া আছে। যেন উগ্র পবন বেগে সংক্ষুব্ধ মেঘ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছে। অযোধ্যার রাজপথে নিশীথে আর অভিসারিকার নূপুরধ্বনি শ্রুত হয় না; এখন তথায় উল্কামুখী শিবা আহারান্বেষণে বিচরণ করে। দীর্ঘিকাজলে আর পুরমহিলা মধুর রব তুলিয়া অবগাহন করে না; এখন তথায় বন্য মহিষ শৃঙ্গ আস্ফালন করে। গৃহ-ময়ূর বাসযষ্টি-হারা হইয়া মৃদঙ্গ-মন্দ্রে আর নৃত্য করে না; এখন দাবানলে দগ্ধপুচ্ছ হইয়া বনে বন্যভাব ধারণ করিয়াছে। সোপানমার্গে আর অলক্তকরাগ দেখা যায় না, এখন তথায় মৃগরক্তাক্ত ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন লক্ষিত হয়। পটে লিখিত করিকুল পদ্মবনে করিণীর

য়াছে। স্তম্ভবিলম্বী রমণীচিত্র এখন কালসহকারে বিবর্ণ হইয়া শ্রীহীন হইয়াছে। সুধাধবল হর্ম্ম্যতল এখন বিমলিন ও তৃণাচ্ছন্ন হইয়াছে, আর তাহাতে চন্দ্ররশ্মি প্রতিভাত হয় না। বিলাসিনী সযতনে যে লতার পুষ্প চয়ন করিত, এখন তাহা বানরে উৎপাটিত করিতেছে। দীপালোকহীন বরাঙ্গনাবিরহিত গবাক্ষ এখন মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। সরযূ-জলে আর কেহ স্নান করে না; সরযূতীরে আর কেহ উপহার দেয় না; সরযূকূলের বানীরগৃহ এখন জনশূন্য।"

একজন পাশ্চাত্য কবি লিখিয়াছেন * যে, শোকে অতীত সুখের পূর্ব্বস্মৃতিই শোকের পরাকাষ্ঠা। অযোধ্যার ভগ্নাবশেষবর্ণনায় কবি পূর্ব্ব সমৃদ্ধি স্মরণ করাইয়া, বিষাদের এই পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়াছেন। এ বর্ণনা কত সুন্দর, কেমন হৃদয়গ্রাহী! বায়রণ তাঁহার কাব্যে (Childe Harold) সমৃদ্ধ রোমনগরীর শোচনীয় পরিণাম বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের তুলনায় তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর। তুলনা করুন;—

Come and see
The cypress, hear the owl and plod your way
O'er steps of broken thrones and temples. Ye!
Whose agonies are evils of a day!
A world is at our feet as fragile as our clay!
The Niobe of Nations! There she stands
Childless and crownless, in her voiceless woe
An empty urn within her withered hands
Whose holy dust was scattered long ago.
The Scipio's tomb contains no ashes now,
The very sepulchres lie tenantless
Of their heroic dwellers: Dost thou flow
Old Tiber, thro' a marble wilderness?
Rise with thy yellow waves and mantle her distress,

* * *

Cypress and ivy and wall flower grown
Matted and massed together; hillock heaped
On what were chambers, arch crushed, column strown

---

* It is true the poet sings
That a sorrow's crown of sorrow is

In fragments; choked up vaults and frescos steep'd
In subterranean damps, where the owl peeped
Deeming it midnight; temples, baths or halls?
Pronounce who can? For all that learning reaped
From her research hath been that these are walls,
Behold the imperial mount! 'Tis thus the mighty falls.
&c. &c. &c.

Childe Harold's Pilgrimage Canto IV.

আমরা বহির্জগতকে জড় ও চেতন, এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছি। জড় জগতের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি; এখন চেতন জগতের কিছু আলোচনা করিব। এই চেতন জগৎ ইতর প্রাণী ও মনুষ্য লইয়া; অর্থাৎ, চেতন জগতের এক দিকে পশু পক্ষী ইত্যাদি, অন্যদিকে নর-নারী। দেখি, কালিদাস এ জগতের কত সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, কালিদাস প্রাকৃতিক জগতের বর্ণনায় বহুলপরিমাণে পশু পক্ষী প্রভৃতির অবতারণা করিয়াছেন। বাস্তবিক, অবসর পাইলেই, এ কবির মন ইতর প্রাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। দিলীপ বশিষ্ঠাশ্রমে প্রবেশ করিয়া, সুরভি পবনে বীজিত হইয়া, প্রথমেই মধুর কেকারব শুনিলেন; অনন্তর স্থলে চটুলনয়ন মৃগদম্পতী এবং জলে কলনাদী সারসপংক্তি দেখিলেন। দুষ্মন্ত কণ্বাশ্রম আঁকিতে বসিয়া, মালিনীর তীরে হংসমিথুন আঁকিলেন, হিমালয়মূলে হরিণশিশু আঁকিলেন। আর আশ্রমবৃক্ষের তলে কৃষ্ণসারযুগল আঁকিলেন। কেন আঁকিলেন, এ কথার একমাত্র উত্তর। মধুর কেকারব, চটুলনয়ন মৃগ-দম্পতী, কলনাদী সারসপংক্তি ইত্যাদি, ইহারা সুন্দর। কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি।

ইংরেজ সমালোচক বলেন, তাঁহার দেশের কবিই ইতরপ্রাণীর আদর জানেন; যে দেশে ইতর প্রাণীর প্রধান বিনিয়োগ মানুষের বৃকোদরপূর্ত্তি, সে দেশ সম্বন্ধে এ কথা কতদূর যথার্থ, বলিতে পারি না। তবে দেখিতে পাই বটে, কাউপারের মত কবি মৈত্রীভাবে, বার্ন্‌সের মত কবি সহানুভূতি-ভাবে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মত কবি জাগতিক ভাবে,ইতর প্রাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। কিন্তু কেহই কালিদাসের মত প্রাণিজগতের সৌন্দর্য্য অনুভব

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে বদ্ধদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্ব্বকায়ম্ ।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্ব্যাং প্রয়াতি ॥

কালিদাসকৃত ভয়ত্রস্ত মৃগের বর্ণনা ঐরূপ। সেক্ষপীয়র-কৃত মৃগয়া-অশ্বের বর্ণনা এইরূপ ;—

Round hoofed, short jointed, fetlocks shag and long
Broad-breast, full eye, small head and nostrils wide,
High crest, short ears, straight legs and passing strong
Thin mane, thick tail, broad buttock, tender hide.

Venus and Adonis.

এইবার মানব মানবীর কথা। বহির্জগতে মানুষেই রূপের চরমোৎকর্ষ, মানবই সৌন্দর্য্যের ললাম, শেষ বিবর্ত্তন। কালিদাস এ সৌন্দর্য্য কত দূর অনুভব করিয়াছেন? দুই একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক। তাঁহার উর্ব্বশীর নিরুপম লাবণ্য আভরণের আভরণভূত, প্রসাধনের প্রসাধনভূত। ইহা সাধারণ বিধাতার সৃষ্ট নহে। ইহার স্রষ্টা কান্তিপ্রদ চন্দ্রমা, অথবা মধুররস মদন অথবা কুসুমাকর বসন্ত।

যক্ষ বনিতার বর্ণনা এইরূপ ;—

"মোহিনীর অঙ্গসৌকুমার্য্য প্রিয়ঙ্গুলতার ন্যায়, অক্ষিপাত চকিত হরিণী-প্রেক্ষণের ন্যায়, কেশকলাপ ময়ূরীর পুচ্ছভারের ন্যায়, ও ভ্রূবিলাস পবন-তাড়িত নদীজলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গহিল্লোলের ন্যায়। সে রূপ সমষ্টি কখন একাধারে বিরাজিত হয় না।"

আর বিশ্বমোহিনী নগরাজদুহিতা পার্ব্বতীর রূপবর্ণনায় কালিদাস যে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সে বর্ণনা এইরূপ ;—

"তুলিকায় বিভাবিত চিত্রপটের ন্যায়, অরুণালোকে বিকশিত কমল-কোরকের ন্যায় উমা সুন্দরী। তাঁহার চরণযুগল স্থলকমলের ন্যায় লোহিতাভ, পাদক্ষেপ রাজহংসীর ন্যায় লীলাঙ্কিত; জঙ্ঘা বিধি-সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ; ঊরু করিকর ও রামরম্ভা দ্বারাও অনুপমেয়; তাঁহার নিতম্ব অন্যনারী-দুর্ল্লভ; নাভি নিম্নাবনত ও বলিত্রয়শোভী; স্তনদ্বয় পীন ও প্রবৃদ্ধ; বাহু

অধরোষ্ঠ প্রবালরাগারুণ; দন্তরুচি মুক্তাফল ও শ্বেতপুষ্পের ন্যায় বিশদ; তাঁহার বাণী অমৃতময়ী; কণ্ঠস্বর কোমল করাহত বীণার নিক্কণের মত; নয়নদ্বয় চকিত হরিণী বা নীলোৎপল তুল্য; ভ্রূযুগ অঞ্জনশলাকায় চিত্রিত, যেন কামের ধনুর্গুণ; কেশপাশ চমরীপুচ্ছমনোহারী; ফলতঃ, উমার রূপ ত্রিজগতের সৌন্দর্য্যসমষ্টির একীকরণ।"

চন্দ্রের কিরণে ক্ষুদ্র জোনাকীর মত, এ বর্ণনার তুলনায় সকল বর্ণনা অসুন্দর হইয়া পড়ে; আর কাহার কালিদাসের মত রূপোপলব্ধি আছে? তুলনা করুন।

জুলিয়েতের রূপবর্ণনা এইরূপ,—

Oh! she doth teach the torches to burn bright!
Her beauty hangs upon the cheek of night
Like a rich jewel in an Ethiop's ear.
Beauty too rich for use, for earth too dear!
So shows a showy dove trooping with crows
As yonder lady, o'er her fellows shows.

Romeo and Juliet.

ইমোজেনের রূপবর্ণনা এইরূপ,—

Cytherea,
How bravely thou becomest thy bed. Fair lily!
And whiter than the sheets. * *
Rubies unparagoned
How dearly they do't 'Tis her breathing that
Perfumes the chamber thus: the flame o'the taper
Bows towards her; and would underprop
To see the enclosed lights, now canopied
Under these windows; white and azure laced
With heaven's own blue.

Shakespere's Cymbeline.

মিলটন-কৃত ইভের বর্ণনা এইরূপ;—

So lovely fair
That what seemed fair in all the world seemed now
Mean or in her summed up, in her contained.
And in her looks which from that time infused

এত দূর আমরা নারীর বর্ণনা দেখিয়াছি। নরের রূপবর্ণনা অন্যরূপ। ভীমকান্ত দিলীপ বা গম্ভীরমধুরাকৃতি দুষ্মন্ত ইহার দৃষ্টান্ত। কিন্তু ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ যোগেশ্বর মহাদেব; তাঁহার বর্ণনা এইরূপ;—

"মহাযোগী মহাধ্যানে নিমগ্ন; বিজনবন, জনহীন লতাগৃহ; কেবল দ্বারদেশে নন্দী বাম করে হেমবেত্র ধরিয়া, ওষ্ঠে একাঙ্গুলী স্থাপিয়া, নীরবতা বিধান করিতেছে। সেথায় বৃক্ষ নিস্পন্দ, ভ্রমর নিশ্চল, পক্ষী নীরব, মৃগ গতিহীন; কানন যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া আছে। মহাদেব দেবদারুতলে ব্যাঘ্রচর্ম্মে বীরাসনে সমাসীন। তাঁহার ঋজু আয়ত দেহ স্পন্দরহিত; ফুল্ল-রাজীবরক্ত পাণিযুগল অঙ্কোপরি উত্তানভাবে স্থাপিত; জটাকলাপ ভুজঙ্গে বদ্ধ; দ্বিগুণিত অক্ষসূত্র কর্ণাবলগ্ন; গ্রন্থিবদ্ধ কৃষ্ণচর্ম্ম নীলকণ্ঠে লম্বমান; ভ্রূভঙ্গরহিত, স্পন্দহীন নিশ্চল চক্ষু-নাসাগ্রনিবিষ্ট; চূড়ায় মৃণালসুকুমার চন্দ্রকলা, কপাল-নেত্রের জ্যোতিঃপ্রভায় পরিম্লান। সমাধিবশে মন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আপনার চিন্তায় আপনি নিমগ্ন। যেন বৃষ্টিক্ষোভরহিত জলধর, যেন তরঙ্গভঙ্গহীন জলধি, যেন নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপ, মহাদেব বিরাজ করিতেছেন।"

মহিমান্বিত মহাপুরুষের ইহা অপেক্ষা সুন্দর বর্ণনা হইতে পারে না। মিল্‌টন একস্থলে মহাপুরুষের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সে বর্ণনা কালি-দাসের বর্ণনার মত সুন্দর নহে। তুলনা করুন;—

Down thither prone in flight
He (Raphael) speeds and through the vast ethereal sky
Sails within worlds and worlds, * *
Till within soar
Of towering eagles, to all the fowls he seems
A phœnix, gazed by all. * *
At once on eastern cliff of paradise
He lights; and to his proper shape returns,
A seraph winged: six wings he wore, to shade
His lineaments divine; the pair that clad
Each shoulder, broad came mantling o'er his breast
With regal ornament; the mid pair

And colours dipped in heaven; the third his feet
Shadowed from either heel with feathered mail
Sky-tinctured grain, Like Maia's son he stood
And shook his plumes, that heavenly fragrance filled
The curcuit wide.

হৃদয়ের যেরূপ ভাব, দেহের সেইরূপ ভঙ্গী (Posture); হৃদয় দেহ স্থায়ী, ভাব ভঙ্গী অস্থায়ী, কিন্তু অনেক স্থলে ভাবের সাহায্যেই আমরা সম্যক্ হৃদয়ের পরিচয় পাই; এইরূপ ভঙ্গীর অবস্থায় অনেক স্থলে রূপের সমগ্র চিত্র দেখিতে পাই। ভাস্কর ও চিত্রকরের এই ভঙ্গীই প্রধান উপাদান। ফিদিয়ুসের ভাস্কর্য্য ও অ্যাংগিলোর চিত্র কেবলই ভঙ্গীময়। কবির কাব্যে দেহ ও ভঙ্গী উভয়েরই সমাবেশ হয়। কালিদাসেও তাহাই হইয়াছে। আমরা দেহবর্ণনার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, এবার ভঙ্গী-বর্ণনার একটা দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি। পার্ব্বতী ফুলসাজে সাজিয়াছেন। তাঁহার বরাঙ্গে পদ্মরাগ-রক্ত অশোক, হেমকান্তি কর্ণিকার, মুক্তাধবল সিন্ধুবার শোভিতেছে। বরবপু স্তনভারে ঈষৎ অবনত; অরুণ-লোহিত বল্কলে আচ্ছাদিত হইয়া যেন স্তবকাভিনম্রা পল্লবিনী লতার মত শোভিতেছে। গতিবশে কেশরময় মেখলা নিতম্বদেশ হইতে স্খলিত হইতেছে, পার্ব্বতী তাহা ব্যবস্থিত করিতেছেন; সুরভি নিশ্বাসে সমাকৃষ্ট হইয়া, ভ্রমর বিম্বাধরে পতিত হইতেছে, চকিতনয়না লীলাকমল সঞ্চালিয়া তাহাকে নিবারিতেছেন। ইত্যাদি।

এতদূরে কলিদাসের বহির্জগতের সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির সমালোচনা শেষ হইল; আমরা বারান্তরে অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ ও অধ্যাত্মজগতের সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির সমালোচনা করিব। (ক্রমশঃ।)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ঘনশ্যাম দাস।

বসন্তে সকল কোকিলই গান গায়। চৈতন্যের মাধুর্য্যরসে বঙ্গে কবিতা-কুঞ্জে এক দিন বসন্তের উদয় হইয়াছিল। সেই দিন শত কণ্ঠে মধুর ধ্বনি শুনা গিয়াছিল।

বৈষ্ণব কবিগণের কাব্য সংগ্রহ করিয়া পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, গীত-চন্দ্রোদয়, গীতচিন্তামণি, পদকল্পলতিকা প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ হইতে প্রায় কুড়ি (১৮৭৩) বৎসর পূর্ব্বে,বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র,বিদ্যা-পতির পদাবলি সংগ্রহ করিয়া, যথাসাধ্য পাঠ সংশোধন করিয়া প্রকাশিত করেন। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে,(১৮৭৮) বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রাচীন পদাবলী নাম দিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলি এবং কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রকাশিত করেন। এই বৎসরই বাবু সারদাচরণ মিত্র, বিদ্যাপতিকে একটু সভ্য ভব্য করিয়া, সমাজে প্রচারিত করিবার চেষ্টা করেন। ইহার সাত বৎসর পরে, বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, পদরত্নাবলী নামে আর একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কয়েক বৎসর হইল, বঙ্গবাসীর সত্ত্বা-ধিকারী, প্রাচীন পদাবলীর এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

যিনি যাঁহার পদাবলি প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি আপন ইচ্ছা বা অভি-জ্ঞামত,অথবা দুই একখানি পুঁথি মিলাইয়া পাঠসংশোধনের চেষ্টা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের জীবনবৃত্তান্তও কতক পরিমাণে জানা গিয়াছে। সম্প্রতি ভগবদ্ভক্ত শিশিরকুমার ঘোষ নরোত্তমের জীবনচরিত প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব কবির সংখ্যা হয় না। অথচ তাঁহারা কেহই সামান্য লোক নহেন—ভক্তমালায় তাঁহাদের অসামান্য সম্ভ্রম। জ্ঞান-দাস, বলরাম, শশিশেখর, ঘনশ্যাম, গোবিন্দদাসের পরেই আদরণীয়। বৈষ্ণব সমাজে এই কয়েক জনকে প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে;—

বিদ্যাপতিশ্চণ্ডীদাসো জয়দেবঃ কবীশ্বরঃ।
লীলাশুকঃ প্রেমযুক্তো রামানন্দশ্চ নন্দদঃ।

ইঁহাদের পরেই জ্ঞানদাস বলরামের নামোল্লেখ করিতে হয়। অথচ, অদ্যাপি ইঁহাদের জীবনচরিত সংগ্রহ করিতে বা প্রকাশ করিতে কেহ চেষ্টা করেন নাই। বিল্বমঙ্গলের পদাবলি জয়দেবের মত ললিত না হইলেও, ভাবের প্রগাঢ়তায় তাহা অপেক্ষা ন্যূন নহে। বঙ্গদেশে বিল্বমঙ্গলের যে গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার পাঠ এত অশুদ্ধ যে, অর্থ সংগ্রহ করা দুষ্কর। রামানন্দ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর পদাবলি এখন সংগ্রহ-গ্রন্থ ভিন্ন আর কোথায়ও দেখা যায় না। যাঁহারা এই সকল মহাত্মাদিগকে প্রাতঃস্মরণীয় বলিয়া গৌরব করেন, যাঁহাদের পদাবলীর এক একটি পদ সুধাস্রাবী, দুর্ভাগ্য দেশে অদ্যাপি তাঁহাদের পদাবলি কেহ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিল না। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলি অসম্পূর্ণ ও অশুদ্ধভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত, কবিরাজ গোস্বামীর চরিতামৃতের এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

বৈষ্ণব পদাবলীর চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলে, একটি কথা স্বতঃই মনে হয়। কল্পতরু প্রভৃতি পদাবলী কিরূপে সংগৃহীত হইল? যখন দেশে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, হাতে হাতে লিখিয়া গ্রন্থ প্রচার করিতে হইত, তখন গ্রন্থসংখ্যার বহুলতা সম্ভব নহে। কোন কোন সংগ্রহ-গ্রন্থ কীর্ত্তনীয়াদিগের মুখে গান শুনিয়া সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। গ্রন্থ দেখিয়া সংগ্রহ প্রস্তুত হইয়া থাকিলে, এত পাঠান্তর ঘটিত না। কীর্ত্তনীয়াগণ প্রেমিক ও গায়ক, কিন্তু পণ্ডিত নহেন—আবার ইচ্ছা পূর্ব্বক যে তাঁহারা প্রাচীন পদে কখন সংযোগ-বিয়োগ করেন নাই, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। বিদ্যাপতি ও বসন্তরায়ে শত বৎসরের প্রভেদ, অথচ বিদ্যাপতির পদের সঙ্গে যে গোবিন্দদাসের ভণিতা দেখা যায়, বসন্তরায়ের পদের সঙ্গেও সেই গোবিন্দদাসের ভণিতা আছে। ইহার একমাত্র অর্থ এই হইতে পারে যে, কীর্ত্তনীয়া গোবিন্দদাস, উভয়ের পদে আপনার নাম সংযোগ করিয়া দিয়াছেন।

কবিদিগের গ্রন্থ দেখিয়া যে কোন সংগ্রহ প্রস্তুত হয় নাই, অথবা সংগ্রহের কোন অংশ প্রস্তুত হয় নাই, এ কথাও আমরা বলিতে পারি না। পদামৃত-সমুদ্র দেখিয়া ও কীর্ত্তনীয়ার নিকট সংগ্রহ করিয়া,পদকল্পতরু রচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থ কৈলা পদামৃত সমুদ্র আখ্যান,
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান।

সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল।
এই গীত কল্পতরু নাম কৈনু সার॥

কিন্তু যে সকল গ্রন্থ দেখিয়া সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছিল, সে সকল গ্রন্থ কোথায় গেল? মৈথিলী গোবিন্দদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন ও কৃষ্ণকর্ণামৃত পাওয়া যায়, কিন্তু বুধুরীয় গোবিন্দদাসের গ্রন্থ কোথায়? এবং পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা ও গীতচিন্তামণি ভিন্ন আর কোন সংগ্রহ-গ্রন্থ কি প্রস্তুত হয় নাই? আমাদিগের নিকট গীতচন্দ্রোদয় নামে একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ রহিয়াছে—এখানি এ পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানিতে পারি নাই।

গীতচন্দ্রোদয়ের সংগ্রহকারক নরহরি দাস। শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ও গীতচন্দ্রোদয়ের সংগ্রাহক নরহরি দাস, একই ব্যক্তি নহেন। ইহাঁর জন্মস্থান নবদ্বীপ না হইলেও, ইনি নবদ্বীপে বাস করিতেন। ইহাঁর নাম ঘনশ্যাম। নরোত্তম, কবিশেখর, বলরাম, নয়নানন্দ প্রভৃতি অনেকের পদ ইহাঁর গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং ইনি ইহাঁদের পরবর্ত্তী। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর চৈতন্যের পরিকর।

বৈষ্ণব কবিগণের আবির্ভাবকাল বা জীবনচরিত সংগ্রহ করা সহজ নহে। আমরা যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া, চৈতন্যের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণের আবির্ভাব-কাল যেরূপ নিরূপণ করিয়াছি, এই স্থানে তাহার উল্লেখ করা গেল:—

জয়দেব—১১০০ খৃষ্টাব্দ।
বিদ্যাপতি—১৩৭৫—১৪৭৫।
চণ্ডীদাস— ঐ
চৈতন্য—১৪৮৪—১৫৩২।
রামানন্দ রায়—ঐ
নরহরি সরকার ঠাকুর—১৫৪০ খৃঃ তিরোভাব।
সনাতন—১৫১৫ বৃন্দাবন গমন।
জীব—১৪৯৫ আবির্ভাব।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ—[illegible]

নরোত্তম ঠাকুর—	ঐ	১৫১৫।
রামচন্দ্র কবিরাজ—	ঐ	১৫২০।
গোবিন্দদাস কবিরাজ	ঐ	১৫২৫।
বৃন্দাবন দাস—	ঐ	
জ্ঞানদাস—	ঐ	
বলরাম দাস—	ঐ	
যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী—	ঐ	
বল্লভদাস বা বল্লভীকান্ত দাস		
গোকুল দাস		
গৌরাঙ্গ দাস		
গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী		
রসিক মুরারি		
চৈতন্য দাস		

রামানন্দ, সনাতন, নরহরি, জীব গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ,চৈতন্যের সমসাময়িক ; শ্রীনিবাস ও নরোত্তম, চৈতন্যদেবকে দেখিতে পান নাই। রামচন্দ্র, গোবিন্দ, জ্ঞান, বলরাম,যদুনন্দন প্রভৃতি নরোত্তম ঠাকুরের সমকাল-বর্ত্তী, চৈতন্যদাস বংশীবদনের পুত্র। সুতরাং বংশীবদন নরোত্তম ঠাকুরের সমসাময়িক বা অব্যবহিত পুর্ব্ববর্ত্তী। শ্রীনিবাস হইতে চৈতন্য দাস পর্য্যন্ত সকলেই খেতুরীতে বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। রামচন্দ্র, গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও নরোত্তমের পরিকর। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম এক সময়ে বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। ইহাঁরা দুজন বঙ্গদেশে চরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ সকল প্রচারিত এবং ইহাঁদের সহযাত্রী "শ্যামানন্দ" কৃষ্ণদাস উড়িষ্যায় জীব গোস্বামীর ভক্তিগ্রন্থ সকল প্রচারিত করেন। শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্রের তিরো-ভাবের কয়েক বৎসর পরে, নরোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব হয়। বল্লভ, গোকুল, গৌরাঙ্গ, বলরাম মিশ্র ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, নরোত্তমের মন্ত্র-শিষ্য। সুতরাং আকবরের বাদসাহৎপ্রাপ্তির পূর্ব্বেই, অন্যূন দ্বাদশ জন বৈষ্ণব কবি মধুর সঙ্গীতে বঙ্গদেশ পুলকিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। গীত-চন্দ্রোদয়-প্রণেতা ঘনশ্যাম নরহরি ইহাঁদের পরকালবর্ত্তী। ষোড়শ শতাব্দীর

লোচনদাস নরহরির শিষ্য। কবি শশিশেখর রায় পূর্ব্বতন। রাধামোহন ও বৈষ্ণবদাস তাঁহার পরস্তন। এই বৈষ্ণবদাস পদকল্পতরু-রচয়িতা। রাধামোহন ও বৈষ্ণবদাস এক ব্যক্তি না হইলেও, তাঁহারা সমসাময়িক ছিলেন।

নরহরির রচিত চারিখানি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। প্রথম খানি পদ্ধতি-প্রদীপ—এখানি সংস্কৃত ভাষায় রচিত; বৈষ্ণবদিগের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। দ্বিতীয় খানির নাম গৌরচরিতচিন্তামণি; ইহাতে গৌরাঙ্গ প্রভুর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। প্রসঙ্গক্রমে নবদ্বীপের সৌন্দর্য্যের ভূরিভূরি সুখ্যাতি করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ খানি হইতে তৎকালীন নবদ্বীপবাসীদিগের আচারব্যবহারের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। তৃতীয় খানি পিঙ্গলছন্দের মত বাঙ্গালা ভাষায় ছন্দঃশাস্ত্র রচনা করা হইয়াছে। নরহরি যে সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন, এই খানি হইতে তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আপনার মত সমর্থন করিতে নরহরি ভূয়োভূয়ঃ পিঙ্গলছন্দঃশাস্ত্র, উজ্জ্বলনীলমণি, ছন্দঃকৌস্তুভ, বৃত্তরত্নাকর, বৃত্তরত্নমালা, অগ্নিপুরাণ, সঙ্গীতপারিজাত, সঙ্গীতমুক্তাবলী, সঙ্গীতদামোদর, ছন্দদীপক, বৃত্তচন্দ্রিকা; সঙ্গীতসার, সঙ্গীতকৌমুদী, গীতপ্রকাশ, ছন্দোমঞ্জরী, মথুরামাহাত্ম্য প্রভৃতি নানা গ্রন্থ হইতে শ্লোক সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদাহরণে, জয়দেব, রামানন্দ ও সনাতন গোস্বামীর সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, অন্যত্র নিজে ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থখানির নাম ছন্দঃসমুদ্র। নরহরির চতুর্থ গ্রন্থের নাম গীতচন্দ্রোদয়। ইহাতে রাধিকা, গৌরচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি আপন পূর্ব্বতন যাবতীয় বৈষ্ণবগণের কবিতা, পদকল্পতরুর আকারে ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে—কিন্তু অর্দ্ধেকের অধিক কবিতা নরহরির স্বরচিত। আকারে এ গ্রন্থখানি পদকল্পতরু অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে।

নরোত্তম ঠাকুর যে গরাণহাটী কীর্ত্তনের স্রষ্টা, "নবতাল গতিনৃত্য কৃত" "শুভ সংকীর্ত্তন পটু নবনৃত্য বাদ্য গায়ক" নরোত্তম বলিয়া নরহরি গৌরচরিতচিন্তামণি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন এবং নরোত্তমের শিষ্য ও গোবিন্দ বিগ্রহের সেবক গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। "শ্রীল নরোত্তম চরণসরোরুহ ভজন পরায়ণ ভুবন উজোর।" "শ্যামানন্দ কৃষ্ণদাসের শিষ্য রসিক মরারী" গোবিন্দ দাস জ্ঞানদাস প্রভৃতির বন্দনা করিয়াছেন। নিজ

সুজনক জগন্নাথপ্রিয় বৈষ্ণব দত্ত নাম যুগ নরহরি ঘনশ্যাম ইতি প্রথিত।” “নরহরি ভণ অনুপম নদিয়াপুর-মাঝে,” “দাস নরহরি ঘনশ্যাম মম নাম যুগ,” সুতরাং, পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে নরহরি-ভণিতা-যুক্ত এবং ঘনশ্যাম-ভণিতা-যুক্ত যে সকল পদ দৃষ্ট হয়, তাহা যে একই ব্যক্তি কর্তৃক রচিত এবং ইনি যে নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ সন্তান, গোবিন্দ ও জ্ঞানদাসের পরবর্ত্তী, তাহা নিশ্চিত হইল।

গৌরচরিতচিন্তামণিগ্রন্থে নরহরি আপন কৃত ছন্দঃসমুদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন,—

রচিহুঁ ছন্দ বহু ভাঁতি ইম মাত্রা বর্ণ বিভেদ,
শুনত শ্রবণসুখ হোত অতি নাশত কবিকুলখেদ,
পিঙ্গলাদি বহু গ্রন্থ মথি লাখ লক্ষণ পরকার,
কিম্বা মৎকৃত গ্রন্থবর ছন্দ সমুদ্র নিহার।
রচিহুঁ আনন্দ হিয়
ছন্দ মম চিত্তপ্রিয়,

* * *

গীতচন্দ্রোদয় রচনাকালে বারম্বার নরহরি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, পাছে গ্রন্থখানি জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ করিয়া না যাইতে পারেন। ছন্দঃসমুদ্রের সূত্র-অনুসারে গ্রন্থের বিভাগ নির্ণয় করিয়াছেন, এবং স্থানে স্থানে ছন্দঃসমুদ্র হইতে সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন—বস্তুতঃ, ছন্দঃসমুদ্র ও গীতচন্দ্রোদয়, একখানি গ্রন্থের দুই ভাগ ; সূত্রভাগ ও উদাহরণভাগ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহাতে বোধ হয়, প্রথমে ছন্দঃসমুদ্র, তাহার পর চরিতচিন্তামণি, তাহার পর শেষদশায় গীতচন্দ্রোদয় রচনা করিয়া থাকিবেন। পদ্ধতিপ্রদীপ ক্ষুদ্র গ্রন্থ, কখন রচনা করিয়াছিলেন, বুঝা যায় না। গীতচন্দ্রোদয়রচনার উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে নরহরি বলিয়াছেনঃ—

পূর্ব্ব কবিকৃত গীত নিরুপম আস্বাদিতে সাধ আনন্দভরে।
এ হেতু একত্র করি এই গীতচন্দ্রোদয়ে সুধা সদাই ঝরে।

চরিতচিন্তামণির একটি কবিতা হইতে জানা যায়, বৈতালিক সঙ্গীতে রাজাদের মত পরিকরগণের গীতে মহাপ্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইত। কাহারও গীত পদ্যময়, কাহারও গদ্যময়।

কোউ মধুরতর গদ্য পদ্য কর পাঠ নিরত পরমাদ্ভুত রীত।

সে গদ্যময় গীত সকল কোথায় গেল? যাঁহারা মনে করেন, গদ্যরচনা বাঙ্গালায় এক শত বৎসরের পুরাতন নহে, তাঁহারা এই শ্লোকটিতে কিছু শিখিতে পারিবেন।

নরহরি বলেন, বিদ্যাপতি লক্ষ গীত রচনা করিয়াছেন। পদকল্পতরু বা প্রাচীন পদাবলি প্রভৃতি গ্রন্থে দেড় শত গীতের অধিক ছাপা হয় নাই। আমরা অনেক স্থানে চেষ্টা করিয়া প্রায় আড়াই শত গান সংগ্রহ করিয়াছি, অবশিষ্ট গান কোথায় গেল? অথবা ইহা কি কবিসুলভ অতিশয়োক্তি?

কবি বিদ্যাপতি মতিমানে।
লাখ গীতে জগচিত চোরায়ল গোবিন্দ গোরি সরস রস গানে।

চণ্ডীদাসের প্রণয়পাত্রী, মুদ্রিত গ্রন্থে, "রামী" বা "রজকিনী রামী" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। নরহরি তাহাকে "তারা ধুবিনী" নামে উল্লেখ করিয়াছেন;—

জয় জয় দয়াময় চণ্ডীদাস মণ্ডিত সকল গুণে;
অনুপম যাঁর যশ রসায়ন গাঅত জগত জনে।
নানৈর গ্রামে নিশি সময়েতে বাস্থলি প্রসন্ন হইয়া,
রাই কানু নবচরিত রচিতে কহএ নিকটে গিঞা,
শুনি ভাবে মনে জানি পুন দেবি কহে কি চিন্তহ চিতে,
সুখময়ি তারা ধুবিনি দরশে ফুরিবে বিবিধ মতে।
ইহা শুনি প্রভাতে চলিল প্রণমি বাস্থলি পায়,
ধুবিনি দরশ রসে ফুরে সব কি দিব তুলনা তায়।

নরহরি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। তাঁহার লেখা বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের মত প্রাঞ্জল বা ভাব তেমন প্রগাঢ় না হইলেও, গোবিন্দদাস বা জ্ঞানদাস অপেক্ষা ন্যূন নহে। তাঁহার রচনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গকে দেখিয়া নদ্যার (নদিয়ার) বৃদ্ধা ও যুবতীগণের কেমন ভাবান্তর হইয়াছে, দেখুন;—

শুন ওহে সতি নদিয়া বসতি সফল হৈল মোর,
এ বুঢ়া বয়সে বিহি সকরুণ সুখের নাহিক ওর।
এ ছুটি নয়ান ভরি নিরখিল শচীর নিমাইচাঁদে;
তিল আধ তারে না দেখি বিসম পরাণ সদাই কাঁদে।

অনেক যতনে দিবে ধন গ্রহ পূজিব দৈবগণে,
শচীর মন্দিরে করহ মঙ্গল জাহ নরহরি সনে।
শচীর আলয় আলো হইয়াছে, কি কব সুখের কথা;
বৃদ্ধা নারিগণ মনের হরিষে দাঁড়ায়ে দেখেন তথা;
কেহো বলে ওগো কুলের প্রদীপ নিমাই গুণের রাশি;
আমাদের আঁখি সফল করিতে প্রকট হৈয়াছে আসি।
কেহো বলে ওগো শচীর তনয় সতত কুশলে রহু!
মোর পুণ্য যত দিলাম ইহারে এড়াউ কণ্টক বহু!
কেহো বলে ওগো ইহার লাগিয়া পূজিব কৈলাসরাজে,—
চির আই হৈয়া এইরূপে যেন রহলে নদিয়া-মাঝে।
কেহো বলে ওগো নিতি গঙ্গা পুজি মাগিয়া বর,—
নিজ জনে লৈয়া শচীর দুলাল আনন্দে করুক ঘর!
কেহো বলে চণ্ডী পূজিয়া মাগিব মনেতে যে আছে মেন,
ধন উপার্জ্জন লাগিয়া বিদেশে না যায় কথনু যেন। ইত্যাদি।
কি পুছহ সখি কালিকার কথা কহিতে উপজে হাসি;
লাজ তেয়াগিয়া বলিয়ে যেরূপ দেখেঁলু নদ্যার শশী।
দিবা-অবসানে সাশুড়ি ননদ আর বা কতেকজনা,
তা সভার পাশে বসিয়া আছিনু জানায়ে সুজনপণা।
হেনই সময়ে আমাদের পথে আইলা পরাণপতি,
শুনিয়া চকিত চৌদিকে চাহিয়া হইনুঁ অথির অতি।
বিষম শঙ্কটে পড়িনু বিচার কিছুতে মনে না ফুরে;
আনছান কল্প প্রাণ কি করিব নয়ান সতত ঝুরে।
আমারে বিমনা দেখিয়া সাশুড়ী কহয়ে মধুর কথা,—
কি লাগিয়া বাছা এমন না জানি হৈয়াছে কুনবা বেথা।
এ বোল বলিতে বলিনু তাহারে গা মোর কেমন করে।
এতেক শুনিয়া অনুমতি দিল সুতিয়া থাকহ ঘরে।
শয়নের ছলে তুরিতে বাড়ীর বাহিরে দাঁড়ানু গিয়া,
ও মুখমাধুরী বারেক নিরখি জুড়ানু নয়ন হিয়া।
কেহো না লোখিতে পারিল আমার আনন্দে ভরিল দে।
নরহরি কহে, রসিক জনার চাতুরী বুঝিবে কে?

পূর্ব্বরাগ, মান ও আপ্ত-দূতী-বর্ণনায়, নরহরি চণ্ডীদাসের সমকক্ষ নহেন। মানভঞ্জনে চণ্ডীদাস বাঙ্গালী কবির অগ্রগণ্য। কিন্তু বিরহবর্ণনে নরহরি

কি ব্রজবুলি, কি ভাষা, তাঁহার লেখনী সর্ব্বত্র অমৃতনিঃস্যন্দিনী। আমার নিকট নরহরির কবিতা এক সহস্রের অধিক আছে। গোলাপবাগে কোনটি চয়ন করিব, বুঝা যায় না। সুতরাং যথা তথা হইতে পাঠককে দুটি উপহার দিলাম।

সুহই।

কি পুছহ এ সখি করলু অকাজ।
কহইতে অন্তরে উপজয়ে লাজ॥
কোই সুপুরুষ সরস তনু শ্যাম।
বুঝি ব্রজমাঝ রহই কো গাম॥
পৈঠল অলখিত হিয় মাহা মোরি।
ধৈরজ ধরম না রাখল থোরি॥
পলছন মন না রহয়ে মঝু ঠাম।
ভেল বিপরীত জানয়ে ঘনশ্যাম॥

করুণশ্রী।

সই তারে দেখিনু কিখেনে!
পাসরিতে বলো না পাসরা যায় মনে।
সামাইয়া রহিল হিয়ায়;
ঘুচাইল জাতিকুল কলঙ্কের দায়।
কি বলিব পরাণে না সহে;
মদন-আনলে তনু অনুখন দহে।
উপায়ে নহিল কাজ সিধি।
নিদয় হইল মোরে সে গুণের নিধি;
কি কাজ এ দেহ তাহা বিনে।
তেজিব জীবন এই কদম্বকাননে।
করিহ উত্তর কাল ক্রিয়া;
রাখহ তমালে তনু যতন করিয়া।
লেহ এ ললিতা মণিহার,
অনুখন গলায় পরিহ আপনার।
রূপিনু মল্লিকা নিজ করে,
গাঁথিয়ে ফুলের মালা পরাইহ তারে।
তোমরা কুশলে সভে রৈয়ো—
এই বনে বারেক আসিতে তারে কৈয়ো।

নরহরি কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এখন সে গুলি অপ্রচলিত হইয়াছে। যথাঃ—ধামালি, সিথান, আখুটী, চমক, দাবুড়ী। আমরা এখন ঘোমটা বা ঘুমটা বলি। নরহরি বরাবর ঘুঘট লিখিয়াছেন। বিহারে ঘুজ্ঘট বা ঘোঘ বলে। তখনকার ভাষায় মৈথিলী ভাষার অনেক সাদৃশ্য ছিল। প্রেমহারের মুখবন্ধে আমি লিখিয়াছিলাম, পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গাল ভাষা পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে সমুদয় বাঙ্গলার ভাষা ছিল। স্বরবৈলক্ষণ্য ছাড়িয়া দিলে, পূর্ব্ব-বাঙ্গালা, রাজসাহী, মালদহ, বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের ভাষার প্রভেদ সামান্য। বাঙ্গাল ভাষা মৈথিলী হিন্দীর অনুরূপ। বোধ হয়, দশম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, মৈথিলী ভাষা দ্বারবঙ্গ হইতে শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মিথিলার ভাষা অধিকতর হিন্দী ও বাঙ্গলার ভাষা অধিকতর বাঙ্গলা হইয়া গিয়াছিল। চণ্ডীদাস হইতে ঘনশ্যাম পর্য্যন্ত সকলেই বাঙ্গলা ভাষা জানিতেন; কিন্তু কখন বা সাধ করিয়া, কখন বা বিহারের বৈষ্ণবদিগের মনোরঞ্জনার্থ, ব্রজবুলি বা মিথিলার ভাষায় কবিতা লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি মৈথিলী কবি হইলেও, বাঙ্গলায় কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার কতকগুলি কবিতা শুদ্ধ মৈথিলী ভাষায়, অন্য গুলি মিশ্রিত বাঙ্গলায়। কীর্ত্তনীয়ার মুখে বিদ্যাপতির কবিতায় বাঙ্গলা শব্দের অধিকতর সংযোগ হইয়া থাকিলেও, বসন্ত রায় ও অন্য কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার কবিতা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন; আমার এই পূর্ব্বমত আমি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সমসাময়িক। চণ্ডীদাসের কবিতা, বিদ্যাপতির কোন কোন কবিতার মত মৈথিলী ভাষায় রচিত। কিন্তু কেহ বলে না যে, চণ্ডীদাসের কবিতা আর কেহ অনুবাদ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, গ্রীয়ার্সন সাহেব দ্বারবঙ্গ হইতে বিশুদ্ধ মৈথিলী ভাষায় রচিত বলিয়া বিদ্যাপতির যে কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গলা হইতে স্বতন্ত্র নহে। বাঙ্গলা বর্ণমালার অক্ষর মৈথিলী বর্ণমালার অক্ষরের অনুরূপ, কেবল ই, ঈ, ঋ, ৯, ছ, ল, শ, হ, র আকৃতি অন্যরূপ। পাল ও সেন বংশের রাজত্বকালে, মিথিলা বাঙ্গলার মধ্যে পরিগণিত হইত। এই সময়ে বাঙ্গালীরা মিথিলা হইতে ভাষা ও বর্ণমালা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথির ব, র, ল, শ, উ মৈথিলী অক্ষরের অনুরূপ। মৈথিলী ভাষাকে ব্রজবুলি কেন বলি, আমরা নির্ণয় করিতে পারি

সময়ে ব্রীজী,বজ্জিয় বা লিচ্ছবী নামে এক জাতীয় শক মিথিলায় বাস করিত। ইহারা আজ কাল নেপালে থাকে। বোধ হয়, এই বজ্জিয়দিগের নামানুসারে পূর্ব্বকালে মিথিলাকে ব্রজ বলিত। কিন্তু কোন প্রাচীন গ্রন্থে মিথিলাকে ব্রজ নামে উল্লিখিত হইতে দেখি নাই।

নরহরির সময়ে, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীর ভিতর দু তিন খানি ঘর, মধ্যে আঙ্গিনা ও চারি দিকে প্রাচীরে বেষ্টিত থাকিত। ঘরে গবাক্ষ থাকিত। সদর ও খিড়কীতে দুটি দ্বার এবং সদর দ্বারের পার্শ্বে একখানি চণ্ডীমণ্ডপ থাকিত। বিকাল বেলায় মেয়েরা আঙ্গিনায় বসিয়া সুতা কাটিত ও গল্প করিত। শ্বাশুড়ী বৌদের বড় ভাল বাসিতেন, কিন্তু ননদের সঙ্গে বাঙ্গালী বধূর চিরশত্রুতা। বৌরা কলসী করিয়া নদী বা পুকুর হইতে জল আনিতেন ও রন্ধন করিতেন। বিকালে মেয়েরা দল বাঁধিয়া গা ধুইতে যাইত। পুরুষেরা কেহ কেহ চাকরি করিতে বিদেশে যাইত। পুরুষেরা কপালে চন্দন ও তিলক পরিত, এবং চাঁচর কেশে ফুলের মালা বাঁধিত, কেহ বা গলায় ফুলের মালা ও মাথায় ফুল দিত। "পটাঞ্চল" ও "চারু চীন চীর" মেয়েদের উৎকৃষ্ট বস্ত্র ছিল। নীবিবন্ধ করিয়া কাপড় পড়ার রীতি ছিল। পায়ে নূপুর, হাতে কঙ্কণ, অঙ্গের অলঙ্কার।

> রসভরে শির চালান করিতে আউলাবে চুলের খোঁপা,
> মধুর মধুর দুলিবে নাসার বেসর কানের চাঁপা।
> পিঠের উপর ঝাঁপার দোলনী তাহা না দেখিতে পাবে,
> নয়ানের কোণে ঠারিয়া নাগর ঈষৎ হাসিতে কবে,
> কোন ছলে বাম করেতে বসন তুলিয়া দেখাব তায়;
> অমুনি অবশ হবে নরহরি পরাণ রসিক রায়।

নরহরির অনেকগুলি কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হয়।—

(১) বেকত বিষয়ে বিষাদ ঘটয়ে গুপতে অধিক সুখ।

(২) পিরিতি পরম রতন ইহারে গুপত করিলে কাজ,
বেকত হইলে রসিক জনার অন্তরে উপজে লাজ।

(৩) পিরিতি গুপতে না থাকে কখন, বেকত স্বভাব তার।

(৪) দোষযুক্ত জনে দুষিতে নিষেধ, এ কথা সকলে কয়;
দোষহীন জনে যে দোষে, অবশ্য সে দোষী জগতে হয়।

(৬) রসিকিনী বিনা বুঝিতে পারে কি রসিক জনের হিয়া ?
(৭) নিরাকারে যার আরতি তারে কি আকার কথনু ভায় ?
(৮) যদি না বুঝিয়ে কেহ কিছু কহে তাহে কি করিয়ে হাসি,
যেরূপে বুঝিতে পারয়ে সেরূপে বুঝালে সুবুদ্ধি বাসি।
(৯) যার যে স্বভাব থাকে, তাহা কেহো কভু না ছাড়িতে পারে ;
স্বভাবানুরূপ হয় ক্রিয়া, কারু নিষেধে কিছু না করে।
(১০) পরের কলঙ্ক গায় যেই সেই কলঙ্কী এ নরহরি তা জানে।
(১১) সমানে সমানে সুখ উপজয়ে অসমান সনে বাড়য়ে বেথা।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

বিবিধ।

চীনদেশীয় সিদ্ধ পুরুষ ফোহী একদা পর্য্যটন করিতে করিতে এক গ্রামে উপনীত হইলেন। গ্রামে এক কৃপণ ধনী বাস করিত ; কৃপণ বৃদ্ধ ও তাহার মাথায় টাক। সে জানালায় দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া, ফোহী তাহার নিকট অন্ন ভিক্ষা চাহিলেন। বৃদ্ধ রাগিয়া, কুক্কুর সঙ্গে করিয়া, তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ফোহী সে স্থান হইতে বিদায় হইয়া এক দরিদ্রের কুটীরে গমন করিলেন। কুটীরবাসীগণ স্বামী ও স্ত্রী—তাহাদের অত্যন্ত দৈন্যদশা। দ্বারের সম্মুখে ভিক্ষুক উপস্থিত দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে বসাইল। কিন্তু ঘরে আহার্য্য কিছু নাই। দম্পতীযুগল অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, প্রতিবেশীদিগের নিকট যাচ্ঞা করিয়া, কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ফোহীকে খাইতে দিল। মহাপুরুষ আহারান্তে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, দুই জনে তাঁহার সঙ্গে গ্রামের প্রান্ত পর্য্যন্ত গেল। ফোহীর নাম ও ক্ষমতা সকলেই বিদিত ছিল, কিন্তু অনেকে তাঁহাকে চিনিত না। বিদায়কালে তিনি কহিলেন, “আমার নাম ফোহী। তোমাদের আতিথ্যে আমি প্রীত হইয়াছি। তোমরা আমার নিকট তিনটি বর প্রার্থনা কর।” তাহারা প্রণাম করিয়া কহিল, “ঠাকুর! আমরা যেন জীবনান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হই।” মহাপুরুষ কহিলেন, “তাহাই হইবে। দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।” তাহারা

জন্য আমাদিগকে যেন আর কাহারও নিকট ভিক্ষা না করিতে হয়।" ফোহী কহিলেন, "তথাস্তু। আর কি?" তাহারা আর কি চাহিবে ভাবিয়া পায় না। ফোহী কহিলেন, "দেখ, তোমাদের কুটীর বড় জীর্ণ। আর একখানি ভাল বাড়ী হইলে বড় মন্দ হয় না।" দম্পতী কহিল, "প্রভুর যেমন ইচ্ছা।" ফোহী চলিয়া গেলেন। দরিদ্রদম্পতী গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের কুটীর খুঁজিয়া পায় না। যেখানে কুটীর ছিল, সেখানে প্রকাণ্ড রম্য অট্টালিকা। তাহারা ভয়ে ভয়ে অট্টালিকায় প্রবেশ করিল। প্রাসাদের গৃহগুলি নানাবিধ সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত। প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে বহুবিধ ধনরত্ন স্তূপীকৃত রহিয়াছে।

দুর্ব্বিনীত কৃপণ মধ্যাহ্নভোজনের পর নিদ্রা যাইতেছিল। নিদ্রাভঙ্গ হইলে গবাক্ষ খুলিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল। প্রতিদিন যেখানে দরিদ্র দম্পতীর কুটীর দেখিত, সেখানে অতুল অট্টালিকা দেখিতে পাইল। চক্ষের ভুল হইয়াছে মনে করিয়া, বৃদ্ধ চক্ষু মুদ্রিত করিল। আবার চাহিয়া দেখে, সেই অট্টালিকা আকাশে মাথা তুলিয়া হাসিতেছে। বিস্মিত হইয়া ভার্য্যাকে ডাকিয়া কহিল, "আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, কিছুতে স্বপ্ন ভাঙ্গিতেছে না। মার ত নাকে এক কিল।" বুড়া বুড়ীতে বিশেষ সদ্ভাব ছিল না। ভার্য্যা উপরুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ সজোরে বুড়ার নাকে এক কিল বসাইয়া দিল। কিল খাইয়া বুড়া অনেক ক্ষণ সরিষার ফুল দেখিতে লাগিল, কিন্তু আবার যখন প্রকৃতিস্থ হইল, তখনও সে অট্টালিকা অন্তর্হিত হইল না। অবশেষে বুড়া বাড়ীর বাহিরে গেল। নূতন অভ্রভেদী অট্টালিকার সম্মুখে কৃপণের গৃহ সামান্য কুটীরের ন্যায় দেখাইতেছিল। অট্টালিকার দ্বারদেশে দম্পতী দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা অকপটে সকল কথা খুলিয়া বলিল। বৃদ্ধ আপনার কুবুদ্ধির নিন্দা করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া, যে পথে সিদ্ধ পুরুষ গিয়াছিলেন, সেই পথে ধাবিত হইল। কিছু দূর গিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল। বুড়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, ফোহীকে অনেক মিনতি করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করিল ও তাঁহাকে তাহার গৃহে অতিথি হইতে অনুরোধ করিল। ফোহী ফিরিতে স্বীকার করিলেন না, কিন্তু কৃপণের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। বুড়া তথাপি তাঁহার সঙ্গ ছাড়ে না। কহিল, "আপনি যদি একান্তই ফিরিবেন না, তাহা হইলে

চাও?" "আমার তিনটি ইচ্ছা পূর্ণ হয়, এই বর কামনা করি।" ফোহী কহিলেন, "ভাল ইচ্ছা তোমার মনে আসিবে না।" কৃপণ বুড়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। "আচ্ছা, তোমার তিনটি ইচ্ছা পূর্ণ হইবে", বলিয়া মহাপুরুষ চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধ পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিয়া কি বাসনা করিবে ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখে ফিরিল। তাহাকে অন্যমনস্ক ও বল্গা শিথিল দেখিয়া, অশ্ব উচ্ছৃঙ্খল হইয়া বেগে ধাবিত হইল। বৃদ্ধ ভীত ও কুপিত হইয়া অশ্বকে কহিল, "তোর ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাক্।" বলিবা মাত্র অশ্ব ভগ্নস্কন্ধ হইয়া ভূতলে পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। প্রথম ইচ্ছা পূর্ণ হইল। বৃদ্ধ নিতান্ত বিমর্ষ চিত্তে অশ্বের পৃষ্ঠত্রাণ স্কন্ধে করিয়া পদব্রজে চলিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া, রৌদ্রের উত্তাপে ও ভার বহন করিয়া ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইল। বৃদ্ধ তাহার স্ত্রীকে দিয়া সকল কর্ম্ম করাইত, তাহাকে পশুর মত দেখিত। পরিশ্রমে কাতর হইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিল, "আমার ইচ্ছা হয়, আমার স্ত্রীর পিঠে এই জিন থাকে।" তৎক্ষণাৎ জিন অদৃশ্য হইল। গৃহে ফিরিয়া বুড়া দেখে, তাহার স্ত্রীর পিঠে জিন বাঁধা রহিয়াছে। বুড়ী জিন খুলিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া বাড়ী ফাটাইতেছে। বুড়া তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল, "তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমাকে লইয়া দেশে দেশে ফিরিয়া তোমাকে দেখাইয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করিব।" বুড়ী আর দুই পর্দ্দা গলা তুলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অবশেষে বুড়া বিরক্ত হইয়া কহিল, "আমি কি করিব? তোমার যেমন ইচ্ছা যে, জিন অশ্বশালায় যেখানে থাকে, সেইখানে থাকুক, আমারও কি সেই ইচ্ছা নয়?" জিন তখনি বুড়ীর পিঠ ছাড়াইয়া অশ্বশালায় খুঁটিতে ঝুলিয়া রহিল। বুড়ার তিনটি বাসনা পূর্ণ হইল। লাভের মধ্যে তাহার একটি ঘোড়া মারা গেল।

আর একদিন ফোহী সন্ধ্যার সময় একজন ধনবতী স্ত্রীলোকের গৃহে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। গৃহকর্ত্রী কহিল, "আমি ভিক্ষুক ভণ্ডকে আমার গৃহে আশ্রয় দিই না। তুমি দূর হও!" ফোহী একটি দরিদ্র রমণীর গৃহদ্বারে করাঘাত করিলেন। রমণী তাঁহাকে সাদরে গৃহে আহ্বান করিয়া, ঘরে যাহা কিছু ছিল, আহার করিতে দিল। আহারান্তে তৃণশয্যা বিছাইয়া তাঁহাকে শয়ন করিতে দিল। ফোহী নিদ্রিত হইলে

রমণী স্বহস্তে কিছু বস্ত্র বুনিয়াছিল। সেই বস্ত্র হইতে একখণ্ড ছিন্ন করিয়া, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, অতিথির জন্য একটি জামা সেলাই করিল। প্রাতঃকালে বিদায় গ্রহণ করিবার সময় ফোহী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, "যে কর্ম্ম তুমি প্রাতে আরম্ভ করিবে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহা সমাপ্ত হইবে না।" ফোহী চলিয়া গেলে, বস্ত্রখণ্ড কতখানি অবশিষ্ট আছে দেখিবার জন্য, রমণী তাহা মাপিতে বসিল। কিন্তু বস্ত্র কিছুতেই ফুরায় না। বাড়ী কাপড়ে ভরিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় বস্ত্র নিঃশেষ হইল। দেখিতে দেখিতে কিছু দিনে রমণীর বিস্তর অর্থ সঞ্চিত হইল।

মাস কয়েক পরে, ফোহী আবার সেই পথে গমন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পূর্ব্বে যে রমণী তাঁহাকে খেদাইয়া দিয়াছিল, সে অত্যন্ত সম্মান পূর্ব্বক আপনার গৃহে ডাকিয়া লইয়া গেল। পরিষ্কার অন্ন ও বিবিধ ব্যঞ্জন আহার করাইয়া, তাঁহাকে উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ন করিতে দিল। পূর্ব্বে হইতে তাঁহার জন্য একটি বহুমূল্য অঙ্গরাখা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু স্বহস্তে সেলাই করিয়াছে, ফোহীর মনে এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য, সমস্ত রাত্রি আপনার ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিল। প্রাতঃকালে ফোহী তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, "তুমি প্রাতে যে কর্ম্ম করিবে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার যেন অবসান্ না হয়।" মহাপুরুষকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত, রমণী তাঁহার সঙ্গে অনেক দূর গিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া আসিল। ফিরিবার সময় স্থির করিল, গৃহে আসিয়াই বস্ত্র মাপিতে বসিবে। কিন্তু যখন গৃহে প্রবেশ করিল, তখন গরু গুলা গোয়াল ঘরে ডাকিতে লাগিল। রমণী মনে মনে কহিল, "গরু গুলাকে চট্ করিয়া একটু জল দিয়া কাপড় মাপিতে যাই।" এই বলিয়া জলের কলসী তুলিয়া লইয়া গামলায় জল ঢালিতে লাগিল। কিন্তু সেই যে জল ঢালিতে লাগিল, সারা দিন জল ঢালা আর ফুরাইল না। জলও ফুরায় না, রমণী কলসীও ছাড়িতে পারে না, তাহার হাতে যেন কলসী জোড়া লাগিয়া গিয়াছিল। হুড়্ হুড়্ করিয়া কলসীর মুখ দিয়া জল পড়িতেই রহিল। জলে জলময় হইল। গোয়াল ভাসিয়া গেল, গরু গুলা ডুবিয়া মরিল, গৃহের সমুদয় সামগ্রী ভাসিয়া গেল, ঘর পড়িয়া গেল, রাস্তায় নদী বহিতে লাগিল। রমণী আপনি প্রায় ডুবিয়া মরে। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া প্রতিবাসীরা আসিয়া অনেক কষ্টে ভেলা ভাসাইয়া তাহার

চাউলের উৎপত্তি কেমন করিয়া হইল? গল্পটা শোন। আব্রাহামের পুত্র শাহ ইস্মাইল, সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া সমুদ্রকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা এত অধিক যে ব্যস্ত হইবার কোন কারণ ছিল না। প্রত্যেক সিপাহীকে প্রতিদিন এক কলসী করিয়া জল তুলিবার আদেশ হইল। সমুদ্র শুষ্ক হইলে পৃথিবীজয়ী বীর বরুণরাজের সহিত যুদ্ধ করিবেন। সমুদ্রের জল যখন হ্রাস হইতে লাগিল, তখন জলচরগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া বরুণকে সংবাদ দিল। তিনি কহিলেন, "দেখিয়া আইস, কে এমন কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছে। যদি দেখ, তাহারা অত্যন্ত ব্যস্ত, তাহা হইলে চিন্তার কোন কারণ নাই। আর যদি দেখ যে তাহারা ধীরে সুস্থে সমুদ্রশোষণে নিযুক্ত রহিয়াছে,তাহা হইলে তাহাদের সঙ্কল্প দৃঢ় ও আমাদিগকে কর প্রদান করিতে হইবে।" দূত সংবাদ লইয়া আসিল, এক জন দিনে এক কলসী মাত্র জল তুলিতেছে। বরুণ কহিলেন, "তাহা হইলে আমাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে।" শাহ ইস্মাইলের সমীপে বরুণরাজ দূত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহার কথা কেহ বুঝিতে পারে না। শাহ কহিলেন, "ইহাকে কূপে নিক্ষেপ কর। কিন্তু ইহার সহিত একটি রমণীও নিক্ষেপ কর।" সাত বৎসর কাল দূত ও রমণী সেই কূপে বাস করিতে লাগিল। রমণীর গর্ভে দূতের এক পুত্র জন্মিল। পুত্র কথা কহিতে সক্ষম হইলে, দূত শাহ ইস্মাইলের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার পুত্র দ্বিভাষীরূপে কথা বুঝাইয়া দিতে লাগিল। দূত শাহকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বরুণরাজের নিকট কি চান?" শাহ কহিলেন, "যাহা তিনি আহার করেন, সেই দ্রব্য দেড় শত মন চাই।" দূত বরুণরাজকে গিয়া নিবেদন করিল। বরুণ কহিলেন, "এত আমি কোথায় পাইব? সমুদ্রতলে যত রত্ন আছে, আমি সমুদয় দিতে প্রস্তুত আছি।" দূত ফিরিয়া আসিয়া শাহকে এ কথা অবগত করাইল। শাহ কহিলেন, "অর্দ্ধেক পরিমাণ দিলেও চলিবে। আমি আর কিছু লইব না।" দূত আবার বরুণের নিকট ফিরিয়া গেল। বরুণ কহিলেন, "এত আহার্য্যও আমার ভাণ্ডারে নাই। বরং আমি পুত্র কলত্র প্রদান করিতে সম্মত।" বহু বচসার পর, অবশেষে শাহ চতুর্থাংশ লইতে স্বীকৃত হইলেন। সেই সামগ্রী আর কিছু নহে—তণ্ডুল। ইতিপূর্ব্বে এই উপাদেয় ও দুর্লভ সামগ্রী মানবলোকে কেহ কখন

সমুদ্র হইতে যে জল আহরিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই লবণাক্ত হ্রদ সমূহের জন্ম।

হিসাবে ভুল।

(মোহনলাল ও রমাকান্ত।)

মোহনলাল। (গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) এত আশা, এত পরিশ্রম, হৃদয়ের আবেগ, মনের সাধ সকলই বিফল হল!

রমাকান্ত। কি হল?

মোহন। দেশের দশা কি হইবে, ভাবিতে ভাবিতে রাত্রে আমার নিদ্রা হইত না। অবশেষে একটা উপায় ঠাহরাইয়াছিলাম। দেশের জন্য শরীর পতন হইল, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? পূর্ব্বে কি মহাত্মারা স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতেন না? কবে এই পোড়া দেশ শস্যশ্যামল তালতমালরাজিত বীরপ্রসবিনী হইবে, তাই ভাবিতাম। ভাবিতে ভাবিতে মাথা ধরিত, গায়ে জ্বর আসিত, তবুও ভাবনা ছাড়িতাম না। আমি কি নিজের জন্য ভাবিতাম? তোমাদের জন্য ভাবিতাম, দেশে যে সকল লোক জন্মিতেছে; তাহাদের জন্য ভাবিতাম। কি ফল এই দাসত্বের জীবনে? কোথায় গেল সেই সব আশা! আর কিসের জন্য ভাবিব?

রমা। কেন; কি হইয়াছে?

মোহন। কি হইয়াছে কিছুই কি জান না? জানিলে তোমাদের এমন দশাই বা কেন হবে? পৃথিবীর কোন খবরই রাখ না, দু বেলা দুটি খাইতে পাইলেই নিশ্চিন্ত থাক। বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ টমাস্ সাহেব কি গণনা করিয়াছেন জান না? এই যে পৃথিবীটা চলিতেছে, আমরা বাঁচিয়া আছি, কিসের বলে? সূর্য্যের উত্তাপেই ত জীব বাঁচিয়া আছে, ধরণী ফলবতী রহিয়াছে। এখন, সূর্য্য হইতে যে উত্তাপ বাহির হইতেছে, তাহা ত আর সূর্য্যের ভিতর ফিরিয়া যাইতেছে না। সূর্য্যের তাপসঞ্চয়েরও কোন উপায় নাই। যেখানে কেবল খরচ, জমা কিছুই নাই, সেখানে কত দিন খরচ চলে? [illegible]

শীতল, কঠিন, জীবশূন্য হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়াছেন যে, পাঁচ কোটি বৎসর গত হইলে সূর্য্যের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে। দাহশক্তি আর কিছু দিন থাকিতে পারে, কিন্তু দশ কোটি বৎসর কথনই থাকিবে না। তখন পৃথিবীও প্রাণীশূন্য হইবে। যখন পৃথিবীই উত্তাপশূন্য, জীবশূন্য হইবে, তখন আর আমি স্বদেশের জন্য ভাবিয়া মরি কেন? বৃথা কাজ, বৃথা উদ্যম, বৃথা পরিশ্রম! সবই মিথ্যা!

রমা। পাঁচ কোটি বৎসর—সেটা অনেক দিনের কথা না?

মোহন। অনেক দিনের কথা? হিসাবের জ্ঞান থাকিলে ত! পৃথিবীর জীবনে, কালের গণনায় পাঁচ কোটি বৎসর কতটুকু সময়? দেশের যখন মঙ্গল চেষ্টা করা যায়, সে কি দুই চারি বৎসরের জন্য, না কেবল নিজের সুখের জন্য? চিরকাল দেশ উন্নত হইতে থাকিবে সেই চেষ্টা করা উচিত। তাহাই যদি না হইল, পৃথিবীই যদি মরিল, তাহা হইলে চেষ্টা কাহার জন্য?

রমা। তবে এখন কি করিবে?

মোহন। করিব আবার কি? হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিব, কাল পূর্ণ হইলে মরিয়া পড়িব।

রমা। আমরা ত পাঁচ কোটি বৎসর বাঁচিব না।

মোহন। তোমার কি এতটুকুও বুদ্ধি নাই? আমি কি তাহাই বলিতেছি? আমরা যখন কিছুই করিতে পারিব না জানি, তখন আর বৎসরের গণনায় কাজ কি, সংসারের ঝঞ্ঝাটে কাজ কি? উদ্দেশ্য থাকিলে লোকে কাজ করে। মিছামিছি ভূতের বেগার খাটিয়া কি হইবে? পাঁচ বৎসর বাঁচি আর পাঁচ শো বৎসর বাঁচি—তাহাতে কি আসিয়া যায়? নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত যখন পৃথিবীর আলোক ও জীবন নিভিয়া যাইবে, তখন আমরা কোথায় থাকিব আর তোমার দেশই বা কোথায় থাকিবে?

রমা। এখন বুঝিতে পারিতেছি।

(মোহনলালের গৃহ।)

মোহনলালের স্ত্রী। তুমি বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে চলে কেমন করিয়া? মেয়েটি বড় হইতেছে, আর এমন করিয়া সংসারই বা চলে কিরূপে?

মোহন। আর তোমার সংসার! এখনও সংসারের ভাবনা! মূর্খ হইলে কি বিপদই না ঘটে! এতবার বলিতেছি যে আর কোন বিষয় ভাবিবার

থাক্‌বে না, তা আবার সংসার! সংসারের কোন ভাবনায় আর দরকার নেই। এই দেখ না, আমি এত দিন দেশের ভাবনা ভাবিতাম, কত কি বড় বড় কল্পনা করিতাম। এখন আর কিছু ভাবি?

স্ত্রী। ভাবিতে তোমার মাথা আর মুণ্ডু! পৃথিবী কি আজ্‌ই উল্টাবে না কি? তুমি বুঝি এক মানুষ হয়েছ, আর কেউ বুঝি পৃথিবীতে মানুষ নাই? আর কেউ সংসারের ভাবনা ভাবে না, আর কেউ ছেলে মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবে না? তুমি কি ভেবেছ তুমি ঘরে বসে থাকবে, আর আমি এনে তোমায় খাওয়াব?

মোহন। কে তোমায় মাথার দিব্য দিয়ে বল্‌চে—তুমি এনে খাওয়াও! চুপচাপ সব বসে থাক, দু দিন পরে আপনি সব ফুরিয়ে যাবে। আর ছেলে মেয়ের বিয়েও দিতে হবে না, খেতেও হবে না। যদি কিছু আশা থাক্‌ত, তা হলে কি আমি এমন জড়ভরত হয়ে থাক্‌তাম! আমার কি উৎসাহ কম না ক্ষমতা কম? ইচ্ছা কর্‌লে, কি না কর্‌তে পারি। দেশের জন্য শরীর-পাত কর্‌তে প্রস্তুত, সংসারের ত কথাই নেই। কিন্তু মিছামিছি শরীর মাটী করে কি হবে? এ ত আর অন্য কোন বিপদ নয় যে তার সঙ্গে মানুষ যুঝবে? একেবারে পৃথিবীটাই বরফ হয়ে যাবে—একটিও প্রাণী বেঁচে থাক্‌বে না। এমন সময় চেষ্টা করা মূর্খের কাজ। তুমি কিছু বুঝ্‌তেই পার না, তোমায় কত বোঝাব!

স্ত্রী। আমরা হলাম মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ, আমরা আর ছাই বুঝ্‌ব কি? তা দেখ, এমন করে আমি আর তোমার সংসার চালাতে পার্‌ব না। আমি বাপের বাড়ী যাই, তুমি পৃথিবী কবে উল্টাবে, সেই পথ চেয়ে থাক।

মোহন। তুমি বাপের বাড়ীই যাও আর সেখানেই থাক, সর্ব্বত্রই সমান। যখন সে দিন আস্‌বে, তখন যে যেখানেই থাক্ রক্ষা নাই।

স্ত্রী। আমি ঝিকে একখানা গাড়ী ডাক্‌তে বলি।

(কয়েক জন যুবক। মোহনলালের প্রবেশ।

মোহন। কি হইতেছে?

প্রথম যুবক। আমাদিগের যে বাণিজ্য ব্যবসায় করিবার কথা ছিল, তাহারই আলোচনা হইতেছে।

মোহন। আলোচনা করিয়া কি হইবে?

মোহন। টমাস্ সাহেব কি গণনা করিয়াছেন, জান?

প্রথম যুবক। জানি।

মোহন। জানিয়া শুনিয়াও অনর্থক এ চেষ্টা কেন?

তৃতীয় যুবক। অনর্থক কিসে?

মোহন। আমি দেশের উন্নতির জন্য, মঙ্গলের জন্য কতই ভাবিয়াছি। একবারও নিজের জন্য ভাবি নাই। মনে কতই আশা ছিল। কিন্তু এখন আর ভাবিয়া কি হইবে? সমুদয় পৃথিবীর জীবন ফুরাইয়া আসিয়াছে, একটা দেশের কিম্বা জাতির ভাবনা ভাবিয়া কি হইবে? তোমাদের বুদ্ধি থাকিলে তোমরা আমার মত নিশ্চিন্ত হইতে।

প্রথম যুবক। অত বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়। কাল যদি প্রলয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আজও আমরা যেন উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকি, আমরা সেই বুদ্ধির কামনা করি। তোমার বুদ্ধি তোমারই থাকুক।

মোহন। তোমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করা বৃথা। চোক থাকিতেও তোমরা অন্ধ।

(রমাকান্তের গৃহ। মোহনলালের প্রবেশ।)

মোহন। ওহে রমাকান্ত! বড় বিপদ।

রমাকান্ত। কেন, আবার কি হইয়াছে? সাহেবের গণনায় কি ভুল হইয়াছে না কি? পৃথিবী কি পাঁচ কোটি বৎসরও টিকিবে না?

মোহন। না, না, সাহেবের গণনায় কোন ভুল হয় নাই। বিপদটা আমার নিজের। সমস্ত দিন আহার হয় নাই, ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছি।

রমা। কেন, গৃহে আহার নাই?

মোহন। গৃহে কিছুই নাই। গৃহিণী বাপের বাড়ী গিয়াছেন। বাড়ীতে কেহ নাই।

রমা। কেন, গৃহিণী বাপের বাড়ী গেলেন কেন?

মোহন। আমার উপর রাগ করিয়া। আমি সাহেবের হিসাবটা তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, তা কিছুই বুঝিতে পারিল না। মেয়ে মানুষের বুদ্ধি কি না। অবশেষে রাগ করিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

রমা। ভারি অন্যায়। এ মাসে কি মাহিয়ানা পাও নাই?

মোহন। চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছি।

মোহন। চাকরী করিয়া আর কি হইবে ? সাহেব যে গণনা করিয়াছেন, তাহা ত ফলিবেই।

রমা। তোমার বিবেচনা, তোমার সিদ্ধান্ত সব ঠিক, কেবল একটা তোমার ভুল হইয়াছে। চাকরীই যদি ছাড়িলে, সমস্ত চেষ্টাই যদি ছাড়িলে, তাহা হইলে আহারের চিন্তা কেন ?

মোহন। অনাহারে কেমন করিয়া থাকিব ?

রমা। কেন, হাত পা গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে। পৃথিবীর দিন ত ফুরাইয়াই আসিয়াছে, তোমার দিন না হয় দু দিন আগে ফুরাইল।

মোহন। বন্ধু হইয়া এমন কথা বলা তোমার ভাল হয় না।

রমা। তুমি নিষ্কর্ম্মা হইয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, পরিবারদিগকে অনাহারে রাখিয়া বসিয়া থাক, আর আমি তোমায় খাওয়াই। তাহা হইলেই বন্ধুর কাজ হয়। তুমি মনে করিয়াছ তোমাকে আমি পাঁচ কোটি বৎসর বসিয়া খাওয়াইব ? বেরোও আমার বাড়ী থেকে !

আরঞ্জীবের রাজনীতি।

১

বর্ত্তমান প্রবন্ধে, আরঞ্জীবের জন্ম হইতে সিংহাসনাধিরোহণকালের মধ্যবর্ত্তী ঘটনাসমূহ বিবৃত হইবে। সাধারণ ইতিহাসে যে সমস্ত কথা পাওয়া যায় না, তাহারই অবলম্বনে এই প্রস্তাবের অঙ্গপরিপুষ্টি হইবে। ইহা হইতে আমরা দেখাইব, আরঞ্জীব না জন্মিলে মোগল সাম্রাজ্যের পতন হয় ত সুদূরপরাহত হইত। *

---

* আমি এই প্রবন্ধে যাহা কিছু সন্নিবেশিত করিয়াছি, তাহার অধিকাংশই সিগনর মেনুসীর (Manauchi) লিখিত বিবরণ হইতে সংকলিত। মেনুসী একজন ভিনিসদেশীয় চিকিৎসক। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া, তিনি মোগল রাজসংসারে চিকিৎসকের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, তিনি তাহার সমস্তই নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সাহজাহানের রাজত্বের সময় তিনি সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আইসেন। মেনুসী আরঞ্জীবের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কি সমরপ্রাঙ্গণে, কি বিলাসকাননে, সকল সময়েই

ন বটে—কিন্তু সুলতানা তাহাতে মৃতপ্রায় হইয়া শয্যাশায়িনী
হজাহান শোকে উন্মত্ত হইয়া, রাজকার্য্য বন্ধ করিলেন—
মনায় কারাগার হইতে বন্দী ছাড়িয়া দিলেন। মস-
াঠ ও ফয়তা চলিতে লাগিল। সহরের দোকান-পাট বন্ধ
ইল, দরিদ্রদিগকে ধন বিতরিত হইতে লাগিল। পরে তৎ-
ৎসক এনায়েৎউল্লা, লাহোর হইতে আসিয়া,সুলতানাকে
পিতৃস্নেহপরায়ণা,অতুলক্ষমতাশালিনী, সৌন্দর্য্যময়ী
জেহানারা সপ্তদশ বর্ষ ক... রিয়া প্রাসাদের মধ্যে স্বীয় অসংযত ক্ষমতা পরি-
চালন করেন। মমতাজ-জিমানি জীবদ্দশায় সাহজাহানের প্রতি যেরূপ ক্ষমতা-
শালিনী ছিলেন, জেহানারা মাতার মৃত্যুর পর পিতার উপর সেই ক্ষমতা
প্রকাশ করেন। জীবনের শেষভাগে, আরঙ্গীবের ঘোর চক্রান্তে যখন সাহ-
জাহান কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, তখন রাজকন্যা জেহানারা তাঁহার একমাত্র
সহচারিণী ছিলেন। দিল্লীর প্রধান সরাই
লইয়া, ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন
স্মরণার্থে সাহজাহান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

দারা, সাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ
দারার প্রতি স্নেহশীলা ছিলেন। পরে সিংহাস
যাহা কিছু গোলযোগ ঘটে, জেহানারা সে সম্ব
করিয়াছিলেন। দারা দানে মুক্তহস্ত, ব্যবহারে উ
অনাশ্রয়ী পুরুষ ছিলেন; তাঁহার আত্মসংযমপ্রবৃত্তি অ
গঠন অতি সুন্দর ছিল, তাহার সহিত মনের স
আরও মনোরম করিয়াছিল। না রাগিলে তাঁহা
বড়ই উন্নত ছিল; কিন্তু রাগিলে, প্রধান প্রধান ও
গালাজ দিতে ছাড়িতেন না। তিনি কাহারও উপদেশ গ্র
না। কেহ কোন বিষয়ে উপদেশ দিতে গেলে, তিনি তাহাতে আপনাকে
অপমানিত বোধ করিতেন।

দারা অনেক ইউরোপীয় ভাষা জানিতেন। তৎকালীন প্রচলিত পাশ্চাত্য-
বিজ্ঞানও শিখিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মমত অনেকটা হিন্দু ও খ্রীষ্টানীর মধ্যবর্ত্তী
মতের। এক পক্ষে তাঁহার যেমন হিন্দু অনুবাদক ছিল, তাহাদের দ্বারা
পুরাণাদি অনুবাদ করাইতেন, তেমনি অপর পক্ষে কয়েকজন Jesuit খ্রীষ্টিয়ান

তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়
এক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মসম্বন্ধে উ
অনেক বড় বড় মুসলমান ওমরাহ তাঁহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হ

সাহসুজা—সাহজাহানের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার সাহ
দুঃসাহসিক কার্য্যও করিতে পারিতেন। তাঁহার চতু
চতুরতা অপেক্ষা সম্ভবতঃ নিম্নশ্রেণীর। পিতার
প্রণিধি থাকিত, হারেমের মধ্যে রাজকুমারদের অ
রাখিতেন। দারা সাহজাহানের প্রিয়তম কু
প্রণালী পর্য্যাবেক্ষণের জন্য প্রণিধি নিয় ছিলেন, তাঁহার কার্য্য-
আগরার প্রাসাদে কোথায় কি যুক্ত ছিল। প্রণিধিগণ দিল্লী ও
প্রদান করিত। রাজপ হইতেছে, তৎসম্বন্ধে যুবরাজকে সংবাদাদি
পেক্ষা পুত রাজাদের সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল; সর্ব্বা-
ন্ত সিংহ তাহার অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। পার-
হ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার স্বার্থের
ত্যেক সময়েই মুক্তহস্ত ছিলেন। এই সমস্ত বিশিষ্ট
ক দোষে সব নষ্ট হইয়াছিল। তিনি ঘোরতর ব্যসনা-
য়োজনীয় কাজের মধ্যেও যখন তিনি আমোদে মাতি-
ও হইয়া যাইত। হয় ত নৃত্যগীতাদিতে খেয়াল চাপিল,
ড়িয়া তাহাতে নিমগ্ন হইলেন। সমরক্ষেত্রের ঘোরতর
ভীষিকার মধ্যেও, তাঁহার এই প্রকার ব্যসনাসক্তির
রমণীর বিলোল কটাক্ষ, ঈষদুষ্ণ সুগন্ধময় সিরাজি,
লা যদি তাঁহার মস্তিষ্কের উপর অল্প ক্ষমতা প্রকাশ
ত তিনি দিল্লীর মসনদ্ অধিকার করিতেন।

নারা বেগম। রসিনারা রূপসী বটে, কিন্তু জেহানারার মত
জেহানারার সৌন্দর্য্য তাঁহার ক্ষমতাসঞ্চয়ের অমোঘ অস্ত্রস্বরূপ
ছিল। সেই সুন্দর মুখ,সেই বিলোল কটাক্ষ, সেই সুমিষ্ট স্বর শুনিতে, অনেক
উচ্চপদস্থ রাজসভাসদ সময়ে সময়ে আত্মবিক্রয় করিত। জেহানারা
কৌশলে তাহাদের লোভ দেখাইয়া নিজের কাজ সারিয়া লইতেন, কিন্তু
রসিনারার সে সব কিছুই ছিল না। তিনি কাহারও সহিত বড় একটা মিশি-
তেন না। এরূপ ভাব দেখাইতেন, যেন রাজকার্য্যের, রাজান্তঃপুরের কার্য্যের
বা রাজনীতির সহিত তাঁহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই; কিন্তু গোপনে গোপনে

। আরঙ্গীবের সহায়তা
একমাত্র রসিনারার
মন্ত্রণার সংবাদ পরিজ্ঞাত
সম্বন্ধে আমাদের ।কিছু বেশী
মুরাদ ও তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা
কুমার মুরাদ, সাহজাহানের
না, যাহা উল্লেখযোগ্য। তবে
য়া করিতে গিয়া তিনি অনেক
সময় অনেক দুষ্কর কার্য্য করিয়া ফেলি... । তাঁহার সদসৎ-জ্ঞান খুব অল্প ছিল, সহজেই মিষ্ট কথায় প্রলুব্ধ হইতেন। দিল্লীর রাজসভার গোপনীয় কার্য্যপ্রণালীর সহিত তাঁহার কোন বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না। এ সমস্ত বিষয় তিনি পছন্দ করিতেন না। কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন।

তাহার পর, সাহজাহানের সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা মার্ণিসা বেগম। তাঁহার বড় বুদ্ধি সুদ্ধি ছিল না। রাজসভার দলাদলি তাঁহার লক্ষ্যের মধ্যে আসিত না। কেহ সিংহাসন পাইল বা না পাইল, তাহাতে তাঁহার ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। বহুমূল্য বস্ত্র বা হীরকখচিত অঙ্গুরীয়, বা কোন একটা সৌখিন দ্রব্য পাইলেই, তাঁহার প্রাণের আশা পূরিত।

এই অতুল বিলাসিতার জলধিপার্শ্বে, এই উচ্চাভিলাষের পূর্ণতরঙ্গের নিম্নে—এই কোলাহলমদিরোচ্ছ্বাসের এক প্রান্তে, আর একটি নূতনবিধ চরিত্র ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হইতেছিল। তাহাতে—দারার দাম্ভিকতা, সুজার বিলাসিতা, মুরাদের আত্মম্ভরিতার ছায়ামাত্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। এক পক্ষে—সুখভোগ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অবিমৃশ্যকারিতা, অন্য পক্ষে সুখে উপেক্ষা, প্রচ্ছন্ন উচ্চাভিলাষ ও দূরদর্শিতা ; বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয়পক্ষাশ্রয়ী কুমার আরঙ্গীবই পরিশেষে সকলকে পদদলিত করিয়া, সুবিখ্যাত "তক্ত-তাউসে" অধিরোহণ করেন।

আরঙ্গীব যৌবনের প্রারম্ভে সংসারবিষয়ে অত্যন্ত অনাসক্ত হইয়া উঠিলেন। সিংহাসন তাঁহার আন্তরিক লক্ষ্য হইলেও, বিশেষ চতুরতায়

* আরঙ্গীবকে রসিনারার কনিষ্ঠ বলিয়া ডাক্তার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। রসিনারা আরঙ্গীব অপেক্ষা চৌদ্দ মাসের বড়। ডাক্তার সাহেবের ভ্রম না হইয়া, ইহা হয় ত তাঁহার পুস্তকের অনুবাদকর্ত্তার ভ্রম হইতে পারে।

মনোভাব গোপন করিয়
দিবারাত্র শাস্ত্রাধ্যয়নে
উষ্ণীয, রত্নখচিত বেশভূ
পবিত্রতার আচ্ছাদনস্বরূপ
ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, দ
জন্মিল। কোরাণের আদ্যো
বার করিয়া নেমাজ আরম্ভ হইত
তিনি মধ্যে মধ্যে পদ্যময় বৈরাগ
ন্যায় গদ্যেও তাঁহার বেশ কলম চলি... তাহার জগদ্বিখ্যাত পত্রগুলিই তাহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন! আজকালকার কথায় বলিতে গেলে, তিনি একজন Deplomatic Letter-Writer * ।

তিনি রাজসংসারে বিলাসিতার মধ্যে জন্মিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন, সুখকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখের সহিত সখ্যতা করিয়াছিলেন। বিলাসিতাকে সংযমের মুখে সমর্পণ করিয়াছিলেন—রমণীকটাক্ষ কোরাণের নিকট বলিদান দিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি সংসারত্যাগী হইতে চাহিতেন, এই জন্য দারা তাঁহাকে রহস্য করিয়া "পীর" বলিতেন।

আরঙ্গীব যখন এই প্রকার ভাবস্রোতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তখন দারার ক্ষমতার পূর্ণ অবস্থা। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহজাহান দারাকে ভাল বাসিতেন—তাহার উপর আবার জেহানারার সমর্থন। দারা প্রকৃত পক্ষে সম্রাটের প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া পড়িলেন। রাজসভায়—আমখাসের দরবারে, তাঁহার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা, আমীর ওমরাহদের মধ্যে বড় বাড়িয়া উঠিল।

মোগল রাজসংসারের নিয়মানুসারে, কুমারগণ ভূমিষ্ট হইবামাত্রই, তাঁহাদের পদোচিত সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার উপযুক্ত সম্পত্তি ও নগদ অর্থ তাঁহাদের নামে সরকার হইতে মঞ্জুর হইয়া ভাণ্ডারে জমিতে থাকিত। কুমারেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে—এই সমস্ত সঞ্চিত অর্থের ভাগ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু ইহাতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা অতি অল্পই ছিল। কুমারেরা—প্রচুর ধন হাতে পাইয়া, অনেক সময়ে তাহার সহায়তায় সম্রাটের বিদ্রোহী হইতেন। সাহজাহান এই চিরপ্রবর্ত্তিত প্রথার মূলে কুঠারাঘাত

* শুনা গিয়াছে, তাঁহার রচিত অনেক পত্র আজও পঞ্জাবের বাজারে বাজারে বিক্রয় হয়।

করিয়া পুত্রগণকে সুদূর প্রদেশে—সেনাচালন অথবা শাসনকর্তৃত্বের ভার দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই নূতন নিয়মে সুজা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইলেন। আরঙ্গীব দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের প্রতিনিধি হইয়া চলিলেন—মুরাদ গুজরাটে স্থানান্তরিত হইলেন। কিন্তু দারা সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া, সাহজাহান তাঁহাকে সন্নিধানে রাখিলেন।

দারা পিতার কাছে থাকিয়া ক্ষমতাসঞ্চয় করিয়াই—সকলকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আরম্ভ করিলেন। কতকগুলা ফিরিঙ্গির দল তাঁহার প্রধান সহচর হইল—ইহাদের মধ্যে Fleming নামধারী একজন পর্টুগীজের ক্ষমতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিল। তাঁহার চারিদিকে রাজসভার কুপোষ্য চাটুকারবর্গ ও জন কয়েক ভবিষ্যৎবাদী মোল্লা আসিয়া জুটিল—ইহারা তাঁহার সম্রাট হইবার সম্বন্ধে এত ঘন ঘন ভবিষ্যৎবাণী আরম্ভ করিল যে, দারার মস্তিষ্ক তাহাতে আত্মম্ভরিতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। *

স্বয়ং [illegible]দসাহের আবার এই সময়ে আর এক উপসর্গ আসিয়া বয়োবৃ[illegible] সঙ্গে সঙ্গে সাহজাহান অত্যন্ত ধনলিপ্সু হইয়া পড়িতেছি[illegible] শুনিতে পাওয়া যায়—অধিকাংশ সময়ই সঞ্চিত ধনরাশির স্তূপ দ[illegible] হৃদয় প্রফুল্ল থাকিত। সুতরাং রাজকার্য্য দারার হাতেই [illegible]

সাহজাহানের সিংহাসনের কাছে দারা এক ক্ষুদ্র সিংহাস[illegible] পিতার অনুপস্থিতিতে সেইখানে বসিয়া তিনি তাঁহার প্রতিনি[illegible] সমগ্র হিন্দুস্থানের দণ্ডমুণ্ডের বিধান করিতেন। পিতার [illegible] পাখীর লড়াই দেখিতেন, আমখাসে বার দিয়া বসিতেন [illegible] আপনাকে প্রকৃত সম্রাট বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

সম্ভ্রান্ত ওমরাহ ও হিন্দুরাজগণকে দারা বিশ্বাস করি[illegible] নামক একজন উজীরকে সাহজাহান স্বীয় প্রধান [illegible] ছিলেন—দারা বিষপ্রয়োগে তাহার জীবলীলা[illegible]

---

* এক সময়ে এই প্রকার এক জন গণক, দারাকে বলিয়াছি[illegible] বলিতেছি, আপনি সম্রাট হইবেন ; যদি না হন, তবে আমার[illegible] সভাসদ্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ প্রকার কঠিন বাধ্যবা[illegible] ব্যক্তি অম্লানবদনে উত্তর করিল,—"যুবরাজ যদি সম্রাট হন, [illegible] —কিন্তু না হইলে—আমা অপেক্ষা তাঁহার নিজের মাথা বঁ[illegible]

অম্বরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহকেও তিনি অবহেলা করিতে ছাড়িতেন না। বিদ্রূপ করিয়া তাঁহাকে "ওস্তাদজী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। *

তাঁহার আর একটি হঠকারিতার উদাহরণ দিই—এক সময়ে বিখ্যাত সেনানী মহব্বত খাঁর জনৈক কর্ম্মচারী দারার অধীনস্থ এক সেনানায়কের অপমান করে। দারা এই কথা শুনিয়া হুকুম দিলেন, মহব্বত খাঁকে দিল্লীতে ধরিয়া লইয়া আইস। এই মহব্বতই তাঁহার পিতামহ জাহাঙ্গীরকে নাকাল করিয়াছিলেন।

দারার এক ক্রীতদাস ছিল, তাহার নাম আবার খাঁ। কোন উজীর বা ওমরাহের কোন প্রশংসা করিলেই, দারা তাহাকে অপমানিত করিবার জন্য, স্বীয় প্রিয় ক্রীতদাস আবার খাঁর সহিত তুলনা দিতেন। এই সকল কারণে, হিন্দু মুসলমান ওমরাহগণ দারার বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন।

...যখন দিল্লীতে বসিয়া স্বীয় ভবিষ্যতের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতে- ...সেই সময়ে সাহসুজা বাঙ্গালায় প্রশান্তভাবে দিনপাত করিতে- ... মুরাদ শীকার, তীর ছোঁড়া, ও রমণী-সম্ভোগে অভি... ...মগ্ন। ...সময়ে, সুদূরে দাক্ষিণাত্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্থিরভাবে সুদূর ভবিষ্যতের পথ উদ্ভাবনে দিবারাত্রি ব্যস্ত ছিলেন। আরঙ্গীব দাক্ষিণাত্যে ...নিবি... তিনি মনে মনে স্থির করিলেন—নিঃস্বার্থভাবে জীবন- ...ল, অন্ততঃ সেরূপ ভাব না দেখাইলে, তাঁহার কার্য্যপথ সুবিধাময় ...র্ম্মের আচ্ছাদন উপরে রাখিয়া, ভিতরে ভিতরে তিনি ভ্রাতা- ...রিবার সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে, দাক্ষিণাত্যে ... নির্ম্মিত হইল—যত মোল্লা ও সংসারবিরাগী ফকির তাঁহার ...। তাহাদের সহিত মিশিয়া, বৈরাগ্যের ভাণ দেখান ...কিন্তু তাঁহার এপ্রকার ব্যবহারও সম্পূর্ণ কুটিলতাবর্জ্জিত ...ঘটনাটিতে পাঠক তাহার বিশেষ পরিচয় পাইবেন। ...শের ফকির এক সঙ্গে জড় করিলেন। আরঙ্গীব ...কুমারের উপযুক্ত রসনার তৃপ্তিকর ভোগে তিনি ...তেন। ফকিরদের একত্রিত করিবার উদ্দেশ্য, তিনি ...আহার করিবেন। দলে দলে ফকির আসিয়া ...

জন করিলেন। তাহাদের সহিত প্রশস্ত ময়দানে বসিয়া আহার আরম্ভ করিলেন। মান অপমান কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই—আহার সমাপ্ত হইলে কুমার প্রস্তাব করিলেন, “আপনাদের বস্ত্রাদি অত্যন্ত মলিন হইয়াছে, আমি আপনাদের নূতন বস্ত্র দিব।” ফকিরেরা ইহাতে বড়ই শঙ্কিত হইল। এই প্রকার ধর্ম্মাচরণের সহিত তাহাদের স্বার্থের বিরোধ উপস্থিত হইল। তাহাদের ভিক্ষাসঞ্চিত সমস্ত অর্থই তাহারা পোষাকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিত। আরঞ্জীব তাহা জানিতেন—সুতরাং এ বিষয়ে তাহারা অসম্মত হইলেও তিনি জোর করিয়া তাহাদের বস্ত্র ত্যাগ করাইলেন। রাশীকৃত পরিত্যক্ত বস্ত্র এক প্রকাণ্ড স্তূপে পরিণত হইল। কুমার তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিতে আদেশ করিলেন। আগুন ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ফকিরদের পক্ষে উভয় সঙ্কট—পরিত্যক্ত বস্ত্রের মধ্যে অর্থ আছে, এ কথা প্রকাশ করিলে তাহাদের ভণ্ডামি প্রকাশ পায়। তাহারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল, আর সেই রাশীকৃত বস্ত্র গলিত সুবর্ণ উদ্গীরণ করিয়া, বৈশ্বানরের প্রবল তেজে ভস্মীভূত হইয়া গেল। আরঞ্জীব সেই সমস্ত গলিত সুবর্ণ দখল করিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইহাতে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সৈনিক যুগল।

[বিখ্যাত ফরাসী লেখক মোপাসাঁর (Guy de Maupassant) গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হইতে]

প্রত্যেক রবিবারে, দুই জনে ছুটী পাইলেই বেড়াইতে বাহির হইত।

বারীক ছাড়াইয়া দক্ষিণ দিকে কুর্বিভোর মধ্য দিয়া, কুচ্ করিবার মতন হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইত। তার পর, নগরের ঘর বাড়ীগুলি পশ্চাতে ফেলিয়া, বেঁজোনের (Bezons) ধূলিময় রাস্তা ধরিয়া বরাবর চলিত।

বড় কোর্ত্তার মধ্যে দুজনের ক্ষুদ্র ক্ষীণ শরীর কোথায় হারাইয়া যাইত। কোর্ত্তার আস্তিন হাতের নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। বৃহৎ ঢিলা লাল পাজামা

নিম্নে, প্রশান্ত নীল চক্ষু লইয়া দুইখানি নিরীহ ব্রীটন মুখের কোন পৃথক অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

পথ চলিবার সময়ে, দুজনের মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইত না। কথাবার্ত্তার পরিবর্ত্তে, এক চিন্তায় উভয়ে আকুল হইয়া থাকিত। লেসাঁ-পোর (Les champoir) নিকট বনস্থলীর একাংশ, তাহাদের স্বদেশের কথা মনে উদয় করিয়া দিত। সেই বনপ্রান্তে উপস্থিত হইলে, তাহাদের হৃদয়ে আর কোন ব্যথা থাকিত না।

Colomb ও Chaton যাইবার রাস্তা যেখানে মিলিয়াছে, সেইখানে গাছতলায় ভারি কোর্ত্তা দুটি খুলিয়া, দুজনে কপালের ঘাম মুছিত।

প্রতিবার বেঁজোনের সেতুর উপর কিয়ৎক্ষণ থামিয়া, উভয়ে নিম্নে সীন্ নদীর জলস্রোত দেখিত। সেতুর প্রাচীরের উপর ঝুঁকিয়া, দুই তিন মিনিট নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। কখন বা Argentevil্র বিস্তৃত জলরাশির উপর শুভ্র পাল তুলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা চলিতে দেখিয়া, ব্রীটনের চঞ্চল সাগর-বারি, তাহাদের গৃহসন্নিহিত বন্দর ও Morbihan ছাড়াইয়া মুক্তসমুদ্রাভিমুখী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেলেডিঙ্গির কথা মনে পড়িত।

সীন্ পার হইয়াই তাহারা আহার্য্য সংগ্রহ করিত। রুমালে বাঁধা চার স্যুর (sou) রুটী, এক লিতার পেতিত্ ব্লু মদ (A litre of 'petit Blue') ও একখণ্ড ব্লু পুডীং তাহাদের সমস্ত দিনের সম্বল। এই গ্রাম ত্যাগ করিয়া, অল্প অল্প গল্প করিতে করিতে উভয়ের গতি আরো শিথিল হইয়া আসিত।

গন্তব্য বনালীর সম্মুখেই এক প্রকাণ্ড অনুর্ব্বর মাঠ। দূরে দূরে মাঠের মধ্যে দু' চারিটি বৃক্ষ এক এক স্থলে দাঁড়াইয়া আছে। অল্পপরিসর বনপথের দুই পার্শ্বে শ্যামল শস্যক্ষেত্র। দূরে শস্যের হরিৎবর্ণের মধ্যে এই ক্ষুদ্র পদবী ডুবিয়া গিয়াছে। জিন্ (Jean) লুককে (Luc) সম্বোধন করিয়া বলিত,—

"এস্থানটা ঠিক্ Plounivonএর মত নয় ?"

"হাঁ—ঠিক্ বটে।"

পাশাপাশি চলিতে চলিতে স্বদেশের অস্পষ্ট স্মৃতির ছায়া তাহাদের হৃদয় আর্দ্র করিয়া তুলিত। সন্ধ্যা তারার মতন স্বদেশের এক একটি ছবি ক্রমে ক্রমে হৃদয়পটে ফুটিয়া উঠিত। অল্প মূল্যের আলেখ্যর ন্যায় এই সরল ছবিতে

কোন, লতাগুল্মবেষ্টিত বেড়া, একখণ্ড জলাভূমি, আর কখন বা চৌমাথা বা পাথরের একটা ক্রস্ দেখিয়া, তাহাদের মধুর পূর্ব্বস্মৃতি জাগিত।

প্রত্যেকবার উভয়ে একখানা বড় প্রস্তরের নিকট থামিত। এই বৃহৎ শিলাখণ্ড অনেকটা লক্নুভেনের (Locneuven) প্রাচীন আদিম অধিবাসী-দিগের সমাধিস্তূপের ন্যায়।

প্রথম বৃক্ষকুঞ্জের নিকট পৌঁছিয়া, লুক্ প্রতি রবিবারে একগাছি হেজ্‌লের ছড়ি কাটিত। ছড়ির ছাল ছাড়াইতে ছাড়াইতে, অন্যমনস্ক হইয়া স্বগৃহের নানারকম কথা ভাবিত।

জিন্ খাদ্য সামগ্রী লইয়া পশ্চাতে আসিত।

মধ্যে মধ্যে লুক্ স্বদেশের কাহারো নাম করিত, কখন বা দু একটি কথায় বাল্যকালের কোন অতীত ঘটনা বিবৃত করিয়া, অগাধ চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিত। তাহাদের স্বদেশ, বহুদূরে প্রবাসীর প্রিয় মাতৃভূমি, একটু একটু করিয়া সমস্ত প্রাণ মন অধিকার করিয়া লইত; মা প্রবাসী তনয়ের নিকট, তাঁহার সেই সৌম্য আকৃতি, তাহাদিগের পূর্ব্বপরিচিত মধুর শব্দ, লবণাক্ত সমুদ্রানিলতাড়িত শ্যামল ঊষর ক্ষেত্রের গন্ধ পাঠাইয়া দিতেন।

তাহারা আর প্যারিসের উপনগরীর পূতিগন্ধ পাইত না। লবণাক্ত সমুদ্রানিল যেন বেলাভূমির উপর নবপ্রস্ফুটিত কুসুমের সৌরভ বহিয়া আনিতেছিল। দূরে নদীতীরের উপর দু' এক খণ্ড শুভ্র পাল দেখিয়া তাহাদের বোধ হইত, যেন তাহাদের গৃহ হইতে সাগরাম্বু পর্য্যন্ত বিস্তৃত সৈকত-ভূমির অপর দিক্ দিয়া যে সমস্ত ক্ষুদ্র অর্ণবপোত সমুদ্রের কূলে কূলে ভাসিয়া যায়, তাহাদেরই পাইল দেখা যাইতেছে।

শান্ত ও ম্লান হৃদয় লইয়া, ক্ষীণ পদক্ষেপে অনেক পথ পার হইয়া যাইত। কি এক মধুর অবসন্নতা আসিয়া সমস্ত হৃদয় ছাইয়া ফেলিত। পূর্ব্বস্মৃতি ব্যথিত পিঞ্জরাবদ্ধ জীবের ন্যায় কি এক মর্ম্মভেদী বহুকালব্যাপী দুঃখ তাহা-দিগকে আকুল করিত।

লুকের ছড়িটির সমস্ত ছাল ছাড়ান শেষ হইবার সময়, তাহারা প্রত্যেক রবিবারে বনের যে প্রান্তভাগে বসিয়া আহার করিত, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইত।

পূর্ব্ব রবিবারে যে দুই খানি ইট বনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়া-ছিল সেই দুই খানি খুঁজিয়া বাহির করিত। শুষ্ক বৃক্ষপত্রে ও শাখা

ধরাইয়া সঙ্গিনের উপর করিয়া ব্লড্ পুডিং (Blood pudding) টুকু ঝলসাইয়া লইত।

মদের শেষ ফোঁটাটি পর্য্যন্ত পান করিয়া ও রুটিখানির শেষ টুক্রাটি আহার করিয়া, উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া ঘাসের উপর বসিত। মুখে কথা সরিত না, দৃষ্টি বহুদূরে চলিয়া যাইত, চক্ষুর পাতা দুটি নত হইয়া আসিত। প্রার্থনার ন্যায় অঞ্জলি নিবদ্ধ করিয়া, রক্তাভ পা দুখানি মাঠের পপিপুলের মধ্যে ছড়াইয়া, উভয়ে নীরবে বসিয়া থাকিত। প্রখরসূর্য্যকিরণপ্রতিভাসিত শিরস্ত্রাণ ও উজ্জ্বল পিতলের বোতাম দেখিয়া মাথার উপর বিহঙ্গকুলের গান মনে আসিত না।

দুপুর বেলায় উভয়ে এক এক বার বেজোঁস্ গ্রামের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিত; কারণ, প্রত্যেক রবিবারে সেই সময়ে একটি বালিকা দুধ দুহিবার ও গরুটিকে নাড়িয়া বাঁধিবার জন্য, তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইত। সমস্ত দেশের মধ্যে এই গরুটি বাড়ী ছাড়িয়া মাঠে চরিতে আসিত। গরুটি কিছু দূরে বনের পাশে এক ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে চরিয়া বেড়াইত।

তাহারা শীঘ্রই বালিকাকে দূর হইতে চিনিতে পারিত। কারণ, সেই নিরালায় এই বালিকা ব্যতীত অন্য মানবের প্রায় সমাগম হইত না। সূর্য্যের কিরণ লাগিয়া টিনের দুগ্ধপাত্রের যে উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব পড়িত, তাহা দেখিয়া তাহাদের মনে কেমন আহ্লাদ হইত। তাহারা পরস্পরের মধ্যে এই বালিকার কথা প্রায় কখন উল্লেখ করিত না। তাহারা শুধু তাহাকে দেখিতে ভাল-বাসিত। কিন্তু কেন যে তাহাকে দেখিয়া এত আহ্লাদ হইত, তাহার কোন কারণ বুঝিতে পারিত না।

বালিকাটি বেশ সবল ও সুস্থকায়। মাথার লাল চুলগুলি প্রখর সূর্য্য-তাপে ঝল্সিয়া গিয়াছে।

ক্রমাগত তাহাদিগকে সেই এক স্থানে বসিতে দেখিয়া, একবার বালিকা বলিল—"তোমাদের দুই জনকে সকল সময়ে এই খানে দেখি—নয়?"

লুক দু'জনের মধ্যে একটু সাহসী। সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিল, "হ্যাঁ; আমরা এখানে বিশ্রাম করিতে আসি।"

দিগকে দেখিয়া মেয়েটির অধরপ্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল। সে হাসির অর্থ, দুর্ব্বলের উপর রমণীর স্বাভাবিক প্রশান্ত করুণা। বালিকার কম্পিত চতুর নয়ন দু'টি যেন বলিত, "তোমরা এত লাজুক; তোমাদিগকে দেখিয়া দয়া হয়।"

"তোমরা ওখানে চুপ্ করে বসে বসে কি কর? ঘাস গজান দেখ না কি?"

লুকের যেন আরো একটু সাহস আসিল। একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "হতে পারে!"

"আ—কিন্তু ওটা বড় খুঁটি-নাটি কাজ।"

লুক আরো একটু জোরে হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ-হয় ত তাই।"

বালিকা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে এক পাত্র দুধ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "তোমরা একটু দুধ খাবে? এ তোমাদের বাড়ীর মতন দুধ।"

হয় ত সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ইহারা তাহার ন্যায় কৃষকসন্তান, হয় ত বালিকাও তাহাদের ন্যায় প্রবাসী। তাই বালিকার কথা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিল।

তাহাদের প্রাণ কেমন করিয়া উঠিল। বালিকা অনেক কষ্টে তাহাদের খালি মদের বোতলে খানিকটা দুধ্ পুরিয়া দিল। লুক প্রথমে এক এক ঢোক্ করিয়া দুধ পান করিল। সে প্রত্যেক বার মুখ হইতে বোতল লইয়া দেখিতেছিল যে, অর্দ্ধেক খাওয়া হইয়াছে কি না। তার পর, জিনের হস্তে বোতল দিল।

মেয়েটি দুগ্ধপাত্র মাটিতে নামাইয়া, উরুর উপর হাত রাখিয়া সরলভাবে তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের সন্তোষ দেখিয়া, তাহার মনে মনে আহ্লাদ হইতেছিল।

"তবে আজ যাই—আবার রবিবারে দেখা হবে।" এই কথা চেঁচাইয়া বলিতে বলিতে বালিকা চলিয়া গেল।

যত দূর দেখা যায়, তত দূর তাহারা বালিকার দিকে চাহিয়া রহিল। একটু একটু ছোট হইয়া, অবশেষে বালিকার সুদীর্ঘ দেহবল্লরী দূরে মাঠের শ্যামলতার মধ্যে ডুবিয়া গেল।

* * *

পরের সপ্তাহে বারীক ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় জিন বলিল

"আমাদের সেই বালিকার জন্য কিছু কিনিয়া লইলে ভাল হয় না?"

কিন্তু কি জিনিস দেওয়া যাইতে পারে—এই বিষয় লইয়া উভয়ে মহা সমস্যায় পড়িল। লুকের মতে একটু রাঁধা মাংস লইলে ভাল হয়। জিন কিছু মিষ্টান্নভক্ত, সে মিষ্টান্ন উপহার দিবার প্রস্তাব করিল। তাহার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া, অবশেষে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ক্রয় করাই মত হইল। উভয়ে এক যেণের দোকান হইতে দুই সুর (Sous) এক রকম সাদা ও লাল মিছ্রীর মিঠাই কিনিয়া লইল।

সে দিন তাড়াতাড়ি তাহাদের আহার সমাপ্ত হইল। উভয়ে বালিকার আগমন প্রতীক্ষা করিতে করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

জিন্ তাহাকে দূর হইতে প্রথমে দেখিতে পাইয়া বলিল, "ঐ সে আস্‌ছে!" লুক বলিল "হাঁ—সেই বটে।"

বালিকা তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমাদের সব ভাল ত?"

তাহারা দুই জনে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"তুমি কেমন আছ?"

বালিকা উভয়ের সহিত অনেক কথাবার্ত্তা কহিল। চাষবাসের কথা, তাহার কাজকর্ম্মের কথা, তাহার মনিবের বিবরণ, ইত্যাদি বালিকার জীবনের সামান্য সামান্য কাহিনী উভয়ে অত্যন্ত আগ্রহসহকারে শুনিতেছিল।

তাহাদের মিষ্টান্ন দিতে সাহস হইতেছিল না। জিনের পকেটে মিছরি গলিয়া যাইতেছিল।

অবশেষে নিরুপায় হইয়া, লুক্ একটু সাহসে ভর করিয়া, আস্তে আস্তে বলিল—"তোমার জন্য কিছু এনেছি—লইবে কি?"

বালিকা বলিল, "কৈ দেখি? কি বল না!" জিন কোন রকমে ঈষৎ কম্পিতহস্তে পকেট হইতে কাগজের ঠোঙ্গাটা বাহির করিল। লজ্জায় তার চোক্ মুখ্ লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

বালিকা চিনির গুলি কয়েকটিকে ঠেলিয়া, এ গাল হইতে ও গালে আনিতেছিল। গাল দুটি ফুলিয়া উঠিয়াছিল। জিন্ ও লুক্, প্রীতিবিস্ফারিত উৎফুল্ল-নেত্রে বালিকাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল।

বালিকার কথা সমস্ত সপ্তাহ তাহাদের মনের মধ্যে ওলট্-পালট্ করিতেছিল। দু একবার প্রকাশ্যেও তাহার প্রসঙ্গ উথাপিত হইয়াছিল।

পরের রবিবার বালিকা অনেকক্ষণ ধরিয়া দুজনের সহিত গল্প করিল। হাঁটু জড়াইয়া বসিয়া, তিন জনে প্রত্যেকের স্বদেশে অতিবাহিত বিগত জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা বর্ণনা করিতেছিল। তাহাদের দৃষ্টি সুদূর গগন-প্রান্তে ভাসিয়া যাইতেছিল। গরুটি বালিকার বিলম্ব দেখিয়া সতৃষ্ণনয়নে ঘাড় বাঁকাইয়া হাম্বা রবে বালিকাকে ডাকিল। তাহার নাক্ হইতে টস্ টস্ করিয়া ঘাম পড়িতেছিল।

*　　　*　　　*

এক দিন মঙ্গলবারে লুক্ ছুটি লইয়া কোথায় বাহির হইয়া গেল। তাহার ফিরিয়া আসিতে প্রায় রাত্রি দশটা হইল। লুকের সৈনিক-জীবনে ইহা এক নুতন ঘটনা। সে আর কখন ছুটি লয় নাই।

জিন সমস্ত দিন মাথা ঘামাইয়া ইহার কোন একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ স্থির করিতে পারিল না।

বৃহস্পতিবার দিনও লুক্ একজন সঙ্গীর নিকট দশ সু ধার করিয়া কয়েক ঘণ্টার জন্য বারাক্ ছাড়িয়া অন্যত্র যাইবার ছুটি পাইল।

রবিবার দিন জিনের সহিত গন্তব্য বনানীর দিকে যাইবার সময় লুকের ভাবভঙ্গী কিছু নূতন রকম, যেন কিছু পরিবর্ত্তিত ও অস্থির। জিন প্রকৃত কথা কিছুই বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তবুও মনের উপর কেমন একটা সন্দে-হের ছায়া ঘুরিতেছিল।

নির্দ্দিষ্ট বনোপকণ্ঠে পৌঁছিবার পূর্ব্বে, দু জনে একটিও কথা কহে নাই। অত্যন্ত আস্তে আস্তে আহার সমাপন করিল। উভয়ের একটুও ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই।

কিছুক্ষণ পরেই বালিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়ে অন্য দিবসের ন্যায় তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে নিকটে আসিতেই লুক উঠিয়া দু এক পদ তাহার দিকে অগ্রসর হইল। বালিকা ভূমিতে দুগ্ধপাত্র নামাইয়া, লুকের গলা জড়াইয়া, উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে বারবার মুখচুম্বন করিল। জিনের অস্তিত্ব সে একবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। জিনের

বেচারী জিন হতাশ হইয়া বসিয়াছিল। ভাল করিয়া তাহার এ সমস্ত কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল না। তাহার আকুল প্রাণ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। বজ্রাহত সৌধের ন্যায় শতধা ভিন্ন হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা এখনো সে অনুভব করিতে পারে নাই।

লুকের পাশে বসিয়া বালিকা গল্প করিতেছিল।

জিন সে দিকে আর চাহিল না। সে এখন লুকের ছুটির মর্ম্ম বুঝিতে পারিল। কি এক জ্বলন্ত দুঃখ তাহাকে দগ্ধ করিতেছিল। কে যেন চির-ন্যস্ত বিশ্বাস হনন করিয়া, হৃদয়টা একেবারে আমূল উৎপাটন করিয়া গিয়াছে। কি বিষম আঘাতে যেন হৃদয়ের সমস্ত অস্থি মজ্জা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

লুক ও বালিকা উঠিয়া গোরুটিকে নাড়িয়া বাঁধিতে গেল।

জিনের দৃষ্টি তাহাদের পশ্চাতে চলিল। জিন তাহাদিগকে পাশাপাশি চলিয়া যাইতে দেখিল। লুকের লাল-ইজার বনপথকে যেন উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

লুক খোঁটা তুলিয়া লইল। কিছু দূরে হাতুড়ি দিয়া খোঁটাটি মাটিতে পুঁতিয়া গোরু বাঁধিল।

বালিকার দুধ দুহিবার সময়, লুক্ গরুর পিঠের দাঁড়ায় হাত বুলাইতেছিল। ঘাসের উপর দুগ্ধপাত্র রাখিয়া, উভয়ে গভীর বনানীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

প্রাচীরের ন্যায় ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষপত্র জিনের দৃষ্টি রোধ করিল। তাহার বড় যন্ত্রণা হইতেছিল। উঠিতে যাইলে হয় ত সে হতচেতন হইয়া পড়িয়া যাইত।

জিন যন্ত্রণায় হতবুদ্ধি হইয়া, অসাড় নিশ্চেষ্টের ন্যায় বসিয়াছিল। তাহার এক একবার ছুটাছুটি করিয়া গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছিল। সে কোথাও লুকাইয়া থাকিবে—আর কাহারো মুখ দেখিবার তাহার সাধ নাই।

বনাভ্যন্তর হইতে সহসা তাহারা বাহিরে আসিল। পল্লীগ্রামে বিবাহের অঙ্গীকারাবদ্ধ যুবক যুবতীর ন্যায় উভয়ে হাত-ধরাধরি করিয়া, ধীরে ধীরে বনান্তরাল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। লুকের অপর হস্তে বালিকার দুগ্ধপাত্র।

একবার মাত্র প্রসন্ন মুখে জিনকে শুভ সম্ভাষণ করিয়া ও একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া, গ্রামাভিমুখে প্রস্থান করিল। সে দিন আর সে জিনকে দুধ্ দিয়া গেল না।

দু'জনে পূর্ব্বের মত পাশাপাশি নিস্তব্ধ হইয়া বসিল। তাহাদের প্রশান্ত মুখ দেখিয়া, অন্তরের উদ্দাম চঞ্চল তরঙ্গের কথা বুঝা যাইতেছিল না। অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণ তাহাদের উপর পড়িল। মধ্যে মধ্যে গরুটি তাহা-দিগের পানে চাহিয়া ডাকিতেছিল।

এই সময় তাহারা প্যারিসে ফিরিবার জন্য উঠিল।

লুক একগাছি ছড়ি কাটিল। জিন শূন্য বোতল হাতে করিয়া আসিতে-ছিল। সে বেজোঁসের দোকানদারকে বোতল ফিরাইয়া দিল। উভয়ে সীন নদীর জলস্রোত দেখিবার জন্য, বেজোঁসের সেতুর উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

জিন সেতুর লোহার রেলের উপর খুব ঝুঁকিতেছিল, যেন জলস্রোতের মধ্যে কি তাহাকে আকর্ষণ করিতেছে। লুক বলিল, "তুমি কি জল খাবার চেষ্টা করচ্ নাকি?" এই কথা বলিতে না বলিতে, জিন ঝোঁকের মাথায় উল্টাইয়া, একটা লাল ও নীল রঙ্গের তাল হইয়া জলের মধ্যে পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

যন্ত্রণায় লুকের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আর চেঁচাইতে পারিল না। কিছু দূরে কি ভাসিয়া উঠিল; জলের উপর জিনের মাথা একবারমাত্র ভাসিয়া আবার ডুবিয়া গেল।

আরো কিছু দূরে যেন একখানি হাত দেখা গেল। হাত খানি নদীর স্রোতের উপর কিয়ৎক্ষণ ভাসিয়া অদৃশ্য হইল। এই শেষ।

মাঝিরা সেদিন আর মৃত দেহ খুঁজিয়া পাইল না।

লুক একলা দৌড়াইতে দৌড়াইতে পাগলের মতন বারীকে ফিরিল। অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে, অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে, এই শোকাবহ ব্যাপার কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিল, "সে রেলের উপর ঝুঁকে——সে——রেলের উপর ঝুঁকে—— এত দূরে——এত দূরে যে তার মাথার ঝোঁক্ সামলাতে না পেরে—— সে——সে——পড়ে গেল——পড়ে গেল———"।

শোকে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, মুখে আর বাক্য সরিল না। হায়, যদি সে শুধু জানিত!

ফুলের মালা।

আল্‌তা-মোছা।

১

অলক্তাক্ত দু' চরণে জল দিল ঢালি ;
ধুয়ে গেল, মুছে গেল ; পাড় কেন গালি ?
খোকার নহে গো দোষ,
ওর প্রতি মিছে রোষ,
ও শুধু জলের ঘটী করে এল খালি !
কাণেতে শিখায়ে দিনু,
ঘটীটি ধরায়ে দিনু,
ও শুধু জলের ঘটী করে এল খালি !
দূতের কি দোষ কভু ?
ত্থায় যুদ্ধে তারে প্রভু
পাঠায় আপন কাজে ; ভুলিলে কি আলি ?
আমারো নহেক দোষ,
তোমারি যতেক দোষ ;
অলক্তাক্ত দু' চরণে জল দিল ঢালি,
ধুয়ে গেল, মুছে গেল ; পাড় কেন গালি ?

২

উদার উষার কাল ;
সান্ধ্য মেঘ রক্ত-জাল
রঞ্জিল গগনাঙ্গন !—বল বল আলি,
বসন্তে সাজালে কেন শারদীয়া ডালি ?
*　　*　　*
মঞ্জুল যৌবন-কুঞ্জে ফুটিল সেফালি !
ঝুরু ঝুরু বহে বায়,
সৌরভ মিশায় তায় ;
হাতে কেন হে রঙ্গিণি রঙ্গনের থালি ?
দুই চক্ষে লাগে বাধা,
কমল ফুটিবে কোথা,
প্রভাতে ফুটালে তুমি কুমুদী [illegible]

এ মাধবী নিশীথিনী,
ছিল গো চন্দ্রশালিনী,
কবি-চিত্ত-সৌধরাজি আলোকে উজলি ;
রূপ-রাজ্যে, বল, সতি,
কে শিখালে এ কুনীতি ?
তুমি এলে দুই করে মোমবাতি জ্বালি।
আয়ান আসে নি সখি,
মিছা অভিনয়, একি ?
বনমালী হ'ল কেন শ্মশানের কালী ?
হ'তে ছিল দোলরাস,
চারি ধারে গীতোচ্ছ্বাস ;
শ্যামা-বিষয়ক গান ধরিলি লো আলি।
কে তুহারে শিখাইল এই নাগরালি ?
খোকার নহেক দোষ,
ওর প্রতি মিছে রোষ ;
অলক্তাক্ত দু' চরণে জল দিল ঢালি ;
মুছে গেল ; তার জন্যে মিছে কেন গালি ?

গান-শোনা।

(নিমন্ত্রণ খাইবার কিম্বা অন্য কোন কার্য্যের উপলক্ষে, যখন বাড়ীর গৃহিণী, কন্যারা ও বধূরা অন্যত্র গিয়াছেন, আর তোমার বধূ কোন অনতিক্রম্য কারণবশতঃ একাকিনী ঘরে আছেন, ও যখন তিনি নিজেকে "একাকিনী" পাইয়া বিশ্বস্তচিত্তে, গান ধরিয়াছেন ; তখন, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে, চুপে চুপে, সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিও। আর যদি তুমি ধরা পড়, তাহা হইলে, গায়িকাকে সম্বোধন করিয়া, এই কবি-

১

গেয়ে যাও, খেমনা'ক ; গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান!
পিয়ে ও সঙ্গীত-মধু,
আমার মানসী-বধূ,
আহ্লাদে উন্মুখ আজি, ঊর্দ্ধ করি কাণ!
বধিরতা সারিয়াছে,
আত্মা মোর বুঝিয়াছে,
রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, এক্ উপাদান!
পুষ্প, জ্যোৎস্না, প্রেম, গান,
এক্ সেতারের তান!
গেয়ে যাও, খেমনা'ক ; গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান!

২

উঠে পড়ে গীতধারা,
তরল রজত পারা!—
পুষ্পবনে একি রঙ্গ!—নির্ঝরের প্রাণ,
করে সখি ছুটাছুটি আহ্লাদে অজ্ঞান!
নামিছে, পড়িছে ওই,
উঠিছে, নামিছে ওই,
অতীতের মগ্ন স্মৃতি বাহিয়া উজান ;
আশার কাঞ্চন-তরী বাহিয়া সটান!
নয়নে ত্রিদিব-নেশা,
পুলক-বিহ্বল-বেশা,
গেয়ে চাও, খেমনা'ক, গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছে অভিমান!
আজি গো হয়েছে ধন্যা,
সঙ্গীতের অন্নপূর্ণা!
পুষ্পবাস, পূতপ্রেম, মুরলীর তান,
অকাতরে, মুক্তকরে, করিছে প্রদান!
যত তব প্রাণ মাঝে,
হাসি অশ্রু লেগে আছে,
উছলি উছলি আজি, আনিছে ও গান!
সুখ মৃদু কেঁদে উঠে,
দুঃখ মৃদু হেসে উঠে—
গেয়ে যাও, খেমনা'ক ; গেয়ে যাও গান,
সাজে না তোমারে সখি মিছে অভিমান!
কবে কোন্ সেফালীর,
সৌরভে হয়ে অস্থির,
দোঁহে দোঁহা করেছিনু প্রেমসুধা-দান ;
কবে কোন্ যামিনীতে,
বসি বাতায়ন-পথে,
করেছিলে তুমি সখি অভিমান-ভাণ ;
কোন্ সে মাধবী-রাতে,
ফুল-শয্যা, ফুল-পাতে,
একটি চুম্বনে হ'ল নিশি-অবসান ;
নয়নে ত্রিদিব-নেশা,
পুলক-বিহ্বল-বেশা,
বলে যাও সে কাহিনী ; গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান!

আছে, আছে খরগোশ্।

(সকল দেশেই কি শিশুপ্রকৃতি এক হয়? ইংলণ্ডের পল্লিগ্রামে যে ঘটনা দেখিয়া সহৃদয় কবি-ভ্রাতা Wordsworth "We are seven" নামক অপূর্ব্ব কবিতা লিখিয়াছেন, আমার নিজ গৃহে ঠিক্ তেমনি একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। মানব-প্রকৃতি আত্মার মৃত্যু চিন্তা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। সুতরাং Tyndall Versus Hamilton নামক মকোদ্দমা হইবামাত্রই ডিস্‌মিস্ হয়।)

রাণীর ঠাকুমা, এই পথ দিয়া,
যেতেছিলা অন্য স্থানে—
পথ আগুলিয়া, উমাশশী তাঁর,
বস্ত্রের অঞ্চল টানে!
ফাঁপর ঠাকুমা, সুধান্ রাণীরে
আমারে ধরিলি কেন?

বাবার তুহার, কি করেছি চুরি?
ধরিলি কোটাল যেন!
আমার রাণীর, আঁখি তারা মাঝে,
কৌতুক উথলি উঠে!
আল্‌মারি-পাশে, টানি ঠাকুমারে,
লয়ে যায়, বেগে ছুটে!
কহে রাণী গিয়া, "দাওগো ঠাকুমা—
খরগোশ্‌ দাও মোর!"
রাণীর নয়নে, এমনি আগ্রহ,
বহে বহে আঁখি-লোর!
শুনে সে আকুল, শিশুর মিনতি,
ঠাকুমা অবাক্‌ প্রায়—
"হায় রে পাগ্‌লি, গেছে সে যে ম'রে,
কোথায় পাইব তার?"
বিষণ্ণ ঠাকুমা, বলে "নাই—নাই"
রাণীর বাড়িল রোষ;
বার বার চাহি, ঠাকুমার পানে,
বলে, "আছে খরগোশ্‌!"
কাচের উপরে, আঁখি দুটি রাখি,
রাণী চাহে কতবার!
হায় রে জগতে, মরণের কথা,
শিশুরে বোঝান ভার!
সে দিন যে তার, আঁখির সম্মুখে,
মৃতদেহ গেছে চলে,
আশাময়ী রাণী আশার কুহকে,
সে কথাটি গেছে ভুলে! *

কবি শেলির শবদাহ।

লেগহরণের নিকটবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র নগরে, স্পিজিয়া উপসাগরের উপকূলে, কবি শেলি প্রবাসে থাকিতেন। তাঁহার ছোট-খাট একখানি সমুদ্রতরী ছিল। তিনি প্রতিদিন তরী লইয়া সমুদ্রকূলের নিকটে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু তরীখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া কূল হইতে অধিক দূরে যাইতে সাহস করিতেন না।

এই সময়ে একদিন শেলি এই জাহাজে করিয়াই লেগহরণে কবি বায়রণ ও তাঁহার বন্ধু ট্রেলনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। জাহাজে তাঁহার বন্ধু উইলিয়মস ও একটিমাত্র নাবিককে সঙ্গে লইলেন। তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে লেগহরণে পৌঁছিলে পর, সেখানে বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথাসময়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কেবল কতকগুলি পুস্তক, গৃহসামগ্রী ও একটি ডোঙ্গা ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। কবি বায়রণেরও

---

* স্থানাভাবে ও অদৃষ্টের নির্ব্বন্ধে গরীব খরগোশ্‌টি আল্‌মারির মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছিল।

"বলিভার" নামক একখানি ক্ষুদ্র জাহাজ ছিল। ট্রেলনি বলিভারে আরোহণ করিয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে যাইবেন,ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণবশতঃ তাহা ঘটিয়া উঠিল না ; তাঁহাকে শেলির নিকট হইতে বন্দরেই বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। কবি শেলি, তাঁহার বন্ধু উইলিয়মস এবং সেই নাবিকের সহিত বাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু ট্রেলনি তখনও চলিয়া গেলেন না, সেই বন্দরেই নঙ্গর ফেলিয়া রহিলেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শেলির জাহাজের চিহ্নমাত্র দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ডেকের উপরেই দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

তাহার পর, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় শেলির জাহাজ যখন দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল, তখন তিনি ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া ক্যাবিনে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময়ে একজন নাবিক তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "ভয়ানক দম্‌কা বাতাস উঠিয়াছে।" তিনি ইহা শুনিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই আকাশ কাল মেঘে আচ্ছন্ন, চারিদিকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া পরক্ষণেই ভীষণ বজ্রাঘাত হইতেছে। সমুদ্র ক্রমাগত তরঙ্গ উদ্গার করিয়া গর্জ্জন করিতেছে। ট্রেলনি প্রকৃতির এই দৌরাত্ম্য দেখিয়া, শেলির অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে একটু আকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তবু বায়ুর গতি প্রতিকূল দিকে ছিল বলিয়া, কিয়ৎ পরিমাণে আশ্বস্তও হইলেন। ভাবিলেন, শেলি কি কখন এই প্রতিকূল বায়ুর বিপক্ষে যাইতে পারিবেন ? হয় কিনারার নিকটে নঙ্গর ফেলিয়া থাকিবেন, না হয় আশ্রয় লইবার জন্য বন্দরাভিমুখেই ফিরিয়া আসিবেন। কিন্তু অনেকক্ষণ অতীত হইয়া গেল, তবু শেলি ফিরিয়া আসিলেন না দেখিয়া, ট্রেলনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার বিপদাশঙ্কা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জাহাজও নিতান্ত ক্ষুদ্র। সুতরাং সমুদ্রে ঝড়ের সময় এই ক্ষুদ্র তরী ভাসাইয়া সন্ধানে বাহির হওয়া বিপজ্জনক ভাবিয়া, অনেক চিন্তার পর, শেলির অপেক্ষায় সেই বন্দরেই আর একটা নঙ্গর ফেলিয়া সমস্ত রাত্রি অতি-বাহিত করিলেন। সমস্ত রাত্রি ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত হইতে লাগিল। ট্রেলনি সমস্ত রাত্রি বন্ধুর জন্য উৎসুক চিত্তে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। সেই রাত্রেই আবার বন্দরস্থ একটা জাহাজে বজ্র পড়াতে, সেই জাহাজটা একেবারে খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল, এবং সেই সঙ্গে দুই জন লোক মারা পড়িল।

পরদিন ঝড় থামিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল,শেলি বাড়ীতে পৌঁছাইয়াছেন কি না জানিবার জন্য, ট্রেলনি প্রভাতেই এক জন লোক প্রেরণ করিলেন। শেলি বাড়ীতে পৌঁছাইতে পারেন নাই শুনিয়া, ট্রেলনি একেবারে হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন। শেলির অন্যান্য বন্ধুরাও এই দুঃসম্বাদ শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। তাঁহারা চারিদিকে শেলির সন্ধানের জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন প্রকার সংবাদ পাওয়া গেল না।

অবশেষে যে দিকে শেলির জাহাজ গমন করিয়াছিল, ট্রেলনী নিজেই সেই দিক অনুসরণ করিয়া, শেলির অন্বেষণে বাহির হইলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর, উপকূলের একস্থানে একটা ডোঙ্গা এবং দুইটা পিপা পড়িয়া রহিয়াছে শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ সেখানে চলিয়া গেলেন। তিনি সেই ডোঙ্গা এবং পিপা দেখিয়াই, শেলির বলিয়া চিনিতে পারিলেন। কারণ, এই ডোঙ্গাটা শেলী লেগহরণে গিয়া ক্রয় করেন, আর এই দুইটা পিপাতে করিয়া যাত্রাকালে বাড়ী হইতে জল আনিয়াছিলেন। ট্রেলনি এই সকল দ্রব্যের সন্ধান পাইয়া, শেলি যে আর ইহজগতে নাই, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন। এবং পুনরায় উদ্বিগ্নহৃদয়ে জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন।

ক্রমাগত এক সপ্তাহ অনুসন্ধানের পর, একদিন ট্রেলনি নিকটবর্ত্তী চরে দুইটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে শুনিয়া, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দেহ দুটি ৯।১০ দিন সমুদ্রের জলে পড়িয়াছিল, সুতরাং পচিয়া এমন বিকৃত হইয়া গিয়াছিল যে, ট্রেলনি প্রথমে মুখ দেখিয়া কিছুতেই চিনিতে পারিলেন না। কেবল কাপড় এবং অন্যান্য চিহ্ন দেখিয়া ধরিতে পারিলেন যে, বাস্তবিকই শব দুটি শেলি এবং উইলিয়মসের মৃতদেহ। আর, লেগহরণ ছাড়িবার সময় শেলির হস্তে ট্রেলনি কবি কিটসের যে একখানি কবিতাপুস্তক দেখিয়াছিলেন,শেলির জামার পকেটে সেই পুস্তকখানি এখনও পর্য্যন্ত খোলা আছে দেখিতে পাইলেন। বোধ হয়, যখন ঝড় আরম্ভ হয়, তখন শেলি বইখানি পড়িতেছিলেন, হঠাৎ ঝড় উঠাতে পকেটে ঐ অবস্থায় বইখানি রাখিয়া দিয়াছিলেন। হয় ত ভাবিয়াছিলেন, দুরন্ত ঝড় থামিয়া গেলে আবার পড়িবেন।

আবার তিন সপ্তাহ পরে, নাবিকের মৃতদেহও পাওয়া গেল। প্রহরীরা এই সকল মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া পুঁতিয়া ফেলিবে স্থির করিল

করিবার জন্য গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। স্বাস্থ্যের পক্ষে হানি-জনক বলিয়া গভর্মেণ্ট তাঁহাদের এ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় তাঁহারা স্থির করিলেন, ইঁহার মৃতদেহ দাহ করিয়া অবশিষ্ট ভস্ম এবং অস্থি রোমনগরে লইয়া গিয়া সমাধি স্থাপন করিবেন। গভর্মেণ্ট এ প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

অবশেষে তাঁহারা সমুদ্রকূল হইতে ভাসা কাঠ সংগ্রহ করিয়া চড়ার উপরেই চিতা প্রস্তুত করিলেন। শেলির একদিকে কবি বায়রণ মুখ ঢাকিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন, আর একদিকে অন্যান্য বন্ধুরা শোকাভিভূত হৃদয়ে তাঁহার সৎকারাদি সম্পন্ন করিতেছেন। কি বিষাদময় দৃশ্য!

সমুদ্র কবিকে কিরূপে বুঝিবে? ঝটিকায় সামান্য সামুকের মত তাঁহাতে তাই ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু তাঁহার অন্তরে যে মুক্তাফল ছিল, তাহার মর্ম্ম সে কি বুঝিবে? মনুষ্যহৃদয়েই তাঁহার অমরত্ব চিরস্থায়ী।

রোমনগরে, কবি শেলি এবং কবি কিট্স, দুই বন্ধুর সমাধি একস্থানে পাশাপাশি সংস্থাপিত আছে।

দুইটি অমর কবির সমাধি, সেখানে কত স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

শ্রীপ্রজ্ঞা দেবী।

প্রবাসের পত্র।

নর্ম্মদা।

এক দিন মাত্র নাসিকে থাকিয়া, জব্বলপুর পঁহুছি। পর দিন প্রাতে আমি নর্ম্মদা দর্শন করিতে যাই। জব্বলপুর হইতে এ স্থান এগার মাইল ব্যবধান; পথ অতি সুন্দর এবং ছায়াসমাচ্ছন্ন। প্রথমেই নর্ম্মদার জলপ্রপাত দেখিতে যাই। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'ধূমধারা' বলে। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে, প্রস্তর-গর্ভে বেগে জলধারা পড়িয়া যে জলকণা উৎকীর্ণ করে, তাহা দূর হইতে ঠিক ধূমের মত বোধ হয়। সেই জন্যে এই জলপ্রপাতের নাম ধূমধারা হইয়াছে। উভয় পার্শ্বে শ্বেত শৈলশ্রেণী। তাহাদের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া, প্রস্তরগর্ভা নর্ম্মদা প্রবাহিতা। দেখিলেই মেঘদূতের সেই কবিত্বপূর্ণ চরণটি মনে পড়ে,—

"রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাম্।"

"বিষম উপল মাঝে—
বিন্ধ্যপদে শীর্ণা রেবা করিও দর্শন।"

নর্ম্মদার অন্য নাম রেবা। অনুমান পঞ্চাশ হস্ত ঊর্দ্ধ হইতে, বহু ধারায় গর্জ্জন করিয়া, নর্ম্মদা ভীষণ বেগে পতিত হইয়া, এই অপূর্ব্ব জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছেন। নর্ম্মদা যেন অবিরাম সংখ্যাতীত শ্বেতকুন্দ-কুসুমরাশি বর্ষণ করিয়া বিন্ধ্যপাদ পূজা করিতেছেন। জল তুষারবৎ শীতল। তথাপি এই প্রাকৃতিক কবিত্বস্রোতে অবগাহন না করিয়া আমি থাকিতে

স্নান করিবার সময় আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। স্রোতের বেগ এত প্রখর, কিন্তু চারি অঙ্গুলের অধিক জলের গভীরতা নাই।

ফিরিবার সময়ে, গৌরী-শঙ্কর দর্শন করি। জলপ্রপাত হইতে এই মন্দির পর্য্যন্ত, গিরিমূল অসংখ্য আমলকী, বেল ও নানাবিধ বনজাত ফলবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। দেখিলে, ঋষিদিগের পুরাতন আশ্রমের চিত্র মনে পড়ে। আমি কোনও কোনও ফল খাইয়া দেখিলাম। মন্দিরটি একটি শৃঙ্গে অবস্থিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মধ্যস্থলে বৃষারূঢ়া হর-পার্ব্বতী। তাহার উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে গণপতির সঙ্গে বুদ্ধদেব নীরবে শোভা পাইতেছেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণের চারি দিকে, প্রাচীরের মত শ্রেণীবদ্ধ কক্ষমালা। প্রত্যেক কক্ষে এক একটি মূর্ত্তি বিরাজিত। অল্প বেশী সকলেরই ভগ্নাবস্থা। পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, চৌষট্টি যোগিনী। কিন্তু আমি তাহাতে যোগিনীর গন্ধও দেখিলাম না। আমি দেখিলাম, অধিকাংশই মাহেশ্বরী প্রভৃতি রক্তবীজবধের মহাবিদ্যা দুরবস্থাপন্না হইয়া পড়িয়া আছেন। এ পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে নর্ম্মদার উভয়তীরস্থ শৈলমালা ও উপত্যকার শোভা মনোমুগ্ধকর।

পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া আমি ভারতখ্যাত 'মার্ব্বলরক্' বা মর্ম্মর পর্ব্বত দেখিতে যাই। এখানে নর্ম্মদার উভয়তীরস্থ পর্ব্বতই মর্ম্মর, কিন্তু উপরিভাগ তৃণ-গুল্ম-সমাচ্ছন্ন এবং বৃষ্টির দ্বারা বিবর্ণ হইয়াছে। সেরূপ অমল শ্বেতবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। জলপ্রপাত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে জলপতন-বেগে গর্ভস্থ প্রস্তর কাটিয়া একটি দীর্ঘাকার বিচিত্র সরোবর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে স্বয়ং প্রকৃতিই শিল্পী, সেখানে তাহার বিচিত্রতা এবং শোভার কথা কি বলিব? গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক এখানে দুটি বাঙ্গালা এবং দুখানি প্লেজার বোট বা আমোদতরণী রক্ষিত হইয়াছে। তীরস্থিত গৃহ দুইখানি যেন দুখানি ছবি। আমি একখানি জালিবোটে নর্ম্মদার গর্ভে বেড়াইতে লাগিলাম। আমি ইহার কি বর্ণনা করিব? অমল ধবল হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এবং উভয় বর্ণের সংমিশ্রিত নানাবর্ণের, মর্ম্মরশৈলশ্রেণী উভয় পার্শ্বে সরল ভাবে মধ্যাহ্ন রবিকরে কি মহিমাপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পদতলে ঘুরিয়া ফিরিয়া নীল তরল অমৃতখণ্ডের মত নর্ম্মদার গর্ভস্থ সরসী শোভা পাইতেছে। তাহার উভয় পার্শ্বে নানাবর্ণের মর্ম্মর প্রাচীরের ছায়া সেই নীলদর্পণে প্রতিভাত হইয়া, নানাবর্ণের মেঘমালায় খচিত এক খণ্ড আকাশের মত শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে মর্ম্মর গর্ভে কি সুন্দর সুন্দর কক্ষই নির্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। কক্ষপ্রাচীর শ্বেত মর্ম্মরের; কক্ষতল নর্ম্মদা সলিলে নীল-মণিময়। স্থানে স্থানে মর্ম্মরখণ্ড নর্ম্মদার স্রোত অবরোধ করিতে চাহিতেছে, যেন গিরি হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। আবার স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড বিচ্ছিন্ন মর্ম্মর নদীগর্ভে ভাসমান। ঠিক

বোধ হইল, আমি যেন একটি অপ্সরাপুরীর স্বপ্ন দেখিতেছি। সেখানে সকলই যেন সুন্দর, কোমল তরল। সেখানে সকলই প্রেম, সহৃদয়তা এবং মহাপ্রাণতা। আমার মনে হইল, এই সলিলখণ্ড বিন্ধ্যাচলের হৃদয়। বিন্ধ্যসুতা নর্ম্মদা দুহিতৃ-প্রেমামৃতে ইহা পূর্ণ করিয়া, কুলু কুলু রবে কাঁদিতে কাঁদিতে পতিগৃহে চলিয়াছেন। অদূরে জলপ্রপাতের শব্দ এখান হইতে শুনিতে কি মধুর, কি করুণ! অথবা যেন কোন সতী সাধ্বী আকুল হৃদয়ে পতিহৃদয়ে হৃদয় ঢালিতে চলিয়াছেন। সতী যে পথে যাইতেছেন, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ সংসার-প্রস্তর-রাশিও যেন নির্ম্মল, পবিত্র ও সুশীতল করিয়া যাইতেছেন। বোম্বাই নগরের পার্শ্বস্থ আরব সমুদ্রে নৌকাবিহার, সে এক দৃশ্য—তাহা মহিমাপূর্ণ, অনন্ত প্রেমের আভাষপূর্ণ। নর্ম্মদায় নৌকাবিহার, সে অন্য দৃশ্য—তাহা মাধুর্য্যময়, ক্ষুদ্র বালিকার পিতৃপ্রেমের ক্ষুদ্র অথচ গভীর উচ্ছ্বাস। একটি বীর পতির বিরাট হৃদয়, অন্যটি বালিকা নবোঢ়া বধূর ক্ষুদ্র বুক!

প্রাণ ভরিয়া নর্ম্মদার এই মোহিনী শোভা সন্দর্শন করিয়া, আসিবার সময়ে, পথে দুর্গাবতীর রাজধানী 'গড়া' এবং শৈলশেখরস্থিত তাঁহার আবাস-স্থান 'মদনমহল' দেখিয়া আসি। দুর্গাবতীর নাম তুমি 'পলাশিতে'ও পড়িয়াছ,—

"তথাপি সমরে যেন রাণী দুর্গাবতী।"

ইনি পরম রূপসী গোণ্ডজাতীয়া বীরাঙ্গনা ছিলেন। স্বয়ং অশ্বারোহিণী হইয়া সম্মুখ সমরে মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এই দানবদলনীর দুর্গটির একটি মাত্র অট্টালিকা এখনও বর্ত্তমান আছে। উচ্চ শৈলশৃঙ্গের উপরে একখানি একাণ্ড গোলাকৃতি পাথর। তাহার পার্শ্ব হইতে সরল ভাবে প্রাচীর তুলিয়া দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পাথরের এক পার্শ্বেও একটি কক্ষ আছে। ইহা শুদ্ধ ধরিলে গৃহটি ত্রিতল। এই গৃহের দ্বিতীয়-তল হইতে 'গড়া' নগরের দৃশ্য চিত্রিতবৎ সুন্দর দেখায়। পর্ব্বতটির চতুষ্পার্শ্বে স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক গড় বা ঝিল স্ফটিকখণ্ডের মত শোভা পাইতেছে। এই সকল গড় হইতে স্থানটির নাম গড়া হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গৃহটি পর্য্যন্ত এত দিন কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু সেই দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দিনী বীরনারী আজ কোথায়?

জব্বলপুরে ফিরিয়া শিল্পবিদ্যালয় দেখিতে যাই। যে সকল 'ঠগেরা' ইংরাজ সাম্রাজ্যের আরম্ভে, গামছা মোড়া দিয়া সহস্র সহস্র পথিকের প্রাণ-হত্যা করিয়া ডাকাতি করিত, বৃটিশ শাসনের প্রভাবে, আজ তাহারা ও তাহা-দের সন্তানেরা, এই জব্বলপুরে আবদ্ধ থাকিয়া, অপূর্ব্ব শিল্প কার্য্য সকল করি-তেছে। যে হস্ত ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণসংহারক গামছা মুড়িত, আজ তাহা তাঁত বুনিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইংরাজ-রাজের অধিক গৌরবের কথা কি

কবিতা-কুঞ্জ।

ভাদরে।

এ নয় গো আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
নব নীল মেঘখণ্ড আকাশের গায়
ক্রীড়ারত মত্ত করী সম না দেখায়।
এ ভরা ভাদর দিন, আচ্ছন্ন বাদরে,
ঘন নীল মেঘমালা আবৃত আকাশ,
ঘন গাঢ় শ্যামলিমা কাননে প্রান্তরে,
তরল কুয়াষা ব্যাপ্ত বিরহী নিশ্বাস।
যেন,কেঁদে কেঁদে উড়িতেছে কাহারে খুঁজিয়া
শত শত বিরহীর বাষ্পময় হিয়া!
অবিশ্রান্ত বর্ষণার্দ্র রুদ্ধ সৌধাবলী,
কেশ-সংস্কার-ধূপে নহে সুরভিত,
পারাবার মাঝে যেন শৈল শির তুলি,
যেন কোন মন্ত্র বলে জগত স্তিমিত।
বন নদী তীরে ক্লান্তা কুসুমচয়নে,
ফিরেনাক পুষ্পলাবী সীমন্তিনী-কুল,
রুদ্ধ গৃহে রুদ্যমানা বরিহা দুর্দ্দিনে,
নব অশ্রুকণ-সিক্ত হৃদয়-মুকুল!
নাহি উজ্জয়িনী-রামা অপাঙ্গবিলোলা,
কোথা জানপদ বধূ স্নিগ্ধ বিলোকন,
কোথা মধুকরপক্ষ্মা কটাক্ষকুশলা,
কনক-নিকষ-স্নিগ্ধ বিদ্যুৎস্ফুরণ!
নতমুখ পল্লবের ঝরে আঁখিজল
আর্দ্রপক্ষ বিহঙ্গম কুলায়ে বিকল,
নাহি হলে আষাঢ়ের বিভব সুন্দর,
গ্রাম বৃদ্ধ উদয়ন, গল্প মনোহর,
শুধু স্তুপীকৃত ঘনীভূত বৃহদ অতীত,
করিয়া কেবল রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটন,
শত বিরহীর হিয়া স্মিরিতি-মথিত,
কোটী অশ্রুসিক্ত আঁখি নীরবে মগন,
অবিশ্রান্ত বরষণ নয়নের নীর,
শোকাচ্ছন্ন মুখচ্ছবি সারা ধরণীর।

শ্রীগিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

শান্তি।

অস্তাচলে ধীরে যবে ডুবিবে তপন
জীবনের রবি সনে;
মলিন জীবন-জ্যোতি হইবে যখন।
সাধ শুধু রবে মনে মনে;
এসনা আমার কাছে, দেখিয়ে তোমারে পাছে,
পূর্ব্ব কথা স্মরি মিছে হই জ্বালাতন।
জীবন ফুরায়ে যাবে—বিজন শ্মশানে
ভস্ম-অবশেষ রবে;
বহিয়ে বহিয়ে বায়ু তুমুল তুফানে
ধূলা সনে ধূলা মিশাইবে;—
অভাগা সমাধি-স্থলে, ফেল না নয়ন-জলে,—
রাখিলে রাখিতে তুমি পারিতে জীবনে।
চপল হৃদয় তব কত দিকে দোলে,
সতত চঞ্চল গতি;
কার তরে রবে তুমি দেখিব না ম'লে।
সুখসাধে হয়েছে বিরতি;
যাব চলে দূর দেশে, জীবন-যাতনা শেষে,
শান্ত হয়ে শুয়ে রব মহাকাল কোলে।

পথহারা।

আয় আয় আয় মন অয় তুই আয় ফিরে,
আঁধারে হারাবি পথ কোথায় যাইবি দূরে,
আসিছে কুসুম বাস সুদূর কানন হ'তে,
কোন্ স্বপনের ঘোরে যাস্ তারে তুলে নিতে?
সংসার কণ্টকবন নারিবি এ হ'তে পার,
কণ্টক বিঁধিবে পায়ে, ঝরিবে নয়ন ধার!
হেরিছ অদূরে ফুল ও যে গো কানন পার,
কেন এ মহান আশ, স্বরগে জনম তার!
সুদূরে জ্বলিছে আলো চলেছিস্ লক্ষ্য করে,
তোর পথে অন্ধকার, ও যে তারা স্বর্গপুরে!
মরুভূমে মরীচিকা ও মধুর ফুলবাস,
আয় আয় আয় প্রাণ ছেড়ে দেরে বৃথা আশ!
হারাবি প্রাণের সুখ, আপনার শান্তিগেহ
দেখাবে না কেহ পথ ডাকিবে না দিতে স্নেহ!
বিস্তীর্ণ সংসারবনে হ'য়ে যাবি পথহারা,—
সারাটি জীবন হবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা!

শ্রীপ্রমীলা নাগ।

সুলভ সাহিত্য প্রকাশ।

নিম্নলিখিত নূতন প্রকাশিত পুস্তক কয়খানি, সাহিত্য-কার্য্যালয়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পাওয়া যায়। কার্য্যালয়ে আসিয়া লইয়া গেলে মাশুলাদি লাগে না।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত
তিন খানি বই।

লীলা।

উপন্যাস।

চমৎকার গল্প, উজ্জ্বল সমাজ চিত্র, লীলার দুঃখে পাষাণের চক্ষেও জল পড়িবে! মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র, মাশুলাদি ৵৹ দুই আনা।

সংগ্রহ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস।

আটটি উপন্যাস একত্রে মুদ্রিত। চমৎকার গল্প, নানা রসে পূর্ণ। মনোরঞ্জন গল্প মালায় সকলেই তুষ্ট হইবেন। মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ৵৹ দুই আনা।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

আজ কাল হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত ডাক্তার বেরিণী সাহেব কলিকাতায় এই সর্ব্ব-প্রথম ঔষধালয় স্থাপন করেন। ইহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই বহুসংখ্যক হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে; ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য চিকিৎসা-প্রণালী অপেক্ষা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালী অধিক ফলপ্রদ বলিয়াই এত আদরণীয় হইয়াছে। এই চিকিৎসা অতি অল্প ব্যয়ে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নয়; যাঁহারা অতি সামান্য মাত্র লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারাও অনায়াসে আপনার ও পরিবারবর্গের সামান্য সামান্য পীড়া সকল অর্থাৎ সর্দ্দি, কাশী, অজীর্ণ, আঘাত, পেট বেদনা, সামান্য জ্বর প্রভৃতি যে সকল রোগে ডাক্তার দেখাইয়া চিকিৎসা করান অনাবশ্যক বোধ করেন, তাহার চিকিৎসা আপনি করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিলে উক্ত পীড়াসমূহ কখন কখন

অত্যন্ত উৎকট ও দুরারোগ্য হইয়া উঠে; কিন্তু রোগের সূত্রপাত হইতে হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিলে উহা হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শিশু-চিকিৎসা সম্বন্ধে হোমিওপ্যাথি যে বিশেষ উপকারী ও বিসূচিকা (ওলাউঠা) রোগে যে আশু-ফলপ্রদ একথা বহু-জন সম্মত; এ নিমিত্ত সকল গৃহস্থেরই বিশেষ আবশ্যকীয় ঔষধ কয়টী সর্ব্বদা নিকটে রাখা অতীব কর্ত্তব্য।

ডাক্তার বেরিণী সাহেব তাঁহার স্ব-স্থাপিত এই ঔষধা-লয়ের কর্ম্মচারীগণকে নিয়মিতরূপে ঔষধ প্রস্তুতপ্রণালী ও তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার উপায় শিক্ষা দেন; এবং এক্ষণে যদিও ভারতবর্ষের নানা স্থানে অনেক ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে তথাপি ডাক্তার বেরিণীর ঔষধালয়ের তুল্য বিশুদ্ধ ও ফলপ্রদ ঔষধ যে ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আমরা সর্ব্বদা বিলাত ও আমেরিকা হইতে নূতন ঔষধ ও ডাক্তারী পুস্তক সকল আমদানি করিয়া থাকি। প্রত্যেক শিশি সুন্দর কাষ্ঠের কৌটায় দেওয়া হয়; ইহাতে শিশি ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই এবং ঔষধেরও গুণ নষ্ট হয় না।

বেরিণী কোং; ১২নং লালবাজার, কলিকাতা।

ডাক্তার রুবিণীর কর্পূরের আরক।

বিসূচিকার অব্যর্থ মহৌষধ

ও

প্রতিষেধক।

আমাদিগের নামাঙ্কিত সবুজবর্ণ শিশিতে দেওয়া হয়। প্রত্যেক শিশিতে সেবনের নিয়মাবলী লেখা আছে ; ১ আউন্স পরিমাণ মূল্য ১৲ টাকা, ১২ শিশি ১০৲ টাকা। বক্সউড্ কাষ্ঠের কেসের ভিতর কাঁচের ছিপি দেওয়া এক আউন্স শিশি ১৷৹, কর্পূরের আরক পূর্ণ ২৷৹।

বিশেষ গুণ ও প্রয়োজনানুসারে ওলাউঠা চিকিৎসার ঔষধের তালিকা।

১ একোনাইট
২ আর্সেনিকম এল্‌বম
৩ কুপ্রম
৪ ভেরেট্রম এল্‌বম
৫ ক্যান্থারিস
৬ কার্বো ভেজিটেবিলিস্
৭ এসিড হাইড্রোসিয়ানিক
৮ নক্সভমিকা
৯ ইপিকাক
১০ মার্কিউরিয়স করোসিভস্
১১ রিসিনস্
১২ সিকেল কর্নিউটম

এই ১২টি ঔষধপূর্ণ ১ ড্রাম শিশির বাক্স ও অর্দ্ধ আউন্স কর্পূরের আরক মূল্য ৫৲ টাকা, ঐ ১২টি ২ ড্রাম শিশির ঔষধপূর্ণ বাক্স মূল্য ৬৷৹ টাকা কর্পূরের আরক ১ আউন্স ১শিশি ১৲ টাকা।

১৩ ক্যামোমিলা
১৪ চায়না
১৫ টেরিবিন্থিনা
১৬ ওপিয়ম
১৭ আর্যেণ্টম্ নাইট্রিকম্
১৮ ফস্‌ফরস্
১৯ পল্‌সাটিলা
২০ রস্‌টক্স
২১ থুজা
২২ সিনা
২৩ সলফার
২৪ কেলিবাইক্রোম

উপরোক্ত সমস্ত ঔষধপূর্ণ ২৪ টী ১ ড্রাম শিশির বাক্সের মূল্য ১০৲ টাকা।

বিসূচিকা রোগের চিকিৎসার আবশ্যকীয় বিবিধ ডাইলিউসানের ৪৮টী ঔষধ এবং বক্সউড কেসের মধ্যে কর্পূরের আরক সমেত বাক্সের মূল্য ২৪৲ টাকা।

সাধারণ রোগের চিকিৎসা উপযোগী ঔষধের তালিকা।

১ একোনাইট
২ আর্সেনিকম এল্‌বম
৩ বেলেডোনা
৪ ব্রাইওনিয়া
৫ ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব
৬ ক্যামোমিলা
৭ চায়না
৮ মার্কিউরিয়স সলিউবিলিশ
৯ ইপিকাক
১০ নক্স ভমিকা
১১ পল্‌সাটিলা
১২ রস্‌টক্স
১৩ জেল্‌সিমিনম
১৪ কার্বোভেজিটেবিলিস
১৫ কলোসিন্থ
১৬ হিপার সল্‌ফার
১৭ লেকেসিস
১৮ ফস্‌ফরস্‌
১৯ সল্‌ফার
২০ স্পঞ্জিয়া
২১ ভেরেট্রম এল্‌বম
২২ আর্নিকা
২৩ সিপিয়া
২৪ সাইলিসিয়া
২৫ ড্রসেরা
২৬ হাইওসিয়ামস
২৭ এসিড ফস্‌ফরস
২৮ ক্যান্থারিস
২৯ মার্কিউরিয়স করোসিভস
৩০ কফিয়া
৩১ সিনা
৩২ এসিড হাইড্রোসিয়ানিক
৩৩ ভেরেট্রম ভিরাইড
৩৪ কুপ্রম
৩৫ হ্যামামেলিস
৩৬ হাইড্র্যাস্‌টিস
৩৭ এসিড নাইট্রিক
৩৮ সিকেল
৩৯ এন্টিম টার্ট
৪০ ইগ্নেসিয়া
৪১ স্যাবাইনা
৪২ এসিড মিউরিএটিক
৪৩ নেট্রম মিউরিয়েট
৪৪ ডল্কামারা
৪৫ ইউপেটোরিয়ম পার্ফল
৪৬ লাইকোপোডিয়ম
৪৭ সিমিসিফিউগা
৪৮ ষ্ট্রামোনিয়ম

সুসজ্জিত মেহগিনি ও অন্যান্য কাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে উপরোক্ত ঔষধগুলির মূল্য।

		এক ড্রাম	দুই ড্রাম
	১২ শিশির বাক্স	৫৲	৬৷৷০
ক	২৪ " "	১০৲	১৩৲
ক	২৮ " "	১২৲	১৫৲
ক	৩০ " "	১৩৲	১৬৲
খ	৪০ " "	১৭৲	২২৲
খ	৪৮ " "	২০৲	২৫৲
খ	৬০ " "	২৫৲	৩২৲
খ	৭২ " "	৩০৲	৩৮৲

ক চিহ্নিত কয়েক রকম বাক্সের নিম্নে একটি (টানা) দেরাজে বাহ্যিক প্রয়োগ জন্য ৪ ড্রাম পরিমাণে চারিটী ঔষধ লইলে ৬৲ টাকা অধিক বা অতিরিক্ত মূল্য দিতে হইবে।

খ চিহ্নিত বাক্স সকলে উক্তরূপ দেরাজে ৬ প্রকার ৪ ড্রাম পরিমাণের ঔষধ লইলে ৮৲ টাকা ও ১ আউন্স পরিমাণে লইলে ১২৲ টাকা অধিক মূল্য দিতে হইবে।

এতদ্ব্যতীত সুন্দর পালিশ করা, ভিতর মখমলে মোড়া, ডালায় মরক্কো চামড়ার গদি লাগান উৎকৃষ্ট বাক্স সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে এবং গ্রাহকগণের প্রয়োজন মতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বাক্স প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়।

বাহ্যিক প্রয়োগের ঔষধের তালিকা।

আর্নিকা অমিশ্র আরক এক ভাগ, জল দশ ভাগ—মোচড়ব্যথায়, ছড়িয়া গেলে বা আঘাত লাগিলে এই লোষন পরিষ্কার বস্ত্রে দিয়া আঘাৎপ্রাপ্ত স্থানে লাগাইতে হয়।

কেলেণ্ডিউলা অমিশ্র আরক এক ভাগ, জল দশ ভাগ—কাটা, ছিঁদ ও ক্ষত হইলে উপরোক্ত নিয়মে।

ক্যান্থারিস এক ভাগ, সুইট্‌ অয়েল বা জল ১০০ভাগ—পুড়িয়া গেলে, উক্ত নিয়মে।

হাইড্রাসটিস এক ভাগ, জল ছয় ভাগ—ঘুঁটি, পচা ঘা, স্তনঘুঁটি,

ক্যানসার বা ঘুর্‌ঘুরে ক্ষত, উক্ত নিয়মে।

রস্‌টক্স এক ভাগ, জল বা তৈল দশ ভাগ—কোমরে ও স্থানীয় মাংসপেশীর বাতে, উক্ত নিয়মে।

থুজা অমিশ্র আরক আব ও কড়ার উপর লাগাইতে হয়।

আর্টিকা ইউরেনস্‌ এক ভাগ, জল বা তৈল নয় ভাগ, পোড়া ও পোড়া ঘায়ে বিশেষ উপকারক।

ফস্‌ফরিন—ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়বিক পীড়া বা বেদনায় সেবনীয় মূল্য ১।০

বারবেরিণ—যকৃৎ দোষ ও তৎসম্বন্ধীয় অসুখে সেবনীয় মূল্য ১।০

চিনোপোডিয়ম এন্থেল্‌মেণ্টিক শিশুদিগের ক্ষুদ্র ক্রিমি হইলে বিশেষ উপকারক।

হোমিওপ্যাথিক বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিধান—ডাক্তার জারের 'চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতা' নামক পুস্তকের অনুবাদ ৩৲

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ষোড়শক ১৲

ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা—হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী প্রণীত ৫॥০

ভৈষজ্যতত্ত্ব—বিহারীলাল ভাদুড়ী কৃত ৪॥০

চিকিৎসাবিজ্ঞান ঐ ১ম ও ২য় খণ্ড ১০৲

চিকিৎসাপ্রকরণ ১ম ও ২য় খণ্ড—ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কৃত ১০৲

চিকিৎসাসোপান—রাধাকান্ত ঘোষ প্রণীত ৫৲

ভৈষজ্যতত্ত্ব ঐ ৬॥০

ওলাউঠা চিকিৎসা ঐ ।৴০

শিশু ও স্ত্রী-চিকিৎসা ঐ ৸০

জ্বর চিকিৎসা ঐ ১।০

বাহ্যিক প্রয়োগ—হরেকৃষ্ণ মল্লিক কৃত ॥০

বিসূচিকা চিকিৎসা-সার—ডাক্তার স্যালজার ও অন্যান্য বিখ্যাত ডাক্তারগণের বিসূচিকাতত্ত্ব পুস্তক হইতে এবং ডাক্তার এলেন ও হেরিং কৃত সুবৃহৎ ভৈষজ্যতত্ত্ব হইতে সংগৃহীত ॥০

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য হোমিওপ্যাথিক বাঙ্গালা পুস্তক আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি। বাঙ্গালা পুস্তকের জন্য আজ্ঞাপত্রের সহিত অগ্রিম সমুদায় বা আংশিক মূল্য পাঠান আবশ্যক।

ঔষধের মূল্য।

	১ ড্রাম	২ড্রাম	৪ড্রাম	১আউন্স	২আউন্স
অমিশ্র আরক ...	॥০	৷৷৵০	১।০	২৲	৩৲
ডাইলিউসন।					
১ হইতে ১২ ক্রম ...	।৶০	॥০	৷৷৵০	১৲	১॥০
১৩ হইতে ৩০ ক্রম ...	॥০	৷৷৵০	১৲	১॥০	২৲
৩১ হইতে ১০০ ক্রম ...	১৲	১॥০	২৲	৩৲	৪৲
১০১ হইতে ২০০ ক্রম ...	১॥০	২৲	৩৲	৪৲	৫৲
২০১ হইতে ৫০০ ক্রম ...	২৲	৩৲	৪৲	৫৲	৬৲
৫০১ হইতে ১০০০ ক্রম ...	৩৲	৪৲	৫৲	৭৲	৯৲
ক্ষুদ্র বটিকা এবং পিল।					
১ হইতে ১২ ক্রম ...	॥০	৷৷৵০	১।০	২৲	৩৲
১৩ হইতে ৩০ ক্রম ...	৷৷৵০	১৲	১॥০	২॥০	৪৲
৩১ হইতে ১০০ ক্রম ...	১॥০	২৲	৩৲	৪৲	৬৲
১০১ হইতে ২০০ ক্রম ...	২৲	৩৲	৪৲	৫৲	৭৲
২০১ হইতে ৫০০ ক্রম ...	৩৲	৪৲	৫৲	৭৲	৯৲
৫০১ হইতে ১০০০ ক্রম ...	৪৲	৫৲	৬॥০	৭৷৷৵০	৯।০
চূর্ণ।					
১ হইতে ৬ ক্রম ...	৷৷৵০	১৲	১॥০	২৲	৩৲
৭ হইতে ১২ ক্রম ...	১৲	১॥০	২৲	৩৲	৪৲
১৩ হইতে ৩০ ক্রম ...	২৲	৩৲	৪৲	৫৲	৬৲

বাহ্যিক প্রয়োগ জন্য ঔষধের তালিকা ও মূল্য।

	১আউন্স	২আউন্স	৪আউন্স	৮আউন্স	১পাউণ্ড
এসিড কার্ব্বোলিক (কাঁচের ছিপি)	১॥০	৩৲	৫৲	৮৲	১২৲
একোনাইট মূল আরক ...	১॥০	৩৲	৫৲	৮৲	১২৲
এগারিকস্ মস্ক ঐ ...	১॥০	৩৲	৫৲	৮৲	১২৲
আর্নিকা মণ্টানা ঐ ...	১৲	২৲	৩৲	৫৲	৮৲

	১আউন্স	২আউন্স	৪আউন্স	৮আউন্স	১পাউণ্ড
বেলেডোনা মূল আরক ...	১॥০	৩৲	৫৲	৮৲	১২৲
বেলিশ পিরেনিশ ঐ ...	১।০	২॥০	৩।০	৬৲	১০৲
কেলেণ্ডিউলা ঐ ...	১৲	২৲	৩৲	৫৲	৮৲
ক্যান্থারিশ ২ ডাইলিউসন ...	১৲	১॥০	২॥০	৪৲	৬৲
কষ্টিকম্ ২ ঐ ...	১৲	১॥০	২॥০	৪৲	৬৲
হ্যামামেলিস ভার্জিনিকা মূল আরক ...	১।০	২৲	৩৲	৫৲	৮৲
হেলিয়াম্থস ঐ ...	১॥০	৩৲	৫৲	৮৲	১২৲
হাইড্রাষ্টীস্ ঐ ...	১॥০	৩৲	৫৲	৮৲	১২৲
ঐ মূল চূর্ণ ...	১।০	২৲	৩।০	৬৲	১০৲
লিডম্ পেলষ্টার মূল আরক ...	১।০	২৲	৩।০	৬৲	১০৲
রস্টক্স ঐ ...	১৲	২৲	৩।০	৬৲	৮৲
রুটা গ্রাভিওলেনস্ ঐ ...	১।০	২৲	৩।০	৬৲	১০৲
সিম্ফাইটম্ ঐ ...	১।০	২৲	৩।০	৬৲	১০৲
টেমস্ কমিউনিস ঐ ...	১।০	২৲	৩।০	৬৲	১০৲
টিউক্রিয়ম ঐ ...	১৷৵০	৩।০	৬৲	১০৲	১৫৲
থুজা ঐ ...	১॥০	৩৲	৫৲	৮৲	১২৲
অর্টিকা ইউরেন্স্ ঐ ...	১।০	২৲	৩।০	৬৲	১০৲

যে সমস্ত ঔষধ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহার উচ্চ ক্রম সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। অপর যে সকল ঔষধের উচ্চ ক্রম প্রস্তুত থাকে না তাহা আবশ্যকমতে ঔষধের মূল্য ও অতিরিক্ত আর এক টাকা পাইলে প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যায়। মূল্যবান ঔষধ যথা—অরম, এম্ব্রা, এপোমর্ফিয়া, এট্রোপিনম্ প্রভৃতির মূল্য স্বতন্ত্র হিসাবে লওয়া হয়।

পাঁচ টাকা ও তাহার উর্দ্ধ মূল্যে ঔষধ ক্রয় করিলে গ্রাহকগণ শতকরা দশ টাকা হিসাবে কমিসন পাইবেন। প্রত্যেক শিশি উত্তম ও মজবুত কাষ্ঠের কেসের ভিতর দেওয়া হয়, ইহাতে ঔষধের গুণ কোনরূপে নষ্ট হইতে পারে না। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ করিয়া নগদ মূল্য পাঠাইবেন অথবা ভ্যালুপেয়েবল ডাকে ঔষধ পাঠাইতে আদেশ করিবেন।

"বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবার জন্যই 'সাহিত্যের' জন্ম হইয়াছে।"—সাহিত্য।

সাহিত্য।

সুলভ মাসিকপত্র ও সমালোচন।

তৃতীয় বর্ষ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

বাঙ্গালার প্রায় অধিকাংশ প্রসিদ্ধ লেখক "সাহিত্যে" লেখেন।

"সাহিত্যে," প্রতিমাসে, উপন্যাস, গল্প, সমালোচনা, ইতিহাস, জীবনচরিত, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন, সমাজনীতি, সাহিত্য, কবিতা, ভ্রমণবৃত্তান্ত, রহস্য প্রভৃতি বিষয়ে, সুন্দর ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হয়।

"সাহিত্যের" আকার ডিমাই আট পেজী ৭ ফর্ম্মা, ৫৬ পৃষ্ঠা। আবশ্যক হইলে, অতিরিক্ত ফর্ম্মাও দেওয়া হয়। প্রথম সংখ্যা ৮।০ ফর্ম্মা, অর্থাৎ ৬৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা খুব সুন্দর। মূল্যও সুলভ। বাঙ্গালা দেশে এমন সুন্দর কাগজ আর নাই।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য, মায় ডাকমাশুল সর্ব্বত্রে ২৲ দুই টাকা মাত্র।

যাঁহারা গ্রাহক হইতে চান, নিম্নলিখিত ঠিকানায়, নাম ও ঠিকানা এবং অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা পাঠাইবেন। অর্ডার পাইলে ভ্যালুপেবলে "সাহিত্য" পাঠাইয়া থাকি, গ্রাহককে ২৵০ দুই টাকা দুই আনা পোষ্ট আফিসে দিয়া কাগজ লইতে হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। নমুনা চাহিলে, এক সংখ্যার মূল্য মাশুল সমেত সাড়ে চারি আনা পাঠাইতে হয়। অগ্রিম মূল্য না পাইলে, কাহাকেও "সাহিত্য" পাঠান হয় না।

স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী।
২৫ নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন।
কলিকাতা।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
কার্য্যাধ্যক্ষ।

☞ "সাহিত্য"-সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

'সাহিত্য'-সম্বন্ধে সম্পাদকগণের মত।

বঙ্গবাসী ;—"সাহিত্য—মাসিকপত্র ও সমালোচন। ২য় ভাগ ; ১২শ সংখ্যা। শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত। কলিকাতা ২৫নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এই সংখ্যায় সাহিত্যের দ্বিতীয় বৎসর পূর্ণ হইল। সাহিত্য উত্তম চলিতেছে। সাহিত্যের আকারটি সুন্দর ও মুদ্রাঙ্কন উজ্জ্বল। সাহিত্য প্রতি মাসের প্রথমেই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হয়। সাহিত্যের লেখকগণ লিপিকুশল ও সাধারণ্যে সুপরিচিত।"
—বঙ্গবাসী ৭ই চৈত্র, ১২৯৮।

দৈনিক ;—"সাহিত্য—২য় ভাগ ৭ম সংখ্যা পর্য্যন্ত। "সাহিত্য" সবে মাত্র দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে ; কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ যোগ্যতার পরিচয় দিতেছে। ইহার একটি বিশিষ্ট সুখ্যাতির কথা এই যে, অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নব্য যুবক ইহাতে নিয়মিতরূপে লিখিবার ভার লইয়াছেন। ইহা অতি আহ্লাদের কথা। নব্য লেখকগণ বেশ যোগ্যতার পরিচয়ও দিতেছেন। আশা করি, তাঁহারা অধিক করিয়া দেশের কথায় মনোযোগী হইবেন। এতদ্ভিন্ন রজনীকান্ত গুপ্ত, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি প্রবীণ ও সুপ্রতিষ্ঠ লেখকগণও সম্পাদকের সাহায্য করিতেছেন। সুতরাং "সাহিত্য" যে উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রের মধ্যে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে। পত্রিকাখানির আকারও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। ছাপা কাগজ ভাল। মূল্য বৎসরে ২৲ টাকা। প্রকাশকের সুখ্যাতির বিষয় এই যে, তিনি পত্রখানি বেশ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত করিতেছেন।"—৩০শে কার্ত্তিক, ১২৯৮।

সঞ্জীবনী ;—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রায় দুই বৎসর হইল, 'সাহিত্য'-নামে একখানি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিতেছেন। বাঙ্গলাদেশের গণ্য মান্য নরনারীগণ এই পত্রিকাতে লিখিতেছেন। ইহার মধ্যেই 'সাহিত্য' একখানি উচ্চ শ্রেণীর মাসিকপত্রিকা বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আমরা সময়ান্তরে এই পত্রিকাসম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা করিব।"—১২ই বৈশাখ ; ১২৯৯।

হিতবাদী ;—"সাহিত্য—৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা। বয়োবৃদ্ধির সহিত

সর্ব্বাপেক্ষা স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বরচিত প্রভাবতীসম্ভাষণ প্রবন্ধটী বিশেষ প্রীতিকর। ইহাতে সেই মহাত্মার স্নেহময় হৃদয়ের একটী পূর্ণ চিত্র সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। অকৃত্রিম স্নেহ ও প্রেমের স্বর্গীয় মধুর প্রভা এবং সরল শোকের বিষাদ ছায়া একত্রে মিলিত হইয়া হৃদয়কে অভূতপূর্ব্বভাবে আকুলিত করিয়া তুলে।"—৫ই বৈশাখ, ১২৯৯।

প্রকৃতি ;—"সাহিত্য—মাসিক পত্র। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র। সাহিত্য দ্বিতীয় বর্ষে দ্বিগুণ উৎসাহে নবসাজে পরিচালিত হইতেছে। 'প্রকৃতি'র পাঠক মাত্রেই বিজ্ঞাপনস্তম্ভে দেখিয়াছেন, সাহিত্যের লেখকবৃন্দ কোন্ শ্রেণীর। বঙ্গের এরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের সহায়তায়, পণ্ডিতপ্রবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্রের সম্পাদকতায়, সাহিত্য যে মাসিক-পত্র-জগতে প্রথম শ্রেণীর আসন অধিকার করিবেন, তাহাতে .আর বিচিত্র কি? আমরা সাহিত্যের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।"—২৬শে পৌষ, ১২৯৮।

সময় ;—"সাহিত্য—মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের সংখ্যা। ২৫ নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। এই দুই সংখ্যায় বাবু চন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক গণ্য মান্য লেখকই এই পত্রিকায় নিয়মিতরূপে লিখিয়া থাকেন, সুতরাং এখানি যে উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। এরূপ সারবান পত্রিকার সংখ্যা দেশে যতই বৃদ্ধি হয়, ততই মঙ্গল। ইহার লেখা সুরুচি-সংগত এবং শিক্ষা-প্রদ। ভাষা সরল ও ভাব-ব্যঞ্জক। ছাপা অতি পরিষ্কার। আমরা এরূপ পত্রিকার দীর্ঘায়ু কামনা করি।"—১৮ই পৌষ, শুক্রবার, ১২৯৮।

সারস্বত পত্র ;—"সাহিত্য।—মাসিকপত্র ও সমালোচনা। কলিকাতা, ২৫নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন হইতে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। এই পত্রিকাখানি কিঞ্চিৎ অধিক ছয় ফর্ম্মা আকারে মাসে মাসে প্রকাশিত হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে উচ্ছ্বাস ও যে নূতন তরঙ্গ উঠিয়াছিল, জানি না কোন্ দৈবদুর্বিপাকে, কি নিদারুণ গ্রহ-বৈগুণ্যে অকালে তাহা থামিয়া গিয়াছে। এখন সে বঙ্গদর্শনও নাই, সে বান্ধবও নাই, সে আর্য্যদর্শনও এখন অতীতের পুরাতন কক্ষায়

নহে, বরং বেশী, তথাপি বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের কথা যে, একখানি পত্রিকাও বঙ্গদর্শন কি বান্ধবের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই শোচনীয় দুর্দ্দিনে, এই মেঘাচ্ছন্ন আকাশে, আজি আমরা 'সাহিত্যে' সাহিত্যের জ্যোতিঃ দেখিয়া সুখী হইয়াছি। এবং ভবিষ্যতের জন্য আশা করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে। 'সাহিত্যে' বাঙ্গালার অনেক প্রসিদ্ধনামা লেখক লেখনী ধারণ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গ্রাডুয়েট, আগ্রহ-সহকারে বাঙ্গালায় প্রবন্ধ লিখিয়া 'সাহিত্যের' কলেবর পুষ্ট করিতেছেন। ইংরেজী-অভিজ্ঞ সম্প্রদায় যাবৎ বাঙ্গালায় প্রবন্ধলেখা গৌরবের কথা মনে না করিবেন, যাবৎ ইংরেজী-অভিজ্ঞ সম্প্রদায় উৎসাহের সহিত বাঙ্গালা গ্রন্থাদি পাঠ করিতে ইচ্ছুক না হইবেন, তাবৎ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি হইবে না, সাহিত্য-প্রকাশকের যত্নে আজ কিয়ৎপরিমাণে এই অবস্থার অনুকূল কর্ম্ম হইতেছে দেখিয়া, আমরা ভবিষ্যতের জন্য আশান্বিত হইতেছি। পত্রিকা খানি উৎকৃষ্ট কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত হই-তেছে। ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ও মধুর। বিষয়গুলি সারগর্ভ ও চিত্ত আকর্ষক। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে 'সাহিত্য'কে বর্ত্তমান বাঙ্গালা মাসিকপত্রনিচয়ের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত।"—১২ই পৌষ, ১২৯৮।

সোমপ্রকাশ;—"সাহিত্য—মাসিকপত্র ও সমালোচন। উক্ত কয়েক খণ্ড মাসিক পত্র পাঠে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। সাহিত্যসমাজে "সাহিত্য" দ্বারা যে অনেক উপকার সাধিত হইবে, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। এ মাসিক পত্রখানি যে একখানি প্রধান শ্রেণীর মাসিক পত্র হইবে, তাহা এই কয়েক খণ্ড পাঠ করিয়াই অনুমান করিতে পারা যায়। বাঙ্গালার কয়েক জন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকগণ সাহিত্যে লিখি-তেছেন। আমরা আশা করি, নবীন সহযোগী দীর্ঘজীবন লাভ করিবেন এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবেন।"—২৯শে অগ্রহায়ণ, ১২৯৮।

পৃথিবী;—"সাহিত্য।—মাসিক পত্রিকা। ২৫নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সহরে মফঃস্বলে ২৲ টাকা মাত্র। আমরা সাহিত্যের ৩য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুযোগ্য দৌহিত্র বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সাহিত্য সম্পাদক এবং তদীয় পুণ্য ভবনই সাহিত্যের কার্য্যালয়, সুতরাং সাহিত্য যে বাঙ্গালা সাহিত্যকাননে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সুন্দর হইয়াছে। 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনী'ও সাহিত্যকে আরও অলঙ্কৃত করিয়াছে। বাঙ্গালার কৃতী সুলেখকগণ সাহিত্যের সেবক ও উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সম্পাদকতা-ভার সমর্পিত; সুতরাং আশা আছে, 'সাহিত্য' দীনহীন বঙ্গসাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে সফলকাম হইবে। আমরা সাহিত্যের দীর্ঘজীবন কামনা করি।"—১০ই অগ্রহায়ণ; ১২৯৮।

পৃথিবী;—"সাহিত্য।—এবারকার সাহিত্য পাঠে আমরা বড়ই তৃপ্ত হইয়াছি। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী' শীর্ষক প্রবন্ধ বড়ই উপাদেয় হইয়াছে। দেশীয় মহিলারা এরূপ সারবান ও চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ লিখিতেছেন, ইহা গৌরবের সামগ্রী বটে। এতদ্ভিন্ন 'ঈশার পুনরাবির্ভাব,' 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি প্রবন্ধও দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে। এক কথায় বলা যাইতে পারে, সাহিত্য কালে বাঙ্গালা-সাহিত্য-কাননের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিবে।"—১৬ই পৌষ, বুধবার, ১২৯৮।

বর্দ্ধমান-সঞ্জীবনী;—"সাহিত্য, মাসিকপত্র ও সমালোচন। কলিকাতা ২৫নং বৃন্দাবন মল্লিকের লেন হইতে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। এই মাসিক পত্রখানির ছাপা ও কাগজ বড় সুন্দর; কিন্তু বাহিরের চাক্‌চিক্যই ইহার প্রশংসার বিষয় নয়। ইহার লেখকগণ মধ্যে বাবু চন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, প্রভৃতি কয়েক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক আছেন। যে সকল প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই সুপাঠ্য। ইহাতে প্রায়ই উচ্চ দরের প্রবন্ধ সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার ভাষাও সুললিত ও সুমিষ্ট। ইহা একখানি বঙ্গ-সাহিত্যের আদরের ও গর্ব্বের বস্তু। ইহার উন্নতি আমরা একান্ত প্রার্থনা করি।"—২০শে মাঘ, ১২৯৮।

প্রতিকার;—"বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' সাহিত্য-জগতে উপযুক্ত সম্মান লাভ করিতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। বঙ্গ-সাহিত্যের দুরদৃষ্টবশতঃ বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শনের অদর্শন ঘটিয়াছে, জ্ঞানাঙ্কুর অঙ্কুরেই শুখাইল, প্রচারের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হইতে না হইতেই শেষ হইয়া গেল। নবজীবনও জীবনহারা, কেবল নব্য-ভারত বিদ্যমান। এ দুর্দ্দিনে "সাহিত্যের" ন্যায় উচ্চ শ্রেণীর মাসিকপত্র দেখিয়া প্রকৃতই আমাদের আশার সঞ্চার হইয়াছে। সাহিত্যপরিচালনের ভার উপযুক্ত হস্তেই ন্যস্ত, কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ই তাহার পরিপোষক, সুতরাং তাহার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি আশা করা অন্যায় হইবে না।" * * *—

নব্যভারত ;—"সাহিত্য।—মাসিক পত্রিকা, শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত। পত্রিকাখানির বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। 'সাহিত্যের' এই দ্বিতীয় বৎসর। সুরেশ বাবুর চেষ্টা ও শক্তিকে শত শত ধন্যবাদ। বহু লেখক এই পত্রিকায় লিখিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সকলে যদি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন, সাহিত্যের কলেবরে কুলাইবে না বলিয়া আশঙ্কা হয়। যাহা হউক, সাহিত্য যেরূপ দক্ষতার সহিত মাতৃসেবা করিতেছেন, আশা করি, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"—৯ম খণ্ড—১১শ সংখ্যা।

পরিচারিকা ;—"সাহিত্য—ইহা একখানি মাসিকপত্রিকা, স্ত্রী পুরুষে ৬৬ জন ইহার লেখকশ্রেণীভুক্ত। পত্রিকাখানি যে কেবল দৃশ্য মনোহর, তাহা নহে ; ইহার ভাষা অতি বিশুদ্ধ এবং মিষ্ট, পড়িলে শ্রান্তি বোধ হয় না। স্বর্গগত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র কর্ত্তৃক ইহা সম্পাদিত। এই পত্রিকার কয়েক খণ্ড আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তজ্জন্য সম্পাদক মহাশয়কে ধন্যবাদ। গত মাসের পত্রিকা পাঠে আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। সম্পাদকের লিখিত 'মেঘদূত' কাব্যের সমালোচনাটি অতীব সুপাঠ্য হইয়াছে। ইহাতে সমালোচকের লিপি-চাতুর্য্য, রসগ্রাহিতা, কাব্যরুচি এবং কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেল। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে লেখককে বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া নিজে ঘরে বসিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার ফল ফলিয়াছে। আশা করি, এই পত্রিকা খানি উক্ত মহাত্মার মুখ উজ্জ্বল করিবে। শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর উৎকৃষ্ট রচনার কিয়দংশ স্থানান্তরে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। মাতৃভাষার উন্নতির গতি অবধারণ এবং তাহার প্রকৃত সমালোচনা করিয়া, বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন পূর্ব্বক 'সাহিত্য' দীর্ঘজীবী এবং দিন দিন হৃষ্টপুষ্ট হউন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।" —আশ্বিন, ১২৯৮। ১৪ খণ্ড—৬ সংখ্যা।

ধর্ম্মপ্রচারক ;—"আমরা সাহিত্য-নামক নবপ্রকাশিত মাসিক পত্র দুই খণ্ড উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ইহার সম্পাদক। উপযুক্ত লোকের হস্তেই সম্পাদন-ভার অর্পিত হইয়াছে। বঙ্গের প্রধান প্রধান লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ ইহাতে লিখিয়া থাকেন। নানাবিধ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। কালে ইহা একখানি প্রথম

সাহিত্য-কল্পদ্রুম ;—

* * * 'সাহিত্য' বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্রের কলঙ্ক দূর করিয়াছে। চতুর্থ বর্ষের 'প্রচার' ব্যতীত আর কোন পত্রিকাই এরূপ উৎকৃষ্ট ছাপায় কখন প্রকাশিত হয় নাই। ইহার ছাপা, কাগজ ও প্রবন্ধাদি সাজাইবার প্রণালী দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। বাঙ্গালী দ্বারা মুদ্রণের এতটা উন্নতি দেখিয়া বাস্তবিক আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। ইহার জন্য মুদ্রাকর ও সম্পাদক, উভয়েই প্রশংসার্হ। 'সাহিত্যে' যে সকল লেখক লেখিকা লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রশংসা আর কি বলিয়া করিব? যাঁহারা আজকাল বাঙ্গালা ভাষার প্রধান সেবক, যাঁহাদিগের লেখা লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্য-জগৎ আজকাল গর্ব্ব করে, সেই সকল প্রথিত-নামা, গূঢ়বুদ্ধি প্রাচীন লেখকগণ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নব্য কৃতবিদ্য অনেকগুলি রত্ন, ইহাতে লিখিবার জন্য স্বীকৃত হইয়াছেন। * * * এ পর্য্যন্ত যতগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকগুলি সুখপাঠ্য সৎ-প্রবন্ধ আছে। সম্পাদক মহাশয় সম্পাদকতায় দক্ষ বলিয়া আমরা আশা করি, 'সাহিত্য' কালে প্রথমশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইতে পারিবে। 'সাহিত্য' সকলের নিকট আদৃত হইয়াছে দেখিয়া বড়ই প্রীতি হইল। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।"—২য় বর্ষ ; ৭। ৮ সংখ্যা ; ১২৯৮।

সুলভ দৈনিক ;—"পুণ্য শ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের মা-বাপ ছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এই মাসিক পত্রের সম্পাদক। তাঁহারই পবিত্র ভবন এই পত্রের কার্য্যালয়। যথার্থ পাত্রে, যথার্থ স্থানে ও যথার্থ সময়ে, বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ সেবা চলিতেছে। এখন এই মাসিক পত্রের নাম 'বঙ্গসাহিত্য' রাখিলেই যথার্থ নামকরণ হইবে।"—২১শে কার্ত্তিক, ১২৯৮।

সম্বলপুর হিতৈষিণী ;—"সাহিত্য-নামক খণ্ডিয়ে বঙ্গলা মাসিক পত্রিকা অনেক দিনরু আস্তেমানে বিনিময়স্বরূপ পাই আসুঅছুঁ। বর্ত্তমান সাহিত্যের দ্বিতীয় ভাগ দ্বাদশ সংখ্যা আস্তমানঙ্কর হস্তগত হোইঅছি। পত্রিকার কলেবর বৃহৎ, কাগজ অত্যুত্তম, ছাপা অতি সুন্দর। লেখা গবেষণাপূর্ণ, মূল্য সুলভ। পুনশ্চ, এহি পত্রিকা খণ্ডি রীতিমত প্রকাশিত হেউঅছি। লেখকপদরে অনেক যোগ্য স্ত্রী পুরুষ নিয়োজিত হোই অছন্তি। আস্তেমানে এহি পত্রিকার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করুঅছুঁ।"—৩০শে [illegible]

HOPE ;—"We have to make an apology to the publisher of the Bengali monthly magazine 'SAHITYA' for not having noticed it so long. The get-up as well as the contents of the Magazine are of superior order. The publisher has been fortunate enough to secure the help of all the prominent Bengali writers of the day, and with their help he will, we are sure, be able to make his magazine take its rank among the first-class periodicals of Bengal. One interesting feature of the Magazine is that the publisher has induced a number of our University graduates to write for it. The cultivation of Bengali literature by Young India is certainly a happy sign, and the growing literary excellence of the magazine is a proof that the worker and the field are not ill-suited for each other, as used to be supposed."—13.—12.—91.

INDIAN MASSENGER ;—"SAHITYA : a Bengali monthly edited by Sures Chandaa Samajpati. We have been receiving this Bengali periodical regularly for some months past. Its 'get up' is excellent, better than all its older rivals. It is being ably conducted. we are glad to see that along with some well-known Bengali writers many graduates have been contributing to its pages. Liberality of spirit marks many of the editorial utterances."—10.—1.—92.

Indian Nation.—SAHITYA, a Bengalee literary magazine issud every month, edited and published by Babu Suresh Chunder Samajpati It is one of the best of its kind. It yields to none in the quality of its articles and deserves encouragement. —1. 2. 72.

Amria Bazar Patrika ;—"SAHITYA—a Bengalee Monthly Magazine Vol 11, No. 8. Agrahayana, 1298. The present number furnishes, as usual, a good deal of instrvctive and delightful reading. Among others, Babu Chandra Nath Bose M. A. Rabindra Nath Tagore, Rajani Kant Gupta, Chandra-Sikhar Mnkerjee and Nagendra Nath Gupta have written in the nnmber before us. We commend Babu Chandra Nath's thoughtful article on "Food" to our young men. The several short poems are all well written. We need hardly speak of the excellent get-up of the magazine ; in this respect, it has also throughout maintained a high place among Bengalee periodical publications."—17.—12.—91.

Indian Mirror ;—"SAHITYA : We have before us the Poas and the Magh numbers of the above named literary magazine. In an article, written tn the former number by Babu Rabindro Nath Tagore, the style and mode of reasoning of the so called "antiquarians" are very amusingly taken off. In the latter number, appears an interesting account of Jeypore and Amber. The Sahitya seems to be getting on very well so far ... concerned

লাল কুয়র।

স্ত্রীজাতি গৃহকর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করে, পুরুষের সে ইচ্ছা নাই। কিন্তু ইতিহাসে এমন কোন প্রধান ঘটনা দেখা যায় না, যাহাতে স্ত্রীলোকের কোন হাত নাই। হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে কোমল হস্ত দ্বারা স্ত্রীলোকে যে কত রাজত্ব গড়িয়াছে ও ভাঙ্গিয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। দেশের প্রথা অনুসারে এ নিয়মে কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় না। অবরোধবাসিনীর যেমন ক্ষমতা,স্বচ্ছন্দচারিণীরও সেইরূপ ক্ষমতা। মোগল সাম্রাজ্যে পর্দ্দানশীন বেগম ও রাণীগণ অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও ক্ষমতা-শালিনী ছিলেন। তাঁহাদের বুদ্ধিবলে ও কৌশলে কতবার মোগলেরা ঘোর বিপদ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের চক্রান্তে অনেক বার অনেক বিপদও ঘটিয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে দুই জন স্মরণীয়। এক জন মোগল সৌভাগ্যের মধ্যাহ্ন-সূর্য্যস্বরূপ,আর এক জন সাম্রাজ্যনাশের অন্ধকার রাত্রিস্বরূপ। এক জন জগদ্বিখ্যাত সুন্দরী, মহৎস্বভাব, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী; আর এক জন সামান্যা, নীচস্বভাব, মন্দবুদ্ধি; একজন সম্ভ্রান্তবংশীয়া, আর এক জন কুলটা; এক জন শিল্পকুশলা, আর এক জন নর্ত্তকী; এক জন নূর-জাহান, আর এক জন লাল কুয়র; এক জন জাহাঙ্গিরের সাম্রাজ্ঞী,আর এক জন জাহান্দর শাহের উপপত্নী।

জাহান্দর শাহ আলমগীর আরঙ্গজেবের পৌত্র ও বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইতিহাসে বাহাদুর শাহের পর ফিরোকসায়েরের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু জাহান্দর শাহ কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। লাল কুয়রের জালে জড়িত না হইলে, আরও কিছুদিন সিংহাসনের অধিকারী থাকিতেন। তাঁহার ও তৎসঙ্গে মোগল রাজবংশের অধঃপতনবৃত্তান্ত, মীর গোলাম হুসেন খাঁ প্রণীত সইয়র-উল-মতাখেরীন নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

বাহাদুর শাহের জীবিতাবস্থায়,তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মইজুদ্দীন মুলতান প্রদে-শের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে, তাঁহার অন্যতর পুত্র

মইজুদ্দীন প্রথমতঃ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই, পরিশেষে খ্যাতনামা জুলফিকর খাঁ ও তাঁহার পিতা আসদ খাঁর সাহায্যে ও উত্তেজনায় যুদ্ধে সম্মত হন। যুদ্ধক্ষেত্রেও লাল কুয়র তাঁহার সঙ্গিনী। হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নর্ত্তকী রাজপুত্রের সহিত যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিল। জুলফিকর খাঁ না থাকিলে, মইজুদ্দীন কখন যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিতেন না। যুদ্ধে জেহান শাহের মৃত্যু হয়। সেই রাত্রে সুলতান মইজুদ্দীন অতিরিক্ত সুরাপানে এরূপ উন্মত্ত হন যে, পরদিবস কোনমতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় না। এই কথা শ্রবণ করিয়া, মইজুদ্দীনের আর এক ভ্রাতা তৎক্ষণাৎ যুদ্ধসজ্জা করিলেন। জুলফিকর খাঁ দেখিলেন, মইজুদ্দীনকে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত না দেখিলে সৈন্যগণ নিশ্চিত নিরুৎসাহ ও ভীত হইবে। কালবিলম্ব না করিয়া, জুলিফিকর খাঁ মইজুদ্দীনকে আনয়ন করাইয়া হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন। মইজুদ্দীন নগ্নশির, স্খলিতবসন, জ্ঞানশূন্য, কি হইতেছিল— কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। অপর রাজপুত্র পরাজিত ও নিহত হইলেন। আপাততঃ দিল্লীর সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইল। মইজুদ্দীন জাহান্দরশাহ নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন।

আর যতই দোষ থাকুক, জাহান্দর শাহ অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। আসদ খাঁ উকীল-ই-মুৎলক, অর্থাৎ সম্রাটের প্রতিনিধি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। জুলফিকর খাঁ প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু বাদশাহ উপপত্নীকে বিস্মৃত হইলেন না। লাল কুয়র, ইমতিয়াজ মহল বেগম উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, ও হস্ত্যারোহণে বাদশাহের পার্শ্বে গমন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। সম্রাটবংশীয় ব্যতীত অন্য কাহারও পূর্ব্বে এ অধিকার ছিল না। লাল কুয়রের প্রতি বাদশাহের আসক্তি এক প্রকার উন্মত্ততা বলিলেই হয়। ইমতিয়াজ মহল বেগমের খুল্লতাত নিয়ামত খাঁ, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহীর সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন, ও বেগমের ভ্রাতা খোশাল খাঁ, সাত সহস্র অশ্বারোহীর নায়ক হইলেন। ইহাতেও বেগমের মনস্তুষ্টি হইল না। তিনি বাদশাহকে বলিয়া, আকবরাবাদের (আগ্রা) শাসনকর্ত্তাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া, সেই পদ খোশাল খাঁকে প্রদান করিবার চেষ্টা করিলেন। নিয়োগপত্র প্রস্তুত হইল। বাদশাহের মোহর রাজমন্ত্রী জুলফিকর খাঁর নিকটে

ইতে সম্মত হইলেন না। পাঁচ সহস্র সারিঙ্গী ও সাত সহস্র তানপুরা নজ-রানা নির্দ্ধারিত হইল। লাল কুয়র যখন সামান্য নর্ত্তকী ছিল, খোশাল খাঁ তখন তাহার সঙ্গে সারিঙ্গী বাজাইত। উজীরের কথায় মর্ম্মাহত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগিনীকে এই অপমানের কথা জানাইল। লাল কুয়র ক্রোধে অস্থির হইয়া বাদশাহকে এই কথা নিবেদন করিল। বাদশাহ উপপত্নীর একান্ত অনুগত, কিন্তু জুলফিকর খাঁ যে উপকার করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃত হন নাই। জুলফিকরকে ডাকাইয়া মৃদুবচনে খোশাল খাঁর কথা উত্থাপন করিলেন, এবং শেষে কহিলেন, "তুমি বিদ্রূপ করিয়া তাহার নিকট এরূপ নজরানা চাহিয়াছ?" জুলফিকর খাঁ গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "জাঁহাপনা! বিদ্রূপ করিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। পুরুষানুক্রমে আমীর ওমরাহগণ আপনার ভৃত্য, রাজ্যশাসনের ভার তাহাদিগের হস্তেই ন্যস্ত থাকে। আপনার পূর্ব্বপুরুষেরাও নর্ত্তক ও গায়ক লইয়া আমোদ করিতেন। পু[illegible]স্বরূপ তাহাদিগকে অর্থ ও [illegible] মাসিক বেতন দিতেন। কিন্তু যখন নর্ত্তক ও গায়কগণ সেনাপতিত্ব ও রাজ্যশাসনের ভার প্রাপ্ত হইতেছে, তখন সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণকে অনন্যোপায় হইয়া নর্ত্তকের ও গায়কের ব্যবসা অবলম্বন করিতে হইবে। সেই কারণে আমি খোশাল খাঁর নিকট কয়েক সহস্র বাদ্যযন্ত্র চাহিয়াছিলাম। দেশ বিদেশে আপনার যত প্রধান কর্ম্ম-চারী আছে, তাহাদিগকে এই যন্ত্রসমূহ প্রদান করিব, কেন না তাহাদের সর্ব্বদাই কর্ম্মচ্যুত হইবার সম্ভাবনা এবং কর্ম্মচ্যুত হইলে তাহাদের [illegible] জীবিকার এই একমাত্র উপায়।" বাদশাহ লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। সুবা আকবরাবাদের শাসনভার লাল কুয়রের ভ্রাতার হস্তগত হইল না।

প্রথম অবস্থায়, অর্থাৎ লালকুয়র যে সময় সামান্য নর্ত্তকী ছিল, জাহারা নামক রমণীর সহিত তাহার অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য ছিল। জাহারা রাজপথে ফল-মূল বিক্রয় করিয়া জীবনযাপন করিত। লাল কুয়র জাহারার সহিত দোগানা (সপত্নী) সম্পর্ক পাতাইয়াছিল। লাল কুয়রের যখন অদৃষ্ট ফিরিল, জাহা-রাও সেই সঙ্গে ফাঁপিয়া উঠিল। তাহার অনুচরবর্গের সংখ্যা, শ্রেষ্ঠ ওমরাহ-দিগের তুল্য হইল। জাহারা সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, অনু-চরগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া, দুর্গের মধ্যে লাল কুয়রের সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিতে যাইত। অন্তঃপুরে বেগমদিগের মহলের পার্শ্বেই লাল কুয়রের মহল। জাহারা বরাবর সেই স্থানে গিয়া অবতরণ করিত। বেগম ও বাদশাহজাদীগণ

ব্যতীত আর কাহারও সে পর্য্যন্ত যানারোহণে যাইবার অধিকার ছিল না। জাহারা এবং তাহার অনুচরদিগের দৌরাত্ম্যে লোকে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। এক দিন চিন খালিচ খাঁ নামক একজন আমীর লোক জন সমভিব্যাহারে রাজপথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। আরঙ্গজেবের রাজ্যকালে চিন খালীচ খাঁ বাদশাহের সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিষয় কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া পণ্ডিত ও জ্ঞানী পুরুষদিগের সহিত কালাতিপাত করিতেন। সেই পথ দিয়া জাহারা লাল কুয়রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া চিন খালীচ খাঁ অনুচরদিগকে পথ ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। জাহারার অনুচরগণ পথে কাহাকেও দেখিলেই অপমান করিত। চিন খালীচ খাঁর অনুচরদিগকেও তাহারা বিদ্রূপ করিতে লাগিল; কিন্তু সেনাপতি আপনার লোকজনকে ঝগড়া করিতে নিষেধ করিলেন। জাহারা এমন সময় আসি[illegible] জিজ্ঞাসা করিল, এত লোক লইয়া কে যাইতেছে। সেনাপতির পরিচয় পাইয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে মুখ বাড়াইয়া সেনাপতিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "চিন খালীচ খাঁ, তুই নিশ্চয় অন্ধ পিতার পুত্র, নহিলে পথ ছাড়িয়া দিতেছিস্ না কেন?" সেনাপতির এরূপ দুর্ব্বাক্য অসহ্য বোধ হইল। তিনি অনুচরদিগকে সঙ্কেত করিবা মাত্র, তাহারা জাহারার ভৃত্যদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। জাহারাকেও গজপৃষ্ঠ হইতে টানিয়া নীচে ফেলিয়া উত্তম মধ্যম করিয়া দিল। লাথি ও কিলের চোটে জাহারার বহুমূল্য পোষাক ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। বাদশাহের উপর লাল কুয়রের ক্ষমতা সেনাপতি বিদিত ছিলেন। বিপদের আশঙ্কা করিয়া তিনি উজীর জুলফিকর খাঁর ভবনে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কখন উজীরের গৃহে গমন করেন নাই। সকলেই জানিত, তিনি কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করেন না। তাঁহাকে দেখিয়া জুলফিকর খাঁ বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। জাহারার সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ ও তাহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, চিন খালীচ খাঁ আনুপূর্ব্বিক যথাযথ বলিলেন। উজীর কহিলেন, "আপনি যাহা করিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আপনি গৃহে গিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন, কোন আশঙ্কা করিবেন না।" সেনাপতি বিদায় গ্রহণ করিলে পর, জুলফিকর খাঁ বাদশাহকে এই মর্ম্মে একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিলেন,

"একজন ওমরাহের মান অপমান সকল ওমরাহেরা তুল্যরূপে অনুভব করে। আপনার চিরানুগত দাসের মানসম্ভ্রম চিন খালীচ খাঁ হইতে অভিন্ন জানিবেন।" এ দিকে জাহারা বাদশাহের প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াই মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া, ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। লাল কুয়র সবিশেষ জানিয়া, জাহারার অপমানে তাহার অপমান হইয়াছে স্থির করিয়া, বাদশাহের নিকট নালিশ করিল। এই অবকাশে জুলফিকর খাঁর পত্র আসিয়া পঁহুছিল। পত্র পাঠ করিয়া বাদশাহের ক্রোধের শান্তি হইল। জুলফিকর খাঁ মধ্যস্থ না হইলে, সম্ভবতঃ চিন খালীচ খাঁর গুরুতর শাস্তি হইত।

লাল কুয়রের ভ্রাতা খোশাল খাঁ ঘোর পাষণ্ড ও দুর্ব্বৃত্ত হইয়া উঠিল। কোন দুষ্কর্ম্মই তাহার বাকি রহিল না। একদিন একটি রূপবতী ভদ্রমহিলা তাহার নয়নপথে পতিত হইল। রমণীর স্বামী উজীর জুলফিকর খাঁর প্রতিবেশী। খোশাল খাঁ নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া ও অনেক মিনতি করিয়া রমণীকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বিফলপ্রযত্ন হইয়া প্রকাশ্যরূপে বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিতে উদ্যত হইল। রমণীর স্বামী জুলফিকর খাঁর নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। উজীর ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; অত্যন্ত কুপিত হইয়া খোশাল খাঁকে ধৃত করিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। খোশাল খাঁ সম্মুখে আনীত হইবা মাত্র তাহার পদতলে বেত্রাঘাতের আদেশ হইল। প্রহারে নর্ত্তকীভ্রাতা মৃতকল্প হইয়া পড়িল। এরূপ কঠিন শাস্তি দিয়াও জুলফিকর খাঁ ক্ষান্ত হইলেন না। খোশাল খাঁকে বন্দী করিয়া সেলিমগড় দুর্গে পাঠাইয়া দিলেন ও খোশাল খাঁর সমুদয় সম্পত্তি ধৃত করিয়া রাজকোষে প্রদান করিলেন।

বাদশাহের অনুমতি গ্রহণ না করিয়াই জুলফিকর খাঁ লাল কুয়রের ভ্রাতাকে শাস্তি প্রদান করেন। ইহার পর বাদশাহে ও তাঁহার বিশ্বস্ত মন্ত্রীর মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হয়। কিন্তু জাহান্দর শাহ ক্রোধ প্রকাশের অবকাশ পাইলেন না। শনিরূপিণী লাল কুয়র হইতে তাঁহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। বাদশাহের দুর্ব্বলতায় ও অক্ষমতায় অনেকেই তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিল। বাহাদুর শাহের পৌত্র ফেরোক সায়ের, সুবে বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন। জাহান্দার শাহ তাঁহাকে ধৃত করিয়া বন্দীরূপে রাজ-

বেহার অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা হুসেন আলি খাঁর শরণাপন্ন হইলেন। হুসেন আলির ভ্রাতা আবছুল্লা খাঁ এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন। সমরানল আবার প্রজ্বলিত হইল। জাহান্দর শাহের একপ্রকার চিত্তবিকার জন্মিয়াছিল। লাল কুয়রই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছিল; রাজকর্ম্মে একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন। জুলফিকর খাঁ তাঁহার একমাত্র বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, কিন্তু কোকলতাশ খাঁ নামক আর এক জন, বাদশাহের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। ইহাদের দুই জনে সর্ব্বদা বিবাদ হইত। তথাপি জুলফিকর খাঁ অসীম উদ্যম ও উৎসাহের সহিত যুদ্ধ-সজ্জা করিলেন। কিন্তু জাহান্দর শাহের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছিল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লাল কুয়রকে লইয়া গোপনে পলায়ন করিলেন। জুলফিকর খাঁ নির্ভীক চিত্তে রণক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন। কিন্তু বাদশাহকে নিরুদ্দেশ দেখিয়া, তাঁহার উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া গেল। বাদশাহ দাড়ি কামাইয়া, হিন্দু সাজিয়া লাল কুয়রকে লইয়া দিল্লীতে পলায়ন করিলেন। দুর্গের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রী আসদ খাঁর গৃহে গমন করেন। ফেরোক সায়ের নিশ্চিত সিংহাসন অধিকার করিবেন জানিতে পারিয়া, আসদ খাঁ জাহান্দর শাহকে বন্দী করেন। ফেরোক সায়েরের আদেশে জাহান্দর শাহের উদ্বন্ধনে মৃত্যু হয়। জুলফিকর খাঁও নৃশংসরূপে নিহত হন। তাঁহার মৃতদেহ হস্তীর লাঙ্গুলে বাঁধিয়া ও জাহান্দর শাহের ছিন্নমস্তক দেহ দিল্লীর পথে পথে প্রদর্শিত হয়। ইতিহাসে লাল কুয়রের আর উল্লেখ দেখা যায় না। জাহান্দর শাহের মৃত্যুর পর, অতুল মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। লাল কুয়র সেই অধঃপতনের পূর্ব্বগামিনী।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কালিদাস ও সেক্ষপীয়র।

(৪)

কালিদাস।

আমরা ইতিপূর্ব্বে জগৎকে বহির্, অন্তর্, বৌদ্ধ ও অধ্যাত্ম, এই চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। আর 'কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার প্রতি-

য়াছি যে, যদি আমরা দেখি, কালিদাসের সাক্ষাতে সমগ্র সৌন্দর্য্যজগৎ অবভাত হয়, বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ ও অধ্যাত্মজগৎ আপন আপন আবরণ বসন ফেলিয়া দিয়া আপনাদের নগ্ন সৌন্দর্য্যস্বরূপ প্রকট করিয়া শোভিত হয়, তবে আমরা অবশ্য মানিব যে, কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী সৌন্দর্য্যদৃষ্টি। আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, বহির্জগতের সমগ্র সৌন্দর্য্যই কালিদাসের সাক্ষাতে প্রতিভাত হয়, বহির্জগৎ বাস্তবিকই আপন আবরণ বসন ফেলিয়া দিয়া আপনার নগ্ন সৌন্দর্য্যস্বরূপ প্রকট করিয়া শোভিত হয়। এ প্রবন্ধে অন্তর্জগতের আলোচনা করিব।

যাহা চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহাই বহির্জগৎ, আর যাহা অন্তরিন্দ্রিয় মনের বিষয়,তাহাই অন্তর্জগৎ; যথা,সুখ দুঃখ,রাগ দ্বেষ ইত্যাদি। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যাহাই অন্তর্জগতের অন্তর্ভূত, তাহাই সুন্দর নহে; শকারের আত্মম্ভরিতা, সয়তানের দেবদ্বেষ অন্তর্জগতের অন্তর্ভূত, অথচ সুন্দর নহে। অর্থাৎ অন্তর্জগতের কতক অংশ—যে অংশ রূপেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাই সুন্দর। এই অংশই কালিদাসের কাব্যের বিষয়, কারণ কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি।

বহির্জগতের মত এই অন্তর্জগৎও অনন্তবিস্তার; বৈচিত্র্যভেদে এই বিস্তৃতির সীমা নাই। একজন জার্ম্মান দার্শনিক বলিতেন যে, দুইটি পদার্থ পর্য্যালোচনা করিলে তাহার মন বিস্ময়রসে আপ্লুত হইত; এক নক্ষত্রখচিত অনন্ত নীলাকাশ; আর এক এই অনন্তবৈচিত্র্যময় মানুষের মন (আমাদের অন্তর্জগৎ)। অন্তর্জগৎ বৃত্তিময়; বৃত্তি মানস বিকার; এই বৃত্তি বৈচিত্র্য ভেদে অনন্ত, তাই অন্তর্জগৎও অনন্তবিস্তার। কিন্তু সকল বৃত্তিই সুন্দর নহে; সুতরাং সকল বৃত্তির উল্লেখ আমরা কালিদাসে পাইব না। যাহা সুন্দর, মধুর, সুকুমার, তাহারই ছায়া কালিদাসের কাব্যে দেখিতে পাইব, কারণ তিনি সৌন্দর্য্যের কবি। সেই জন্য আমরা কালিদাসে উৎকট ঘৃণা, বিকট ক্রোধ, কদর্য্য কাম, জঘন্য লোভ, নৃশংস ঈর্ষ্যা প্রভৃতির উল্লেখ পাইব না; কিন্তু সরল প্রেম, বিমল সখ্য, মধুর স্নেহ, করুণ বিরহ, শান্ত ভক্তির ছায়া পাইব। কালিদাসে ইয়াগোর খলতা, ওথেলোর সংশয়, ক্লডিয়াসের কামিতা, ম্যাকবেথের দুরাশা, রিগনের পিতৃদ্বেষ, রিচার্ডের স্বার্থসন্ধি,

টাইমনের স্বজাতিদ্রোহিতা নাই। কিন্তু বিদূষকের সরসতা, রতির করুণতা, দুষ্মন্তের বিরহিতা, পুরূরবার উন্মত্ততা, উর্ব্বশীর পূর্ব্বরাগ, প্রিয়ম্বদার প্রেম-সখ্য, কাশ্যপের সুতাস্নেহ, শকুন্তলার প্রণয়োচ্ছ্বাস আছে। বিবাহের কথায় পিতার সম্মুখে পার্ব্বতী অধোমুখী হইয়া লীলাকমলের পত্র গণনা করিলেন—এ ব্রীড়ার বর্ণনা আছে। চরণে কুশাঙ্কুর বিঁধিয়াছে বলিয়া, তরুশাখায় বল্কল বাধিয়াছে বলিয়া,শকুন্তলা একবার কৌশলে দুষ্মন্তের দিকে ফিরিলেন—এ প্রেমছলের বর্ণনা আছে। রাম স্পর্দ্ধী আততায়ী পরাজিত শত্রু পরশুরামের চরণ বন্দনা করিলেন—এ বিনয়ের বর্ণনা আছে। গিরিরাজ সপ্তর্ষির আগমনে পৃথিবীর মাটী ছাড়িয়া স্বর্গারূঢ়ের মত আপনাকে কৃতার্থ ভাবিলেন, এ সম্মাননার বর্ণনা আছে। দানবজয়ী দুষ্মন্ত সুরসুন্দরীর স্তুতিগীতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া আপনার ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিলেন, এ অবিকত্থনার বর্ণনা আছে। বালক রঘু পিতার অশ্বমেধ-অশ্ব-রক্ষায় সুরপতি ইন্দ্রকে অবজ্ঞা করিয়া অস্ত্র-ধারণ করিলেন, এ স্পর্দ্ধার বর্ণনা আছে। বিধুর দুষ্মন্ত বিরহ-শয্যাশায়ী, বিপন্নের আর্ত্তস্বর শুনিয়াই বীরদম্ভে ধনু আস্ফালন করিলেন, এ উৎসাহের বর্ণনা আছে। অপরিচিত ঔরষ পুত্রের অঙ্গ-সংস্পর্শে রাজা অমৃতরসে আপ্লুত হইলেন, এ বাৎসল্যের বর্ণনা আছে। নিরপরাধিনী নির্ব্বাসিতা পতি-অন্ত-প্রাণা শকুন্তলা প্রথমস্বামিসন্দর্শনে, অভিমান ভুলিয়া 'জয় আর্য্য-পুত্র' বলিয়া পতিসম্ভাষণ করিলেন, এ প্রেমক্ষমার বর্ণনা আছে। এইরূপ আরও কত বর্ণনা আছে, সকল কথার উল্লেখ সম্ভব হয় না। দুই একটা বর্ণনার একটু বিস্তৃত আলোচনা করি।

পুরূরবা প্রেমপ্রবণ; অনেক সাধনায় প্রিয়তমা উর্ব্বশীকে পাইয়া, বাসনা-অনল নিভিবার পূর্ব্বেই প্রণয়িনীকে হারাইয়াছে। হারাইয়া সংজ্ঞাহীন, তাহার অন্বেষণে কৈলাস গিরি-বন-কুঞ্জ পাতি পাতি করিতেছে। কোকিলের ললিত পঞ্চমে উর্ব্বশীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আশুসমাগম প্রতীক্ষা করিতেছে; ভ্রমরগুঞ্জনে শিঞ্জিনীর রোল শুনিয়া উৎকীর্ণের মত চাহিয়া আছে; কখন হংসের কলনিনাদে নূপুরধ্বনি শুনিয়া সেই দিকে ছুটিয়া যাইতেছে; কখন গজমিথুনের সরস কেলি দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইতেছে; মৃগমৃগীর শৃঙ্গকণ্ডুয়ন দেখিয়া আপনার অদৃষ্টকে নিন্দা করিতেছে; চক্রবাকদম্পতীর প্রেম-অভিনয় দেখিয়া ঈর্ষ্যাকষায়িত চক্ষে চাহিয়া আছে; ফেনবসনা বীচিচঞ্চলা নদীর

কেকারাবী ময়ূরকে, কুসুমখচিত পর্ব্বতকে উর্ব্বশীর তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছে; কখন কাল মেঘে বিদ্যুৎ-উন্মেষ দেখিয়া 'দুষ্ট দানব উর্ব্বশী হরিয়াছে' এই আশঙ্কায় শরাসনে শর যোজনা করিতেছে; কখন ধারাসারে সিক্ত হইয়া, বিরহাকুল প্রাণে কালের সহজ গতি রোধিয়া বর্ষাকালের প্রত্যাদেশ করিতেছে; আবার কখনও পুষ্পিতা অশোকশাখা স্তবকাভিনম্রা দেখিয়া, পীনস্তনী উর্ব্বশী কল্পনা করিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতেছে।

এ বর্ণনা অতি হৃদয়গ্রাহী; কাব্যজগতে ইহার তুলনা বিরল। ভবভূতি মালতীমাধবে ইহার অনুকরণ করিয়াছেন; সে বর্ণনাও অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু কালিদাসের বর্ণনার সহিত তুলনীয় নহে। মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতিতে যে অন্তর, ইহাদেরও তাহাই। সেক্ষপীয়রের ত্রোইলাস্, রোমিও, অ্যানটনী, জীবনের ঘটনাচক্রে এক এক বার পুরুরবার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে,কিন্তু কাহারও বর্ণনা এমন সুন্দর, এমন হৃদয়গ্রাহী নহে।

এক জন প্রেমিক তাহার প্রিয়তমার উদ্দেশে বলিয়াছিল—'তোমারি উপমা প্রিয়ে তুমি এ মহীমণ্ডলে'। কালিদাসের সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। এই পুরুরবার উন্মাদবর্ণনার কালিদাসের মেঘদূতে একটা তুলনা আছে। সে যক্ষরমণীর বিরহবর্ণন। পুরুরবা পুরুষ, যক্ষরমণী স্ত্রী; পুরুষ প্রগল্ভ, বহির্মুখ; স্ত্রীলোক লাজশীল, অন্তর্মুখ। এই কথা মনে রাখিয়া মেঘদূতের বর্ণনা পাঠ করুন।

চক্রবাকবিরহে চক্রবাকীর ন্যায়, প্রিয়বিরহে যক্ষরমণী উৎকণ্ঠিত প্রাণে শিশিরমথিত পদ্মিনীর মত পরিম্লান হইয়াছে। অবিরল রোদনে তাহার চক্ষু ফুলিয়াছে; উষ্ণ নিশ্বাসে তাহার বিম্বাধর বিবর্ণ হইয়াছে; আলুলিত কেশাঁধারে অবরুদ্ধ বিধুমুখ হস্ত-ন্যস্ত রহিয়াছে। যক্ষরমণী কখন স্বামীর কল্যাণে পুষ্পবলি দিতেছে, কখন পিঞ্জরের সারিকাকে প্রিয়ের কথা সুধাইতেছে; কখন তাহার বিরহ-কৃশ প্রতিকৃতি হৃদয়ে অঙ্কিত করিতেছে। কখন মলিন-বসনা প্রিয়নাম-মধুর গীত গাহিতে গিয়া নয়নজলে বীণাতন্ত্রী আর্দ্র করিতেছে। কখন এক একে বিরহের দিন গণিয়া মানসসিদ্ধ প্রিয়সমাগম উপভোগ করিতেছে। কখন উৎকণ্ঠায় নিদ্রা হারাইয়া আধিকৃশা ভূমিশয়নে বিরহশয্যায় অশ্রুমোচন করিতেছে। কখন অসংযত রূক্ষ ধূসর কেশ সরাইয়া নিদ্রায় প্রিয়ের

ধরিয়াছে; শীতল চন্দ্ররশ্মিতে প্রীতি ভুলিয়াছে; অঙ্গের মনোহর আভরণ খুলিয়াছে। তাহার নেত্র অঞ্জনশূন্য; ভ্রূ বিলাসশূন্য; অলক স্নেহশূন্য; জীবন সুখশূন্য।

যাহার বিরহে প্রণয়িনীর এই দশা, সে প্রিয়, অতিদূরে নির্ব্বাসিত হইয়াছে; বিধুর প্রিয়ার উদ্দেশ না পাইয়া, সংজ্ঞাহীন মেঘকে দূত করিয়াছে। তাহার কল্পনা-দূত মেঘের সন্দেশ এইরূপ।

সখি! তোমার সহচর যক্ষ জীবিত আছে; অতিদূর রামগিরি আশ্রম হইতে তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছে; হায়! মানুষের জীবন বিপদবহুল।

আজ বিধির বিধানে সে বহু-দূরে; তাই কল্পনায় তোমায় আলিঙ্গন করিয়া অতি ক্ষীণ সন্তপ্ত দেহে উৎকণ্ঠিত প্রাণে অশ্রুসিক্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে; তোমারও সেই দশা!

সখীর সাক্ষাতে কথনীয় কথাও সে একদিন তোমার মুখস্পর্শলোভে কানে কানে বলিত, আজ সেই শ্রবণপথের অতিদূরে নয়নের অতীত হইয়া উৎকণ্ঠায় লোকমুখে এই সংবাদ পাঠাইল।

প্রিয়ে! লতিকা তোমার দেহের মত সুকুমার; হরিণী তোমার মত চকিতনয়না; শশধর তোমার মুখের মত শোভাময়; ময়ূরপুচ্ছ তোমার কেশের মত মনোহর; নদী-হিল্লোল তোমার ভ্রূভঙ্গের মত চঞ্চল; কিন্তু কোথাও তোমার সমগ্র সাদৃশ্য নাই। যবে ধাতুরাগে শিলায় তোমার ছবি আঁকিয়া (তুমি মানিনী) তোমার চরণ ছুঁইয়া মান ভাঙ্গিতে যাই, অমনি অশ্রু আসিয়া দৃষ্টি রোধ করে, আর তোমায় দেখিতে পাই না। হায়,বিধাতার বিড়ম্বনা! যবে বহুকষ্টে স্বপ্নে দর্শন পাইয়া আকাশে বাহু তুলিয়া তোমায় আলিঙ্গন করিতে যাই—মূঢ় আমি, কোথায় তুমি? আমার দশা দেখিয়া করুণাময়ী বনদেবীরা বিরলে মুক্তাস্থূল অশ্রুপাত করেন। যবে দেবদারু-কিশলয় দোলাইয়া তাহার রসে সুরভিত হইয়া অলকার পবন এদিকে বহিয়া আসে, আমি তাহাকে কতই আলিঙ্গন করি—হয় ত তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে। হায় আমি তোমার বিরহে বিধুর; আমার অতি দীর্ঘ রজনী পলকের মত কাটিবে কেন? আমার রবি কিরণ গুটাইয়া শীঘ্র অস্তমিত হইবে কেন? হায় আমার দুরাশা। তথাপি তোমার দর্শন-আশায় কোনরূপে প্রাণ ধরিয়া আছি। কল্যাণি! তুমিও ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। সুখদুঃখ চিরস্থায়ী নয়।

এমন মধুর ভাব আর কোন কবির কাব্যে আছে কি? আমার মনে আছে, প্রায় ৪ বৎসর হইল, এক ইংরাজি পত্রিকার স্তম্ভে জগতের কাব্যের কোন অংশ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই কথার বহু আন্দোলন হইয়াছিল। এ আন্দোলনে প্রায় সকল ইংরাজ মনীষী (ম্যাথুআরণল্ড, সুইণবরণ্ প্রভৃতি) যোগদান করিয়াছিলেন। আপন আপন রুচি অনুসারে প্রত্যেকেই, সেক্ষপীয়র মিলটন্, স্পেনসার, দান্তে, হোমর, ভারজিল প্রভৃতির এক এক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে কেহই সংস্কৃত জানিতেন না; জানিলে, আমার বিশ্বাস, মেঘদূতের পূর্ব্বধৃত অংশ পরিত্যাগ করিয়া জগতের কাব্য অন্বেষণ করিতেন না। সহৃদয় উলসন্ সাহেব যথার্থ বলিয়াছেন* যে, কি পূর্ব্বতন, কি নূতন, অতি অল্প কবির কাব্যেই এরূপ সুকুমার কোমলতা বা সুমধুর ভাব দৃষ্টিগোচর হয়।

আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়া অন্তর্জগতের সমালোচনার উপসংহার করি। কুমার-সম্ভবের রতিবিলাপ সকলেরই পরিচিত। হরকোপানলে কাম ভস্মীভূত হইলে রতির প্রেমাধার হৃদয় হইতে যে বিষাদগীতির নির্ঝরিণী বহিয়াছিল, কাব্যামোদী মাত্রেই তাহার রসাস্বাদ করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস আর এক পুরুষহৃদয়ের যে করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনাইয়াছেন, আমার মনে হয়, রমণীর বিষাদগীতি অপেক্ষাও তাহা মধুর। সেই ক্রন্দন এইরূপ।

কুসুমের কোমল ঘায় ইন্দুমতীর সুকুমার দেহ এলাইয়া পড়িল; প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে মিশাইয়া গেল। অজ রাজা প্রিয়তমার শবদেহ ক্রোড়ে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 'হায়, কোমল কুসুম স্পর্শের যদি এই পরিণাম, তবে আর কি না বিধাতার বধের অস্ত্র হইবে! অথবা হিমসেকে নলিনী শুকাইয়া যায়, বুঝি সুকুমার হিংসিবার সুকুমার প্রহরণ। না, না; এ মালা-স্পর্শ কি প্রাণহর? কই, হৃদয়ে রাখিলাম আমি ত মরিলাম না? হায়! আমার ভাগ্যে অমৃতও গরল হইল।

আমি ভাগ্যহীন; এ মালারূপী অশনি; তাই আমি তরু অক্ষত রহিয়াছি, আর আমার আশ্রয়িনী লতা বিশীর্ণ হইয়াছে।

প্রিয়ে! শত অপরাধেও ত তুমি আমায় অবজ্ঞা কর নাই; বিনা দোষে আজ আমার সহিত কথার আলাপও পরিত্যাগ করিলে? সুহাসিনি!

* We have few specimens, either in classical or modern poetry, of

আমায় কি শঠ কপট ভাবিয়াছ? তাই চিরতরে লোকান্তরে পলাইলে, একবার মুখের সম্ভাষণও করিয়া গেলে না!

প্রিয়ে! চেতনা হারাইয়া আমি ত আবার সচেতন হইলাম; তোমার চেতনা হইল কই? ধিক্ আমার হতজীবন!

সখি! শ্রমজলকণা তোমার মুখে ভাসিতেছে; তুমি কোথায়? হায় মানবের নশ্বর প্রাণ! কই, কখন মনেও ত তোমার অপ্রিয় করি নাই, তবে কেন ছাড়িয়া গেলে? আমি নামে পৃথিবীর পতি, প্রেমে ত স্বধু তোমারই অধিকার।

সুন্দরি! কুসুমখচিত ভ্রমরকৃষ্ণ তোমার কুঞ্চিত কেশজাল পবনে উড়িতেছে; মূঢ় আমি! আশা হইতেছে বুঝি তুমি ফিরিয়া আসিলে। প্রিয়ে একবার জাগিয়া উঠ; তুমি আলোকরূপিনী, হৃদয়ের এ বিষাদ আঁধার দূর হউক্। হায়! তোমার মধু কণ্ঠস্বর থামিয়া গিয়াছে, আজ ও মুখ ভ্রমর-গুঞ্জনহীন নিমীলিত পদ্মের মত হইয়াছে।

সখি! শশী আবার রজনীর সহিত মিলিত হয়; চক্রবাক-চক্রবাকীর বিরহের অবসান হয়; স্বধুই তোমার আমার বিচ্ছেদে মিলন নাই। হায়! কুসুমশয়নে তোমার সুকুমার দেহে ব্যথা লাগিত, আজ সেই দেহ কঠিন চিতায় সঁপিয়া দিব।

সখি! চিরসঙ্গিনী এই মেখলা যেন শোকাতুরা চিরতরে নীরব হইয়াছে। কোকিলা তোমার মধুর বাণী শিখিয়াছে, কলহংসী তোমার মদালস গতি শিখিয়াছে, মৃগী তোমার বিলোল কটাক্ষ শিখিয়াছে, লতা পবনকম্পনে তোমার বিভ্রম শিখিয়াছে। তুমি স্বর্গে গিয়াছ; আজ তোমার বিরহে কি স্বধু ইহাদের দেখিয়া হৃদয় বাঁধিতে পারিব?

সহকার তরু ও ফলিনীলতার পরিণয় সম্বন্ধ করিয়াছিলে; কই তাহাদের ত বিবাহ দিয়া গেলে না? তোমার যতনের অশোকতরু কুসুমিত হইয়াছে, কই তাহাতে ত তোমার কেশভূষা হইল না? তোমার নিশ্বাসের মত সুরভি বকুলফুলে দু'জনে মেখলা গাঁথিতেছিলাম, তাহা ত সমাপ্ত হইল না!

প্রিয়ে উঠ! আর ঘুমাইও না। সখীরা তোমা-অন্ত প্রাণ; সুকুমার পুত্রটি নিতান্ত শিশু; আমি একান্ত অনুরক্ত; আমাদের অবহেলা করিও

তোমার বিরহে আজ সুখ অস্তমিত হইল; অনুরাগ হারাইয়া গেল; সঙ্গীত নীরব হইল; বসন্ত উৎসবহীন হইল; অলংকার নিরর্থক হইল। শয্যা শূন্যময় হইল। তুমি কি আমার শুধুই স্ত্রী; তুমি সচিব, সখী, শিষ্যা; হায় কৃতান্ত! আর আমার কি রাখিলে!

সুলোচনে! যে মুখে মধুর আসব তুলিয়া দিতাম, আজ কি পরলোকে তাহারই উদ্দেশে অশ্রুসিক্ত জলাঞ্জলি দিব! প্রিয়ে তোমা বিনা অজের আর কি সুখ আছে? আর ত কিছুতে তাহার হৃদয় ভরে না, তুমিই যে তাহার সর্ব্বস্ব!

সেক্ষপীয়রের প্রেম-উন্মাদিনী ভিনাস্ প্রিয়তম অ্যাডোনিসকে হারাইয়া বিলাপ করিয়াছিল। সে বিলাপে কতকটা কৃত্রিমতা, কতকটা আবেশ-হীনতা আছে; সে বিলাপ অজ-বিলাপের মত করুণ মধুর সুন্দর নহে। তুলনা করুন—

'My tongue cannot express my grief for one
And yet,' quoth she 'Behold two Adons dead
My sighs are blown away, my salt tears gone
My eyes are turned to fire; my heart to lead.
Heavy heart's lead, melt at mine eyes' red fire,
So shall I die by drops of hot desire!
Alas poor world! what treasu e hast thou lost
What face remains alive that's worth the viewing
Whose tongue is music now? What canst thou boast
Of things long since or anything ensuing?
The flowers are sweet, their colors fresh and trim
But true sweet beauty lived and died with him.

* * * * *

To see his face the lion walked along
Behind some hedge, because he would not fear him,
To recreate himself when he had sung,
The tiger would be tame and gently hear him.
If he had spoke the wolf would leave her prey
And never fright the silly lamb that day.
When he beheld his shadow in the brook
The fishes spread on it their golden gills

That some would sing, some other in their bills
Would bring him mulberries and ripened cherries.
He fed them with his sight, they him with berries

*   *   *   *   *

Had I been toothed like him (boar) I must confess
With kissing him I would have killed him first
But he is dead and never did he bless
My youth with his : the more am I accurst"
With this she falleth in the place she stood
And stains her face with his congealed blood.
She looks upon his lips and they are pale
He takes him by the hand and that is cold
She whispers in her ears a heavy tale
As if they heard the woful words she told.
She lifts the coffer lids that close his eyes
Where lo ! two lamps burnt out, in darkness lies

Venus and Adonis.

সেক্ষপীয়রে আর এক রোদনের উল্লেখ আছে, সে বিলাপ নহে, আর্ত্তনাদ, পুত্রহারা জননীর গগনভেদী আর্ত্তনাদ। সে রোদন ভিনাসের ক্রন্দন অপেক্ষা অনেক অংশে হৃদয়গ্রাহী, কিন্তু অশ্রু- বিলাপের মত করুণ মধুর সুন্দর নহে।

কন্‌স্টান্‌স্‌ একমাত্র পুত্র আর্থারকে হারাইয়া শাবকহারা বাঘিনীর মত পাগলিনী হইয়াছে।

No, I defy all counsel, all redress
But that which ends all counsel, true redress
Death ! death ! Oh ! Amiable lovely death
Thou odoriferous stench, sound rottenness
Come, grin on me ; and I will think thou smilest
And buss thee as thy wife. Misery's love
Oh ! Come to me !
King Phillip—Oh fair affliction, peace !
Constance.—No No I will not, having breath to cry.
Oh ! that my tongue were in the thunder's mouth
Then with a passion would I shake the world.

*   *   *   *   *

Lies in his bed, walks up and down with me
Puts on his pretty looks, repeats his words
Remembers me of all his gracious parts
Stuffs out his vacant garments with his form.

এক জন কবি বলিয়াছেন যে, কবির জীবনের দুঃখ-ছায়া কাব্যে প্রতিফলিত হয়। প্রবাদ আছে, সেক্ষপীয়র এই বিলাপ লিখিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পুত্র-হারা হইয়াছিলেন। কালিদাসের অজবিলাপও কি কবির চিত্তবৃত্তির প্রতিকৃতি?

বারান্তরে আমরা বৌদ্ধজগৎ ও অধ্যাত্মজগতের আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

উমা-মঙ্গল।

(কবি-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বাবুর শিশুকন্যার ফোটো-দর্শনে এই কবিতা কয়টি রচিত হইয়াছে।)

চিত্রে।

১

একি চিত্র! সৌন্দর্য্যের জাগ্রত প্রতিমা
শোভিছে বালিকা বেশে; লাবণ্য-লহরি
এলান কুন্তল জালে রাজিছে আ মরি!
ফুল্লনেত্রে ফুল্লাধরে একি শ্যামলিমা!
চির বসন্তের রাজ্য-মহিমা-গরিমা
হয়েছে প্রচার আহা শিশুর হৃদয়ে!
রাশি রাশি দৃষ্টি-অলি ও রূপ-নিলয়ে
পড়ে গিয়া; হের দেখ কণ্ঠের ভঙ্গিমা!
জলধি-ভবনে যেন বালিকা কমলা,
এক দৃষ্টে হেরিতেছে, ঝলকে ঝলকে
ঝলসে রতন বিভা! প্রশান্ত, সরলা,
শিশু গৌরী হেরে যেন জলদে চমকে
চপলা আকাশ-বালা; অদূরে শিখিনী
নাচে রঙ্গে; আর্দ্রনেত্র মেনকা জননী!

২

থাক্ মা থাক্ মা তুই কবির শিয়রে,
চির নব, চির উষা, চির জ্যোৎস্না-রূপে!
কবি-কর্ণে বাজে শঙ্খ উৎসব-বাসরে—
ভরে যাক্ মোর গেহ দেহ-গন্ধ-ধূপে!
চির সরলতা তোর, চির মধুরতা,
বাঁধা পড়িয়াছে এই চিত্রের মাঝারে;
ভাগ্যবান আমি, তোর চির প্রফুল্লতা
বিকচ ফুলের সাজি দিতেছে আমারে!
চির হাসি, চির শান্তি, সংসার-নিদাঘে,
মধুর উজ্জ্বল দৃষ্টি আশঙ্কা সন্দেহে,
থাক্ মা থাক্ মা হেথা; দীপ্ত অনুরাগে,
হোক্ চির দুর্গাপূজা-দরিদ্রের গেহে!
কি আনন্দ! চিত্রে বদ্ধ তোর বরতনু;
দেবেন্দ্র-ভবনে যেন চির রামধনু!

৩

অয়ি কন্যা, পেয়েছিন্ কি মহিমা তুই
চিত্রমাঝে! সংসারের শোক তাপ জরা
পশিতে নারিবে তোরে; অজরা, অমরা,
চিরানন্দ-নিকেতনে লো আনন্দময়ি!
ওই তোর তরঙ্গিত কেশের কলাপ,
করিবে আলাপ সদা স্কন্ধ সাথে তোর!
ওই তোর "হেঁসোহার", যেন চন্দ্রচাপ,
নিশি দিন পাবে শোভা গৃহাকাশে মোর,
বিবাহ-রজনী উমা হবে যবে ভোর,
জনক জননী তোর কেঁদে হবে সারা,
কিন্তু মেয়ে, রবি তুই গৃহমাঝে মোর
চির কুমারীর রূপে, রূপের ফোয়ারা!
হবে না এ মুখ ম্লান, হাস্যগীতি বন্ধ;
পর্ব্বে পর্ব্বে পূজা তুই, ত্রিদিব আনন্দ!

পরিচয়।

১

এত দিন কোথা ছিলি পাগলিনি মেয়ে?
বসে আছি তোর ওই আশা-পথ চেয়ে!
সুধাংশুমণ্ডলে তুই, ছিলি কি আনন্দময়ি,
চকোরেরা উড়ে যথা সুধা-সর ছেয়ে?
জ্যোৎস্না-কিরণ মাথে, তুইও তাদের সাথে,
খেলাতে মগন ছিলি গান গেয়ে গেয়ে?
এত দিন কোথা ছিলি পাগলিনি মেয়ে?

২

এত দিন কোথা ছিলি পাগলিনি মেয়ে?
পড়ে আছি তোর ওই আশা-পথ চেয়ে!
অপ্সরার কণ্ঠে যথা, আরক্ত অপরাজিতা,
পারিজাত লতাগুলি উঠে বেয়ে বেয়ে,
তুইও ইন্দ্রাণী-গলে, হেলে দুলে, কুতুহলে,
ছিলি লগ্ন, মগ্ন দেবী তোর স্পর্শ পেয়ে!
এত দিন কোথা ছিলি পাগলিনী মেয়ে?

৩

এত দিন কোথা ছিলি পাগলিনি মেয়ে?
পড়ে আছি এই বিশ্বে তোর পথ চেয়ে!
মনে নাই? তোর সঙ্গে, সপ্ত ঋষি-ধামে রঙ্গে
অরুন্ধতী-পদধূলি মাখিতাম ধেয়ে!
রোহিণী গাহিত গান, মঙ্গল ধরিত তান,
তোর ওই কচি কচি মুখ-পানে চেয়ে!
এত দিন ছিলি কোথা পাগলিনি মেয়ে?

৪

এত দিন ছিলি কোথা পাগলিনি মেয়ে?
আছি পড়ে দুনিয়ায় তোর পথ চেয়ে!
শুনিয়া বেসুরা গান, মর্ম্মাহত মোর প্রাণ;
ফেলেছে ধরার ধূলা প্রাণ-তন্ত্রী ছেয়ে!
বিশ্বে আনো সুরপুর, বেসুরা হউক্ দূর—
পুরাতন সঙ্গী আমি, মোর পানে চেয়ে,
গাও গান কল-তান; লজ্জা কি লো মেয়ে?

কড়াক্রান্তি।

[সুদূরগামিতা]

মুদ্রার বিভাগে অন্য দেশে যত ভাগ বা অংশ দেখিতে পাওয়া যায়, এদেশে তদপেক্ষা অনেক বেশী ভাগ বা অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজিতে পাউণ্ড আছে, শিলিং আছে, পেনি আছে, ফার্দিং আছে—আমাদের টাকা আছে, আনা আছে, পয়সা আছে, কড়া আছে, ক্রান্তি আছে, দন্তি আছে, কাক আছে, তিল আছে। ইংরাজি হিসাবে পাউণ্ড, শিলিং, পেনি, ফার্দিঙ্গের বেশী ধরে না, আমাদের হিসাবে টাকা, আনা, পয়সা, কড়া, ক্রান্তি, দন্তি, কাক, তিল সব ধরে। ইংরাজ এবং অন্যান্য জাতি ক্ষুদ্রতম অংশ ধরে না, ছাড়িয়া দেয়; আমরা ক্ষুদ্রতম অংশ ধরি, ছাড়ি না।

লয়ের কথায় লিখিয়াছি—

"জন্মের পর জন্ম, শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ কঠিন কষ্টকর কঠোর সাধনা করিয়া যাইতেছি—পথ আর ফুরায় না—কবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহা মনে নাই, মনে করিতে গেলে আত্মহারা হইয়া যাই—কবে চলা শেষ হইবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না, ভাবিতে গেলে অভিভূত হইয়া পড়ি। আর সে পথের কষ্টই বা কত! পথের এ পাশে ও পাশে মোহন দৃশ্য, মোহন স্বর, মোহন মূর্ত্তি, মোহন মোহ! অ-হ-হ কি কষ্ট! আমি মোহাচ্ছন্ন, আমার কি কষ্ট! সব ছাড়িয়া, সব ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চলিতেছি—অবিরাম চলিতেছি, অনন্ত কাল চলিতেছি! তাই কি কাহারও, তাই কি কোথাও, একটু দয়ামায়া, একটু কৃপাকরুণা আছে যে একটি যবপরিমিত পথ, একটি মুহূর্ত্তপরিমিত কাল কমিয়া যাইবে! যাঁহাতে মিশিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া যাইতেছি, তাঁহাতেও ত দয়ামায়া নাই, কৃপাকরুণা নাই। তিনি যে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—তোমাতে কণামাত্র জড়ত্ব থাকিতে আমি তোমাকে গ্রহণ করিব না, আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিব না।"

ক্রান্তিটি ছাড়ে না। আপন কক্ষপথে ভ্রমণ করিতে যে গ্রহের যত সময় আবশ্যক, তাহার পলানুপলের কোটি অংশ কম সময়ে সে গ্রহের সেই কক্ষ-পথে ভ্রমণ শেষ করিবার যো নাই। যে নক্ষত্ররশ্মিটির যে গ্রহে পঁহুছিতে যত সময় আবশ্যক তাহার পলানুপলের কোটি অংশ কম সময়ে সে রশ্মিটির সে গ্রহে পঁহুছিবার উপায় নাই। যে বজ্রনিনাদ দুই পলে তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে, সাধ্য কি তাহা দুই পলের কোটি অংশ কম সময়ে তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে? এইরূপ দেখিবে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কড়াক্রান্তিটির ব্যতিক্রম হয় না, যে কোন প্রাকৃতিক ক্রিয়াবল তাহার কড়াক্রান্তিটি বাদ পড়ে না, বাদ পড়িবার যো নাই। আর হিন্দু বলেন যে ধর্ম্মজগতেও কড়া-ক্রান্তিটি বাদ যায় না, স্বয়ং ভগবান কড়াক্রান্তিটিও ছাড়েন না। তাই বুঝি হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানেও কড়াক্রান্তিটি পর্য্যন্ত ছাড়েন নাই, কড়াক্রান্তিটির ভাবনাও ভাবিয়া গিয়াছেন, ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রে রজস্বলা কন্যার বিবাহের বিশেষ নিষেধ আছে, রজস্বলা কন্যার বিবাহের ফল বড় ভয়ানক বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহা কি কেবলই মূর্খতা, কেবলই কুসংস্কার? বিশ্বামিত্রের শিষ্য গালবের গুরুদক্ষিণা দিবার কথা বোধ হয় সকলেই জানেন। * বিশ্বামিত্র দক্ষিণা লইবেন না, গালব দক্ষিণা না দিয়াও ছাড়িবেন না। বিশ্বামিত্র রাগিয়া বলি-লেন, তবে আমাকে শুভ্রবর্ণ শ্যামৈককর্ণ অষ্টশত অশ্ব গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। গালব দরিদ্র, আট শত শ্বেতবর্ণ শ্যামৈককর্ণ অশ্ব পাইবেন কোথায়? তিনি রাজা যযাতির নিকট গমন করিলেন। যযাতি বলিলেন, আমার ধনাগার শূন্য, আমি ওরকম অশ্ব ক্রয় করিয়া দিতে পারিব না, অতএব তুমি এক কাজ কর। মাধবী নাম্নী আমার একটি অতি রূপবতী কন্যা আছে, তুমি তাহাকে লইয়া গিয়া ঐশ্বর্য্যশালী রাজাদিগকে দেও, তাঁহারা মাধবী হইতে পুত্র লাভ করিয়া তোমাকে তোমার অভিলষিত অশ্ব দান করিবেন। গালব মাধবীকে লইয়া গিয়া ইক্ষাকুবংশীয় রাজা হর্য্যশ্বকে দিলেন। মাধবীর গর্ভে হর্য্যশ্বের একটি পুত্র সন্তান হইল। তিনি গালবকে দুই শত শ্বেতবর্ণ শ্যামৈককর্ণ অশ্ব দিয়া মাধবীকে ফিরাইয়া দিলেন। মাধবী পূর্ব্বলব্ধ একটি বরপ্রভাবে আবার কুমারী হইয়া গেলেন। তখন গালব তাঁহাকে আর এক রাজাকে দিলেন। সে রাজাও একটি পুত্র সন্তান লাভ করিয়া গালবকে

দুই শত শ্বেতবর্ণ শ্যামৈককর্ণ অশ্ব সহ মাধবীকে ফিরাইয়া দিলেন। তখন মাধবী সেই বরপ্রভাবে আবার কুমারী হইয়া আর এক রাজার নিকট অর্পিত হইলেন। এই প্রকারে গালবের সমস্ত গুরুদক্ষিণার সংস্থান হইল। মাধবীর কুমারিত্বলাভের অর্থ এই যে কুমারীরই বিবাহ হইতে পারে, যে কুমারী নয় তাহার বিবাহ নাই। কিন্তু শুধু কুমারী বা অবিবাহিতা হইলেই হয় না।

অতএব সেই সর্ব্বলোকপূজিতা সাবিত্রীর কথা শুন। পিতার আদেশে সাবিত্রী সত্যবানকে পতি মনোনীত করিয়াছিলেন। নারদ বলিলেন, এক বৎসর পরে সত্যবানের মৃত্যু হইবে। পিতা কন্যাকে অন্য বর মনোনীত করিতে অনুরোধ করিলেন। কন্যা কহিলেন—"দ্রব্যের অংশ একবার মাত্র নিপতিত হয়; কন্যারে একবারই প্রদান করে; দদানি এই বাক্য একবারই বলে। হে পিতঃ! এই তিন কার্য্য এক একবারই অনুষ্ঠিত হয়। অতএব সত্যবান দীর্ঘায়ুই হউন আর অল্পায়ুই হউন, সগুণই হউন বা নির্গুণই হউন, আমি যখন একবার তাঁহারে পতিত্বে বরণ করিয়াছি তখন তিনিই আমার পতি। আমি কদাপি আর কাহারে বরণ করিব না। দেখুন, কর্ম্ম প্রথমত মন দ্বারা নিশ্চিত, তৎপরে বাক্য দ্বারা অভিহিত ও তৎপশ্চাৎ কার্য্য দ্বারা সম্পাদিত হয়। অতএব আমার মতে মনই প্রমাণ।"* সাবিত্রীর মতে মনের পরিণয়ও পরিণয়, মনের ভিতর যে পতি সে প্রকৃত পক্ষেই পতি। কিন্তু যথাযথ স্থানে অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারা যায় যে রজস্বলা হইলেই স্ত্রীদিগের আসঙ্গলিপ্সা হইয়া থাকে, অন্ততঃ হইবার সম্ভাবনাই বেশী। আর সে আসঙ্গলিপ্সা চরিতার্থ না হইলে স্ত্রীদিগের চরিত্র কলুষিত না হইলেও মন কলুষিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ইউরোপীয়েরা বলিয়া থাকেন যে অবিবাহিতা স্ত্রীদিগকে সাবধানে অপবিত্র ভাব ও বস্তু হইতে দূরে রাখিলে তাহাদের চরিত্র বল, মন বল কিছুই অপবিত্র হইতে পারে না। কিন্তু স্ত্রীদিগকে এমন করিয়া রাখাই একটা বিষম কঠিন কার্য্য এবং লোক-সাধারণের অবস্থা বিবেচনায় তাহাদিগকে এমন করিয়া রাখিতে পারাও এক রকম অসম্ভব। আবার স্ত্রীদিগের শারীরিক উত্তেজনার কারণ তাহা-দের মনের বাহিরেও যেমন থাকে ভিতরেও তেমনি থাকে। রজোদর্শনে শারীরিক যে পরিবর্ত্তন বা পরিণতি ঘটে, অর্থাৎ রজোদর্শন যে শারীরিক

পরিবর্ত্তন বা পরিণতির অভিব্যক্তি আসঙ্গলিপ্সা তাহারই ফল বা অভিব্যক্তি। অতএব শুধু বাহ্য কারণ সম্বন্ধে সতর্ক হইলে চলে না, আভ্যন্তরিক কারণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক। রজস্বলা হইবার পর স্ত্রীলোক অবিবাহিতা থাকিলে শারীরধর্ম্মে তাহার মানসিক বিকার জন্মিতে পারে, নানা পুরুষের চিন্তা তাহার মন অধিকার করিতে পারে। কিন্তু স্বয়ং সাবিত্রী বলিয়াছেন যে মনের ভিতর যে পতি সে প্রকৃত পক্ষেই পতি। অতএব যে অবিবাহিতা রজস্বলার মনে কোন পুরুষ স্থান পাইয়াছে তাহার যদি সেই পুরুষের সহিত পরিণয় না হইয়া অন্য পুরুষের সহিত পরিণয় হয় তবে সে ব্যভিচারিণী। তাহার মনে একাধিক পুরুষ স্থান পাইলে সে যে ব্যভিচারিণী তাহা বলিবার ত প্রয়োজনই নাই। সতীকুলের সাম্রাজ্ঞী বলিয়াছেন 'মনই প্রমাণ'। অতএব মনে যাহাতে ব্যভিচার না হয় তাহাই করা আবশ্যক। মনে যে ব্যভিচার করিতে বা ব্যভিচার চিন্তা করিতে পায় তাহার মনের ধাতটাই যেন ব্যভিচারী রকম বা ব্যভিচারপ্রবণ হইয়া যায়। মনে যে ব্যভিচারিণী তাহার বিবাহও ব্যভিচার। মনের ব্যভিচার নিবারণ করিবার একমাত্র উপায় ব্যভিচারচিন্তার শক্তি ও আসক্তি জন্মিতে পারিবার পূর্ব্বেই বিবাহ। কারণ বিবাহিতা হইলে স্ত্রীর সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা স্পৃহা পতিতে আবদ্ধ বা সংলগ্ন হইয়া যায়—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তও থাকে না বিচরণও করে না। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে রজোদর্শনের পূর্ব্বে স্ত্রীদিগের বিবাহের জন্য এত শক্ত শাসন এত কঠিন ব্যবস্থা। সতীধর্ম্মের কড়াক্রান্তিটুকু পর্য্যন্ত সঞ্চয় করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রে অনার্ত্তবার বিবাহের ব্যবস্থা। হিন্দুর ভগবানও কড়াক্রান্তিটি ছাড়েন না, হিন্দুও কড়াক্রান্তিটি ছাড়েন না। হিন্দুর ভগবানও বলেন, কড়াক্রান্তিটি ছাড়িলে টাকাটি মোহরটিও পাওয়া যায় না; হিন্দুও বলেন, কড়াক্রান্তিটি ছাড়িলে টাকাটি মোহরটিও পাওয়া যায় না। আর আমরা সকলেই জানি সতীধর্ম্মরূপিনী হিন্দুরমণীও বলেন, সতীধর্ম্মের কড়াক্রান্তিটি ছাড়িলে সতীধর্ম্মের টাকাটি মোহরটিও থাকে না।

মনের ব্যভিচারের কথা খৃষ্টধর্ম্মেও আছে। "Whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart"—যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীর প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে সে মনে মনে সেই স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে (মেথিউ—৫, ২৮)। কিন্তু কার্য্যে ও সামাজিক অনুষ্ঠানে খৃষ্টধর্ম্ম

বলম্বীরা মনের ব্যভিচারের কথাটা বড় একটা গ্রাহ্য করেন না। মনের পাপের কথা তাঁহারা কহিয়া থাকেন বটে, তাঁহাদের গ্রন্থেও আছে বটে, কিন্তু সে কথা অবলম্বন করিয়া বা সে কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান গঠিত বা ব্যবস্থিত করেন না। সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁহারা হিন্দুর ন্যায় কড়াক্রান্তি ধরেন না, হিন্দুর ন্যায় বহুদূর গমন করেন না। খাতাপত্রেও তাঁহারা ফার্দ্দিঙ্গে পর্য্যন্ত নামেন না, হিন্দুরা তিলটি পর্য্যন্ত ছাড়েন না। সুদূরগামিতা যথার্থই হিন্দুর লক্ষণ, হিন্দুধর্ম্মের লক্ষণ, হিন্দুত্বের লক্ষণ।

এই কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতার আরো দুই একটি উদাহরণ গ্রহণ কর।

মাধবীর কথার অর্থ, বিধবার বিবাহ নাই। কারণ বিধবা কুমারী নয়। আর সাবিত্রীর কথার যে অর্থ মাধবীর কথারও কার্য্যতঃ সেই অর্থ। অর্থাৎ মনে মনে বহুপুরুষ চিন্তা করিলে সতীধর্ম্মের জ্ঞান ও সংস্কার যেমন হতবল বা শ্লথ হইয়া যায়, কার্য্যতঃ বহুপুরুষের পরিচয় করিলেও সতীধর্ম্মের জ্ঞান ও সংস্কার তেমনি হতবল বা শ্লথ হইয়া পড়ে। অতএব পতিহীনার মন যাহাতে পত্যন্তরগ্রহণের দিকেও না যায় তাহার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। আমাদের শাস্ত্রকারেরা সে উপায় বলিয়াও দিয়াছেন।

> কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্প মূলফলৈঃ শুভৈঃ।
> ন তু নামাপি গৃহ্লীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্ত তু॥
>
> (মনু—৫, ১৫৭)

পতি মৃত হইলে স্ত্রী পবিত্র পুষ্প ফল মূলাদি অল্পাহার দ্বারা দেহ ক্ষীণ করিবে কিন্তু ব্যভিচারবুদ্ধিতে পরপুরুষের নামগ্রহণও করিবে না।

বোধ হয় অন্য কোন ব্যবস্থাপক হইলে 'ব্যভিচারবুদ্ধিতে পরপুরুষের চিন্তা করিবে না' এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন, ইহার বেশী বলিতেন না। কিন্তু মনু হিন্দু ব্যবস্থাপক। তিনি বলিলেন 'ব্যভিচারবুদ্ধিতে পরপুরুষের নামগ্রহণও করিবে না'। অনেকে বলিবেন, মনু বড় বাড়াবাড়িই করিয়াছেন, পরপুরুষের চিন্তাই যেন দোষ পরপুরুষের নাম করাও কি দোষ? আমার বোধ হয়, নাম করাও দোষ। কারণ নামের পিছনে প্রায়ই

থাকে না। নাম করা যথার্থই রোগের লক্ষণ। কুন্দনন্দিনীর সেই সারি-গাঁথা নগেন্দ্র-নগেন্দ্র-নগেন্দ্র-র কথা মনে আছে ত? নাম-রূপ কড়াক্রান্তিটি বড় তুচ্ছ জিনিষ নয়।

আবার নাম করার আর একটি অর্থ আছে। নাম করিতে করিতে কিছু স্পর্দ্ধা জন্মিয়া থাকে, কিছু গা-ঘেষা হইতে ইচ্ছা হয়, একটু মাখামাখি করিবার ঝোঁক হয়। কিন্তু যেখানে স্পর্দ্ধা, যেখানে গা-ঘেষা, যেখানে মাখামাখি সেখানে ভক্তি সম্ভ্রম থাকিতে পারে না। অতএব যাঁহার প্রতি ভক্তি সম্ভ্রম রাখা কর্ত্তব্য তাঁহার নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ না করিলেই ভাল হয়, অর্থাৎ বিনা সম্ভ্রমের প্রণালীই এই। এই প্রণালীতেই ভক্তি সম্ভ্রম রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। আর এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে আচার্য্য, পিতা, মাতা, মন্ত্রদাতা প্রভৃতি গুরুজনের নামটি পর্য্যন্ত গ্রহণ সম্বন্ধে সম্ভ্রমশীল হইবার ব্যবস্থা আছে এবং পাদবন্দনাকালে তাঁহাদের পাদস্পর্শ পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহাও কড়াক্রান্তি বটে। কিন্তু এমন কড়াক্রান্তি ছাড়িয়া না দেওয়াই ভাল। এই কড়াক্রান্তি ছাড়িয়া দেওয়ায় আচার্য্য পিতা মাতা গুরু পুরোহিত সকলেই ত ভাসিয়া যাইতেছেন।

গুরুজনসম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে আর একপ্রকার কড়াক্রান্তির ব্যবস্থা আছে। পিতা ধর্ম্ম পিতা স্বর্গ, মাতা স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী, পিতাই গার্হপত্য অগ্নি, মাতাই দক্ষিণাগ্নি ও আচার্য আহবনীয় অগ্নি, এই তিন অগ্নিই গুরুতর হয়েন *—গুরুজনের এতদনুরূপ যে সকল গৌরব গরিমা আছে অত্যুক্তি বলিয়া তাহা ছাড়িয়া দিলে গুরুজনের গৌরব গরিমার প্রতি আস্তে আস্তে অলক্ষিত ভাবে এতই অনাস্থা হইয়া পড়িবে যে গৌরব গরিমার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের নিগ্রহই নিয়ম হইয়া পড়িবে। অতএব এরূপ কড়াক্রান্তির প্রতিও হতাদর হওয়া ভাল নয়। যেখানে এরূপ কড়াক্রান্তির প্রতি অনাদর সেখানে গুরুজনের প্রতি প্রকৃত ভক্তি সম্ভ্রমের বড়ই অভাব, আত্মাদর বড়ই প্রবল—প্রমাণ, নব্য বঙ্গ।

ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত চরিত্রের বিশুদ্ধতা হয় না। সেই জন্য কামরিপু

---

* পিতা বৈ গার্হপত্যোগ্নির্মাতাগ্নির্দক্ষিণঃ স্মৃতঃ।
গুরুরাহবনীয়স্তু সাগ্নিত্রেতা গরীয়সী ॥

দমন করা সম্বন্ধে সকল শাস্ত্রেই উপদেশ আছে। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে একটু বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি। *

মাতা ভগিনী কন্যা প্রভৃতির সহিতও পুরুষ নির্জন গৃহে বাস করিবে না, যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ একান্ত বলবান হইয়া জ্ঞানবান পুরুষকেও আকর্ষণ করে।

অনেকে এই শ্লোক পড়িয়া মনুর উপর খড়্গহস্ত হইবেন—বলিবেন, তাঁহার নীতিও যেমন নীচ, রুচিও তেমনি জঘন্য। কিন্তু কথিত আছে যে ভগবান শঙ্করাচার্য্যও এক সময় মনুর এই শ্লোকের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছিলেন কিন্তু পরে ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। আর প্রকৃতার্থে এই পাপময় ইন্দ্রিয়পীড়িত সংসারে মনুর বর্ণিত কোন পাপ্‌টা না ঘটিতেছে। কয়েক বৎসর হইল বঙ্গের একটি জেলায় এক ব্যক্তি আপন শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে লইয়া বাটী যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক নির্জ্জন গৃহে বলপূর্ব্বক শ্বশ্রূঠাকুরাণীর ধর্ম্মাপহরণ করিয়াছিল। তবে আর বাকী রহিল কোন্ পাপ্‌টা। আর কোন পাপই যদি বাকী না থাকে তবে তুচ্ছ রুচির অনুরোধে এ পাপটা বা ও পাপটার কথা চাপিয়া না রাখিয়া মানুষকে তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার কথায় সাবধান করিয়া দেওয়াই ত ভাল। হিন্দু-শাস্ত্রকারেরা কড়াক্রান্তিটিও ছাড়িতেন না, কড়াক্রান্তিটিও চাপিয়া রাখিতেন না। চাপিয়া রাখা রোগটা তাঁহাদের একবারেই ছিল না। তাই তাঁহারা কড়াক্রান্তিতে পর্য্যন্ত উপনীত হইতেন। তাই তাঁহাদের এত দূরগামিতা।

অনুসন্ধান করিলে হিন্দুর এই কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতার আরো অনেক প্রমাণ পাইবে। এই জিনিষটা অস্পৃশ্য, এই ব্যক্তিটা অস্পৃশ্য, ইহাকে স্পর্শ করিয়া জলপান করিতে নাই, উহার স্পৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করা অনুচিত, ঐ লোকটার ছায়া মাড়াইলে নাইতে হয়, পত্নীকে পুত্রের মাতা বলা হইবে না পুত্রের প্রসূতি বলিতে হইবে—এইরূপ বহুতর শাসন ও সংস্কারের কতকগুলিতে বিশিষ্ট যুক্তি আছে, আবার কয়েকটিতে কড়াক্রান্তির পরিমাণ কিছু বেশী আছে। অতএব কতকগুলি নির্দ্দোষ, কতকগুলি দোষাবহও বটে। কোন্ গুলি নির্দ্দোষ কোন্ গুলি দোষাবহ তাহার বিচার এ স্থানে করিতে পারি না। কিন্তু এ কথা বলিতে পারি যে তন্মধ্যে যে গুলি অপকার-

জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে সে গুলিও হিন্দুর প্রকৃতিগত কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতারই ফল, আধ্যাত্মিক বাবুগিরি বা অন্য কোন ব্যাধির লক্ষণ বা অভিব্যক্তি নয়।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারা যাইতেছে যে কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতার অর্থ—ঊর্দ্ধদিকেই বল, নিম্ন দিকেই বল, কোন দিকেই কিছুমাত্র ছাড়িয়া না দেওয়া। এই কথাটা উল্‌টাইয়া বলিলেই এইরূপ দাঁড়ায়—ঊর্দ্ধদিকেই বল, নিম্ন দিকেই বল সকল দিকেই সমস্তটা গ্রহণ করা। এক কথায়—কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতার অর্থ, সমস্ত সমুদায় বা সমগ্র গ্রহণ করা বা প্রাপ্ত হওয়া। লয় বা ব্রহ্মে লীন হওয়ারও সেই অর্থ। অতএব লয়বাদেও যে মানসিক প্রকৃতি নির্দ্দেশীকৃত বা অভিব্যক্ত কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতায়ও সেই মানসিক প্রকৃতি নির্দ্দেশীকৃত বা অভিব্যক্ত। এবং লয়বাদও যেমন হিন্দু, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুত্বের লক্ষণ কড়াক্রান্তি বা সুদূরগামিতাও তেমনি হিন্দু হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুত্বের লক্ষণ।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

ঘনশ্যাম দাস।

২

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, লোচনদাস নরহরির শিষ্য; চৈতন্যমঙ্গল লোচনদাসের প্রণীত, চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থের লোচনদাস নরহরিকে আপনার গুরুদেব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

"ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস প্রাণ অধিকারী;
যাঁর পদ প্রেম প্রতি আশ।"
"আমার ঠাকুর শ্রীনরহরি দাস;
এই ভরসায় কহে এ লোচনদাস॥"

লোচনদাস নরহরির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন:—

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর,
সকল সংসারে যশ ঘোষয়ে প্রচুর॥
পিতা যাহার মহামতি শ্রীমুকুন্দ দাস।
চৈতন্য সম্মত পক্ষে মধুর বিশ্বাস॥

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর বৈদ্যবংশজ। লোচনদাস তাঁহারই শিষ্য। আমাদের ঘনশ্যাম নরহরি "বিপ্রকুলজাত", লোচনদাস ইঁহার পূর্ব্বতন। লোচনদাস নরোত্তমের সমসাময়িক। বয়সে তাঁহা অপেক্ষা কিছু কনিষ্ঠ হইবেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশে রাধামোহনের আবির্ভাব হয়। রাধামোহন পদামৃতসমুদ্র সংগ্রহ করেন। পদামৃতসমুদ্রে নরহরি ঘনশ্যামের কবিতা আছে। সুতরাং গীতচন্দ্রোদয় পদামৃতসমুদ্র অপেক্ষা পুরাতন, পদামৃত-সমুদ্র দেখিয়া বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু রচিত হয়।

আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন,
কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন।
যাহার বিগ্রহে গৌর প্রেমের নিবাস,
হেন শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ।
গ্রন্থ কৈলা পদামৃত সমুদ্র আখ্যান,
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান।
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া,
তাহার যতেক পদ সব তাহা লইয়া,
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল,
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল।
এই গীতকল্পতরু নাম কৈনু সার,
পূর্ব্ব রাগাদি ক্রমে বারি শাখা যার॥

পদ কল্পতরু॥

রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুধুরীয় গোবিন্দদাস কবিরাজ গীতামৃত নামে একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। সেখানি গোবিন্দদাসের আপনার লেখাতেই পূর্ণ কি অন্তগুলির মত তাহাতেও রামানন্দ রায়, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দ ঘোষ, গীত গোবিন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতির রচিত গীতগুলির সংগ্রহ হইয়াছিল, বলিতে পারা যায় না। সে গ্রন্থ আমরা দেখি নাই, সেখানি সংগ্রহ হইলে এই সকল সংগ্রহ গ্রন্থকে সময়ানুসারে এইরূপ নির্দ্দেশ করা যায়।

১। গোবিন্দদাস কবিরাজ কৃত গীতামৃত।

৩। রাধামোহন ঠাকুর কৃত পদামৃতসমুদ্র।
৪। বৈষ্ণবদাস কৃত পদকল্পতরু।
৫। পদকল্পলতিকা।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গ্রন্থ সংগ্রহ-গ্রন্থ নহে। নরোত্তমবিলাস দেখিয়া বোধ হয়, গোবিন্দদাসের গীতামৃতসংগ্রহ-গ্রন্থ নহে। তাহা তাঁহার পদাবলীতেই পূর্ণ ছিল।

কত ক্ষণে স্থির হৈয়া কহে সর্ব্ব জন।
গোবিন্দের কাব্য কিছু করহ শ্রবণ॥
শুনি গোবিন্দের কাব্য প্রশংসিলা কত।
কবিরাজ খ্যাতি হৈল সভার সম্মত॥

নরোত্তমবিলাস॥

তথা হৈতে গেলা জীব গোস্বামীর স্থানে।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি সেই খানে॥
একত্র হইল অনেকের দরশন।
ভূমে পড়ি বন্দিলেন সভার চরণ॥
সভে অতি অনুগ্রহ কৈলা এ সভারে।
শ্রীজীব গোস্বামী স্নেহে কহে গোবিন্দেরে॥
এথাকার সংবাদ আচার্য্যে জানাইবা।
নিজকৃত গীতামৃত পাঠাইয়া দিবা॥
অতি অল্প দিনে এই গ্রন্থ সমাধিবা।
লোক দ্বারে পত্রী সহ গ্রন্থ পাঠাইবা॥

নরোত্তমবিলাস॥

নানা রকম পদ পদবলী প্রকাশিলা॥

ভক্তমাল॥

গীতামৃত ভিন্ন গোবিন্দদাস সঙ্গীতমাধব নামক এক খানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে সঙ্গীতমাধব গোবিন্দ পাঠ করেন নাই। ইহাতে বোধ হয়, বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া গীতামৃত সম্পূর্ণ করিয়া, গোবিন্দদাস সঙ্গীতমাধব রচনা করিয়াছিলেন। গীতামৃত সংগ্রহ গ্রন্থ না হইলে, ঘনশ্যাম নরহরির গীতচন্দ্রোদয় সর্ব্বপ্রথম সংগ্রহ গ্রন্থ।

পূর্ব্বোল্লিখিত চারিখানি গ্রন্থ ভিন্ন ঘনশ্যাম নরহরির আর দুই খানি

নরোত্তমবিলাস আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, কিন্তু ভক্তিরত্নাকর এখনও পাই নাই। নরোত্তমবিলাসে নরহরি ভক্তিরত্নাকরের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিরত্নাকরের পরে নরোত্তমবিলাস রচিত হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। নরোত্তমবিলাস পড়িয়া বোধ হয়, নরহরি নরোত্তমের কোন শিষ্যের শিষ্য, নরোত্তম হইতে অনেক অধিক দূরবর্ত্তী নহেন্। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, অনুমান হয়।

নরহরি নরোত্তমবিলাসে বলিয়াছেন,—

শুনিলুঁ প্রাচীন মুখে এ সব আখ্যান।
কিঞ্চিৎ বর্ণিলুঁ এ আস্বাদে ভাগ্যবান॥

ভক্তিরত্নাকরের এইরূপ উল্লেখ নরোত্তমবিলাসে পাওয়া যায়।

এথা এ সকল কথা সংক্ষেপে কহিলুঁ।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ইহা বিস্তারিলুঁ॥

নরোত্তমবিলাস দ্বাদশ বিলাসে সম্পূর্ণ। ইহাতে নরহরির বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এক একটি বিলাসের শেষে "নরোত্তমবিলাস কহয়ে নরহরি" এইরূপ একটি ভণিতা আছে। পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লিখিত চারি খানি গ্রন্থের বা নরহরির আত্মজীবনের কোন পরিচয়, নরোত্তমবিলাসে নাই। ভক্তিরত্নাকর হইতে হয় ত নরহরির সম্বন্ধে অন্য সংবাদ পাওয়া যাইতে পারিবে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

ভারতে ইংরাজ ও রুস।

ভারতবর্ষ হইতে রুসসৈন্য এখনও অনেক দূরে, কিন্তু আক্রমণের আশঙ্কা অনেক দিন হইতে উপস্থিত হইয়াছে। অসাধারণ ক্ষমতাশালী রুসীয় সেনাপতি জেনেরল স্কোবেলেফ প্রথমতঃ ভারতজয়ের কল্পনা উদ্রিক্ত করেন। সেই অবধি সে কথা আর কেহই বিস্মৃত হইতে পারে নাই। রুসিয়া যেমন ধীরে ধীরে মধ্য এসিয়ায় অগ্রসর হইতেছে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের আতঙ্ক ক্রমেই তত বাড়িতেছে। ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তে কোয়েটা হইতে রাওলপিণ্ডী পর্য্যন্ত দুর্গশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি গবর্মেণ্টের কেমন অবস্থা

হইতেছে না। কখনও গিলগিটের দিকে, কখনও পামিরে, কোন সময় কান্দাহারে ও হেরাতের দিকে দৃষ্টি—রুস-ভল্লুকের বিকট মূর্ত্তি কখন কোন্ দিকে উদয় হইবে, সর্ব্বদা সেই ভয়। আর আমরা? আমরা ধর্ম্ম লইয়া, সমুদ্র লঙ্ঘন লইয়া বাদানুবাদ করিতেছি। রুসিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলে আমাদের যে চিন্তার কারণ নাই এমন নহে, কেন না, ইংরাজের রাজ্যনাশের আশঙ্কা, কিন্তু আমাদের সর্ব্বনাশের ভয়। কিন্তু ভয় হইলে কি হয়, আমাদের উলুখড়ের দশা। দেশটা আমাদের বটে, বনের মত গজাইয়া আমরা অনেক দিন হইতে বাস করিতেছি, কিন্তু রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধিলে আমরা উভয় দলের সৈন্য কর্ত্তৃক পদদলিত হইব। যদি রক্ষা পাই ত দাঁড়াইয়া দেখিব, এই পর্য্যন্ত।

প্রথমেই কথা উঠিতেছে যে, রুসিয়া ভারতবর্ষের অভিমুখে আসিলেই যে ভারতবর্ষ জয় করিতে আসিতেছে, এরূপ কেন্ মনে করিতে হইবে? উত্তর, আলেকজাণ্ডার হইতে নাদিরশাহ পর্য্যন্ত যে কেহ আসিয়াছেন, হয় ভারতবর্ষ জয়, অথবা লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে। সৈন্যবল লইয়া কেহ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসে না। পূর্ব্বে যখন রাজা ও বাদশাহেরা হীনবল ছিলেন, তখন যে আসিত, সেই দেশ জয় করিত। এখন ইংরাজের আমলে আফগানিস্থান অথবা তুর্কিস্থান হইতে কোন ভয় নাই, কিন্তু দুর্জ্জয় রুসিয়া হইতে সম্পূর্ণ ভয় আছে। যেমন দেবতা, তেমনি অসুর।

কিন্তু রুসিয়া আসিলেই ভয়ের কারণ কি? কারণ এই যে, ভারতবর্ষ সুশাসিত হইলেও নিষ্কণ্টক নহে। ইংরাজ বিজাতি, ভারতবাসীদিগের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। গবর্মেণ্ট যে সন্দিগ্ধচিত্ত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেশের লোককে দেশরক্ষার ভার হইতে অপসারিত করিয়াছেন। যুদ্ধ হইলে গবর্মেণ্টের সৈন্যবলই একমাত্র রক্ষার উপায়। যুদ্ধের সহিত দেশের লোকের কোন সম্বন্ধ নাই। দেশের লোক ইংরাজের পক্ষ হইলেও অস্ত্রধারণে অক্ষম ও বঞ্চিত। অতএব যুদ্ধকালে রাজার সহায়তা করিতে পারিবে না। এই কারণে রুসোফোবিয়া (Russophobia) নামক রোগের উৎপত্তি, ও এই কারণে রুসিয়া হইতে যে ভয়, তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের স্থিরতা বা দৃঢ়তা নাই।

যে সম্পত্তিটা আমার, পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছি, সেটার

বলে ভোগ দখল করিয়াছি, সেটার উপর কাহারও নজর পড়িলে সহজেই মনে আশঙ্কা হয়। যাহার বিষয়, সে আমার সহায়তা করিবে না, প্রতিকূলতা করিতে পারে, এই ভয় থাকে। ভারতবর্ষের ইংরাজের অবস্থা অবিকল সেইরূপ। এই জন্য দেশটাকে তাঁহারা কেমন করিয়া রক্ষা করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। ভারতবর্ষের সীমান্তে তাঁহারা যেরূপ আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে পদে পদে চিত্তাস্থৈর্য্যের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। দক্ষিণ আফগানিস্থানের দিকে কিছু দিন পূর্ব্বে জেকোবাবাদ ভারতবর্ষের সীমা ছিল; সেনানিবেশ সেইখানেই স্থাপিত ছিল। দ্বিতীয় আফগান সমরের পর ইংরাজেরা বেলুচিস্থানে প্রবেশ করিলেন। কোয়েটা সীমান্ত নির্দ্ধারিত হইল। অগাধ অর্থ ব্যয় করিয়া রেলওয়ে নির্ম্মিত হইল। কিন্তু কোয়েটাতেও গবর্মেণ্ট স্থির হইতে পারিলেন না। চমন পর্ব্বত ভেদ করিয়া সুড়ঙ্গ পথে রেলওয়ে প্রস্তুত হইল। আর এক পদ অগ্রসর হইলেই কান্দাহার। চমন হইতে কান্দাহারের পথ সমতল ও মুক্ত, রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে কোন কষ্ট হইবে না। আমির আবদুররহমান এ প্রস্তাবে নিতান্ত অসম্মত বলিয়াই এ পর্য্যন্ত কান্দাহার পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মিত হয় নাই। কিন্তু আর একবার হেরাতের অভিমুখে রুসের ভয় উপস্থিত হইলেই কান্দাহারে রেল যাইবে। যদি আমির আবদুররহমান ততদিন জীবিত থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয়, তিনিও ইহাতে সম্মত হইবেন। তিনি যদি জীবিত না থাকেন, তাহা হইলে ত কথাই নাই।

ইংরাজে ও রুসে আকাশ জমি তফাৎ। শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, বাণিজ্যে, রাজ্যশাসনে, ইংরাজ সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয়; রুসিয়া বৈষম্যপূর্ণ, রুসিয়ার উন্নতির পথ সঙ্কীর্ণ, রুসিয়া দুরন্ত অসুর বলে বলী। কিন্তু যেখানে জোর যার মুল্লুক তার, যেখানে কৌশলের অপেক্ষা বলের প্রাধান্য, সেখানে ইংরাজ রুসকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। আফগানিস্থানে ইংরাজ ও মধ্য এসিয়ায় রুস তাহার দৃষ্টান্তস্থল। আফগানিস্থানে ইংরাজেরা ছল বল কৌশল সমুদয় প্রয়োগ করিয়াছেন, কিন্তু আফগানদিগের উপর কোন বিশ্বাস নাই। দুই বার যুদ্ধে ইংরাজেরা জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু আফগানিস্থান তাঁহারা অধিকার করেন নাই। আফগানেরা পরাভূত হয় বটে, কিন্তু বশীভূত হয় না। ব্রহ্মদেশ কেমন সহজে ইংরাজের রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল, কিন্তু আফগানিস্থান যেমন স্বাধীন ছিল, সেইরূপ স্বাধীন রহিয়াছে। অবশেষে বৈরভাব ত্যাগ করিয়া

গবর্মেণ্ট মিত্রভাব ধারণ করিলেন। আবদুররহমান ইংরাজের সাহায়তায় আফগানিস্থানের শাসনকর্ত্তা। তিনি কৃতজ্ঞতাপাশে ইংরাজের নিকট বদ্ধ। কিন্তু কেবল কৃতজ্ঞতায় আফগান বদ্ধ হয় না। আবদুররহমান বুদ্ধিমান, নিষ্ঠুর; সতর্ক, বহুদর্শী। আফগানিস্থানে এমন আমীর অনেক দিন দেখা যায় নাই। কিন্তু আফগানদিগের যেমন বুদ্ধি, আবদুররহমানের সেই বুদ্ধিই অধিক পরিমাণে আছে। এই জন্য তাঁহার কৃতজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া গবর্মেণ্ট নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। আবদুররহমানকে লোভ প্রদর্শিত হইল। লর্ড ডফরিণ আমীরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাওয়ালপিণ্ডীতে যে দরবার করেন, তাহার বর্ণনা পাঠ করিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। আমীর যেন বর, তাঁহার দলবল বরযাত্র। লর্ড ডফরিণ কন্যাকর্ত্তা ও ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ কন্যাযাত্র। বরযাত্রেরা যেমন উপদ্রব অত্যাচার বিদ্রূপ করে, আমীরের অনুচরগণ সেইরূপ করিত—প্রচুর আহার্য্য সামগ্রী নষ্ট করিত, ইংরাজদিগকে দেখিলে হাসিত, কিম্বা তাঁহাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিত না, হেলিয়া দুলিয়া পথে পথে বেড়াইত। ইরাজেরা মনে মনে বড় বিরক্ত হইতেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে নীরবে সমুদয় সহ্য করিতে হইত। দরবারে যে দানসামগ্রী সাজান হইয়াছিল, ঠিক বরকে দিবার উপযুক্ত। কলের পুঁতুল, কলের পাখী, জরির পোষাক ইত্যাদি। একটা কলের পাখীতে কে চাবি দিয়া রাখিয়াছিল, যখন লর্ড ডফরিণ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, পাখীটাও ডাকিতে আরম্ভ করিল। শ্রোতৃগণ অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়াছিলেন। আমীর আবদুররহমানের মাসে এক লক্ষ মুদ্রা বরাদ্দ হইল, তাহার পর দুই লক্ষও হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বৎসরে বৎসরে আমীরকে কয়েক সহস্র ভাল বন্দুক উপহার দেওয়া হয়। টাকা অস্ত্র বস্ত্র গবর্মেণ্ট অকাতরে আমীরের কোলে ঢালিয়া দিতেছেন। বিনিময়ে গবর্মেণ্ট এই মাত্র প্রার্থনা করেন যে, আমীর ইংরাজের পক্ষে থাকেন, রুসিয়ার সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখেন। এই ব্যবহারে আবদুররহমান লুব্ধ হইতে পারেন, কিন্তু ভীত হইবেন না। গবর্মেণ্টও মধ্যে মধ্যে তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। এই যে এখন গবর্মেণ্ট লর্ড রবর্ট্‌সকে দৌত্যপদে নিযুক্ত করিয়া আফগানিস্থানে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, আমীর কিছু বিগড়াইয়া উঠিয়াছেন, বাগ মানিতেছেন না। যুদ্ধের কথা [illegible] উঠিয়াছিল। এত মিত্রতা এত বিশ্বাস কোথায় গেল। যদি সমস্ত

হয় ত যে বন্দুকগুলা গবর্মেণ্ট আমীরকে দিয়াছেন, সেগুলা লইয়া আমীর কি করিবেন ?

রুসিয়ার এ সব কোন বালাই নাই। কিছুদিনের কথা, বোখারা হইতে কয়েক জন যাত্রী হজ্ তীর্থ করিতে যাইতেছিল। রুসেরা কেমন,—জিজ্ঞাসা করাতে, দু'টি কথায় উত্তর দিয়াছিল, "উরুস জালিম।" জালিম বলিয়াই রুসিয়ার ভয়ে মধ্য এসিয়া সন্ত্রস্ত। রুসেরা কাহাকেও অর্থলোভ দেখায় না, জোড়া তাড়া দিয়া কাহারও সহিত মিত্রতা রাখিতে চায় না। অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতেছে, যে পথ ছাড়িয়া দেয়, সে রক্ষা পায়, যে গতি রোধ করে, সে বিনষ্ট হয়। টাকা দিয়া অস্ত্র দিয়া রুসিয়া কোন জাতির সহিত সখ্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করে না। রুসিয়ার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মধ্য এসিয়া শাসিত ও বশীভূত হইয়াছে। ইংরাজ কৌশলে বড়, কিন্তু রুসিয়া বাহুবলে বড়। এসিয়াবাসী সকল জাতিই মনে করে, রুসিয়ার মত রণকুশলী জাতি আর নাই। ইংরাজেরাও সেই আশঙ্কায় রুসীয়দিগকে ভারতবর্ষ হইতে সাধ্যমত দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। পঞ্জদেতে যে সময় কয়েক শত আফগানসৈন্য নিহত হইয়াছিল, সে সময় ইংরাজেরা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। শান্তিপ্রিয় মন্ত্রীপ্রবর গ্লাডষ্টোন পার্লামেণ্টের নিকট একাদশ কোটি পাউণ্ড, সমর আয়োজনের নিমিত্ত চাহিয়াছিলেন। পার্লামেণ্ট একবাক্যে তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। যুদ্ধ বাধিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। আমীর ইংরাজের বন্ধু, অতএব আমীরের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলে ইংরাজের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করা হয়, এই কারণ প্রদর্শন করাইয়া, ইংরাজেরা যুদ্ধের উদ্যোগ করেন। সৌভাগ্যক্রমে সেবার যুদ্ধ হইল না। ব্রিটিশ ও রুসীয়ান গবর্মেণ্ট পরামর্শ করিয়া, আফগানিস্থান ও রুস রাজ্যের সীমা সহরদ্দ নির্দ্ধারিত করিলেন। কিন্তু এ সীমাচিহ্ন কত দিন থাকিবে ? যতদিন আমীর জীবিত থাকিবেন, অথবা যতদিন আফগানিস্থানের সহিত গবর্মেণ্টের সখ্যভাব থাকিবে। আবদুররহমানের মৃত্যু হইলেই আফগানিস্থানে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইবে। হয় ত গবর্মেণ্টের সহিত আবার বিবাদ বাধিবে। সেই অবকাশে যদি রুসিয়া সীমা লঙ্ঘন করিয়া আফগানিস্থানের এক খণ্ড অধিকার করে, তাহা হইলে ইংরাজেরা কি করিবেন ? হয় ত দুই চারিখানা কড়া চিঠি লেখা হইবে, একটু তর্জ্জন গর্জ্জন হইবে, যুদ্ধের কথা হইবে, তাহার পর গোল মিটিয়া যাইবে।

আফগানিস্থান ও পামীর হইতে রুসিয়াকে দূরে রাখিবার চেষ্টা বৃথা। ইংরাজের বিপুল সাম্রাজ্যই তাহার প্রমাণ। বলীর সম্মুখে দুর্ব্বল টিকিবে না, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত ইংরাজের অধীন হইল কেন? ব্রহ্মদেশ কেন ইংরাজের করকবলিত হইল? নদী যেমন পথবর্ত্তিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীকে গ্রাস করে, সেইরূপ বলবান জাতি দুর্ব্বলকে গ্রাস করে। ইংরাজের ভারতরাজ্য বিস্তৃত হইয়া চীনরাজ্যের সম-সীমান্ত হইয়াছে। চীনেরা স্বাধীনতাপ্রিয় বলবান জাতি। অতএব ইংরাজের রাজ্য আর বিস্তৃত হইবে না, এমত আশা করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে ইংরাজের রাজ্য যেমন করিয়া বিস্তৃত হইয়াছে, মধ্য এসিয়ার সাম্রাজ্য ঠিক সেইরূপে বিস্তৃত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ইংরাজের বুদ্ধিবল ও সৈন্যবল, রুসিয়ার কেবল সৈন্যবল। ইংরাজের সৈন্যবল তেমন নাই বলিয়াই আফগানিস্থান জয় করিয়াও ইংরাজেরা অধিকার করেন নাই। রুসিয়া অধিক সংখ্যক সৈন্যবল লইয়া স্বচ্ছন্দে আফগানিস্থান অধিকার করিতে পারে। অধিকার যে করিতেই হইবে, এমনও কোন কথা নাই। আবদুররহমান ইংরাজের পক্ষে; তাঁহার উত্তরাধিকারী রুসিয়ার পক্ষে হইতে পারেন। তাহা হইলেই ইংরাজের সমস্ত কৌশল, এত ব্যয়, সব পণ্ড হইবে। ফল কথা এই যে, রুসিয়া ভারতবর্ষের সীমান্তে আসিবেই আসিবে। যে কারণে ইংরাজেরা ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া, চীন সাম্রাজ্যের সীমায় উপনীত হইয়াছেন,সেই কারণে রুসিয়া আফগানিস্থান অথবা পামীর অতিক্রম করিয়া, অথবা উভয় পথ দিয়া, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম দ্বারে উপনীত হইবে। যদি এ সিদ্ধান্ত গবর্মেণ্ট স্থির করেন, তাহা হইলে কতক অমূলক ভয় ও বিস্তর অপব্যয় নিবারিত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের সীমায় রুসিয়া আসিলেই আশঙ্কার কারণ নাই। রুসিয়া ও জর্ম্মনি সম-সীমান্ত, কিন্তু জর্ম্মানির কোন আশঙ্কা নাই। তাহার কারণ, জার্ম্মানি রুসিয়ার অপেক্ষা হীনবল নহে। আরও এক কারণ, ইয়োরোপে Balance of power নামক একটা সামগ্রী আছে। কোন জাতি আর এক জাতিকে আক্রমণ করিলে, সকল জাতির মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। নেপোলিয়নকে ইয়োরোপীয় সকল জাতি মিলিত হইয়া পরাস্ত করে। ক্রিমিয়ায় ইংরাজ ও ফেঞ্চ মিলিত হইয়া রুসিয়ার সহিত যুদ্ধ করে। ১৮৭০

দেয় নাই, তাহার কারণ এই যে, আর কোন জাতির কোন আশঙ্কা ছিল না। ফ্রান্সে ও জর্ম্মানিতে পুরুষানুক্রমে বৈরতার ফল ফলিল। এসিয়ায় এরূপ পরস্পরে সহায়তার কোন আশা নাই। ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীনে থাকে অথবা রুসিয়ার হস্তগত হয়, ইউরোপের অন্যান্য জাতি সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ইংরাজেরা কাহারও সাহায্য পাইবেন না, রুসিয়ার পক্ষেও অন্য কোন জাতি অস্ত্র ধারণ করিবে না। এই জন্য উভয় পক্ষে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন।

যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজেরা যে ভারতবাসীর সহায়তার আশা করেন না, তাহার প্রমাণ তাঁহারা স্বয়ং দিয়াছেন। দেশের লোক নিরস্ত্র, বিনা অনুমতিতে কেহ অস্ত্র রাখিলে দণ্ডার্হ হয়। দেশীয়দিগকে গবর্মেণ্ট ভলণ্টিয়ার হইতে দিবেন না। এ সকল কথা রুসিয়ার অগোচর নাই। যুদ্ধ হইলে ইংরাজের বেতনভুক্ত সৈন্য ছাড়া প্রজা রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে না, রুসিয়েরা তাহা জানে। যে জলন্ত স্বদেশবাৎসল্য রুসিয়ার আছে, যাহার উত্তেজনায় মস্কো মহানগরী অগ্নিসাৎ হইয়াছিল, ও যাহাতে নেপেলিয়নের হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার হইয়াছিল, সে দেশানুরাগ এ দেশে নাই। নিজের হাতে নিজের ঘরে কে এ দেশে আগুন লাগাইতে পারে। ইংরাজ গিয়া যদি অন্য রাজা আসে ত প্রজা যেমন শিষ্ট ভাবে অদৃষ্টের হাতে সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিত আছে, সেই রূপই রহিবে। মারামারি কাড়াকাড়ি আর যেই করুক, আমরা কখন কিছু করিব না। গবর্মেণ্টও আমাদিগকে সেই আদেশ করিয়াছেন। ইহাতে গবর্মেণ্টের দোষ হইয়াছে কি না, সে কথার বিচার করিব না। কিন্তু এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশের লোকের উপর গবর্মেণ্টের যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকিত, দেশের লোক যদি অস্ত্রচালনায় নিপুণ হইত, তাহা হইলে রুসাতঙ্ক অনেকটা কমিয়া যাইত।

রুসিয়া হইতে ভারতবর্ষের কি ভয়, তাহার আন্দোলনে আমাদের কোন ফল নাই; কেন না, সে বিষয়ে গবর্মেণ্ট আমাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না, কিছু জানিতে দেন না, আমাদের সাক্ষাতে কোন কথা প্রকাশ করেন না। কিন্তু গবর্মেণ্টের অপেক্ষা আমাদের চিন্তিত হইবার কারণ অনেক বেশী। তবে রুসিয়ার বর্ত্তমান সম্রাট জীবিত থাকিতে ইংলণ্ড ও রুসিয়ায় যুদ্ধ হইবার বড় আশঙ্কা নাই। স্টেড সাহেব তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে ইয়ো-

তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া, নাইহিলিষ্ট চক্রান্ত হইতে রক্ষা পাইয়া, ইয়োরোপ ও এসিয়ার শান্তিরক্ষা করিতে থাকুন, ভারতবাসীমাত্রেরই ইহা প্রার্থনীয়।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

একটি পত্র।

সুহৃদয়েষু—অল্প দিন হইল, আমি কোন কাব্য সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ কোন কাগজে বাহির করিয়াছিলাম। সেটা পড়িয়া আপনি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার মতে এরূপ লেখাকে রীতিমত সমালোচনা বলা যায় না। আমার বক্তব্য এই যে, আমার সেই লেখাটুকুকে সমালোচনা না বলিয়া আর কোন উপযুক্ত নাম দিলে যদি তাহার ভাবগ্রহণের অধিকতর সুবিধা হয়, আমার তাহাতে আপত্তি থাকিতে পারে না। আমি দেখিয়াছি, সমালোচক অনেক সময়ে নিজের নামকরণের সহিত নিজে বিবাদ করিয়া লেখকের উপর বিরক্ত হইয়া উঠেন। পুত্রমাত্রকেই পদ্মলোচন নাম দেওয়া যায় না—যদি মোহবশতঃ অপাত্রে উক্ত নাম প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, এবং যদি সেই নামধারী দুর্ভাগ্য ব্যক্তি চক্ষুর আয়তির অপেক্ষা নাসার দৈর্ঘ্যের জন্য বিখ্যাত হইয়া পড়ে, তবে তাহার উপর রাগ করা সঙ্গত হয় না।

সমালোচনা বলিতে যদি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি ব্যায়ামপটু দলবল লইয়া কাব্যের অন্তঃপুর আক্রমণ বোঝায়, তবে আমার দ্বারা তাহা অসম্ভব। আমি এইটুকু বলিতে পারি, আমার কাছে কেমন লাগিল। আমি একজন মানুষ, আমার এক প্রকার বিশেষ মনের গঠন; বিশেষ কাব্যপাঠে আমার মনে যে ভাবোদয় হয়, আমি তাহাই প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি—কিরূপ ভাবোদয় হওয়া উচিত ছিল, তাহা আমি নির্ভয়ে সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি না—যিনি বিশেষ কৌশলপূর্ব্বক নিজেকে নিজে লঙ্ঘন করিতে পারেন, যিনি নিজের চেয়ে নিজে বেশি বুঝেন, তিনিই সে বিষয়ে নির্ভুল মত দিতে পারেন।

আমার অনেক সময়ে মনে হয়, ভূমিকা এবং উপসংহার ফাঁদিয়া আগাগোড়া মিল করিয়া বড় বড় প্রবন্ধ লেখা মনুষ্যসমাজে প্রচলিত হওয়াতে

এবং প্রস্থের উপর মানুষের একটি বর্ব্বর অনুরক্তি আছে—এই জন্য প্রায় সকল জিনিষেরই গজে মাপিয়া মূল্য স্থির হয়। এই কারণেই সকল কথা বড় করিয়া বলিতে হয়। কিন্তু সত্য রবারের মত স্থিতিস্থাপক পদার্থ নহে, বরঞ্চ তাহাকে বাড়াইতে গেলেই কমাইতে হয়। খাঁটিকে খাঁটি করিতে হইলে তাহাকে যেমনটি তেমনি রাখিতে হয়, ওজন বাড়াইবার জন্য তাহাতে যতই জল মিশান যায়, ততই তাহার দর কমিয়া আইসে।

একটি কাব্যগ্রন্থ যখন ভাল লাগে, তখন তাহার সম্বন্ধে বেশি কথা বলা কতই শক্ত! ঠিক যেটুকু মনের কথা, তাহা লিখিলে রীতিমত প্রবন্ধ কিম্বা গ্রন্থ হয় না। এই জন্য বসিয়া বসিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, পরিচ্ছেদের উপর পরিচ্ছেদ স্তূপাকার করিয়া, তত্ত্বের উপর তত্ত্ব আকর্ষণ করিয়া, নিজের মানসিক পরিশ্রমের একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া, সেটাকে খু নী উন্নত সত্য বলিয়া মনে হয়। বেশি পরিশ্রমের ধনকে বেশি গৌরবের বলিয়া মনে হয়। মাঝের হইতে যেটি ঠিক সত্য, যেটি আসল কথা, সেটি স্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে।

ঠিক সত্য মানে কি? কাব্যসম্বন্ধীয় সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য নহে। পাঁচ সাত শ প্রমাণ তাহার প্রমাণ নহে। হৃদয়ই তাহার প্রমাণ। আমি যতটুকু ঠিক অনুভব করি, ততটুকু সত্য। অবশ্য শিক্ষা এবং প্রকৃতি গুণে কোন কোন সহৃদয় বিশেষরূপে কাব্যরসজ্ঞ, এবং তাঁহাদের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত সাহিত্যপ্রিয় লোকদের নিকট চিরকাল সমাদৃত হয়। অপর পক্ষে কোন কোন হৃদয়ে কাব্যের জ্যোতি রীতিমত প্রতিফলিত হইবার মত স্বচ্ছতা নাই, কিন্তু যেমনই হউক, কাব্যসম্বন্ধে নিজের নিজের ভাব ব্যক্ত করা ছাড়া আর কিছু সম্ভব হয় না।

কোন কোন ইংরাজ লেখক বলেন, সমালোচনা একটি বিশেষ ব্যবসায়, ইহার জন্য বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক। প্রকৃত সমালোচককে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন করিয়া, নিজের ভাল মন্দ লাগাকে খাতির না করিয়া বিচার করিতে হইবে। অর্থাৎ অকূল পাথারে লেখনী ভাসাইতে হইবে।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না, একজন অশিক্ষিত লোকের যাহা ভাল লাগে, শিক্ষিত লোকের তাহা ভাল লাগে না, এবং অশিক্ষিত লোকের যেখানে অধিকার নাই, শিক্ষিত লোকের সেখানে বিহারস্থল। অর্থাৎ

করিতে পারে না, কিন্তু বহুকাল চাষের গুণে সেই গাছের এমন একটা পরিবর্ত্তন হয় যে, মিষ্ট রস উৎপাদন করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

কিন্তু দুই গাছই একই পদ্ধতি অনুসারে ফল ফলায়। উভয়েই নিজের ভিতর হইতে কাজ করে।

কাব্য-সমালোচনা-সম্বন্ধেও শিক্ষিত অশিক্ষিত নিজের হৃদয় দ্বারা রস গ্রহণ করে, তবে অবস্থা গতিকে হৃদয়ের পার্থক্য জন্মিয়াছে। বিজ্ঞানের মীমাংসাস্থল বহির্জগতে; কাব্যের মীমাংসাস্থল নিজের অন্তর ব্যতীত আর কোথাও হইতে পারে না।

এই জন্য কাব্যসমালোচনা ব্যক্তিগত। চাঁদের আলো পদ্মার বালুচরের উপর পড়িয়া একরূপ আকার ধারণ করে, নদীর জলের উপর পড়িয়া আর [illegible] প ভাব ধারণ করে, আবার ওপারের ঘনসন্নিবিষ্ট বনভূমির ম[illegible] পড়িয়া আর একরূপে প্রতিভাত হয়। চন্দ্রালোকের মধ্যে যে কাব্যরস আছে, ইহাই তাহার তিন প্রকার সমালোচনা। কিন্তু ইহা পাত্রগত, তাহার আর সন্দেহ নাই। তথাপি চন্দ্রালোকের কবিত্ব হিসাবে তিনই সত্য। চন্দ্রালোককে দেশ কাল পাত্র হইতে উঠাইয়া লইয়া, তাহার অতি বিশুদ্ধ নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে হইলে, তাহার কবিত্ব ছাঁটিয়া দিতে হয়। তখন তাহা হইতে কেবল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই সম্ভব।

আরো একটি কথা আছে। বিশেষ কাব্য সম্বন্ধে আমি যে কোন তত্ত্বকথা লিখি, তাহা কালক্রমে মিথ্যা হইবার কোন আটক নাই, কিন্তু আমার কেমন লাগিল, তাহা কোন কালে মিথ্যা হইবার যো নাই। আমি যদি এমন করিয়া লিখিতে পারি, যাহাতে আমার ভাল মন্দ লাগা অধিকাংশ যোগ্য লোকের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারি, তবে সেটা একটা স্থায়ী সাহিত্য হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু আমি যদি একটা ভ্রান্ত মত অধিকাংশ সাময়িক লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারি, তথাপি সেটা স্থায়ী হয় না। মনে করুন, আমি যদি প্রমাণ করিয়া দিই যে, কুমারসম্ভব সাংখ্যমতের একটি সুচতুর ব্যাখ্যা, অতএব তাহা একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য, তবে তাহা বর্ত্তমান কালের স্বদেশবৎসল দার্শনিকবর্গের যতই মুখরোচক হোক, সাময়িক ভাব ও মতের পরিবর্ত্তনকালে তাহার কোন মূল্য থাকিবে না। কিন্তু তাঁহার কাব্যাংশ আমার যে

সুন্দর করিয়া বলিতে পারি, আহা কুমারসম্ভব কি সুন্দর, তবে সে কথা কোন কালে অমূলক হইয়া যাইবে না।

কিন্তু আমি আত্মরক্ষা করিতে গিয়া অন্যকে আক্রমণ করিতে চাহি না। যাঁহারা বুদ্ধি দ্বারা কাব্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া সমালোচনা করেন, তাঁহাদিগকে নিন্দা করি না। যখন মানবহৃদয় হইতে কাব্য প্রসূত, তখন কাব্যের মধ্যে ইতিহাস সমাজনীতি মনস্তত্ত্ব সমস্তই জড়িত আছে বলিয়াই কাব্য ন্যূনাধিক পরিমাণে আমাদের ভাল লাগে; অতএব কৌতূহলী লোকদিগের শিক্ষার জন্য সেগুলিকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেখান দোষের নহে।

শুদ্ধ আমার বক্তব্য এই যে,সমালোচনা কেবলই হাকেই বলে না। কেবল কাব্যের উপাদান আবিষ্কার করিলেই হইবে না; কাব্যকে উপভোগ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। কোমর বাঁধিয়া নহে, তর্ক করিয়াও নহে। হৃদয়ের ভাব যে উপায়ে এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয়ে সংক্রামিত হয়, সেই পদ্ধতিতে অর্থাৎ ঠিক আন্তরিক ভাবটুকু অন্তরের সহিত ব্যক্ত করা। নিজের হৃদয়পটে কাব্যকে প্রতিফলিত করিয়া দেখানো। তালিকার পরিবর্ত্তে চিত্র, তত্ত্বের পরিবর্ত্তে ভাব প্রকাশ করা।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

টেনিস্‌ন।

যে উজ্জ্বল নক্ষত্র ইংলণ্ডের সাহিত্যগগনে অৰ্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া অপূর্ব্ব কিরণালোকে ইংলণ্ডের নরনারীর হৃদয় উদ্‌ভাবিত করিতেছিল, তাহা কালের পূর্ণতায় অস্তমিত হইয়াছে। যাঁহার কবিত্বের উচ্ছ্বাস, সমগ্র ইয়ুরোপভূমি প্লাবিত করিয়া, ভারতীয় কাব্যামোদীদিগের হৃদয়তটে প্রহত হইত, যাঁহার নিত্যনব প্রতিভার পরিচয়লাভার্থ ইংলণ্ডের শত শত নরনারী উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত, তিনি এই নশ্বর জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, বিগত ৬ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার প্রাতে লর্ড টেনিসন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

টেনিসনের জীবনী।

১৮০৯ খৃঃ অব্দের ৬ই আগষ্ট লিন্‌কন্‌শায়রের অন্তঃপাতী এক ক্ষুদ্র গ্রামে

জন গণিতবিৎ, ভাষাতত্ত্বজ্ঞ, সঙ্গীতপারদর্শী, চিত্রকর ও কবি ছিলেন। তাঁহার চরিত্র অতি উদার ও মহান ছিল। টেনিসনের জননীও শান্ত ও মধুর-স্বভাবা, কোমলহৃদয়া, স্নেহময়ী, ধর্ম্মপ্রাণা ও কল্পনা-শক্তিশালিনী রমণী ছিলেন। ফলতঃ, এই রমণী সর্ব্বাংশে কবি-জননীর অনুরূপ গুণে ভূষিতা ছিলেন। জনকজননীর অশেষ গুণ তাঁহাদের সন্তানেও সঞ্চারিত হইয়া ছিল। টেনিসন বাল্যক্রীড়ায় মধ্যযুগের কিম্বদন্তীমূলক বীরকাহিনীর অনুকরণ করিতেন। উত্তরকালে, এই সকল কাহিনী তাঁহার হস্তে সুমধুর কাব্যে পরিণত হইয়াছিল।

বিদ্যাশিক্ষার প্রথম সূচনার পর হইতে, তিনি সে ভার অনেকটা নিজ হস্তেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার চিন্তায় ও চরিত্রে স্বাধীনতার আভাষ পাওয়া যাইত। তাঁহার অগ্রজদ্বয়ও কাব্যানুরাগী ছিলেন; ইহাঁদিগের সাহচর্য্যে টেনিসনের হৃদয়ও কবিতাপ্রিয় হইয়া উঠে। তিন ভ্রাতা একত্রে প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিতেন, ও বহুবিধ কবিতা রচনায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। শুনা যায়, এক দিন তাঁহার পিতামহ শিশু টেনিসনকে মৃত পিতামহীর উদ্দেশে একটি শোকগীতি রচনা করিতে বলেন। কবিতা রচিত হইলে, তিনি প্রীত হইয়া টেনিসনকে দশ শিলিং পারিতোষিক দেন এবং বলেন যে, কবিতা রচিয়া এই তোমার অর্থলাভের সূত্রপাত হইল। এই সময়ে টেনিসন সকল কবির মধ্যে বায়রণকে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি প্রথম বয়সে কাব্যরচনায় বায়রণকেই অনুকরণ করিয়া চলিতেন। ১৮২৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। এ কবিতা জনসমাজে আদৃত হয় নাই। তখনকার সমালোচকগণ টেনিসনের এই নবপ্রকাশিত কবিতা উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

টেনিসন, ১৮২৮ খৃঃ অব্দে ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি সত্বরই সেখানকার প্রতিভাশালী যুবক দলের অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এইখানেই হ্যালাম্, থ্যাকারে প্রভৃতির সহিত তাঁহার চিরসৌহার্দ্দ্যের সূত্রপাত হয়। কলেজের পাঠে উপেক্ষা করিয়া তিনি কল্পনাদেবীর উপাসনায় অধিকতর মনোনিবেশ করিতেন; সুতরাং তাঁহার অদৃষ্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। এই সময়ে কবিতারচনার প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক

১৮৩০ খৃঃ অব্দে টেনিসনের আর একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহার অধিকাংশ কবিতা, রচনার উৎকর্ষে, তাঁহার ভাবী যশের সূচনা করিয়া দেয়। এই সময়ে টেনিসন, প্রিয়বন্ধু হ্যালামকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বদেশবৎসল স্পেনবাসীদিগের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিয়া, স্পেনদেশে গমন করেন। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে তাঁহার তৃতীয় কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক সম্বন্ধে কোনও বিজ্ঞ কবি সমালোচক লিখিয়াছেন যে, এরূপ সুন্দর, মৌলিকতাপূর্ণ গীতিকবিতা ইতিপূর্ব্বে কখনও একত্রে সংগৃহীত হয় নাই।

১৮৩৩ খৃঃ অব্দে টেনিসনের প্রিয়তম বন্ধু হ্যালামের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায়, তিনি প্রথম জীবন-মরণের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উপলব্ধি করেন। তিনি শোকাতুর হইয়া সর্ব্বদা নিভৃতে অবস্থান করিতেন। দুএকটি হৃদয়ের বন্ধু ভিন্ন, লোকসমাজে আর কাহারও সহিত বড় মিশিতেন না। এই সুহৃদের মৃত্যুঘটনা উপলক্ষ করিয়াই তাঁহার আধ্যাত্মিক-চিন্তাপূর্ণ In Memorim নামক শোক-কাব্য বিরচিত হয়। ক্রমশঃ তাঁহার কবিতার সুখ্যাতি ইংলণ্ডে প্রচারিত হইতে থাকে। চারি বৎসরের মধ্যে তাঁহার কবিতাসংগ্রহের তিন সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই সময়ে কবিবর ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেন যে, টেনিসন নিশ্চয়ই বর্ত্তমান কবিদিগের শীর্ষস্থানীয়।

১৮৪৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার Princess কবিতা প্রচারিত হয়। এই কাব্য নূতন পুরাতনের সুন্দর সংমিশ্রণে, স্ত্রীজাতির আশা উৎসাহ উন্নতির কবিতাময় আলোচনে এবং স্থানে স্থানে হৃদয়গ্রাহী সংগীতের সমাবেশে, সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া উঠে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি কুমারী শেলউডের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ঐ বৎসরেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মৃত্যু হইলে, তিনি মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজ-কবি-পদে অভিষিক্ত হন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে, তাঁহার Maud প্রকাশিত হয়। ইহা তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষ-ব্যাপী চিন্তার সুমধুর ফল, এবং তদানীন্তন নীচ, কপট, স্বার্থপর, ও অর্থলোলুপ সমাজের শ্লেষাত্মক সজীব চিত্র।

Idylls of the king টেনিসনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। ইহাও তাঁহার বহু পরিশ্রমের ফল। ১৮৫৯ অব্দে ইহার প্রথম খণ্ড ও ১৮৮৫ অব্দে সম্পূর্ণ

প্রভৃতি, হিন্দু জীবনের সার উপাদানগুলি, তাঁহার এই কাব্যে সমুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে টেনিসনের Enoch Arden নামক কবিতা প্রকাশিত হয়। ইহা সাধারণ গার্হস্থ্য জীবনের একটি সরল চিত্র। এই কবিতা ইয়ুরোপীয় বহুবিধ ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

১৮৮৩ অব্দে Locasley Hallএর উপসংহারভাগ প্রচারিত হয়। ইহাতে দেখিতে পাই যে, জগতের উন্নতি সম্বন্ধে কবির প্রথম বয়সের উচ্চ আশা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

বয়োবৃদ্ধিসহকারে তাঁহার প্রতিভার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ কিছু মাত্র মলিন হয় নাই। অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রমেও এই কলনাদী কোকিল কণ্ঠের ঝঙ্কার আমাদিগকে পূর্ব্ববৎ বিমোহিত করিয়াছে।

টেনিসন ছয়খানি নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু চরিত্রচিত্রনের নিপুণতা স্বত্বেও তাঁহার নাটকগুলি সাহিত্যজগতে তাদৃশ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। গীতিকাব্যে ও গল্প কাব্যেই তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় কাব্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে, টেনিসনের শেষ কবিতা, "আকবরের স্বপ্ন" (Dreams of Acbor) নামক পুস্তক শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

টেনিসন জীবিতকালে স্বদেশবাসী কর্ত্তৃক বিবিধ উপাধিভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। রাজকবি অকস্‌ফোর্ডের D. C. L. উপাধি, Royal Societyর সভ্য পদ, কেম্ব্রিজের ফেলো ও গ্রন্থকারসমিতির সভাপতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

টেনিসন প্রথম জীবনে দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা বলিয়া কবিতার সেবা পরিত্যাগ করিয়া কখনও অন্য কোন বিষয়কার্য্যে মনোনিবেশ করেন নাই। কবিতাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল।

টেনিসন বড় অমায়িক ছিলেন। তাঁহার সাহচর্য্যসুখ সকলেরই স্পৃহনীয় ছিল। তিনি মনুষ্যচরিত্রবোধে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রাজনীতির কুটিল বর্ত্মানুসরণ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। জগতের কোলাহল ছাড়িয়া তিনি নির্জ্জন উপবনগৃহে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার পত্নী-প্রেম ও পুত্র-স্নেহ সর্ব্বজনপ্রশংসনীয়। প্রিয়তম কনিষ্ঠ পুত্রের

টেনিসন প্রাতঃকাল কবিতারচনায় অতিবাহিত করিতেন। মধ্যাহ্নে কোন সহচর বন্ধুর সহিত পাদচারে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইতেন। তিনি মিতাহারী ও মিতাচারী ছিলেন।

টেনিসন দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, সুদীর্ঘ কেশ-কলাপ, উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় নয়ন, সৌষ্ঠবময় মুখ-মণ্ডল, ঝঙ্কারিণী বাণী, সরল উচ্চ হাস্য এবং মর্ম্মভেদী কাতর কণ্ঠ সর্ব্বজনরমণীয় ছিল।

বিগত ৬ ই অক্টোবর টেনিসন লোকান্তরিত হইয়াছেন। কবির মৃত্যুও কবিতাময় হইয়াছে। চকোর যেমন কৌমুদীবিধৌত আকাশে বিভোর প্রাণে চন্দ্ররশ্মিতে মিশাইয়া যায়, কবিবরের জীবাত্মাও জ্যোৎস্নাসমুদ্ভাসিত শয়নকক্ষে কোন ত্রিদিব-রাজ্যের পূর্ণসুধাকর লক্ষ্য করিয়া অনন্তে মিশাইয়াছে।

টেনিসনের কবিতা।

শুনা যায়, টেনিসন বলিতেন যে, প্রাত্যহিক জীবনে যাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদপেক্ষাও উচ্চতর, এবং মহত্তর ভাবের অভিব্যক্তিই কবিতা। তাঁহার কাব্য আলোচনা করিলে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট দেখিতে পাই। যাহা কিছু উচ্চত্তর ও মহত্তর, তিনি তাঁহার কাব্যে তাহাই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা পাঠ করিতে করিতে আমাদের হৃদয় ক্ষুদ্রতার সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া, পূর্ণতার বিশাল রাজ্যে উপনীত হয়। কবিজীবনের প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সকলই সুরুচি ও সুনীতির পরিপোষক।

টেনিসনের প্রতিভা সর্ব্ববিধ উচ্ছৃঙ্খলতার বিরোধী। সমাজ, সভ্যতা, উন্নতি,ধর্ম্মকর্ম্ম,প্রেম, শোক,সর্ব্বত্রই তিনি শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। তিনি তাঁহার সকল কাব্যেই মনুষ্যের উদ্দাম চিত্তবৃত্তিকে সংযত করিয়া, নিয়মের পথে পরিচালিত করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ-রাজা আর্থারের জীবন-ব্রত উদ্‌যাপিত হইল না ; কারণ মহিষীর পাপ-প্রবণতা রাজ্যের সুশৃঙ্খলার বিরোধী হইয়াছিল। প্রিয়তম বন্ধুর অসহ্য বিয়োগ-শোকে তাঁহার হৃদয় আত্মহারা হইয়া পড়ে নাই ; কেন না অতিশোক সুশৃঙ্খলার বিরোধী। কুমারী আইডার (Princess) স্বাধীনতার সুখস্বপ্ন ঘটনার

উন্নতি জাগতিক শৃঙ্খলার বিরোধী। যাহা তীব্র কঠোর উদ্দাম ও অসংযত, তাহা টেনিসনের কাব্যের উপাদান নহে।

তাঁহার কাব্য প্রকৃত সৌন্দর্য্যালোকে উদ্ভাসিত। কিন্তু প্রকৃতির নীরস গম্ভীর সৌন্দর্য্য তাঁহার চিত্তাকর্ষক ছিল না। যে সৌন্দর্য্য আপনার মহিমা-শিখরে আরূঢ় হইয়া জগতের প্রতি নির্ম্মম কটাক্ষপাত করে, তাহা তাঁহার নয়নানন্দ নহে।

যে বিরল ও নিভৃত সৌন্দর্য্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের অন্তস্তল অণুপ্রাণিত করিত, তাহাতে টেনিসনের হৃদয় আকৃষ্ট হইত না। যেখানে প্রকৃতি, সৌন্দর্য্যের উপর সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশে অসীম-শোভাময়ী মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, সেইখানেই টেনিসনের আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করিত। প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম পদার্থগুলিও তাঁহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইত। তাঁহার বর্ণনার আর একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, তিনি বর্ণনীয় ভাবনিচয়ের সম্যক পরিস্ফুটনের নিমিত্ত তদুপযোগী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিতেন; তাই আমরা দেখি যে, অনুতাপক্লিষ্টা আর্থারমহিষীর (Guinevere) মর্ম্ম-পীড়ায় সাহানুভূতি দেখাইয়াই যেন প্রকৃতির মুখমণ্ডল কুজ্‌ঝটিকাবৃত হইয়া উঠিল; পূর্ণিমার চন্দ্রালোক অন্তর্হিত হইল; মৃত ব্যক্তির মুখাবরণের ন্যায়, শুভ্র কুহেলিকাবসনে পৃথিবীর রূপ ঢাকিয়া গেল; জগৎ নিস্তব্ধ হইল।

টেনিসনের জগৎব্যাপিনী প্রতিভা কোনও বিশেষ দেশ, কাল বা পাত্রে আবদ্ধ ছিল না। প্রাচীন গ্রীক ও রোম, মধ্যযুগের ইতালী ও ইংলণ্ড, বর্ত্তমান কালের জার্ম্মানি, তাঁহার কাব্যে সকল যুগের ছায়াই প্রতিফলিত হইয়াছে। নির্ধন কুটীরবাসীর সরল জীবন-গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা হইতে, রাজাধিরাজ বিশ্ববিজেতার বীর-জীবনী পর্য্যন্ত সকলই তাঁহার কাব্যের উপাদানভূত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিভা-দর্পণে সকল জাতির, সকল শ্রেণীর ও সকল প্রকৃতির মানব-জীবন প্রতিবিম্বিত হইত।

তাঁহার কাব্য-কৌশল (Art) সর্ব্বজনপ্রশংসিত। প্রচলিত পুরাতন ভাবগুলিকে তিনি এমন নূতন, সুন্দর ও সৌষ্ঠবময় শব্দবিন্যাসে সুসজ্জিত করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় উৎকৃষ্ট কাব্যামোদে আপ্লুত হয়। তাঁহার ললিতঝঙ্কারময় কবিতাও এই কাব্য-কৌশলের অন্তর্ভূত। তাঁহার

কিন্তু তিনি ইহাকে এরূপ অপূর্ব্ব বেশে ও সুললিত ছন্দে নিবদ্ধ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, ইহা যেন তাঁহারই কল্পনাপ্রসূত অভিনব কাহিনী বলিয়া ভ্রম হয়।

কালিদাস দিলীপ সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন,

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং রবিঃ॥

"সূর্য্য যেরূপ পৃথিবীর রস বাষ্পাকারে আহরণ করিয়া বৃষ্টির আকারে বহুগুণে প্রত্যর্পণ করেন, রাজা দিলীপ প্রজার নিকট কর গ্রহণ করিয়া সেইরূপ করিতেন।" টেনিসনের সম্বন্ধেও এ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। টেনিসন উনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের প্রতিরূপ (Representative) কবি। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের আশা, অভিরুচি, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ, আধ্যাত্মিক নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালী, তাঁহার কাব্যে সম্যক্ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। সেই বিক্ষিপ্ত ভাবরাশি একত্র সঞ্চিত ও উৎকৃষ্ট কাব্যের আকারে পরিণত হইয়া, সমগ্র নরনারীর হৃদয়ে অমৃতসিঞ্চন করিতেছে।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রদত্ত কবি-মাল্য কালবশে টেনিসনের মস্তক হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল ; কিন্তু স্বয়ং বাগ্দেবী অমর কবির গলে যে সুরভি পারিজাতের অক্ষয় যশোমাল্য সযত্নে পরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববিধ্বংসী মহাকাল কখনও বিশুষ্ক করিতে পারিবে না। তাহা চিরদিন সরস ও সজীব থাকিয়া, স্বর্গীয় পরিমলে কাব্যজগৎ আমোদিত, উৎফুল্ল, ও অনুপ্রাণিত করিবে।

শ্রীমথুরানাথ সিংহ।

ঘরের লক্ষ্মী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"আমার ভাই বড় লজ্জা করে।"

"তোর এক কাপের লজ্জা।"

শ্রাবণ মাস। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে।

পত্রের অগ্রভাগ বাহিয়া মুক্তার ন্যায় স্বচ্ছ সলিলবিন্দুগুলি ভূমে পড়িতেছে। এমনি এক বর্ষার দিনে, নির্জ্জন ঘরে দুই সইয়ে কথা হইতেছিল। চারুবালা মা-বাপের বড় আদরের মেয়ে। আদরের মেয়ে বলিয়া, সে আবদারে কি দুষ্ট নয়। এত ভীতু ছেলে, মেয়েদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যাইত না। কেহ যদি বড় করিয়া ডাকিত, অমনই অভিমানে চারুর বড় বড় চক্ষু দুটি জলে পুরিয়া যাইত। কেহ আদর করিয়া ডাকিলে লজ্জায় চারু মাথা তুলিতে পারিত না। চারুর সই ঠিক্ চারুর বিপরীত প্রকৃতির। সেই গাছ-কোমর বাঁধিয়া পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়ায় তৎপর, সেই আড়াআড়িতে সুনিপুণ, সেই চঞ্চলার শিরোমণি, মেয়েলি শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা সইটি যে কি করিয়া ঠিক্ চারুর মনের মত হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া উঠা দুষ্কর। সইটি চারুর অপেক্ষা ছোট হইলেও চারুর মন্ত্রণা ও সাহসদাত্রী। কোন কথা বুঝিতে না পারিলে চারুর সইকে বিশেষ আবশ্যক পড়িত। শনি মঙ্গলবারে কোন গাছতলায় যাইতে নাই, এলোচুলে অমাবস্যার রাত্রে থাকিলে কি হয়, রাক্ষুসে বেলায় ভাত খাইতে নাই কেন, এ সকলের মীমাংসায় চারুর সই পাড়ার মেয়েদের সর্ব্বাগ্রগণ্যা। তাহা ছাড়া তাহার আর একটি বিশেষ গুণ ছিল, কোন্ গাছে শাঁকচুন্নি থাকে, কোন্ গাছে ভূত থাকে, তাহা সে গাছ দেখিলেই টের পাইত, আর ভূত-ছাড়ান মন্ত্রও যে জানিত না, তাহাও নয়। যাহা হউক, এমন সর্ব্বগুণসম্পন্না সইয়ের কথা অবশ্য চারু কখনই অগ্রাহ্য করিত না। কিন্তু আজ একটি বিষয়ে সে অপরাধী হইয়াছে—তাহাই লইয়া দুই সইয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

আগামী কল্য রথ। তাই চারুর বরটি নিমন্ত্রণে শ্বশুরবাড়ী আসিবেন। চারুর মোটে দু'মাস বিবাহ হইয়াছে, বরের সহিত তাহার বড় একটা আলাপ-পরিচয় নাই। তাই বর আসিবে শুনিয়া আহ্লাদে গলিয়া না গিয়া ভয়ে সারা হইতেছে। মেয়েটি স্বাভাবিক কিছু ভীতু, তাহার পর বর জিনিসটা যে কি, তাহা বড় বোঝে না, স্বাভাবিক সংস্কার বশতঃ "বর" ভাবিতেই ভয়ের ভাবটা আগে মনে হয়; যথার্থ কথা বলিতে কি, প্রেমের ভাবের সূত্রপাতও যে তাহার মনে হইয়াছিল, তাহা বলিতে গেলে নিতান্তই মিথ্যা কথা বলা হয়। বর ভাবিতেই শ্বশুরবাড়ী মনে আসে, শ্বশুরবাড়ী মনে আসিলেই, বাপ্ মা ছাড়িয়া যাওয়ার কথা, খেলাঘর ছাড়িয়া যাওয়ার কথা,

আরও কত কথাই মনে পড়ে। মনে পড়িলেই বড় বড় চোখে এক চোখ জল হয়। কাযেই চারুকে বড় দোষ দেওয়া যায় না।

আসল কথা কি না, সই বলিতেছিল, বরের সঙ্গে কথা কহিতে হইবে, আর কি কথা হয়, তা আবার সইকে শুনাইতে হইবে, কাযেই চারু বড় বিপদে পড়িয়াছে। সইয়ের কথা বেদবাক্য, তাই বা কি করিয়া লঙ্ঘন করিবে,—আর বরের সঙ্গে কথা কওয়া! ওমা সে আবার কি? চারু জন্মেও (অর্থাৎ ১১ বৎসরের মধ্যে) কখন এমন বিপদে পড়ে নাই। সইকে ইহার অসম্ভাবিতা নানারূপে বুঝাইতে গিয়া কিছুই বুঝাইতে পারিতেছিল না। কেন না, সইয়ের যুক্তি চিরকালই চারুর কাছে অখণ্ডনীয়। সইও যে এ বিষয় বুঝিতে পাকা, তাহাও নয়,—তবে সবই বুঝি বলিয়া সইয়ের মনে একটা বিলক্ষণ আত্মগরিমা আছে, কাজেই এ বিষয়েই বা পশ্চাৎপদ হইবে কেন? কিন্তু চারুকে সে যাহা বলিতেছিল, তাই যদি আবার কেহ তাহাকে বলিতে আসিত, তবে ক্ষেমা আর তাহাকে আস্ত রাখিত না। আর নিজেও সারাদিন কাঁদিয়া কাটিয়া একাকার করিত। পৃথিবীতে পরের বিষয়ে জ্ঞান সকলেরই বড় কম। সই কেন আমার কথা রাখিতে চাহিতেছে না, তাহা ক্ষেমা ভাবে নাই, সে বোধ হয় ভাবিতেছিল, আমার কথা রাখাই সইয়ের উচিত।

টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল সন্ধ্যাও হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় বৃষ্টি বড় জোরে আসিল। বাতাসে [illegible] লা মড় মড় করিয়া উঠিল, কাক বেচারিরা একবার কাতরস্বরে কাক[illegible] করিল, ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসিতে লাগিল, বালিকা দু'টি জানালা বন্ধ করিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় দরজায় একটু গোলমাল শুনা গেল। ক্ষেমা হাসিয়া সইয়ের গা টিপিয়া বলিল, "ঐ লো ঝড় বৃষ্টি মাথায় ক'রে তোর বাহ্লে বর এসেছে।" চারুর বুক দুড় দুড় করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিপদ নানারকম। আর পথে ঘাটে খেলা করিবার যো নাই। দরজার চৌকাট পার হইলেই মা বকেন, বলেন, "হলি কি? এত বড় মেয়ে হ'ল, একটু জ্ঞান নাই। ওমা, জামাই বাড়ীতে,—আর তুই কি না পাড়ায়

কিন্তু ঘাড় হেঁট করিয়া থাকে, কেমন কথা কহিতে লজ্জা করে। সারাদিন বাড়ীর মধ্যে বদ্ধ থাকা কি কষ্ট! আমতলার খেলাঘর ক'দিন নিকান হয় নাই, ক'দিন পূজার ফুল তুলিতে যাওয়া হয় নাই। রথের সময় "বেয়ানের" বাড়ী হইতে মেয়েটি আনিবে, রথের তত্ত্ব করিবে, তাহার কিছুই হয় নাই। বেয়ান আসিলে—চারু—কি জানি কেন যে লজ্জায় ঘাড় তুলিতে পারে না। আর "আমার মেয়েটি কেমন আছে বেয়ান?" এ কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। মনের মধ্যে মহা একটা গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। ভয়ের ভাবটা অনেক কমিয়া সেইখানে লজ্জার ভাবের বিশেষ আধিপত্য হইয়াছে; যেন সে সকলের কাছে মস্ত অপরাধী, যেন সকলে তাহার দিকেই চাহিয়া আছে, যেন সকলে তাহার বিষয়েই কথা কহিতেছে। এমন কি স'ইয়ের কাছে পর্য্যন্ত লজ্জা করে, এ রোগের ঔষধ কি?

ভূষণ দিদি বেড়াইতে আসিয়া বলিলেন, "কি কাকিমা, তোমার জামাই এসেছে। তা, দেখে এলাম—দিব্বি জামাইটি চারুরই বরের যুগ্যি বটে।" চারু সেখানে বসিয়াছিল, তাহার মুখ, চোখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। মা উত্তর করিলেন, "তা বাছা ভূষণ, তোমাদের পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদে চারু যেমন আমার একটি মেয়ে, তেম্নি জামাইটি বেশ হয়েছে। তা বলি, কলিকাতার ছেলে, মেয়ের ত ᐧই দেখ্‌তে পাচ্ছ, কেবল টো টো করে বেড়ান। তুমি নাকি কি নূতন রকম চুল বাঁধ্‌তে জান, চারুর চুল ক'টা বেঁধে দিয়ে যাও। সহরের ছে [illegible] রকম দেখে শুনে, আমরা মা, পাড়াগেঁয়ে মানুষ, অত শত ত [illegible] না। তা, তুমি চুল ক'টা বেঁধে দিয়ে যাও।" এমন সময় ক্ষেমা "কি হচ্ছে সই" বলিয়া উপস্থিত হইল। তার পর, ভূষণকে চুল বাঁধিতে দেখিয়া বলিল, "ভাল ক'রে বেঁধে দিও দিদি, বরের মনে ধরান চাই।" চারুর এ কথা শুনিয়া সইয়ের উপর অত্যন্ত অভিমান ও রাগ হইল। কেন না, চারুর যে লজ্জা করিতেছে, তা সই পর্য্যন্ত বুঝিল না, সেও ঠাট্টা করিতে লাগিল।

আবার যখন মনে হয়, মনে করিতে চারু আপনিই লজ্জায় মরিয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে কেমন একটু সুখ হয়। সেই হাত দু'খানি ধরিয়া আদর করিয়া যিনি বলিয়াছিলেন, "চারু লজ্জা কি, কথা কও না।" তিনি কে? তিনি চারুর বর! অমনি বুকের মধ্যে ঢেঁকি পড়িতে থাকে। আবার

কথা কি মিষ্ট হয়? আচ্ছা তাঁকে কি রকম দেখিতে? চারু ত তাঁহাকে দেখে নাই, কেবল কথাই শুনিয়াছে। কথা শুনিয়া,—যতটা ভয়ের জিনিস ঠাহরাইয়া রাখিয়াছিল, এখন আর ততটা বোধ হয় না।

ক্ষেমা সকাল বেলা মার সঙ্গে কি নিয়া ঝগড়া বাধাইয়াছিল, মা তাই রাগ করিয়া বলিতেছিলেন, "লোকের যদি মেয়ে হয়, তবে যেন চারুর মতই মেয়ে হয়। এত আদরের, তবু মুখে কথাটি নাই। ভয়েই সারা হয়। আহা মেয়ে নয় ত, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আর আমার অদৃষ্টের দোষে এমন মেয়েও হয়েছিল, একটি কথা শুনিবে না, কথায় ত আঁটিয়া উঠা ভার। চারুর কাছে থেকে থেকেও যদি তার একটু স্বভাব পায়! দু'বেলা একটু ক'রে চারুর পা ধোয়া জল খাস্।" ক্ষেমা রাগে গস্ গস্ করিতেছিল, এমন সময় ভুবন আসিয়া খবর দিল, চারু শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। ভুবন চারুর বেয়ান, চারুর মেয়েটিকে সাজাইয়া গুজাইয়া মাটীর পাল্কি করিয়া নিজে বেহারা হইয়া লইয়া যাইতেছিল, যাইবার সময় অমনি ক্ষেমার কাছে খপর দিয়া গেল। খবর পাইয়া ক্ষেমার রাগ মাথায় উঠিল, তৎক্ষণাৎ মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া মিটিয়া গেল। "মা আয়!" বলিয়া ক্ষেমা চারুদের বাড়ীর দিকে দৌড়িল। ক্ষেমার মাও তাহার অনুগামিনী হইলেন।

ছোট গ্রামখানি, বোসেদের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাইবে শুনিয়া সকলেই প্রায় দেখিতে আসিয়াছে। চারু পরিচিত সকলের মুখ দেখিতেছে, আর তাহার হৃদয় উথলিয়া উঠিতেছে। আর কিছুক্ষণ পরে ইহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইবে না, এই চির-পরিচিত স্নেহময় গৃহ ছাড়িয়া কোথায় কোন অপরিচিত কঠোর রাজ্যে গিয়া পড়িবে। সই আর কাহার সঙ্গে গল্প করিবে, খোকার ঘোড়া আর কে হইবে, সন্ধ্যাবেলা মা দাওয়ায় বসিয়া কাহাকে গল্প শুনাইবেন, মেনি বিড়ালটিকে কে দুধভাত মাখিয়া দিবে? হায়, হায়, চারু এ সব ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? চারু নীরবে অবনত বদনে কাঁদিতে লাগিল, চারুর বেয়ান চারুর মেয়েটিকে কোলে করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পুঁতুলটি কাঁদিয়াছিল কি না, তাহার ঠিক্ খবর রাখি না,—কিন্তু হিন্দুগৃহের কন্যা-বিদায়ের করুণ দৃশ্যে পাথরও গলিয়া যায়, মাটীর পুঁতুল গলিবে আশ্চর্য্য কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নিজের দেশ সকলের কাছেই ভাল লাগে, কলিকাতাবাসীরা দু'দিন পল্লীগ্রামে গিয়া বাস করা কষ্টকর মনে করেন, কিন্তু পড়াগেঁয়েরা যে মনে মনে কলিকাতার বড়ই সুখ্যাতি করেন, তাও নয়। অনেক পাড়াগেঁয়ে প্রকাশ্য-রূপেই কলিকাতার নিন্দা করেন। নূতন স্থানে আসিয়া নূতন নূতন জিনিস দেখিয়া দুই চারি দিন মন লাগে বটে, কিন্তু যতই দিন যায়, ততই দেশের জন্য মন খাঁ—খাঁ করে। দেশের এটি উটি খুঁটিনাটি কত কি মনে পড়ে, আর সবই যেন মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। যিনি সখের জন্য বেড়াইতে আসেন, তাঁহারই এই দশা হয়, তা চারুর যে হবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? দু'দিন একদিন চারু কলিকাতার ঘর বাড়ী লোক জন দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অতলোকদেখিয়া মনে একটা বড় ভয় উপস্থিত হইল। এত লোকের মধ্যে কেহ যদি হারাইয়া যায়? আর পাড়াগাঁর রাস্তা মনে পড়িলে মহাতৃপ্তি হইত। কখন ভাবিত,এখানে যে বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেয় না, ভালই করে, অত লোকের মধ্য দিয়া যাইতে কাহার না ভয় হয়? আবার মনে করিত, যদি নদীতে স্নান করিতে যাইতে হইত, তবে কি হইত? ওই লোকের মধ্য দিয়া ত যাইতে হইত, উহার মধ্যে যদি হারাইয়া যাইতাম?

বউ ঘরে নামিলেই শাশুড়ী "এস আমার মা এস, আমার লক্ষ্মী এস", বলিয়া মহাযত্নে উপরে লইয়া গেলেন। ননদেরা সকলে তাহাকে কোথায় রাখিবে, কি করিবে, ভাবিয়া ঠিক পায় না। এই সব দেখিয়া চারু অবাক হইল। বিবাহের সময় দিন কয়েক শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন কাহাকেও চেনে নাই। যে কয়েক দিন ছিল, কাঁদিয়াই কাটাইয়াছিল। এবার ক্রমে ক্রমে সকলকে চিনিল। শাশুড়ী কখন কিছু বলেন না, যদি বলেন মিষ্ট কথায়, ননদেরা অতিশয় যত্ন করে। চারু এই অপরিচিত রাজ্যেই ক্রমে মন বাঁধিল। সই ও মার কথা মনে পড়িয়া মাঝে মাঝে বড় কষ্ট হয়, আর অত্যন্ত দেখিবার ইচ্ছা হয়, তখন নির্জ্জনে বসিয়া একা একা কাঁদে। ননদেরা দেখিতে পাইলে ভারি ব্যস্ত হইয়া "বউ কাঁদ কেন, কাঁদ কেন?" বলিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা করে।

শ্বশুরগৃহে এই আদরে চারুর কিছুদিন কাটিল। ঝি, রাঁধুনি পর্য্যন্ত বৌমা বলিতে অজ্ঞান, যেন তাহারা বৌমাকে পাইয়া সাতরাজার ধন এক

এক দিন সন্ধ্যাবেলা চারু নির্জ্জনে একা বসিয়া আছে, শ্বাশুড়ী ঠাকুরঘরে মালা জপিতেছেন, দুই ননদ নীচে রান্নাঘরে আছে। চারুর অত্যন্ত ভয় করিতে লাগিল। অবশেষে একা থাকিতে না পারিয়া নীচে রান্নাঘরের নিকট গেল, কিন্তু পাছে নীচে আসিয়াছে বলিয়া ননদেরা কিছু বলে, এই ভয়ে ঢুকিতে সাহস হইল না। এমন সময় শুনিল, এক ননদ বলিতেছেন, "এমন আহ্লাদে মেয়ে গৃহস্থঘরে পোষায় না। ছোট বৌয়ের সবি বাড়াবাড়ি। আমরা এত আদর যত্ন করি, তবু রাঙ্গা চোখে জল টস্ টস্ করে, আমি বাপু এত আহ্লাদ দেখিতে পারি না। শ্বশুরঘর কে না করে? আমরা নূতন বৌ গিয়েই কত কাজ করেছি, আর উনি সংসারের কুটাখানি দু'খানি করিতে পারেন না।" ননদ বিবেচনা করিলেন না যে, তাঁহারাই ছোট বৌকে কোন কায করিতে দেন না। চারুর শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল, সেই অভিমানপূর্ণ নয়ন জলে ভরিয়া গেল, আর রান্নাঘরের দরজায় না দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল। বড় ননদ বলিলেন, "কে গেল রে? ঝি, দেখ্ত রমেশ বুঝি?" ঝি দেখিয়া বলিল, "ছোট বৌমা উপরে উঠিয়া গেলেন।" অমনি সকলের চক্ষে চক্ষে একটা রহস্যপূর্ণ কথা হইয়া গেল। কেহ আর কিছু না বলিয়া নিজ নিজ কর্য্যে নিযুক্ত হইলেন। চারু যখন শুইতে যাইবে, তখন শ্বাশুড়ী ডাকিয়া বলিলেন, "ছোট বৌমা, ৲ টা কথা শুনে যাও ত।" চারু সন্ত্রস্ত হইয়া শ্বাশুড়ীর নিকটে গেল। তখন শ্বাশুড়ী বলিলেন, "তুমি এত টুকু মেয়ে, তোমার এত বুদ্ধি হয়েছে? আড়ি পাতিয়া লোকের কথা শুন? ও অভ্যাস ত ভাল নয়। তোমা হতে কি শেষে আমাদের ঘর ভাঙ্গিবে।" চারু নীরব হইয়া শুনিল, কিন্তু এ তিরস্কারের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিল না। শ্বাশুড়ী আবার বলিলেন, "এমনি আড়িপেতে তুমি কথা শুনিবে, আর খুঁটীনাটী সব যে নগেনের কানে লাগিয়ে দেবে, শেষে তোমা হতে কি আমার ছেলে পর হবে? আমার বাছা স্পষ্ট কথা! কে কোথা কি বলে তাই লুকিয়ে শুনিতে যাও, তুমি ত সামান্য মেয়ে নও। আমি মনে করি শান্ত শিষ্ট। ও মা! এদিকে পেটে পেটে বুদ্ধি, মিট্‌মিটে ডান।" বলিয়া শ্বাশুড়ী চলিয়া গেলেন। এরূপ সম্ভাষণ চারুর পক্ষে এই নূতন, কাজেই তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। অভিমান ভরা চারু যে বড় করিয়া ডাক সহিতে পারিত

স্বামী আদর করিয়া বলিলেন, "চারু কাঁদিতেছ কেন ?" চারু কিছু উত্তর দিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল। তখন কিছু দুঃখিত স্বরে স্বামী বলিলেন, "চারু, আমার একটি কথারও উত্তর দিবে না। আমি কি তোমার এত পর ? কেবল তুমি বাপের বাড়ীর জন্যই কাঁদ। মা এত যত্ন করেন ; সুরো,রাজ, এত ভালবাসে, এতেও কি তোমার মন উঠে না ? আমার কাছে থাকিতে তোমার একটুও ভাল লাগে না।" চারু কি উত্তর দিবে ? স্বামীর কাছে আসিতে ভাল লাগে কি না, তাহা তাহার মনই জানে। যে দুঃখের বোঝা লইয়া স্বামীর কাছে আসিয়াছিল, আসিয়া তাহা দ্বিগুণ ভারি হইল।

পরদিন চারুর বড় জা বাপের বাড়ী হইতে আসিলেন। দু'চার দিনের মধ্যে চারু বড় জার "ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলা" হইল। যে কোন একটা দোষ চারুর মাথায় চাপাইলেই নিষ্কৃতি। ননদেরাও এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইলেন। দশ দিন না যাইতেই যে বৌকে শাশুড়ী "আমার ঘরের লক্ষ্মী এস" বলিয়া ঘরে তুলিয়াছিলেন, সেই ঘরের অলক্ষ্মী হইয়া দাঁড়াইল। যে চাকর চাকরাণীরা ছোট বৌমাকে সাতরাজার ধন মাণিক পাইয়াছিল, তাহারাই আবার অত্যন্ত হতশ্রদ্ধা করিতে লাগিল। শাশুড়ী বৌয়ের যে একটি আধটি দোষের কথা ছেলের কাছে তুলিতে ক্রটী করিলেন, তাহাও নয়। এমনি ক.রয়া দিন দিন ছোট বৌয়ের নানা দোষ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। তাহার মধ্যে কান্না এক প্রধান দোষ হইয়া দাঁড়াইল। শাশুড়ী প্রায় প্রতি কথাতেই বলিতেন, "এমন ঘেঁনঘেঁনে বৌ ঘরে এনেছিলাম !"

দুপুর বেলা চারু ঘরের জানালাটিতে একা বসিয়া আছে, আর বাড়ীর কথা মনে পড়িয়া আপনা-আপনি চোখে জল আসিতেছে, কিছুতে সম্বরণ করিতে পারিতেছে না। গাল দিয়া জল গড়াইয়া আসিতেছে, আর ভয়ে ভয়ে অমনি মুছিয়া ফেলিতেছে। পাছে কেহ আসিয়া দেখে। এমন সময় নীচে বড় জার গলা শুনিতে পাইয়া বারাণ্ডায় আসিল। শাশুড়ী চারুকে দেখিয়া বলিলেন, "কি, দুধ বেড়ালকে দিয়ে খাইয়েছ ? বেশ ; এখন নরেন খিদেয় মারা পড়ুক।" চারু আস্তে আস্তে বলিল, "আমি ত দুধের কিছু জানি না।" তাই শুনিয়া বড় জা নীচে হইতে ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন,

এখন আবার জানি না, ভাল মানুষ আর কি ?" চারু বলিল, "আমি ত লই নাই, ঠাকুরঝি তরকারী ঢাকা দিতে নিয়ে গিয়েছেন।" ইহাতে ঠাকুরঝি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "হাঁগো বড়মানুষের বোন, ঠাকুরঝির নামে ত দোষ দেবেই। এখনকার বৌরা কি আর ঠাকুরঝি নিয়ে ঘর করিতে পারে, নানা ফন্দিতে তাড়াইতে পারিলে বাঁচে। আমার যেমন পোড়া কপাল, তাই বাপের বাড়ীতে থাকি। শ্বশুরবাড়ীতে কি এক মুঠো অন্ন জোটে না? স্বামীই যেন নাই, দেওর, ভাসুর ত আছে। আমি তখনই বলেছিলাম, বড় দাদা,ছোটদাদা বৌর বাক্য সহ্য ক'রে আমি থাকিতে পারিব না। তা দাদারা তখন বলিলেন, 'কার সাধ্য কি যে তোমায় কিছু বলে।' আর এখন বলিবেন, আমার বৌকে বলিবার তুই কোথাকার কে ? মা! পায়ে পড়ি—আমাকে পাঠিয়ে দাও, আমি শ্বশুরবাড়ী গিয়া থাকিব। ভাসুর দেওর এক মুঠো খেতে দেবেই।" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। শাশুড়ীও সেই সঙ্গে "আমারই কপাল মন্দ, নহিলে তোর এমন অদৃষ্ট হবে কেন? আমার সোণারচাঁদ মেয়ে," ইত্যাদি বলিয়া কন্যার সুরে যোগ দিলেন। বাড়ীতে মহাহুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গেল। বড়বৌ শাশুড়ী ও ননদকে নানারূপে থামাইতে লাগিলেন। আর চারু অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। দাস দাসী সমস্ত জড় হইল। পুত্রদ্বয় বাড়ীতে আসিয়া বৃত্তান্ত শুনিয়া অবাক্ হইলেন। অনেক করিয়া দুই জনে মা ও ভগিনীকে শান্ত করিলেন। ছোটবাবু সে দিন আর রাত্রে আহার করিলেন না। রাত্রে যত মনের আক্রোশ স্ত্রীর দ্বারা মিটাইবেন ভাবিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য! চারুর বিষাদমাখা মলিন মুখখানি দেখিয়া কিছু মনে থাকিল না।

ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চারু, সুরোকে তুমি কি বলেছিলে?"

সরলতার প্রতিমা চারু কেমন করিয়া নিজের ওকালতি নিজে করিতে হয়, কেমন করিয়া কথা-কাটাকাটি করিতে হয়, কিছুই জানিত না। চারু কষ্টোচ্চারিত কণ্ঠে বলিল, "কিছু না।"

ছোটবাবু কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "কিছু না? তবে কি তা'রা মিথ্যা ক'রে তোমার নামে বলিল? মা কি মিথ্যা ক'রে বলিলেন?"

চারু চুপ করিয়া রহিল।

ছোটবাবু বলিলেন, "মার ত ভারি দায়—তোমার নামে মিথ্যা করিয়া

চারু নীরব হইয়া রহিল।

ছোটবাবু বিরক্ত হইয়া আবার বলিলেন, "চারু, উত্তর দাও না কেন? উত্তর বুঝি ভাবিয়া ঠিক্ করিতেছ?" চারু আর পারিল না, কাঁদিয়া বলিল, "আমাকে মার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

ছোট বাবু রাগিয়া বলিলেন, "কালই পাঠাইয়া দিব, আর কখন আনিব না। জানি আমি, তুমি আমাকে ভালবাস না। মিছামিছি তোমাকে ধরিয়া রাখিয়া কি হইবে? তোমার মন ত ধরিয়া রাখিতে পারিব না।"

পরদিন ছোট বাবু উদ্যোগ করিয়া বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আনন্দময় হৃদয় চারু বাপের বাড়ী রাখিয়া গিয়াছিল; আসিয়া আর ফিরিয়া পাইল না। আবার মার কোল পাইল, সই আসিল, বেয়ান আসিল, ভূষণদিদি আসিল,—কিন্তু সেই স্নেহমুখগুলি চারুর তপ্ত হৃদয় শান্ত করিতে পারিল না। স্বামীর কথাগুলি আগুন হইয়া অহোরাত্র চারুর বুকে জ্বলিতেছিল। মেনি বিড়ালটা চারুকে দেখিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিল, কিন্তু চারু আর তাহাকে কোলে নিল না। আমতলার খেলাঘরে হাঁড়িকুড়ি গড়াগড়ি যাইতেছে, চারু আর গুছাইয়া রাখিল না। চারুর মেয়ে কত দিন শ্বশুরবাড়ী রহিয়াছে, চারু আসিয়া তাহাকে আনিল না। তিন মাসের মধ্যে চারুর এত পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইলেন। মা শুনিলেন, জামাই মেয়েকে রাগ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে; শুনিয়া মুখ খানি ভার করিলেন, চারুকে কিছু বলিলেন না। চারু মার গৃহ-কার্য্যে মন দিল। সর্ব্বদা মার কাছে কাছে বেড়ায়, মা তাহাতে বড় সুখী নন, মেয়ে একটু খেলা টেলা ক'রে বেড়াইলে বড় আনন্দিত হন। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ মাস গেল, জামাই কোন খবর নিল না, চারু ঈষৎ রুগ্ন হইয়া পড়িল। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ মাস গেল, তথাপি কোন সংবাদ নাই। জ্যেষ্ঠ মাস, চারু বড় পীড়িত হইল। চারুর পীড়ার সংবাদ কলিকাতায় শ্বশুরবাড়ী গেল। শাশুড়ী বলিলেন, "এখন মেয়ে পাঠাবার পথ না পেয়ে ব্যামর ফিকির করেছে। আবার পায়ে ধ'রে পাঠাতে ত হল। বড় যে দর্প ক'রে এত দিন ঘাড়ে ক'রে রেখে যায়নি, এখন কেন? ব্যাম হয়েছে সেরে যাবে, ছট্ বল্‌তেই নগেন যাবে, ওদের চাকর না কি? নিতে এল না, নিমন্ত্রণ পাঠালে না, জামাইকে হুকুম করে পাঠালেম, অমনি

জামাই যাবে, এত কেন? নগেন, লিখে দে, এখন যাবার সময় নাই, এখানে যেন তারা রেখে যায়।" ননদেরও ঐরূপ মত হইল। কিন্তু নগেন বেচারি কি করে? চারুর উপরে রাগ কোন্ দিন তাহার পড়িয়া গিয়াছে। মায়ের ভয়ে এতদিন কিছু বলে নাই। এখন চারুর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া বড় কাতর হইয়া পড়িল। সেই সুন্দর মলিন মুখখানি যতবার মনে পড়িতে লাগিল, ততবারই আপনাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দিন কয়েক হৃদয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইয়া অবশেষে শ্বশুরবাড়ী যাইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। মা এই কথা শুনিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। "ওমা! তুই কি তাদের চাকর না কি? তাই তু বলে ডাকিতেই যাবি?" ইত্যাদি ইত্যাদি বলিতে থাকিলেন। নগেন নানা-রূপে মাকে বুঝাইয়া দিল। ছেলের কথা বুঝেন না, এমন মা খুবই কম দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই অবশেষে গৃহিণীকে নগেনের শ্বশুরবাড়ী যাত্রায় মত দিতে হইল।

রথের পূর্ব্ব দিবস নগেন শ্বশুরবাড়ী রওনা হইলেন। আর বৎসরের সুখ-স্মৃতি পথে মনে জাগিতে লাগিল। আর বৎসর ঠিক্ এই দিনে কি ভাবে শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছিলেন, আর এ বৎসরই বা কি ভাবে যাইতেছেন। চারুর সেই সুকুমার বিষাদ-মাখা মুখখানি মনে পড়িয়া বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। দারুণ আত্মগ্লানিতে হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। আপনাকে মনে মনে শত শত ধিক্কার দিলেন, আর কি বলিয়া চারুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তাহাও ঠিক্ করিয়া লইলেন। সমস্ত পথ কল্পনা করিতে করিতে সন্ধ্যার সময় শ্বশুরবাড়ীর দ্বারদেশে আসিয়া পৌছিলেন। সহসা কল্পনা-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শাশুড়ী অন্তরালে দাঁড়া-ইয়া কাঁদিতেছেন। সেই রথের পূর্ব্ব দিবস,সেই সুশ্যামা সন্ধ্যাবেলা,সেই শ্বশুর-বাড়ী, সবই সেই—কেবল চারু নাই। সংসারের কঠোর আঘাতে চারু-রূপ কুসুমটি না ফুটিতে ফুটিতেই ঝরিয়া গিয়াছে। জাগ্রত সংসার। কৃষকেরা হলস্কন্ধে গান গাহিতে গাহিতে বাড়ী আসিতেছে, পক্ষীকুল ঝাঁকে ঝাঁকে রব করিয়া কুলায়ে ফিরিতেছে, ছেলে মেয়েরা আনন্দে রথের বাঁশী বাজাইতেছে, গৃহীগণ ঘরে ঘরে মঙ্গল-আরতি করিতেছে ও সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতেছে। কিন্তু চারু কোথায়? চারু এ সংসারে চির-নিদ্রিত।

আলো ও ছায়া।*

কবিতা হৃদয়ের ভাষা। হৃদয়ের জ্বালাতেই কবিতার বিকাশ; এবং জ্বালার শান্তিই কবিতার চরম। হৃদয়ের বলেই মনুষ্যজীবনের উন্নতি; এবং কবিতা সেই উন্নতির পরিচায়ক। জাতীয় সভ্যতার ক্রম, কবিতার সহিত অন্তর্লিপ্ত।

যখন মনুষ্যের স্বল্প অভাব, এবং সেই অভাব অল্পায়াসেই পূর্ণ হয়, যখন সংসারের জটিলতা ও প্রণয়ের কপটতা কেবলমাত্র অঙ্কুর-ভাবে সমাজে স্থান পায়, তখন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে হৃদয় মুগ্ধ হয়। সৌন্দর্য্যের অনুভবও সরল হয়। যাহা মহৎ এবং যাহাতে জ্ঞানেন্দ্রিয় সহজেই আকৃষ্ট হয়, বালকের তাহাই ভাল লাগে। সেইরূপ, জাতীয় বাল্যাবস্থায় তদ্রূপ পদার্থ মানব হৃদয়কে আকৃষ্ট করে। ব্যবহার-বৈচিত্র্যে অকলুষিতহৃদয় পঞ্চনদবিহারী পবিত্র আর্য্যগণের সরল উক্তি এই শ্রেণীর কবিতা। বাল্যাবস্থা যৌবনে পরিণত হয়; তখন নানাজাতীয় ভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। যুবক আপনার ভাবেই আপনি মুগ্ধ। কবিও সেইরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া ভাবের প্রাচুর্য্যে বহমান হন। কালিদাস একদিন ভোজরাজাকে বলিয়াছিলেন যে, আমরা পুরস্কারের আকাঙ্খায় কবিতা লিখি না। আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রকৃতির গুণানুবাদ করি। তাহার জন্য প্রকৃতির নিকট কিছু প্রত্যাশা করি না। উন্মত্ত কবি মনুষ্যসমাজে কি প্রকৃতিরাজ্যে যাহা ভাল দেখেন, তাহারই ভাবে অধীর হইয়া হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করেন। ভাবের প্রাচুর্য্যে সমগ্র অলঙ্কার শাস্ত্রের উৎপত্তি। এই সময়কার কবিতায় কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কবির হৃদয় পূর্ণ করিতে পারে না। রমণীর হাব ভাব, রমণীর প্রণয়, রাজার ঐশ্বর্য্য, শূরের বীর্য্য, মৈত্রী ও করুণা, এক কথায় মনুষ্য সমাজে যাহা কিছু হৃদয় আকর্ষণ করে—তাহাই সর্ব্বরসসমন্বিত কবিতার আবির্ভাব করে। প্রথম

যুগের কবিতার যেরূপ আশ্চর্য্যবত্তা স্বভাব, দ্বিতীয় যুগের কবিতার স্বভাব সেইরূপ তীব্রতা।

প্রৌঢ়াবস্থায় মনুষ্যহৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। সংসারের বৈষম্য, জীবনের অনিশ্চয়, তাপত্রয়ের বিভীষিকা, কবিতার উৎস বদ্ধপ্রায় করে। সেই বদ্ধপ্রায় উৎসের মৃদু মধুর কল্লোল জীবনের সঙ্গীত। সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এই সঙ্গীতে মুগ্ধ হন। এই সঙ্গীত কবিতার প্রৌঢ়তা-ব্যঞ্জক। এই কবিতা দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, অশান্তিময় ও শান্তিময়। "কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ" "সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ" এইরূপ ভাবাপন্ন কবিতা অশান্তিময়। হ্যামলেট এই অশান্তিময় কবিতায় পরিপূর্ণ। টেনিসনের "ইন্ মেমোরিয়াম্"ও ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। চিরকালই কি অশান্তি ভাল লাগে? কিন্তু এই অশান্তি নিবারণের জন্য মনুষ্য দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করে,—এক যথেচ্ছাচার, অন্য বৈষম্যের অন্তর্লীন সাম্যদর্শন ও শান্তিলাভ। অশান্তিপূর্ণ যথেচ্ছাচার বায়রণ ও শেলির কবিতায় স্পষ্ট প্রতীয়মান। বায়রণে এই ভাব স্থূল ও সুমার্জ্জিত।

"Truth's deathless voice pauses among mankind !
If there must be no response to my cry—
If men must rise and stamp with fury blind
On his pure name who loves them,—thou and I
Sweet friend ! can look from over tranquility
Like lamps into the world's tempestuous might—
Two tranquil stars, while clouds are passing by
Which wap them from the founding seaman's sight
That burn from year to year with unextinguished light"

Shelly.

গভীর চিত্তসমাবেশে কবি আত্মমধ্যে বিষয়ানপেক্ষী আনন্দ অনুভব করেন। সেই আনন্দের আভাব জগৎ আলোকিত করে। সেই ক্ষীণ আলোকে কবির চিত্ত শান্তিময় হয়। তখন প্রবল ঝঞ্ঝায় জগৎ বিচলিত হইলেও কবির হৃদয়গত ঐকতানিক প্রবাহ জগতের অন্তর্লীন হইয়া সমভাবে প্রবাহিত হয়। এই হৃদয়স্রোত দর্শন-রাজ্যের সমাধি, কবিতা-রাজ্যের চরম ভাব। এইখানে আত্মদর্শন ও কবিতার একত্র সমাবেশ।

নিম্নলিখিত কবিতা কোন্ বৈদান্তিক আপন বলিয়া স্বীকার না করিবেন :—

"Nor less, I trust,
To them I may have owed another gift,
Of aspect mere sublime ; that blessed mood,
In which the burthen of the mystey,
In which the heavy and the weary weight,
Of all this unintelligible world,
Is lightened :—that serene and blessed mood,
In which the affection gently bad us on,—
Until, the breath of this corporeal frame,
And even the motion of our human blood
Almost suspended, we are laid asleep
In body, and become a living soul :
While with an eye made quiet by the power
Of harmony, and the deep power of joy,
We see into the life of things."

Wordsworth.

এই জীবনসঙ্গীতে হৃদয়ের ভাব পবিত্র হয়, রিপু সকল দমিত হয়, এবং মনোবৃত্তি উত্তেজনাশূন্য হইয়া মৃদুমধুরভাব ধারণ করে। এই ভাব সেক্ষপীয়রের পেরিক্লিস, প্রস্‌পেরো ও হারমিয়নিতে বিদ্যোতিত হইয়া তাহাদিগকে দেবতুল্য করিয়াছে। এই ভাবাপন্ন হইয়া কে বলিতে পারে ;—

Though with their high wrongs I am struck to the quick;
Yet with my nobler reason 'gainst my fury
Do I take part : the rarer action is
In virtue than in vengence :"

Tempest.

এই সঙ্গীত জীবনের সঙ্গীত। এই সঙ্গীত জীবনের উপযোগী। সর্ব্বকালে, সকল অবস্থায় মনুষ্য এই সঙ্গীতে আনন্দলাভ করে।

"আলো ও ছায়ার" সঙ্গীত, এই জাতীয় বলিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলগ্রাহী। ইহাতে অশান্তি আছে, এবং শান্তির আভাষও আছে ; ইহাতে "ছায়া" আছে, এবং "আলো" আছে ;—কিন্তু আলো অপেক্ষা ছায়া অধিক। এই আলোক সন্ধ্যার ক্ষণালোক। ইহাতে উত্তাপ নাই, শৈত্যও নাই ; হর্ষ নাই, বিষাদ

থাকিয়া যায়; ভাষার বাহনে বাহিরে আসে না। এই হর্ষময় বিষাদে অশান্তি আসিতে আসিতে অদৃশ্য হয়, এবং শান্তিও আপনাকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হয় না। কবি বলিতেছেন :—

"আমারে দিও না দোষ, নূতন সঙ্গীত
উন্মাদক নাহি যদি হয়;
শান্তি সে গোধূলি আলো, মৃদু সন্ধ্যানিলে,
নহে ঝড় বজ্র বিদ্যুন্ময়।"

"To be or not to be" বলিয়া কবির হৃদয় ব্যাকুল নহে; কিন্তু Lake poet'sএর "blessed mood" তাঁহার হৃদয়ে পূর্ণ বিকশিত না হউক, তাহার আভাষের কোন সন্দেহ নাই।

"হেরিনু সংসার মরীচিকাময়ী
মরুভূমি মত রয়েছে পড়ে';
বাসনা পিয়াসে উন্মত্ত মানব,
আশার ছলনে মরিছে পুড়ে'।"

হতাশ হইয়া কবি বলিতেছেন,—

"নাই কি রে সুখ! নাই কি রে সুখ?
এ ধরা কি সুধু বিষাদময়?
যাতনে জ্বলিয়া কাঁদিয়া মরিতে
কেবলি কি নর জনম লয়?"

স্বার্থত্যাগ ও পরোপকার জীবনের মহাব্রত। ঐ ব্রতে সুখ দুঃখ সকলই বিসর্জ্জন দাও। কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে কর্ম্ম কর। কাজ কি কেঁদে?

"যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয় ভার।"
"গেছে যাক্ ভেঙ্গে সুখের স্বপন,
স্বপন অমন ভেঙ্গেই থাকে।
গেছে যাক্ নিবে আলেয়ার আলো,
গৃহে এস আর ঘুরো'না পাঁকে।"

কিন্তু যতই যত্ন কর না কেন, নীতি ও দর্শনশাস্ত্রের অত্যুচ্চ সিংহাসনে আরূঢ় হও না কেন, কি যে এক বিষাদের ধারা হৃদয়ের মধ্য হইতে প্রবাহিত হয়, তাহা ত যাইবার নহে।

"লুকান বিষাদ আঁধার অমায়
মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মত,
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে
ঢালে সুমধুর আলোক কত।"

এ বিষাদেও সুখ আছে। এ বিষাদ শান্তির রূপান্তর মাত্র। এই বিষাদেরই আলোকের আভাষ প্রতীত হয়। কিন্তু সেকি সত্য সত্য আলোক—না আশার কুহক ?

"কোথা হ'তে আসিছে ঊষায়
সুরভিত মৃদু সমীরণ ?
কাঁটা যবে ফুটেছিল পায়,
হৃদে কি ফুটিল ফুল বন ?"

"সন্তর্পণে দুই হাতে অন্ধবৎ পথ হাতাড়িয়া,
সম্মুখেতে সাধুকণ্ঠে গীতধ্বনি শুনিয়া শুনিয়া,
চলিলাম কি জানি কোথায় !
আঁধারে চলেছি অন্ধ, আসে রাতি, শিশির বাতাস।
ঐ কি পোহাল নিশি ? একি উষ্ণ ঊষার নিশ্বাস ?
আলো যেন পড়িছে হিয়ায়।"

এই ঊষালোকেই বিশ্বরাজ্যের মধুর সঙ্গীত শোনা যায়। এই আলোকেই Lake poet'sএর ভাব স্বতঃ বিরাজিত। এইবার দেখুন সেই "Blessed mood" হইল কি না ?

"বিশ্ব-যন্ত্রে কি মধুর গীত
অনুদিন হইছে ধ্বনিত,
পশিতেছে নীরবে আত্মায় ;
অন্তহীন দেশ কাল পূরি
বাজিতেছে জাগরণী তূরী,
আহ্বানিছে কি জানি কোথায়।
কথা আর পারি না বলিতে
চাহি পথ নীরবে চলিতে,
মূক হয়ে শুনিবারে চাই ;"

স্থান পাইত না। তাহা হইলে সুবর্ণ-পারিজাত প্রস্ফুটিত হইয়া জগৎ আমোদিত করিত এবং সত্যযুগ কেবল কবির কল্পনাকে আশ্রয় করিত না। এই ভাবে যে উচ্চনীতি স্বতঃ প্রসৃত হয়, তাহা স্বার্থপরতার ভিত্তি অপেক্ষা করে না। যে ভাবে কবির হৃদয় হইতে নিম্নলিখিত কবিতা নিঃসৃত হইয়াছে, তাহার সহিত Utilitarianism কিম্বা Egoism মিশ্রিত Altruism এর কোন সম্বন্ধ নাই।

"সত্য দোষে আপনার চরণ স্খলিত তার ;
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে ?
তাই তার আর্ত্তরবে সকলে বধির হবে,
যে যাহার চলে' যাবে চাহিবে না ফিরে ?
বর্ত্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিল এক সাথে,
পথে নিবে গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই ;
তোমরা কি দয়া করে' তুলিবে না হাতে ধরে'
অর্দ্ধ দণ্ড তার লাগি থামিবে না ভাই ?"

প্রস্পেরোর উক্তির সহিত একবার ইহার তুলনা কর।

এই ত গেল অন্তরঙ্গ সমালোচনা। বহিরঙ্গ সমালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। কোন অন্ধ পাঠকও কবির মার্জ্জিত ভাষা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। এরূপ সুরুচিবিশিষ্ট কবিতা বঙ্গভাষায় বিরল।

কবিতাগুলি ভাল লাগিয়াছিল বলিয়া শত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে তাহার সমালোচনা করিলাম।

কবিতার উৎস শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ঐকান্তিক প্রবাহ এখন হৃদয় মধ্যে চির বিরাজিত, তাহারই লহরী দেখিয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। হইতে পারে, চলিত রীতি অনুসারে ইহা কোন সমালোচনাই নহে।

শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ।

বৰ্দ্ধনরাজগণ।

(১)

কলুষনাশিনী সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর পবিত্র সলিলে প্রক্ষালিত হইয়া যে ভূমি জগতে ধর্ম্মক্ষেত্র নামে পরিচিত হইয়াছিল;—অগ্নি, ইন্দ্র, সোম ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞস্থান বলিয়া যে ভূমি "দেবযজ্ঞক্ষেত্র" নামে শথপথ, ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তরেয় আরণ্যকে উক্ত হইয়াছে;—যে "চক্র" মধ্যে তপস্যা করিয়া চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত নরপতি সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন বলিয়া সেই চক্র জগতে কুরুক্ষেত্র নামে পরিচিত হইয়াছিল;—কুরুকুলাধম পাপমতি দুর্য্যোধন, ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডুপুত্রদিগকে বিনাশ করিতে যাইয়া যে স্থলে স্বয়ং একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত বিনষ্ট হইয়াছিল;—কোষকার হেমচন্দ্রের মতে সেই স্থলের অন্য নাম শ্রীকণ্ঠ। এই শ্রীকণ্ঠ প্রদেশে দেবাদিদেব কৈলাসনাথের এক প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। যেস্থানে ভূতভাবন ভবানী-পতির মন্দির বিরাজিত ছিল, তাহার নাম স্থান্বীশ্বর। উত্তরকালে স্থান্বীশ্বর একটি সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইয়াছিল। এই নগর যে বিষয় (পরগণা) মধ্যে অবস্থিত, তাহাকেও স্থান্বীশ্বর বলিত। স্থান্বীশ্বর অদ্যাপি জগতে থানেশ্বর নামে পরিচিত রহিয়াছে।

পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ বলেন, "স্থান্বীশ্বর রাজ্যের পরিধি ১১৬৭—১৪০০ মাইল। রাজধানীর পরিধি প্রায় ৪ মাইল। এই রাজ্যের ভূমি উর্ব্বরা। জলবায়ু উত্তম, কিন্তু উষ্ণ। অধিবাসীগণের প্রকৃতি সরল নহে। ইহারা ধনবান এবং আমোদ প্রমোদে অনুরক্ত। ইহারা ইন্দ্রজাল বিদ্যার বিশেষ সমাদর করিয়া থাকে। অধিকাংশ অধিবাসী বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, অল্প লোকে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। মূল্যবান পণ্যদ্রব্যসমূহ বিবিধ স্থান হইতে স্থান্বীশ্বরে আগত হয়। এই রাজ্যে তিনটি সঙ্ঘরাম আছে, তাহাতে ৭০০ শ্রমণ বাস করেন। তাঁহারা সকলেই হীনায়ন মতা-বলম্বী। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিধর্ম্মীদিগের কয়েক শত দেব মন্দির আছে।"

রাজধানীর (স্থান্বীশ্বরের) চারি পার্শ্বে, ২০০লি (৩০ কিম্বা ৪০ মাইল) পরিধি সমন্বিত স্থানকে অধিবাসীগণ "ধর্ম্মক্ষেত্র" বলিয়া থাকেন।*

---

* Beal's Translation of

পুরাকালে পুষ্পভূতি নামক জনৈক নরপতি এই স্থান্বীশ্বরে রাজত্ব করিতেন। তিনি শিবোপাসক ছিলেন। দক্ষিণদেশীয় ভৈরবাচার্য্য নামক জনৈক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ তাঁহার গুরু ছিলেন। রাজগুরু ভৈরবাচার্য্য একদা বিদ্যাধরত্ব-লাভ-কামনায় স্বীয় শিষ্যকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী নিশায় মহা শ্মশানে বসিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অকস্মাৎ ভূগর্ভ হইতে এক ভীষণকায় নাগ উত্থিত হইয়া বলিল, রে পামর! আমি শ্রীকণ্ঠ নাগ, যথাবিধি আমার পূজা না করিয়া তুই এই স্থানে সিদ্ধি কামনা করিতেছিস, এক্ষণেই এই দুষ্ট রাজার সহিত তোকে সংহার করিতেছি। রাজা, নাগের বাক্য-শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া,তাহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং অল্পকালমধ্যে শ্রীকণ্ঠ নাগকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া তাহার কেশাকর্ষণ করিলেন। ইত্যবসরে বিষ্ণুবক্ষোবাসিনী কমলা তথায় আবির্ভূত হইয়া নরপতির অলৌকিক বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার গুরুকে বিদ্যাধরত্ব প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, "নরপতে! আমার বরে তুমি এক বিশাল রাজবংশের প্রবর্ত্তক হইবে। তোমার বংশে হর্ষ নামে এক রাজচক্রবর্ত্তী জন্ম-গ্রহণ করিবেন, আমি স্বয়ং তাঁহার চামরধারণে নিযুক্ত থাকিব।" এই অসা-ধারণ বীর পুষ্পভূতি হইতে বর্দ্ধন রাজবংশের উৎপত্তি। কিন্তু পুষ্পভূতির পুত্র পৌত্রাদির নাম আমরা অবগত নহি এবং পুষ্পভূতির উত্তর পুরুষদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম কোন মহাত্মার নামের সহিত "বর্দ্ধন" শব্দ সংযোজিত হইয়া-ছিল, তাহাও স্থিররূপে লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত সুকঠিন।

ভরতপুর রাজ্যের অন্তর্গত বিজয়গড় নামক পার্ব্বত্য দুর্গ মধ্যে ৪২৮ সম্বতের * যে শিলাস্তম্ভলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যদি তাহা পুষ্পভূতির বংশধরের কীর্ত্তিস্তম্ভ হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, যশো-বর্দ্ধন নরপতি সর্ব্বপ্রথম এই গৌরবাত্মক শব্দ স্বীয় নামের সহিত সংযুক্ত

বিখ্যাত মন্ত্রী আবুল ফজল এই ধর্ম্মক্ষেত্র বা কুরুক্ষেত্রের পরিধি ৪০ ক্রোশ লিখিয়াছেন। (Gladwin's Ain Akbari. Vol. II. p. 517.) জেনারল কনিংহাম সাহেবের পরিদর্শন-কালে যে স্থান ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া অধিবাসীগণ নির্দ্দেশ করেন, তাহার পরিধি ৪৮ ক্রোশ। (Archaeological survey Report. Vol. II. p. 213. ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, কুরু-ক্ষেত্রের সীমা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে।

* ৪২৮ সম্বতকে ফ্লিট সাহেব বিক্রম অর্থাৎ মালবাব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরাও ইহাকে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতেছি। Corpus Inscriptionum Indicarum.

করিয়াছিলেন। উক্ত স্তম্ভে লিখিত আছে যে, ব্যাঘ্ররাতের প্রপৌত্র, যশোরাতের পৌত্র এবং যশোবর্দ্ধনের পুত্র বিষ্ণুবর্দ্ধন নামক রাজ্যাধিপতি এই যজ্ঞস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভলিপিতে পুষ্পভূতির নামোল্লেখ নাই।

পঞ্চনদ প্রদেশে প্রাচীনকালে সিংহপুর নামে একটি রাজ্য ছিল। পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ এই রাজ্যের পরিধি ৬০০ মাইল লিখিয়াছেন, তাঁহার মতে সিংহপুর নগর তক্ষশিলা হইতে ১৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। হিয়োনসাঙের সময়ে সিংহপুর রাজ্য কাশ্মীর রাজদণ্ডের অধীন ছিল বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে "বর্ম্মণ" আখ্যাধারী ক্ষত্রিয় নরপতিগণ এই রাজ্য শাসন করিতেন। লক্ষমণ্ডলপ্রশস্তিতে সিংহপুরের দ্বাদশ জন নরপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সেই বংশীয় দশম নরপতি অচলবর্ম্মণ সংগ্রামগঙ্গলের দ্বিতীয় পুত্র ভাস্করবর্ম্মণ রিপুগঙ্গল নরপতি কপিলবর্দ্ধনের কন্যা জয়াবলীকে বিবাহ করেন। এই রাজ্ঞী জয়াবলীর কন্যা ঈশ্বরাকে জালন্ধরাধিপতি চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করিয়াছিলেন।* জয়াবলীর পিতা ও ঈশ্বরার মাতামহ কপিলবর্দ্ধন পুষ্পভূতির বংশজাত কি না, তাহারও কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু সিংহপুর ও জালন্ধর রাজবংশের সহিত যাঁহার সম্পর্ক ছিল, তাঁহাকে স্থান্বীশ্বরের অধিপতি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কপিলবর্দ্ধনের নামের সহিত "রাজ"-শব্দ সংযুক্ত নাই। বোধ হয়, কবিতার ছন্দ স্থির রাখিবার জন্য প্রশস্তি-প্রণেতা বাসুদেব ভট্ট নৃপ-শব্দ পরিত্যাগ করিয়াছেন। †

৫৮৯ মালব (বিক্রম) অব্দের ক্ষোদিত মন্দসোরের শিলালিপিতে বিষ্ণুবর্দ্ধন নামক জনৈক বিজয়ী "নরাধীপের" উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শিলালিপিতে তাহাকে "রাজাধিরাজ, পরমেশ্বর" বিশেষণ দ্বারা সম্মানিত ও "ঔলিকরলাঞ্ছন" বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি পুষ্পভূতির বংশধর কি না, তাহার কোন উল্লেখ নাই। ‡

যাহা হউক, উত্তরকালে পুষ্পভূতির বংশে নরবর্দ্ধন নামে এক নরপতি

---

* Fpigraphia Indica, page 13.

† তস্য গুণার্জ্জিতদেবীশব্দাশ্রীকপিলবর্দ্ধনসুতাভূৎ।
রাজ্ঞী প্রাণেশা শ্রীজয়াবলীত্যেক পত্নীচ।

‡ Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. III

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম বজ্রিণী দেবী। বজ্রিণী দেবীর গর্ভে নরবর্দ্ধনের এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম রাজ্যবর্দ্ধন। মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন অপ্সরাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তদ্গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম আদিত্যবর্দ্ধন। রাজ্যবর্দ্ধন সূর্য্যোপাসক ছিলেন। বোধ হয়, এই জন্যই তিনি তাঁহার পুত্রকে "আদিত্যবর্দ্ধন" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ আদিত্যবর্দ্ধন পিতার ন্যায় পরমাদিত্যভক্ত ছিলেন। তিনি মগধের সুবিখ্যাত গুপ্তবংশীয় নরপতি দামোদর গুপ্তের কন্যা মহাসেনগুপ্তাদেবীকে বিবাহ করেন। এইরূপে জগদ্বিখ্যাত বর্দ্ধন ও গুপ্ত বংশের সংযোগে পরমাদিত্যভক্ত পরমভট্টারক পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ প্রতাপশিল প্রভাকরবর্দ্ধনের উৎপত্তি। মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন বাহুবলে হূণ জাতিকে দমন করিয়াছিলেন। সিন্ধু, গুর্জ্জর, গান্ধার, মালব ও লাটদেশে তাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছিল। তিনি যশোমতী নাম্নী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। পরমভট্টারিকা যশোমতী মহাদেবীর গর্ভে প্রভাকরবর্দ্ধনের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। জ্যেষ্ঠকুমার রাজ্যবর্দ্ধন, কনিষ্ঠকুমার হর্ষবর্দ্ধন; তাঁহার অন্যান্য নাম হর্ষদেব এবং শিলাদিত্য। রাজকুমারীর নাম "রাজ্যশ্রী মহাদেবী"।

বর্দ্ধনবংশীয়গণ যৎকালে স্থাণ্বীশ্বর রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, সেই সময় "বর্ম্মা" আখ্যাধারী মৌখরী-বংশীয়গণ কনোজের রাজদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। এই বংশীয় অবন্তীবর্ম্মার পুত্র গ্রহবর্ম্মার সহিত রাজ্যশ্রীর পরিণয়-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

মাধবগুপ্ত নামক এক ব্যক্তি প্রভাকরবর্দ্ধনের উপদেষ্টা ছিলেন। আমাদের বিবেচনায় ইনি প্রভাকরবর্দ্ধনের মাতুল মগধেশ্বর মহাসেন গুপ্তের পুত্র।* তারক নামক জনৈক জ্যোতির্ব্বেদ পণ্ডিত এবং সুসেন নামক জনৈক চিকিৎসক প্রভাকরবর্দ্ধনের সভায় উপস্থিত ছিলেন। মালব রাজপুত্র দেবগুপ্ত বর্দ্ধনরাজসভায় প্রতিভূস্বরূপ উপস্থিত ছিলেন। মহারাণী যশোমতীর ভ্রাতৃপুত্র ভণ্ডি এই রাজসংসারে প্রতিপালিত হন। তিনি প্রথ-

---

* আপসহারর ক্ষোদিত লিপির পঞ্চদশ পংক্তিতে মাধব গুপ্তের বর্ণনায় লিখিত আছে, "শ্রীহর্ষদেব নিজ সঙ্গম বাঞ্ছয়।" ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে, পিতার ন্যায় হর্ষদেবও মাধব গুপ্তের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

মতঃ কুমারদ্বয়ের শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। উত্তরকালে তিনি রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের মন্ত্রীত্ব করিয়া গিয়াছেন।

রাজপুত্রগণ সুশিক্ষিত হইলে পর, মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন হিমালয়ের পরপারবাসী হূণজাতিকে দমন করিবার জন্য জ্যেষ্ঠকুমার রাজ্যবর্দ্ধনকে উত্তরাভিমুখে প্রেরণ করেন। কুমার হর্ষবর্দ্ধন কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত হিমালয়াবধি অগ্রজের অনুসরণ করিয়াছিলেন; রাজ্যবর্দ্ধন প্রস্থান করিলে পর, হর্ষবর্দ্ধন মৃগয়া উপলক্ষে কিছুকাল হিমালয় প্রদেশে অতিবাহিত করেন। তৎকালে একদা কুরঙ্গক নামক জনৈক বার্ত্তাবহ মস্তকে নীলবসন ধারণ পূর্ব্বক কুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের প্রবল দাহজ্বরের সংবাদ জ্ঞাপন করিল।* তৎশ্রবণে কুমার উদ্বিগ্নচিত্তে রাজধানীতে গমন করেন। হর্ষবর্দ্ধন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া পিতার মুমূর্ষু অবস্থা দর্শনে ব্যাকুলচিত্তে উষ্ট্রারোহী কিঙ্কর দ্বারা স্বীয় অগ্রজসমীপে সেই সংবাদ উপর্য্যুপরি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিয়া, আদর্শ পতিব্রতা মহিষী যশোমতী প্রজ্বলিত চিতায় প্রবেশ করিলেন। কুমার হর্ষবর্দ্ধন অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিনয় ও করুণ বাক্য দ্বারা বিবিধ প্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও স্বীয় জননীকে এই দুষ্কর কার্য্য হইতে বিরত করিতে সক্ষম হন নাই। মহিষী যশোমতীর চিতায় প্রবেশের অল্পকাল পরেই, প্রভাকরবর্দ্ধন ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কুমার হর্ষ, এইরূপে শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া, জ্যেষ্ঠের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

---

* রাজবংশীয়দিগের নিকট তাঁহাদের কোন আত্মীয়ের অশুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিবার কালে নীলবসন ধারণ করিবার প্রথা দীর্ঘকাল সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। দিল্লীর মোগল রাজদরবারে এই প্রথা প্রচলিত থাকার প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সম্রাট আকবরের মন্ত্রী ও প্রিয় সুহৃদ আবুল ফজলের হত্যাকাণ্ড কোন ব্যক্তি সম্রাটকে মৌখিক জ্ঞাপন করিতে অক্ষম হইলে, আবুল

প্রকৃতির পরিচয়।

২

কল্পনা স্মৃতিমূলক চিন্তাসাপেক্ষ। পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে, এক প্রকারের স্মৃতি-শক্তি অতি সামান্য জীবেও দেখা যায়;—স্মৃতির জটিলতা ও সূক্ষ্মতার তাহাদের অভাব আছে বটে, কিন্তু গাঢ়তার অভাব নাই। যাহা দেখা গিয়াছে বা শুনা গিয়াছে, তাহা স্মরণ থাকিলে, তাহা হইতে যোগ বিযোগ করিয়া, যাহা দেখা যায় নাই বা শুনা যায় নাই, তাহার কল্পনা করা যাইতে পারে। মনুষ্য দেখিয়াছি, সিংহ দেখিয়াছি—সিংহের মুখে মনুষ্যের দেহ ও বানরের লাঙ্গূল যোগ করিয়া, যাহা কখন দেখি নাই, এমন একটি নৃসিংহ বানরমূর্ত্তি কল্পনা করিতে পারি। অবশ্য এরূপ কল্পনা খুব নিম্ন শ্রেণীর—যে কল্পনায় কবিত্বের উদ্ভব,তাহা বর্ব্বর মনুষ্যেও নাই, পশু পক্ষীতেও নাই। সুতরাং বলিতে হইবে, সভ্যজনসুলভ, ব্যাবৃত, জটিল, সূক্ষ্ম কল্পনা নিম্ন জীবে না থাকিলেও, অব্যাবৃত কল্পনার গভীরতা তাহাদের সামান্য নহে। কল্পনার একটি রূপ স্বপ্ন। ছয় মাসের শিশুকেও স্বপ্নে হাসিতে ও কাঁদিতে দেখা গিয়াছে। বর্ব্বর মানব সমাজের শিশু—সুতরাং স্বপ্নে বর্ব্বরদিগের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে. এবং পশু পক্ষীদিগকে স্বপ্ন দেখিতে দেখিলে অনুমান করা যাইবে, তাহাদেরও কল্পনাশক্তি আছে।

কালিদাস ও সেক্সপিয়র পৃথিবীতে দুর্লভ। পশু পক্ষীর কল্পনার পরিমাণ করিতে হইলে বর্ব্বরদিগের কল্পনাশক্তির প্রথমে পরিচয় লইতে হইবে। ক্রমবিকাশে আকাশ পাতালের তুলনা নাই। স্তরে স্তরে ধীরে ধীরে বন্ধনী ধরিয়া নামিয়া গেলে দেখা যাইবে, আকস্মিক অদ্ভুত ব্যাবৃতি মানব প্রকৃতিতে ঘটে নাই। অশ্বত্থের শ্যামল পল্লব গগণ ভেদ করিয়া উঠিলেও তাহার মূল অসূর্য্যম্পশ্য ধরিত্রীর আঁধার গহ্বরে।

ভয়, হিংসা, ক্রোধ, ঘৃণা, দুঃখ, শোক, লজ্জা; অনুতাপ, নৈষ্ঠুর্য্য, প্রতারণা, সহানুভূতি, স্নেহ, অহঙ্কার এবং বিস্ময়, অতীত স্মৃতি ও অনাগত কল্পনার উপর নির্ভর করে। আমরা দেখাইব, নিম্ন শ্রেণীর জীবপ্রকৃতিতে ইহাদের

হয়। আশা ও আশঙ্কা কল্পনামূলক, উহারাই স্নেহ, সহানুভূতি, সৌজন্য, হিংসা, দ্বেষ, প্রতারণার প্রসূতি।

যে সকল পশু পক্ষী আমাদের গৃহে বা নিকটে বাস করে, তাহাদের সন্তানস্নেহ সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শালিখ পাখিগুলি আপনারা না খাইয়া জলে কাদায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত যত্নে সন্তানদিগকে প্রতিপালন করে। এজন্য বর্ষাকালে ইহাদিগকে দুর্ব্বল ও কদাকার দেখা যায়। সম্প্রতি কলম্বিয়া নগরের কর্ণেল মাক্‌ডোলাণ্ড ইণ্ডিয়ানেপলিস সংবাদপত্রে একটি গরুর স্নেহের কথা লিখিয়াছেন। একদিন চরাইতে লইয়া যাইবার সময় দেখা গেল, যে নদীটি পার হইয়া গোচরে যাইতে হইত, সেটিতে বান আসিয়াছে, গরুগুলিকে অগত্যা নদী পার হইতে হইল, স্রোতের বেগে অনেকে কিছু দূর ভাসিয়া গেল—কষ্টে তটের নিকট না পৌছিতেই একটি গরু চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল, তাহার বাছুরটি অনেক দূর ভাসিয়া গিয়াছে, এবং সাঁতার দিতে না পারিয়া ডুবিবার মত হইয়াছে। দেখিয়াই সে পুনরায় ফিরিয়া সাঁতার দিতে দিতে বাছুরের পার্শ্বে গিয়া গা ঠেস দিয়া তাহাকে ভাসিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিল। তাহার আশ্রয় পাইয়া, বাছুরটি আস্তে আস্তে কিনারায় পৌছিল।

সার জন লবক বলেন, পিপীলি া ও মধুমক্ষীর বুদ্ধির যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাইলেও তাহাদের মধ্যে অপত্যস্নেহ কি সহানুভূতির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। কোন কোন পিপীলিকা বা মধুমক্ষী মধুপানে উন্মত্ত স্বজাতীয়কে চলৎশক্তিরহিত দেখিলে বা আহত দেখিলে তাহাকে যত্ন করিয়া বাসায় বহিয়া লইয়া যায়, স্নান করাইয়া দেয়, বা অন্য রকম সেবা করে,—ইহা কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। সঙ্গীকে আহত হইতে দেখিয়া কোন কোন জাতীয় সর্প প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে সত্য বটে; এবং শোল প্রভৃতি কোন কোন মৎস্যের অপত্যস্নেহ দেখা যায়। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, অপত্যস্নেহ ও সহানুভূতির ন্যায় সুকুমার বৃত্তি বুদ্ধি-বিকাশের পরে ব্যাবৃতি লাভ করে। পক্ষীদিগের মধ্যেই এই দুইটি বৃত্তির প্রথম বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

পিপীলিকা ও মধুমক্ষীগণ বাসায় কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার কবর দিয়া থাকে। ভীমরুল মারিয়া দেখিয়াছি, অন্য ভীমরুল মৃতদেহ লইয়া পলায়ন

মাছি মারিয়া দেখিয়াছি; অন্য মাছি স্বজাতীয় মৃতের উদরস্থ আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া মৃতদেহ যথাস্থানে ফেলিয়া পলায়। হইতে পারে, ভীমরুল মৃতের দেহস্থ আহার্য্যের লোভে তাহাকে লইয়া যায়। কি জন্য ভীমরুল এরূপ করে, এখনও নিশ্চয়রূপে অবধারণ করা যায় নাই।

বর্ব্বরদিগের অপত্যস্নেহ ও সহানুভূতির নিকৃষ্টতা দেখিলে, পক্ষীর নিম্নতর জীবে এই দুইটি বৃত্তির অভাব দেখিয়া দুঃখিত হইবার কারণ থাকে না। বরং পক্ষী ও পশুদের স্নেহের তুলনায় বর্ব্বরের হীনতা লক্ষ্য করিয়া লজ্জিত হইতে হয়। ফিজি ও নবগিনির অধিবাসীরা সন্তানদিগকে বড় ভাল বাসে, অথচ আবশ্যক হইলে দাসরূপেও বিক্রয় করিয়া থাকে। অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা সন্তানস্নেহের জন্য বিখ্যাত; কিন্তু কখন কখন সন্তান কাটিয়া তাহার চর্ব্বিতে মাছ ধরিবার এবং মাংসে কুম্ভীর ধরিবার টোপ করিয়া থাকে, এবং পীড়িত হইলে সন্তানকে ফেলিয়া দেয়। তাসমেনিয়াতেও শিশুবধের বড় প্রাদুর্ভাব। প্রসববেদনায় মার মৃত্যু হইলে, তথাকার অসভ্যেরা জীবন্ত শিশুকে হত্যা করিতে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করে না। মানবপ্রকৃতি; ১ম খণ্ড।

পক্ষান্তরে কপোতমিথুনের দাম্পত্যপ্রীতি মানবসমাজের আদর্শ। সন্তানবিরহে কুক্কুটীর কাতরক্রন্দন পাষাণবক্ষেও জলধারা আকর্ষণ করে। পারিসের পশুবাটীকায় একটি অষ্ট্রীচ পত্নীবিরহে অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। বিল সাহেবের হংসটি চোরে লইয়া যায়, স্বামীবিরহে হংসী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া ম্লান মুখে মলিন বেশে এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকে। সেই সময় আর একটি হংস তাহার প্রণয়প্রার্থী হয়, হংসী তাহাকে একটুও প্রশয় দেয় নাই। চোরের নিকট হইতে হংস ফিরিয়া আসিল, উভয়ের আনন্দকোলাহল ও প্রণয়সম্ভাষণে বিল সাহেব চমকিত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, হংসী স্বামীকে অপর হংসের দুর্ব্বৃত্ততার কথা বলিয়া দিয়াছিল, কারণ অনতিবিলম্বে হংস প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করিয়া অন্ধ করিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া শেষে মারিয়া ফেলিয়াছিল।

স্বামীর মৃত্যু হইলে, রাজহংসী ও পারাবত বহুদিন পর্য্যন্ত যে প্রকার ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাহা বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বিধবার আদর্শ। কেহ বা অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। বলপূর্ব্বক স্থানান্তরিত না করিলে স্বামীর মৃতদেহপার্শ্বে দিবানিশি পড়িয়া থাকিতে অনেককে দেখা যায়। তাহারা

মৃতদেহ রক্ষা করে, কখন বা সাদরসম্ভাষণে আহ্বান করে, কখন বা আলিঙ্গন করিয়া থাকে। কালিদাসের রতির দুর্দ্দশা তখন প্রত্যক্ষ করা যায়।

পক্ষীদিগের দাম্পত্যানুরাগের আর একটি নিদর্শন, তাহাদের বেশভূষা ও গৃহনির্ম্মাণ। বধূ গৃহে আনিবার পূর্ব্বে, কোন কোন পক্ষী অতি যত্নে একটি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়াদেশীয় এক প্রকার পক্ষী (Bower birds) নীড়মধ্যে শয়নের ও উপবেশনের বিভিন্ন কুট্টিম নির্ম্মাণ করে, এবং গৃহের সম্মুখে একটি প্রাঙ্গণ প্রস্তুত করে। বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তর বা শুক্তিখণ্ড সংগ্রহ করিয়া, প্রাঙ্গণ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে খচিত করে ;—দেখিলে কাহারও সন্দেহ করিবার ক্ষমতা থাকে না যে, তাহাদের সৌন্দর্য্যানুভাবকতা শক্তি অসামান্য। এরূপও শুনা গিয়াছে, বিহারের হিন্দুস্থানী যুবক যেমন শোভার জন্য রাত্রিকালে টুপির ভিতর জোনাকী পুরিয়া রাখে, এই জাতীয় পক্ষী গ্যাসের আলো যোগাইতে না পারিয়া রাত্রিকালে খদ্যোতের আলোকে গৃহ প্রাঙ্গণ আলোকিত করে। গৃহনির্ম্মাণ শেষ হইলে, বিহঙ্গযুবক চঞ্চু দ্বারা কেশ সম্মার্জ্জন করিয়া, চঞ্চুলগ্ন তৈলাক্ত পদার্থে দেহের চাকচিক্য সম্পাদন করিয়া, সেই অপূর্ব্ব প্রাঙ্গণে বসিয়া পঞ্চমস্বরে ঝঙ্কার করিতে থাকে। দেহের সৌন্দর্য্য, স্বরের মধুরতা ও গৃহের বিচিত্রতা দেখিয়া, অনেক যুবতীই তাহার অঙ্কভাগিনী হইতে প্রয়াস পায়।

পক্ষীদিগের অপত্যানুরাগও অসামান্য। ইহার নিত্য নিদর্শন আমরা দেখিয়া থাকি। সুতরাং উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। কখন কখন অপত্যানুরাগের আধিক্যে, একটি পক্ষী বলপূর্ব্বক অপরের বাসা অধিকার করিয়া, তাহার ডিম্বে তা দেয়। এবং তাহার সন্তানকে আপনার মত করিয়া যত্নে প্রতিপালন করে।

পক্ষীদিগের সহানুভূতিও সামান্য নহে। উপযুক্ত কুমারীর অভাবে, অন্যের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া, একটি সোয়ান হংস একটি বৃদ্ধা রাজহংসীকে বিবাহ করিয়াছিল। বার্দ্ধক্যবশতঃ বৃদ্ধার দৃষ্টিশক্তির অভাব হয় ; সোয়ান চঞ্চুপুটে হংসীর গ্রীবা ধরিয়া তাহাকে জলে লইয়া ছাড়িয়া দিত, এবং নিকটে থাকিয়া তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিত। এবং জলভ্রমণ শেষ হইলে, আবার তেমনি করিয়া ধরিয়া তাহাকে গৃহে আনিত। শিশু-সন্তান পথে চলিতে গর্ত্তে পড়িয়া গেলে,

সাহেব একটি জলচর টার্ণ পক্ষীকে সমুদ্রে গুলি করিয়া আহত করিয়াছিলেন। পক্ষীটিকে ধরিতে যাইবামাত্র আর দুইটি টার্ণ আসিয়া, এক একটি এক এক পক্ষ ধরিয়া, আহতটিকে লইয়া পলায়ন করিল। বার চৌদ্দ হাত দূরে যাইয়া শ্রান্তি বোধ করিলে, তাহারা ধীরে ধীরে তাহাকে সমুদ্রবক্ষে বসাইয়া দিল, তখন আর দুইটি আসিয়া তাহাকে সেইরূপে লইয়া পলায়ন করিল। এইরূপে চারিটি পক্ষী মিলিয়া আহত পক্ষীটিকে সমুদ্রতটে একটি গিরিশিখরে লইয়া স্থাপন করিল। এডোয়ার্ড সাহেব সেখানে অনুসরণ করিলে এক পাল পক্ষী আসিয়া তাহাকে কোথায় লইয়া পলাইল, সাহেব তাহার অনুসন্ধান পাইলেন না। মেক্সিকোর লোকেরা একটি নূতন উপায়ে মৎস্য শিকার করে। তাহারা একটি পেলিকান পাখী ধরিয়া তাহার ডানা ভাঙ্গিয়া দিয়া নিকটে কোথাও লুকাইয়া বসে। আহত পক্ষীর চীৎকারে অন্য পেলিকানেরা সেখানে আসিয়া উদরস্থ মৎস্য বমন করিয়া তাহাকে খাইতে দেয়; ধীবরেরা তখন বাহির হইয়া সেগুলি আত্মসাৎ করে।

সহানুভূতি হইতে সামাজিকতার উদ্ভব হয়। কোন কোন মৎস্য দল বাঁধিয়া বাস করিলেও প্রকৃত সামাজিকতার নিদর্শন প্রথমে পক্ষীজাতির মধ্যে দেখা যায়। সামাজিকতা সহানুভূতির পরিচায়ক।

"বায়সেরা বহু পরিবার একত্রে বাস করে, অপরিচিতকে স্থান দেয় না। একপ্রকার শাসন-নীতি ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। দোষীরা দণ্ড পায়, দোষের পরিমাণানুসারে দণ্ডের তারতম্য হইয়া থাকে, এবং গুরুতর দোষে নির্ব্বাসনের বিধান আছে। অর্জ্জনকারী স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি ভোগ করিতে পারে। ভবিষ্যতের বিপদ নিবারণের উপায় করিতে জানে। চরিবার সময় ইহারা প্রহরী রাখিয়া চরে।" মানবপ্রকৃতি, ১ম খণ্ড।

মানসিক ব্যাবৃতি কিয়ৎপরিমাণে দৈহিক ব্যাবৃতির অনুরূপ। অপত্যস্নেহ, সহানুভূতি, সামাজিকতা ও সৌন্দর্য্যানুভাবকতায়, পশুগণ, পক্ষীদিগের শ্রেষ্ঠ।

"উত্তর আমেরিকার বনে দেখা গিয়াছে, মহিষীদিগের প্রসব সময়ে মহিষেরা তাহাদিগকে মধ্যে রাখিয়া আপনারা দল বাঁধিয়া পাহারা দিতে থাকে,—যেন হিংস্র জন্তুরা বৎসদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে। পশুদিগের মধ্যে সর্দ্দার বা রাজা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও তাহাদিগের

শিকারীরা কাঙ্গারুকে তাড়া করিলে, সে দৌড়িয়া পালাইবার সময় তলপেট হইতে এক একটি সন্তান লইয়া দূরে দূরে ফেলিয়া যায়। সুতরাং সে হত হইলেও তাহার সন্তানগণ রক্ষা পায়;—অনেক সময় এইরূপে দেহের ভার লাঘব হওয়াতে, সে অধিক দৌড়াইতে পারিয়া শিকারীদিগের নিকট পরিত্রাণ পায়; তখন ফিরিয়া আসিয়া সন্তানগুলিকে সংগ্রহ করে। স্ত্রীলকে তাড়া করিলে, সে সন্তানদিগকে পলাইবার অবসর দিবার জন্য আপনি না পালাইয়া শত্রুকে আক্রমণ করে। উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে থাকে, সেই অবসরে সন্তানগণ পালাইয়া যায়;—অনাথিনী আপনার প্রাণ দিয়া সন্তান-দিগকে রক্ষা করে।

ক্রেপোল সাহেব লিখিয়াছেন, টরেণ্টো নগরে এক কৃষকের একটি অশ্ব ছিল। একদিন কৃষকপত্নী সাঁকো পার হইবার সময় দৈবাৎ পা পিছলিয়া নদীতে পড়িয়া যান। নিকটে কেহ ছিল না, তাঁহার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, সহসা অশ্বটি তাঁহার এই দুরবস্থা দেখিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাঁহার কাপড় মুখে ধরিয়া ভাসাইয়া রাখে, অবশেষে অন্য লোক আসিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করে।

ষ্ট্রীকলাণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন, একটি ঘোটকীর দশ বার বৎসর বয়সে সন্তান হয়; ঘোটকীর এক চোখ কানা ছিল; ঘুরিতে ফিরিতে গেলে সে দেখিতে না পাইয়া সন্তানটিকে মাড়াইয়া ফেলিত, এইরূপে তাহার পদাঘাতে সন্তানটি মারা যায়। পর বৎসর তাহার আর একটি সন্তান হয়, সাহেব ভাবিয়াছিলেন, এটাও সেইরূপে মারা যাইবে। কিন্তু এবার সে ঘুরিবার ফিরিবার পূর্ব্বে ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া লইত, সন্তানটি কোথায় আছে, তাহার পর পা ফেলিত, এবার এক দিনও সে সন্তানটিকে মাড়ায় নাই। অশ্বের স্মৃতি, কল্পনা ও বিচারশক্তির ইহা একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত।

স্পেন দেশে কোন ঘোড়া দুষ্টামী করিলে তাহার সাজ সজ্জা কাড়িয়া লইয়া অন্য অশ্বকে দেওয়া হয়। অপমান ও হিংসার এই সামান্য দণ্ডে তাহার দুষ্টপণা সারিয়া যায়। ইহাতে অশ্বের স্মৃতি, কল্পনা, সৌন্দর্য্যানুভাব-কতা ও বিচারশক্তির যুগপৎ পরিচয় পাওয়া যায়। গলার ঘণ্টা কি মালা খুলিয়া লইয়া স্বজাতির অন্য কাহাকেও পরাইয়া দিলে, মেষ ও বৃষের বড়ই কষ্ট হয়, দেখা গিয়াছে।

হরিণকে আহত করিয়া দেখা গিয়াছে, অন্যেরা শৃঙ্গ দিয়া ঠেলিয়া আহতের পলায়নের সাহায্য করে। বীবরদিগের সামাজিকতার কথা সকলেই শুনিয়াছেন। সন্তান সন্ততি লইয়া সংখ্যায় অনেকগুলি হইলে বীবরেরা প্রাচীন বাস ছাড়িয়া নূতন বাস স্থাপন করে। যুবকেরা নদীর প্রান্তদিকে ও বৃদ্ধেরা উৎসমুখে চলিয়া যায়। উৎসমুখে বাসোপযোগী স্থান সুলভ ও গৃহনির্ম্মাণের কাষ্ঠ সুপ্রাপ্য, বৃদ্ধেরা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও অক্ষম, এজন্য যুবকেরা তাহাদিগকে সেই দিক ছাড়িয়া দিয়া আপনারা অন্য দিকে চলিয়া যায়।

হৃদয়ের কোমলতা ও মহত্ত্বে হস্তী সকল পশুর শ্রেষ্ঠ। অন্যায় অত্যাচার না হইলে হস্তী প্রতিহিংসা করে না। পক্ষান্তরে তাহাদের বালকবালিকার প্রতি কোমল ব্যবহার, পরোপকারিতা ও সহিষ্ণুতার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

হস্তীর প্রতিহিংসা পরীক্ষা করিবার জন্য কাপ্তেন শিপ একটি হস্তীকে রুটী ও মাখমের সঙ্গে মরিচ গুঁড়া মিশাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার ছয় সপ্তাহ পরে সাহেব হাতীটির কাছে গিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। হস্তীর রাগের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, সাহেব ভাবিতেছিলেন,—পরীক্ষা সফল হইল না, ভাবনায় একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন। সহসা সময় বুঝিয়া হাতী শুঁড় হইতে পচা জল বাহির করিয়া সাহেবের সমস্ত শরীর ভাসাইয়া দিল। সিংহলের গবর্ণর টেলণ্ট সাহেব লিখিয়াছেন, এক ব্যক্তি জঙ্গলে একটি হস্তীকে আঘাত করিয়াছিল, হস্তী তাহার অনুসরণ করিয়া সহরে আসে, রাজপথ দিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হয়, শেষে সহস্র লোকের সাক্ষাতে তাহাকে পদতলে পিষ্ট করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জঙ্গলে ফিরিয়া যায়।

হস্তীরা দলপতির একান্ত আজ্ঞাবহ। দলপতির বৃহৎ দন্তের লোভে শিকারীরা তাহাকেই হত্যা করিতে চেষ্টা করে। দেখা গিয়াছে, সেই সময়ে দলের সকলে তাহাকে এমন করিয়া ঘেরিয়া রক্ষা করে যে, অনেকগুলিকে অগ্রে হত্যা না করিলে দলপতিকে পাওয়া যায় না। কখন বা আহত দলপতিকে অন্যেরা স্কন্ধে তুলিয়া জঙ্গলে পলায়ন করে।

লক্ষ্ণৌ নগরে একবার এমন মারীভয় হয় যে, মৃত ও পীড়িতে রাজপথ

ভ্রমণে বাহির হইয়া এমন দ্রুতবেগে হস্তী চালনা করেন যে, শত শত লোক পদদলিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তাঁহার ভ্রুক্ষেপ ছিল না। কিন্তু হস্তী এমনি সাবধানে পদক্ষেপ করিয়াছিল যে, একজনেরও আঘাত লাগে নাই। লরিষ্টন সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বুলি নামে একটি হাতীকে সার্কাসে খেলা করিবার জন্য বিলাতে লইয়া যাওয়া হয়। একটা কাঠের সাঁকো করিয়া তাহার উপর হাতী চড়িয়া পার হইবার তামাসা দেখান হইবে, স্থির হয়। তামাসা কেমন হইবে দেখিবার জন্য, অভিনয়ের পূর্ব্ব দিন মাহুত হাতী চড়িয়া সাঁকো পার হইতে যায়। হাতী বুঝিতে পারে, সাঁকো তাহার ভার সহিবে না। এজন্য সে পার হইতে চাহে না, তখন অধিকারীর উত্তেজনায় ডাঙ্গস দিয়া মাহুত হাতীকে এত আঘাত করে যে, দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তে সেই স্থান ভাসিয়া গিয়াছিল। হাতীর চীৎকারে ইয়ং নামে একটি সাহেব সেখানে যাইয়া উপস্থিত হন। এবং হাতীর শুঁড়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করেন, অধিকারীর উত্তেজনায় মাহুত আবার মারিতে প্রবৃত্ত হইলে, ইয়ং তাহাকে নিবৃত্ত করেন, উভয়ে একটা বচসা হয়; এমন সময়ে যে জাহাজে হাতী বিলাত গিয়াছিল, সেই জাহাজের কাপ্তেন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়াই হাতী তাঁহার নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে যাইয়া শুঁড় দিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ক্ষত স্থানে হাত লাগাইয়া দেয়, এবং পুনরায় সেই রক্তমাখা হাত লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরে, এই শোকজনক দৃশ্যে অধিকারীর পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়, সে দৌড়িয়া গিয়া কিছু খাবার আনিয়া হাতীকে দেয়, শুঁড়ে করিয়া তাহা লইয়া হাতী পদতলে পেষণ করে, কিন্তু ইয়ং সাহেব কিছু আনিয়া দিলে সে আদর করিয়া তাহা খায়, এবং শুঁড় দিয়া ইয়ং সাহেবের কোমর জড়াইয়া আলিঙ্গন করে; যেন বলিল, বুলী নির্দ্দয়কে ঘৃণা করে, কিন্তু উপকারীর নিকট সে চিরদিন কৃতজ্ঞ।

বিড়ালের অপত্যস্নেহ ও মূষিক বা পক্ষীর প্রতি নিষ্ঠুরতা সকলেই দেখিয়াছেন। কিন্তু বিড়ালের সহানুভূতি আছে, অনেকের বিশ্বাস নাই। এজন্য সেই প্রকার দুই একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইবে। ফিচ সাহেব লিখিয়াছেন, দেখা গেল,—একদিন বিড়ালটি, কতকগুলি মাছের কাঁটা মুখে করিয়া বাহিরের দিকে যাইতেছে; তাহার পিছে পিছে যাইয়া দেখিলাম,

কাঁটাগুলি তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিল ; সেগুলি খাওয়া হইলে সে ফিরিয়া আসিয়া, আরো কতকগুলি লইয়া সেইরূপে তাহাকে খাওয়াইয়া আসিল ; তাহার পর ঘরে আসিয়া বাকী কাঁটাগুলি আপনি খাইল। টম্‌সন সাহেব আর একটি বিড়ালের কথা লিখিয়াছেন। সে আপনি না খাওয়াইয়া পাচিকার কাপড় ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া অতিথিকে দেখাইয়া দিল। পাচিকা তাহাকে খাইতে দিলে,সে অতিথির আহারকালে তাহার চারিদিকে ডাকিয়া ডাকিয়া আনন্দে ঘুরিয়াছিল। ম্যাকফারসন সাহেব লিখিয়াছেন, তাঁহার একটি বড় ও একটি ছোট বিড়াল ছিল; বড় বিড়ালটি ছোটটিকে দেখিতে পারিত না। কিন্তু একদিন ছোট বিড়ালটি একটি গর্ত্তে ঢুকিয়া মাটীচাপা পড়িলে, সে পাচিকার কাপড় টানিয়া সেই স্থানটি দেখাইয়া দেয়—পাচিকা যতক্ষণ মাটী খুঁড়িয়া তাহার উদ্ধার করিয়াছিল, সে ততক্ষণ বিশেষ আগ্রহের সহিত সেখানে বসিয়াছিল। কিন্তু উদ্ধার সমাধা হইলে, সে অমনি সেখান হইতে চলিয়া যায়, আনন্দের কোন চিহ্ন তাহাকে দেখিতে দেয় নাই। যেন তাহার ইচ্ছা ছিল, ছোট রাণী জানিতে না পারে, সে তাহার জন্য কোথায়ও একটু মাত্র ভালবাসা পোষণ করে।

আত্মসম্মানজ্ঞান কুকুরের বড় প্রবল। উচ্চজাতীয় কুকুর নিম্নজাতীয়ের সহবাসে অপমান জ্ঞান করে। রোমানীজ সাহেব লিখিয়াছেন, কেহ তাঁহার টেরিয়ারকে কুকথা বলিলে বা খরদৃষ্টি করিলে, সে বিষাদে সারাদিন ম্রিয়মাণ থাকিত। একদিন তাঁহার ভাইয়ের সঙ্গে কুকুরটি বেড়াইতে যায়—পথে অন্য একটি কুকুরের সঙ্গে খেলিবার সময় সাহেব তাহাকে দস্তানা ফেলিয়া মারিয়াছিলেন। তদবধি সে কখন তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে যায় নাই। রোমানিজ সাহেব গাড়ী চড়িয়া কুকুর সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেন। ঘোড়াকে চাবুক মারিবার উপক্রম করিলেই, কুকুরটি দাঁত দিয়া তাঁহার কাপড় টানিয়া নিবারণ করিত। স্নান করিতে কুকুরটির বড় আপত্তি ছিল। কেহ স্নান করাইতে গেলে সে কামড়াইতে আসিত, উপবাস, ভৎর্সনা, প্রহার, কিছুতেই তাহাকে রাজি করিতে পারা যায় নাই। তখন সাহেব তাহাকে সঙ্গে যাইতে দিতেন না। আদর করিয়া কাছে আসিলে উপেক্ষা করিতেন ;—এইরূপ কয়েকদিন করিলে সে বিষাদে মৃতপ্রায় হইল, দশ দিন পর্য্যন্ত মনে মনে আন্দোলন করিয়া এমনি ভাব

তাহাকে খুব ঘসিয়া মাজিয়া স্নান করাইয়া দেওয়া হইল; সে কোন আপত্তি করিল না, এবং স্নানান্তে সাহেবের নিকট আসিয়া অভিবাদন করিয়া জানাইল, আমি জানি এখন আপনি আদর করিবেন। তদবধি সে স্নান করিতে আর কখন আপত্তি করে নাই। কুকুরের সন্তানস্নেহ সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সহানুভূতির দৃষ্টান্ত পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেওয়া গিয়াছে—নূতন দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই।

বানরের স্নেহ, সহানুভূতি ও সামাজিকতা, বর্ব্বরের অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট নহে। দেওঘরে একদিন দেখিয়াছিলাম, এক বানরকুমারী ভাইটিকে লইয়া কতই আদর করিতেছে, কোলে বসাইতেছে, কাঁধে চড়াইতেছে, দোলাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই ভায়ের রোদন নিবারণ করিতে পারিতেছে না। অবাক হইয়া ভ্রাতৃস্নেহ দেখিতে লাগিলাম, তখন শিশুর জননী আসিয়া তাহাকে কোলে লইল—অমনি ক্রন্দন নিবারিত হইল। বানরেরা শিশুর নিদ্রাকালে মাছি তাড়ায়, নদীর জলে মুখ ধোয়াইয়া দেয়, কখন বা সন্তানের শোকে প্রাণত্যাগ করে। অনাথদিগকে অন্যেরা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করে। বনমানুষদিগকে গুলি করিয়া দেখা গিয়াছে, অন্যেরা তাহাকে কাঁধে লইয়া পলায়ন করে। এক সাহেব একটি বানরীকে হত্যা করিয়া তাঁবুতে লইয়া গিয়াছিলেন—অবিলম্বে চল্লিশ পঞ্চাশটি বানর আসিয়া তাঁবু ঘেরিয়া ফেলিল। সাহেব বন্দুক বাহির করিবামাত্র অবরোধকারীরা পলায়ন করিল, বন্দুকের ক্ষমতা তাহাদের স্মরণ ছিল, কিন্তু দলপতি পলায়ন করিল না। বলে পারিবে না দেখিয়া, সে শিবিরের দ্বারে আসিয়া মৃতদেহ দেখাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সাহেব দয়ার্দ্র হইয়া মৃতদেহ ফিরাইয়া দিলে, সে তাহাকে কাঁধে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। একটি বানর গাছ হইতে পড়িয়া হাত ভাঙ্গিয়াছিল; দেখা গিয়াছিল, তাহার পীড়িতাবস্থায় একটি বৃদ্ধা,—সে তাহার কেহ নহে,—নিত্য রোগীকে আপনার খোরাকের অংশ দিয়া খাওয়াইয়া যাইত। আহত বানরকে অন্যজাতীয় বানরেও সুশ্রূষা করে। বানরের অনুসন্ধিৎসা ও অনুকরণপ্রিয়তার কথা সকলেই জানেন। সে সম্বন্ধে উদাহরণ দিবার আবশ্যক নাই।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

আরঙ্গীবের রাজনীতি।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

আরঙ্গীব যখন এইরূপে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিয়া ধূমায়িত অগ্নির ন্যায় ধীরে ধীরে—দাক্ষিণাত্যে বসিয়া তেজঃসঞ্চয় করিতেছিলেন—অন্যান্য ভ্রাতাদিগকে প্রলোভিত করিয়া নিজের প্রকৃত মনোভাব সংগোপিত রাখিয়া মনে মনে জয়লক্ষ্মীর সাক্ষাৎকামনা করিতেছিলেন—সেই সময়ে ভবিতব্য তাঁহার ভবিষ্যৎ পথ সরল করিবার জন্য এক নূতনবিধ ঘটনার সৃজন করিল।

আরঙ্গীব এই সুবিশাল, ফলশস্যময়, ধনরত্নপূর্ণ ভারতভূমির একচ্ছত্র অধীশ্বর হইবেন—ইহা বিধাতার অখণ্ডনীয় লিপি বলিয়া, অদৃষ্ট, আমীর জুমলাকে পারস্যদেশে—ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্য হইতে আনিয়া, দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। জুমলা না থাকিলে বা দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ঘটনাক্ষেত্রে উপস্থিত না হইলে, আরঙ্গীব হয় ত ভগ্নমনোরথ হইয়া হতাশ হৃদয়ে দিল্লী হইতে সেই সুদূর প্রদেশে শীতল সমাধি মধ্যে জীবনের উচ্চ আশার সহিত সমাহিত হইতেন।

আরঙ্গীব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনভার লইয়াছিলেন, সেই সময়ে, গোলকুণ্ডাধিপতির আমীর জুমলা নামে এক বিখ্যাত সেনাপতি তথায় ধীরে ধীরে স্বীয় ক্ষমতা বিকাশ করিতেছিলেন। আমীর আর্দ্দিস্তানের মরুময় প্রান্তর প্রদেশ হইতে একমাত্র অদৃষ্টকে সঙ্গে লইয়া, দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই অনাহারক্লিষ্ট নিরক্ষর বালক, অনেক চেষ্টার পর, একজন মণিব্যবসায়ীর কেরাণীরূপে নিযুক্ত হইলেন। স্বীয় তীক্ষ্ণ প্রতিভাবলে ক্রমশঃ ধন সঞ্চয় করিয়া, আমীর জুমলা চাকরী পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে বিশেষ ধনশালী হইয়া, তিনি গোলকুণ্ডাধিপতির মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া,তেলিঙ্গানা দুর্গের প্রধান সেনাপতির পদে বরিত হইলেন। আমীর লেখাপড়া ভাল জানিতেন না, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শাণিত তরবারির সহায়তায়, তিনি গোলকুণ্ডাধিপের অতিশয় বিশ্বস্ত হইয়া উঠিলেন। গোলকুণ্ডা ভারতের রত্নভাণ্ডার, তিনি সেই গোলকুণ্ডাধিপের প্রধান সেনাপতি, সুতরাং স্বীয় ক্ষমতার বলে

বেনামী বাণিজ্যে গোলকুণ্ডাজাত শ্রেষ্ঠ হীরকাদি দেশদেশান্তরে বিক্রয় করিয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্য-প্রতিভা-অস্ত্র—এই তিনের একত্র সমাবেশ দেখিয়া, গোলকুণ্ডাধিপতি ক্রমশঃ স্বীয় প্রধান সেনাপতির উপর মনে মনে বীতক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে আর একটি অভূতপূর্ব্ব ঘটনা তাঁহার বিরাগ আরও বাড়াইয়া দিল। এখন হইতে নানা কারণে, বিশেষতঃ নিজের স্বার্থের জন্য, তিনি আমীর জুমলার ধ্বংসসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। সভায় আমীর জুমলার লোকই অধিক, রাজকার্য্যে তাঁহার আত্মীয়সংখ্যা বড় অল্প নয়;—সুতরাং সকলের সমক্ষে, গোলকুণ্ডাধিপতি মুখ ফুটিয়া সমস্ত না বলিতে পারিলেও, মনে মনে সুযোগ অন্বেষণে বিরত হইলেন না।

আগ্নেয় গিরিগহ্বরের জ্বলন্ত ধাতুস্রাবের ন্যায়, যে বিরাগস্রোত তাঁহার মানসক্ষেত্র আলোড়িত ও সংক্ষুব্ধ করিতেছিল, এক দিন এক অসম্ভব কারণে তাহা সম্পূর্ণরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ঘটনাটি এই;— মৃত গোলকুণ্ডাধিপতির এক বিধবা পত্নী ছিল। জনরব উঠিল, আমীর জুমলার সহিত বিধবা রাজ্ঞীর অবৈধ প্রণয় সংঘটিত হইয়াছে। গোলকুণ্ডাধিপতির কর্ণে যখন এই কথা উঠিল, তখন তিনি জুমলার প্রতি বিশেষ দণ্ডবিধানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। জুমলা এই সময়ে কর্ণাট প্রদেশে ছিলেন; রাজসভাস্থ তাঁহার আশ্রিত ও পালিত বন্ধুবর্গ, এই বিপদের সংবাদ গোপনে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিল। জুমলা এই ভীষণ সংবাদে বুদ্ধি হারাইলেন না। জীবনে তিনি যে সমস্ত দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার সহিত তুলনায়, এ বিপদ অতি সামান্য। তাঁহার পুত্র মহম্মদ আমীর খাঁ, সেই সময়ে গোলকুণ্ডার রাজসভায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। জুমলা পুত্রকে লিখিয়া পাঠাইলেন—তুমি কৌশলক্রমে—যে উপায়ে পার, রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। কিন্তু তাঁহার এ সতর্কতা গোলকুণ্ডাপতির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। জুমলা নিরুপায় হইয়া গোলকুণ্ডাপতির ধ্বংসসাধনের জন্য, আরঙ্গীবকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিলেন,—

মীরজুমলার পত্র।

"কুমার!

"সমস্ত দাক্ষিণাত্য জানে, আমি গোলকুণ্ডাধিপতির জন্য কি না করিয়াছি। তিনি আমার কাছে কৃতজ্ঞতার দুশ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ। কিন্তু সে কৃতজ্ঞতার

প্রতিদান করা দূরে থাক্—তিনি আমায় সপরিবারে ধ্বংস করিবার চেষ্টায় আছেন। আমি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছা করি। এ বিষয়ে কি আপনি সম্মতি দিবেন? যুবরাজ! আমার প্রতি আপনি অবশ্যই করুণা দেখাইতে কুণ্ঠিত হইবেন না—এই করুণালাভের জন্য আমি নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিতে আপনাকে পরামর্শ দিই। গোলকুণ্ডাধিপতির ভাণ্ডার দ্যুতিময় হীরকাদিতে পরিপূর্ণ; তাঁহার রাজ্য ফলশস্যময় এবং উর্ব্বর। এ সমস্ত যদি দিল্লীশ্বরের কাজে লাগে, তাহার অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? আপনি গোলকুণ্ডা জয় করুন—রাজাকে অবরুদ্ধ করুন, ইহাতে যাহা সহায়তা করিতে হয়, তাহা আমিই করিব। যুবরাজ! আমার সারল্যে বিশ্বাস স্থাপন করুন—এ কার্য্যে আপনার কোনরূপ অনিষ্ট, বিপদ, মানহানি ও সৈন্যাপচয়ের সম্ভাবনা নাই। চারি পাঁচ হাজার উত্তম অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করুন; ইহাদের প্রবল বেগ প্রতিহত করা গোলকুণ্ডাধিপের ক্ষমতার আয়ত্ত নয়। দৌলতাবাদ হইতে গোলকুণ্ডা দুই সপ্তাহের পথ—আপনি জনরব প্রচার করিয়া দিন যে, দিল্লীশ্বরের দূতরূপে আপনি বাঘনগরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন—ইহাতে কেহ কোন সন্দেহ করিবে না।

"গোলকুণ্ডাপতির যাহা কিছু চিঠিপত্র, দাবির-নামক এক সচিবের হাত দিয়া তাহার নিকটে যায়। সেই দাবির আমার বিশ্বস্ত ও অনুগত। আমি তাহাকে এরূপ পরামর্শ দিব যে, কেহ যেন আপনার কার্য্যে কোন সন্দেহ না করিতে পারে। রাজপুরীতে প্রবেশ করিতে পারিলেই কার্য্যসিদ্ধি। প্রথামত দিল্লীশ্বরের দূতের সম্বর্দ্ধনার জন্য, গোলকুণ্ডাধিপ যখন সভামণ্ডপে উপস্থিত থাকিবেন—সেই সময়ে আপনি তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিবেন। রাজাকে লইয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেও আমি কোন বিষয়ে কোন কথা কহিব না। ইতিমধ্যে আমি আরও বলিয়া রাখি যে, এই দৌত্যাভিযানের সমস্ত খরচপত্র আমি বহন করিব, এবং যাত্রাকালের প্রত্যেক দিন আমি আপনাকে ৫০ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিব।"

যুবরাজ আরঙ্গীব যখন এই অত্যাশ্চর্য্য পত্র পাইলেন, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। একটি হ্রদের তীরে কয়েক জন সহচরকে লইয়া তিনি সেই ধীরস্রোতোময় হ্রদ বক্ষে অস্তমান সূর্য্যকিরণের সহিত ক্ষুদ্র বীচিমালার আমোদ-সংগ্রাম নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। পত্র পাইবামাত্র তিনি সঙ্গীদিগকে বিদায়

দিয়া নিবিষ্টমনে পত্র পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখে ঘোরতর চিন্তার ছায়া অঙ্কিত হইল; কিয়ৎকাল পরে আবার সেই চিন্তামেঘাচ্ছাদিত মুখমণ্ডল কোন ভবিষ্যত আশায়, মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় পরিষ্কার হইয়া উঠিল।

কুমার দূতকে বিশ্রামের উপযুক্ত স্থানে প্রেরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি এ সম্বন্ধে দৃঢ় চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন—মীরজুমলার সহায়তা পরিত্যাগ করিলে, দিল্লীর সিংহাসন তাঁহার পক্ষে প্রহেলিকার মত হইয়া উঠিবে। প্রাতে উঠিয়া আরঙ্গীব দূতকে বলিয়া দিলেন, "আমি আজই বাঘনগরের দিকে যাত্রা করিব।"

আরঙ্গীব এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে গোলকুণ্ডার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন যে, পথিমধ্যে কেহ তাঁহাকে কোন প্রকার সন্দেহ করিল না। গোলকুণ্ডাধিপতি তাঁহার বাঘনগরের সুপ্রশস্ত "দিলারাম" উদ্যানে মোগল দূতকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য সদলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু আর কিছুক্ষণ থাকিলে বোধ হয়, অন্ধতমসাবৃত কারাগার বা মোগলের শাণিত কৃপাণ, তাঁহার আতিথেয়তার পুরস্কার প্রদান করিত। আরঙ্গীব আসিয়া পৌঁছিলেন—এমন সময়ে একজন বিশ্বস্ত অনুচর আসিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল, "মহারাজ! পলায়ন করুন—দূত আর কেহই নহেন, স্বয়ং কুমার আরঙ্গীব।"

গোলকুণ্ডাধিপ পলায়ন করিয়া আপাততঃ রক্ষা পাইলেন বটে—কিন্তু আরঙ্গীবের জিগীষাবৃত্তি নিতান্ত দুর্দ্দম্যভাব ধারণ করিয়াছিল বলিয়া—তিনি কামানাদি অস্ত্র শস্ত্রে বলীয়ান না হইলেও, অযথা সাহসাবলম্বনে গোলকুণ্ডাধিপতির আশ্রয়দুর্গ আক্রমণ করিলেন।

কিন্তু সহসা দিল্লী হইতে নূতন হুকুম আসাতে ঘটনাস্রোত ভিন্ন দিকে পরিচালিত হইল। দারা দিল্লীতে থাকিয়া সকল বিষয়েরই সংবাদ রাখিতেছিলেন—যখন দেখিলেন, আরঙ্গীব এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে তাঁহার প্রচুর বলবৃদ্ধি হইবে—তখন অনন্যোপায় হইয়া বেগম সাহেবের (জেহনারা) সহায়তায় বাদসাহের মত ফিরাইলেন *। দিল্লী হইতে বাদসাহের হুকুম

* বেগম সাহেব বা জাহানারা, সাহজাহানের উপর যেরূপ অবৈধ ক্ষমতা পরিচালন করিতেন, তাহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে আর একটি ভয়ানক রহস্যময় প্রবাদ প্রচলিত আছে। এরূপ শুনা যায়, (মেনুসীর মতও এইরূপ) যে, সাহজাহানের সহিত তাঁহার প্রধানা কন্যার অবৈধ আসক্তি ছিল। বৃদ্ধাবস্থায় সাহজাহান বড় সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। জেহানারা খাদ্যদ্রব্য নিজ চক্ষে

আসিল --"গোলকুণ্ডাধিপের সহিত বৃথা বিদ্রোহে কোন প্রয়োজন নাই—কুমার আরঙ্গীর অচিরাৎ দাক্ষিণাত্য প্রত্যাবর্ত্তন করিল।"

আরঙ্গীব এই নিষেধ-আজ্ঞার মধ্যে দারার প্রচ্ছন্ন হস্ত দেখিয়া আদৌ বিস্মিত হইলেন না। তিনি অবনতমস্তকে বাদসাহের আজ্ঞা পালন

না দেখিয়া দিলে, তিনি কিছুই খাইতেন না। উল্লিখিত কথাগুলি অবিশ্বাস্য হইলেও (অন্তত আমাদের কাছে) প্রধানা বেগমের চরিত্র যে ভাল ছিল না, তাহার দুই একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। রাজসভার মধ্যে এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওমরাহ যুবকের সহিত বেগম সাহেবের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। অন্যান্য অন্তঃপুরিকারা যেরূপ অবরোধ অবস্থায় থাকিতেন—তাঁহাদের চারিদিকে যেমন ভীষণ প্রহরীর সমাবেশ থাকিত, জেহানারার সম্বন্ধেও তদ্রূপ বন্দোবস্ত ছিল। তথাপি তিনি সেই প্রণয়ীকে গুপ্তভাবে নিজকক্ষে লইয়া গিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেন। এক-দিন উক্ত যুবক জেহানারার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া, বাদসাহ ধীরে ধীরে কন্যার কক্ষদ্বারে করাঘাত করিলেন। জেহানারার শয়নগৃহের পার্শ্বেই স্নানাগার বা "গোসলখানা"; গোসলখানার মধ্যে এক ক্ষুদ্র মর্ম্মরনির্ম্মিত চৌবাচ্ছা ছিল। বেগমসাহেব অন্য উপায় না দেখিয়া, তাঁহার প্রণয়ীকে তন্মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া, দ্বার খুলিয়া দিলেন। সাহজাহান গৃহে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মুখ উদ্বেগ ও চিন্তাশূন্য। ক্রোধের লেশমাত্র তাহাতে নাই। তিনি গম্ভীরভাবে কন্যার সহিত অন্য বিষয়ের কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথাবার্ত্তা শেষ হইলে বাদসাহ বলিলেন, "জাহা-নারা! তুমি কি আজ স্নান কর নাই? তোমার শরী— এত দেখাইতেছে কেন? আমার অনুরোধ, তুমি এখনই গোসলখানায় যাও।" গোস খানা তখন অন্ধকারময়; বাদসাহ এক খোজাকে বর্ত্তিকা আনিতে আদেশ করিলেন। তাহাকে পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হইয়া-ছিল। বলা বাহুল্য, সেই নপুংসকের তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে জাহানারার প্রণয়পাত্রের শির দ্বিখণ্ডিত হইয়া কক্ষতলে নিক্ষিপ্ত হইল। সাহজাহান অসঙ্কুচিত চিত্তে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড সমাধা করিয়া, গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

এ সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে;—নাজির খাঁ নামক এক পারস্যদেশীয় যুবক, সাহজাহানের দরবারে ক্রমশঃ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। নাজির খাঁ সুপুরুষ, গীতবাদ্যানুরক্ত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। তিনি সায়েস্তা খাঁর অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। সায়েস্তা খাঁ ইহাকে এতদূর ভালবাসিতেন যে, প্রধানা বেগমের সহিত ইহাঁর বিবাহের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত করিতে গিয়াছিলেন। সাহজাহান এ বিষয়ে অমত করাতে সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। বেগমসাহেবের সহিত এ ব্যক্তির গুপ্ত প্রণয় ছিল, সাহজাহান ইহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। একদিন তিনি সভামধ্যে অন্যান্য সকলের ন্যায়—উক্ত পারস্যদেশীয় যুবককে সম্মান ও অনুগ্রহ চিহ্নস্বরূপ এক তাম্বূল উপহার দিলেন। হতভাগ্য যুবক নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাম্বূল চর্ব্বন করিতে করিতে সভাভঙ্গের পর পাল্কীতে গিয়া উঠিল। তাহাকে বাটী পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে হইল না। তাম্বূলমধ্যস্থ বিষের গুণে সে ব্যক্তি বিষাক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এ সম্বন্ধে আমাদের নিজের কোন মন্তব্য নাই; পাঠক নিজে উহা করিয়া লউন।

করিবেন। গোলকুণ্ডার অবরোধকার্য্য দুই মাসের পর সহসা পরিত্যক্ত হইল। তিনি রাজার সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিলেন যে, আমীর জুমলাকে গোলকুণ্ডাধিপতি সর্ব্ববিষয়ে মুক্তি দিবেন—তাঁহার (আরঙ্গীবের) জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন—তাঁহার অবর্ত্তমানে কুমার মহম্মদ গোলকুণ্ডার সিংহাসন অধিকার করিবেন। এবং গোলকুণ্ডা প্রদেশের মুদ্রায় দিল্লীশ্বরের নাম অঙ্কিত থাকিবে।

এই সময় হইতে আমীর জুমলার সহিত আরঙ্গীবের বন্ধুত্ব বিশেষরূপে দৃঢ়ীভূত হইয়া উঠিল। আমীর ও তিনি, দৌলতাবাদে বসিয়া ভবিষ্যৎ সুখ ও উচ্চ আশায় উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। আমীরের সহিত আরঙ্গীবের এই সম্মিলন ভারত ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। কেন না, আরঙ্গীবের রাজত্বকালে, ভবিষ্যতের কার্য্যক্ষেত্রে, আমীর হিন্দুস্থানের সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

আরঙ্গীবের পরামর্শানুসারে, আমীর জুমলা মধ্যে মধ্যে বাদসাহের কাছে দিল্লীতে উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বাদসাহ আগরায় ডাকিয়া পাঠাই[illegible]ন। আমীরের মনে এক গূঢ় উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে[illegible]। গো[illegible]ণ্ডাধিপতির উপর তিনি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। যদি বাদসাহের মন পরি[illegible]র্ত্তন করিয়া, গোলকুণ্ডার উচ্ছেদসাধনার্থে হুকুম আনিতে পারেন, এই আশায় তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন ও হীরকাদি লইয়া আগরায় যাত্রা করিলেন। কপোতডিম্বাকার এক বহুমূল্য মণি তিনি দিল্লীশ্বরকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিলেন। নানাবিধ উপায়ে গোলকুণ্ডার অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা তাঁহার কর্ণগোচর করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বুঝাইলেন, কান্দাহারের তুষারময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সামান্য গোটাকত দ্রাক্ষাক্ষেত্রের জন্য যুদ্ধ না করিয়া যদি বাদসাহ সেই সৈন্য গোলকুণ্ডাবিজয়ে নিয়োজিত করেন, তাহা হইলে সেই প্রদেশের চিরবিখ্যাত হীরকের খনি, তদপেক্ষা অল্পায়াসে তাঁহার অধিকারভুক্ত হইবে।

এই সময়ে দারা * আগরায় বড় বাড়াইয়া তুলিতেছিলেন। সহসা অতুল ক্ষমতা সঞ্চয় করিয়া পিতার সিংহাসনে বসিয়া হিন্দুস্থানের দণ্ডমুণ্ডের

* দারা এই সময়ে বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছিলেন। সাদুল্লা খাঁ—সাহজাহানের সভায় এক বিখ্যাত ওমরাহ ছিলেন। বাদসাহ তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস করিতেন। রাজ্যমধ্যে তাঁহার ক্ষমতাও অপ্রতিহত ছিল। সাহজাহান তাহাকে আসিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজ-

বিধান করিতে পাওয়াতে, তাঁহার মস্তিষ্ক ঘোরতর অহংভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সাহজাহান তাঁহার কোন সন্তানকেই এখন হইতে বিশ্বাস করিতেন না। দারার এই প্রকার প্রগল্‌ভতা ও ক্ষমতার আতিশয্য দেখিয়া, তিনি পূর্ব্ব হইতে তাহা দমনের চেষ্টা করিতেছিলেন। ...ক জুমলার প্রস্তাবানুসারে, দাক্ষিণাত্যে তাঁহার নিজের সৈন্যদল বৃদ্ধি ক... অবসর দেখিয়া, তিনি তাহাতে সম্মতি দিলেন। মণিমুক্ত... ব্যাপারে তাঁহাকে প্রণোদিত করে নাই, এরূপ নহে। ... বিপরীত বুঝিলেন। তিনি ভাবিলেন, জুমলার সহিত ... অতি সহজ কার্য্য। এই ব্যাপারে, আরঞ্জ... ক্ষমতা প্রকা... করা হইবে। এই ভাবিয়া, তিনি দাক্ষিণাত্যে সৈন্যপ্রেরণের বিরুদ্ধ... হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু পরিশেষে, অনেক চেষ্টা... পর, বাদসাহের মত পরিবর্ত্তন করিতে না পারিয়া, মীর জুমলাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি স্বত্বে বাধ্য করিলেন। (১) তিনি তাঁহার স্ত্রী পুত্রকে প্রতিভূস্বরূপ আগরায় রাখিয়া যাইবেন। (২) আরঞ্জীবের সহিত তিনি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে বিযুক্ত থাকিবেন। (৩) আরঞ্জীব কেবল দৌলতাবাদে থাকিয়া দাক্ষিণাত্য শাসন করিবেন। এ সমস্ত ব্যাপারে কোন মতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। প্রথম স্বত্বটিতে মীর জুমলা দারার উপর অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু পরিশেষে বৃদ্ধ বাদসাহের প্রবোধ বাক্যে সংক্ষুব্ধ মনে দারাকে অভিসম্পাত করিতে করিতে দাক্ষিণাত্য যাত্রা করিলেন।

ঘটনাস্রোত যখন এই প্রকার অবস্থায় উপস্থিত ... হান সহসা ভয়ানক পীড়িত হইয়া উঠিলেন। মূত্রকৃচ্ছ্র ত... তই ছিল, এক্ষণে আবার তাহার সহিত পক্ষাঘাত আসিয়া জুটিল। বাদসাহ কয়েক দিন ধরিয়া অচেতন অবস্থায় রহিলেন। সেপ্টেম্বর মাস—শীতকাল;

নীতিজ্ঞ পুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন। সাদুল্লা প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তাঁহার বর্দ্ধিত প্রতাপ দেখিয়া দারা ভাবিলেন, বাদসাহের মৃত্যুর পর, সাদুল্লার ইচ্ছার ও অনুগ্রহের উপর দিল্লীর সিংহাসন ন্যস্ত হইবে। দারা এরূপ জনরব শুনিলেন যে, সাহজাহানের মৃত্যুর পর, উজীর নিজে সিংহাসনের স্বত্বাধিকার করিবেন। এই সকল দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিলেন। সেলিম কর্ত্তৃক আবুল ফজলের মৃত্যুতে আকবর যেরূপ সন্তপ্ত ও রুষ্ট হইয়াছিলেন, সাহজাহানও দারার এই ব্যবহারে তদ্রূপ হইলেন।

কালধর্ম্মে পীড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সকলেই বাদসাহের জীবনের সম্বন্ধে হতাশ হইয়া উঠিলেন।

চিকিৎসকেরা রক্তমোক্ষণের পরামর্শ দিলেন। ইহাতে উপকারও হইল বটে। ব' সাহ কতকটা সুস্থ হইলেন। এই হুজুগের ও ক্ষণিক রোগ- .গ্র হিন্দুস্থানের রাজস্ব রেহাইএর হুকুম প্রথামত জাহির হইল। পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহারা আরও উচ্চকণ্ঠে, আরও দসাহের মঙ্গল-কামনায় "আজান" দিতে লাগিল। আসিয়া দৈবকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। দরিদ্রদের মধ্যে .তারিত হইতে ল .। রাস্তা, ঘাট লোকে পরিপূর্ণ, সকলেই .সাহের সংবাদ জানি .র জন্য উদ্‌গ্রীব, দোকানপাট বাণিজ্যাদি বন্ধ হইল, ফটকের উপর নাকারা আনার" নহবত থামিল, সকলেই বিষণ্ণ; সকলেই তাঁহার মঙ্গলকামনায় ব্যগ্র, হিন্দু-মুসলমান-পারসী সকলে একত্রে মিলিয়া তাঁহার আরোগ্য-প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বড় বড় হিন্দুরা দেবমন্দিরে স্বস্ত্যয়নাদিও করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

বিজ্ঞানের একটি কথা।

বর্ত্ত . . . . হ বিজ্ঞানের এক সিদ্ধান্ত প্রাণীতত্ত্বের অভিব্যক্তি-বাদকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান মনে করেন। প্রত্যেক জাতীয় জীবজন্তুগণ যে বিশেষ বিশেষ ভাবে সৃষ্ট হয় নাই—এক জাতীয় জীব হইতে এই বিশ্বের যাবতীয় জীবজন্তু উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ মতকে অভিব্যক্তিবাদ কহে। ইংরাজীতে ইহাকে (Evolution theory) বলে। এক জনের দ্বারা ইহার আবিষ্কার হয় নাই; তবে ইহার প্রধান প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ চার্লস্ ডার্ব্বিন্ (Charles Darwin)। আজকাল যাঁহারা অভি-ব্যক্তিবাদ সমর্থন করেন, তাঁহাদের অনেকেরই কথার ভাবে মনে হয় যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে ও তাঁহার মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিলে, যেন অভি-ব্যক্তিবাদকে দৃঢ়রূপে সমর্থন করা যায় না। ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম।

অধিকাংশ অভিব্যক্তিবাদীগণের মতে, যদি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই একজাতীয় প্রাণী হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর উৎপত্তি হইল, তখন ঈশ্বর স্বীকারের কোনও প্রয়োজনই দেখা যায় না। স্বীকার করিলাম যে,প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই এক প্রাণী হইতে বংশানুক্রমে অবস্থার উপযোগী হইয়া বিভিন্ন প্রাণীসমূহ উৎপন্ন হইতেছে, এবং রক্ষা পাইতেছে। প্রথমেই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, প্রাণ আসিল কি প্রকারে? বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই, এবং আমরাও এ বিষয়ে এখন কোনও বিচার করিব না। ধরিয়া লইলাম যে, প্রথম প্রাণ যে কোন প্রকারেই হউক, আসিয়াছে। আমাদের দ্রষ্টব্য এই যে, এই প্রাণ হইতে যে, ক্রমে ক্রমে উন্নত জীবজন্তু হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাতে কোনো জ্ঞানের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় কি না? আমরা যদি প্রাকৃতিক কার্য্যের মধ্যে কোনো জ্ঞানের কার্য্য দেখিতে পাই, তবেই বুঝিতে পারিব যে, এই সকল ঘটনা কোনো সজ্ঞান পুরুষ কর্ত্তৃক নিয়মিত হইতেছে। কারণ জ্ঞান থাকিলেই ইচ্ছা থাকিবে, এবং জ্ঞান ও ইচ্ছা কখনই শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রজাপতির বিষয় আলোচনা করা যাউক। কয়েক জাতীয় প্রজাপতি আছে, তাহাদিগকে নানা কারণে পক্ষীরা আহার করে না। তাহারা বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া আকাশে নির্ভয়ে বিচরণ করে; পক্ষীরাও তাহাদিগের উজ্জ্বলবর্ণ দেখিয়া চিনিতে পারিয়া তাহাদিগকে ধরিতে যায় না। অপর কয়েক জাতীয় প্রজাপতি আছে, তাহারা পক্ষী-দিগের উপাদেয় আহার। তাহারা যদি পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতিদিগের অনুকরণ করে, তবেই তাহারা নিরাপদ হইতে পায়। অনুকরণ তাহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক হইল। পরিবৃত্তির নিয়মানুসারে তাহাদিগের বংশ-পরম্পরায় অবস্থার উপযোগী অনুকরণ সংঘটিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমান কালের শেষোক্ত প্রজাপতিদিগকে দেখিলে,সহসা প্রথমোক্ত প্রজাপতিদিগের সহিত তাহাদিগের প্রভেদ বুঝা যায় না।

অভিব্যক্তিবাদের মতে যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বিভিন্ন জীব উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে পরিবৃত্তি একটি প্রধান নিয়ম। প্রজাপতির দৃষ্টান্তেই দেখা যাউক্। ধরিয়া লইলাম যে, অনুকারক প্রজাপতিদিগের অনুকরণোপ-যোগী পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনের সূত্রপাত হইল। তাহাদিগের শাবকগণ

যদি ঠিক পিতামাতার ন্যায় হয়, তাহা হইলে তাহারা বাঁচিতে পারে না। কিন্তু সেই শাবকগণের মধ্যে, প্রায়ই দেখা যায়, কোনটা বা পিতৃ-প্রজাপতির ন্যায় হইল; কোনটা বা পিতৃ-প্রজাপতির ন্যায় না হইয়া কতক-পরিমাণে অনুকৃত প্রজাপতির ন্যায় হইয়া পড়িল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত শাবকগণের মধ্যে যাহারা পিতৃ-প্রজাপতির ন্যায়, তাহাদিগের অপেক্ষা অপর শাবকগণেরই পক্ষী প্রভৃতি শত্রুদিগের হাত এড়াইয়া বাঁচিয়া থাকিবার অধিক সম্ভাবনা আছে। এই প্রকার পিতৃ-প্রজাপতি হইতে পরিবর্ত্তন বংশপরম্পরায় হইতে কয়েক বংশ চলিয়া গেলে, সর্ব্বশেষবংশীয় প্রজাপতি-গণ প্রথম পিতৃপুরুষ হইতে এতটা ভিন্নাকার ও ভিন্নপ্রকৃতি হইতে পারে যে, উভয় প্রজাপতিই যে একজাতীয়, তাহা বুঝিতে অনেক সময় ভ্রম হইতে পারে। এইরূপ জীবমাত্রেরই শাবকগণ যে পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রায় কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহাকেই পরিবৃত্তির নিয়ম (Law of variation) বলা যায়।

এই পরিবৃত্তির নিয়মানুসারে, অনুকারক প্রজাপতিদিগের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল বটে। কেন হইল—তাহাদিগের আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির জন্য। এইখানে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, তাহারা আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে আপনাদের ইচ্ছানুসারে পরিবর্ত্তিত হইল, তাহা নহে; তাহাদের পরিবর্ত্তন হইল বলিয়াই আত্মরক্ষা হইতে পারিল। কি উপায়ে এই পরি-বর্ত্তন হইল?—ইহার উত্তরপ্রদান করিতে বিজ্ঞান অসমর্থ। পিতৃ-প্রজাপতি-গণ এই আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনের বিষয় কিছুই জানে না; আর যদিই বা জানে, তবে তাহাদের কি ক্ষমতা যে, শাবকদিগের একটি রোমও রঞ্জিত করিতে পারে? মাতৃ-প্রজাপতির ক্ষমতা এই পর্য্যন্ত যে, সে তাহার আপনার রুচি-অনুসারে পিতৃ-প্রজাপতি বাছিয়া লইতে পারে। কিন্তু ডিম্ব প্রস্তুত হওয়া প্রভৃতি বিষয় তাহার আয়ত্তাধীন নহে। তাহার শাবকগণ যে কিরূপ হইবে, কোন্ জাতীয় হইবে, অথবা উভয়জাতীয় হইলেও কোন্ জাতীয় কয়টা হইবে, এই সকল কিছুই তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

আর একজাতীয় প্রজাপতি আছে, তাহাদের ডানার উপর দিক্ শুষ্ক পত্রের ন্যায় ধূসর বর্ণের, কিন্তু নীচের দিক্টা উজ্জ্বল নীলবর্ণে রঞ্জিত। এই বর্ণও পরিবৃত্তির নিয়মানুসারে সংগঠিত হইয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এই বর্ণ কেন হইল, তবে নানা জনে আত্মরক্ষা প্রভৃতি নানা কারণ প্রদর্শন

করিতে পারিবেন। কিন্তু এই বর্ণ কি উপায়ে হইল? এই উপায়ের বিষয় প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, কোনও সজ্ঞান ইচ্ছা কর্ত্তৃক এই রঞ্জিত হওয়া নিয়মিত হইতেছে। কারণ, বর্ণমাত্রই উৎপাদন করিতে গেলেই দৃষ্টিবিজ্ঞান বিশেষরূপ জানা আবশ্যক। যদি অতিরিক্ত সজ্ঞান শক্তি না স্বীকার করি, তবে স্বীকার করিতে হয় যে, যে দৃষ্টিবিজ্ঞানের অত্যল্পভাগও অনেক মনুষ্য জানে না, সেই বিদ্যা প্রজাপতি জানে, এবং তাহা জানিয়াই উক্ত প্রকার বর্ণ উৎপাদন করে। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, একটি সামান্য প্রজাপতির ক্ষমতা বিশেষ ক্ষমতাপন্ন মনুষ্যের অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক, কারণ কোনও মনুষ্যই এ পর্য্যন্ত প্রজাপতির ডানাতে কোনও প্রকার বর্ণই উৎপাদন করিতে পারে নাই।

এমন তো বলা যাইতে পারে যে, প্রাকৃতিক নিয়মই এই সমুদয় বর্ণ-উৎপাদন প্রভৃতি কার্য্য করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক কি প্রাকৃতিক নিয়ম কোনও কার্য্য স্বয়ং করিতে পারে? আমি অগ্নিতে জল দিলাম, অগ্নি নিবিয়া গেল। এই কার্য্যটি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ী হইয়া সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম কি অগ্নি নিবাইল, না আমি নিবাইলাম? প্রাকৃতিক নিয়ম সকলকে প্রাকৃতিক কার্য্যের ব্যাকরণশাস্ত্র বলিতে পারি। আগে যেমন ভাষা, তাহার পরে যেমন ব্যাকরণ; সেইরূপ প্রাকৃতিক ঘটনা আগে, তাহার পরে সেইগুলি নিয়মিতরূপে ঘটিতে দেখিলে, আমরা সেই ঘটনাসকলের কার্য্যকরণের মধ্যে একটি নিত্য সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়া, সেই সম্বন্ধের নাম দিই 'প্রাকৃতিক নিয়ম।' কিন্তু এই প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্তা কে? কার্য্যকারণের মধ্যে এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের যোজয়িতা কে? পূর্ণশক্তি ইচ্ছাময় ব্রহ্ম ব্যতীত আর কাহাকে এই সকলের নিয়ন্তা বলিতে পারি? আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের নিকটে যতই জিজ্ঞাসা করি না কেন যে, প্রাকৃতিক ঘটনাসকল কি উপায়ে হইতেছে, তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা বৃথা। পরিবৃত্তিই বল, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনই বল, আর অন্য যে কোন নিয়মের কথাই বল, কোনও নিয়মই বলিতে পারিবে না যে, অমুক প্রাকৃতিক ঘটনা কি উপায়ে হইল; সে এই মাত্র বলিতে পারিবে যে, উহা কেন হইতেছে কি নিয়মের দ্বারা বদ্ধ রহিয়াছে। (১)

---

(১) এক কথায় আমরা why জানিতে পারি, কিন্তু how জানিতে পারিব না।

অভিব্যক্তিবাদের আর একটি প্রধান নিয়ম "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন"। (২) (Survival of the fittest)। এই নিয়মের কথা শুনিলেই মনে হয় যে, ইহা তো অতি সোজা কথা, যে যোগ্যতম হইবে, তাহারই জয় হইবে। কিন্তু সোজা কথা হইলেও এই বিষয়টি একটু বিবেচনার সহিত দেখিতে হইবে। যোগ্যতম বলিতে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বুঝাইবে না। যোগ্যতম বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, চতুর্দ্দিকের অবস্থার পক্ষে অধিকতম উপযোগী। প্রাণীবৃত্তান্ত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, নানা জাতীয় জীবজন্তু, যাহারা এক সময়ে অবস্থার উপযোগী হওয়াতে দলবলের সহিত পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিল, পরে অবস্থা তাহাদের প্রতিকূল হওয়াতে তাহারা লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। আরও এইটুকু দেখিতে পাই যে, লুপ্তপ্রায় জীবজন্তুদিগের স্থানে যে সকল পরবর্ত্তী জন্তু আসিয়াছে, তাহারা লুপ্তপ্রায় জীবদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে "উন্নত," এবং তাহাদিগের শারীরিক গঠন, মস্তিষ্কাদি, পূর্ব্ববর্ত্তী জীবদিগের অপেক্ষা কিছু জটিল (complicated)। তবেই দেখা যাইতেছে যে, যোগ্যতমের নিয়মটি স্বয়ং কোনও উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য স্পষ্টই দেখা যাইতেছে উন্নতি; উক্ত নিয়মটি সেই উদ্দেশ্যসাধনের কার্য্যপ্রণালীমাত্র, যন্ত্রমাত্র। পরিবৃত্তির নিয়মই বল, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন নিয়মই বল, সেই সকলই দেখিতেছি, এক একটি বিভিন্ন কার্য্যপ্রণালীমাত্র। কিন্তু সৃষ্টির লক্ষ্য উন্নতি।

এখন প্রশ্ন এই যে, কাহার উদ্দেশ্য জগতের উন্নতি! ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার সৃষ্টিতে উন্নতির হিল্লোল অবিশ্রান্তভাবে বহিতে থাকিবে। যিনি সমুদয় বিশ্বজগতকে উন্নতির সহায় করিয়া দিয়াছেন; এমন কি, যিনি মৃত্যুকেও স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে রত রাখিয়াছেন, সেই পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি, পরব্রহ্ম ব্যতীত এই উন্নতির স্রোত জগতে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া, আর কাহাতে সম্ভবিতে পারে? তিনি ভিন্ন আর কে এতটা ক্ষমতা ধারণ করিতে পারে? এই উদ্দেশ্য যদি তাঁহারই না হইবে, তবে কি কতকগুলি অচেতন প্রাকৃতিক নিয়ম এই উন্নতির উদ্দেশ্যকে স্থাপনা করিয়াছে? অচেতন কার্য্য-প্রণালী মাত্র কোনো মহান্ "উদ্দেশ্যকে" স্থাপনা করিতে পারে—ইহা অপেক্ষা বাতুলতার কথা আর কি হইতে পারে? আমি দূরে সংবাদ প্রেরণ

---

(২) ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অনুবাদ।

করিব। এই কারণে আমি কতকগুলি দণ্ড তাম্রতারে সংযুক্ত করিয়া দিলাম এবং সেই তারের সহিত একটি বিশেষ যন্ত্র সংযুক্ত করিলাম। এখন এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে স্পর্শ করিলেই তাড়িৎশক্তি উৎপাদন করিয়া আমার অভিলষিত প্রদেশে প্রেরণ করে। আমারি রচিত কোনো বিশেষ সংকেত অনুসারে, এই তাড়িৎশক্তি দ্বারাই আমি তথায় সংবাদ প্রেরণ করিতে পারি। দূরে সংবাদ প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্য কি তাড়িৎশক্তির, না আমার? আমিই কি এই উদ্দেশ্যের মূল প্রবর্ত্তক নহি? এবং তাড়িৎশক্তি কি আমার উদ্দেশ্যসাধনের এক বিশেষ নিয়মপ্রণালীমাত্র নহে? তাড়িৎ-শক্তির উদ্দেশ্য দূরে সংবাদ প্রেরণ করা, ইহা কত দূর অসঙ্গত কথা? উদ্দেশ্য মাত্রেরই পশ্চাতে এক সজ্ঞান পুরুষের আবশ্যক। সেইরূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে উন্নতি-উদ্দেশ্য স্থাপনা কতকগুলি অচেতন নিয়ম-দ্বারা কিছুতেই হইতে পারে না। অচেতন নিয়মের কথা দূরে থাক্, সচেতন সজ্ঞান মনুষ্যই কি সকল সময়ে উন্নতিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করে? আমরা যখন আহার করি, তখন কি আমরা ইহা মনে করিয়া আহার করি যে, ভবিষ্যতে ইহা দ্বারা আমার উন্নতি সাধিত হইবে! আমাদের ক্ষুধা পায় বলিয়াই আমরা আহার করি; ক্ষুধার সময়ে আহার না করিয়া থাকিতে পারি না বলিয়াই আমরা আহার করি। ক্ষুধা আসিবার সময়ে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসে নাই। যে মঙ্গলবিধাতার আদেশে ক্ষুধা শরীরের মধ্যে আসিয়াছে, তিনিই জানেন যে, ইহা কেন আসিয়াছে, ইহা দ্বারা কি উন্নতি সাধিত হইবে। তবে আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যের পরিচয় পাই, যখন দেখি যে, ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে গিয়া মনুষ্যের প্রয়োজনীয় নানা তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে; আহার করিয়া শরীরের বলবৃদ্ধি হইতেছে, এবং সেই সঙ্গে মানসিক বল, আধ্যাত্মিক বল, সকলই বর্দ্ধিত হইতেছে।

এতক্ষণে আমরা স্পষ্ট বুঝিলাম যে, সেই চেতনের চেতন পরমেশ্বর জড়-রাজ্যের অতীত থাকিয়া, প্রাণরাজ্যের অতীত থাকিয়া, সকলেরই অতীত থাকিয়া, সকলের দ্বারাই স্বীয় উদ্দেশ্য সংসাধিত করিয়া লইতেছেন। সেই উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার সৃষ্টিতে উন্নতি হউক। বিজ্ঞান যতই কেন তত্ত্ব আবিষ্কার করুক না, সে সকলই এই উদ্দেশ্যসাধনের নিয়ম প্রণালীমাত্র, —বিশেষ বিশেষ পথ মাত্র। ইহাদের মূলে এক সজ্ঞান, শক্তিমান্ নিয়ন্তা

না থাকিলে, ইহারা থাকিতেই পারে না। বিজ্ঞান যতই আলোচনা করা যায়, ততই সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইতে থাকি। কে বলে যে, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ়তর থাকে না? এমন কোনও কথা নাই যে, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলেই ঈশ্বরে অবিশ্বাস আসিবে, অথবা, ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেই বিসৃষ্টিবাদ (Special creation) স্বীকার করিতে হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় কেপলারের সিদ্ধান্তই বল, পদার্থবিদ্যায় নিউটনের সিদ্ধান্তই বল, আর প্রাণীতত্ত্বে ডার্ব্বিনের সিদ্ধান্তই বল, সকল সিদ্ধান্তই সেই পূর্ণমঙ্গল পরব্রহ্মের মহিমাই কীর্ত্তন করিতেছে।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্দ্ধনরাজগণ।

২

যুবরাজ রাজ্যবর্দ্ধন গৃহে উপনীত হইয়া পিতামাতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে শোকাভিভূত হইলেন। তিনি পিতৃমাতৃশোক বিস্মৃত হইবার পূর্ব্বে আরও একটি লোমহর্ষণ দুর্ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধন স্বর্গগত ও রাজ্যবর্দ্ধন দূরদেশবাসী, এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, মালবরাজ দেবগুপ্ত, গ্রহবর্ম্মার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক, রাজ্যশ্রীকে নিগড়বদ্ধ করিয়া, কান্যকুব্জের কারাগারে নিক্ষেপ করেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের শোকানল ভীষণ ক্রোধানলে পরিণত হইল। প্রধান মন্ত্রী ভণ্ডি ও দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত তিনি অবিলম্বে মালবপতির বিরুদ্ধে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বাহুবলে মালবসৈন্য পরাজিত, মালবরাজ্য বিধ্বস্ত ও দেবগুপ্ত নিহত হইলেন। * মালবরাজের ধন রত্নাদি রাজ্যবর্দ্ধনের হস্তগত হইল। মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন

* বাণভট্টপ্রণীত হর্ষচরিতে মালব রাজার নাম লিখিত হয় নাই। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনে দেবগুপ্তের নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। বিবিধ ক্ষোদিত লিপি আলোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, এই দেবগুপ্ত মালব দেশের পূর্ব্বাংশে এবং মহাকোশল বা দক্ষিণ কোশল (ছত্রিশগড়) প্রদেশে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেন। ডাক্তার ভুলসয়রের মতে এই মালব রাজা পঞ্জাবের নিকট অবস্থিত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহা সঙ্গত বাক্য নহে।

বিজিত ধন রত্ন ও বন্দীগণের ভার ভণ্ডীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন "পরমসৌগত" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ ছিলেন। § তৎকালে পূর্ব্ব ভারতে দারুণ বৌদ্ধবিদ্বেষী এক নরপতি ছিলেন। আধুনিক রাজমহলের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে উৎকলের সীমান্ত অবধি সমস্ত ভূভাগ তাঁহার করতলস্থ ছিল। প্রাচীন গৌড়নগরী তন্মধ্যে অবস্থিত হইলেও, রাজ্যাধিপতি সুবর্ণরেখার তীরস্থিত কর্ণসুবর্ণ বা করণসুকরাণ নগরে বাস করিতেন। এই নরপতির নাম শশাঙ্কদেব। বোধ হয়, সুবিখ্যাত গুপ্ত-বংশ হইতে তাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল। এজন্যই তিনি নরেন্দ্র গুপ্ত আখ্যা প্রাপ্ত হন। গৌড়নগরী তাঁহার করতলস্থ ছিল বলিয়া তিনি সাধারণতঃ "গৌড়েশ্বর গুপ্ত" আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইতেন। গৌড়েশ্বর শশাঙ্কদেব বহুভাবে রাজ্যবর্দ্ধনকে স্বীয় শিবিরে আহ্বান করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাঁহার প্রাণসংহার করেন। কুন্তলনামক জনৈক অশ্বারোহী সেনাপতির প্রমুখাৎ হর্ষবর্দ্ধন এই সংবাদ শ্রবণে শোক ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। এই সময় প্রধান মন্ত্রী ভণ্ডি, মালবরাজ্যের বিজিত সম্পত্তি লইয়া, শোকাকুল হর্ষবর্দ্ধনের নিকট উপস্থিত হইলেন। হর্ষবর্দ্ধন স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পঞ্চা[illegible]ত বৎসর অন্তেও, তৎপ্রতি হর্ষের গভীর শ্রদ্ধা, একান্ত অনুরাগ, অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, আমরা হর্ষবর্দ্ধনের শাসনপত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি।

রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী ও সামন্তবর্গ রাজসভায় উপস্থিত হইলে, সচিব-প্রধান ভণ্ডি তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যুবরাজ লোকান্তরিত হইয়াছেন; কনিষ্ঠ ভ্রাতাই তাঁহার একমাত্র উত্তরাধিকারী। ইনি স্নেহশীল, দয়ালু, কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং বিনীত। আমার বিবেচনায় ইনিই সিংহাসনে আরোহণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। সমবেত সভ্যমণ্ডলী এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া হর্ষবর্দ্ধনকে বলিলেন, কুমার! আপনার পিতা মহারাজের সুশাসনে প্রজাগণ সুখে কালযাপন করিয়াছে। আপনার অগ্রজের রাজ্যাধি-

§ রাজ্যবর্দ্ধন বৌদ্ধ ছিলেন, ইহা বাণভট্ট লিখেন নাই। কিন্তু মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের তাম্র-শাসন ও মুদ্রায় ইহার স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। (Epigraphia Indica. page. 72. and C.I.I. Vol. III. p. 232.) চীন পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ এই বাক্যের সত্যতা পোষণ করিতেছেন। (Si-Yu-Ki. Vol. I. p. 210.)

কারেও প্রজাবর্গ সেইরূপ আশা করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ, তাঁহার মন্ত্রীগণের অসাবধানতায়, তিনি অকালে শত্রু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছেন। এখন রাজ্যের সর্ব্বসাধারণ প্রজামণ্ডলী আপনার গুণানুবাদ দ্বারা, আপনার প্রতি তাহাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে। আমরা সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি রাজদণ্ড ধারণ করুন। আপনার বংশের শত্রুকুল নিপাত করুন। বিশ্বাসঘাতকতা ও নিষ্ঠুরতার দ্বারা যাহারা আপনার বংশের অবমাননা করিয়াছে, তাহাদের সমুচিত দণ্ডবিধান দ্বারা স্বীয়বংশের কলঙ্ক অপনোদন করুন। ভরসা করি, আপনি কখনই আমাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না।

কুমার হর্ষবর্দ্ধন বলিলেন, রাজ্যভার বহন করা নিতান্ত দুরূহ কার্য্য। আমি এই গুরুভার বহন করিবার নিতান্ত অনুপযুক্ত পাত্র। আমার স্নেহময়, পরমদয়ালু জনক, ও "বুদ্ধদেবের ন্যায় পরহিতব্রতপরায়ণ" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালকবলিত হইয়াছেন, সুতরাং প্রকৃতিবর্গের উপকারার্থ, তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে, আমি রাজমুকুট ধারণ করিতে সম্মত হইলাম *।

* পরিব্রাজক হিয়োনসাঙ বলেন, "উক্ত ঘটনার পর, হর্ষবর্দ্ধন বলিলেন, রাজদণ্ড ধারণ করিবার পূর্ব্বে, আমি বুদ্ধদেবের উপদেশ [illegible]হণ করিতে ইচ্ছা করি।" এই কথা বলিয়া তিনি গঙ্গাতীরে গমন করিলেন। তথা[illegible] [illegible]সত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের এক প্রস্তরমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। তিনি তাঁহার পদমূলে করযো[illegible] উপবেশন করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, সেই সময় এক তেজোময় পুরুষ তথায় আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"তুমি কি প্রার্থনা করিতেছ?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "প্রজাবর্গ আমাকে আমার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরিত্যক্ত আসন অধিকার করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। এ সম্বন্ধে আমি ভগবান বুদ্ধদেবের আদেশ প্রার্থনা করিতেছি।" তদুত্তরে সেই পুরুষ বলিলেন, "পূর্ব্বজন্মে তুমি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলে, সেই পুণ্যবলে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। করণসুবর্ণের অধিপতি পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে, তুমি রাজদণ্ড ধারণ করিয়াই ইহার প্রতিবিধান করিবে। বুদ্ধের প্রতি তোমার মতিগতি থাকিলে, দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া তুমি যশস্বী হইবে। ভারতের পঞ্চ বিভাগ (পঞ্চ গৌড়) তোমার করতলস্থ হইবে। পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের অধিপতিগণ তোমার পদানত হইবে। কিন্তু তুমি সিংহাসনে আরোহণ ও মহারাজ উপাধি ধারণ করিতে বিরত থাকিবে।" Si-yu-ki.—Vol. I. p. 211—13.

হিয়োনসাঙের উল্লিখিত বর্ণনা আমরা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, ক্ষোদিত মুদ্রা ও তাম্রশাসনে, হর্ষবর্দ্ধনের "মহারাজাধিরাজ" উপাধি দৃষ্ট হয়। রাজ্যাভিষেককালে, হর্ষবর্দ্ধন শৈব কিম্বা বৌদ্ধ ছিলেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। পশ্চাৎ তাঁহার ধর্ম্মমতের সমালোচনা করা যাইবে।

মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য, রাজমুকুট ধারণ করিয়াই স্বীয় অমাত্যবর্গকে বলিলেন, "অদ্যাপি আমার অগ্রজের শত্রু উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয় নাই,—পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলি করতলস্থ হয় নাই,—এই সকল কার্য্য সম্পাদন না করিয়া, আমি কখনই (সুখে) অন্নগ্রহণ করিতে পারিব না *।

পূর্ব্বভারতে হর্ষবর্দ্ধনের বিজয়ী পতাকা সংরোপিত করিবার জন্য, পঞ্চ সহস্র হস্তী, দুই সহস্র অশ্বারোহী ও পঞ্চাশ সহস্র পদাতি সজ্জিত হইল। হর্ষবর্দ্ধন ভণ্ডীর নিকট শ্রুত হইয়াছিলেন যে, রাজ্যশ্রী গুপ্ত † নামক জনৈক কুলপুত্রের সাহায্যে কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া, বিন্ধ্যাচলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি স্বসৈন্যে গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া, প্রথমে, রাজ্যশ্রীর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য বিবেচনায়, ভণ্ডিকে পূর্ব্বাভিমুখে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং বিন্ধ্যাচলে প্রবেশ করিলেন। বিবিধ স্থান ভ্রমণ করিয়াও হর্ষবর্দ্ধন রাজ্যশ্রীর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন না। অবশেষে একদা হর্ষবর্দ্ধন, দিবাকর মিত্র নামক জনৈক বৌদ্ধ স্থবিরের অশ্রমে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাকে ভগিনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনিও তাঁহার কোন সংবাদ বলিতে পারিলেন না। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন, যৎকালে সেই প্রশান্তমূর্ত্তি ভিক্ষুর সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়, এক ব্যক্তি দ্রুতপদে দিবাকর মিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "দেব! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! এক পবিত্র রমণীমূর্ত্তি শোকে অধীর হইয়া অনলে প্রবেশ করিতেছেন।" মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন, সেই রমণীকে আপনার ভগিনী বিবেচনায়, উন্মত্তবৎ তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। ভিক্ষুও সহচরবর্গের সহিত তাঁহার অনুগমন করিলেন। হর্ষ দূর হইতে দেখিলেন, সত্য সত্যই তাঁহার ভগিনী রাজ্যশ্রী অনলে প্রবেশ করিতেছেন। তদ্দর্শনে, তিনি পবনবেগে ধাবিত হইয়া, নিমেষমধ্যে রাজ্যশ্রীকে স্নেহপাশে বদ্ধ করিলেন।

---

* The enimies of my brother are unpunished as yet, the neighbouring countries not brought to submission; while this is so my right hand shall never lift food to my mouth. Si-yu-ki.—Vol. I. p. 231.

কিন্তু বাণভট্ট হর্ষচরিতে লিখিয়াছেন যে, সিংহনাদ ও স্কন্দ গুপ্ত নামক সেনাপতিদ্বয়ের উত্তেজনায়, হর্ষবর্দ্ধন গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন।

† মগধের গুপ্ত রাজবংশের সহিত বর্দ্ধনবংশ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ থাকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুতরাং এস্থলে গুপ্ত শব্দ দ্বারা মগধরাজবংশীয় কোন ব্যক্তিকে লক্ষ করা হইয়াছে।

দিবাকর মিত্র, হর্ষবর্দ্ধন ও রাজ্যশ্রীর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, প্রীতিচিহ্নস্বরূপ এক অমূল্য রত্নহার * হর্ষকে প্রদান করিলেন। দিবাকর মিত্রকে গ্রহবর্ম্মার চিরপরিচিত পরম সুহৃদ জানিতে পারিয়া, রাজ্যশ্রী বৌদ্ধ ভিক্ষুনী হইয়া, আজীবন তাঁহার আশ্রমে বাস করিবেন, স্থিরীকৃত হইল। রাজ্যশ্রী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

হর্ষবর্দ্ধন প্রাচীন গৌড় নগরীতে স্কন্ধাবার সংস্থাপন পূর্ব্বক, পূর্ব্বভারতের রাজন্যবর্গকে পরাজিত এবং কামরূপের অধিপতি ব্রাহ্মণবংশীয় কুমার ভাস্কর বর্ম্মার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

ক্রমে হর্ষবর্দ্ধনের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ষষ্টি সহস্র হস্তী ও এক লক্ষ অশ্বারোহী, তাঁহার বিজয়ী পতাকা ভারতের দিগ্‌দিগন্তে সংরোপিত করিবার জন্য ধাবিত হইল। ক্রমে ছয় বৎসর কাল অবিশ্রান্ত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া কাশ্মীর হইতে কামরূপ, নেপাল হইতে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত স্বীয় বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। একমাত্র চিরপরাক্রান্ত মহারাষ্ট্র জাতির অধিপতি সত্যাশ্রয় শ্রীপৃথিবীবল্লভ (দ্বিতীয় পুলকেশী) ব্যতীত, ভারতের অন্যান্য সমস্ত রাজন্যবর্গ, তাঁহার সমক্ষে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের এই দীর্ঘকালব্যাপী সমর-বৃত্তান্ত, চীনদেশীয় বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিৎ মাতোঁয়ালীন জলন্ত ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। মাতোঁয়ালীন বলেন "মহারাজ শিলাদিত্যের দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ সংগ্রামের ন্যায় এরূপ যুদ্ধ আর কখনও হইয়াছে বলিয়া শ্রুত হওয়া যায় না। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত, হস্তীসমূহের পর্য্যান ও সৈনিকদিগের অসিচর্ম্ম পরিত্যাগের অবসর হয় নাই। মহারাজ শিলাদিত্য ভারতের চারিটি বিভাগকে, তাঁহার পদানত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। উত্তরাপথের সমস্ত রাজা তাঁহার পদানত হইয়াছিল।"

পরিব্রাজক হিয়োন সাঙ মহারাষ্ট্রদেশের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "এই সময় মহারাজা শিলাদিত্য ভারতের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত জয় করিয়া, তাঁহার সৈনিকবর্গকে দিগ্‌দিগন্তে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কেবল একমাত্র মহারাষ্ট্র তাঁহার পদানত হয় নাই। তদনন্তর তিনি ভারতের পঞ্চবিভাগ হইতে উৎকৃষ্ট সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া, মহারাষ্ট্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্যাপি তিনি এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই।"

* এই রত্নহার হইতেই বোধ হয় রত্নাবলীর উৎপত্তি।

তৎকালে চালোক্যবংশীয় নরপতিগণ মহারাষ্ট্রদেশ শাসন করিতে-ছিলেন। বাতাপী ও কল্যাণ নগরী তাঁহাদের রাজধানী ছিল। চালোক্য রাজগণের অনেকগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দ্বারা মাতোঁয়ালীন ও হিয়েনসাঙের লিখিত বৃত্তান্তের সত্যতা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তররূপে পোষণ করিতেছে। কয়েকখণ্ড তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, কীর্ত্তিবর্ম্মা পৃথিবী-বল্লভ মহারাজের পুত্র সত্যাশ্রয় শ্রীপৃথিবীবল্লভ, মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনকে জয় করিয়া, "পরমেশ্বর" আখ্যা ধারণ করিয়াছিলেন। সাবন্তবাড়ী রাজ্যের অন্তর্গত নেরুর নামক স্থলে প্রাপ্ত একখণ্ড তাম্রশাসন হইতে [illegible] ত করিতেছি।

"তস্যাত্মজস্‌সমরসসক্ত সকলোত্তরাপথশূর* শ্রীহর্ষবর্দ্ধন পরমেশ্বরশব্দস্য সত্যাশ্রয় শ্রীপৃথিবীবল্লভ মহারাজাধিরাজ†।"

---

* মতান্তরে—"সমর সসক্ত সকলোত্তরাপথেশ্বর শ্রীহর্ষবর্দ্ধন।

Ind. Ant. Vols. VI. p. 76 and IX. p. 127.

† এই তাম্রফলকের অনুবাদক মেজর জেকুব, দেবনাগর অক্ষরে ইহার যে প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ভ্রম পরিলক্ষিত হওয়ায়, আমরা মূল প্রতিলিপির সপ্তম, অষ্টম, নবম পংক্তি হইতে ইহা উদ্ধৃত করিলাম।

J. Bo. R. A. S. Vol. III. Facsimiles of the Copper Plate No. II.

চালোক্য নরপতিগণের বিবিধ তাম্রশাসন হইতে, তাঁহাদের একটি বংশাবলী এস্থলে প্রকাশ করা গেল।

চন্দ্রবংশে—হারিতি গোত্র।

বিজয়াদিত্য
|
বিষ্ণুবৰ্দ্ধন
|
১। জয়সিংহ মহারাজ। (৪২২ শকাব্দ)
|
২। রণরাজ মহারাজ। (বিজয়াদিত্য)
|
৩। শ্রীপুলকেশি বল্লভ মহারাজ।
|
৪। শ্রীমঙ্গলীস বল্লভ মহারাজ। — ৫। শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্ম পৃথিবীবল্লভ মহারাজ। (৪৮৯ শক)
|
৬। "পরমেশ্বর" সত্যাশ্রয় শ্রীপৃথিবীবল্লভ। মহারাজাধিরাজ। (দ্বিতীয় পুলকেশী, ৫৩১ শকাব্দ)*
|
৭। শ্রীচন্দ্রাদিত্য পৃথিবীবল্লভ মহারাজ। — ৮। বিক্রমাদিত্য সত্যাশ্রয় শ্রীপৃথিবীবল্লভ।

---

* ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুব্জবিষ্ণুবৰ্দ্ধন, রাজমহেন্দ্রীর নিকটবর্ত্তী স্থানে বেঙ্গীপুর রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ প্রাচ্য চালুক্য বলিয়া খ্যাত।

ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, একমাত্র মহারাষ্ট্রপতি সত্যাশ্রয় (দ্বিতীয় পুলকেশী) ব্যতীত, ভারতের অন্যান্য নরপতিবর্গ হর্ষবর্দ্ধনের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। ভ্রাতা ও ভগিনীপতির উপাংশুহত্যার দ্বারা হর্ষবর্দ্ধনের হৃদয়ে যে ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা পরিচালিত হইয়াই তিনি "চক্রবর্ত্তী" বা "মহারাজাধিরাজ" আখ্যা ধারণ করিতে সক্ষম হন। পুরাণকারদিগের গাঁজাখুরী গল্প পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র ইতিহাসের সাহায্যে আমরা [illegible]রতে তিন জন বিখ্যাত কীর্ত্তিমান প্রকৃত সম্রাট দেখিতে পাইতে[illegible] [illegible]কুল তিলক মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র দেবপ্রিয় প্রিয়[illegible]রাজ অশোক তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। আফ্রিকার মরুভূমি [illegible] পৃথিবীতে এমন স্থান অতি বিরল, যে স্থলে মহারাজ অশোকের [illegible]দশ আজ্ঞা ঘোষিত না হইয়াছিল। পূর্ব্বসাগরের তরঙ্গকলাপচুম্বিত উৎকল হইতে বৈয়াকরণচূড়ামণি পাণিনির সূতিকাগৃহ প্রাচীন গন্ধার দেশ পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র পর্ব্বতগাত্রে অদ্যাপি অশোকের সেই ত্রয়োদশ আজ্ঞা খোদিত রহিয়াছে। আসিয়ার পূর্ব্বোত্তরপ্রান্তস্থিত জাপান হইতে ইয়ুরোপের অন্তর্গত সুইডেন নরওয়ে প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পরিভ্রমণ করিয়া, জগতের সভ্য অসভ্য সমস্ত মানবকে, অশোকের সেই সকল আদেশ শ্রবণ করাইয়াছিলেন। অশোকের পর, আমরা গুপ্তবংশাবতংস—লিচ্ছবিদৌহিত্র অশ্বমেধযজ্ঞকারী অপ্র[illegible] পরাক্রম মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্তের নামোল্লেখ করিতে পারি। পারস্যের "ষায়ণষাহি" নরপতি যাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন—ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত ত্রিপুরা হইতে পারস্য পর্য্যন্ত যাঁহার বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, তিনি অবশ্যই মহারাজ অশোকের পার্শ্বে উপবেশন করিতে পারেন। অশোক ও সমুদ্রগুপ্তের পর, তাঁহাদের কনিষ্ঠ "পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের" নামোল্লেখ হইতে

মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর ভট্টারক।
|
৯। বিজয়াদিত্য সত্যাশ্রয় (ইত্যাদি)
|
১০। বিজয়াদিত্য সত্যাশ্রয় (ইত্যাদি)
|
১১। বিক্রমাদিত্য—(দ্বিতীয়)
|
১২। কীর্ত্তিবর্ম্ম—(দ্বিতীয়) (৬৭৫—৮২ শকাব্দ)

রাষ্ট্রকূট বংশীয় কান্তি দুর্গ দ্বারা রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। ৮৯৫ শকাব্দে, পুনর্ব্বার চালুক্যবংশীয় তৈলপ দেবকল্যাণ নগরীর রাজসিংহাসন অধিকার করেন।

পারে। * বৌদ্ধদ্রোহী ব্রাহ্মণগণ তদানীন্তন বাগবাজারের আড্ডায় দম কসিয়া কত নগণ্য রাজার অদ্ভুত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, তাঁহারা ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী প্রকৃত কীর্ত্তিমান সম্রাট-ত্রয়ের মধ্যে একজনেরও জীবনচরিত লিখেন নাই। বৌদ্ধগণ অশোকের যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। অশোকের ন্যায় সম্রাটের এরূপ জীবনী পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না। বিষ্ণু-পুরাণকার আমাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ পূর্ব্বক, এক পংক্তিতে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের বংশের ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়াছেন। আর ফ্লিটসাহেব গুপ্ত-বংশের আবিষ্কৃত মুদ্রা ও খোদিত লিপি অবলম্বন করিয়া, এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বাণভট্ট হর্ষবর্দ্ধনের অন্নে আজীবন প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি হর্ষচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াই দাঁড়ি দিয়া বসিয়াছেন। যে স্থানে প্রকৃত পক্ষে হর্ষের জীবন আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানে তিনি ইতি দিয়া-ছেন। সম্ভবতঃ বাণের অকালমৃত্যুতে এরূপ ঘটনা হইতে পারে। পক্ষা-ন্তরে কেহ কেহ বলেন, হর্ষ যখন হিন্দু ছিলেন, তৎকালে বাণ তাঁহার জীবনী লিখিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পশ্চাৎ তিনি যখন বৌদ্ধ হইলেন, বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বাণ তৎকালে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে বিরত হইলেন। আমরা বাণভট্টের প্রতি এরূপ গুরুতর কলঙ্ক আরোপ করিতে প্রস্তুত নহি। কারণ, হর্ষের অভিষেকের পঞ্চবিংশতি বৎসর অন্তে, তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই পঞ্চবিংশতি বৎসরের ঘটনাসমূহ বাণ অনায়াসে লিখিতে পারিতেন। বাণের জগদ্বিখ্যাত কথাগ্রন্থ কাদম্বরী, তাঁহার অকালমৃত্যুতে অসম্পূর্ণ ছিল। তদনন্তর, তাঁহার পুত্র এই গ্রন্থের উত্তরভাগ রচনা করিয়া, গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বাণের অকালমৃত্যুতে হর্ষচরিতও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

---

* Siladitya may be regarded as a type of Hindu Suzerains who reigned in the olden time.—Wheeler's Imperial Assemblage at Delhi, page 12.

আকবর সাহের মৃত্যু।

বাবর হইতে আরঙ্গজেব পর্য্যন্ত, মোগল সম্রাটগণ সকলেই বিচিত্রবীর্য্য এবং অসীম ক্ষমতাশালী, কিন্তু ইঁহাদিগের মধ্যে আকবর সাহ প্রধান। জগতে চক্রবর্ত্তী সম্রাটদিগের মধ্যে আকবর স্মরণীয়; সকল দিক হইতে দেখিতে গেলে এরূপ বিবেচনা হয় যে, তাঁহার তুল্য সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ মহদাশয় ভূপতি জগতে কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। সুলেমান তাঁহার অপেক্ষা বহুদর্শী ও জ্ঞানী ছিলেন; আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়ান তাঁহার অপেক্ষা দিগ্বি-জয়ী শূরবীর ছিলেন; হারুণ-অল্-রশীদ প্রজাপালনে সমধিক যত্নবান ছিলেন। কিন্তু আকবর সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত সৌভাগ্যশালী রাজার আদর্শ-স্থানীয়। সীজার ও হ্যানিবালের তুল্য যুদ্ধবিশারদ না হউন, যুদ্ধস্থলে তাঁহার বীর্য্য দেখিয়াও সকলে চমৎকৃত হইত। দ্বাদশ বর্ষের বালক সিংহের ন্যায় যুদ্ধ করিতেন। তাঁহার তুল্য ধনী কেহ হয় নাই। রাজকার্য্যে যেরূপ দক্ষতা ও নিপুণতা ছিল, বিস্তৃত সাম্রাজ্য তাহার পরিচয়। হিন্দু মুসলমানের বৈরভাব তিনিই মোচন করেন/তাঁহারই গুণে মোহিত হইয়া চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজপুতগণ তাঁহার দরবার অলঙ্কৃত করেন, এবং তাঁহার সহিত বৈবাহিক-সূত্রে বদ্ধ হন। বিলাসপরায়ণ না ছিলেন এমন নহে, কিন্তু ভোগবিলাসে কখন অধিক কাল যাপন করিতেন না। মহত্ত্বের সমস্ত লক্ষণই তাঁহাতে ছিল। অষ্ট প্রহরের মধ্যে এক প্রহরের অধিক নিদ্রা যাইতেন না। কুবেরের ন্যায় অক্ষয় ভাণ্ডারের অধীশ্বর হইয়াও, বিলাসিতায় কাল কাটাইতেন না, নিত্য ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন। পারমার্থিক তত্ত্বে মন-নিবিষ্ট ছিল, পণ্ডিত, শাস্ত্রী ও মৌলবীদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনায় অনেক সময় সমস্ত রাত্রি যাপন করিতেন। পদব্রজে বহু দূর গমন করিতে কুণ্ঠিত বা শ্রান্তি বোধ করিতেন না। এত বড় রাজত্বের সমস্ত কার্য্য স্বয়ং দেখিতেন, বুদ্ধি ও দৃষ্টি সর্ব্বমুখী ছিল। সিন্ধুপ্রদেশের মরুভূমি মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া, বাল্যকালে ভিখারীর সন্তানের ন্যায়, দেশে দেশে ফিরিয়াছিলেন। পিতা হুমায়ুনের মৃত্যুর পর, তিনি হিন্দুস্থানের বাদসাহ হইলেন বটে, কিন্তু মোগল রাজ্য সে সময় ক্ষুদ্র। আকবরের প্রতাপে, কৌশলে, গভীর রাজনীতির

বলে সেই রাজত্ব কাবুল হইতে বঙ্গপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল। বহুতর ইতিহাসে তাঁহার অতুল কীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র জাহাঙ্গীরের স্বলিখিত আত্মচরিতে তাঁহার সম্বন্ধীয় অনেক কথা আছে। জাহাঙ্গীর পিতাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন।

রামায়ণ মহাভারতে যে সকল আজানুলম্বিত, কিণাঙ্কিতবাহু, সিংহবিক্রম রাজাদিগের বর্ণনা পাঠ করা যায়, আকবর সেই জাতীয় পুরুষশার্দ্দূল ছিলেন। তৈমুরবংশীয়েরা বাস্তবিক তুর্কি ছিলেন, তাঁহাদিগকে মোগল বলা ভ্রম। আকবর সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন, অসাধারণ কান্তিবিশিষ্ট তুর্কি রাজবংশাবতংস ছিলেন। তাঁহার আকৃতি দীর্ঘ, বর্ণ লোহিত গোধূমের ন্যায়, চক্ষু কৃষ্ণতার, এবং ভ্রূযুগ ঘনকৃষ্ণ ও মিলিত। নাসিকার উপর একটি কৃষ্ণবর্ণ তিল ছিল। বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, বাহু দীর্ঘ। বাদসাহ মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিতেন। দশ মনের প্রকাণ্ড লৌহ শিকল লইয়া নিত্য ব্যায়াম করিতেন। যে হস্তীকে আর কেহ বশীভূত করিতে পারিত না, আকবর তাহাকে বশ করিতেন। এক হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে লাফ দিয়া অন্য হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেন। যখন কোন হস্তী মত্ত হইয়া মাহুতকে বধ করিত ও অন্য হস্তীকে নিকটে আসিতে দিত না, তখন বাদসাহ বৃক্ষে অথবা প্রাচীরে আরোহণ করিয়া, সেই হস্তীর স্কন্ধে লাফাইয়া পড়িতেন, ও তাহাকে অঙ্কুশ দ্বারা বশীভূত করিতেন।

জাহাঙ্গীর আকবর সাহের ঐশ্বর্য্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অত্যুক্তিদোষ থাকিলেও স্বর্ণ ও মণিমুক্তায় তাঁহার তুল্য ধনবান সম্রাট কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ কথা সকলেই স্বীকার করে। তাঁহার কোষাগারে এত স্বর্ণমুদ্রা ও হীরা মাণিক্য ছিল যে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁহার আদেশানুসারে রাজপ্রাসাদস্থিত একটি কোষাগারের ধন একবার ওজন করা হয়। চারি শত তুলাদণ্ড দ্বারা পাঁচ মাস যাবৎ মুদ্রা ওজন করা হয়, কিন্তু তাহাতেও সেই রাশীকৃত ধন ফুরায় না। হস্তীশালায় বত্রিশ সহস্র হস্তী থাকিত। তাহাদিগের আহারের নিমিত্ত নিত্য চারি লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইত। বাদসাহের মৃগয়ার নিমিত্ত দ্বাদশ সহস্র মৃগ ও দ্বাদশ সহস্র অন্যান্য পশু থাকিত। যে দেশে যাহা কিছু দুর্লভ, বহুমূল্য ও আশ্চর্য্য সামগ্রী ছিল, আকবর তাহা সমস্তই সঞ্চিত করিয়াছিলেন। আকবর অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। গদ্য ও পদ্য রচনায় তাঁহার সবিশেষ নিপু-

ণতা ছিল। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় তর্ক বড় ভালবাসিতেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার নিকট অত্যন্ত সম্মানিত হইতেন। সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণতাই তাঁহার চরিত্রের মহৎ গুণ ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোনরূপ পক্ষপাতিতা করিতেন না। মহারাজা মানসিংহ তাঁহার সভায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওমরাহ ছিলেন।

আকবর শাহ যে সময় অত্যন্ত পীড়িত, সে সময় ওমরাহদিগের মধ্যে যুবরাজ সেলিমের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। প্রখ্যাত ইতিহাসকার আবুল ফাজেলের হত্যানিবন্ধন, আকবর যুবরাজের প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। সেই সুযোগে, মহারাজা মানসিংহ ও অন্যান্য ওমরাহগণ, মানসিংহের ভাগিনেয় সেলিমের জ্যেষ্ঠ পুত্র খুসরুকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিবার চেষ্টা করেন। সেলিম দুর্গের বাহিরে বাস করিতেন, দিনান্তে একবার করিয়া রুগ্ন পিতাকে দেখিতে যাইতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে মানসিংহ প্রভৃতি বাদশাহের কাণে নানা কথা তুলিতেন। আকবর শাহ স্বীয় প্রতিভা ও বহুদর্শিতা বলে বুঝিতে পারিলেন যে, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া পৌত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিলে, গৃহবিচ্ছেদ ও বিসম্বাদের আশঙ্কা। সেলিম রাজকার্য্যে অক্ষম ছিলেন না, আকবর তাহাও জানিতেন। ~~একদিন~~ তিনি যুবরাজ সেলিমকে গোপনে সাবধান থাকিতে বলিয়া দিলেন, আরও বলিলেন, "তুমি প্রতিদিন এখানে আসিও না। যখন আসিবে, একা আসিও না, কয়েক জন শরীররক্ষক সঙ্গে লইয়া আসিও।" পর দিবস বাদশাহের অনুমতি না লইয়াই চক্রান্তকারীরা দুর্গের দ্বার রোধ করিল। যুবরাজ গিয়া দেখিলেন,—দ্বার রুদ্ধ, তোরণের উপর তোপ সাজান রহিয়াছে। তিনি অগত্যা ফিরিয়া গেলেন।

এই সময় মানসিংহ যুবরাজ সেলিমকে পত্র লেখেন যে, আমীর ওমরাহগণ সকলে খুসরুর পক্ষে, অতএব যুবরাজও সেই প্রস্তাবে সম্মত হউন। সেলিম পত্রের কোন উত্তর না দিয়া, পারবেজ নামক পুত্রকে বাদশাহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন ও বলিয়া পাঠাইলেন যে, স্বয়ং পীড়িত বলিয়া আসিতে পারিলেন না। আকবর শয্যা হইতে হস্ত উত্তোলন করিয়া যুবরাজের নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করিয়া যুবরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, "এমন সময় তুমি আমার নিকট রহিলে না কেন? সিংহাসন লইয়া কোনই বিবাদ নাই, তবে তুমি আমায় দেখিতে আইস না কেন?" সুযোগ পাইয়া

কয়েক জন ওমরাহ নিবেদন করিলেন, "শাহজাদা সেলিম সৈন্য লইয়া দুর্গ বেষ্টন করিয়াছেন, হুজুর কয়েক দিন যমুনার পর পারে গিয়া বাস করিলে ভাল হয়।" আকবর কহিলেন, "তোমরা কি দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছ যে, যুবরাজ সৈন্যবল সংগ্রহ করিয়াছেন?" মির্জা আজীজ কাউকা এই অবসরে জিজ্ঞাসা করেন, "রাজপুত্র খুসরু সম্বন্ধে বাদশাহের কি আদেশ হয়?" পীড়িত বাদশাহ ক্লিষ্টস্বরে কহিলেন, "ঈশ্বরের আদেশেই সমস্ত হয়, তিনি যাহাকে দেন, সেই রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমাদের কথায় বোধ হইতেছে, তোমরা আমার মৃত্যু-কামনা করিতেছ। যদি আমার যাত্রার সময় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া আর কাহাকে রাজ্য দান করিব? সেলিমের এমন কি বিশেষ দোষ আছে যে, তাহাকে পিতৃসিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিব? খুসরুকে বাঙ্গালার শাসনভার প্রদান করিলাম।" বাদশাহের দৃঢ়তা দেখিয়া চক্রান্তকারীগণ ভীত হইল। মানসিংহ প্রভৃতি ওমরাহগণ একে একে গিয়া যুবরাজকে অভিবাদন করিলেন। খুসরু স্বয়ং আসিয়া পিতাকে বন্দনা করিলেন।

আকবর শাহ, মৃত্যু আসন্ন বুঝিতে পারিয়া, যুবরাজকে আপনার রাজবেশ ও মস্তক হইতে শিরোপা খুলিয়া পাঠাইয়া দিলেন, এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, সেলিমকে না দেখিয়া তিনি স্থির হইতে পারিতেছেন না। সেলিম বাদশাহের প্রসাদ ধারণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বাদশাহের শ্বাস আরম্ভ হইয়াছে। সেলিমকে দেখিয়া আকবর কহিলেন, "ওমরাহদিগকে আমার শয্যাপার্শ্বে আনয়ন কর।" সকলে আসিলে, বাদশাহ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "তোমরা আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ সকল মার্জ্জনা কর।" পরে স্পষ্টস্বরে কহিতে লাগিলেন, "আমার রাজত্বে যে শান্তি ও নিশ্চিন্ততা ভোগ করিয়াছ, তাহা স্মরণ কর; আমার রাজসভার ঐশ্বর্য্য স্মরণ কর; অন্তিমকালে ভোগস্পৃহা ত্যাগ করিয়া জগদীশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়াছি; কাবা তীর্থের জন্য চন্দ্রাতপ নির্ম্মাণ করিয়াছি। আমার সমাধিস্থানে তোমরা স্নেহাশ্রুস্বরূপ মুক্তাফল বিসর্জ্জন করিও; প্রাতে প্রার্থনাকালে আমায় স্মরণ করিও। যখন শীতের তীব্র শীতল বায়ু বহিবে, তখন এই শীতল হস্ত কত স্বর্ণ বিতরণ করিয়াছে,— স্মরণ করিও। আমার প্রাণ এই অন্ধকার পিঞ্জর হইতে উড়িয়া পলায়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। যে বক্ষঃস্থল ধারণ করিবার জন্য এই পৃথিবী

অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ বোধ হইত, তাহাতে এখন নিশ্বাসের অর্দ্ধভাগ মাত্রও অবশিষ্ট নাই।" বাদসাহ নীরব হইলেন। যুবরাজ সেলিম রোদন করিতে করিতে পিতার পদতলে মস্তক রক্ষা করিলেন। তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া, ধীরে ধীরে তিন বার পিতার শয্যা প্রদক্ষিণ করিলেন। বাদসাহ সঙ্কেত পূর্ব্বক যুবরাজকে ফতে-উল-মুল্‌ক নামক তাঁহার স্বহস্তের তরবারি কটিদেশে বন্ধন করিতে আদেশ করিলেন।

সে দিবস বাদসাহ জীবিত রহিলেন। পর দিবস, যুবরাজের সমক্ষে, বাদসাহ মীরাণ সদরজাহানকে আহ্বান করাইয়া, কল্‌মা সহাদৎ পাঠ করিতে আদেশ করিলেন। কল্‌মা পাঠ করিবার পূর্ব্বে যুবরাজকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "বাবা, এই শেষ বিদায়, পৃথিবীতে আর আমাদের সাক্ষাৎ হইবে না। অবরোধে যে সকল স্ত্রীলোক আছে, তাহাদিগকে রক্ষা করিও। এখন তাহারা যেমন বেতন পাইতেছে, তাহাদিগকে সেইরূপ বেতন দিও। যে সকল কথা তোমায় বলিয়াছি, বিস্মৃত হইও না। আমার ভৃত্যদিগকে রক্ষা করিও, দীন দুঃখীকে পালন করিও। আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিও।" এই বলিয়া বাদশাহ সংসারচিন্তা হইতে বিরত হইলেন। সদরজাহান কল্‌মা পাঠ করিতে লাগিলে "লা ইলাহী ইল অল্লা! মহম্মদ উর রসুল অল্লা!" বাদশাহ স্পষ্টাক্ষরে কল্‌মা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। এইরূপে, প্রশান্তভাবে আকবর সাহের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিয়াছিল।

মৃতদেহ সুবাসিত জলে স্নান করাইয়া, নানাবিধ গন্ধসামগ্রী অনুলেপন করাইয়া, বহুমূল্য বসনে আবৃত হইল। যুবরাজ সেলিম দুর্গের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত মৃতদেহ স্বয়ং বহন করিলেন। দ্বারের বাহিরে আসিয়া, সেলিমের পুত্রগণ ও প্রধান কর্ম্মচারীগণ, সম্রাটের মৃতদেহ বহন করিতে লাগিলেন। আগ্রা হইতে কিছুদূরে, সিকন্দ্রা নামক স্থানে আকবরের সমাধি হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কেরাণি-জীবন।

বাবু রামকিঙ্কর রায়, ইংরাজি বিদ্যায় পারদর্শী, কিন্তু খাঁটি হিন্দু। দুষ্ট-লোকে বলে, প্রথম বয়সে নাকি তাঁর কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল, কিন্তু যে যা' বলে বলুক, এখন রামকিঙ্কর বাবুর মত হিঁদু মেলা ভার।

রায় মহাশয় বাল্যবিবাহের বড় পক্ষপাতী, তবে এ কথাও তিনি বলিতেন, অভিভাবক দূরদর্শী না হইলে, বাল্যবিবাহে কিছু কুফলও ফলিতে পারে; বিজ্ঞ রায় মহাশয়ের কিন্তু সে ভয়টুকুও ছিল না; তাই তিনি এক দশমবর্ষীয়া বালিকার সহিত স্বীয় ষোড়শবর্ষীয় পুত্র শ্রীমান নলিনীকান্তের বিবাহ দিয়াছিলেন।

রায় মহাশয় কলিকাতায় কাজ করিতেন, কাজ কর্ম্মের অবস্থা ভাল, পরিবারবর্গ কাছেই থাকিত।

নলিনীকান্তের বিবাহের পর তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে; এই তিন বৎসরে রায় মহাশয় পুত্রবধূকে অনেকবার আনাইয়াছেন, কিন্তু বালকপুত্রের সহিত বালিকা-বধূর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহাতে কোন আলাপ-পরিচয় না ঘটে, তদ্বিষয়ে তিনি পূর্ণমাত্রায় সতর্ক। তিনি জানিতেন, বাল্য-বিবাহরূপ পূর্ণিমার চন্দ্রের কলঙ্কই ঐটুকু।

কিন্তু মেয়েরা এতটা বুঝে না, তা'রা লুকাইয়া লুকাইয়া, মাঝে মাঝে, গভীর রাত্রে বধূকে নলিনীর ঘরে দিয়া আসিত। এ খবর কিন্তু বিজ্ঞ রায় মহাশয়ের কাণে উঠিবার সম্ভাবনা ছিল না।

এইরূপে কিছুদিন যায়। এক দিন সময় বুঝিয়া, গৃহিণী রায় মহাশয়কে বলিলেন—"আর শুনেছ! আমাদের বউমা যে পোয়াতী।" কথাটা শুনিয়া রায় মহাশয় সহসা চমকিয়া উঠিলেন। বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে গৃহিণীর পানে চাহিয়া বলিলেন—"অ্যাঁ—বউমা!—আমাদের নলির বউ!" রায় মহাশয়ের তখনকার মূর্ত্তি ঠিক চিত্র করা দুরূহ। যাহা হউক, এত দিনে বিজ্ঞ রায় মহাশয় বুঝিলেন, চাঁদে কলঙ্ক স্বভাবেরই নিয়ম।

যথাকালে, নলিনীকান্তের এক কন্যা জন্মিল। ইহার পর হইতে, ষষ্ঠী দেবী বধূমাতার উপর অসাধারণ কৃপাবিতরণ করিতে কখনও কার্পণ্য

করেন নাই। দেখিতে দেখিতে রায় মহাশয়, পৌত্র-পৌত্রী-পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিলেন, তাহাদের লইয়া তিনি বড় আনন্দে দিন কাটাইতেন।

রায় মহাশয় এইরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ উপর হইতে তাঁহার তলব পড়িল; হায়! এত সাধের খেলাঘর ফেলিয়া,রায় মহাশয়কে অসময়ে যাইতে হইল! পিতার এই আকস্মিক মৃত্যুতে নলিনী অকুলপাথারে পড়িল। সে যে এখনও কলেজের ছাত্র! নলিনীর পিতা অনেকদিন হইতেই বেশ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু কই, তেমন কিছুই ত রাখিয়া যান নাই। এই তরঙ্গ-ভঙ্গময় সংসারসমুদ্রে, নলিনী একা, নিতান্তই একা, কেমন করিয়া সে এতবড় গৃহস্থালী চালাইবে? শেষ সে ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই অশৌচ অবস্থাতেই তার ৺ পিতৃদেবের বড় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। সাহেব, রায় মহাশয়কে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন, নলিনীকে শীঘ্রই একটি কাজ দিতে স্বীকৃত হইলেন।

নলিনী তার পর কলিকাতার বাসা ছাড়িয়া দিয়া, সপরিবারে দেশে গেল।

কোনরূপে পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া, নলিনী কলিকাতায় ফিরিল। পরিবারবর্গ দেশেই রহিল।

কলিকাতায় আসিয়া নলিনীকে আর বড় কষ্ট পাইতে হইল না, সেই সাহেবের দয়ায় শীঘ্রই একটি কাজ জুটিল; বেতন ত্রিশ টাকা। কাজ পাইয়া, নলিনী ভাবিল, হায়! হায়! শেষ এই ত্রিশ টাকায় জীবন বিকাইতে হইল! আফিসের অন্য অন্য কেরাণিরা মনে করিল, নলিনীবাবুর কি জোর কপাল; একেবারেই ত্রিশ!

নলিনীর নূতন জীবন আরম্ভ হইল, প্রথম প্রথম চাকুরীতে তার তত্তটা মন বসিত না! তার আকাশের মত মুক্ত হৃদয়, বায়ুর মত স্বাধীন ভাব, হটাৎ কেরাণিগিরির সংকীর্ণ কূপে আবদ্ধ হইতে চাহে না। সে যখন কষ্টে, বহুকষ্টে কেরাণিগিরিতে মন বাঁধিতে চায়, তখনই যেন, কোথা হইতে পূর্ব্ব স্মৃতির বাঁশী বাজিয়া উঠে, আর মন বাঁধা হয় না। এই জন্যই "ব্রেক" কসার প্রয়োজন, বুঝি তাহারই অনুকরণে এপ্রেন্টিসের সৃষ্টি। নলিনীর হৃদয় একটু কাব্য-প্রবণ, এতদিন সে কাব্য ও কবিতা, ফুল ও জ্যোৎস্না লইয়া মত্ত ছিল। ভাবিয়াছিল,—ইহা লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিবে। কিন্তু একে একে তাহার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিতে লাগিল। হায়, তবে ত শুধু

ঘুমন্ত জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্যে, ফুটন্ত কুসুমের গন্ধে, ছুটন্ত দখিণা বায়ুতে পেট ভরে না!

নলিনীর কাব্যরসের সহিত অন্য দুই একটা রসও ছিল। তা'র মধ্যে বীররসই প্রধান। ভারত-জাগান ভাব, তাহার অন্তরে অন্তঃসলিলার মত বহিত, সময়ে সময়ে সে রস লেক্‌চাররূপে উথলিয়া উঠিত। সে কত বার ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডির চিত্র উজ্জলবর্ণে আঁকিয়া, ভারতবাসীর সমক্ষে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছে। কত দিন সে, কৃষ্ণদাস ও সুরেন্দ্রনাথের দেশহিতৈষিতার খুঁৎ ধরিয়াছে, মনে করিয়াছে, সে দেখাইবে, কেমন করিয়া দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হয়। কিন্তু হায়! আজ তাহার সে সব সঙ্কল্প জল্পনায় পরিণত হইল!

নলিনীকান্ত কলিকাতার এক 'মেসে' থাকিতেন, দেশে কিছু 'জমীজারাৎ' আছে, তবু বাটীতে মাসে মাসে পনর টাকা করিয়া না দিলে চলে না। নলিনীর বাটী কলিকাতা হইতে কিছু দূর হইলেও, রেলগাড়ীর কল্যাণে, শনিবারে গিয়া সোমবারে আফিস করা চলে। কিন্তু টাকায় কুলায় না বলিয়া, নলিনীর নিয়মমত যাতায়াত চলে না, মাসে কেবল একবার যাওয়া হয়।

আফিসে বেতনবৃদ্ধির নাম গন্ধ নাই, কিন্তু বাটীতে, বংশবৃদ্ধি সমভাবেই চলিতেছে। এখন আর পনর টাকায় সংসার খরচ কুলায় না, আঠার টাকা করিয়া পাঠাইতে হয়, কাজেই মাসান্তে একবার যাওয়া, তা'ও বন্ধ করিতে হইল। এখন ন' মাসে, ছ' মাসে।

কিন্তু এততেও নলিনীর কাব্যরস আজও একবারে শুকায় নাই, বাহিরের উত্তাপে, পাতালে ভোগবতীর মত, সে রস অন্তরে আশ্রয় লইয়াছে। হায়, কবিতা-রোগের কি ঔষধ নাই? এ রোগ একবার ধরিলে বুঝি 'ক্রণিক' হইয়া দাঁড়ায়। নলিনী এখনও বাছিয়া বাছিয়া শুক্লপক্ষে বাড়ী যায়, বসন্তের শনিবারেও তার কলিকাতায় মন টিকে না। এখনও সে, দীর্ঘ প্রবাসের পর, মিলনের জ্যোৎস্না রাত্রি চোখে চোখে কাটাইতে চায়। নলিনীর গৃহিণী যখন গৃহস্থলীর কথা বলিতে ব্যস্ত, নলিনী তখন একদৃষ্টে তাঁহার বদনচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে থাকে—কথাগুলা 'মাঠে মারা' যায় দেখিয়া গৃহিণী যখন স্বরলহরী সপ্তমে তুলিয়া বলেন—"নাও, তোমার পাগ্‌লামী রাখ, আর সাহিত্যতা কর্ত্তে হবে না,—চিরকালই কি ছেলেমি ভাল লাগে?" তখন নলিনীনাথ একটু অপ্রতিভ হইয়া, প্রকৃতিস্থ হন।

নলিনী কর্ম্মে প্রবেশ করার পর, পাঁচ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন তার দুই কন্যা ও তিনটি পুত্র। জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স নয় বৎসর হইতে চলিল। দুই তিন বৎসর মধ্যে বিবাহ না দিলে নয়, কি উপায়ে সে এ গুরুভার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, নলিনী এখন দিন রাত তাই ভাবে। নলিনীর বয়স আজিও ত্রিশ বৎসর হয় নাই, কিন্তু সে যখন, ছাতা কাঁধে গোধূলি লগ্নে আফিস হইতে গৃহে ফিরে, তখন তাহার সেই চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখখানি আর উদাস-মন্থর গতি দেখিয়া মনে হয়, বুঝি অকাল বার্দ্ধক্যে যৌবন হরিয়া লইয়াছে।

নলিনী যখন প্রথম প্রথম কর্ম্মে প্রবেশ করে, তখন তাহার 'উপর-ওয়ালার' মিষ্ট ভৎর্সনায় বড় ব্যথা পাইত। গুরুমহাশয়ের বেত বড় যন্ত্রণা-দায়ক বটে, কিন্তু সে ত শুধু ত্বক্‌স্পর্শী, এত মর্ম্মস্পর্শী নয়। কিন্তু কাণে সবই সয়। ক্রমে তার শ্রবণে কড়া পড়িতে আরম্ভ হইল, তবু এক দিন এক নূতন সাহেবের বীভৎস তাড়নায় নলিনীর ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার লুপ্ত বীর্য্য সুপ্ত সিংহের মত জাগিয়া উঠিল। তখনই সে কর্ম্মত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া 'রেজিগ্‌নেশন্' দিতে যায়, অমনি পুত্র কন্যাগুলির মুখ মনে পড়িল।—মনে পড়িল, আজ কাজ ছাড়িলে, কাল অন্য কর্ম্ম মিলিবে, এমন সম্ভাবনা নাই—তবে কি সব অনাহারে মারা পড়িবে—না, আর কাজ ছাড়া হইল না।

নলিনী একবার অনেক দিনের পর বাটী গিয়াছে। গৃহিণীকে দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে জানাইল, "একটা শুভ খবর আছে।" গিন্নি অমনি উৎফুল্ল লোচনে, মহা আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?" নলিনী একটু রঙ্গ করিবার অভিলাষে বলিল, "কেন, অনেক, দিনের পর আমি এসেছি, এটা কি আর সুখবর নয়?" গৃহিণী যেন একটু বিরক্তি সহকারে বলিয়া উঠিলেন, "নাও, ও সব রঙ্গ রাখ—এখন খবরটা কি খুলে বল।" তখন, নলিনী পূর্ণানন্দে বলিল, "আমার সেই লেখাটার ভারি সুখ্যাতি হয়েছে।" ঘোর অবহেলায় গৃহিণী অধরপল্লব কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"এই? আমি বলি মাইনেই বা বেড়েছে," বলিতে বলিতে গজেন্দ্রগামিনী উপেক্ষায় কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। নলিনীর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। নিশ্বাস মুক্ত বাতাসে মিলাইয়া গেল।

শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ।

১

পারিবারিক জীবন।

পশ্চিম ঘাটপর্ব্বতশ্রেণীর উত্তর অংশকে সহ্যাদ্রি বলে। সহ্য পর্ব্বত মহারাষ্ট্রদেশকে পূর্ব্বপশ্চিমে দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। সহ্য পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশ 'কোঁকণ' (কঙ্কণ বা Concan) নামে প্রসিদ্ধ। কোঁকণ দুই ভাগে বিভক্ত; যথা, উত্তর কোঁকণ ও দক্ষিণ কোঁকণ। উত্তর কোঁকণের অন্তর্গত 'চৌল' প্রদেশে (District of Choule) সমুদ্রতীরে সাবিত্রী নদীর মোহানার নিকটে, 'শ্রীবর্দ্ধন' নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এই গ্রাম বহুদিবসাবধি আবিসিনীয়গণের অধিকারভুক্ত। আবিসিনীয়গণ দাক্ষিণাত্যে 'সিদ্দি' নামে পরিচিত। কুলাবা জেলার অন্তর্গত "জঞ্জীরা" দ্বীপ সিদ্দিগণের রাজধানী। (১)

শ্রীবর্দ্ধন গ্রামের লোকসংখ্যা তিন সহস্রের অধিক নহে; তন্মধ্যে প্রায় এক সহস্র ব্রাহ্মণ। কঙ্কণের অন্তর্গত অন্যান্য স্থানের ন্যায়, এই গ্রামেও আম, কাঁঠাল, নারিকেল, কদলী ও সুপারি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এখানকার সুপারি অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ও আদৃত।

এই শ্রীবর্দ্ধনে প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে (খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে) এক জন সদ্বংশজাত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার নাম বিশ্বনাথ ভট্ট। তিনি গার্গগোত্রোৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম জনার্দ্দন ভট্ট। বিশ্বনাথ ভট্ট শ্রীবর্দ্ধনের 'দেশমুখ' অর্থাৎ গ্রামাধিকারী (মোস্তাজির) ছিলেন। তিনি,—শুধু তিনি কেন—সকল দেশমুখই গ্রামের ২৫ ভাগের এক ভাগ জমী নিষ্কর ভোগ করিতে পাইতেন। সুতরাং তাঁহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। বিশ্বনাথ পণ্ডের (২) চারিটি পুত্র ছিল। ১ম কৃষ্ণাজী পণ্ড; ২য় জনার্দ্দন পণ্ড, ৩য় রুদ্রাজী পণ্ড ও ৪র্থ বালকৃষ্ণ সংক্ষেপে বালাজী পণ্ড।

(১) এখন এখানে একজন Assistant Political Agent থাকেন।

(২) বাঙ্গালাভাষায় "বাবু" সচরাচর যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সেই অর্থে "পণ্ড" শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা রামবাবু=রামচন্দ্র পণ্ড; বিশ্বেশ্বর বাবু=বিশ্বনাথ পণ্ড ইত্যাদি।

এই সর্ব্বকনিষ্ঠ বালাজী পণ্ডই ইতিহাসে 'পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ' (১) নামে পরিচিত।

বালাজী পণ্ড তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদর্শী ও অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। সাহস, ধৈর্য্য, উদ্যোগ ও উৎসাহেরও অভাব ছিল না। তাঁহার ন্যায় সুদক্ষ কারকুন (২) (Clerk বা কেরাণী) তৎকালে অতি অল্পই ছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা শিবাজী ও 'আঙ্গ্রে' ঘোর পড়ে ও জাধব প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় বীরপুরুষগণের বখর (জীবনী-সম্বলিত ইতিহাস), সিদ্দি ও মোগলবংশীয় নৃপতিগণের ইতিহাস ও বিজাপুরের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি হস্তলিখিত ইতিহাসগ্রন্থপাঠে তাঁহার অতিশয় অনুরাগ ছিল। এই সমস্ত গ্রন্থই তিনি স্বয়ং সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশমুখের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অবকাশ পাইলেই, তিনি এই সকল গ্রন্থ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। শিবাজীর সমসাময়িক কয়েক জন বীরপুরুষের জীবনী অবলম্বন করিয়া, তিনি স্বয়ং একটি স্বতন্ত্র বখর রচনা করিয়াছিলেন। ফলকথা, তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা অতিশয় বলবতী ছিল। অন্যান্য দেশমুখের ন্যায়, তিনি বৃথা আমোদে সময় নষ্ট করিতেন না।

হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুজাতি ও হিন্দুরাজ্যের প্রতি বালাজী বিশ্বনাথের আন্তরিক অনুরাগ ছিল। হিন্দুগণের প্রতি মুসলমানগণের উৎপীড়ন ও অত্যাচারের বিবরণ পাঠ বা শ্রবণ করিলে, তাঁহার হৃদয়ে অতিশয় আঘাত লাগিত; তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার বদান্যতা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল। কখনও কোনও অতিথি বা ভিক্ষুক, যথোচিত সৎকৃত না হইয়া, তাঁহার গৃহ হইতে ফিরিয়া যায় নাই। পথিক ও তীর্থযাত্রীগণ, তাঁহার গৃহে ৪।৫ দিন থাকিয়া, তাঁহার আতিথ্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া চলিয়া যাইত। এমন কি, কেহ কেহ বা ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে অবস্থান করিত। দূরদেশাগত পথিকবৃন্দের নিকট হইতে দেশের অবস্থার বিষয়, অর্থাৎ মহারাজ সম্ভাজী (শম্ভুজী) কিরূপে ধৃত হইলেন, তাঁহার ভ্রাতা রাজারাম কিরূপে

(১) মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ স্বীয় নামের সহিত স্বীয় পিতার নামও সংযোজিত করেন। প্রথমতঃ স্বীয় নাম, পরে পিতার নাম ও তৎপরে উপাধি লিখিত হয়। যথা,—রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারক; মহাদেব গোবিন্দ রানড়ে ইত্যাদি। এখানে 'গোপাল' ও 'গোবিন্দ' পিতার নাম, এবং 'ভাণ্ডারকর' ও 'রানড়ে' উপাধি।

(২) "'কারকুনঃ' কার্য্যকারকঃ" ইতি রাজব্যবহারকোষঃ।

রাজ্য শাসন করিতেছেন, ধনাজী জাধব ও সন্তাজী ঘোরপড়ে প্রভৃতি মরাঠা সর্দ্দারগণ কোথায় ও কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবই বা এখন কি করিতেছেন, তাঁহার সৈন্যসংখ্যা কত, পুরন্দর প্রভৃতি দুর্গগুলি এখন কাহার অধীনে আছে, মাওলীগণ কিরূপ অবস্থায় কালযাপন করিতেছে, ইত্যাদি বিষয় জানিয়া, তাহা কাগজে লিখিয়া রাখিতেন। ফলতঃ গ্রামাধিকারীর নিরীহ কার্য্য করিয়া কালাতিপাত করা, তাঁহার পক্ষে কষ্টকর বোধ হইত। মহারাষ্ট্রীয় ও মোগল নৃপতিগণের ইতিবৃত্ত পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া, তাঁহার মন অতিশয় যুদ্ধবিগ্রহপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি যেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার এই বাসনা সদ্যঃ পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া, তাঁহাকে কিছুদিন নিস্তব্ধভাবে নিরীহের ন্যায় কালাতিপাত করিতে হইয়াছিল।

বালাজী পণ্ডের স্ত্রী রাধাবাই রূপবতী ও সরলস্বভাবা ছিলেন। কিঞ্চিৎ কোপনস্বভাবা হইলেও, তাঁহার সুশীলতা, পতিপরায়ণতা ও নম্রতার অভাব ছিল না। বলা বাহুল্য, বালাজী পণ্ডেরও রাধাবাইর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। এইরূপে, এই দম্পতী শ্রীবর্দ্ধন গ্রামে আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন গত হইলে পর, রাধাবাইর গর্ভ লক্ষণ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে দশ মাস দশ দিন পূর্ণ হইল। শুভক্ষণে তিনি(১৬৯৫ খ্রীঃ অঃ) এক সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিলেন। এই নবজাত কুমা[illegible] বাজীরাও। ইনি ইতিহাসে 'প্রথম বাজীরাও' নামে প্র[illegible] হউক, বাজীরাওর জন্মগ্রহণের পর,বালাজী বিশ্বনাথের [illegible] বয়ঃকনিষ্ঠ বলিয়া তাহার নাম 'চিমণাজী' ([illegible] সাধারণতঃ ইঁহাকে সকলে "চিমাজী[illegible] ইতিহাসে বীর বলিয়া পরিচি[illegible] জন্মিয়াছিল।

বালাজী প[illegible] পাইতে ল[illegible] নির্ব্বা[illegible]

আঙ্গ্রের (১) সহিত সিদ্দির সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবার উপক্রম হওয়ায়, দেশের সর্ব্বত্র অশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। আবার মোগল সৈনিকগণও সুবিধা পাইলে লুণ্ঠন করিতে পরাঙ্মুখ হইত না। দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার নিত্যঘটনার মধ্যে পরিগণিত হইল। ধন প্রাণ রক্ষা করা লোকের পক্ষে অতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিল। বালাজী পণ্ড এরূপ অশান্তিপূর্ণ দেশে বাস করা অপেক্ষা দেশত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করা, শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

এই সময় আরও একটি ঘটনা বালাজী পণ্ডকে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। স্বজাতীয়তা নিবন্ধন আঙ্গ্রের সহিত বালাজী বিশ্বনাথের বন্ধুত্ব ছিল। এই সময়ে বালাজী পণ্ডের কোনও শত্রু সিদ্দির নিকট গিয়া বলিল, "বালাজী বিশ্বনাথ আপনার অধীনস্থ হইয়াও গোপনে আঙ্গ্রের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। এমন কি, বালাজী বিশ্বনাথের প্ররোচনাতেই আঙ্গ্রে আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।" সিদ্দি অতিশয় লঘুমতি ছিলেন; তিনি এই কথায় সহজেই বিশ্বাস করিলেন। তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি বালাজী পণ্ডকে ধৃত করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ এই অনপেক্ষিত বিপজ্জনক সংবাদ শ্রবণে অতিমাত্র [illegible]ীত হইলেন। বিশেষতঃ, মুসলমান নরপতিগণের কঠোর দণ্ডবিধানের [illegible]রিয়া, শ্রীবর্দ্ধনে আর মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান করা, তিনি যুক্তিসঙ্গত [illegible]না। পর দিন সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে তাঁহারা মহারাষ্ট্র-[illegible]নী সাতারার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রথমতঃ, [illegible] গমন করিয়া, 'অম্বাজী পণ্ড পুরন্দরে' নামক [illegible]গৃহে কিছু দিন বাস করিলেন। পরে [illegible]র সাতারায় (সেতারায়)

[illegible]ক্ষ যোদ্ধা ও মহারাষ্ট্রীয় [illegible]দায় বন্দরে তিনি [illegible] অভিহিত

[illegible]লখী-

গমন করিলেন। ১৭০৭ খ্রীঃ অব্দে বালাজী বিশ্বনাথ সাতারায় পদার্পণ করেন।

রাজ্যের অবস্থা।

মহারাষ্ট্র-রাজ্যসংস্থাপক প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ছত্রপতি শিবাজীর ইহলোক-পরিত্যাগের পর, তৎপুত্র কুলাঙ্গার সম্ভাজী (শম্ভুজী) ১৬৮০ খৃঃ অব্দে মহারাষ্ট্রসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সম্ভাজী নিতান্ত কাপুরুষ না হইলেও, অতিশয় নিষ্ঠুর, বিলাসপ্রিয়, অসচ্চরিত্র ও দাম্ভিক ছিলেন। এই নিমিত্ত প্রজাবর্গ, বিশেষতঃ মরাঠা সর্দ্দারগণ, তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া, শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামকে সিংহাসন প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। সম্ভাজী এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হইবামাত্র, ষড়যন্ত্রকারীদিগকে ধৃত, কারারুদ্ধ ও অতি নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিলেন। বিলাসপ্রিয় সম্ভাজীর যথেচ্ছাচারিতায় মহারাষ্ট্ররাজ্যের মূল শিথিল হইল, শিবাজীর সময়ের সুদক্ষ কর্ম্মচারিগণ পদচ্যুত হইলেন। দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজীব ... ময় ও সুবিধা বুঝিয়া ...
অব্দে জয়োদ্দেশে বহু সৈন্য ... দক্ষিণাত্যে প্রবে...
বৎসর কাল ক্রমাগত য...
রায়গড় পর্যন্ত অ...
পানোন্মত্ত সম্ভা...
ধৃত হইয়া, ...
সম্রাটের আ...
অল্প দিন পরে...
পুত্র, সম্রাট ক...

সম্ভাজীর মৃত্যু...
ভ্রাতা) রাজারা...
কালে, ...
নীত...
চরি...

ও "সণ্ডাজী ঘোর পড়ে" প্রভৃতি মরাঠা সর্দ্দারগণের চেষ্টায়, অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়া, রাজ্যে শান্তি স্থাপিত ও মোগলগণ পরাজিত হইল। রাজারামের সময়, ভগ্নপ্রায় মহারাষ্ট্ররাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। একাদশ বর্ষ কাল রাজত্ব করিয়া, রাজারাম ১৭০০ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলে পর, তদীয় পত্নী তারাবাই তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের নামে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।*

এদিকে সম্ভাজীর পুত্র শিবাজী, তাঁহার জননীর সহিত দিল্লীতে ঔরঙ্গজীবের অন্তঃপুরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজীব সম্ভাজীর স্ত্রীপুত্রকে দিল্লীতে লইয়া গিয়া, তাঁহাদের প্রতি কোনওরূপ অসদ্ব্যবহার করেন নাই। বরং তাঁহাদিগকে স্বীয় অন্তঃপুরে সযত্নে রাখিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজীবের কন্যা বেগম সাহেব, তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন। সম্রাটও শিবাজীকে আদর করিতেন। সম্রাট এই শিবাজীর পিতামহ মহারাষ্ট্ররাজ্যসংস্থাপক শিবাজীকে, "দস্যু"ও ইহাকে "সাও" অর্থাৎ "সচ্চরিত্র" বলিয়া ডাকিতেন। এই 'সাও' হইতেই "শাহু" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। সম্ভাজীর পুত্রকে ঔরঙ্গজীব "সাও" বলিয়া ডাকিতেন বলিয়া, সকলেই তাঁহা— "সাও" বা "সাহু" (শাহু) বলিত।

করিবার নি— করি—

—রগণ সম্ভাজীর প— —থাকিলেও, ঔরঙ্গজীব কর্ত্তৃক

বালাজী বিশ্বনাথ এই অনালোক্ষিত বিপজ্জনক —পিত হইলেন। রাজা-

—ীত হইলেন। বিশেষতঃ, মুসলমান নরপতিগণে— —ডু প্রভৃতি সর্দ্দারগণ,

—রিয়া, শ্রীবর্দ্ধনে আর মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থান ক— —বিরুদ্ধে পুনঃপুনঃ

—না। পর দিন সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে উ— —তিব্যস্ত করিয়া

—নী সাতারার অভিমুখে প্রস্থান করি— মোগলদিগের

— গমন করিয়া, 'অম্বাজী পণ্ড — হইবে। এই

—গৃহে কিছু দিন বাস — —ষ্ট্রীয়গণ মোগল

—র সাতা— —রাঠাগণকে শান্ত

—হউক, ঔরঙ্গজীব

—দী—বের কন্যা

—বিবাহ

—লিখিয়া

—য়ঃ।

দিয়াছিলেন, এবং বিবাহকালে শাহুকে উপঢৌকনস্বরূপ 'অক্কলকোট,' 'ইন্দাপুর,' 'নেবাসে' ও 'সুপা' পরগণা জাইগীর ও তিনখানি তরবারি (১) প্রদান করিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়গণের পুনঃপুনঃ আক্রমণে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া, ঔরঙ্গজীব শাহুকে ছাড়িয়া দিয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সম্রাট ভাবিয়াছিলেন, এক রাজ্যে দুই জন রাজা হইলে, গৃহ-বিবাদে মহারাষ্ট্ররাজ্য উচ্ছিন্ন হইবে। কিন্তু সম্রাটের প্রধান সেনাপতি জুলফিকর খাঁ, এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, শাহুর মুক্তি কিছুদিনের জন্য স্থগিত রহিল। সম্রাট বারম্বার পরাজিত হইয়া, ভগ্নচিত্তে ও ভগ্নদেহে আহম্মদ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইখানেই তাঁহার (১৭০৭ খৃঃ) মৃত্যু হয়। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর, বাহাদুরশাহের রাজত্বকালে, শিখজাতির অভ্যুদয় এবং রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাহাদুরশাহ রাজপুতদিগের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া ও শাহুকে ছাড়িয়া দিয়া, দক্ষিণাপথের রাজস্বের চৌথ (চতুর্থাংশ) অঙ্গীকার করতঃ, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সময় শাহুর বয়ঃক্রম ১৭ বৎসর।

বলিয়াছি, রাজারামের মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী তারাবাই রাজ্যভার গ্রহণ করেন। শাহুর মুক্তিসংবাদশ্রবণে, তারাবাই তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য, শাহুকে প্রবঞ্চক অর্থাৎ জাল শাহু বলিয়া ঘোষণা করিলেন। শাহু মহারাষ্ট্রে আগমন পূর্ব্বক কয়েক জন বড় বড় মরাঠা সর্দ্দারকে হস্তগত করিয়া, তারাবাইর সহিত যুদ্ধ করিলেন যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করিয়া, শাহু (১৭০৮ খৃঃ অঃ) সাতারার রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। ক্রমশঃ।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

---

(১) যে তরবারি সম্রাট স্বয়ং ব্যবহার করিতেন, তাহা ও সুপ্রসিদ্ধ ভবানী তরবারি ও অফজুলখাঁ যে তরবারি ব্যবহার করিতেন তাহা, এই তিনটি তরবারি উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

শিশু-হারা।

সে আমার লুকাল কোথায় ?
শুধু দু'দণ্ডের তরে
এসেছিল খেলা ক'রে,
নিমেষ ফেলিতে গেল হায়!
যখন ধরাটি সারা
হয়েছিল মাতোয়ারা,
বসন্তের মদির সুবাসে।
অফুট নলিনী প্রায়
সে মু'খানি লয়ে হায়
দাঁড়াইল পরাণেতে এসে।
কে জানিত সে হিল্লোলে
হৃদি-বৃন্ত যাবে দলে
আবার ফুরাবে সবি হায়—
এখনো পড়িছে মনে
গৃহদ্বারে বাতায়নে
হাসির লহরী ভেসে যায়।
কচি দুটি বাহু দিয়ে
গলা মোর জড়াইয়ে
কি চুম্বন অধর পাতায়,
খেলে না ভুমিতে পড়ে
কাঁদিতেছে হাহাকারে,
খেলিবে সে গিয়েছে কোথায়।
রজনীর অন্ধকারে
হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে
শয্যা পার্শ্ব শূন্য, কেহ নাই।
গভীর ঘুমের ঘোরে
কোলে টেনে নিতে কারে
আকুল ব্যাকুল হয়ে চাই।
এখনো দুরেতে শুনি
তার সে ক্রন্দন ধ্বনি
মা বলে কি ডাকিছে আমায়!

এখনি আমায় দেখে
হাসিটি উঠিবে কেঁপে
কচি দুটি অধরেতে হায়!
বরষি চুম্বন স্রোত
এ পরাণ ওতপ্রোত
হরষেতে উঠিবে উলসি
সে ঘুমের তুলনায়
সবি বুঝি হেরে যায়
চাঁদ মোর কোলে পড়ে খসি।

* * *

ফুরায়েছে সকলি আমার,
ডাকিয়াছি ভগবান
দয়া কর রাখ প্রাণ,
চরণে ধরেছি দেবতার।
বুঝেছিগো এ নিখিলে
শুধু ম্লান অশ্রুজলে
টলেনাক আসন তাঁহার।
বলেছিনু রাখ প্রাণ
করিব শোণিতদান
চিরিয়া এ হৃদয় আমার।
ত বুত পাষাণময়,
টলিল না সে হৃদয়,
নিয়ে গেল হৃদয়ের ধন
সুবিশাল এ নিখিলে
শুধুই তাহাকে পেলে
ভরিল কি তব হৃদি মন ?

* * *

স্বরগের ধন বলে
এ হৃদয় গেলি দলে
ফিরিয়া না হেরিলি আমায় ?

সেথা সে অনন্ত গেহে
এমনি কি মার স্নেহে
রাখিয়াছে হৃদয়ে জড়ায়।
তোরি মত সেথা হায়
শত শত প্রাণ যায়
সকলেই পায় সম স্নেহ,
আমারো মায়ের প্রাণ
নাহি এর পরিমাণ
সেথা শুধু ছিল তোর গেহ।
সে হৃদয় শূন্য করি
কোথায় গিয়েছ চলি
যেথা থাক,—শুধু সুখে থাক।
এ অনন্ত প্রাণ মোর
কারো নয় শুধু তোর
তোরে যেন ব্যথা দেয় নাক।
আমি আছি পথ চেয়ে
এ জীর্ণ-জীবন বেয়ে
কবে যাব সে অনন্ত গেহে—
আবার নবীন আশে
বাঁধি তোরে মায়াপাশে
হৃদয়ে লুকাব এই স্নেহে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

কালিদাস ও সেক্ষপীয়র।

(৫)

কালিদাস।

গতবারে আমরা অন্তর্জগতের আলোচনা করিয়াছি, এবার বৌদ্ধজগতের সমালোচনা করিব। এবারেও সেই এক কথাই সপ্রমাণ হইবে যে, কালিদাসের সাক্ষাতে সমগ্র সৌন্দর্য্য-জগৎ অবভাত হয়, তিনি সৌন্দর্য্যের কবি; তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী সৌন্দর্য্যসৃষ্টি।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যে জগৎ বুদ্ধির বিষয়ীভূত, তাহা বৌদ্ধ-জগৎ। এই বুদ্ধিই সত্যেন্দ্রিয়, ইহার দ্বারাই আমরা সত্যাসত্য নির্ণয় করি। অতএব যে জগৎ সত্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাই বৌদ্ধ-জগৎ। সুতরাং দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মনীতি, সমাজতত্ত্ব, এ সকল কথাই বৌদ্ধ-জগতের অন্তর্ভুক্ত।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, যাহাই বৌদ্ধ-জগতের অন্তর্ভূত, তাহাই সুন্দর নহে। চার্ব্বাকের নাস্তিকতা, হব্‌সের স্বার্থবাদ, বৌদ্ধজগতের অন্তর্ভূত, অথচ সুন্দর নহে। অর্থাৎ বৌদ্ধজগতের কতক অংশ, যে অংশ রূপেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, তাহাই সুন্দর। এই অংশই কালিদাসের কাব্যের বিষয়; কারণ কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি।

এই দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম্মনীতি সমাজতত্ত্বের কবিতাময়ী আলোচনাকে

'কাব্যে দার্শনিকতা' বলে। এই 'কাব্যে দার্শনিকতার' বিষয়ে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। এই প্রণালীর সম্বন্ধে কাহারও কাহারও ঘোরতর আপত্তি লক্ষিত হয়। তাঁহারা বলেন যে, 'দার্শনিকতা দর্শনে থাকুক, বৈজ্ঞানিকতা বিজ্ঞানে থাকুক, সমাজনীতি ধর্ম্মতত্ত্বের কথা সাহিত্যে থাকুক, আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের কাব্যে অনধিকারপ্রবেশ কেন?' উত্তরে তাঁহাদের ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিই—'বিজ্ঞানতত্ত্বে যে এক মর্ম্ম-স্পর্শী ছায়া আছে, তাহাই কাব্য'। বাস্তবিক দর্শনাদিতে যে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, তাহার তুলনায় অন্য সৌন্দর্য্য আভাহীন হয়। হইবারই কথা; কি সৃষ্টিতত্ত্ব, কি সমাজতত্ত্ব, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, সর্ব্বত্রই অনন্তজ্ঞান, অনন্তশক্তি, অনন্তকল্পনার অনন্ত সৌন্দর্য্যাভাস জাজ্বল্যমান। জগৎ যে ঈশ্বরসৃষ্ট, জগত্তত্ত্ব যে অনন্তজ্ঞান, অনন্তশক্তি, অনন্তকল্পনা প্রসূত। দর্শন ত আর কিছু নহে এই তত্ত্বকাব্যের বিজ্ঞানময়ী আলোচনা; তবে কাব্যে এই দর্শনের কবিতাময়ী আলোচনা থাকিবে না কেন?

ম্যাথু আর্‌নল্ড * যথার্থই বলিয়াছেন—"দিন দিন আমরা বুঝিতে শিখিব যে, কাব্যই জীবনমরণের সমালোচনা করিয়া, আমাদের প্রাণে আশা উৎসাহের সঞ্চার করে, সান্ত্বনার সুধা সেচন করে। কাব্যের অভাবে বিজ্ঞানের পূর্ণতা হয় না; যাহা আমাদের কাছে আজ ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়, কালে কাব্যই তাহার স্থান অধিকার করিবে।

এই 'কাব্যে দার্শনিকতার' অর্থ কি, একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাই। জার্ম্মান কবি গেটের মারগারেট প্রণয়ী ফাউষ্টকে জিজ্ঞাসিলেন, ফাউষ্ট ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ কি না। ফাউষ্ট দার্শনিক বেদান্তের চিন্ময় নিরঞ্জন ব্রহ্মতত্ত্বে বিশ্বাস করে। ফাউষ্ট উত্তর করিল ;—

Hear me not falsely, sweetest countenance !
Who dare express him ?
And who profess him
Saying : I believe in him !

---

* More and more mankind will discover that we have to turn to poetry to interpret life for us, to console us, to sustain us. Without poetry our science will appear incomplete, and most of what now passes with us for religion and philosophy will be replaced by poetry.—*Essays in criticism, second series.*

Wordsworth says—Poetry is the impassioned expression which is in the countenance of all science.

Who feeling, seeing
Deny his being
Saying: I believe him not!
The all-enfolding,
Folds and upholds he not
Thee, me, himself?
Arches not there the sky above us?
Lies not beneath us firm the earth?
And rise not on us shining
Friendly, the everlasting stars?
Look I not, eye to eye, on thee,
And feel'st not, thronging
To head and heart, the force
Still weaving its eternal secret
Invisible, visible, around thy life?

ইহাই দর্শনের কবিতাময়ী আলোচনা, ইহাই কাব্যে দার্শনিকতা। কালিদাসে এরূপ আলোচনা, এরূপ দার্শনিকতা বহুলপরিমাণে দৃষ্ট হয়। সে আলোচনার, সে দার্শনিকতার সর্ব্বত্র এক অদ্বিতীয় লক্ষণ; কালিদাসের কাব্যের সকল অংশের যে লক্ষণ, ইহাও তাহাই; কেহই নীরস অসুন্দর নহে; সকলই সরস, সৌন্দর্য্যমাখা।

একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। বিক্রমোর্ব্বশীর নান্দী এইরূপ—দেবদেব সকলের মুক্তি বিধান করুন। যিনি বেদান্তের বিশ্বব্যাপী অদ্বিতীয় একপুরুষ; অন্যত্র নিরর্থক ঈশ্বর শব্দ কেবল যাঁহাতেই সার্থক; সংযমধন মুমুক্ষু যোগী যাঁহাকে অন্তরে অন্বেষণ করে; দৃঢ়ভক্তি যাঁহার সহজ সাধন; সেই শিব আপনাদের মুক্তি বিধান করুন।

শকুন্তলার নান্দীও এই ধরণের, তাহারও সৌন্দর্য্য বুদ্ধিগম্য; সে নান্দীও অতীব হৃদয়গ্রাহী। তবে ভাষান্তরে অনুবাদ করিয়া তাহার সৌন্দর্য্য বুঝান যায় কি না সন্দেহ।

আদর্শ রাজা দিলীপের বর্ণনায় আমরা এই সৌন্দর্য্যই উপলব্ধি করি। সে সৌন্দর্য্যও বুদ্ধিগম্য। সে বর্ণনা এইরূপ—"দিলীপ আদর্শ রাজা; তাঁহার দৈহিক মানসিক নৈতিক সকল শক্তিই পূর্ণ বিকশিত। তাঁহার বক্ষ বিশাল, স্কন্ধ আয়ত, বাহু সুদীর্ঘ, দেহ উন্নত। তাঁহার বল সকলের অতিরিক্ত তেজ

সকলের অভিভবকারী, শরীর সকলের উৎকৃষ্ট। তাঁহার প্রজ্ঞা দেহের অনুরূপ, বিদ্যা প্রজ্ঞার অনুরূপ, ক্রিয়া বিদ্যার অনুরূপ, সিদ্ধি ক্রিয়ার অনুরূপ। তিনি ভীমকান্ত, মৃদু হইয়াও প্রখর। তিনি যথার্থ নিয়ন্তা, তাঁহার শাসনগুণে প্রজা ধর্ম্মপথে অক্ষুণ্ণ থাকিত। প্রজার অভ্যুদয়ের নিমিত্তই তিনি কর গ্রহণ করিতেন, যেমন দিবাকর জলবাষ্প গ্রহণ করেন। তাঁহার সৈন্যবল কেবল শোভার্থ ছিল, বুদ্ধি ও বাহুবলেই সকল কার্য্য সমাধা হইত। তিনি মন্ত্রকুশল, তাঁহার গূঢ় মন্ত্রণা কেবল ফলকালে বিবৃত হইত। নির্ভয় হইয়া আত্মরক্ষা, অরোগী হইয়া ধর্ম্মচর্য্যা, নির্লোভ হইয়া ধনার্জ্জন ও অনাসক্ত হইয়া সুখভোগ, তাঁহারই ঘটিয়াছিল। তিনি জ্ঞানী হইয়া মৌনী, শক্তিমান হইয়া ক্ষমাশীল, দাতা হইয়া শ্লাঘাহীন ছিলেন। বিষয়বিমুখ বিদ্যাবৃদ্ধ ধর্ম্মপ্রাণ রাজার, জরা বিনা বার্দ্ধক্য ঘটিয়াছিল। প্রজাদিগের রক্ষা, পালন ও শিক্ষার ভার লইয়া, তিনিই তাহাদের পিতৃস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার দণ্ড-প্রয়োগ দুষ্টদমনে, বিবাহ পুত্রার্থে, পুরুষার্থ ধর্ম্মে ও প্রীতি শিষ্ট জনে ছিল। তাঁহার গুণগ্রাম পরসেবায় রত থাকিত, তিনি বিধাতার অপূর্ব্ব রাজসৃষ্টি।"

এ বর্ণনা অতি সুন্দর, কিন্তু রঘু ও কুমারের ঈশ্বরস্তোত্র ইহা অপেক্ষাও অনেক সুন্দর। ঐ রচনা, কাব্যে দার্শনিকতার আদর্শ বলিলে বলা যায়।

রঘুবংশে ঈশ্বরস্তোত্র এইরূপ—হে দেব! তোমায় নমস্কার; তুমি জগৎ সৃজন পালন সংহার কর; তোমার তিন মূর্ত্তি। তুমি নিত্য, নির্ব্বিকার; কেবল গুণযোগেই বিভেদ অঙ্গীকার কর। তুমি ভুবনের পরিমাণ জান, তোমার পরিমাণ কে জানে প্রভু? তুমি নিষ্কাম, কামনার ফলদাতা; তুমি জিষ্ণু, তুমি অজিত। তুমি সূক্ষ্ম—এই স্থূলজগতের কারণ; তুমি অন্তর্যামী, তোমাকে খুঁজিয়া পাই না। তুমি নিস্পৃহ, তোমার তপস্যা কেন দেব! তুমি দয়াময়, দুঃখরহিত; তুমি পুরাণ, অজর; তুমি সর্ব্বজ্ঞ তোমায় কে জানে প্রভু? তুমি স্বয়ম্ভু কিন্তু জগৎ-কারণ; তুমি প্রভুর প্রভু; তুমি এক হইয়াও অনেক।

সপ্ত সাম তোমার মহিমাগীতি; সপ্ত সিন্ধু তোমার শয্যাগৃহ; সপ্তার্চ্চি তোমার মুখ; সপ্ত লোক তোমার আশ্রিত। চতুর্ব্বর্ণ চতুর্যুগ চতুর্বর্গ সকলের তুমিই উদ্ভব; দেব, তুমি চতুর্ম্মুখ। তোমার মহিমা অপার; তুমি অজ হইয়াও জন্মবান্; নিরীহ হইয়াও অরিমর্দ্দন; স্বপ্নময় হইয়াও জাগরূক। তোমাতে সকলই সম্ভবে—বিষয়ভোগ, তপশ্চর্য্যা; ঔদাসীন্য,

প্রজাপালন। তুমি কাঙ্ক্ষিত; আগম সহস্র পথে তোমারই উদ্দেশ করে, শাখানদী যেমন সাগরের। ভক্তিমান্ মুমুক্ষু যোগীর তুমিই অনন্ত গতি। ক্ষিতি আদি তোমার বিভূতির ইয়ত্তা নাই, তোমার ই[illegible]ক করিবে প্রভু? তোমার স্মরণে পাপতাপ দূর হয়, তোমার দর্শনে কি হর্ষ [illegible]ব? জলধির রত্নের মত, সূর্য্যের রশ্মির মত তোমার কীর্ত্তিকথার অবসান নাই।"

পাশ্চাত্য কবির কাব্যে ও এই কাব্যে দার্শনিকতার অভাব নাই; কিন্তু কালিদাসের কাব্যের মত কোথায়ও কি এমন সরস সৌন্দর্য্যমাখা হইয়া আছে? ড্রাইডন, পোপ প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবির কথা ধরি না—তাঁহাদের কাব্য ত বাক্‌ছল ও ভাবছলের একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু মিলটন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন প্রভৃতির সহিত তুলনা করিলেও ঐ কথাই প্রতিপন্ন হয়। মিলটনের 'স্বর্গচ্যুতি' কাব্যে অনেক দার্শনিকতা আছে, একটা নমুনা দেখুন।

So will fall
Man and his faithless progeny; whose fault?
Whose but his own? Ingrate, he had of me
All that he could have; I made him; just and right
Sufficient to have stood, tho' free to fall,

* * *

Not free, what proof could they have given sincere
Of true allegiance, constant faith or love
Where what they needs must do appeared,
Not what they would? What praise could they receive?
What pleasure I, from such obedience paid?
When will and reason, reason also is choice
Useless and vain, of freedom both despeiled
Made passive both, had served necessity,
Not me? They therefore as to right belonged
So were created, nor can justly accuse
Their maker or their making or their fate
As if predestination overruled
Their will, disposed by absolule decree
Or high foreknowledge. They themselves decreed
Their own revolt, not I; If I foreknew
Fore knowledge had no influence on their fault
Which had no less proved certain foreknown

ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহা কি কাব্য, না তৃতীয় শ্রেণীর যুক্তিবাদ? আত্মার স্বাধীনতা পরাধীনতার কি এই কবিতাময়ী আলোচনা? অনেক দুঃখেই পোপ * বলিয়াছিলন যে, ক্রীশ্চিয়ানের ঈশ্বর ধর্ম্মযুক্তি-বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছেন। আর একজন ফ্রেঞ্চ সমালোচক লিখিয়াছেন † যে, "মিল্‌টনের ঈশ্বরে আর ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সে বড় ভেদ নাই। জেমসের মত ঈশ্বরও কূটতর্কবিৎ, বিদ্যাভিমানী ও দীর্ঘসূত্রী। মনে হয়, তাঁহার নীরস বক্তৃতা-ভার বহিতে স্বর্গের ক্ষুদ্র দেবতারা অস্থির হইত।" স্বজাতিবৎসল ইংরাজ সমালোচকেরাও ‡ এখন এ কথা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা বুঝিতেছেন যে, মিলটনের শ্রেষ্ঠত্ব 'কাব্যে দার্শনিকতা'য় নহে, অন্যত্র। কলিদাসের সহিত এ অংশে তুলনা করিলে মিল্‌টন হীনপ্রভ হইয়া পড়েন। মিলটন সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, টেনিসনের স্মৃতিগীতির (In Memorium) সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। স্মৃতিগীতির আদ্যোপান্ত পাঠ করা এক প্রকার কৃচ্ছ্রসাধন বলিলে হয়। স্থানে স্থানে সুন্দর কবিতা আছে বটে; কিন্তু অধিকাংশ স্থলই নীরস, * অবিচিত্র, কৃত্রিমতাময়। 'লক্‌স্‌লি হলে'র স্থানে স্থানে সুন্দর দার্শনিকতা আছে, কিন্তু তাহা কালিদাসের সহিত তুলনার পক্ষে যথেষ্ট নহে।

ইংরাজি কাব্যে যদি কোথাও কালিদাসের তুলনা থাকে, তবে সে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যে দার্শনিকতায়। তাঁহার কবিতার ইহাই প্রধান উপাদান, তাঁহার প্রতিভার ইহাই মূলমন্ত্র। জলে স্থলে চরাচরে, জীব ও জড়ে, তিনি

---

* God, the father, turns a school divine.

† We perceive that Milton's Jehovah is connected with the theologian James I, versed in the arguments of Arminians and Gomarist, very clever at the *distinguo* and before all incomparably tedions. To get them to listen to such tirades, he must pay his councillors of state very well.
Terine, English Literature.

‡ Vide Saintsbury's Elezabethan Literature.

* His long pœm 'In Momorium; written in praise and memory of a friend who died young is cold, monotonous and often too prettily arranged. He goes into mourning; but like a correct gentleman with bran new gloves, wipes away his tears with a combrice handkerchief and displays throughout the religions service which ends the poem, all the compunction of a well trained and respectful layman.

যে বিশ্বময়ী চিন্ময়ী মহাশক্তির বিচিত্র ক্রীড়া দেখিতেন, তাহার ছায়ালোকে তাঁহার কাব্য উদ্ভাসিত। এহেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও সুন্দরতা সরসতার অংশে কালিদাসের তুলনীয় নহেন। তাঁহার কাব্যেও দর্শনের আলোচনা স্থানে স্থানে নীরস অমধুর অসুন্দর দৃষ্ট হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-ভক্ত আরনল্ড স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন * যে, "ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দর্শন ভিত্তিহীন, কায়াশূন্য ছায়ামাত্র। ইহার সংস্পর্শে অনেক স্থলে তাঁহার কাব্য কবিতাহীন বাগাড়ম্বরে পরিণত হইয়াছে।" ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রতি বীণাপাণি সর্ব্বদা কৃপাকটাক্ষ করিতেন না। যখনই প্রতিভার আলোক তাঁহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইত, তখনই তাঁহার কাব্য নীরস অমধুর অসুন্দর হইত। 'কাব্যে দার্শনিকতা'র অবতারণার উপলক্ষে এ ব্যাপার বহুশঃ ঘটিয়াছে। সুতরাং তাঁহার দর্শন-আলোচনা কালিদাসের সমকক্ষ হইবে না, ইহা বড় বিচিত্র নহে।

কুমারসম্ভবের এক অংশের একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যাউক। পার্ব্বতীর পঞ্চতপে পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব জটাধারী যোগীর বেশে দর্শন দিলেন। লীলাময় লীলাচ্ছলে পার্ব্বতীর হৃদয় পরীক্ষা করিতে, ছলনাময় বাক্‌জাল পাতিলেন। কপট সন্ন্যাসী নিজ মুখে নিজের নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন, যদি তাহাতে পার্ব্বতীর প্রেমময় হৃদয় বিচলিত হয়। "ছি ছি! তুমি অমঙ্গলময় শিবের প্রেমাকাঙ্খিনী! তোমার এই সুকুমার কর, মহাদেবের সেই ভুজঙ্গভূষণ কর গ্রহণ করিবে! তোমার শুভ্র দুকূল, শিবের শোণিতাক্ত গজাজিনের সহিত মিলিত হইবে! চন্দনচর্চ্চিত তোমার এ বর বপু শিবের চিতাভস্মমাখা কুৎসিত অঙ্গে সঙ্গত হইবে! মহাদেবের মস্তকে থাকিয়া চন্দ্রকলার যে দুর্দ্দশা, শিবের মিলনে তোমারও সেই দশা ঘটিবে। তাহার কোন্ গুণে তুমি ভুলিয়াছ? কুৎসিত ত্রিনয়ন, অজ্ঞাত কুলশীল, বস্ত্রবিহীন দারিদ্র্য? মহাদেবের বাসনা পরিত্যাগ কর; তুমি

---

* His poetry is the reality; his philosophy, so far at least as it may put on the form, and habit of a 'scientific system of thought and the more that it puts them on is the illusion * * They are a tissue of elevated but abstract verbiage, alien to the very nature of poetry. * * In Wordsworth's case, the accident of inspiration, for so it may almost he called, is of peculiar importance * * No poet when it fails him is so left, weak as a breaking wave.

ত্রিলোকসুন্দরী, তোমার বরের অভাব কি? কে না রত্নের জন্য লালায়িত?"

পার্ব্বতী ইহার উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহার সৌন্দর্য্য অনুবাদে বুঝান যায় না। সে উত্তরের সৌন্দর্য্য বুদ্ধিগম্য (Intellectual); কিন্তু তাহা সৌন্দর্য্যে বৌদ্ধজগতের সারভূত।

ঈষৎ অরুণ নয়নে কোপে ভ্রুকুটি করিয়া পার্ব্বতী বলিলেন, তুমি ক্ষুদ্র যোগী; লোকাতীত মহাপুরুষের অচিন্ত্য মহিমা কি বুঝিবে? হায়! যিনি জগতের শরণ্য মঙ্গলালয়, তিনি অমঙ্গলময়! কামনারহিত মহাদেবের কি ক্ষুদ্র বিলাসীর মত বেশরচনা দেখিতে চাও? তাঁহার মহিমা কে বুঝিবে? তিনি ধনহীন হইয়া ধনেশ্বর; লোকনাথ হইয়া শ্মশানচারী; ভীমরূপ হইয়া কান্তবপু। তিনি বিশ্বমূর্ত্তি; রত্নাকর বা ভুজঙ্গভূষণ, গজাজিন, বা শুভ্র দুকূল, নরকপাল বা চন্দ্রকলা, তাঁহার সকলই সমান। আর চিতাভস্ম? শিবের অঙ্গ সংস্পর্শে তাহা পবিত্রতম; দেবতারাও তাহা সাদরে শিরে ধারণ করেন। তিনি বৃষভবাহন; কিন্তু ঐরাবতারূঢ় মহেন্দ্রও মস্তক নামাইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করেন। তিনি অজ্ঞাতকুলশীল? ব্রহ্মারও আদি অনাদি পুরুষের ইহা অসম্ভব নহে। অথবা বিতণ্ডায় কি ফল? আমি তাঁহার অনুরাগিনী। আমার লোকলজ্জার ভয় নাই।

ভারত যখন অন্নদামঙ্গলে গৌরীর মুখে শিবের নিন্দাচ্ছলে ব্যাজ স্তুতি করিয়াছিলেন,—

> অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
> কোন গুণ নাই তাঁর, কপালে আগুন॥
>
> ইত্যাদি।

তখন এই কালিদাসের তান তাঁহার স্মৃতিতে বাজিতেছিল। কিন্তু অনুকরণ কবে প্রকৃতের সমতুল্য হয়? তা ছাড়া, ভারত তখন সৌন্দর্য্যদৃষ্টি হারাইয়া দ্ব্যর্থ বাক্‌ছলের সন্ধান করিতেছিলেন।

আর এক কবির কাব্যে এই হরগৌরীসংবাদের ছায়া লক্ষিত হয়। সে শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত। শ্রীহর্ষের দময়ন্তীও পার্ব্বতীর মত ইন্দ্রাদিকে তুচ্ছ করিয়া এক নলে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনিও প্রেমময় হৃদয়ে নল বিনা অন্য পতি বরণ করিবেন না, নিশ্চয় করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদি দেবতারা তাঁহার রূপলুব্ধ হইয়া বরণের আশায় দময়ন্তীর সন্নিধানে দূতী

প্রেরণ করেন। দূতী দেবদূতী, প্রগল্‌ভা; তাহাতে আবার দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ অধিকারিণী। নলের নিন্দা ও ইন্দ্রাদির স্তুতি করিয়া ঘোরতর দার্শনিক বক্তৃতা আরম্ভ করিল। দময়ন্তীও কম নহেন; তিনিও দর্শন-শাস্ত্রে (বিশেষতঃ ন্যায়দর্শনে) অতিশয় পারদর্শিনী। তুমুল বিতণ্ডা বাধিল। শেষ দময়ন্তী দীর্ঘ বিচার করিয়া, দেবদূতীকে হারি মানাইয়া, বুঝাইয়া দিলেন যে, জগতে যাহার যাহা রুচিকর, তাহার পক্ষে তাহাই ভাল; যাহা আমার রুচিকর, তাহা আমার ভাল; যাহা তোমার রুচিকর, তাহা তোমার ভাল; বাস্তবিক কোন পদার্থই ভাল বা মন্দ নহে। ক্রমেলক (উষ্ট্র) কণ্টক বৃক্ষ ভক্ষণ করে, তাহার কাছে কোমলেচ্ছু ব্যক্তি নিন্দনীয়; আবার কোমলেচ্ছুর কাছে ক্রমেলক নিন্দনীয়; কে নিন্দার্হ, কে প্রশংসার্হ, কে বলিবে? অথবা জগতে প্রত্যেক কার্য্যই কারণের ফল; এই কারণ কোন দার্শনিকের মতে ঈশ্বরেচ্ছা, কাহার বা মতে অনাদিকালবাহী ঘটনা পরম্পরা; তাঁহার যে নলের প্রতি অনুরাগ হইয়াছে, এ অনুরাগের জন্য তিনি দায়ী নহেন; দায়ী ঈশ্বরেচ্ছা বা ঘটনাপরম্পরা। ইত্যাদি;

দূতী স্তম্ভিত হইয়া মনে মনে ন্যায়শাস্ত্রকে গুরুতর তিরস্কার করিতে করিতে পলায়ন করিল। আমরাও পাঠককে ন্যায়ের মহিমাগান করিতে অনুরোধ করিয়া উপসংহার করি। যদি পারি, বারান্তরে অধ্যাত্মজগতের কথা বলিব।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

পঞ্চপুষ্প। *

এখানি উপন্যাস গ্রন্থ। পাঁচটি ছোট ছোট গল্প লইয়া রচিত, তাই গ্রন্থকার ইহার নাম দিয়াছিলেন পঞ্চপুষ্প। ফুলগুলি একে একে পরখ করিয়া দেখিলাম—কোমল, মনোহর, আনন্দপ্রদ। তবে, সব গুলিই যে দলে দলে প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে দশ দিক্ আকুল করিয়াছে,

* শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য আট আনা মাত্র।

তাহা বলি না। বলি না যে, ইহার প্রত্যেকেই এক একটি কর্ণিকার তুল্য, অথবা বসোরার আমদানি। তবে ইহা অবশ্যই বলিব যে, ফুলগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া সুখ আছে। ভর ভর করিয়া গন্ধে একেবারে মগজ ভরিয়া না দিউক, সারাদিনের খটুনির পর তপ্ত মাথাটা ঠাণ্ডা করিবার ক্ষমতা আছে। কথাটা সকলের মতের সহিত মিলিবে কি না, জানি না; কিন্তু আমি তো অন্যের কথা বলিতেছি না, বলিতেছি আমাদের নিজের কথা। সবাই কি সব ফুল পছন্দ করেন? এমন দেবতাও যে আছেন, যাঁহার ঘেঁটু ফুল না হইলে মন উঠে না!

বাজে কথা যাক্। আসল কথা, লেখকের রচনার আমরা প্রশংসা করি। বঙ্গসাহিত্যে তিনি অপরিচিত না হইলেও, উপন্যাস লেখায় তাঁহার এই প্রথম চেষ্টা। আমরা সাহস করিয়া বলিতেছি, সে চেষ্টায় তিনি অনেকদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মনে পড়ে, ভূতপূর্ব্ব "নবজীবন"—সম্পাদক তাঁহার লেখকতালিকার বিজ্ঞাপনে বর্ত্তমান গ্রন্থকারের বিশেষণ দিয়াছিলেন—"বাঙ্গালার ইতিহাসে ঘুণ।" বস্তুতঃ, প্রাচীন অসম্পূর্ণ জটিল ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব ঘাঁটিয়া, তিনি মাঝে মাঝে যে সব নূতন বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার সামগ্রী বটে। মাসিকপত্র-পাঠকের নিকট তাহার অল্পই অবিদিত থাকিতে পারে। যিনি ইতিহাস লইয়া এতটা ঘোঁটাঘুঁটি করিয়া অমন নূতন জিনিষ তৈয়ার করিতে পারেন, তিনি যে পাঁচটা ইতিহাসের ছোট ছোট গল্প লিখিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নয়।

তবে, লেখার কায়দা? তাও তো কিছু মন্দ দেখিলাম না। হইতে পারে, স্থানে স্থানে ভাষার দৌড় নাই, বর্ণনার জম্‌জমাট নাই, কল্পনার উচ্ছ্বাস মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। হইতে পারে, কোন একটা চরিত্রের পূর্ণবিকাশ হইতে হইতে হয় নাই, যেখানে আরও খানিকটা লিখিলে ভাল হইত, সেখানটা সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে, অন্ততঃ যেখানে একটা বিষয় না লিখিলেও চলিত, তাহা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, এরূপ দোষশূন্য, অপূর্ণতাশূন্য কয় খানা উপন্যাস আছে? বিশ্লেষণের ছুরিকা লইয়া যদি প্রত্যেক স্নায়ুটি খুঁটাইয়া অণুবীক্ষণ লইয়া দেখিতে যাও, তাহা হইলে অতিবড় সুন্দর পুরুষও কদাকার হইয়া দাঁড়ায়। আমরা মোটামুটি বুঝি। মোটামুটি গল্পগুলি আমাদের বেশ লাগিয়াছে। তবে, সবগুলি যে এক ওজনের হইয়াছে, তাহা বলি না। তাহা আশা করাও অন্যায়। হাতের

পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান? কথায় বলে, পাঁচ ফুলে সাজি। গ্রন্থকারও সেইরূপ পাঁচ রকমের পাঁচটি ফুল লইয়া, তাঁহার সাজি সাজাইয়াছেন। গোলাপ ও চাঁপার পাশে যদি করবীর শোভা পায়, তবে "আলেখ্য," "হত্যাকারী কে?" প্রভৃতির পাশে, "রুধিরোৎসব" শোভা পাইবে না কেন?

হঠাৎ-প্রসিদ্ধ সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকের দল, যাঁহাদের এমন-হয়-নাই-হবে-না পুস্তকের তালিকার বিজ্ঞাপনে সংবাদপত্রের দীর্ঘ দীর্ঘ স্তম্ভ সকল ভরিয়া রহিয়াছে, তাঁহারা যাহাই মনে করুন, আমরা এই নূতন লেখকের ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বাস্তবিকই তৃপ্তি পাইয়াছি।

একটি ফুল।

শান্তি।

বাঁচা গেল!—এইরূপে, ছয় মাস ধরে,
অনাহারে, অনিদ্রায়, মুমূর্ষুর পাশে
ছিনু বসে! বাঁচা গেল—লইয়ে মৃতেরে,
যাও গো নদীসৈকতে; মুদে মুদে আসে
আঁখি-পাত; আজি আমি শোব অকাতরে!
চুপে চুপে, ভয়ে ভয়ে, কহিতাম কথা,
পাছে রোগী চমকিয়া, পায় মনোব্যথা!
বাঁচা গেল, আজি আমি শোব অকাতরে!
প্রেম'ত গিয়েছে মরে; করিতে বিদ্রূপ,
তুমি আর শ্মশানে, এস না, এস না।
"উঠ সখা কথা কও!"—একি অপরূপ
সম্ভাষণ! পায়ে পড়ি, অশান্তি এস না—
যাও, যাও; চক্ষু মোর আসিছে জড়ায়ে;
এখনি সারা-জীবন, পড়িব ঘুমায়ে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বেশ।

"এতানি বনপুষ্পাণি বিচিত্রসুরভীনি চ।
তেতূদ্যানপ্রসূনানাং গন্ধভাজো হি কেবলং॥"

আজ অভিসারে যাবে রাই
আয় সবে সুবেশ বানাই,
চাতক সঙ্কেতে হরি, মুরলী খুরলী করি,
প্রেম রসে ধরণী ভাসায়
আয় সখি সাজাই রাধায়।

তড়িত লতিকা যেন স্থির,
কলেবর কাঞ্চন রুচির,
সুনীল নিচোল দিয়া, বর তনু প্রসাধিয়া,
সখীরে পাঠাব নিধুবন,
হবে মুগ্ধ মুরলী বদন।

চিত চোরাওলি হাসি রাশি,
পেখিলে পড়িবে খসি বাঁশী
ভুজ যুগে মণিময়, কঙ্কণ, কিশলয়,
ঝমকেতে থমকিবে কাম
উরঃ-কোরকেতে মতিদাম।

কেশ দল নিবিড় চামর,
দিব তাহে কুসুমের থর ;
সুভগ কপোল তলে, অলক ভ্রমর দলে
কত শোভা হবে নিরমল,
রাধা মুখ সুরভি কমল !

পা দুখানি থল-কমলিনী
তাহে দিব সোণার কিঙ্কিনী,
মনোহরা রণ রণি, কি ছার মুরলী ধ্বনি
অগণিত চরণ বিলাস,
ওই পদ শ্যাম অভিলাষ।

কে জানে এমন প্রেম আধা ?
মণিময় প্রেমে প্রাণ বাঁধা
প্রেম বেণুয়ায় সাধা, সুরময়ী রাধা রাধা
শ্যাম—রাধা নলিনী সুবাস
মণি জোড়ে কাঞ্চন বিকাশ।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

রূপসী-মঙ্গল।

(এই কবিতা কয়টি বঙ্গের নারীমণ্ডলীর করকমলে, তাঁহাদিগের চিরভক্ত ও নিত্য-শুভাকাঙ্ক্ষী রচয়িতা কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত অর্পিত হইল।)

সাঁজের প্রদীপ।

১

নেত্রে হাসি, হস্তে দীপ, এস গো রূপসি!
হোলো মোর শয্যালয় কুমুদ-কহ্লারময়;
ছেয়ে গেল নিশিপদ্মে চিত্তের সরসী!
হের দেখ, হাসি হাসি দিল মোরে কাছে আসি,
এক রাশি ফুলরাশি কল্পনা-রূপসী!
অধর্ম্ম পাইল ভয়, পুণ্যের হইল জয়,
হেরি সখি নিশিমুখে তব মুখশশী!

২

গৃহ-রাজ্যের চির-বিজয়ী প্রদীপ!
অসাধ্য হইল সাধ্য, পুরুষ হইল বাধ্য,
জয় জয় নারী তব সাঁজের প্রদীপ!

৩

মধুনিশি—জোস্নালোক—লালে লাল স্ফুটাশোক
কি কাহিনী কানে তব কহিল মোহিনি?
তাই ও ভালের টিপ, তাই ও সাঁজের দীপ,
আভাষে প্রকাশ করে অশোক-কাহিনী!
তুমি কি নিজের আঁখে, পরীদের ক্ষুদ্র কাঁখে,
হেরিয়াছ কুঞ্জবনে জোনাকি-গাগরী?
হেরি তোমা, হর্ষে সারা, নিশান্তে কি শুক্রতারা
ঢালি দিল প্রাণে তব আলোক-লহরী?

৪

নিশি ভোর হয় হয়— তুমি সখি সে সময়
আলোকে দাঁড়ায়েছিলে করে ফুলসাজি!
শিবের পূজার তরে, শ্রদ্ধাভরে হর্ষভরে,
বাছি বাছি তুলে নিলে ফুল্ল ফুলরাজি।
হেরি ও ধরণ ধারা, জোৎস্না হাসিয়ে সারা!
লুটায় চরণে তব, সেফালী-ছায়ায়!
চন্দ্র ডাকে "আয় আয়!" জোৎস্না আর কি যায়?
ঝাঁপাইয়া ক্রোড়ে তব পশিল হিয়ায়!

৫

সহসা কৌস্তুভমণি হাসিল হরষে!
সহসা ফুটিল পদ্ম মানস-সরসে!
সহসা "উপমা" আসি জ্যোতিশ্ছটা পরকাশি,
বরষিল ভাষরাশি কবির মানসে!
লাবণ্য উথলে দেহে, ইন্দিরা পশিল গেহে—
হাসিয়া উঠিল গেহ চরণ-পরশে!

অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর।

১

একি মনোহর স্বর! কণ্ঠস্বর একি?
তমসা তটিনীতটে, কবির মানসপটে,
ছন্দের ঝঙ্কারে নাচে কবিতা-নর্ত্তকী;
জ্ঞান হয়, কলতান, বুঝি কি ধরেছে গান;
স্বরেতে মিলাতে স্বর, সাধ যায়, সখি!
দূর-বাঁশরীর তান, বিস্মৃত স্বপন গান,
মনে পড়ে হিয়া মাঝে কত-কি কত-কি!
জলযন্ত্রে দিয়ে দোলা রঙ্গিনী দামিনী-বালা
ঢালি দিল সুধারাশি জুড়াতে চাতকী!

২

কি মধুর ওই তোর কণ্ঠস্বর সখি!
কি যাদু জড়ান তায়! কি মধু মাখান হায়!
হর্ষে ভরা নরনারী উঠিল পুলকি!
চিরবিরহিণী ধনী যেন রে নয়নমণি
পেয়ে ওই, রবে তোর দাঁড়াল থমকি!

৩

আবার আবার তুমি কথা কও সখি—
বিদেশে স্বজন-মুখ হেরিলে, উদ্দাম সুখ
হয় যথা, দীপ্ত হর্ষ উঠিল ঝলকি!
চির-ভগ্ন-মনোরথ আশার সুসার পথ
হেরি যথা অকস্মাৎ উঠে গো চমকি,
একি স্বর মনোহর! আনন্দের কলেবর
মঙ্গল-কলসী সম, উঠিল "ছলকি"!

৪

একি সুধা কণ্ঠে তোর, মদন-বিহগি!
কোন্ পুষ্প-বিছানায়, শুইয়া মলয় বায়,
আনিল সুরভি-শ্বাস, হইয়ে কুহকী?
মুখরিত অলিপুঞ্জে কোকিল-কূজিত-কুঞ্জে,
ভ্রমিয়াছে সারাদিন বুঝি সে কুহকী?
প্রাণমন হর্ষে ভোর, মুরছি পড়িছে মোর;
আবার ও কণ্ঠস্বর! একি মোহ! একি!

৫

ধন্য স্বর! জয় জয়! কে যেন গো (বোধ হয়)
গীতগোবিন্দের শ্লোক উচ্চারিছে সখি!
অথবা সুকণ্ঠে গায় "মদন-ভস্ম"-অধ্যায়; *
নত-জানু সানু-শিরে অতনু কুহকী!
আম্রের মুকুল ঘ্রাণে, কামের অমোঘ বাণে
অলিকুল গুঞ্জরিল! চাহিল চমকি
বনলক্ষ্মী; একি সুধা! একি কণ্ঠ, সখি!

রূপসীর দীর্ঘ-নিশ্বাস।

১

যেখানে ফুটিত সদা বসোরা গোলাপ,
বুলবুলি সদা করিত আলাপ,
সখি সে গোলাপ-পুরে, উদাস পুরবি সুরে,
রথাঙ্গ করিছে কেন করুণ বিলাপ?

২

অযোধ্যায় আজি সখি একি অভিনয়!
পুরস্ত্রী গাহিতেছিল "জয় রাম জয়"—
একি তথা অকল্যাণ! শঙ্খ-ধ্বনি অবসান!
রাজ-লক্ষ্মী ভালে হানে কঙ্কণ-বলয়!

৩

নন্দনে নাচে না আজি ইন্দ্রের অপ্সরী!
পথের ভিখারী আজি রাজরাজেশ্বরী!
মানস-সরসী-মাঝে, স্বর্ণপুষ্প নাহি রাজে;
ব্রজে আজি নাহি বাজে শ্যামের বাঁশরী!

৪

হে শারদী নিশীথিনি, চন্দ্রিকা-বৈভব
কোথা তব? শেফালি-গৌরব?
লো অলকা! কোথা তোর, কবির মানস-চোর
নিত্যোৎসব! শব সম সব যে নীরব!

৫

পারিজাত নরপতি, ভগ্ন অট্টালিকা;
পত পত উড়ে আহা বিচ্ছিন্ন পতাকা!
কেলি-সরসীর ধার, রাজহংসী নাহি আর;
হায় হায় সারি সারি বসেছে বলাকা!

৬

লো রূপসি, স্বর্ণপাত্রে ঢালিয়ে গুগ্‌গুল,
জ্বেলেছিলি ধূপ ধূনা আনন্দে আকুল,
আহা তাহা করি খালি, তিক্তগন্ধ দিল ঢালি,
কোন্ সে রসের চূড়া বিধাতার ভুল?

৭

মদনের অঙ্গ নাই; এ অজ্ঞাতবাসে,
তাই কি করিছে বাস এ দীরঘ শ্বাসে?
মলয়া ববে না শ্বাস? হবে না শাপের হ্রাস?
সুন্দর কন্দর্প-তনু ঝুরিবে কি ত্রাসে?

৮

বহাও দখিণা বায়, ফুটাও মালতী,
কুঞ্জদেবতার হোক সধূপ আরতি!
দেখি সে মধুর দৃশ্য, হাস্যক্ অখিল বিশ্ব!
ধর হে মঙ্গলা তুমি মঙ্গল-মূরতি!

মৃদু হাস্য।

১

হে কল্যাণি, তোমার ও সুললিত হাস,
দুঃখে ভরা এই বিশ্বে মধুর আশ্বাস!

---

* কুমারসম্ভব; তৃতীয় সর্গ।

সঙ্গীহারা, যেতে যেতে, অকস্মাৎ বনপথে,
পথিকের চক্ষে যেন পুষ্পের বিকাশ।

২

ও স্বচ্ছ তরল হাসি জানে না চাতুরী।
নাহি জানে ছদ্মবেশ, মরি কি মাধুরী।
ওর নাম নয় "হাসি" ক্ষুদ্র কোন শিশু আসি,
পথ আগুলিয়া যেন দাঁড়াল আ মরি।

৩

চিত্ত-কায়া-ছায়া-ধরা চিকণ আরসী।
কুন্দে ভরা তব হাসি শোভার সরসী।
(নীলাকাশে পূর্ণ ইন্দু) রুদ্ধ গৃহে এক বিন্দু,
পশি যেন শশিকলা, হরিল তামসী।

৪

চূত-কুসুমেতে গাঁথা মনোহরা সিঁতি,
একে বালা শ্বেতাম্বরা মধুর মূরতি।
নিকষে কনক-রেখা, ভগ্ন হৃদে দিল দেখা,
করে লয়ে ফুলমালা আশা রূপবতী।

৫

শনৈশ্চর চুপে চুপে করিল প্রয়াণ;
জগতে হইল আজি ধর্ম্মের কল্যাণ;
মঙ্গল কলসে ঢাকা, শোভিল আম্রের শাখা;
দুর্গে ওই দেখা দিল বিজয়-নিশান।

উচ্চ হাসি।

১

তব ওই উচ্চ হাসি শুনি, সুহাসিনি,
বোধ হয় "দেয়ালি"তে, দীপোৎসব চারিভিতে।
বিবাহ-উৎসবে বাজে কঙ্কণ-কিঙ্কিণী।
যেন সখি মধুমাসে, বৃন্দাবনে, দোল রাসে,
অধরে অধর স্পর্শে রজতশিঞ্জিনী।
কুহরিয়া অনিবার, ধ্বনি করি চারিধার,
ছাদেতে বসিল শ্বেত কপোতের শ্রেণী।

২

সহসা বহিল যেন মলয় অনিল।
সহসা জাগিল যেন মাধব কোকিল।
সহসা বহিল বায়, শশাঙ্কের রশ্মি ভায়,
নিবিড় নীরদমালা হইল শিথিল।
অলক্ষ্মী হইল দূর, উদাম ধরিল সুর,
উৎসাহে ভরিয়া গেল সংসার নিখিল।
লাজ বাঁধ গেল টুটি সাগরগামিনী ছুটি,
ধাইল সাগর পানে; হোলো চির-মিল।

ভেঙ না, ভেঙ না মান।

১

এমনি স্বভাব মোর। হেরিলে মানিনী,
আমি তার কর ধরি, পোহাই গো বিভাবরী,
কই না একটি কথা সারাটি যামিনী।
ঝুরু ঝুরু বহে বায়, ফুল্ল দীপালোক ভায়,
মাঝে মাঝে বেজে উঠে কঙ্কণ-কিঙ্কিণী।
উঠানে চাঁদিনি হাসে, মাঝে মাঝে ভেসে আসে
যামিনীর রুণু রুণু নূপুর শিঞ্জিনী।
আমি তার কর ধরি, পোহাই গো বিভাবরী,
কই না একটি কথা সারাটি যামিনী।

২

অবাক চাহিয়া থাকি, সতৃষ্ণ বদনে,
গভীর-তিমির-মগ্ন মানিনী-নয়নে।
হীরা মুক্তা চমকিছে, পদ্মরাগ ঝলকিছে,
প্রভা উথলিয়া পড়ে মুক্ত আবরণে।
চৌদিকে রতনজাল। মেশামিশি লালে লাল,
পাটলে, লোহিতে, পীতে, গোলাপি বরণে।
জিনিয়া কপোতগ্রীবা, শিখিনীর পুচ্ছবিভা,
বাসবের বৈজয়ন্তী সজল গগনে।
ততোধিক মনোহর, রঙে রঙ থরে থর,
বিচিত্র মানের ঘটা সুন্দরী-বদনে।

৩

ভেঙ না, ভেঙ না মান, সেধ না হেলায়;
মানিনীর কি মহিমা বুঝান কি যায়?
চপল চক্ষুর রঙ্গে, অভিরাম গ্রীবাভঙ্গে,
কুটিল অপাঙ্গে তার, শিথিল ব্রীড়ায়,
কি যে আমি শিখিয়াছি, বুঝান কি যায়?

শিখেছি সে যাদুগরি, কি তন্ত্রে যতন করি,
মোহিনী প্রকৃতি বালা চিত্রে তুলিকায়,
শ্যামলতা জম্বুফলে, রক্তাভা অশোকদলে,
বিচিত্র বরণ-ঘটা বিটপির গায়,
গোলাপে গোলাপি বর্ণ, অতসীতে খাঁটি স্বর্ণ,
শ্বেত পীত লাল বুটি পতঙ্গ পাখায়।
চপল চক্ষুর রঙ্গে অভিরাম গ্রীবাভঙ্গে,
সকলি শিখেছি আমি গোলাপি নিশায়! *
ভেঙ না, ভেঙ না মান, সেধ না হেলায়।

৪

ভেঙ না, ভেঙ না মান; কর ধরি তার
বন্দী করি রেখ ধরি করে আপনার,
কে কবে রে ভালবাসে ঘনঘটা নীলাকাশে,
তাহে যদি নাহি হাসে দামিনী রঙ্গিনী?
হিয়ায় হিয়ায় রাখি, দেখেছি সকলি ফাঁকি;
রূপসীর কি মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিনি!
ছন্দোবন্ধে কেঁদে কেঁদে, দেখিয়াছি পায়ে সেধে,
সৌন্দর্য্যের কি রহস্য জানিতে পারি নি!
মাণিক্যের চাকচিক্য কবি-চক্ষে হ'ল লক্ষ্য,
কবি-কুঞ্জে রাণী তাই মানিনী-নাগিনী!
তাই তার কর ধরি, পোহাতেছি বিভাবরী;
রুণু রুণু বাজে, শোন, যামিনী-শিঞ্জিনী;
রুণু রুণু বাজে, শোন, কামিনী-কিঙ্কিনী!
বিশ্বে হেথা সবি মায়া, সকলি কায়ার ছায়া;
অসত্যের যবনিকা তুলিয়া ভামিনী,
দেখ, দেখ, রূপ-কক্ষে বসেছে মানিনী!

মহীরাবণের পালা।

কৃত্তিবাস-রামায়ণে পাঠ কর আগে,
মহীরাবণের পালা অতি চমৎকার!
তার পরে পাঠ কর কবিতা আমার;
বুঝিবে তখন, ভাল লাগে কি না লাগে।
গড় রচি, এ হৃদয় তার মাঝখানে
রাখিলাম; চারি দ্বারে জাগিছে প্রহরী।
মদনের পুত্র প্রেম কত মায়া জানে,
দ্বারে আসি দেখা দিল বধূ-রূপ ধরি!
দিল খেদাইয়া তারে সজাগ প্রহরী;
তার পরে, অন্য দ্বারে, যুবতী সাজিয়া
দেখা দিল; কথা কহে হাসিয়া হাসিয়া;
প্রহরী চিনিল তারে—পলায় সুন্দরী।
ছেলে কাঁখে করি শেষে আইল জননী;
একি মায়া!—চিত্ত-চুরি হইল অমনি!

অদ্ভুত শাস্তি।

হা দেখ, মদন-ভস্ম পড়েছি কুমারে;
সিরাজের ক্রূরপনা বঙ্গ-ইতিহাসে;
অষ্টম হেন্‌রির আখ্যা, যার অত্যাচারে
রাজরাজেশ্বরীকুল কাঁপিত তরাসে;
বৃথা ও ভ্রুকুটী তব, রক্তিম লোচন,
মানাগ্নির উষ্ণশ্বাসে স্ফুরিত অধর;
কঠোর আমার হিয়া, করিয়া স্মরণ,
সরল সহজ মূর্ত্তি ধর লো সত্বর!
নতুবা, এমনি করি, এ বাহুবন্ধনে
চিরবন্দী করি তোরে, হৃদি-কারাগারে
রাখিব; এমনি করি, ঘোর অবিচারে,
শুষিয়া লইব প্রাণ একটি চুম্বনে!
অথবা, এমনি করি, কৌতুকের ছলে,
ভাসাইয়া দিব তোরে এই অশ্রুজলে!

পরাজয়।

একি গো বিধির কীর্ত্তি! হেমন্ত ঋতুতে
কোথা হ'তে কোথাকার ক্রূর রোগ আসি,
হরিয়া লইল হায় যত রূপরাশি
প্রেয়সীর;—হেরিলাম লাজে ও খেদেতে
আগুল্‌ফলম্বিত কেশ গিয়াছে ঝরিয়া;

---

* দোহাই পাঠকের, তিনি যেন মনে না করেন, "গোলাপি নেশার" পাঠের পরিবর্ত্তে, মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ "গোলাপি নিশায়" মুদ্রিত হইয়াছে। যে রাত্রিতে এমন অলৌকিক মানের ঘটা, সে রাত্রি "গোলাপি" ভিন্ন অন্য কোন বিশেষণ দ্বারা অভিহিত হইতে পারে?

হায় যে অলকগুচ্ছে কুসুমের দাম,
চুম্বিয়া চিবুক চারু, যত্নে পরাতাম,
ছিন্ন মালা-ডোর সম পড়িছে ঝুলিয়া!
হেরি সে বিষাদমূর্ত্তি—দ্বিগুণ সোহাগে
টানিয়া লইনু বক্ষে ছিন্ন লতিকারে;
আদর চন্দন রাখি হৃদয়-ভৃঙ্গারে,
লেপিনু শ্রীঅঙ্গ তার দীপ্ত অনুরাগে।
বিধির হইল হার—বসন্তে আবার
ফিরে এল রূপ-রাশি প্রিয়ার আমার।

গীতিকাব্য।

প্রিয়ারে আনিনু যবে বিবাহ করিয়া,
যুগ্ম ভ্রূ (হরগৌরী) খঞ্জন নয়ন
নিরখি; পরখি সবে ভানু বিগঞ্জন
রূপরাশি, বাখানিল নিখুঁত বলিয়া।
আমি হেরি—বালিকার সরল হৃদয়;
সর্ব্বংসহা মৌন ধরা সম সহিষ্ণুতা;
করুণাময়ীর প্রাণ দ্রব হয়ে বয়
পর দুঃখে; নারীরূপা এ কোন্ দেবতা?
বালক সমালোচক নহে এ নয়ন;
রঙ্গিল মলাটে হেরি দুই চারি শ্লোক৹
গোবিন্দের (শিশুহস্তে সন্দেশ প্রয়োগ)।
ভুলি না ভিতরে দৃষ্টি করিতে ক্ষেপণ।
একি কাব্য!—সারারাত্রি জ্বলিছে দেউটি,
প্রিয়া-চক্ষে কাব্য পড়ি উলটি পালটি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

ভারতবর্ষ ও ইউরোপের বাণিজ্য।

অতি প্রাচীন কাল হইতে, আসিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে যত পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, প্রায় সকলেই ভারতবর্ষ বিজয় করিয়া প্রতিষ্ঠা-লাভের চেষ্টা পাইয়াছে। ইউরোপ যখন অজ্ঞতা ও অসভ্যতার গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত, ভারতবর্ষ তখন জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত ও সভ্য জগতের শীর্ষদেশে বিরাজিত ছিল। ভারতবর্ষের জ্ঞানালোকে ইউরোপ প্রথমতঃ আলোকিত হয়। ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া, ইউ-রোপ অশেষ সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যবিষয়ক প্রভুত্ব লাভ করে। বাণি-জ্যের বিস্তৃতি ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, ইউরোপ, জগতের প্রভুত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যই ইউরোপের বর্ত্তমান উন্নতি ও প্রভুতার মূল।

খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এবং তিরোভাবের পরে, নানা সময়ে বিভিন্ন জাতি দ্বারা ভারতবর্ষ আক্রান্ত হয়। প্রাচীন আরব, মিসর, পারস্য, এসিরিয়া, ফিনিসিয়া, গ্রীক ও রোম, খ্রীষ্টের আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে, ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রভূত সমৃদ্ধির অধিকারী

হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় লোকেরাও সেই প্রাচীন সময়ে বাণিজ্য ব্যবসায়ে উদাসীন ছিলেন না। ভারতবর্ষের বহির্বাণিজ্য তখন আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলস্থ সকট্রাদি দ্বীপ হইতে জাবা দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

ধর্ম্মশাস্ত্রকার মহর্ষি মনুর সময়ে যে জল ও স্থল পথে বাণিজ্যব্যাপারে ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরা নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন, সমুদ্রযাত্রায় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে যে প্রাচীন কালের হিন্দুরা বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন,—মনুসংহিতায় (৮।১৫৬—৫৭) তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। সম্ভবতঃ, সমুদ্রের উপকূলভাগে এই বহির্ব্বাণিজ্য নিবদ্ধ ছিল। বাইবেলের উল্লিখিত 'ওফির' নগর ভারতবর্ষে অবস্থিত ছিল কি না, সে বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও, ইহুদীরাজ সলমনের সময়ে, বহুসংখ্যক ইহুদীয় ও ফিনিসীয় বাণিজ্য-তরী যে ভারতবর্ষ হইতে নানাবিধ মহামূল্য দ্রব্যজাত স্বদেশে লইয়া যাইত, বাইবলে (I Kings. x. 22.) তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কাল হইতে আরবের অধিবাসীরা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্যব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে তাহারা সবিশেষ লাভবান হইতে থাকে। অবশেষে আরবের বণিকেরা কালক্রমে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে আপনাদের হস্তগত করে। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূল হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত আরবের বাণিজ্য প্রসারিত হয়। সিন্ধুদেশের উপকূল হইতে ভারতীয় বাণিজ্যদ্রব্য জলপথে পারস্য, বেবিলন ও মস্কাটের উপকূলে নীত হইত, এবং তৎপরে স্থল ও জলপথ দিয়া মিসর ও সিরিয়া দেশে প্রেরিত হইত। খ্রীষ্টের আবির্ভাবের পূর্ব্বতন দ্বিতীয় শতাব্দীতে, আগাথারকাইডিস (Agatharchides) নামে জনৈক গ্রীক লেখক লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে অসংখ্য বাণিজ্যতরী সবীয়ার (বর্ত্তমান যীমেন) উপকূলে ভারতবর্ষ হইতে যাতায়াত করিত। প্রসিদ্ধ লেখক প্লিনির সময়ে সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত আরবদেশীয় বণিকেরা উপনিবিষ্ট হইয়া ভারতীয় দ্রব্যজাতের একমাত্র বিক্রেতা হইয়া উঠে।

খ্রীষ্টের তিরোভাবের প্রথম শতাব্দীতে এক জন সুদক্ষ গ্রীক নাবিক "Periplin of Erythrain Sea" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মিসরের গ্রীকগণ লোহিতসাগরের উপকূল হইতে দলে দলে বহির্গত হইয়া, আরবীয় বণিকদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়, এবং ভারতবর্ষীয়

বাণিজ্য হস্তগত করিয়া, আরবের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা করে।

৩২৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে ভুবনবিজয়ী গ্রীক সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার উত্তরপশ্চিম প্রান্ত দিয়া ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হন, এবং অচিরে পঞ্জাবের অধিকাংশ অধিকৃত করিয়া ব্যাবিলন নগরে প্রতিগমন করেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ সেনাপতি নিয়ারকাস ৩২৬ খ্রীঃ পূঃ অব্দে সিন্ধুনদ হইতে ইউফ্রেটিস নদী পর্য্যন্ত সসৈন্যে জলপথে গমন করিয়া, ভারতবর্ষের সহিত গ্রীকদিগের বাণিজ্যের পথ আবিষ্কৃত ও পরিষ্কৃত করেন। ব্যাবিলন নগরে অবস্থিতিকালে, (৩২৩ খ্রীঃ পূঃ) সম্রাট আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু হয়; তাঁহার মৃত্যুর পর, সেনাপতিগণ তদীয় অতুল সাম্রাজ্য আপনাদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া লয়। সিরিয়ার সম্রাট সেলিউকাস ভারতবর্ষ বিজয়ের জন্য পঞ্জাবপ্রান্তে উপনীত হন। মগধের মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়া, ৩১২ খ্রীঃ পূঃ অব্দে তিনি স্বরাজ্যে প্রতিগত হন। সূক্ষ্মদর্শী মিগাস্থিনিস মগধের রাজসভায় দূতরূপে অবস্থিতি করিবার জন্য পাটলিপুত্রনগরে প্রেরিত হন। এই সময় হইতে ভারতবর্ষের সহিত গ্রীস ঘনিষ্ট সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। পরস্পরের সংস্পর্শে উভয় দেশেরই নানা বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়। অদ্যাপি গ্রীস ইউরোপের গুরু ও শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। গ্রীকগণের নিকট ইউরোপ সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষের অতুল সম্পদ ও সভ্যতার বিষয় অবগত হন। গ্রীক বণিকেরা ভারতবর্ষের সহিত সাক্ষাৎসম্পর্কে বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং ভারতের অতুল বাণিজ্যবিভবের বিষয় ইউরোপে প্রচারিত করিতে থাকে।

ধর্ম্মবীর মহাত্মা মহম্মদের অভ্যুদয়ের (৬১১—৩২ খ্রীঃ) পর হইতে ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের সাক্ষাৎভাবে সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ অন্তর্হিত।ও ভারতীয় বাণিজ্যের দ্বার একবারে নিরুদ্ধ হয়। সিন্ধু নদ হইতে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম প্রান্ত—ভারতবর্ষ হইতে পর্টুগালের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মুসলমানদিগের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতমহাসাগরে ও ভূমধ্যসাগরে মুসলমান-(মুর)-জাতীয় আরবীয় বণিকগণের বাণিজ্যবিষয়ক আধিপত্য সংস্থাপিত হয়। তাহারা ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যদ্রব্য জলপথে আরব ও লোহিতসাগর দিয়া, মিসর, প্যালেষ্টিন ও সিরিয়ার বন্দরে আনয়ন করিত। সেই সকল মহামূল্য বাণিজ্যদ্রব্য ইউরোপে নানাস্থানে বিক্রয়

করিয়া ইতালীর অন্তর্গত ভেনিস, জেনোয়া, পিসা ও এমানফি নগরীর বণিকগণ প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিত। এই উপায়ে, এই সকল নগরী সবিশেষ সমৃদ্ধ ও উন্নত হয়, এবং ভূমধ্যসাগর ইউরোপে সভ্যতার একমাত্র কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে।

আরবের এই গৌরবের সময়ে, ভারতীয় বাণিজ্যদ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানাদি বিবিধ শাস্ত্র, মুসলমানদিগের দ্বারা ইউরোপে নীত হয়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত, আরব উপদেষ্টার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, জ্ঞান ও সভ্যতার বিমল জ্যোতিঃ দ্বারা, অসভ্য ও অজ্ঞানান্ধ ইউরোপকে আলোকিত করিতে থাকে। ভারতবর্ষের শিষ্যস্থানীয় আরব, ভারতীয় জ্যোতিষ, গণিত, আয়ুর্ব্বেদ, সঙ্গীত ও শাকুনিকাদি বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া, ইউরোপকে তাহার উপদেশ প্রদান করিতে থাকে। এইরূপে ইউরোপ আরবের নিকট ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের আস্বাদ প্রাপ্ত হয়। গ্রীস ও আরব, ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপকে সবিশেষ পরিচিত করে।

বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন পূর্ব্বক তুর্কিরাজ মহম্মদ ১৪৫৩ খ্রীঃ কনষ্টাণ্টিনোপল নগরী অধিকার করিয়া, তুরুস্ক সাম্রাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে নবযুগের সঞ্চার করিলেন। গ্রীক সভ্যতা ও সাহিত্য দ্বারা অজ্ঞানান্ধ ইউরোপকে আলোকিত করিয়া, তাহার বর্ত্তমান উন্নতির ও প্রভুতার পথ পরিষ্কৃত করিল। দ্রুতপদে ইউরোপ জ্ঞান ও উন্নতির পথে প্রধাবিত হইয়া, ভাবী প্রাধান্যলাভের সূত্রপাত করিল। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি ঘটিতে লাগিল। তুরুস্ক সাম্রাজ্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন হইতে ইতালীর সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য অন্তর্হিত হইতে লাগিল, এবং ভূমধ্যসাগরের পরিবর্ত্তে আটলাণ্টিক মহাসাগর বাণিজ্য ও সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইল। ইউরোপের দক্ষিণ হইতে পশ্চিম উপকূলে সভ্যতা ও উন্নতির প্রখর স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। পশ্চিম ইউরোপ নবজীবন লাভ করিয়া বাণিজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে তুরুস্ক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ভেনিস জেনোয়া প্রভৃতি ইতালীয় নগরীর পক্ষে ভারতীয় বাণিজ্যদ্রব্য প্রাপ্তির দ্বার প্রায় নিরুদ্ধ হয়। লাভের পথ বন্ধ হওয়াতে, এই সকল সমৃদ্ধ নগরীর অধোগতি আরম্ভ হয়। সেই সময় হইতে ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ আগমন করিতে

লালায়িত হইয়া, ইউরোপীয় বণিকগণ ভারতে যাতায়াতের পথ আবিষ্কারের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠে। পর্টুগাল, পশ্চিম ইউরোপে এই নবযুগের প্রবর্ত্তক। অতি ক্ষুদ্র পর্টুগাল ইউরোপের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, ভারত-বর্ষের প্রতি ইউরোপের ভোগলালসাময়ী দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথম আকৃষ্ট করে, এবং ইউরোপের বর্ত্তমান উন্নতি ও প্রভুতার সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করে।

১৩৮৩ খ্রীঃ পর্টুগালের রাজা ফার্ডিনেণ্ডের মৃত্যু হইল। ইতিপূর্ব্বে পর্টুগাল মুরদিগকে স্বদেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়া-ছিল। স্পেনের রাজমহিষী, রাজা ফার্ডিনেণ্ডের সিংহাসনের এক মাত্র উত্তরাধিকারিণী ছিলেন, তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে আত্মস্বাধীনতা বিসর্জ্জনে অস-ম্মত হইয়া, পর্টুগাল মৃত রাজার অবৈধ দাসীগর্ভজ ভ্রাতা প্রথম জনকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিল। রাজা জনের দ্বিতীয় পুত্র, সুবিখ্যাত যুবরাজ হেনরি, বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হইয়া, "নাবিক" হেনরি নামে জগদ্বিখ্যাত হন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও ঐকান্তিক যত্নে, পর্টুগালের বন্দরে বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ নির্ম্মিত হইতে লাগিল, সেগ্রেস নগরে মানমন্দির স্থাপিত হইল, সমুদ্রে দিঙ্‌নির্ণয়ের নিমিত্ত কম্পাস ব্যবহৃত হইতে লাগিল। তিনি ১৪১৮ খ্রীঃ অব্দে পোর্টমেণ্টোতে পর্টুগালের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। তাঁহার উদ্যোগে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলভাগে ও তন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জে পর্টুগালের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহারই আশ্রয়ে, ভাস্কো ডাগামা ও কলম্বস নাবিকতা-কার্য্য শিক্ষা করেন, এবং নাবিক-তায় নৈপুণ্য লাভ করিয়া, ভাবী প্রসিদ্ধিলাভের সূত্রপাত করেন। মুরদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, তাঁহারই নেতৃত্বে, পর্টুগাল মুরদিগের সমৃদ্ধির প্রধান কারণ ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যব্যাপার অধিকার করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকে। তিনিই নগণ্য পর্টুগাল রাজ্যকে সমগ্র ইউরোপের বরণীয় শিক্ষক ও পরিচালকের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার মহিমা শতগুণ বর্দ্ধিত করেন। তাঁহারই অবিশ্রান্ত প্রয়াসে পর্টুগালের রাজধানী লিসবন নগরী ইউরোপে বাণিজ্যের এক মাত্র কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। ১৪৬০ খ্রীঃ এই মহামতি রাজকুমার পরলোক গমন করেন। সেই সময় পর্য্যন্ত, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলস্থ সিরালিয়ন আবিষ্কৃত হইয়া, সমগ্র উপ-কূল ও নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে পর্টুগালের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যুবরাজ নাবিক হেনরির যত্ন ও অধ্যবসায়ে পশ্চিম ইউরোপে এইরূপে

বাণিজ্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়া, ইউরোপের প্রভুত্ব জগতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সূত্রপাত করে।

যুবরাজ হেনরির মৃত্যু ঘটিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথ অবলম্বন করিয়া, পর্টুগাল উত্তরোত্তর উন্নতি ও সৌভাগ্যের পথে অগ্রসর হইয়া, ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান রাজ্যে পরিণত হইল। কোইম্ব্রা নগর পরিত্যক্ত হইয়া প্রধান বন্দর লিসবনে রাজধানী আনীত হইল। পর্টুগালের রাজারা বাণিজ্যের বিস্তার বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। রাজা দ্বিতীয় জন, লিসবন নগরে সমুদয় ইউরোপীয় জাতিদিগকে বাণিজ্যার্থ যাতায়াতে বিশেষ উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। পর্টুগাল ধীরে ধীরে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল আবিষ্কার ও অধিকার করিতে লাগিল। পর্টুগালের সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া, স্পেন বাণিজ্যব্যাপারে পর্টুগালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হইয়া, কেনেরি দ্বীপপুঞ্জে স্পেনের প্রভুতা প্রতিষ্ঠিত হইল।

এই সকল আবিষ্ক্রিয়ায়, ভারতবর্ষে যাতায়াতের সহজ পথ আবিষ্কৃত করাই, পর্টুগাল ও স্পেন উভয়েরই প্রধান লক্ষ্য ছিল। রাজকুমার হেনরির মৃত্যুর ২৬ বৎসর পরে, রাজা দ্বিতীয় জনের রাজত্বকালে, পর্টুগিজ নাবিক বার্থোলমিউ ডায়াজ ১৪৮৬ খ্রীঃ আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে ঝটিকাবর্ত্তময় অন্তরীপ বহু কষ্টে আবিষ্কৃত করিয়া, ভারতবর্ষে যাতায়াতের পথ পরিষ্কৃত করিলেন। দ্বিতীয় জন সেই অন্তরীপের নাম রাখিলেন—'উত্তমাশা'। ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য অধিকারের জন্য তিনি কিরূপ ব্যগ্র ছিলেন, ইহাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই অভিনব আবিষ্কারে ইউরোপে নব যুগ প্রবর্ত্তিত হইল।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলভাগে ৬৮ বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় পর্টুগাল ভারতবর্ষে যাতায়াতের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। এই সময়ে জেনোয়াবাসী কলম্বস আপনার প্রতিভাবলে ভারতবর্ষে যাতায়াতের সহজ পথ আবিষ্কারে মনোযোগী হইলেন। আটলাণ্টিক মহাসাগর দিয়া বরাবর সাহস সহকারে পশ্চিমাভিমুখে গেলে, সহজেই ভারতবর্ষ পাওয়া যাইতে পারিবে, এই ভাব এই প্রতিভাশালী নাবিকের মনে উদিত হইল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজার সাহায্যলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া, কলম্বস ভগ্নহৃদয়ে স্পেনের রাজ্ঞী ইজাবেলার শরণাপন্ন হইলেন। অবশেষে, স্পেনের রাজা

ও রাজ্ঞীর সাহায্যে, পেলস বন্দর হইতে তিন খানি জাহাজ লইয়া, ১৪৯২ খ্রীঃ ৩রা আগষ্ট, ভারতবর্ষ আবিষ্কারের জন্য পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিন পুরুষ যাবৎ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, পর্টুগিজ নাবিকেরা যাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই, কলম্বস একবারে তাহা সম্পাদন করিয়া আপনার আবিষ্ক্রিয়ার প্রভাবে সমগ্র জগতকে চমকিত করিতে বাসনা করিলেন। বহুকষ্টে, ১১ই অক্টোবর বাহামা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত হেটি-দ্বীপে উপনীত হইয়া, আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত করিলেন। তখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে যাতায়াতের পথে সুবিস্তীর্ণ মহাদেশের অস্তিত্ববিষয়ে তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন। ভারতবর্ষ আবিষ্কারের চেষ্টায়,তিনি দ্বিতীয়বারে ডোমিনিকা দ্বীপ, ও তৃতীয়বারে ট্রিনিডাড দ্বীপ আবিষ্কার করেন; এবং ওরিনোকো নদীর মোহনায় উপনীত হইয়া ভারতবর্ষ আবিষ্কারের কল্পনা করিলেন। এই-রূপে ভারতবর্ষ আবিষ্কারের ক্রমাগত চেষ্টায়, কলম্বস আমেরিকা আবি-ষ্কৃত করিলেন। স্পেনের অতুল ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তীর্ণতর নব ইউরোপের সূত্রপাত হইল। তিনি ভারতবর্ষ আবিষ্কারে অকৃতকার্য্য হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার প্রভাবে ইউরোপের ইতিহাসে যুগান্তর-উপস্থিতির পূর্ব্বসূচনা হইল।

এদিকে পর্টুগাল ভারতবর্ষ আবিষ্কারের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আফ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল আবিষ্কার করিয়া, দিন দিন পর্টুগিজ নাবিকেরা ভারতবর্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইতে-ছিল। রাজা দ্বিতীয় জন ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হইবার নিমিত্ত,কোভিলহাও ও পৈভা নামক দুই জন উদ্যমশীল পর্টুগিজ যুবককে স্থল-পথে ভারতবর্ষ অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। ১৪৮১ খ্রীঃ পর্য্যটকদ্বয় জাহাজে পর্টুগাল হইতে যাত্রা করিয়া আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দরে অবতরণ করিলেন, এবং তথা হইতে নাইল নদী দিয়া, জলপথে মিসরের রাজধানী কায়রো নগরে উপনীত হইলেন। কায়রো নগর হইতে পর্য্যটকদ্বয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হই-লেন। পৈভা পশ্চিমাভিমুখে আফ্রিকার মধ্যভাগ আবিষ্কারের জন্য প্রস্থান করিলেন। কোভিলহাও পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া, এক দল যাত্রীর সহিত এডেন বন্দরে উপনীত হইলেন। এডেন হইতে জাহাজে চড়িয়া জলপথে তিনি ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে উপস্থিত হইলেন। কোভিলহাও,কোচিন, কেনেনুর, কলিকট ও গোয়া পরিদর্শন করিয়া এডেন বন্দরে প্রত্যাবৃত্ত হন।

তিনি তথা হইতে পর্টুগালের রাজার নিকট আপনার পর্য্যটনবৃত্তান্তের সহিত ভারতবর্ষের অবস্থা লিখিয়া পাঠাইলেন।

কোভিলহাওর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পহুঁছিবার অনতিকাল পরে, ১৪৯৭ খ্রীঃ ১৮ই জুলাই তিন খানি জাহাজ সঙ্গে লইয়া, জগদ্বিখ্যাত নাবিক ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেন। তের মাস পর্য্যন্ত অনবরত বহুতর আয়াস ও ক্লেশ সহ্য করিয়া,তিনি ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে,কলিকট বন্দরের অনতি-দূরে উপস্থিত হন। ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগষ্ট লিসবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, গুণগ্রাহী রাজা ইমানুয়েল,আভিজাতবর্গের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করেন। এইরূপে পর্টুগালরাজের যত্নে ও অর্থব্যয়ে, স্থলপথে কোভিলহাও এবং জলপথে ভাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষ আবিষ্কৃত করিয়া, ইউরোপের ইতিহাসে গৌরবময় নবযুগ প্রবর্ত্তিত করেন।

কলম্বসের আমেরিকা-আবিষ্কার অপেক্ষা, ভাস্কো ডা গামার ভারতবর্ষ আবিষ্কার অধিকতর বিপদসঙ্কুল ও আয়াসসাধ্য ব্যাপার। ভারতবর্ষ আবিষ্কারের চেষ্টায় কলম্বস দুই মাসে আমেরিকার পূর্ব্বোপকূলের অনতিদূরে ছোট দ্বীপে উপনীত হন ; ভাস্কো তের মাস অবিশ্রান্ত বহু আয়াস ও বিপদ সহ্য করিয়া ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে প্রথমেই উপস্থিত হন। কলম্বস ভারতবর্ষ আবিষ্কারের জন্য ক্রমাগত তিন বার চেষ্টা করিয়াও আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারে অকৃতকার্য্য হন, ভাস্কো একবারেই ভারতবর্ষ আবি-ষ্কার করিয়া জগতকে বিস্মিত করেন। কলম্বস আমেরিকার সন্নিহিত যে সকল দ্বীপে স্পেনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার সর্ব্বত্র এবং মেক্সিকো ও পেরু ব্যতীত আমেরিকার সকল স্থানে, অতি অসভ্য আমমাংসভোজী বিবিধ বর্ব্বর জাতি বাস করিত ; ভাস্কোর আবিষ্ক্রিয়াকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুসভ্য রাজবিধি প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং খ্রীষ্টের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতায় ভারতবর্ষ সমগ্র জগতের শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত ছিল। ভারতবর্ষের নাম অনুসারে কলম্বসের আবিষ্কৃত আমেরিকার উপকূলস্থ দ্বীপপুঞ্জ West Indies নামে পরিচিত হয়। কলম্বস আপনার আবিষ্ক্রিয়া-প্রভাবে স্পেন ও ইউরোপের জন্য অনতিবিলম্বে যাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই, ভাস্কোর ভারতবর্ষ আবিষ্কারে পর্টুগাল ও ইউরোপ অবিলম্বে তদপেক্ষা শত গুণ অধিক সমৃদ্ধি লাভ করে। উভয় ঘটনাই ইউরোপের ইতিহাসে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, ইউরোপে

বাণিজ্যবিস্তার ও উপনিবেশস্থাপনের অভিনব স্রোত প্রবাহিত করিয়াছে, ইউরোপের সাহিত্য, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অনুশীলন সবিশেষ বর্দ্ধিত করিয়াছে, ইউরোপের সভ্যতা ও প্রভুত্ব সমগ্র জগতে অদ্যাপি বিস্তারিত করিতেছে। ভারতবর্ষের আবিষ্ক্রিয়া এই উভয় ঘটনারই মূলে অবস্থিত থাকিয়া, জগতের ইতিহাসে ভারতবর্ষ কোন স্থল অধিকারের যোগ্য—স্পষ্টাক্ষরে তাহার পরিচয় নির্দ্দেশ করিতেছে।

ভারতবর্ষ আবিষ্কারের অবিশ্রান্ত চেষ্টায়, আফ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল পর্টুগিজদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। স্পেনের সাহায্যে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। পর্টুগিজ নাবিক আলভারেজ দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে গমনকালে, ঝটিকাপ্রবাহের দৈবযোগে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলে বিতাড়িত হইয়া, ১৫[illegible] খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল আবিষ্কার করেন। এই সময়ে ব্রেজিলে পর্টুগালের আধিপত্যপ্রতিষ্ঠার সহিত, আমেরিকায় ইউরোপের উপনিবেশ ও অতিজঘন্য দাসত্বপ্রথাসংস্থাপনের সূত্রপাত হয়।

ইংলণ্ডের বাণিজ্যবিষয়ক উন্নতি ও প্রভুতা, ভারতবর্ষ আবিষ্কারের চেষ্টাতেই যে প্রথমতঃ আরব্ধ হয়, ভবিষ্যতে অন্য প্রবন্ধে তাহা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

মধুচ্ছন্দার সোমযাগ।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে ঋগ্বেদ হইতে বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষির জীবনবৃত্তান্ত যতদূর সঙ্কলন করিতে পারা যায়, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। পরে মধুচ্ছন্দার সোমযাগের উল্লেখের পূর্ব্বে, সাধারণতঃ সোমযাগ কি, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। পাঠকবৃন্দ দেখিয়াছেন যে, সোমযাগ-নামক উপাসনা-পদ্ধতি অতি প্রাচীন। ভারতবর্ষীয় ও পারস্যদেশীয় আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষেরাও সোমযাজী ছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক দেবতার উদ্দেশে সোমরস আহুতিস্বরূপ প্রদান করিতেন। ভারতবর্ষে আর্য্যাধিকারবিস্তারের পর, সোমযাগ এক প্রকার মহোৎসবে পরিণত হইয়াছিল।

এক্ষণে পাঠকবৃন্দ যদি জিজ্ঞাসা করেন, মধুচ্ছন্দার সোমযাগের বিবরণ কোথায় পাইব—আমরা তাঁহাদিগকে ঋগ্বেদের "শাকল" নামক শাখার প্রারম্ভে যে দশটি "সূক্ত" আছে, এবং উক্ত শাখার নবম মণ্ডলের প্রথমে যে একটি "সূক্ত" আছে, ঐ একাদশটি সূক্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করিব। বেদ গদ্য, পদ্য ও সংগীতময়। গদ্যময় বেদের সাধারণ নাম "যজুস্"। পদ্যময় বেদের সাধারণ নাম "ঋক্" বা "অর্ক"। সংগীতময় বেদের সাধারণ নাম "গাথা," "গান" বা "সাম"। "যজুস্" সকল যদিও গদ্যময়, উহাদের মধ্যে অনেকগুলিতে একপ্রকার মাত্রা আছে। এইরূপ মাত্রার সম্ভাবশতঃ, কতকগুলি মন্ত্র গদ্য পদ্য উভয়েরই প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। উহারা না গদ্য, না পদ্য; এইরূপ মন্ত্র সকলের মধ্যে, "নিবিদ্" নামক এক শ্রেণীর মন্ত্র আমাদের বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য।

দ্বৈপায়নকৃষ্ণ, গদ্য পদ্য ও সংগীতাত্মক বেদমন্ত্র সকল পৃথক পৃথক করিয়া, এক এক "সংহিতা" বা সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। পদ্যময় বেদ অর্থাৎ ঋগ্বেদ, কৃষ্ণের পূর্ব্বেও, অনেক লোকের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন আকারে সংগৃহীত হইয়াছিল। * এই সংগ্রহকর্ত্তাদের উপাধি ছিল "ব্যাস"। দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ, এই ব্যাসগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান "ব্যাস" বলিয়া, তিনিই পৃথিবীতে "বেদব্যাস" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

এইরূপে নানা দেশে নানা পণ্ডিত কর্ত্তৃক বেদের যে নানা সংগ্রহ-গ্রন্থ

---

* কুতূহলী পাঠক এই বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে বেদসংগ্রহের যে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিবেন। আর এই কথার প্রমাণ ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। যথা,—

"যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়মূ আয়ন্
তাম্ অন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।
তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা
তাং সপ্তরেভা অভিসংনবংতে॥" ঋগ্বেদ—১০।৭১।৩।

এই ঋকের তৃতীয় চরণে স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে যে, তৎকালে পণ্ডিতগণ বেদ-মন্ত্র সকল (আভৃত্যা) আহরণ বা সংগ্রহ করিয়া, নানাস্থানে (পুরুত্রা) অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পরিষদ্, টোল বা বিদ্যামন্দিরে, তাহা (ব্যদধুঃ) সংরক্ষিত করিয়াছিলেন। এই সংগ্রহকার পণ্ডিতগণই এক এক জন ব্যাস ছিলেন।

সংকলিত হয়, তাহাদের নাম বেদের "শাখা"। বেদ একটি প্রকাণ্ড মহীরুহ, আর বেদের অসম্পূর্ণ বা পাঠভেদ-বিশিষ্ট সংগ্রহ-গ্রন্থ সকল সেই মহীরুহের "শাখা" প্রশাখা বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল। এইরূপ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া, বেদতরু অতি প্রকাণ্ড কলেবর ধারণ করে।

দ্বৈপায়ন কৃষ্ণের পরকালবর্ত্তী "শাকল্য" নামক জনৈক সুপণ্ডিত বহুদর্শী অধ্যাপক, স্বীয় পরিষদে যে "ঋগ্বেদ" মন্ত্রের সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, যাহা পরে "শাকল্যের" শিষ্যগণ কর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে প্রচারিত হয়,—এবং যাহা অতি প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে,—তাহারই নাম ঋগ্বেদের "শাকল" শাখা। এই শাকল শাখাই এক্ষণে ঋগ্বেদের প্রধান মন্ত্র বলিয়া পরিগণিত। ইয়ুরোপে ভট্ট মোক্ষমূলর এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ঋগ্বেদের এই শাকল নামক শাখাতে, উপরি-নির্দ্দিষ্ট স্থানে, মধুচ্ছন্দার এগারটি "সূক্ত" * সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। পাঠকবৃন্দ সেই সূক্ত-মালাতে ঋষি মধুচ্ছন্দার সোমযাগের আকৃতি দেখিতে পাইবেন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদকে আর্য্যজাতির আদি গ্রন্থ ও হিন্দুধর্ম্মের মূল গ্রন্থ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। † ঋগ্বেদ নামে বিশেষ কোন গ্রন্থ নাই। ঋগ্বেদের শাকল শাখা নামক গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক; অর্থাৎ দ্বৈপায়ন কৃষ্ণ অপেক্ষা অর্ব্বাচীন। দত্ত মহাশয় যদি ঋগ্বেদের শাকল শাখাকে আর্য্যজাতির আদি গ্রন্থ বলেন, তবে উপরে যাহা উল্লিখিত হইল, তদনুসারে তাঁহার মতে যোগ দেওয়া অসাধ্য। যদি তিনি ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে আর্য্যজাতির আদি গ্রন্থ অর্থাৎ আদি রচনা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও তাঁহার ভ্রম হইয়াছে, বলিতেই হইবে। যজুর্ব্বেদের অনেক অনেক মন্ত্র, ঋক্ অপেক্ষা প্রাচীন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। বারান্তরে ও স্থানান্তরে, এই বিষয়ের সবিস্তর আলোচনা করিবার

---

* সূক্ত অর্থাৎ—সু+উক্ত=মনোহর কাব্য। অর্থাৎ,সুললিত ছন্দোময় কবিতা। "সূক্ত" সকল প্রধানতঃ উপাসনা-কার্য্যের জন্য বা ধর্ম্মোপদেশের জন্য রচিত।

† পাঠকবৃন্দ দত্ত মহাশয়ের ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদের ভূমিকার ২য় পৃষ্ঠা দেখিবেন।

ইচ্ছা রহিল; কিন্তু এস্থানে ঋক্ অপেক্ষা বহু প্রাচীন "নিবিদ" নামক মন্ত্র-গুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করি। কেন না, মধুচ্ছন্দার সোমযাগ বুঝিতে গেলে, নিবিদ্ মন্ত্রের সাহায্য আবশ্যক হইবে।

ঋগ্বেদের মন্ত্র সকল বেদশাস্ত্রের প্রাচীনতম অংশ বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, ঋক্‌মন্ত্রেই "নিবিদ্" নামক অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বেদবাক্যের উল্লেখ রহিয়াছে। সায়ণাচার্য্য ব্যাখ্যা করেন,—"নিবিদ্-বেদাত্মিকা বাক্।" এই নিবিদ সকল অতি পবিত্র, দেবতাগণের বিশেষ প্রীতিজনক এবং তাঁহাদের অনুগ্রহলাভের পক্ষে সবিশেষ উপকারী বলিয়া পরিগণিত ছিল, এবং ইহাদের অতি প্রাচীনতা সম্বন্ধে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, অনেক ঋক্‌মন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে ইহাদিগকে প্রাচীন বলা হইয়াছে। নিম্নে ইহার কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

রহুগণের পুত্র গোতম বলিতেছেন,—(১।৮৯।৩)

"তান্ পূর্বয়া নিবিদা হূমহে বয়ং
ভগং মিত্রং অদিতিং দক্ষম্ অস্রিধং।
অর্যমনং বরুণং সোমম্ অশ্বিন
সরস্বতী নঃ সুভগা ময়স্করৎ॥"

আমরা ভগ, মিত্র, অদিতি, অজেয় দক্ষ, অর্যমা, বরুণ, সোম অশ্বিদ্বয় (প্রভৃতি) সেই দেবগণকে প্রাচীন নিবিদের দ্বারা আহ্বান করিতেছি—ইত্যাদি। দেখা যাইতেছে যে, ঋক্‌রচনাকারী গোতমের সময়ে, নিবিদ্ মন্ত্র যে কেবল বিদ্যমান ছিল, তাহাই নহে; গোতম ঐ নিবিদ্ মন্ত্রকে প্রাচীন বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন।

অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি, ঋগ্বেদী ঋষিগণের মধ্যে একজন অতি প্রাচীন ঋষি বলিয়া পরিগণিত। তিনি বলেন (১।৯৬।২)—

"স পূর্বয়া নিবিদা কব্যতায়ো-
রিমাঃ প্রজা অজনয়ন্ মনূনাম্।
বিবস্বতা চক্ষসা দ্যামপশ্চ
দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাম্।"

তিনি অর্থাৎ অগ্নিদেব মনুপুত্র আয়ুর স্তুতিগর্ভ প্রাচীন নিবিদের দ্বারা তুষ্ট হইয়া এই বর্ত্তমান মনুবংশের বৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন—ইত্যাদি। দেখা গেল, কুৎসের চক্ষেও নিবিদ্ সকল প্রাচীন সামগ্রী।

অঙ্গিরাবংশীয় শূনহোত্রের পুত্র গৃৎসমদ ঋষি বলিতেছেন, (২।৩৬।৬)—

"জুষেথাং যজ্ঞং বোধতং হবাস্ত মে
সত্তো হোতা নিবিদঃ পূর্ব্যা অনু।
অচ্ছা রাজানা নম এতি আবৃতং
প্রশাস্তাদা পিবতং সোম্যং মধু॥

প্রাচীন নিবিদ্ সকল উচ্চারিত হইলে পর, হোতা নিষন্ন হইয়াছেন। এক্ষণে হে মিত্র ও বরুণ! আমার আহ্বানে কর্ণপাত কর—ইত্যাদি। গোতম ও কুৎসের ন্যায় গৃৎসমদ ঋষিও নিবিদ সকলকে প্রাচীন বলিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু, গৃৎসমদ "নিবিদঃ" এই বহুবচনান্ত শব্দ ব্যবহার করায়, তৎকালে বহুসংখ্যক নিবিদমন্ত্র বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

বসিষ্ঠের পুত্র বামদেব বলিতেছেন (৪।১৮।৭)—

"কিমু ষ্বিদস্মৈ নিবিদো ভনংতে-
ন্দ্রস্যাবদ্যং দিধিষন্ত আপঃ।
মমৈতান্ পুত্রো মহতা বধেন
বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদ্ বি সিন্ধূন্॥

(এই কল্লোলবতী নদী সকলকে জিজ্ঞাসা কর।) ইহাদের জলগণ ইন্দ্রের বৃত্রবধরূপ পাপকে ফেনাকারে ধারণ করিয়া এই ইন্দ্রের স্তুতির উদ্দেশে নিবিদ্ উচ্চারণ করিতেছে না? (তাহারা কি বলিতেছে না) মদীয় পুত্র মহৎ বজ্রের দ্বারা বৃত্রকে বিনাশ করিয়া সিন্ধু সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন?

এই ঋকটি ইন্দ্রের মাতা অদিতির উক্তি। এস্থলে ঋষি বামদেব স্পষ্টই মরুত্বতীর নিবিদ্ নামক নিবিদের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন। উক্ত নিবিদ্ এইরূপ—

"ইন্দ্রো মরুত্বান্ সোমস্য পিবতু।
মরুৎ স্তোত্রো মরুদ্‌গণঃ।
মরুৎসখা মরুদ্‌বৃধঃ।
ঘ্নন্ বৃত্রা সৃজদপঃ।" ইত্যাদি।

এই প্রাচীন নিবিদে যে "ঘ্নন্ বৃত্রা সৃজদপঃ" অর্থাৎ বৃত্রগণকে বিনাশ করিয়া জলসকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—বামদেব সেই বাক্যই অবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন—দেখ, নদীগণ ইন্দ্রের উদ্দেশে নিবিদ্

উচ্চারণ করিতেছে ও বলিতেছে যে, ইন্দ্র "বৃত্রং জঘন্বাঁ অসৃজদ্ বি সিন্ধূন্"। নিবিদের ও ঋকের ভাষা তুলনা করিয়া বোধ হয় যে, এই নিবিদ্ বামদেবের কণ্ঠস্থ ছিল। আর বামদেবও "নিবিদঃ" এই বহুবচনান্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়া, বহুসংখ্য নিবিদ্ তৎকালে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ দিতেছেন।

এক্ষণে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ঋক্ মন্ত্র অপেক্ষা নিবিদ্ মন্ত্র সকল প্রাচীন। পুনা সংস্কৃতবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ, পণ্ডিতবর মার্টিন্ হোগ মহোদয়, স্বপ্রচারিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মুখবন্ধে প্রথমে নিবিদ্ সকলের প্রাচীনতার উল্লেখ করেন। ঋগ্বেদপাঠকালে আমিও যখন "তান্ পূর্ব্বয়া নিবিদা" এই মন্ত্র প্রথম দেখি, তখন আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম, এবং নিবিদ্ কি পদার্থ, তাহা অবগত হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম। পরে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে একটি নিবিদের আকার দেখিতে পাই, এবং অবশেষে হোগ মহোদয়ের ঐতরেয়ব্রাহ্মণের অনুবাদের টীকায় আরো কয়েকটি নিবিদ্ দেখিতে পাই। বোধ হয়, অনুসন্ধান করিলে আরো পাওয়া যাইবে। হোগ মহোদয়, মহারাষ্ট্রদেশীয় বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের সাহায্যে "সপ্তহৌত্রপ্রয়োগ" নামক বৈদিক কার্য্যকাণ্ডঘটিত গ্রন্থ হইতে নিবিদ্ কয়েকটি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোম্বাইনগরে সম্প্রতি ঋক্‌পরিশিষ্ট নামে যে গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার নিবিদধ্যায়েও ঐ নিবিদ্‌গুলি প্রদত্ত হইয়াছে।

যজ্ঞকার্য্যে নিবিদ সকলের ব্যবহারসম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। (দ্বিতীয় পঞ্চিকা; ত্রয়স্ত্রিংশৎ কণ্ডিকা) যথা,—"আহাব নামে যে মন্ত্র আছে, তাহাই ব্রাহ্মণ; যাহা নিবিদ্ তাহা ক্ষত্রিয়, আর যাহা সূক্ত, তাহা বৈশ্য। প্রথমে আহাব উচ্চারণ করিয়া পরে নিবিদ্ উচ্চারণ করিলে ব্রহ্মেতে পশ্চাৎ ক্ষত্রকে সংযোগ করা হয়। নিবিদ্ উচ্চারণ করিয়া সূক্ত পাঠ করিবে; যেহেতু নিবিদ্ ক্ষত্র এবং সূক্ত বৈশ্য, ক্ষত্রেতে পশ্চাৎ বৈশ্যকে সংযোগ করা হয়। হোতা যদি যজমানকে তাহার "ক্ষত্র" হইতে বিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তবে নিবিদের মধ্যে সূক্ত পাঠ করিলেই তাহা নিষ্পন্ন হয়। এই-রূপ করিয়া তিনি তাহার যজমানকে, তাহার ক্ষত্র হইতে চ্যুত করেন। হোতা যদি যজমানকে তাহার ধনধান্যাদি হইতে বিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, সূক্তের মধ্যে নিবিদ্ পাঠ করিলেই তাহা সম্পন্ন হয়। কিন্তু যদি এইরূপ ইচ্ছা করেন যে, যজমানের ব্রহ্মজ্ঞান, ক্ষত্রশক্তি বা ধনসমৃদ্ধির কোন হানি না হউক, তাহা হইলে প্রথমে আহাব, পরে নিবিদ্, পরে সূক্ত, যথাক্রমে

উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। সকলের পক্ষেই এই ক্রম বিহিত। আদিতে এক মাত্র প্রজাপতি বিদ্যমান ছিলেন, তিনি কামনা করিলেন,—আমি জন্মগ্রহণ করি, বহু হই। তিনি তপঃ অনুষ্ঠান করিলেন, মৌনী রহিলেন। সংবৎসরের পর তিনি বাক্য উচ্চারণ করিলেন। দ্বাদশ বার উচ্চারিত সেই শব্দ, অর্থাৎ দ্বাদশপদবিশিষ্ট সেই শব্দ, নিবিদ্ বলিয়া গণ্য। * এই নিবিদ্ উচ্চারিত হইলে সকল প্রাণী সৃষ্ট হইল। ঋষি এই তত্ত্ব অবগত হইয়া বলিয়াছেন ;— "সপূর্বয়া নিবিদ" ইত্যাদি। (ঋগ্বেদ ১।৯৬।২।) এই কারণে সূক্তের পূর্ব্বে নিবিদ্ উচ্চারণ করিলে সন্ততি প্রাপ্ত হয়। যে এই তত্ত্ব অবগত আছে, সে সন্ততি ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয়।" †

এই ব্রাহ্মণাংশের তাৎপর্য্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডঘটিত কয়েকটি কথা জানা আবশ্যক করে। যজ্ঞকার্য্যে অনেক ঋত্বিকের প্রয়োজন ; তন্মধ্যে হোতা ও অধ্বর্য্যু নামক ঋত্বিকদ্বয় প্রধান ঋত্বিক বলিয়া পরিগণিত। যজ্ঞস্থানের পরিমাপকরণ, বেদী-নির্ম্মাণ, অগ্নি-মন্থন, সোম-অভিষবণ, ইত্যাদি অধ্বর্য্যুর কার্য্য। অধ্বর্য্যু, ক্রিয়াকালে সমুচিত বেদমন্ত্র সকল পাঠ করেন। আর দেবতাদের স্তুতিপাঠ, হোতা নামক ঋত্বিকের কার্য্য। এই স্তুতিপাঠের প্রাচীন নাম "শংসন," এবং যে সকল মন্ত্র স্তুতিস্বরূপ পঠিত হয়, সেই মন্ত্রসমবায়ের নাম "শস্ত্র"। ঋত্বিকগণ মিলিত হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য করেন, যাহাতে যজ্ঞের অঙ্গবৈকল্য না ঘটে বা একের কার্য্যকরণকালে অন্যের কার্য্যের সহিত গোলমাল না হয়। সোম যাগে একবার প্রাতঃকালে, একবার মধ্যাহ্নে, একবার সায়াহ্নে, সোমাহুতি প্রদান করা হয়। এই ক্রিয়া-ত্রয়কে যথাক্রমে প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিনসবন ও সায়ন্তন সবন বলে। প্রাতঃসবনক্রিয়াতে যখন হোতা "শস্ত্র" পাঠে উদ্যুক্ত হয়েন, তখন, তিনি অধ্বর্য্যুকে লক্ষ্য করিয়া, এই অতিপ্রাচীন মন্ত্র উচ্চারণ করেন, যথা—"শোহংসাবোম্।" এই মন্ত্রের পারিভাষিক নাম "আহাব"। ইহাতে

---

* এ স্থলে "অগ্নির্দেবেদ্ধ" ইত্যাদি একটি বিশেষ নিবিদের প্রতিই কটাক্ষ করা হইয়াছে।

† বেদের ব্রাহ্মণভাগ, অর্থবাদ অর্থাৎ কাল্পনিক যুক্তিতে পরিপূর্ণ। পাঠকবৃন্দ এস্থলে তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া, উদ্ধৃত ব্রাহ্মণাংশে যে প্রথা বা নিয়মের উল্লেখ রহিয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ প্রণিধান করিবেন।

দুইটি শব্দ আছে;—যথা "শংসাব" "ওম্"। ইহার সরল তাৎপর্য্য এই যে, "হে অধ্বর্য্যু! আইস, এবার নিরাকার পরব্রহ্মের স্তব করা যাউক"। অধ্বর্য্যুকে আহ্বান করা হয় বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম—"আহাব।" হোতা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলে অধ্বর্য্যুর প্রত্যুত্তর মন্ত্র এই—"শোংসামো দৈবোম্।" অর্থাৎ হাঁ মহাশয়, এক্ষণে পরমাত্মার শংসন (স্তুতিকার্য্য) আরম্ভ করা যাউক। অধ্বর্য্যুর এই উক্তির পারিভাষিক নাম "প্রতিগর"। অন্যান্য সবনে আহাবের কিঞ্চিৎ রূপান্তরকরণের বিধি আছে; যথা মাধ্যন্দিন সবনে, "অধ্বর্য্যো শোংসাবোম্"। এবং সায়ন্তন সবনে,—"অধ্বর্য্যো সোমোং সাবোম্" এইরূপ রূপান্তর হয়। (আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র; ৫।৯।৫।১৪ সূত্র দেখুন।)

আহাব-সংজ্ঞক বেদমন্ত্র অতি প্রাচীন, সন্দেহ নাই; নিবিদ অপেক্ষাও প্রাচীন। যেমন বর্ণত্রয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, তেমনি স্তুতিপাঠকালে সমুদায় বেদমন্ত্রের মধ্যে আহাবের প্রাধান্য। কেন না, এই আহাবের মধ্যে "ওঁ" এই শব্দ বিদ্যমান।* এই শব্দটি স্বয়ং একটি মন্ত্র। একটি একাক্ষর মন্ত্র, ইহার পারিভাষিক নাম "প্রণব"। ওং শব্দের আদিম অর্থ—হাঁ বা বটে। ইহাতে "ভাব" এ অস্তিত্বের ধ্বনি পাওয়া যায়, অভাব নিরাকৃত হয়। আস্তিক ব্রহ্মবাদীগণ আপনাদের মৌলিক বিশ্বাস সকল এই একাক্ষর প্রণবের দ্বারা প্রকাশ করিতেন। পরমেশ্বর আছেন কি নাই? নাস্তিক বলিবেন "ন"—আস্তিক ব্রহ্মবাদী বলিবেন "ওং"। মনুষ্যের মৃত্যু দেখিয়া লোকে যে তর্ক বিতর্ক করে, জিজ্ঞাসা করে,—পরলোক আছে কি নাই? তদুত্তরে নাস্তিক

---

* আমাদের পাঠকবৃন্দ কবি কালিদাসের রঘুবংশের এই শ্লোকটি এখানে স্মরণ করিবেন;—

"বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিনাম্।
আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণবশ্ছন্দসামিব ॥"

বেদপাঠীমাত্রেই অবগত আছেন যে, "ওং" এই পবিত্র শব্দ বেদের আদি মন্ত্র। ওঁং-এর ন্যায় পবিত্র মন্ত্র আর নাই। কুতূহলী পাঠক মনুসংহিতায় দেখিবেন যে, বেদপাঠের আরম্ভে ও অবসানে, "ওঁং" শব্দ উচ্চারণ করা চিরাগত প্রথা ছিল। অগ্রে "ওঁং" শব্দ উচ্চারণ না করিলে, বেদপাঠ বিফল বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার তাৎপর্য্য যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

বলেন,—"ন"—আস্তিক ব্রহ্মবাদী বলেন,—"ওং"। এক্ষণে পাঠকবৃন্দ বুঝিবেন—"ওঁং" এই শব্দটি বেদের সার কি না। অবশেষে "ওঁ" এই শব্দ, রূপনামবিবর্জ্জিত সত্তামাত্রজ্ঞেয় পরমাত্মার উৎকৃষ্ট নাম বলিয়া, ঋষিসমাজে পরিগৃহীত হয়। "ওং" অর্থাৎ "হাঁ আছেন বটে।" পরমাত্মাসম্বন্ধে ইহার অধিক আর কি বলা যাইতে পারে? কঠ ঋষি বলিতেছেন,—

সর্ব্বে বেদা যৎপদম্ আমনন্তি,
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদ্ ইচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যো॥

এই বলিয়া উত্তরে বলিতেছেন—"ওঁম্ ইতি এতৎ।" সকল বেদ, সকল তপাংশ অর্থাৎ বিজ্ঞান, যে পরমাত্মার বিষয় আলোচনা করে, সংগ্রহেণ অর্থাৎ সংক্ষেপে, ঋষিগণ তাহার "ওঁং" (হাঁ আছেন বটে) এই নাম বিধান করেন। এই "ওং"কার বিদ্যমান থাকায়, "আহাব," মর্য্যাদায় সকল মন্ত্রের শ্রেষ্ঠ।

যেমন ক্ষত্র এবং বৈশ্যের মধ্যে বৈশ্যের অপকৃষ্টতা, তেমনি নিবিদ ও ঋক্ "সূক্তের" মধ্যে, ঋক্ সূক্তের অপকৃষ্টতা। এই অপকৃষ্টতাজ্ঞান নিশ্চয়ই অর্বাচীনতা-মূলক। কেন না, গুণে ঋক্ সকল নিবিদ্ অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট।

অতএব দেখা যাইতেছে, "শংসন" অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্তুতিপাঠকালে, অগ্রে আহাব, পরে নিবিদ, এবং সর্ব্বশেষে ঋক্ সূক্ত উচ্চারণের নিয়ম, অতি প্রাচীনকালেই, অর্থাৎ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচনাকালে,—যদি তৎপূর্ব্বেও না হয়—প্রচলিত হইয়াছিল। ঋক্‌মন্ত্র সকলের রচনাকালেও যে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা উপরি-উদ্ধৃত "সত্তো হোতা নিবিদঃ", "পূর্ব্যা অনু" এই অংশ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, প্রতীতি হইবে। প্রাচীন নিবিদ সকল শংসনের "অনু" অর্থাৎ পরে, হোতা "সত্তঃ" অর্থাৎ সূক্ত শংসনের জন্য উপবিষ্ট হইয়াছেন। হোতা প্রধানতঃ ঋক্ মন্ত্রই উচ্চারণ করিতেন। আমার বোধ হয়, ঋগ্বেদের অধিকাংশ মন্ত্র হোতা নামক ঋত্বিকদেরই রচিত। অর্থাৎ, প্রাচীন ও আদিম হোতাগণের মধ্যে যাঁহারা সম্যক প্রতিভাশালী ছিলেন, এবং স্বয়ং সুললিতছন্দে স্তোত্র রচনা করিতে পারিতেন,—তাঁহারা প্রাচীন

দ্বারা নূতন প্রণালীতে অর্চনা * কার্য্য সমাধা করিতেন। "সত্তো হোতা নিবিদঃ,""পূর্ব্যা অনু"এই ঋক্ অংশ পর্য্যালোচনা করিলে অসম্ভব বোধ হয় না যে, গৃৎসমদ ঋষি আপনাকেই "হোতা" বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন †। তিনি এই কথা বলিতেছেন যে, প্রাচীন নিবিদ্ সকল কীর্ত্তন করা হইয়াছে, এক্ষণে হে মিত্রাবরুণ! তোমাদের হোতা (অর্থাৎ আমি গৃৎসমদ) স্বরচিত অর্চ্চনা (ঋক্) মন্ত্র উচ্চারণ করিতে উপবিষ্ট হইল, তোমরা ;—

"জুষেথাং যজ্ঞং বোধতং হবাস্ত মে।"

আমার পূজা গ্রহণ কর, আমার আহ্বানে কর্ণপাত কর।

এইরূপ ঋক্মন্ত্র শংসনের পূর্ব্বে নিবিদ্মন্ত্রশংসনের নিয়ম যে ঋক্রচনার কালে প্রচলিত ছিল,অন্য ঋকেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভরদ্বাজঋষি বলিতেছেন (ঋগ্বেদ ৬।৬৭।১০)—

"বি যদ্বাচং কীস্তাসো ভরংতে,
শংসন্তি কেচিন্নিবিদো মনানাঃ।
আৎ বাং ব্রবাম সত্যানি উক্‌থা
নকির্দেবেভির্যতথো মহিত্বা।

ভরদ্বাজ ঋগ্বেদী ঋষিদের মধ্যে একজন অতি প্রাচীন ঋষি, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এই ঋক্মন্ত্র যে অতি প্রাচীন, তাহাও ইহার রচনা-প্রণালীতে প্রকাশ। মেধাবী অর্থে "কীস্তাস" শব্দ, এবং যাও এই অর্থে "যতথঃ" শব্দ, অর্ব্বাচীন সংস্কৃতে একবারে অব্যবহৃত। "বাচ্" শব্দের পারিভাষিক অর্থ—বেদবাক্য বা স্তুতি। ভাষায় এই মন্ত্রের অনুবাদ এইরূপ হইবে। যথা ;—

"হে মিত্র ও বরুণ! মেধাবী ঋত্বিক্‌গণ পৃথক্ পৃথক্ বেদবাক্য সকল উচ্চা-

---

* এক্ষণেও আমাদের মধ্যে যখন পুরাণ পাঠ হয়, তখন প্রথমে পণ্ডিত "পাঠক", সংস্কৃত পুরাণ পাঠ করেন, এবং আর এক জন ব্রাহ্মণ "ধারকের" কার্য্য করেন। "কথক" চলিত ভাষায়, কতক সঙ্গীতে, কতক গদ্যে, কতক পদ্যে, পুরাণের উপাখ্যানকে নূতন আকারে শ্রবণ করান। সংস্কৃত মূল পুরাণ ও কথকের কথায় যে সুবাদ, নিবিদ্ এবং ঋক্ মন্ত্রেও অনেকটা সেইরূপ সুবাদ ছিল, বোধ হয়।

† গৃৎসমদ যে একজন ব্যবসায়ী যাজক ছিলেন, তাহার সমীচীন প্রমাণ আছে। ঋগ্বেদ ২।১।৬ মন্ত্র দেখুন।

রণ করিতেছেন। কোনও কোনও ঋত্বিক দেবতাগণকে হৃদয়ে সাক্ষাৎকার করিয়া (মনানাঃ) নিবিদ্ সকল শংসন করিতেছেন। অতঃপর (আৎ) সত্য উক্থ বা ঋক্‌মন্ত্র সকল আমরা উচ্চারণ করিব। তোমরা তোমাদের মাহাত্ম্য লইয়া, দেবতাগণের সহিত যজ্ঞস্থল হইতে চলিয়া যাইও না।” ইহাতে ঋষির মনে মনে এইরূপ ভাব দেখা যায় যে, নিবিদ্ মন্ত্রের শংসন সমাপ্ত হইলেই, উপাসনা সমাপ্ত হইল মনে করিয়া, দেবতারা চলিয়া যাইবেন। তাই তিনি বলিতেছেন, হে মিত্র ও বরুণ! নিবিদ্ মন্ত্র শংসন শেষ হইল বটে, কিন্তু “আৎ” (অতঃপর) আমরা উক্থ (বোধ হয়, ভরদ্বাজ স্বরচিত মন্ত্রকেই এখানে উক্থ বলিতেছেন) মন্ত্র পাঠ করিব, তোমরা চলিয়া যাইও না।

এক্ষণে বিচক্ষণ পাঠকবৃন্দ বিবেচনা করিবেন, নিবিদ্ সকলের তুলনায় ঋক্‌মন্ত্র সকল আধুনিক সামগ্রী কি না। ঋগ্বেদের লাঘব-সাধনের জন্য এ কথা বলা হইতেছে না; অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহাতে ঋগ্বেদের গৌরবই অনুভূত হইবে। কেন না, ঋক্‌মন্ত্রের লালিত্য, উৎকর্ষ ও গাম্ভীর্য্য বশাৎ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন নিবিদ্ সকল বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। যদিও প্রাচীন নিবিদ্ সকল ভক্তির সহিত ঋগ্বেদের মন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ঋগ্বেদের “ব্রাহ্মণে” ঋক্ অপেক্ষা নিবিদের প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়াছে, তথাপি স্বাভাবিক উৎকর্ষগুণে ঋক্‌মন্ত্র সকল কালক্রমে নিবিদের স্থান অধিকার করিতে, এবং অবশেষে তাহাদের বিলোপসাধনে, সমর্থ হইয়াছে। তবে পাঠক স্মরণ রাখিবেন—“ঋক্” সকল অসভ্য সময়ের স্বভাবসিদ্ধ কবিগণের প্রাকৃত সঙ্গীত নহে। ঋক্ মন্ত্রের পূর্ব্বে একটি প্রশস্ত বেদশাস্ত্রের ভাণ্ডার বিদ্যমান ছিল। ঋক্ সকল আমাদের আদিম ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া কোনমতেই গণ্য হইতে পারে না; বৈদিক উপাসনা-পদ্ধতি উৎকর্ষের চরমসীমায় উপনীত হইলে, “ঋক্” সকল রচিত হইয়াছিল। ফলতঃ, ঋক্ সকল যদি অশিক্ষিত আদিম কবিদের রচনা হয়, তবে তাহাদের ন্যায় অদ্ভুত সামগ্রী আর নাই। ঋগ্বেদের ভাষাতে সংস্কারের ভূরি ভূরি চিহ্ন দেদীপ্যমান। এই ভাষা সুমার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত, গভীর অর্থব্যঞ্জক ও বিবিধ ধ্বনিপূর্ণ। ইহাতে নানা শাস্ত্রের কথা দেখা যায়। আর ঋগ্বেদের ছন্দের মাধুর্য্যের কথা কি বলিব? কেবল মাধুর্য্য নহে, ছন্দগুলিতে কোন খুঁত নাই; সেগুলি ছন্দঃশাস্ত্রের নিয়মের আদর্শস্বরূপ বলিলেও চলে। আর ছন্দঃ কি একটি দুইটি? ভূরি ভূরি ছন্দঃ, আর তাহাদের পরিপাটি ভাবের

গাম্ভীর্য্য, ভাষার মার্জ্জিত শ্রী ও ওজস্বিতা, এবং ছন্দের ভূরিতা, লালিত্য ও পারিপাট্যে, ঋগ্বেদের মন্ত্র সকলের উপমা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। যাঁহারা ঋক্‌মন্ত্র রচনা করিতেন, তাঁহারা আপনা-আপনি অনেক সময়ে স্বরচিত ঋকের মনোহারিতায় এমনি মুগ্ধ হইতেন যে, উহা স্বরচিত বলিয়া বিবেচনা করিতে সাহসী হইতেন না। সরস্বতীর অনুগ্রহ ব্যতিরেকে ঐরূপ সুন্দর সত্যপূত বাক্য মনুষ্যের জিহ্বায় আবির্ভাব হওয়া অসাধ্য বলিয়া মনে করিতেন। স্বাভাবিক উৎকর্ষগুণে, ঋক্‌মন্ত্র সকল পরমাত্মার নিকট হইতে নিঃসৃত বলিয়া পরে গণ্য হইয়া আসিয়াছে। এতাদৃশ ঋগ্বেদকে অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন আদিম কালের স্বভাবসিদ্ধ কবির রচনা বলা, নিতান্ত সাহসের কর্ম্ম। যাঁহারা নিবিদ্ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সুধীর চিন্তাশীল কবি ছিলেন। সুললিত রচনায় তাঁহাদের বিলক্ষণ পটুতা জন্মিয়াছিল। কিন্তু ঋগ্বেদী ঋষিরা, নিবিদ্-রচয়িতা ঋষিগণ অপেক্ষাও কাব্যকারিতা, সূক্ষ্মদর্শিতা ও ভাবগাম্ভীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া, অনন্তকালস্থায়ী সুললিত অর্চ্চনামন্ত্র সকল মনুষ্যজাতির হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষিত ও মার্জ্জিতবুদ্ধি পণ্ডিত ছিলেন, এবং অলৌকিক প্রতিভার সহিত, শিক্ষার ও অনুশীলনপ্রসূত রচনা-কৌশলের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ক্রমশঃ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

বিজ্ঞানে ঈশ্বর।

কাহার শাসনে এই সূর্য্য চন্দ্র, এই দ্যুলোক ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে? কে এই আকাশের মধ্যে থাকিয়া অগণ্য সূর্য্য চন্দ্র, অগণ্য গ্রহনক্ষত্রকে পরিচালনা করিতেছেন? কাহার আদেশে ইহারা ভ্রাম্যমাণ হইতেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

> "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।
> এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।"

"এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।" এই সকলই সেই মহান্ পুরুষ পরমেশ্বরেরই

ইচ্ছাতে পরিচালিত হইতেছে ; তাঁহারই শক্তি দ্বারা শক্তিবিশিষ্ট হইয়া, এই সকলই ভ্রাম্যমাণ হইতেছে।

আমাদের এই পৃথ্বী-গোলক, স্বীয় উপগ্রহ চন্দ্রের সহিত মহাশূন্যের মধ্য দিয়া, প্রতি সেকেণ্ডে (অর্থাৎ 'এক' বলিতে যতটুকু সময় লাগে, সেইটুকু সময়ের মধ্যে) গড়ে ১৮ মাইল ছুটিয়া থাকে। কি দারুণ বেগ! 'এক' এই কথাটি উচ্চারণ করিতে না করিতেই পৃথিবী ৯ ক্রোশ চলিয়া গিয়াছে! পৃথিবীকে এই রূপে ৫৮০,০০০,০০০ মাইল চলিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। এই যে পৃথিবী এতটা পথ সবেগে পরিভ্রমণ করে, কিন্তু কখনো কি কেহ ইহাকে অনিয়মিত হইতে দেখিয়াছে? সেই যে প্রথম বৎসর পৃথিবী সূর্য্যকে কিঞ্চিদধিক ৩৬৫ দিনে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছিল, আজও কি ঠিক ততদিনেই প্রদক্ষিণ করিতেছে না? এই প্রদক্ষিণ-কার্য্য বিন্দুপরিমাণেও অনিয়মিত ভাবে হইতে পারে না। চন্দ্র পৃথিবীকে পরিভ্রমণ করে ; যেমন পৃথিবী সেই চন্দ্রের সহিত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ আবার আমাদের এই সূর্য্য, স্বকীয় গ্রহগণের সহিত অপর এক বৃহত্তর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এইরূপ সূর্য্যের পর সূর্য্য চলিয়াছে। সুতরাং আমাদের এই পৃথিবী একবার যে পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়বার সেই পথ দিয়া যাইতে পারিবে না। তবে একবার ভাবিয়া দেখ যে, এই পৃথিবীর কক্ষপথের অন্ত কোথায়!

আবার কেবল এই একমাত্র পৃথিবীই যে দারুণ দ্রুতগতিতে শূন্যপথে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা নহে। কত গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিকতর বেগে চলিতেছে। ইহারি মধ্যে আবার কত ধূমকেতু চলিয়া যাইতেছে ; কত নূতন পৃথিবী সৃষ্ট হইতেছে—কিন্তু ইহার মধ্যে তো কিছুমাত্র অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না। সমস্তই শৃঙ্খলার দ্বারা, নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছে। তখন কেমন করিয়া বলিব যে, এই সকল কার্য্য সেই মহাশক্তি, মঙ্গলস্বরূপ পূর্ণ পুরুষের হস্ত প্রদর্শন করিতেছে না!

কেহ কেহ বলেন যে, প্রত্যেক পরমাণুতে গতিশক্তি আছে, সেই গতিশক্তির বলেই, কেবল এই গ্রহাদির পরিভ্রমণ নহে, জড়জগতের সকল কার্য্যই চলিতেছে। স্বীকার করিলাম যে, পরমাণুর গতিশক্তির বলেই জড়জগতের সকল কার্য্যই চলিতেছে। তাড়িৎ শক্তিই বল, চৌম্বক শক্তিই বল, সকলই যে একমাত্র শক্তির বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তন মাত্র, তাহা বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের

দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, পরমাণুগণ সেই গতিশক্তি পাইল কোথা হইতে? সকল প্রকার শক্তি যে একই শক্তির বিভিন্ন আকার মাত্র, ইহা যেমন একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, সেইরূপ বিজ্ঞানের ইহাও আর একটি সিদ্ধান্ত যে, পরমাণুগণের গতি থাকিলে, তাহারা আপনা-আপনি থামিতে পারে না, এবং তাহাদের গতি না থাকিলে আপনা-আপনি চলিতেও পারে না; কারণ, পরমাণুগণ জড়বস্তু—সচেতন পদার্থ নহে। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, পরমাণুগণ প্রথম গতিশক্তি পাইল কোথা হইতে? পৃথিবীই বল, সূর্য্যই বল, ইহারা প্রথম চলিতে আরম্ভ করিল কি প্রকারে? ইহারা জড়বস্তু; সুতরাং শক্তি প্রাপ্ত না হইলে, আপনা-আপনি শক্তিবিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব, জড়বস্তু মাত্রে জড়বস্তু হইতে অতিরিক্ত শক্তি নিয়োগ করা চাই-ই।

এই শক্তি তবে কে দিয়াছেন? যে শক্তিবলে অগণ্য সূর্য্য চন্দ্র, অগণ্য গ্রহ-নক্ষত্র ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, সেই শক্তি প্রদান করিবার ক্ষমতা, কোন্ পরিমিত-শক্তিবিশিষ্ট জীবের থাকিতে পারে? সেই শক্তি দিতে পারেন—কেবল সেই এক ইচ্ছাময় পূর্ণ পুরুষ। এই শক্তি তিনি যে কেমন করিয়া দিলেন, তাহা অবশ্য আমরা জানিতে পারি না, এবং তাহা মানবের বুদ্ধির অতীত। কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে যে জড়বস্তুগণ স্বীয় স্বীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতেই বলিলাম যে, জড়বস্তু সকলে অতিরিক্ত শক্তির নিয়োগ করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে, পরমাণু বলিয়া কোন বিশেষ পদার্থ নাই; কেবল শক্তির কতকটা সমষ্টিমাত্র আছে। শক্তি, পরমাণু ভিন্ন পৃথক্ থাকিতে পারে কি না, এবং পরমাণু শক্তি ভিন্ন পৃথক্ থাকিতে পারে কি না, অথবা কেবল শক্তিসমষ্টি আছে, কিম্বা পরমাণু ও শক্তি উভয়ই আছে, এই সকল অতি দুরূহ সমস্যা হইলেও, আমরা ইহা বলিতে পারি যে, ব্যাবহারিক পরমাণু ও ব্যাবহারিক শক্তি, এই দুই বস্তু, অন্ততঃ আমাদের ব্যাবহারিক চক্ষে, নিতান্তই বিভিন্ন পদার্থ। এই দুই ব্যাবহারিক পদার্থের ব্যবহারক সংযোগই বা কে করাইয়া দিলেন? আর যদি বা কেবলমাত্র শক্তিসমষ্টিরই অস্তিত্ব থাকে, তবে সেই শক্তিসমষ্টিই বা আসিল কোথা হইতে? এই কারণ অন্বেষণ করিতে আমরা যত দূর যাই না কেন, যতক্ষণ না মূল কারণ ঈশ্বরে যাইয়া পড়ি, ততক্ষণ কিছুতেই আমরা প্রকৃত কারণে উপনীত হইতে পারি না। এক জন

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের কথা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—"The student of Nature who starts from the axiom of the universality of the law of causation, cannot refuse to admit an eternal existence ; if he admits the conservation of energy, he cannot deny the existence of an eternal energy ; if he admits the existence of immaterial phenomena in the form of consciousness, he must admit the possibility, at any rate, of an eternal series of such phenomena."* অর্থাৎ, বৈজ্ঞানিক যদি কার্য্যকারণতত্ত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে স্বতন্ত্র কোনো অনন্ত অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; যদি তিনি শক্তির পুঞ্জীকরণ স্বীকার করেন, তবে তিনি এক অনন্ত শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না ; যদি তিনি চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয় যে, চেতনার এক অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে। আমরা ইহার উপরে তাঁহাকে ইহাও বলিতে বলি যে, যদি বৈজ্ঞানিক প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে এক অনন্ত প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় ; যদি তিনি জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে এক অনন্ত জ্ঞানের অস্তিত্বও স্বীকার করিতেই হইবে। এই সঙ্গে তাঁহাকে ইহাও জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, জ্ঞান, প্রেম, চেতনা প্রভৃতি কি শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে ? অথবা তাহারা কাহাকেও আশ্রয় করিয়া থাকিবে ? অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত প্রাণ,—এক সেই ঈশ্বর ভিন্ন আর কে এই সকলের আশ্রয় হইবে ?

আর এক কথা এই যে, যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে আমাদের গুরুতর পরিশ্রম আবশ্যক, প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি আবশ্যক, সেই সকল বিষয় দৈবক্রমে পরমাণুর গতিক্রমবশতঃ সংঘটিত হইয়াছে, ইহা সম্ভবপর ? না এক ইচ্ছাময় পূর্ণজ্ঞান পরমপুরুষের ইচ্ছানুসারে হইয়াছে, ইহাই সম্ভবপর ? কোনো সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত (Kepler) গ্রহগণের গতির নিয়ম আবিষ্কার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—"O God ! I think Thy thoughts after Thee" হে পরমেশ্বর ! আমি তোমার চিন্তার অনুসরণ করিতেছি। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই সকল গতি নিয়ম, গ্রহগণের ঘুরিবার এক প্রণালী

* "Essays upon some controverted questions." by T. H. Huxley F. R. S.—Page 230.

মাত্র ; কিন্তু পশ্চাতে যদি সেই শক্তিদাতা পুরুষ না থাকিতেন, তবে কিছু-তেই গ্রহগণ গণিতের সূক্ষ্মসিদ্ধান্ত সকল অনুসরণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতে পারিত না! 'দৈবক্রমে' কথাটি উঠিয়াছে—জগতের এমন কোনো বস্তু কি আছে, এমন কোনো ঘটনা কি আছে,—যাহা দৈবাৎ হইতে পারে, যাহা কোনো কারণবশতঃ হয় নাই? এমন কোনো কিছু নাই। কিন্তু আমরা যত কারণ দেখিতে পাই, সেগুলি আনুষঙ্গিক কারণমাত্র (Secondary cause) কিন্তু মূল কারণ (Primary cause) অন্বেষণ করিলেই দেখিতে পাই যে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অপর মূল কারণ নাই।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সাংখ্যস্বরলিপি।

সংজ্ঞা।

স্বরলিপি জটিল করিবার প্রয়োজন নাই। স্বরলিপি যত সরল হইবে, ততই নূতন শিক্ষার্থীগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইবে। আজকাল স্বর-লিপিতে সা রে গা মা পা ধা নি পরিবর্ত্তিত হইয়া কখন স রি গ ম, কখন স র র ম কখন বা সো রো গো মো ইত্যাদি বিকৃত সার্গম সঙ্কেত সকল ব্যবহৃত হয়। ইহাতে সঙ্গীত-শিক্ষার্থীগণের তেমন সুবিধা হয় না, বরঞ্চ অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু এ অসুবিধা সাংখ্যস্বরলিপিতে যথাসাধ্য দূরী-কৃত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সাংখ্যস্বরলিপির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে সা রে গা মা পা ধা নি প্রায় সকল সময়েই অপরিবর্ত্তিত আকারে রক্ষিত হইয়াছে। এবং ইহার আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার সপ্তক ও মাত্রা-পরিমাণ প্রভৃতি প্রধানতঃ সংখ্যা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। এই কারণে বর্ত্ত-মান স্বরলিপি সাংখ্যস্বরলিপি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সপ্তক চিহ্ন।

সা রে গা মা পা ধা নি এই সাতটি সুর লইয়া এক একটি সপ্তক। সচরাচর আমাদের সঙ্গীতে তিন সপ্তক ব্যবহৃত হয়ঃ—উদারা, মুদারা, তারা অথবা মন্দ্র, মধ্য, তার। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রে তিন সপ্তক হইতেও অতিরিক্ত সপ্তক ব্যবহার হয়।

সহজভাবে আমাদের কণ্ঠ হইতে যে সা স্বর বাহির হয়, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া নিখাদ পর্য্যন্ত সাতটি স্বরকে মধ্য সপ্তক বলা যায়। এই মধ্য সপ্তকই স্বাভাবিক সপ্তক। এই মধ্য সপ্তককেই আমরা মূল বা প্রথম সপ্তক বলিয়া ধরিয়া লইলাম। ইহার দ্বারা উচ্চের এবং নিম্নের সকল সপ্তক নিয়মিত হয়। এই মধ্য সপ্তকে চিহ্নের কোন বাঁধাবাঁধি নাই, অর্থাৎ মধ্য সপ্তকে ইচ্ছা করিলে চিহ্ন দিতেও পারি, ইচ্ছা করিলে নাও দিতে পারি। যেমন সচরাচর শত বলিলেই একশত বুঝায়, সহস্র বলিলেই এক সহস্র বুঝায়—ইহাদের পূর্ব্বে এক না লিখিলেও চলিতে পারে, সেইরূপ মধ্য বা প্রথম সপ্তকের শিরোভাগ বা নিম্নভাগ ১ এর দ্বারা চিহ্নিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। যথা,

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১
সা রে গা মা পা ধা নি   বা   সা রে গা মা পা ধা নি
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১

ইহা না লিখিয়া আমরা সচরাচর সা রে গা মা পা ধা নি লিখিব।

সপ্তকের প্রভেদসূচক সংখ্যাচিহ্ন উচ্চ এবং নিম্ন স্বরগ্রাম হিসাবে ক্রমান্বয়ে স্বরের শিরোভাগে এবং নিম্নভাগে স্থাপিত হইবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি :—

মধ্য সপ্তক (যাহাকে মুদারা বলে)—

সা রে গা মা পা ধা নি।

দ্বিতীয় উচ্চ সপ্তক (যাহাকে তারা বলে)—

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
সা রে গা মা পা ধা নি।

তৃতীয় উচ্চ সপ্তক (তারার উচ্চ সপ্তক)—

৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩
সা রে গা মা পা ধা নি। ইত্যাদি।

এইরূপ আবশ্যক হইলে চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি উচ্চ সপ্তকের স্বরগুলির শিরোভাগে চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতির জ্ঞাপক ৪, ৫ আদি সংখ্যা লিখিত হইবে।

দ্বিতীয় নিম্ন সপ্তক (যাহাকে উদারা বলে)—

সা রে গা মা পা ধা নি।
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২

তৃতীয় নিম্ন সপ্তক (উদারার নিম্ন সপ্তক)—

সা রে গা মা পা ধা নি। ইত্যাদি।
৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩

এইরূপ চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতি নিম্ন সপ্তক আবশ্যক হইলে তাহাদের স্বর-

গুলির নিম্নভাগে চতুর্থ পঞ্চম প্রভৃতির জ্ঞাপক ৪, ৫ আদি সংখ্যা লিখিত হইবে।

কড়ি ও কোমলের চিহ্ন।

জটিলতা পরিহারের জন্য কড়ি ও কোমল বুঝাইবার কালে স্বরের অক্ষর পরিবর্ত্তিত না করিয়া তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র সঙ্কেত ব্যবহার করা হইয়াছে। কোমল বুঝাইবার জন্য ঁ চন্দ্রবিন্দু আর কড়ি বুঝাইবার জন্য ় উল্টা চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হইবে। কোমলের চিহ্ন ও কড়ির চিহ্ন আবশ্যকানুসারে স্বরের মাথায় অথবা বামপার্শ্বে স্থাপিত করা যায়। যথা,—

ঁগা বা গাঁ; ়মা বা মা়।

মাত্রা।

স্বরের স্থায়িত্বকালকে মাত্রা কহে।

এক বা স্বাভাবিক মাত্রা।

একক ঠিক স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ নাতিদীর্ঘ-নাতিহ্রস্বভাবে উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তাহাকেই একমাত্রা কহে।

একমাত্রার চিহ্ন=১

এই একমাত্রা চারিবার উচ্চারণ করিলে চারিমাত্রা হইবে। যথা,—

১ ১ ১ ১।

এই একমাত্রা চারি চারি করিয়া চারিবার উচ্চারণ করিলে যোগমাত্রা হইবে। যথা,—১ ১ ১ ১। ১ ১ ১ ১। ১ ১ ১ ১। ১ ১ ১ ১।

এই স্বাভাবিক একমাত্রাকে অবলম্বন করিয়াই নানা তালের উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের সঙ্গীতশাস্ত্রে ও গায়কসমাজে প্রচলিত যে সকল তাল আছে, তদ্ব্যতীত ইচ্ছা করিলে আরও নানারূপ তাল উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। তাল কালেরই পরিমাপক চিহ্নমাত্র; সুতরাং কালকে যত বিভিন্ন প্রকারে সীমাবদ্ধ করিব, তত বিভিন্ন প্রকার তালেরও সৃষ্টি হইতে থাকিবে।

এক বা স্বাভাবিকমাত্রাকে যে সুর অধিকার করিবে, তাহার স্থায়িত্বকাল একমাত্রা। এই একমাত্রিক সুরকে ১এর দ্বারা চিহ্নিত করিলেও করিতে পারি, না করিলেও না করিতে পারি। যথা ১সা=সা।

গুণিতমাত্রা।

একমাত্রার গুণিত যে মাত্রা হইবে, তাহাকে গুণিতমাত্রা কহে। ইহাকে দীর্ঘমাত্রাও বলা যাইতে পারে। যথা, দ্বিমাত্রা, ত্রিমাত্রা ইত্যাদি।

দ্বিমাত্রা।

দ্বিমাত্রা এই নামেই বুঝা যাইতেছে, ইহা এক মাত্রার দ্বিগুণ। প্রত্যেক দ্বিমাত্রা দুইটি একমাত্রার সময় অধিকার করে।

দ্বিমাত্রিক চিহ্ন=২;

এইরূপ প্রত্যেক ত্রিমাত্রা তিনটি একমাত্রার সময় অধিকার করে।

ত্রিমাত্রার চিহ্ন=৩;

এইরূপ চতুর্মাত্রার চিহ্ন=৪ ইত্যাদি।

যখন কোন স্বর দ্বিমাত্রা, ত্রিমাত্রা প্রভৃতি গুণিতমাত্রাকে অধিকার করিবে, তখন সেই স্বরের পার্শ্বে গুণিত মাত্রার চিহ্নটি লিখিতে হইবে। যথা ২ সা; এইখানে সা স্বর দুই মাত্রা অধিকার করিয়াছে, অর্থাৎ সা স্বরটি দুই মাত্রা কাল পর্য্যন্ত একটানে গাহিতে হইবে। এই ২সা কে, সা সা। এই রূপেও রাখা যাইতে পারে।

অংশমাত্রা।

একমাত্রার অংশ হইলেই তাহাকে অংশমাত্রা কহে। ইহাকে হ্রস্ব-মাত্রাও বলা যাইতে পারে। যথা অর্দ্ধমাত্রা, সিকিমাত্রা।

অর্দ্ধমাত্রা।

অর্দ্ধমাত্রা এই নামেতেই জানা যাইতেছে, ইহা একমাত্রার অর্দ্ধ। দুইটি অর্দ্ধমাত্রায় একমাত্রা হয়। অর্দ্ধমাত্রা হিসাবে একমাত্রা প্রকাশ করিলে দুইটি অর্দ্ধমাত্রা লিখিতে হইবে যথা। ১ ।= । $\frac{১}{২}$ $\frac{১}{২}$ । সেইরূপ একমাত্রাকে এক-তৃতীয়, এক-চতুর্থ অংশমাত্রা হিসাবে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনটি এক-তৃতীয়, চারিটি এক-চতুর্থ অংশমাত্রা লিখিতে হইবে। যথা। ১ ।= । $\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{৩}$ $\frac{১}{৩}$ । ; । ১ । = । $\frac{১}{৪}$ $\frac{১}{৪}$ $\frac{১}{৪}$ $\frac{১}{৪}$ । ; এক-পঞ্চম, এক-ষষ্ঠ ইত্যাদি অংশমাত্রার সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

যখন কোন স্বর অংশমাত্রাকে অধিকার করিবে, তখন অংশমাত্রার উপরিস্থিত ১ সংখ্যাটি মুছিয়া সেই স্বর লিখিতে পারিবে। যথা ;— $\frac{\text{১}}{\text{২}} = \frac{\text{সা}}{\text{২}}$; $\frac{\text{১}}{\text{৩}}\text{সা} = \frac{\text{৩}}{\text{সা}}$; $\frac{\text{১}}{\text{৪}}\text{সা} = \frac{\text{৪}}{\text{সা}}$ ইত্যাদি।

স্বরের মাত্রাচিহ্ন-স্থাপনের সাধারণ নিয়ম।

স্বরের পার্শ্বে সন্নিহিত করিয়া মাত্রাচিহ্ন স্থাপিত হইবে। একমাত্রিক স্বরের পার্শ্বে ১ বসিবে ; যথা ১সা বা সা১। দ্বিমাত্রিক স্বরের পার্শ্বে ২ বসিবে ; যথা ২সা বা সা২। অর্দ্ধমাত্রিক স্বরের পার্শ্বে $\frac{\text{১}}{\text{২}}$ বসিবে ; যথা $\frac{\text{১}}{\text{২}}$সা বা সা$\frac{\text{১}}{\text{২}}$। এখন ১সা বলিলেও সা বুঝায়, শুধু সা বলিলেও তাহাই বুঝায়, সুতরাং যেখানে ১সা থাকিবে সেখানে শুদ্ধ সা রাখিলেই চলিবে। যথা ১সা = সা; $\frac{\text{১}}{\text{২}}\text{সা} = \frac{\text{সা}}{\text{২}}$; $\frac{\text{১}}{\text{৩}}\text{সা} = \frac{\text{১সা}}{\text{৩}} = \frac{\text{সা}}{\text{৩}}$; $\frac{\text{১}}{\text{৪}}\text{সা} = \frac{\text{১সা}}{\text{৪}} = \frac{\text{সা}}{\text{৪}}$ ইত্যাদি।

খণ্ডমাত্রা বা হসন্তমাত্রা।

যে কোন স্বর প্রাধান্যহীন হইয়া নিমেষের মধ্যে অপর স্বরের সহিত যুক্ত হয়, অর্থাৎ যে স্বরকে অতিদ্রুত স্পর্শ করিয়া স্বরান্তরে যাইতে হয়, তাহার মাত্রাকাল খণ্ডমাত্রা বা হসন্তমাত্রা নামে অভিহিত হইল। বঙ্গভাষায় যেমন অস্ফুট-উচ্চারণ 'হসন্ত' তকে 'খণ্ড'ত বলা যায়, সেই নিয়ম অনুসরণ করিয়া আমরাও হসন্তমাত্রাকে খণ্ডমাত্রা বলিলাম। এবং এই খণ্ডমাত্রিক স্বরের আমরা স্ত্রীস্বর সংজ্ঞা দিলাম। এই স্ত্রীস্বরকে মুখ্যস্বরের পার্শ্বে হসন্ত চিহ্নযুক্ত ও স্বরবর্ণ-লুপ্ত করিয়া লিখিতে হইবে। যথা, প্ধা ; ম্প্ধা ; গ্ম্প্ধা। এখানে ধা স্বরেরই প্রাধান্য, ধা স্বরই মুখ্যভাবে বিদ্যমান ; অন্য স্বরগুলি ছুঁইয়াই চলিয়া যাইতে হয়। ইচ্ছা করিলে খণ্ডমাত্রিক স্বরকে হসন্তচিহ্নযুক্ত করিয়া ক্ষুদ্র অক্ষরেও লিখিতে পারা যায়। যথা, গ্ম্প্ধা। হসন্তবর্ণের স্বরবর্ণ থাকে না বলিয়া আমরা হসন্তমাত্রিক স্বরের স্বরবর্ণ লোপ করিয়া দিলাম।

আমাদের সিকিমাত্রিক স্বর অনেকটা হসন্তমাত্রিক স্বরের মত শোনায় বলিয়া আমরা তাহাকে ভিন্নরূপে লিখিতে গেলে তাহাতে $\frac{\text{১}}{}$ (সিকি-

তাহার কিঞ্চিৎ প্রাধান্য থাকাতে, স্ত্রীস্বর হইতে সিকিমাত্রিক স্বরের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য সিকিমাত্রিক স্বরের স্বরবর্ণ রক্ষা করিব। যথা $\frac{১}{৪}$ পা = প্া এই পা স্বরটি যদি স্ত্রীস্বর হইত তাহা হইলে প্ এইরূপ লিখিতাম।

বিরামচিহ্ন।

বিরামের জন্য নূতন চিহ্নের কোন আবশ্যক নাই। বিরামে স্বরই অন্তর্হিত হয়; মাত্রার বিরাম নাই, মাত্রা বরাবর চলিয়া যায়; সেইহেতু সঙ্গীতে স্বরটি না লিখিয়া মাত্রাচিহ্নটি রাখিয়া গেলেই তাহা স্বরের বিরাম সঙ্কেত হইল। একমাত্রিক বিরামচিহ্ন ১, দ্বিমাত্রিক বিরামচিহ্ন ২ ইত্যাদি। দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি ঃ—সা রে ১ মা। এখানে 'রে' স্বরের পর ১ চিহ্নটি একমাত্রিক বিরামচিহ্ন বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ এই এক-মাত্রাকাল কোন স্বরই গাহিতে বা বাজাইতে হইবে না। যদি এই ১ চিহ্নের স্থানে কোন স্বর লিখিত হয় তাহা একমাত্রিক স্বর হইবে। সেইরূপ সা রে ২ মা থাকিলে বুঝিতে হইবে যে 'রে' স্বরের পর দুইমাত্রাকাল বিশ্রাম করিতে হইবে।

অলঙ্কারচিহ্ন।

স্বরযোগ।

স্বরের পর স্বর গাহিতে বা বাজাইতে গেলে তাহাদিগের মধ্যে যে একটি স্বাভাবিক যোগ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই স্বরযোগ। এই স্বাভাবিক স্বরযোগ অলঙ্কার হইতেই আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের অলঙ্কার সমূহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই স্বাভাবিক স্বরযোগের জ্ঞাপকচিহ্নস্বরূপে যোগচিহ্ন (+) অথবা 'কমা' চিহ্ন (,) ব্যবহৃত হইবে; কিম্বা যোগচিহ্ন, কমা চিহ্ন ব্যবহার না করিয়া পরে পরে কিঞ্চিৎ ব্যবধান রাখিয়া স্বরগুলি লিখিয়া গেলেও চলিবে। যথা। সা + গা + রে + মা। = । সা, গা, রে, মা। = । সা গা রে মা।

স্বরের টান।

যতমাত্রা পর্য্যন্ত কোন স্বরের টান চলিবে ততমাত্রা পর্য্যন্ত সেই স্বরের অক্ষরের মাত্রা হইতে একটি কসি টানিয়া যাইতে হইবে। যথা, । $\overline{\text{সা + ১ + ১ + ১}}$ । = । $\overline{\text{সা ৩}}$। বলা বাহুল্য যে সা স্বরের একমাত্রাও রক্ষিত

মাত্রা কাল গাহিতে হইবে। স্বরের টান গুণিতমাত্রার দ্বারাই ব্যক্ত হইতে পারে, তথাপি প্রয়োজনবশতঃ স্বরের টানের স্বতন্ত্র চিহ্নও করা গেল। যথা

। সা + ১ + ১ + ১ । = । সা৩ । = । ৪সা । = । সা সা সা সা । *

* "গুণিতমাত্রা"র শেষ অংশটুকু দেখ।

আশ।

গানের কথার একটি অক্ষরে স্বর হইতে স্বরে গমনকে আশ কহে। আশ বুঝাইবার জন্য স্বরগুলির মধ্যে মধ্যে এক একটি করিয়া কসি টানিতে হইবে। যথা । গা—রে—মা—রে।
। জা — — গো।

যদি একটি স্বরও দুই বা ততোধিকবার একটি অক্ষরে উচ্চারিত হয় তাহা হইলেও স্বরগুলির মধ্যে মধ্যে আশচিহ্ন লিখিত হইবে। যথা

। সা—সা—সা সা।
। কে — — ন।

মীড়।

অতি ঘনসংলগ্ন আশকে মীড় কহে। মীড়ে স্বরের হিঁচড়ান বা মোচড়ান ভাব প্রকাশ পায়। মীড় বুঝাইবার জন্য আশযুক্ত স্বরগুলির উপরে একটি রেখা টানিতে হইবে। যথা;

সা—রে—গা ; সা—রে—গা—মা।

গমক।

স্বরের ধীর কম্পনকে গমক বলে। ইহাতে প্রত্যেক স্বর কম্পিত এবং প্রস্বনিত হয়। গমকের চিহ্ন = ং। যে যে স্বর গমকযুক্ত হইবে সেই সেই স্বর অনুস্বারসমেত করিয়া লিখিত হইবে। যথা সাং। গানের কথার একটি অক্ষরে যদি কোন স্বর দুই বা ততোধিকবার সগমক উচ্চারিত হয় তাহা হইলে সেই সগমক স্বরগুলির মধ্যে মধ্যে আশচিহ্ন দেওয়া যাইবে।

স্বরের ঝোঁক।

যে যে স্বরে ঝোঁক পড়িবে সেই সেই স্বরের উপর ছোট ছোট দাঁড়ি পড়িবে। যথা সা রে গা মা।

গিট্‌কিরি।

আশসহকারে স্বর হইতে স্বরে দ্রুতগমনকে গিট্‌কিরি কহে। গিট্‌-

কিরির চিহ্ন = স্বরের মাথায় ঋফলা ৄ ; যতদূর গিট্‌কিরি চলিবে ততদূর ঋফলা হইতে ফুটকি দিয়া যাইতে হইবে। যথা

ৄ..............................

প্‌ধা—প্‌ধা—পা—ম়া—পা ;

কে — — — —

গিট্‌কিরি অতিক্রুত হইলে স্বরের মাথায় দীর্ঘ ঋফলা ৄ বসিবে ; সেই অতিক্রুত গিট্‌কিরিটিও যতদূর চলিবে ততদূর দীর্ঘ ঋফলা হইতে ফুটকি দিয়া যাইতে হইবে।

স্বরমিশ্র (Harmony)।

(স্বরগুণন)

আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতের দিকেও লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। দুএকটি ইংরাজী গৎ আজকাল অনেকেরই মুখে প্রায় শোনা যায়। যদিও আমাদের দেশীয় সঙ্গীত ইউরোপীয় সঙ্গীত অপেক্ষা নানাগুণে শ্রেষ্ঠ তথাপি কবি মুরের আইরিষ গান এবং মোজার্ট রসিনি প্রভৃতি জর্ম্মণ ও ইটালীয় স্বর-কবিগণের সঙ্গীত যাঁহারা জানেন তাঁহারা ইউরোপীয় সঙ্গীতের মধুরতা অস্বীকার করিতে পারেন না।

স্বরমিশ্র-প্রধান ইউরোপীয় সঙ্গীতের স্বরগুণনই মুখ্য উপাদান। দুই বা ততোধিক স্বরের একস্বরীকরণকে স্বরগুণন কহে। একস্বরীকরণ অর্থাৎ বিভিন্ন স্বরের যুগপৎবাদন, পরে পরে নয়।

স্বরের গুণনচিহ্ন = × অথবা . বিন্দু। স্বর-গুণনের চিহ্ন স্বরসমূহের মধ্যে মধ্যে স্থাপিত হইবে। যথা, সা × গা × পা অথবা সা. গা. পা।

একস্বরীভাবে ক্রীড়িত দুই বা ততোধিক স্বরকে গুণিতস্বর (Chord) কহে। যথা 'সা × গা × পা'। এই গুণন চিহ্নযুক্ত তিনটি স্বর একটি গুণিত স্বর। যদি এই গুণিত স্বর দ্বিমাত্রিক হয় তাহা হইলে ২ 'সা.গা.পা.' এইরূপ লিখিত হইবে। যদি অর্দ্ধমাত্রিক হয় তাহা হইলে $\frac{১}{২}$সা.গা.পা অথবা $\frac{\text{সা.গা,পা}}{২}$ লিখিত হইবে ইত্যাদি।

কথার সংক্ষেপ।

আওয়াজ বৃদ্ধির = (বৃ:), আওয়াজ হ্রাসের = (হ্র:) ; প্রবল আওয়াজ =

অতিমৃদু আওয়াজ=(মৃ: মৃ: বা মৃ:); আওয়াজের ক্রমশ হ্রাস=(ক্র—বৃ:); মধ্য বল আওয়াজের=(মঃ বঃ বা ম্ব:); অস্থায়ী=স্থা অন্তরা=ন্ত আভোগ ভো সঞ্চারী=ঞ্চ পুনরায়=পু:; প্রথম=প্র; দ্বিতীয়=দ্বি ইত্যাদি।

তালিবিভাগ সঙ্কেত।

দুই তালির মধ্যস্থিত এক একটি ভাগকে এক একটী তালিবিভাগ বলে। প্রত্যেক তালিবিভাগ কতকগুলি মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে, যেমন কাওয়ালি তালের প্রত্যেক তালিবিভাগ চারিটি করিয়া মাত্রা অধিকার করে। গানে যে যে মাত্রায় তালি পড়িবে সেই সেই মাত্রার পূর্ব্বে এক একটি করিয়া দাঁড়ি দিতে হইবে।

তালি ও মাত্রাবিভাগ সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য তালিবিভাগের নিম্নে মাত্রাবিভাগ লিখিতে হইবে; প্রথম তালির নিম্নে প্রথম তালির মাত্রা সংখ্যা, দ্বিতীয় তালির নিম্নে দ্বিতীয় তালির মাত্রা সংখ্যা এইরূপ ক্রমান্বয়ে লিখিতে হইবে; যথা কাওয়ালি তালের সংকেত ঃ—

তালি। ১। ২। ৩। ০।
মাত্রা। ৪। ৪। ৪। ৪।

তালিবিভাগ-সঙ্কেত স্বরলিপির পূর্ব্বেই দেওয়া হইবে।

সকল সময়ে স্বরের মাথায় তালিসংখ্যা দেওয়া সুবিধাজনক না-ও হইতে পারে, এই কারণে আমরা ইচ্ছামত পূর্ব্বোক্ত তালিবিভাগসঙ্কেতের ন্যায় আর একটি সঙ্কেতের দ্বারা সঙ্গীতের স্বরলিপির পূর্ব্বেই বুঝাইয়া দিব যে আস্থায়ী প্রভৃতি কোন্ তালিতে আরম্ভ হইবে। যথা—

আরম্ভ। স্থা। ন্ত। ভো। ঞ্চ।
তালি । ১। ২। ৩। ০।

এইখানে বুঝিতে হইবে যে আস্থায়ী প্রথম তালে, অন্তরা দ্বিতীয় তালে, আভোগ তৃতীয় তালে, সঞ্চারী চতুর্থ তালে আরম্ভ হইবে। এইরূপে আরম্ভ হইয়া নিয়মিতরূপ তালিবিভাগ চলিবে।

আমাদের দেশীয় তালে যে সম্ ও ফাঁক আছে তাহার মধ্যে সমেই গানের বিশ্রামস্থান। ফাঁক যদিও বস্তুতঃ একটি তালি ছাড়া কিছুই নহে, কিন্তু ইহাতে কার্য্যতঃ তালি দেওয়া হয় না। সমের চিহ্ন=তালি সংখ্যার অথবা স্বরের পার্শ্বে বা স্থানে যুগল বিন্দু চিহ্ন; যথা—

১। ২ঃ। ৩। ০। বা ১। ঃ। ৩। ০।

গানের সঙ্গে সঙ্গে তাল লিখিতে গেলে যে মাত্রায় তালি পড়িবে সেই মাত্রার উপরে বক্রবন্ধনীর মধ্যে তালি সংখ্যা লিখিতে হইবে।

গানের কথা স্থাপন প্রণালী।

সুরের নীচে নীচে কথার অক্ষর বসিবে। যথা—

। সা গা রে মা।
। ক বে যা বে।

কিন্তু যেখানে সুরের নীচে কথার অক্ষর না থাকিবে সেখানে পূর্ব্ব অক্ষরের স্বরবর্ণের টান চলিতেছে বুঝিতে হইবে। সেই টান বুঝাইবার জন্য কসিচিহ্ন ব্যবহার করা যাইবে। যথা—

। সা—গা—রে মা।
। হ — — রি।

বলা বাহুল্য যে গানের সমাপ্তিতে যুগলদাঁড়ি বসিবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপে নিম্নলিখিত গানটি অতি সহজ বলিয়া স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকবর্গকে সর্ব্বপ্রথম উপহার দিতেছি।

জ্ঞানদাসের গান। *

(রাস বিষয়ক)

রাগিণী ঝিঁঝিঁট—তাল একতালা। †

রাসমণ্ডল মধুসখা আব নের্ত্তি বনওয়ারি।
করসোঁ কর জোরি শ্যাম গোপীজন ঠার ঠার
বীচমোহন বিরাজিত ছব কোটকামবারি।
ধন ধন বৃন্দাবন ধন গোকুলধন গোপীগোয়ার
ধন ধন ব্রজপুর যাঁহা নীল অবতারি।
করত রাস অতিবিলাস পুলকিত ভও নাচত তাল
জ্ঞানদাস নিরখত ছব ওনেকি বলেহারি।

---

* ইহা জ্ঞানদাসের নিজের সুর, যাহা ওস্তাদেরা গাহিয়া আসিয়াছেন।

† একতালা দুই প্রকারে তাল দেওয়া যায়। ওস্তাদেরা (বিশেষতঃ কালাঁওতেরা) যেরূপে তাল দেন, আমিও তদনুযায়ী একতালার তালিবিভাগ সঙ্কেত দিয়াছি। একতালার অন্যরূপ তালিবিভাগ সঙ্কেতটি এই :—তালি। ২ঃ। ৩। ০। ১। মাত্রা। ৩। ৩। ৩। ৩।

তালি। ২ঃ। ৩। ০। ১। । স্থা। স্ত।
মাত্রা। ৪ । ২। ২। ৪। তালি। ২। ২।

(স্থা) । পা পা মা পা । পা ধা । মা পা । মা গা
(স্থা) । রা — স ম । ও ল । ম ধু । স খা

২ ২ ২
রে গা। গ্‌সা সা সা নি। ধা পা । ধা ১/২ নি ১/২ ধা। নি
আ ব। নে — র্ত্ত তি। ব ন । ওয়া — — । —

২ ২ ২
সা সা সা। নি নি ১/২ নি ১/২ ধা পা । পা ধা । মা পা ।
রি — —। রা — স — ম । ও ল । ম ধু ।

মা গা রে গা । (স্ত—প্র) । পা পা পা পা। পা ধা । নি
স খা আ ব । (স্ত—প্র) । ক র সোঁ —। ক র । জো

২ ২
নি । নি নি নি নি । ন্‌স নি সা
— । রি শ্যা — ম । গো — পী

২ ২ ২ ২ ২ ২
নি । সা রে । সা রে । সা নি নি সা । ধা নি
— । জ ন । ঠা — । র ঠা — র । ক র

নি ধা । পা ধা । নি নি । নি নি নি নি ।
সোঁ — । ক র । জো — । রি শ্যা — ম ।

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
। ন্‌সা নি সা নি । সা রে । সা রে । সা নি
। গো — পী — । জ ন । ঠা — । র ঠা

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
নি নি । ন্‌স সা সা সা । সা সা । সা সা ।
— র । বি — চ মো । হ ন । বি রা ।

২ ২ ২
। রে সা নি নি । নি নি নি নি । সা ধা ।
। জি ত ছ ব । কো — ট কা । — ম ;

২ ২ ২
। ধা ১/২ নি ১/২ ধা । নি সা সা সা । (স্থাঃ) নি নি
। বা — — । — রি — — । (স্থাঃ) রা —

১/২ নি ১/২ধা পা । পা ধা । মা পা । মা গা রে
স — ম । গু ল । ম ধু । স খা আ

গা । (স্তেধি) । পা পা পা পা । পা ধা । নি নি ।
ব । (স্তধি) । ধ ন ধ ন । বৃন্ — । দা — ।

২ ২ ২ ২
। নি নি নি নি । নৃসা নি সা নি । সা রে ।
। ব ন ধ ন । গো — কু ল । ধ ন ।

২ ২ ২ ২ ২
।স্ রে সা। সা নি নি সা। ধা নি নি ধা।
। গো —। পী গোয়া — র। ধ ন ধ ন।

২
। পা ধা। নি নি । সি নি নি নি । নৃসা নি
। বৃন্ —। দা — । ব ন ধ ন । গো —

২ ২ ২ ২ ২ ২
সা নি । সা রে । সা রে । সা নি নি
কু ল । ধ ন । গো — । পী গোয়া —

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
নি । নৃসা সা সা সা । সা সা । সা সা ।
র । ধ ন ধ ন । ব্র জ । পু — ।

২ ২ ২ ২
। সা রে সা সা । নি নি নি নি ।
। র যাঁ — হাঁ । নী — ল অ ।

২ ২ ২ ২
। সা ধা । ধা ১/২ নি ১/২ ধা । নি সা সা সা ।
। — ব । তা — — । — রি — — ।

(স্থা) । নি নি ১/২ নি ১/২ ধা পা । পা ধা । মা পা ।
(স্থা) । রা — স — ম । গু ল । ম ধু ।

। মা গা রে গা । (স্তভৃ) । পা পা পা পা ।
। স খা আ ব । (স্তভৃ) । ক র ত রা ।

২
পা ধা । নি নি । নি নি নি নি । সা নি
— স । অ তি । বি লা — স । পু ল

২ ২ ২ ২ ২ ২
সা নি । সা রে । সা রে । সা নি নি
কি ত । ভ ও । না চ । ত তা —

২
সা । ধা নি নি ধা । পা ধা । নি নি । নি
ল । ক র ত রা । — স । অ তি । বি

২ ২ ২ ২
নি নি নি । সা নি সা নি । সা রে ।
লা — স । পু ল কি ত । ভ ও ।

২ ২ ২ ২ ২ ২
সা রে । সা নি নি নি । সা সা সা
না চ । ত তা — ল । জ্ঞা — ন

২ ২ ২ ২ ২ ২
সা । সা সা । সা সা । রে সা নি নি ।
দা । — স । নি র । থ ত ছ ব ।

২
। নি নি নি সা ।
। ও নেঁ কি — ।

২ ২ ২
ধা ধা । ধা $\frac{১}{২}$ নি $\frac{১}{২}$ ধা । নি সা সা সা ॥
ব লে । হা — — । — রি — — ॥

নিঃ
রা

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মনুষ্যজাতির উৎপত্তি।

আজকাল আমাদের দেশে যাহাদের কিছুমাত্র লেখাপড়া জানা আছে, তাহাদের মধ্যেও ডারউইনের নাম জানে না, এমন লোক অতি বিরল। তাহারা শুনিয়া রাখিয়াছে যে, মনুষ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে ডারউইন সাহেব কি একটা অদ্ভুত, বেয়াড়া, কিম্ভূতকিমাকার মত প্রচার করিয়াছেন। যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশই ডারউইনের মত এবং তাহার ব্যাখ্যা বিবৃতি টীকা টিপ্পনীর সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত নহেন। তাঁহারা মোটামুটি জানিয়া রাখিয়াছেন যে, ডারউইন সাহেব বৃক্ষের বানর খাড়া করিয়া মনুষ্যজাতির পিতৃনিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। বুঝিয়া রাখিয়াছেন যে, হনুমান, গিবন, গরিলা, শিম্পানজি, ওর‍্যাংওটাং প্রভৃতি যে সকল বানরশ্রেণীর জীব পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদেরই মধ্যে কেহ মনুষ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষ।

বানরশ্রেণীর যে সকল জীব এক্ষণে পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, মনুষ্য তাহাদেরই কাহারও বংশাবতংস, এমন কথা ডারউইন কোথাও বলেন নাই। তাঁহার সার কথা এই যে, পৃথিবীর অন্যান্য জীবের ন্যায় মনুষ্যও অন্য কোন নিম্নতর জীবের পরিণাম মাত্র। তাঁহার প্রধান গ্রন্থের প্রধান কথা এই যে, জীবজগতে এবং অন্যত্রও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন নিয়মে জাতির উৎপত্তি। কোন একটি জাতি পারিপার্শ্বিক অবস্থাধীন বিবর্ত্তিত হইয়া অন্য কোন নূতন জাতিতে পরিণত হয়। এই নিয়ম জগতের সর্ব্বত্র। জগতের যাহা নিয়ম, কেবল মনুষ্যজাতির সম্বন্ধে তাহার ব্যতিক্রম কল্পনা করা কখনই সমীচীন পদ্ধতি হইতে পারে না। ডারউইন বলেন, যেমন অন্যান্য জীব, তেমনি মনুষ্যও নিম্নতর কোন জীব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

কথাটা অবশ্যই নূতন রকমের; খানিকটা বিস্ময়করও বটে। সুতরাং এরূপ তত্ত্ব যিনি প্রচার করেন, তাঁহার নিকট প্রমাণ চাহিবার অধিকার সকলেরই আছে। ডারউইনও প্রমাণ দিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার প্রযুক্ত প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিয়া, অধুনাতন বৈজ্ঞানিক জগৎ তাঁহার মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সেই প্রমাণের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই দেখিতে হয় যে, নিম্নতর কোন জীব হইতে উৎপন্ন হইবার লক্ষণ বা চিহ্নাদি মনুষ্যের শারীরিক সংস্থানে বিদ্যমান আছে কি না। কেবল শারীরিক সাদৃশ্য দেখাইলেই অবশ্য যথেষ্ট হইবে না;—মানসিক ও নৈতিক সাদৃশ্য ও পরিণতিও প্রদর্শিত করিতে হইবে, এবং তাহার অর্থও বুঝাইতে হইবে। কিন্তু প্রথমে শরীর লইয়াই আরম্ভ করা যাউক। ডারউইন স্বয়ং এই প্রণালীই অবলম্বন করিয়াছেন। ওয়ালেসও এই পদবীর অনুসরণ করিয়াছেন। আমাদেরও বোধ হয় যে, ইহাই প্রকৃষ্ট পদ্ধতি।

উপর উপর দেখিলেও বেশ উপলব্ধি হয় যে, মনুষ্যের শরীর, ইতর জীবেরই শরীর। প্রভেদ অবশ্যই আছে, কিন্তু প্রধান প্রধান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও গঠনের সংস্থান ও প্রকৃতি,একই রকম। অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবের শরীর এবং মানুষের শরীর যে একই ছাঁচে ঢালা,তৎপক্ষে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। মনুষ্য কঙ্কালে যতগুলি অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অনুরূপ অস্থি সকল বানর, বাদুড় ও শীল্ নামক জলজন্তুতেও আছে। কেবল অস্থি বলিয়া নহে; পেশী, ধমনী, শিরা, রক্তাশয় সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। হক্স্লি প্রভৃতি শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা দেখাইয়াছেন যে, মস্তিষ্ক সম্বন্ধেও ইহার ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না।

উচ্চতর শ্রেণীর জীবমাত্রেই এরূপ অঙ্গ-সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা তজ্জাতীয় জীবের পক্ষে নিষ্প্রয়োজনীয়, কিন্তু অন্য কোন সমশ্রেণীর অথচ ভিন্ন জাতীয় জীবের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এরূপ স্থলে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, কোন সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে ইহা উত্তরাধিকৃত। যাহাদিগের প্রয়োজনীয়, তাহাদের মধ্যে পরিস্ফুট; যাহাদের প্রয়োজনীয় নহে, তাহাদের মধ্যে লুপ্তপ্রায়। মনুষ্যেও এরূপ অঙ্গ-সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক জীবেই শরীরের চর্ম্ম কুঞ্চিত ও প্রসারিত করিবার উপযোগী বিশেষ পেশী আছে। ইহার দ্বারা তাহারা ইচ্ছা মত আপন দেহের চর্ম্ম কুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে পারে ও করে। অশ্বজাতীয় জীবেই ইহা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। অপ্রয়োজনীয় বলিয়া, এই শক্তি মনুষ্যজাতির মধ্যে লুপ্তপ্রায় হইয়া থাকিলেও, ইহার বিদ্যমানতা দেখা যায়। আমরা সকল অঙ্গের চর্ম্ম ইচ্ছাধীন সঞ্চলিত করিতে পারি না বটে, কিন্তু কোন কোন অঙ্গের পারি। হস্ত বা পদের চর্ম্ম ইচ্ছায় সঞ্চালিত হয় না বটে, কিন্তু ভ্রূ-কুঞ্চন সকলেরই ইচ্ছাধীন এবং ইচ্ছায়ত্ত। কেহ কেহ মাথার

খুলি ইচ্ছাধীন সঞ্চালিত করিয়া, মস্তকস্থিত দ্রব্যও উৎসারিত করিতে পারে, এরূপ প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ ইচ্ছাধীন মাথার খুলি সঞ্চালিত করিবার ক্ষমতা, বংশাধীন উত্তরাধিকৃত হইয়া আসিতেছে। ফ্রান্সে এইরূপ একটি বংশের অস্তিত্বের কথা, এম, এ, ডি ক্যাণ্ডোল সাহেব ডারউইনকে জানাইয়াছিলেন। (১)

ইচ্ছাধীন কর্ণ-সঞ্চালন-শক্তি সম্বন্ধেও ঐরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য অপেক্ষা নিম্নতর অনেক জীবেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা ইচ্ছাধীন আপন কর্ণ সঞ্চালিত করিতে পারে। শব্দ প্রণিধান করিয়া খাদ্য বা খাদক জীবের বিদ্যমানতা নির্ণয় করিবার জন্য, ইতর জীবের পক্ষে এই ইচ্ছাধীন-কর্ণ-সঞ্চালনশক্তির পরিপুষ্টি বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়াই, বোধ হয়, এই শক্তি তাহাদের মধ্যে বিশেষরূপে পরিপুষ্ট। মনুষ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় নহে বলিয়াই,বোধ হয়, অব্যবহারে এই শক্তির লোপ হইয়াছে। লোপ হউক, তথাপি কোন কোন স্থলে, সময়ে সময়ে, ইহার বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়। এমন মানুষ দেখা গিয়াছে, যাহারা আপন কর্ণ, সম্মুখে পশ্চাতে বা উর্দ্ধ দিকে ইচ্ছাধীন সঞ্চালিত করিতে পারে। ডারউইন স্বয়ং ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অধ্যাপক প্রেয়র, কর্ণতত্ত্বসম্বন্ধে বহু অধ্যয়ন ও পরীক্ষা করিয়া, প্রায় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। (২) ইহার দুইটি অর্থ আছে। প্রথম, অপ্রয়োজনে, সুতরাং অব্যবহারে, শক্তির লোপ হয়। দ্বিতীয়,বংশানুক্রমিক লক্ষণ সহজে ছাড়ে না—যাই যাই—করিয়াও কিছুকাল পড়িয়া থাকে। মনুষ্য অত্যুন্নত হইয়াছে সত্যই, কিন্তু সম্পর্ক ছাড়াইতে পারে নাই—আজিও ভাল করিয়া বংশ-গোপন করিতে পারে নাই।

কতকগুলি সংক্রামক রোগ আছে, তাহা মনুষ্য হইতে ইতরজীবে, এবং ইতরজীব হইতে মনুষ্যে সংক্রামিত হয়। বসন্ত, বিসূচিকা, উপদংশ, দক্র, জলভীতি প্রভৃতি অনেক সংক্রামক ব্যাধি এই লক্ষণাক্রান্ত। কতকগুলি অসংক্রামক রোগ আছে, বানর ও মনুষ্য উভয়ের মধ্যেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের ন্যায় বানরের সর্দ্দি হয়, এবং তাহা পুনঃপুনঃ ঘটিতে থাকিলে, অবশেষে তাহাদের মধ্যেও যক্ষ্মায় পরিণত হয়। মনুষ্যের ন্যায়

(১) 'Expression of the Emotions in Man and Animals', 1872, P. 144.

(২) The Descent of Man. 1874. p. 14.

তাহাদেরও চক্ষে ছানি পড়ে, মলাধারে প্রদাহ হয়। মনুষ্য-ব্যবহার্য্য ঔষধ-প্রদানে তাহাদের শরীরে মনুষ্যশরীরোচিত কার্য্যও হইয়া থাকে। অনেক বানর চা, কাফি, সুরা বা তাম্রকূটের বড় প্রয়াসী। পূর্ব্বোত্তর আফ্রিকার অধিবাসীরা, কড়া বিয়র্ মদের ফাঁদ পাতিয়া, বন্য বানর ধরে। অধিক সুরা-পানের পরবর্ত্তী ফল, তাহাদের মধ্যে ঠিক্ মনুষ্যের ন্যায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। পরদিন, মনুষ্যের ন্যায়, তাহাদেরও মাথা ধরে, মেজাজ খিট্‌খিটে হয়, শরীর অবসাদ-প্রাপ্ত হয়। তখন তাহাদিগকে সুরা দিলে, তাহারা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করে, এবং নেবুর রস পাইলে আগ্রহসহকারে পান করে। ইহাতে আর কিছু না হউক, এটুকু বুঝা যায় যে, মনুষ্যের এবং নিম্নবর্ত্তী অন্যান্য জীবের দৈহিক গঠন ও সংস্থান অনেকটা এক রকম।

মনুষ্যের এবং তন্নিম্নবর্ত্তী অন্যান্য জীবের গর্ভস্থ ভ্রূণ, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পর্য্যালোচনা করিয়া, বৈজ্ঞানিকেরা এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তাহাদের উৎপত্তি ও প্রাথমিক বিকশনপদ্ধতি অবিকল একই রকম। প্রথম প্রথম কুক্কুরের ভ্রূণ এবং মনুষ্যের ভ্রূণে কোনই প্রভেদ লক্ষিত হয় না। কিছু দিন পরে, গর্ভ কতকটা পরিপুষ্ট হইলে, এই দ্বিবিধ ভ্রূণের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। কিন্তু যে সকল বিষয়ে মনুষ্যের ভ্রূণ কুক্কুরের ভ্রূণ হইতে পৃথক হইয়া উঠে, সেই সকল বিষয়েই বানরের ভ্রূণের সদৃশ হইয়া পড়ে। তার পর, গর্ভ যখন বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, তখন মানুষের ও বানরের ভ্রূণে পার্থক্য দৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া অধ্যাপক হক্‌স্‌লি লিখিয়াছেন,—"নিঃসন্দেহ, এই সকল বিষয়ে মানুষ যতটা বানরের নিকটবর্ত্তী, বানর ততটা কুকুরের নিকটবর্ত্তী নহে।"

অব্যবহিত নিম্নতর অনেক জীবের সহিতই মানুষের সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য বানরশ্রেণীর জীবের সহিত যতটা, ততটা অন্য কোন জীবের সহিত নাই। বাস্তবিকই বানরজাতীয় জীব দেখিলেই মনে হয়, ইহারা যেন মানুষের শং। হাত, মুখ, ভাব, ভঙ্গী, কার্য্য, এতটাই মানুষের মতন, অথচ এতটা বে-সুরা, যে কেবল দৃষ্টিমাত্রই মনে হয়, বিধাতা যেন মানুষকে ভ্যাঙ্গাইবার জন্যই বানরের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনেকটা সাদৃশ্য না থাকিলে, এরূপ ভাব মনে উদয় হয় না। এই সাদৃশ্য ও পার্থক্যের কথা বারান্তরে আলোচনা করিব। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

জননী।

[বিখ্যাত ফরাসী লেখক মোপাসাঁর (Guy de Maupassant) গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ হইতে]

আমি ভিরলোঁনে প্রায় পনর বৎসর যাই নাই। শরৎকালে সুহৃদ্বর সার্-ভ্যালের সহিত মৃগয়ার নিমিত্ত এই জনপদে পুনর্ব্বার পদার্পণ করিলাম। অরাতিহস্তে হতশ্রীসম্পন্ন সারভ্যালের উদ্যানবাটী এই মাত্র পুনঃসংস্কৃত হইয়াছিল।

এই জনপদটি আমার বড় ভাল লাগিত। পৃথিবীর দু'একটি প্রচ্ছন্ন অংশের ন্যায়, এই নিভৃত স্থানটি কি এক হৃদয়প্লাবী শরীরী সৌন্দর্য্যে নিম-জ্জিত। সুন্দরীর দেহধূপের ন্যায়, এই আতট সৌন্দর্য্য তোমার সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়কে আকুল করে। ভালবাসা এখানে শুধু দেহজ। কোন এক সুশ্যাম গিরিশৃঙ্গ, উপলভেদী নির্ঝর, বা মৃগপদাঙ্কিত বনস্থলী, জীবনে ইত-স্ততঃ বিক্ষিপ্ত আনন্দময় ঘটনার ন্যায়, আমাদিগের হৃদয় স্পর্শ করে। এই কোমল উপভোগস্মৃতি শুষ্ক হৃদয়কে চিরবসন্তের নবীন কিশলয়ে আবৃত করিয়া রাখে। কখন কখন প্রফুল্ল দিবসে চকিতদৃষ্ট বনকুসুমশোভী সরিত্তট, বা পরাগরঞ্জিত উদ্যানবীথিকার দিকে আমাদের চিন্তাস্রোত আপনি ছুটিয়া যায়। বসন্তপ্রভাতে পথপার্শ্বে শুভ্রোজ্জ্বলবেশা কোন ইন্দীবরাক্ষী জনপদবধূ প্রাণে ও দেহে অপূর্ণ কামনা-মদিরা ঢালিয়া দিয়া যাইবার সময় হৃদয়পটে যে ছবি রাখিয়া যায়—যখন মনে হয়, আমরা সুখের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া চলিয়াছি—সেই অভিরাম আলেখ্যবৎ, এই সৌন্দর্য্য অবিনাশী।

ভিরলোঁনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনানীবেষ্টিত পল্লীসমূহ আমার চক্ষে বড় সুন্দর, মধ্যে মধ্যে সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল তরঙ্গ বক্ষে করিয়া, ক্ষিতিবক্ষে রক্তবাহিনী শিরার ন্যায়, কৃশ তটিনীসমূহ ছুটিয়া চলিয়াছে। কি সুন্দর! ইচ্ছা করিলে, এই সকল সরিতে নানাপ্রকার মৎস্য ধরা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে স্নানেরও বেশ সুবিধা। নদীতটে দীর্ঘ ঘাসের ভিতর শরব্য পক্ষীরও অভাব নাই।

আমি ছাগের ন্যায় লঘুপদে বনমধ্যে বিচরণ করিতেছিলাম—কুকুর দুইটি আমার সম্মুখে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। দক্ষিণভাগে কয়েক শত হস্ত দূরে, সারভ্যাল, লুর্সান্ ক্ষেত্রটি আলোড়ন করিতে ব্যস্ত। এই বনস্থলীর সীমা অতিক্রম করিতেই একটি জনশূন্য ভগ্ন কুটীর আমার নয়নপথে পতিত হইল।

হটাৎ কুটীরখানির পুর্ব্বাবস্থার কথা মনে পড়িল। ১৮৬৯ সালে ইহার এরূপ দুর্দ্দশা হয় নাই। তখন এই দ্রাক্ষালতামণ্ডিত পরিচ্ছন্ন কুটীরপ্রাঙ্গণে গৃহপালিত পশু পক্ষী ঘুরিয়া বেড়াইত। মৃত কুটীরের আতঙ্কজনক কঙ্কাল-দৃশ্য কি শোচনীয়!

এই সঙ্গে আর এক দিবসের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। একদিন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া কুটীরদ্বারে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। গৃহস্বামিনী রমণী এক পাত্র সুরা দিয়া, আমার ভদ্রোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল। সারভ্যালের নিকট তখন এই কুটীরবাসীদিগের ইতিহাস শুনিয়াছিলাম। এই রমণীর স্বামী চুরি করিয়া মৃগ হনন করিত। একবার শস্ত্রধারী শান্তি-রক্ষকদিগের হস্তে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করে। ছেলেটিকে আমি এক-বারমাত্র দেখিয়াছিলাম। তাহার আকার দীর্ঘ ও কাঠিন্যব্যঞ্জক। পিতার ন্যায় সে-ও মৃগয়ানিপুণ। লোকে তাহাদিগকে "স্যাভেজ" বলিয়া ডাকিত।

আমি সারভ্যাল্‌কে ডাকিলাম। সে বকের ন্যায় সুদীর্ঘ পদবিক্ষেপে আমার নিকটে উপস্থিত হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কুটীর-বাসীরা কোথায়?" সারভ্যাল আমার প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত গল্পটি বলিল।

জার্ম্মাণদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সময়, মাকে গৃহে একলা রাখিয়া, স্যাভেজ, সৈন্যদলে প্রবেশ করিল। তখন তাহার বয়স তেত্রিশ বৎসর। লোকে কিছু টাকা কড়ি আছে বলিয়া, পুত্রবিরহিত স্ত্রীলোকটির দুঃখে তত দুঃখিত হইল না।

গ্রাম হইতে অনেক দূরে, বনোপকণ্ঠে, এই নির্জ্জন কুটীরে, স্যাভেজের মা একলা বাস করিত। কিন্তু তাহার মনে কখন লেশমাত্র ভয়ের উদ্রেক হইত না। এই রমণী তদীয় পরিবারস্থ পুরুষদিগের ন্যায় সাহসী। তাহার হাস্যবিরহিত আনন ও সুদীর্ঘ দেহযষ্টি দেখিয়া লোকে তামাসা করিতে ভয় পাইত। পরিশ্রমক্লান্ত কৃষকরমণীদিগকে প্রায় হাসিতে দেখা যায় না। হাসিটা সুধু পুরুষদিগেরই অধিকৃত। কৃষকেরা মদিরাগৃহ হইতে খানিকটা গোলমাল ও আমোদ করিতে শিখে, কিন্তু তাহাদের অর্দ্ধাঙ্গ-

ভাগিনীরা ম্লান ও সঙ্কীর্ণ হৃদয় লইয়া, কোন প্রকারে তমসাবৃত জীবনপথ অতিবাহিত করিয়া যায়। মেঘাচ্ছন্ন দিবসের ন্যায়, তাহাদের মুখ যেন সদা-সর্ব্বদা ঘনান্ধকারে ব্যাপ্ত।

শীতাগমে নগর ও প্রান্তর তুষারে আবৃত হইয়া গেল। স্যাভেজের মা এখন সপ্তাহে একবার মাত্র কিঞ্চিৎ রুটি ও মাংস কিনিবার জন্য প্রান্তরস্থিত নির্জ্জন কুটীর ত্যাগ করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিত। মধ্যে বাঘের ভয় হওয়ায়, স্যাভেজের মা, ছেলের পুরাণ মরিচাধরা বন্দুকটি কাঁধে করিয়া লোকালয়ে বহির্গত হইত। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! কিঞ্চিৎ অবনত হইয়া, তুষারপিচ্ছিল ভূমির উপর দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবার সময়,বন্দুকের নলটি এই বর্ষীয়সী রমণীর শুভ্রকেশাচ্ছাদী কৃষ্ণ শিরস্ত্রাণ ছাড়াইয়া উঠিত।

এক দিন এক দল প্রুসীয় সৈন্য গ্রামে উপস্থিত হইল। অবস্থা বুঝিয়া সকলের বাটীতেই দু'এক জন সৈন্যের আবাসস্থল নির্দ্ধারিত হইল। কিছু সম্পত্তি আছে বলিয়া, চারি জন সৈনিক স্যাভেজদিগের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এই চারি জনই দেখিতে বেশ সুন্দর ও হৃষ্টপুষ্ট। চক্ষু নীলাভ। গাত্র ও শ্মশ্রুর রং পাটল। আকৃতি দেখিয়া বোধ হয় না যে, বিগত সমরক্লেশ নিবন্ধন বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিজেতা হইয়াও পরাজিতদের সহিত ব্যবহারে অতি শান্ত ও দয়ালু। বিশেষতঃ, গৃহকর্ত্রী রমণীর সহিত তাহারা অতিশয় ভদ্রতা করিত। তাহারা, যাহাতে বেশী খরচ বা দৈহিক কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য। প্রাতে হিমানীরুদ্ধ অস্পষ্ট সূর্য্যালোকে কুটীরসন্নিহিত কোন কূপের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহারা গাত্রধৌত করিত ও কেশবিন্যাসে নিযুক্ত থাকিত। বৃদ্ধা তাহাদের জন্য গৃহে স্যুপ রাঁধিত। কাঠ কাটিয়া, রন্ধনগৃহ ধুইয়া, ঘরদুয়ার ঝাঁট্ দিয়া, তাহারা যথার্থ পুত্রের ন্যায় বৃদ্ধার কার্য্যের সহায়তা করিত।

কিন্তু বৃদ্ধা মুহূর্ত্তের জন্য তাহার বিদেশী পুত্রের কথা ভুলিতে পারে নাই। তাহার সেই ক্ষীণ ও দীর্ঘ অবয়ব, বক্র নাসিকা, ধূমল নেত্র ও ওষ্ঠবিলম্বী ঘনকুঞ্চিত গুম্ফ বৃদ্ধার যখন তখন মনে পড়িত। সে প্রত্যহ এই অভ্যাগত যুবকদিগকে তাহার পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিত।

তাহারা বলিত, "আমরা ত জানি না।" স্ত্রীলোকটির কষ্ট ও আন্তরিক অশান্তি দেখিয়া ও বহুদূরে স্বদেশে আপনাদের মায়ের মুখ ভাবিয়া, তাহারা শতসহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের দ্বারা বৃদ্ধাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত।

শত্রু হইলেও স্যাভেজের মা তাহাদিগকে বেশ ভালবাসিত। দরিদ্র কৃষকদিগের মনে মাতৃভূমির শত্রু বলিয়া জর্ম্মাণদিগের উপর বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয় না। এই প্রকার স্বদেশবাৎসল্য ও শত্রুহিংসা, অপেক্ষাকৃত ধনবানদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। যুদ্ধের সময়, দরিদ্রেরাই অধিক ব্যয়ভার বহন করে; কারণ দরিদ্রতা নিবন্ধন সামান্য অর্থ দান করিতেই তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। নূতনরক্তশোষী করদানান্তে তাহাদের ভাল করিয়া দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদন জুটিয়া ওঠে না। সমরক্ষেত্রে, বহুসংখ্যক বলিয়া তাহারাই পতঙ্গের ন্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সংগ্রামকালে পৃথিবীতে দুর্ব্বল ও নির্বিরোধী বলিয়া, দরিদ্রেরাই অতি তীক্ষ্ণ ও মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহারা স্বদেশবৎসলদিগের উৎসাহদীপ্ত বাক্যালাপের একটি বর্ণও বুঝিতে পারে না, আত্মসম্মানের কথা হইলে অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে, ও কূট-রাজনীতিসম্মত জাতিগত দলাদলি, তাহাদের নিকট এক অদ্ভুত অজ্ঞেয় পদার্থ।

গ্রামের লোকেরা স্যাভেজের মার বাটীতে অবস্থিত জার্ম্মাণদিগের কথা উল্লেখ করিয়া বলিত, "আহা! তাহারা বেশ শান্তিময় কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে!"

এক দিন বৃদ্ধা একাকিনী গৃহকার্য্য করিতে করিতে দূরে তাহার কুটীরাভিমুখী একটি লোককে দেখিতে পাইল। শীঘ্রই তাহাকে চিনিতে পারিল—সে গ্রামস্থ পোষ্ট-আফিসের পিয়ন্। তাহার নিকট হইতে স্বীয় নামাঙ্কিত একখানি পত্র লইয়া, চসমা বাহির করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল:—

"ম্যাডাম স্যাভেজ—আমার পত্রপাঠে এক শোচনীয় সংবাদ অবগত হইবে। তোমার পুত্র ভিক্টর কাল যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইয়াছে। একটি গোলা তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া চলিয়া যায়। যুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিলাম। সে তোমার কথা উল্লেখ করিয়া আমায় একটি অনুরোধ করিয়া যায়।—তাহার কোন অশুভ হইলে, আমি যেন তোমাকে সেই দিনই সংবাদ পাঠাই।

"আমি যুদ্ধাবসানে তোমাকে দিব বলিয়া তাহার ঘড়িটি খুলিয়া রাখিয়াছি।

"আমার প্রীতি নমস্কার জানিবে। "সিজার রিভো।

"২৩-সংখ্যক মার্চ্চিং রেজিমেণ্ট।"

পত্রখানি তিন সপ্তাহের পুরান।

তাহার চক্ষে জল আসিল না। সে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এখনও যেন যন্ত্রণা আরম্ভ হয় নাই। সে ভাবিল, "তবে ভিক্‌টর আর এ জগতে নাই।" তার পর একটু একটু করিয়া তাহার নয়নপ্রান্তে দু'এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল। প্রবল ঝঞ্ঝার ন্যায় দুঃখ আসিয়া এক দণ্ডের মধ্যে সমস্ত হৃদয়টা তোলপাড় করিয়া তুলিল। একটি একটি কথা মনে করিয়া তার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। সে আর ভিক্‌টরের মুখচুম্বন করিতে পাইবে না! পুলিসের লোকেরা তাহার স্বামীকে নিহত করিয়াছে— জার্ম্মাণেরা তাহার একমাত্র পুত্ররত্ন কাড়িয়া লইল। গোলা লাগিয়া ভিক্‌-টরের দেহ দ্বিখণ্ড হইয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে। সে যেন এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাহার চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছিল। মাথা ঢুলিয়া পড়িতেছে, জ্যোতিহীন চক্ষু দুটি নিথর দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। পূর্ব্বে রাগের মাথায় ভিক্‌টর যেরূপ গোঁপের কোণ কামড়াইত, সেইরূপ যেন গুম্ফাংশে দংশন করিতেছে।

ভিক্টরের মৃত দেহ লইয়া তাহারা কি করিয়াছে? বন্দুকের গুলিতে ক্ষত কপোলের সহিত তাহার স্বামীর রক্তাক্ত দেহ যেরূপ ফিরাইয়া দিয়াছিল, সেইরূপ শুধু যদি ভিক্টরের মৃত দেহ ফিরাইয়া দেয়!

সে পাশে কলরব শুনিতে পাইল। প্রুসিয়ানরা গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল। বৃদ্ধা কষ্টে চক্ষু মুছিয়া তাড়াতাড়ি পত্রখানি লুকাইয়া রাখিল। অন্যদিনের ন্যায় তাহাদিগকে শুভ সম্ভাষণ করিল।

তাহারা চারি জনে খুব হাসিতেছিল। একটি হৃষ্টপুষ্ট খরগোস পাইয়া, তাহাদের আহ্লাদের সীমা ছিল না। বলিতে হইবে না যে, সরল ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া, তাহারা এই খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করে নাই। তাহারা ইঙ্গিত করিয়া বৃদ্ধাকে বুঝাইতেছিল যে, ভাগ্যক্রমে আজ্ ভাল আহার্য্য জুটিয়াছে।

স্যাভেজের মা তাহাদিগের প্রাতরাশ প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। কিন্তু কোন ক্রমে সে আজ এই ক্ষুদ্র পশুটিকে বধ করিতে হৃদয়

বাঁধিতে পারিল না। পূর্ব্বে এই প্রকার প্রাণীবধ সে শত সহস্রবার করিয়াছে। অবশেষে এক জন সৈনিকের সবল মুষ্ট্যাঘাতে এই ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণবায়ু উড়িয়া গেল।

ত্বক্ উন্মোচন করিবার সময়, গরম রক্ত স্পর্শ করিয়া সে সভয়ে শিহরিয়া উঠিল। এই রক্ত ক্রমে শীতল হইয়া তাহার হস্তে জমিয়া যাইতেছিল। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল। সে যেন এই শোণিতাক্ত শশকের ন্যায়, তাহার পুত্রের ছিন্নবিচ্ছিন্ন রক্তাপ্লুত দেহ দেখিতে পাইতেছিল।

সে তাহাদের সহিত আহারস্থানে বসিল মাত্র, এক গ্রাসও তাহার মুখে উঠিল না। তাহারা হৃষ্টচিত্তে উদর পূরণ করিয়া আহার করিতেছিল। গৃহকর্ত্রীর দিকে তখন তাহাদের বড় লক্ষ্য ছিল না। বৃদ্ধা নিস্তব্ধ হইয়া অপাঙ্গে তাহাদিগকে দেখিতেছিল। যেন তাহার মনের মধ্যে কি একটা মতলব ঘুরিতেছিল। কিন্তু তাহার মুখে হৃদয়ের ভাব কিছুই প্রকাশ হয় নাই।

হঠাৎ সে বলিল, "দেখ! আমরা এক মাস এক সঙ্গে রহিয়াছি, কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত তোমাদের নাম জানিতে পারিলাম না।" তাহারা অনেক কষ্টে এই জিজ্ঞাসার অর্থ সংগ্রহ করিয়া আপনাদের নাম বলিল। কিন্তু তাহাতে বৃদ্ধা সন্তুষ্ট না হওয়ায়, একখণ্ড কাগজে স্ব স্ব পরিবারের ঠিকানাসম্বলিত নাম লিখিয়া দিল। বৃদ্ধা নাকে চসমা দিয়া অনেকক্ষণ সেই নূতন রকম বিদেশী অক্ষর দেখিল। তাহার পর কাগজখানি ভিক্টরের মৃত্যুসংবাদবাহী পত্রের সহিত মুড়িয়া একত্রে রাখিল।

আহার শেষ হইলে, স্যাভেজের মা বলিল, "তোমাদের জন্য আমি একটা কাজ করিব।"

গৃহের ভিতর এক কাষ্ঠমঞ্চের উপরে এই সৈনিকচতুষ্টয় শয়ন করিত। বৃদ্ধা সেখানে বীচালি বহিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধাকে তাহাদের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতে দেখিয়া, তাহারা একটু আশ্চর্য্য হইল। সে তাহার যত্নের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিল। যাহাতে এই দুরন্ত শীতে তাহাদের বেশি কষ্ট না হয়, এই তাহার ইচ্ছা। তাহারাও বীচালি সাজাইয়া চাল পর্য্যন্ত তুলিল। এই তৃণভিত্তির মধ্যে তাহারা সুখে নিদ্রা যাইতে পারিবে।

রাত্রে আহারের সময় স্যাভেজের মাকে খাদ্যসামগ্রী স্পর্শ করিতে না

দেখিয়া, এক জন তাহাকে খাইবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। বৃদ্ধা অসুখের ভান করিয়া আহার করিতে কোনপ্রকারে সম্মত হইল না। জার্ম্মাণ সৈনিকেরা সিঁড়ি দিয়া মঞ্চের উপর শয়ন করিতে উঠিলে, স্যাভেজের মা ভাল করিয়া অগ্নি জ্বালিয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহারা কাষ্ঠমঞ্চের ক্ষুদ্র দ্বার বন্ধ করিলে, বীচালির অন্বেষণে, এই রমণী, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাহির হইয়া রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিল। বরফের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পাছে কোন শব্দ হয় বলিয়া, সে পাদুকা গ্রহণ করে নাই। সে মধ্যে মধ্যে কান পাতিয়া সৈনিকচতুষ্টয়ের গম্ভীর, বিসম নাসিকা-গর্জ্জন শুনিতেছিল।

সমস্ত আয়োজন পূর্ণ দেখিয়া, সে সিঁড়ি সরাইয়া এক আঁটি বীচালি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর, সেই জ্বলন্ত বীচালি পূর্ব্বসংগৃহীত শুষ্ক তৃণরাশির উপর স্থাপন করিয়া, বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দু'এক মুহূর্ত্তের মধ্যে, কামারের হাপরের ন্যায়, সমস্ত ঘরটি আলোকিত হইয়া উঠিল। নাতিশুভ্র আলোকরশ্মি, ক্ষুদ্র গবাক্ষের ভিতর দিয়া বরফের উপর পড়িয়াছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই, গৃহের উপর হইতে মনুষ্যকণ্ঠজাত হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ শুনা গেল। মঞ্চের ক্ষুদ্র দ্বারখানি খসিয়া পড়িলে এক ঝলক আগুন কাষ্ঠমঞ্চ ভেদ করিয়া খড়ের চাল স্পর্শ করিল। বৃহৎ মশালের ন্যায় অগ্নিশিখা আকাশের দিকে উঠিল। ঘরখানি ধু ধু করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

আগুণের চট্ চট্ শব্দ ও ভিত্তিপতননিনাদ ভিন্ন আর কিছুই শুনা যাইতেছিল না। হটাৎ ধূমজালব্যাপ্ত চতুর্দ্দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইয়া, চালখানি মাটীতে পড়িয়া গেল।

গৃহদাহালোকে নিকটবর্ত্তী গ্রাম ও প্রান্তর, রক্তাভ রৌপ্যখচিত বস্ত্রের ন্যায় দেখাইতেছিল।

কোন দূর হইতে ঘণ্টার রব ভাসিয়া আসিতেছিল।

কুটীর হইতে একটী প্রাণীও যাহাতে বাহির হইতে না পারে, সেই জন্য, বৃদ্ধা স্যাভেজ-রমণী, পুত্রের বন্দুকটি স্কন্ধে রাখিয়া, কুটীরচত্বরে দাঁড়াইয়াছিল।

যখন দেখিল, সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে, সে বন্দুকটি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। ক্ষণমধ্যেই এক প্রচণ্ড শব্দ হইয়া উঠিল।

চারিদিক হইতে এই অগ্নিদাহস্থলে লোকসমাগম হইতেছিল।

সকলে আসিয়া দেখিল, বৃদ্ধা শান্ত হইয়া এক পতিত বৃক্ষকাণ্ডে বসিয়া আছে।

ফরাসীভাষাবিৎ একজন জার্ম্মান সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাকে তদীয় আলয়স্থিত সৈনিকচতুষ্টয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

সে নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নির দিকে হাত বাড়াইয়া, স্থির নিষ্কম্প স্বরে বলিল, "ঐখানে।"

তাহারা সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বোল্লিখিত জার্ম্মান সেনাপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া ঘরে আগুন ধরিল?" সে উত্তর দিল, "আমি ঘরে আগুন ধরাইয়া দিয়াছি।"

প্রথমে তাহার কথা কেহই বিশ্বাস করিল না। সকলে ভাবিল, এই অতর্কিত বিপদগ্রস্ত হইয়া সে পাগল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে সেই সাংঘাতিক পত্রপ্রাপ্তি হইতে জার্ম্মাণ যুবকদিগের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী অকপটে বর্ণনা করিল। সে একটিও ক্ষুদ্র কার্য্য বা অনুভূতি ভুলিয়া যায় নাই।

বক্তব্য শেষ হইলে, সে দুই খণ্ড কাগজ পকেট হইতে বাহির করিয়া, নির্ব্বাণোন্মুখ ক্ষীণ অগ্নির আলোকে চসমা দিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার পর একখানি কাগজ দেখাইয়া বলিল, "এইখানি ভিক্টরের মৃত্যু," অন্য একখানি কাগজ বাহির করিয়া ভস্মাবশিষ্ট গৃহের দিকে মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিল, "এই খানি ওদের নাম—তোমরা উহাদের মৃত্যু-সংবাদ বাটীতে লিখিয়া পাঠাইতে পার।" সে নির্ভয়ে জার্ম্মান সেনাপতির হস্তে দুই খণ্ড শুভ্র কাগজ অর্পণ করিল। প্রুসীয় সেনানী বৃদ্ধার স্কন্ধ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

"তোমরা এই চারি জন জার্ম্মান সৈন্যের মায়েদের কাছে এই সংবাদ পাঠাইবার সময় লিখিও যে, ভিক্টরের মা "Victroie Simon la Sauvage" এই কার্য্য করিয়াছে। কোন ক্রমে পত্র লিখিতে ভুলিও না।"

জার্ম্মান সেনাপতির আজ্ঞা পাইয়া, জন কয়েক লোক তাহাকে ধরিয়া উত্তপ্ত ভিত্তিমূলে দাঁড় করাইল। দ্বাদশ জন সৈনিক বিংশতি হস্ত দূরে বন্দুক লইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল। স্যাভেজের মা একটুও আপত্তি

প্রকাশ করিল না। সে সমস্ত বুঝিতে পারিয়া, এই ভবিতব্যের অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র।

সেনানীর সঙ্কেতবাক্যের সহিত বন্দুকের আওয়াজ শুনা গেল। একটা গুলি একটু পিছাইয়া পড়ায়, একাকী লক্ষ্যস্থানে ক ছুটিল।

বৃদ্ধা একবারে পড়িয়া গেল না। যেন কে খানি পিষিয়া দিয়াছে বলিয়া আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িল।

প্রুসীয় সেনানী কাছে আসিলেন। বৃদ্ধার দেহ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার ক্ষীণ শুষ্ক হস্তে একখানি রক্তাক্ত পত্র।

আমার বন্ধুবর আর একটা কথা বলিলেন,—

"জার্ম্মানরা এই হত্যার প্রতিশোধের নিমিত্ত আমার এই জনপদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাটীটি প্রায় ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া যায়।"

আমার শুধু এই চারি জন নিরীহ ভদ্র যুবকের মায়ের কথা মনে পড়িতেছিল। আর স্যাভেজ-জননীর বীভৎস বীরপনার কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিতেছিলাম।

আমি একখানি দগ্ধ প্রস্তরখণ্ড কুড়াইয়া লইলাম।

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

কালিদাস ও সেক্ষপীয়র।

(কালিদাস।)

গতবারে আমরা বৌদ্ধজগতের আলোচনা করিয়াছি; এবার অধ্যাত্মজগতের সমালোচনা করিব।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যে জগৎ বিবেকের (conscience) বিষয়ীভূত, তাহাই অধ্যাত্মজগৎ। এই বিবেকই ধর্ম্মেন্দ্রিয়; ইহা নীতিজ্ঞানের সাধন; বিবেক দ্বারা আমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করি, কি পাপ কি পুণ্য ইহার

নিশ্চয় করি, উচিত অনুচিত, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের তত্ত্ব উপলব্ধি করি। অতএব যে জগৎ ধর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাই অধ্যাত্মজগৎ।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, যাহাই অধ্যাত্মজগতের অন্তর্ভূত, তাহাই সুন্দর নহে। দানব ই- -।, দানবী রিগন্ অধ্যাত্মজগতের অন্তর্ভূত, অথচ সুন্দর নহে। অর্থাৎ -াত্মজগতের কতক অংশ, যে অংশ রূপেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাই সুন্দর।

এই অধ্যাত্মজগতের স্বরূপ কি? দৈহিক জীবন যেরূপ শারীরিক শক্তি ও প্রাকৃতিক শক্তির নিত্য সংগ্রাম, অধ্যাত্মজীবনও সেইরূপ পাপ ও পুণ্যের চির সমর। এ যুদ্ধে কোথাও পাপ জয়ী, কোথাও পুণ্য জয়ী; কিন্তু রণান্তে উভয়েই শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষত বিক্ষত। ইহা সেই পুরাণ কথা; হিন্দুর দেবাসুরের আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, পারসীর অহুর মস্‌দের ও অহিরমাণের ত্রিকালব্যাপী সমর, খৃষ্টানের ঈশ্বর ও সয়তানের স্বর্গ যুদ্ধ। সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালে পুণ্য পাপে মহারণ। জগৎ অযুত রসনায় ইহাই বিবৃত করিতেছে; এ রণ, সৃষ্টির আদি হইতে প্রলয়ের অন্ত পর্য্যন্ত চলিতেছে ও চলিবে। তবেই বুঝা গেল যে অধ্যাত্মজগতের স্বরূপ, পরস্পরবিরোধী পুণ্য শক্তি ও পাপ শক্তির মহা সমর।

এই শক্তিদ্বয় আবার কখন একই মানবের অন্তরাত্মায় অবস্থিত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে। কখন ভিন্ন ভিন্ন জীবকে আধার করিয়া রণ মুখে অগ্রসর হইতেছে। সেক্ষপীয়রের ম্যাকবেথ প্রভুপরায়ণ সাহসী বীরপুরুষ, শত যুদ্ধে বীরদম্ভে অসি আস্ফালিয়া, প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছে; কিন্তু আজ সে দুরাকাঙ্ক্ষার দাস হইল, বৃদ্ধ প্রভুর পলিত মুণ্ড ছেদন করিয়া রাজমুকুট নিজ শিরে পরিবার, আজ তাহার সাধ হইল। প্রভুভক্তি ও দুরাকাঙ্ক্ষার তুমুল সংগ্রাম বাধিল। দুরাকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিমতী হইয়া পিশাচিনী বেশে আশার আলোক দেখাইয়া তাহাকে প্রলোভিত করিল; দুরাকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিমতী হইয়া ম্যাকবেথপত্নী রূপে পৌরুষের ভাণ দেখাইয়া তাহাকে প্রোৎসাহিত করিল। দুর্ব্বল প্রভুভক্তি প্রবলের নিকট পরাভূত হইল। পাপের জয় হইল, পুণ্যের পরাজয় হইল। এ দৃষ্টান্তে পুণ্যশক্তি ও পাপশক্তি একই মানবের অন্তরাত্মায় অবস্থিত। আর একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। গনারিল ও রিগন পিতার প্রসাদে রাজরাণী হইয়া, সেই পিতাকেই বাত্যাবিকট তিমিরময়ী রজনীতে, অন্ধকার বনপথে নির্ব্বাসিত করিয়া, পিতৃ-প্রেমের প্রতিদান দিল; আর করডিলিয়া

পিতার শাসনে নির্ব্বাসিতা হইয়া সেই পিতারই রোগে শুশ্রূষা, নিরাশায় সান্ত্বনা ও বিপদে প্রাণপাত করিয়া পিতৃদ্বেষের প্রতিশোধ দিল। এ-ও সেই পুণ্য পাপের মহারণ। এ দৃষ্টান্তে পুণ্যশক্তি ও পাপশক্তি এক মানবে অবস্থিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবকে আশ্রয় করিয়াছে। এইরূপ অধ্যাত্মজগতের সর্ব্বত্র। যেখানেই অধ্যাত্মজীবন, সেখানেই পাপ পুণ্যের মহারণ। যেমন অন্ধকার ভিন্ন আলোক থাকিতে পারে না, প্রতিযোদ্ধা ভিন্ন যোদ্ধা থাকিতে পারে না, সেইরূপ পাপ ভিন্ন পুণ্য থাকিতে পারে না।

ভাবিয়া দেখুন, ইয়াগো ভিন্ন দেস্‌দিমোনা চরিত্র[১] অসিদ্ধ হয়; ক্লডিয়াস্ ভিন্ন হেমলেট[২] চরিত্র অসিদ্ধ হয়; আইক্যামো ভিন্ন ইমোজেন[৩] চরিত্র অসিদ্ধ হয়; মিফিস্‌টোফিলিস ভিন্ন ফাউষ্ট[৪] চরিত্র অসিদ্ধ হয়; অর্থাৎ পাপ ভিন্ন পুণ্য অসিদ্ধ হয়। সেই জন্য পুণ্যের কথা বলিতে গেলেই পাপের কথা পাড়িতে হয়। পুণ্যের চিত্র আঁকিতে গেলেই পাপের চিত্রের অবতারণা করিতে হয়। কবির কাব্যের আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হই। কিন্তু পুণ্য সুন্দর, পাপ অসুন্দর; পাপের চিত্র কুৎসিত, পুণ্যের চিত্র সৌন্দর্য্যময়। ইয়াগো কুৎসিত, দেস্‌দিমোনা সুন্দর; ক্লডিয়াস্ কুৎসিত, হ্যামলেট সুন্দর; আইক্যামো কুৎসিত, ইমোজেন সুন্দর; মিফিস্‌টফিলিস্ কুৎসিত, ফাউষ্ট সুন্দর। সেই জন্য আমরা দেখি, সেক্ষপীয়র গেটে প্রভৃতি যাঁহারা অধ্যাত্মজগতের ছবি আঁকিয়াছেন, তাঁহাদের কাব্যে সুন্দর ও অসুন্দরের পাশাপাশি সমাবেশ হইয়াছে; কদর্য্য ও সৌন্দর্য্য পরস্পর মিশ্রিত হইয়াছে; কেন না, পাপ ও পুণ্য মিশিয়া অধ্যাত্মজগৎ; একের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইলে অপরের অস্তিত্ব ধারণা করিতে হইবে, অথচ পুণ্য সুন্দর, পাপ অসুন্দর।

কিন্তু যিনি সৌন্দর্য্যের কবি, নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যই যাঁহার কাব্যের উপাদান, কদর্য্য কুৎসিত অসুন্দর যাঁহার কাব্যে স্থান লাভ করিতে পারে না, তাঁহার অধ্যাত্মজগতের চিত্র কেমন হইবে? অধ্যাত্ম জীবন চিত্রিত করিতে হইলে ত অসুন্দর ও সুন্দর, কদর্য্য ও সৌন্দর্য্য উভয়ের সমাবেশ চাই। আমরা অনুমান করিতে পারি যে, তাঁহার অধ্যাত্মজগতের চিত্র পূর্ণাবয়ব হইবে না; তিনি সুন্দরের কবি, অসুন্দর কোথা পাইবেন? পুণ্য সুন্দর

১। Shakespere's Othello. ২। His Hamlet.
৩। His Cymbeline. ৪। Goethe's Faust.

বটে, কিন্তু ইহা অসুন্দর পাপের সাহচর্য্য ভিন্ন থাকিতে পারে না। দেখুন, সমুদ্রের ফেণা কেমন শুভ্র, কেমন নির্ম্মল; কিন্তু ইহা তরঙ্গে তরঙ্গে বিকট বিলোড়ন হইতে উদ্ভূত। পুণ্যও সেইরূপ। কালিদাসের কাব্যের আলোচনা করিলে এই অনুমানই প্রমাণিত হয়। সেক্ষপীয়র গেটে প্রভৃতির কাব্যে যেরূপ অধ্যাত্মজগতের উজ্জ্বল প্রতিকৃতি পাই, কালিদাসের কাব্যে তাহা পাই না; কারণ তিনি সৌন্দর্য্যের কবি, অসুন্দরের সমাবেশ না হইলে অধ্যাত্মজগৎ সিদ্ধ হয় না। কালিদাসের কাব্যে ত ইয়াগো, ক্লডিয়াস্, আইক্যামো বা মিফিস্টফিলিসের স্থান হইবে না; তবে দেসদিমনা, হ্যামলেট, ইমোজেন ফাউষ্টের সম্ভাবনা হয় কিরূপে। এরূপ অঘটন ঘটন, প্রকৃতির বিপর্য্যয় কিরূপে হইতে পারে?

তবে কি কালিদাসে অধ্যাত্মজগতের আদৌ চিত্র নাই? তা' কেন? আছে; তবে সে ভিন্ন প্রণালীর।

আমরা ইতিপূর্ব্বে অধ্যাত্ম জীবনের যত উদাহরণ দেখিয়াছি, তাহার সকলই বিরোধী পুণ্যশক্তি ও পাপশক্তির সমর ক্রীড়ার দৃষ্টান্ত। শক্তিদ্বয় কোথাও একই মানবে অবস্থিত; কোথাও ভিন্ন ভিন্ন জীবকে আশ্রয় করিয়াছে। কিন্তু এমনও মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার অধ্যাত্ম জীবন স্বভাবজাত, স্বতঃসিদ্ধ, পুণ্যশক্তি ও পাপশক্তির সংগ্রামসিদ্ধ নহে। দুষ্মন্ত ক্ষত্রিয় রাজা, চিত্তসংযম তাঁহার চিরাভ্যস্ত। নদীর জলে স্রোত যেমন স্বভাবসিদ্ধ, তাঁহারও বুঝি চিত্তসংযম সেইরূপ। দুষ্মন্ত শকুন্তলার সাক্ষাৎ হইল, উভয়েই উভয়কে আত্মসমর্পণ করিলেন, কিন্তু মিলন হইল না। শকুন্তলা বিরহজ্বালায় জ্বলিয়া নলিনী-পত্র-শয্যায় শয়ন করিলেন, দুষ্মন্ত চন্দ্রকিরণে বিদগ্ধ হইয়া অনলপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। অনেক যাতনার পর মিলন হইল। কিন্তু মিলনের সুখাস্বাদ না ঘটিতেই গুরুজনের আগমনে শকুন্তলা অন্তর্হিত হইলেন; দুষ্মন্ত হতাশ হইয়া তাঁহার পদ্মমুখ, রক্তাধর ও চটুল নয়নের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার তখন চিত্তের অবস্থা কিরূপ? সহসা রাক্ষসত্রস্ত তাপসের আর্ত্তস্বর শুনিলেন। বিরহ বিষাদ, বিকল্প কোথায় লুকাইল; দুষ্মন্ত বীরদর্পে ভয়ার্ত্তের ত্রাণে অগ্রসর হইলেন।

এই যে চিত্ত সংযম, ইহা আধ্যাত্মিক জগতের উৎকৃষ্ট পদার্থ, ইহা অধ্যাত্ম জীবনের শ্রেষ্ঠ উপাদান, অতীব হৃদয়গ্রাহী, সৌন্দর্য্যময়। কিন্তু ইহা পাপ-

প্রবৃত্তির সহিত সংঘর্ষজাত নহে, ইহা স্বভাবজ, স্বতঃসিদ্ধ। এইরূপ অন্যত্র। যখনই আমরা কালিদাসে কোন সুন্দর উৎকৃষ্ট অধ্যাত্মতার সাক্ষাৎ পাইব, তখনই দেখিব যে ,তাহা অপকৃষ্ট অসুন্দর পাপশক্তির সহিত সংগ্রামের ফল নহে। তিনি সুন্দরের কবি, অসুন্দরের স্থান তাঁহার কাব্যে হইবে কেন? ইহা গেল বিরোধী শক্তিদ্বয়ের এক মানবাত্মায় অবস্থানের কথা। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মাকে আধার করিয়া পুণ্য ও পাপশক্তির সমরকাহিনী কালিদাস কোথায়ও বিবৃত করেন নাই, কারণ সে বিবরণে পুণ্যশক্তির সহিত পাপশক্তির সাহচর্য্য অবশ্যম্ভাবী ; পাপশক্তি অসুন্দর ; অসুন্দরের বর্ণন আমরা কালিদাসে পাইব কেন? ইহার একটা ধ্রুব প্রমাণ দিতেছি। নর-নারায়ণ রামচন্দ্রের অলৌকিক চরিত্রে অবশ্যই কালিদাস আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এমন সুন্দর চরিত্র আর কোন্ দেশে আছে? শীতল জল জমিয়া যেরূপ শীতলতা-ঘন তুষার হয়, রামচরিত্র সেইরূপ অধ্যাত্মতা-ঘন, আধ্যাত্মিকতাময়! বন্যার পঙ্কিল জল যেমন নভঃস্পর্শী গিরিচূড়া স্পর্শ করিতে পারে না, জগতের পাপশক্তি সেইরূপ ঐ মহাপুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই এ সুন্দর চরিত্রের বর্ণনায় কালিদাস রঘুবংশের ছয় সর্গ নিয়োজিত করিয়াছেন। তাড়কাবধ হইতে আরম্ভ করিয়া হরধনুঃভঙ্গ, ভার্গববিজয়, বনবাস, রাবণবধ, সীতা-উদ্ধার, মৈথিলী-বিসর্জ্জন, পুণ্যাশ্বমেধ, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন প্রভৃতি সকল লীলারই সুন্দর বর্ণনা আছে। কিন্তু কৈকেয়ীর ঈর্ষ্যারূপ যে পাপশক্তিকে ভিত্তি করিয়া রামচরিত্র গঠিত, যাহার বর্ণনে বাল্মীকি বহু অধ্যায় নিয়োজিত করিয়াছেন, তাহার সুধু উল্লেখ বই আর কিছুই নাই, কেন না, সে পাপশক্তি অসুন্দর।

কিন্তু এই পাপশক্তিকে বাদ দিলে অধ্যাত্মজগতের কতটুকু বর্ণনীয় থাকে? বলিয়াছি ত এই পাপশক্তি ও পুণ্যশক্তির নিত্য সংগ্রামই অধ্যাত্ম-জগতের স্বরূপ। ফলতঃ তাহাই ঘটিয়াছে ; বহির, অন্তর ও বৌদ্ধ জগতের সৌন্দর্য্য যেরূপ সৈকতের বালুকার ন্যায়, সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায়, রাশি রাশি অগণিত হইয়া কালিদাসের কাব্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, অধ্যাত্ম জগতের সৌন্দর্য্য সেরূপ নহে। তবে যাহা আছে, তাহা অতীব মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী। একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। অপুত্রক দিলীপ রাজা পুত্রকামনায় বশিষ্ঠাশ্রমে উপনীত হইলেন। ঋষি ধ্যানযোগে জানিলেন যে, গো-রাণী সুরভির অভিশাপই রাজার পুত্রলাভের অন্তরায় হইয়াছে। জানিয়া শাপমোচনার্থে

আশ্রমধেনু সুরভিবৎসা নন্দিনীর সেবায় দিলীপকে নিযুক্ত করিলেন। ধনুর্ধারী রাজা ছায়ার মত বনে বনে নন্দিনীর অনুসরণ করিতে লাগিলেন। দাবানল জ্বলিয়া নির্ব্বাপিত হইত, বৃষ্টি ঝরিয়া উপশান্ত হইত; অরুণ উষা, লোহিত সন্ধ্যায় পরিণত হইত, কিন্তু রাজা নন্দিনীর সেবায় বিরত হইতেন না। এইরূপ কতদিন বহিয়া গেল। একদিন নন্দিনী স্বেচ্ছাসুখে বিচরণ করিয়া তৃণাচ্ছন্ন হিমালয় গহ্বরে প্রবেশ করিল। রাজা অন্য মনে বনশোভা দেখিতে দেখিতে সঙ্গে চলিলেন। সহসা নন্দিনীর করুণ চীৎকারে গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত হইল। দিলীপ চাহিয়া দেখিলেন,—ভীষণ সিংহ নন্দিনীকে আকর্ষণ করিতেছে। রাজা ধনুকে শরসন্ধান করিতে গেলেন, হস্ত অবশ হইল; রোষে ক্ষোভে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। সিংহ মানুষের স্বরে কথা কহিয়া বলিল, "মহারাজ! বৃথা এ সাধনা; আমি দেব সিংহ, মানুষের অস্ত্রাঘাতে আমার কি হইবে। আজ, বিধিবশে পর্য্যাপ্ত আহার মিলিয়াছে, অতএব ধেনুটি আমায় দিয়া প্রস্থান করুন।" শরণাগত-বৎসল্ রাজা নিজের শরীর বিনিময়ে নন্দিনীর মোচন ভিক্ষা করিলেন। সিংহ হাসিয়া বলিল, "মহারাজ! তোমার একি বুদ্ধি? সমৃদ্ধ রাজ্য, ধরার ইন্দ্রত্ব, নবীন যৌবন, এই বর বপু; সামান্য ধেনুর জন্য এ সকল জলাঞ্জলি দিতেছ? তুমি বাঁচিলে, কোটী প্রজার মঙ্গল, তুচ্ছ গো-জীবনে ফল কি?" কে শুনে? দিলীপ ক্ষত্রিয় রাজা, বিপন্নার্ত্তিহর; জড়দেহ বলি দিয়া শরণাগতরক্ষণে প্রস্তুত হইলেন। সসাগরা পৃথিবীর একেশ্বর ভোগলালিত নবীন রাজদেহ অকিঞ্চিৎ মাংসপিণ্ডের মত সিংহের গ্রাসে তুলিয়া দিলেন। সিংহ উৎকট লম্ফপ্রদানে উদ্যত হইল। সহসা ইন্দ্রজাল অপসৃত হইল। মায়াসিংহ, মায়াবন সকলি অন্তর্হিত হইল; সুধু দিলীপ রাজা ও দেবধেনু নন্দিনী; দেববালারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল।

অধ্যাত্মজগতের এ চিত্র অতি সুন্দর; কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও এক সুন্দর চিত্র চন্দ্রনাথ বাবু * কালিদাস হইতে বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছেন। সে চিত্র এইরূপ;—"পতির জন্য সীতাদেবী কত কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। অবশেষে যখন পরীক্ষার পর পরীক্ষার নিমিত্ত দেবীকে, রাম চন্দ্রের সেই প্রজামণ্ডলী

* নবজীবনে ষোড়শোপচারে পূজা নামক প্রবন্ধ দেখ।

পরিবেষ্টিত বিরাট সভায় আনয়ন করা হইল, তখন দেবীর মুখে একটি কথা নাই—রাগের ক্ষোভের বা অভিমানের শব্দটি মাত্র নাই। তখন দেবীর—

কাষায়পরিবীতেন স্বপদার্পিতচক্ষুষা।
অন্বমীয়ত শুদ্ধেতি শান্তেন বপুষৈব সা॥

রক্তবস্ত্রে তাঁহার শরীর আচ্ছাদিত, নিজপদে দৃষ্টি সংলগ্ন, তিনি যে পবিত্র-স্বভাবা, তাহা তাঁহার সেই শান্ত মূর্ত্তিতেই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

তাঁহার শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া উপস্থিত প্রজামণ্ডলী আপনাদের প্রচারিত নিন্দাবাদের কথা মনে করিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

মহর্ষি বাল্মীকি প্রজাগণের সন্দেহ নিরাকৃত করিতে দেবীকে অনুমতি করিলেন। কোমলতাময়ী কামিনী আর কত সহ্য করিবে? দেবী কহিলেন, "যদি আমি কায়মনোবাক্যে পতি হইতে বিচলিত হইয়া না থাকি, তবে দেবি বিশ্বম্ভরে আমাকে অন্তর্হিত কর!" পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া গেল; ভিতর হইতে বিদ্যুৎপ্রভা উথলিয়া উঠিল। সেই প্রভারাশির মধ্যে এক অপূর্ব্ব সিংহাসনোপরি স্বয়ং দেবী বসুন্ধরা উপবিষ্টা। দেবী বসুন্ধরা দুঃখিনী সীতাকে কোলে করিয়া অন্তর্হিত হইতেছেন। তখন সীতা কি করিতেছেন?

সা সীতামঙ্কমারোপ্য ভর্ত্তৃপ্রণিহিতেক্ষণাং।
মামেতি ব্যাহরত্যেব তস্মিন্ পাতালমভ্যগাৎ॥

তখনও সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত বসুন্ধরা সীতাকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং রাম 'না না' ইহা বলিতে না বলিতেই রসাতলে প্রবেশ করিলেন।

তখনও সীতার নয়নদ্বয় পতির প্রতি স্থিরীকৃত। বল দেখি, এমন চিত্র, পতিভক্তির এমন ভাব আমাদের কার মনে আছে?" আমাদের কাহার ত মনে নাই-ই; জগতের অন্য দেশের অন্য কবির কল্পনায় কখন ছিল কি না সন্দেহ। বাস্তবিক এ আধ্যাত্মিক চিত্রের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। অবিচারের এমন মধুর প্রতিদান, অত্যাচারের এমন ললিত প্রতিশোধ, জগতের অন্য কোন কাব্যে নাই।

পার্ব্বতীর পঞ্চতপও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পার্ব্বতী উমা, হিমালয়ের দুহিতা। পিতা হিমালয় তাঁহাকে শিবের উদ্দেশে বরণ

দেহমাধুরী, প্রকৃতির মাধুরীকে সহায় করিয়া দৈহিক উপায়ে কামের সাহায্যে শিবের মন ভুলাইতে আসিল। কিন্তু যোগীবর মহাদেব, তাহাতে ভুলিলেন না; কাম এক হুঙ্কারে ভস্মীভূত হইল, রতি নৈরাশে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল; বসন্ত মলয় পবন লইয়া সে বন ছাড়িয়া পলাইল, উমা লজ্জাবতী, শূন্য মনে পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু হৃদয়ব্যাপী প্রেম, সে ত যাইবার নয়। উমা আধ্যাত্মিক উপায়ে তপস্যার সাহায্যে পতিলাভে উদ্যত হইলেন। কোমল শিরীষ ফুল পতত্রীর পদ সংস্পৃষ্ট হইল। উমা চন্দনচর্চ্চিত হার ফেলিয়া বক্ষে বল্কল বাঁধিলেন; ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ-কলাপে জটা রচনা করিলেন; রত্নমেখলা খুলিয়া তৃণময় কাঞ্চী পরিধান করিলেন; কন্দুকক্রীড়া ভুলিয়া অক্ষসূত্র ধারণ করিলেন; কোমল পুষ্পশয্যা ছাড়িয়া কঠিন পাষাণে শয়ন করিলেন; মহার্ঘ বসন ত্যজিয়া জীর্ণ বল্কল ধারণ করিলেন। কিন্তু তাহাতেও মনোরথ সিদ্ধ হইল না। তখন দেহ পণ করিয়া উৎকটতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। অনাহারে কেবল অযাচিত জল ও চন্দ্ররশ্মি পান করিয়া জীবন ধারণ করিলেন। গ্রীষ্মের প্রখরতায় চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহি-লেন। বর্ষার মেঘাড়ম্বরে বাত্যাহত, ধারা-তাড়িত হইয়া বিদ্যুৎ উন্মেষ চকিতে শিলাতলে শয়ন করিয়া রহিলেন। শীতের হিমানীতে তুষার বৃষ্টি সহিয়া হিমানিলপৃষ্ট হইয়া আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া রহিলেন। মৃণাল-কোমল সুখলালিত বর অঙ্গে এইরূপে তপস্বীর অধিক তপঃক্লেশ সহ্য করি-লেন। শেষ মনোরথ সিদ্ধ হইল। হরগৌরী মিলিত হইলেন।

ভাবিয়া দেখিলে এই হরগৌরীমিলনের একটা গভীর গূঢ় অর্থ উপলব্ধি হয়। এ মিলন সেই সাংখ্যের 'প্রকৃতিতে পুরুষের মিলন মহান্,' বই আর কিছুই নয়। সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, জগৎ জীবশক্তি (পুরুষ) ও জড়শক্তি (প্রকৃতি), এই উভয়ের অপূর্ব্ব মিশ্রণে গঠিত। সাংখ্য-কার আরও বলেন যে, এই প্রকৃতিপুরুষের মিলন পুরুষার্থ, অপবর্গ, মোক্ষের নিমিত্ত। এ মিলন আধ্যাত্মিক, মানব মানবীর দৈহিক মিলনের মত ইহাতে কামের কণিকামাত্র নাই, অথচ ইহাতে উৎকৃষ্ট ফল, মোক্ষ (কুমার-সম্ভবের কার্ত্তিকেয় যিনি হরগৌরীর মিলনে জন্মিয়া দেবতাদিগকে পাপাসুর তারকের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন) প্রসূত হইতেছে। এই গূঢ় দার্শনিক

মধুর পরিণয় সঙ্গীত। অতএব কুমারসম্ভব এক উচ্চ অঙ্গের কবিতাময় কল্পনারূপক (Allegory)।*

মিলটন্ একস্থলে স্পেন্সরের প্রশংসায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার কবিতায় শব্দের সাধারণ অর্থের পশ্চাতে একটা গূঢ় অর্থ লুক্কায়িত আছে। (where more is meant than meets the ear) বাস্তবিক সকল শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যেই এইরূপ একটা একটা ব্যঙ্গ্যার্থ (Allegorical) নিহিত থাকে। ক্ষুদ্র কবিরা যেমন শব্দের দ্ব্যর্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হন, শ্রেষ্ঠ কবিরা তেমনি অর্থের দ্ব্যর্থ প্রতিপাদন করেন। ওডেসি, ফেয়ারিকুইন্, হ্যাম্লেট, টেম্পেষ্ট, ফাউষ্টের পাঠকের কাছে এ কথা সপ্রমাণ করা অনাবশ্যক। ঐ সকল কাব্যেরই বাচ্যার্থের পশ্চাতে, সমাজতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্বের একটা গূঢ় ব্যঙ্গ্যার্থ প্রচ্ছন্ন আছে। আমরা দেখিলাম, কালিদাসের কুমারসম্ভবেও তাহাই।

এই কল্পনারূপকের (Allegory) উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য কবি স্পেন্সরের ফেয়ারি কুইন (Færy Queen)। এই কবির রূপক প্রণালীর সহিত কালিদাসের রূপক প্রণালীর তুলনা করা যাক্। সকল পাশ্চাত্য সমালোচকই স্বীকার করেন যে, স্পেন্সার রূপকের অবতারণা করিয়া সরস কবিতা নীরস করিয়াছেন ;—ঐ রূপকের ভারে তাঁহার কবিতা প্রপীড়িত। রসহীন, দুর্ব্বোধ্য, অসম্বদ্ধরূপকে তাঁহার কাব্যের যথেষ্ট হানি হইয়াছে।

এক জন সমালোচক লিখিয়াছেন—"হাজ্লিটের উপদেশ এই যে স্পেনসরের রূপক অবহেলা করিয়া 'পরীরাণী' কাব্য পাঠ করিলে আর নীরস লাগিবে না ; কিন্তু ইহাতে যে বিরক্তির কারণ রহিয়াছে, তাহার উপায় কি? ঐ রূপক অনিচ্ছাসত্ত্বেও পুনঃপুনঃ আমাদের আক্রমণ করে, অনিচ্ছাসত্ত্বে লোকেরা যেরূপ ধর্ম্মমন্দিরে নীত হইত। রূপকের উৎকৃষ্ট উদাহরণ ওডেসি কাব্য ; ইহা আমরা সরস কাব্য বলিয়া অধ্যয়ন করি ; কিন্তু অবশেষে ইহার দ্ব্যর্থ উপলব্ধি করিয়া নূতন কাব্যামোদ আস্বাদন করিতে থাকি †।"

---

* শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু তাঁহার 'প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত' প্রবন্ধে কুমারের আর এক প্রকার আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়াছেন।

† Hazlitt bids us not mind the allegory and says it won't lite us nor meddle with us, if we do not meddle with it. But how if it bore us, which is after all the fatal question? The truth is that it is too often forced upon us against our will

যাঁহারা কুমারসম্ভব পাঠ করিয়াছেন, তাহারা নিঃসংশয়ে স্বীকার করিবেন যে, সমালোচক যে কারণে পরীরাণীর উপর বিরক্ত, তাহার কোন লক্ষণই কালিদাসের কাব্যে নাই, অথচ ওডেসির দ্ব্যর্থ-সরসতা পূর্ণমাত্রায় আছে। এরূপ সুন্দর সরস কাব্য জগতে বিরল। আর একটা কথা বলিয়া প্রবন্ধের এ অংশের উপসংহার করি। কুমারের সহিত এক অংশে মিল্‌টনের স্বর্গ-চ্যুতির তুলনা হয়। উভয় কাব্যই অতিপ্রকৃত উপাদানে রচিত। কুমারের চরিত্র একজনও মানব নহে। হরগৌরী, হিমালয়, সপ্তর্ষি, কাম, রতি, বসন্ত ইত্যাদি ইহার নায়ক নায়িকা। স্বর্গচ্যুতিরও ঐরূপ। ঈশ্বর, সয়তান, দেব, দানব, পাপ, মৃত্যু, আদম ইব প্রভৃতি চরিত্র লইয়া ইহা গঠিত। এই অতিপ্রকৃতের অবতারণায় কালিদাসের কবিতাময় কৌশলের কাছে মিল্‌টন পরাজিত। বঙ্কিম বাবু যথার্থ বলিয়াছেন—"দেব চরিত্র প্রণয়নে কালিদাস মিল্‌টন অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কবিত্ব ধরিতে গেলে প্যারেডাইস্ লষ্ট (স্বর্গচ্যুতি) হইতে কুমারসম্ভব অনেক উচ্চ। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব কোন ভাষার কোন মহাকাব্যে আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কৌশলের কথা ধরিতে গেলে মিল্‌টন্ অপেক্ষা কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। প্যারেডাইস্ লষ্ট পাঠে শ্রম বোধ হয়; কুমারসম্ভব আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ এই যে, কালিদাস কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্য্যবিশিষ্ট করিয়াছেন,"—কেন না, তিনি সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার অমানুষী সৌন্দর্য্যদৃষ্টি।

ক্রমশঃ।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

---

as people were formerly driven to church till they began to look on a day of rest as a penal institution. The true type of the allegory is the *Odyssey*, whieh we read without suspicion as true poem and then find a new pleasure in divining its double meaning as if we somehow got a better bargain of our author than he meant to give us.

Lowell. *The English Poets.*

ঘনশ্যাম দাস।

ভক্তিরত্নাকরে ঘনশ্যাম নিজের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ঃ—

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ব বাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁহার শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম'
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হৈতে হৈনু উদাসীন।
মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রি দিন॥
দয়ার সমুদ্র ওহে বৈষ্ণব গোঁসাই।
বেদে গায় তুয়া কৃপা বিনে আর গতি নাই॥
নরহরি কহে এই কৃপা কর মোরে।
নিরন্তর ডুবি যেন ভক্তিরত্নাকরে॥

ভক্তিরত্নাকর একখানি বৃহৎ গ্রন্থ। মহাপ্রভুর পরিকরগণের ও তৎ-পরবর্ত্তী বৈষ্ণব মহান্তগণের জীবনচরিতে পরিপূর্ণ। পঞ্চদশ তরঙ্গে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। এক এক তরঙ্গের শেষে এইরূপ ভণিতা আছে।

শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥

ভক্তিরত্নাকর মুদ্রিত হইয়াছে কি না, জানি না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়া মুদ্রিত গ্রন্থ কোথাও পাই নাই। আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া অমৃত-বাজার পত্রিকা সম্পাদক ভক্তপ্রবর শিশিরকুমার ঘোষ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথিখানি আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন; সেই পুস্তক হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত সংবাদগুলি সংগ্রহ করিলাম। শিশির বাবু আরো লিখিয়াছেন,—"ঘনশ্যাম নরহরির নিবাস কাটোয়ার নিকট। সম্ভবতঃ তাঁহার বংশীয়েরা অদ্যাপি আছেন। ইনি বড় অধিক দিনের লোক নহেন।" কাটোয়ার অধিবাসী কোনও মহাত্মা যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক নরহরির বংশবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া দেন, আমরা বড়ই বাধিত হইব।

বোধ হয়, গৌরচরিত্রচিন্তামণি সমাপ্ত করিয়া, ঘনশ্যাম ভক্তিরত্নাকর লিখিয়াছিলেন, এবং নরোত্তমবিলাস ভক্তিরত্নাকরের পরে লিখিত।

ভক্তিরত্নাকরের মত একখানি গ্রন্থ লিখিতে কত সময় যায়। কত অনুসন্ধান করিয়া, কত গ্রন্থ আলোচনা করিয়া, কত প্রাচীন প্রবাদ সংগ্রহ করিয়া, একখানি গ্রন্থ তাঁহাকে লিখিতে হইয়াছিল। যখন স্মরণ হয়, ভক্তি-

রত্নাকর ভিন্ন ঘনশ্যাম ছন্দসমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয়, গৌরচরিত্রচিন্তামণি, প্রক্রিয়া-পদ্ধতি ও নরোত্তমবিলাস লিখিয়াছেন, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হই। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনি গবেষণা, তেমনি লিখিবার উৎসাহ।

আমরা নরহরির জন্মস্থান, জাতি, কুল ও তৎকৃত গ্রন্থের পরিচয় এই তিন প্রবন্ধে সংগ্রহ করিয়াছি। তাঁহার আবির্ভাবকাল নিঃসন্দেহরূপে অবধারণ করিতে পারি নাই, আমার বিশ্বাস, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, ঘনশ্যাম দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। তাঁহার কৃত গ্রন্থের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র কাগজে একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। এটি কোন গ্রন্থে নাই। এ কবিতাটি রক্ষা হয়, এই অভিলাষে, এখানে তাহা সংগ্রহ করিয়া দিলাম। ইহা হইতে তাঁহার কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। এখনও লোকে ঘরের বিদ্যাপতিকে পরের করিয়া রাখিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষার আদর এখনও শিখে নাই। কিন্তু এক দিন আসিতেছে যখন আমাদের বংশধরেরা এই প্রাচীন মহাত্মাদিগের একটি কথার জন্য লালায়িত হইবে।

জয় জয় রাধা রাসবিহারিণী!
খঞ্জননয়নী রমণিমণিমোহিনী গিরিবরধর ধৃতিভঞ্জনকারিণী ॥ ধ্রু ॥
চন্দবদনী অভিরামিনী ভামিনী দামিনী তন ঘন অম্বর ধারিণী।
বৃন্দাবনবিলাসিনী শ্যামঘনমনহারিণী রসময়ী সুকুমারীণী ॥ ১ ॥

আজু রজনী শেষ সময় সুখ সমাজ সাজে।
কিন্নর কুল তুলহ তান, কীর নিকর করত গান,
কোকিল কুলকলিত পঞ্চম স্বর বাজে ॥ ধ্রু ॥
বিকসিত নব কুসুমকুঞ্জ, তাহি মধুকর পুঞ্জ পুঞ্জ,
গুঞ্জত অলি মঞ্জুল জনু মধুর যন্ত্ররাজে ॥
ষড়যুত গমক সুধঙ্গ; উঘত ধিধিকট ধিণঙ্গ,
নৃত্যত শিখী নিরখত সুরনর্ত্তকীগণ লাজে ॥
হংস করত সাধুধ্বনি, ক্রৌঞ্চ ধৈর্য্য তেজত শুনি,
অঙ্কুর ছল পুলক বল্লিভরভূমি নমিতাজে ॥
অদ্ভুত উহ প্রেমমাতি, নাচত যত কপোত পাঁতি,
ঘুঘুইতি শব্দ ছদ্ম হুঙ্কৃতি ঘন গাজে ॥
পবনমিস সিংগার্ হার, ধুলত পল্লব রিঝ অপার,
কুসুম মিস পরাণ মোতি রিঝ দেত ত্রাজে ॥
যব আস বিন্দ পরত, জনু আনন্দ-অশ্রু ঝরত
নরহরি ভণ অনুপম নদিয়াপুর মহি মাঝে ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় গানটি ভৈরব রাগে গাওয়া যায়।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রা[illegible]

সাধনা।

নানাবিষয়িণী মাসিক পত্রিকা।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

আকার ক্রাউন্ ১৬ পেজী ৮০ পৃষ্ঠা।

(১৫ই অগ্রহায়ণ হইতে দ্বিতীয় বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।)

বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। ডাকমাশুল ওজন দশ তোলার অধিক হওয়ায় ৸৹ বারো আনা। অগ্রিম মূল্য ও মাশুল ব্যতীত কাহাকেও কাগজ পাঠান হয় না।

১৫ই কার্ত্তিক সাধনার এক বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম বর্ষ ১১০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। অল্পসংখ্যক এখনও অবশিষ্ট আছে। মূল্য ২৲ টাকা, মাশুল ॥৴৹ নয়আনা।

প্রথম বর্ষের সাধনা (দুই খণ্ডে বিলাতী বাঁধাই)। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৸৹ এবং মাশুল ।৹ চারিআনা।

যাঁহারা গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
কার্য্যাধ্যক্ষ।
৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, কলিকাতা।

মধুচ্ছন্দার সোমযাগ।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, মধুচ্ছন্দা ঋগ্বেদী ঋষিগণের মধ্যে এক-জন নবীন ঋষি। মধুচ্ছন্দার সমকালে দেবরাত, কড, রেভ প্রভৃতি অনেক ঋক্‌রচনাকারী ঋষি বিদ্যমান ছিলেন। মধুচ্ছন্দার পিতা ঋষি বিশ্বামিত্র, তাঁহার পিতার গুরু বৃদ্ধ জমদগ্নি ঋষি, পিতামহ ঋষি গাথী এবং আর একজন পূর্ব্বপুরুষ ইষীরথের পুত্র কুশিক, বহুতর ঋক্ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের সমকালে পিজবলের পুত্র দিগ্বিজয়ী যে সুদাস নামক রাজা পঞ্জাব দেশে সাম্রাজ্য করিয়া গিয়াছেন, যিনি স্বীয় অশ্বমেধ যজ্ঞে বিশ্বা-মিত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ঋগ্বেদে প্রকাশ, সেই সুদাসও একজন "রাজর্ষি" ছিলেন, এবং তাঁহার রচিত ঋক্‌মন্ত্রও অদ্যাপি বিদ্যমান। আর এই সমস্ত ঋক্‌মন্ত্রের পূর্ব্বে নিবিদ্ নামে একজাতীয় প্রাচীন উপাসনামন্ত্রও বিদ্যমান ছিল। মধুচ্ছন্দার সূক্ত সকলের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে হইলে, তাঁহার সমকালবর্ত্তী ও পূর্ব্বতম ঋষিদের ঋক্‌মন্ত্র ও নিবিদ্‌মন্ত্রের সহিত পরিচয় থাকা নিতান্ত আবশ্যক। পিতৃপিতামহাদির মন্ত্র সকল নিশ্চয়ই মধুচ্ছন্দার কণ্ঠস্থ ছিল। নিবিদ্ সকলের সহিত নিশ্চয়ই তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার সময়ে বেদ একটি মন্দির-রাজিপরিবৃত, নবরত্ন-শোভিত প্রশস্ত দেবায়তনের ন্যায় বিদ্যমান ছিল; তিনি তাহারই এক প্রান্তে, আপনার মনের মত একটি ক্ষুদ্র ভজনালয় নূতন নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন মাত্র।

এক্ষণে মধুচ্ছন্দার "সূক্ত" সকল আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, ঋগ্বেদের ভাষা সম্বন্ধে এবং ঋগ্বেদরচনাকারী ঋষিদের সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৭১ সূক্তে যাহা উক্ত হইয়াছে—তাহা পাঠকবৃন্দের প্রণিধানের যোগ্য। আমি এই সূক্তটিকে ঋগ্বেদের অর্থাববোধের পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয় মনে করি। আমার বিবেচনায়, এই সূক্তটি বেদপাঠের প্রবেশিকাস্বরূপ গণ্য হওয়া উচিত। তজ্জন্য আমি ইহার কেবল অনুবাদ দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কেন না, আমার অনুবাদ ঠিক হইল কি না হইল,—বিচক্ষণ পাঠক-বৃন্দের বিবেচনা করা উচিত। তজ্জন্য প্রথমে এই সূক্তটির মূল ও তাহার

সংস্কৃত অন্বয় দিতেছি। পরে, শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যেরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, এবং আমি যেরূপ অনুবাদ করিতে চাহি, তাহা পাশাপাশি দেওয়া হইবে। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৭১ সূক্ত এই ;—

> বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎ প্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
> যদ্ এষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎ প্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ॥ ১॥

অন্বয়। হে বৃহস্পতে! যদ্ বাচঃ অগ্রং (তৎ) নামধেয়ং দধানাঃ প্রথমং প্রৈরত। যদ্ এষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রম্ আসীৎ, তদেষাং গুহা বিঃ নিহিতং (বাচঃ শেষং) প্রেণ (প্রেরয়)॥ ১॥

> সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র ধীরা মনসা বাচমক্রত।
> অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি॥ ২॥

অন্বয়। তিতউনা সক্তুমিব, যত্র ধীরাঃ মনসা পুনন্তঃ বাচম্ অক্রত, অত্র সখ্যানি সখায়ঃ জানতে। এষাং বাচি ভদ্রা লক্ষ্মীঃ অধি নিহিতা॥ ২॥

> যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয়ম্ আয়ন্ তাম্ অন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্টাম্।
> তামাভৃত্যা ব্যদধুঃ পুরুত্রা তাং সপ্তরেভা অভি সং নবংতে॥ ৩॥

অন্বয়। যজ্ঞেন ইয়ং বাচঃ পদবীয়ম্ আবয়ন্ (ঋষয়ঃ ইতি শেষঃ)। অনু (পশ্চাৎ) ঋষিষু প্রবিষ্টাং তাং (বাচঃ পদবীং) অবিদন্ (ইতরে জনা ইতি শেষঃ)। তাম্ আভৃত্য (আহৃত্য) পুরুত্রা (বহুষু স্থানেষু) বি+অদধুঃ (পণ্ডিতাঃ ইতি শেষঃ)। সপ্ত রেভাঃ (ছংদাংসি) তাং অভি সং নবংতে॥ ৩॥

> উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্ উত ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোতি এনাম্।
> উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥ ৪॥

অন্বয়। ত্বঃ (একঃ) উত এনাং বাচম্ পশ্যন্ ন দদর্শ; ত্বঃ উত এনাং বাচং শৃণ্বন্ ন শৃণোতি। সুবাসাঃ উশতী জায়া পত্যে ইব ত্বস্মৈ উত তন্বং বিসস্রে (ইয়ং ঋষিপ্রণীতা বাক্ ইতি শেষঃ)॥ ৪॥

> উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীতমাহুর্নৈনং হিন্বংতি অপি বাজিনেষুঃ।
> অধেন্বা আচরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাঁ অফলাম্ অপুষ্পাম্॥ ৫॥

অন্বয়। সখ্যে (বিষয়ে) উতত্বং স্থিরপীতমাহুঃ (পণ্ডিতা ইতি শেষঃ)। অপি (চ) বাজিনেষু ন এবং হিন্বংতি (পণ্ডিতাঃ ইতি শেষঃ)। (যো ন তাদৃশঃ স্থিরপীতঃ স) এষ (অন্যো জনঃ) অফলাং অপুষ্পাং বাচং শুশ্রুবান্ মায়য়া অধেন্বা (কর্ম্ম ইতি যাবৎ) আচরতি॥ ৫॥

যস্তিত্যাজ সচিবিদং সখায়ং নতস্য বাচি অপি ভাগো অস্তি।
যদীং শৃণোতি অলকং শৃণোতি নহি প্রবেদ স্বকৃতস্য পন্থাম্॥ ৬॥

অন্বয়। যঃ সচিবিদং সখায়ং তিত্যাজ,তস্য বাচি অপি (কিমুত যজ্ঞকর্ম্মণি) ন ভাগোঽস্তি। যৎ (যদা) ঈং (ইমাং বাচং) শৃণোতি অলকং শৃণোতি। হি (যস্মাৎ) সুকৃতস্য পন্থাং ন বেদ॥ ৬॥

অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়োঃ মনোজবেষু অসমা বভূবুঃ।
আদঘ্নাস উপকক্ষাস উ ত্বে হ্রদা ইব স্নাত্বা উ ত্বে দদৃশ্রে॥ ৭॥

অন্বয়। অক্ষণ্বংতঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ঃ মনোজবেষু অসমা বভূবুঃ। ত্বে উ (কস্মিংশ্চিৎ জনে পুনঃ) আদঘ্নাস উপকক্ষাস (ইব দদৃশ্রে) ত্বে উ স্নাত্বা হ্রদা ইব দদৃশ্রে॥ ৭॥

হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু যদ্ ব্রাহ্মণাঃ সংযজংতে সখায়ঃ।
অত্রাহ ত্বং বি জহুর্বেদ্যাভিরা উহ ব্রাহ্মণো বিচরংতি উ ত্বে॥ ৮॥

অন্বয়। যৎ (যদা) ব্রাহ্মণাঃ সখায়ঃ হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু (মন্ত্রেষু) সংযজন্তে অত্রা (অত্র) হ বেদ্যাভিঃ (সহ) ত্বং বিজহুঃ (মন্ত্রা ইতি শেষঃ); উহ ত্বে ব্রহ্মাণঃ আ বিচরংতি॥ ৮॥

ইমে যে নার্বাঙ্ন পরশ্চরন্তি ন ব্রাহ্মণাসো ন সুতেকরাসঃ।
ত এতে বাচম্ অভিপদ্য পাপয়া সিরীস্তংত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ॥ ৯॥

অন্বয়। যে ইমে ন অর্বাক্ ন পরঃ চরংতি, ন ব্রাহ্মণাসঃ ন সুতেকরাসঃ, তে এতে পাপয়া (রীত্যা) বাচম্ অভিপদ্য অপ্রজজ্ঞয়ঃ সিরীঃ ভবন্তি তন্ত্রং তন্বতে॥ ৯॥

সর্ব্বে নন্দন্তি যশসাগতেন সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ।
কিল্বিষস্পৃৎ পিতুষণির্হ্যেষাং অরং হিতো ভবতি বাজিনায়॥ ১০॥

অন্বয়। সর্ব্বে সখায়ঃ যশসাগতেন সভাসাহেন সখ্যা নন্দন্তি। হি (যস্মাৎ) কিল্বিষস্পৃৎ পিতুষনিঃ (তাদৃশঃ সখা) এষাং বাজিনায় অরং (অলং) হিতো ভবতি॥ ১০॥

ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বি মিমীত উ ত্বঃ॥১১॥

অন্বয়। ত্বঃ যজ্ঞস্য মাত্রাং বিমিমীত; ত্বঃ ধারাং পুপুষ্বান্ পোষম্ আস্তে। ত্বঃ শক্বরীষু গায়ত্রং (সাম) গায়তি। ত্বো ব্রহ্মা জাতবিদ্যাং বদতি॥ ১১॥

অনুবাদ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত।

১। হে বৃহস্পতি! বালকেরা সর্ব্বপ্রথমে বস্তুর নাম মাত্র করিতে পারে। তাহাই তাহাদের ভাষাশিক্ষার প্রথম সোপান। তাহাদের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে সঞ্চিত ছিল তাহা বাগ্‌দেবীর করুণাক্রমে প্রকাশ পায়।

লেখকের প্রস্তাবিত।

১। হে বেদের (তত্ত্বজ্ঞানের) অধিপতি পরমেশ্বর! প্রথমে যাহা বেদভাষার অগ্রভাগ (স্থূলার্থ) তাহা নামধেয়বিধানকর্ত্তাগণ (নিরুক্তকার ও বৈয়াকরণগণ) প্রেরণ করিয়াছেন (অর্থাৎ তাঁহাদের সাহায্যে শিখিয়াছি)। যাহা ইঁহাদের (ঋষিদের) শ্রেষ্ঠ ও মনবিহীন (সূক্ষ্মার্থ) ছিল, যাহা সম্যকরূপে গুহাতে নিহিত আছে, তাহা প্রেরণ কর।

দত্তমহাশয়ের অনুবাদের দোষাবলী।

১। মূলে "বালকেরা" এই শব্দ নাই, প্রকরণবশতঃও পাওয়া যায় না। মূলে "ভাষাশিক্ষার সোপান" এই শব্দগুলি আদৌ নাই, প্রকরণ হইতেও পাওয়া যায় না। "তাহা বাগ্‌দেবীর করুণাক্রমে প্রকাশ পায়," এ কথাগুলিও মূলে নাই, প্রকরণ হইতেও পাওয়া যায় না। "হে বৃহস্পতি!" বলিয়া সম্বোধন করিয়া বৃহস্পতিকে কি বলা হইল? প্রথমার্দ্ধে মূলে "ঐরত" ও শেষার্দ্ধে "প্রেণ", এই দুই সংস্কৃত শব্দের যে অর্থ, তাহা অনুবাদে দেওয়া হয় নাই। বিচক্ষণ পাঠক প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে আরও বুঝিতে পারিবেন, মূলের সহিত অনুবাদের সম্পর্ক বড়ই কম।

আমার অনুবাদে "এষাং"—"ঋষীনাং" বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহা দ্বিতীয় ঋকের "এষাং" "ধীরাঃ" "সখায়ঃ" ও তৃতীয় ঋকের "ঋষিষু", এই সমুদায় শব্দের সহিত মিলন করিলে, প্রকরণবশাৎ স্পষ্টই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"বাচো অগ্রং"—বাক্‌শব্দের পারিভাষিক অর্থ বেদভাষা। ঋকের তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে বেদের সূক্ষ্মার্থ অর্থাৎ ঋষিদের অভিপ্রেত অর্থ বুঝা যায় না।

২। যেমন চালনীর দ্বারা শক্তুকে পরিষ্কার করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান বুদ্ধিবলে পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব অর্থাৎ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাদিগের বচনরচনাতে অতি চমৎকার লক্ষ্মী সংস্থাপিত আছে।

২। ছাতুকে চালনীর দ্বারা অভক্ষ্য অংশ হইতে পরিষ্কার করার ন্যায় ধীর (ঋষি)গণ যথায় (যে বেদে) মনের দ্বারা ভাষাকে (অনুপাদেয় লৌকিক অর্থ হইতে) পরিষ্কার করিয়া নির্ম্মল করিয়াছেন, সেই বেদভাষার রহস্য "সখা"গণই অবগত আছেন। ইঁহাদের রচনাতে "সাধ্বী শোভা" (chaste beauty) নিহিত আছে।

২। "পরিষ্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন''—মূলে বিশেষণভাবে "পরিষ্কৃত" শব্দ নাই। "পুনন্তঃ" আছে; তাহা ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশ করে। "ভাষাকে পরিষ্কার করিয়া অর্থাৎ অনুপাদেয় অংশ হইতে পৃথক করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন," এরূপ লেখা উচিত ছিল। মূলে যে "সখা" শব্দ আছে, তাহার অর্থ বন্ধু নহে। উহার বৈদিক অর্থ "ঋষি।'' "সখ্য'' শব্দের অর্থ "গুপ্তভাবার্থ" বা "রহস্য।'' "সেই ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব অর্থাৎ বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হয়েন"—কাহার বন্ধুগণ? বন্ধুত্ব-শব্দের অর্থ যে বিস্তর উপকার, তাহা কষ্টকল্পনা। আর, ভাষাতে বন্ধুগণ বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হয়েন কিরূপে? মূলে আছে "ধীরাঃ;'' অতএব,তাহার অনুবাদে "বুদ্ধিমান" না লিখিয়া "বুদ্ধিমানগণ'' লেখা উচিত ছিল। মূলের প্রথমার্দ্ধে যে "যত্র" ও শেষার্দ্ধে যে "অত্র'' শব্দ আছে, যাহা নিরতিশয় অর্থপূর্ণ, অনুবাদে ঐ দুইটি শব্দই অন্তর্হিত। "জানতে' শব্দের "লভন্তে" অর্থ না করিয়া, "জ্ঞা"-ধাতুর সাধারণ অর্থ লওয়াই উচিত ছিল।

আমার অনুবাদে "সখাগণ" এই শব্দ রক্ষা করিয়াছি। কারণ, বেদে ভূরি ভূরি স্থানে বৈদিক ঋষি ও বেদব্যবসায়ী ঋত্বিক্‌গণকে "সখা'' বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। তাঁহারা দেবতাদের "সখা" বলিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষতঃ "সখা" বলা হইত। প্রাকৃত ভাষায় আজিও অস্মদেশে যাহারা দেবতার অনুগ্রহে অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া অতিমানুষ বা ভবিষ্যতের কথা বলিতে পারে বলিয়া লোকের বিশ্বাস, তাহাদিগকে "সখা" বা "জান" বলিয়া উল্লিখিত হইতে শুনিয়াছি। ইহাতে প্রাচীন "সখা" শব্দের অর্থের আভাস পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ১।৫।১ ঋকে মধুচ্ছন্দা যে "স্তোমবাহসঃ

৩। বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞ দ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন। ঋষিদিগের অন্তঃকরণ মধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন। সেই ভাষা আহরণপূর্ব্বক তাঁহারা নানা স্থানে বিস্তার করিলেন। সপ্তছন্দ সেই ভাষাতেই স্তব করে।

৩। ঈশ্বরের উপাসনা ক্রিয়া দ্বারা ভাষার এই পদবী (বা রীতি) ঋষিগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঋষিগণের অন্তঃকরণে সেই ভাষা প্রবিষ্ট হইলে, পরে সাধারণ লোকে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই ভাষাকে আহরণ করিয়া পণ্ডিতগণ নানা স্থানে (নানা বিদ্যামন্দিরে) স্থাপিত করিয়াছেন। সপ্তছন্দ সেই ভাষাকে পরিবেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছে।

৪। কেহ কেহ কথা দেখিয়াও

৪। কেহ কেহ বেদভাষাকে

সখায়ঃ"দিগের কথা বলেন, তাহারা স্পষ্টই বেদবাহক ঋত্বিক। সখা হইতে সখ্য শব্দের তাৎপর্য্য পাওয়া যায়। সখা যেমন রহস্যবিদ্, সখ্য তেমনি রহস্য অর্থাৎ গুহ্য ভাব।

৩। "বুদ্ধিমানগণ" এই শব্দ মূলে নাই। দ্বিতীয় চরণে "ঋষি" শব্দের উল্লেখ আছে। তাহাতে "আয়ন্" এই ক্রিয়ার কর্ত্তার স্থলে "ঋষয়ঃ" এই শব্দই উহ্য করিতে হইবে। সুতরাং বুদ্ধিমানগণের পরিবর্ত্তে ঋষিগণ লেখাই উচিত ছিল। মূলে "ইয়ং পদবী" আছে; ইয়ং শব্দ অনুবাদে পরিত্যক্ত হইয়াছে কেন? "ইয়ং" শব্দ সাতিশয় অর্থপূর্ণ। "এই পদবী" অর্থাৎ বৈদিক ভাষার পদবী। "বুদ্ধিমানগণ যজ্ঞ দ্বারা ভাষার পথ প্রাপ্ত হয়েন," ইহার অর্থ কি? "ঋষিগণের অন্তঃকরণমধ্যে যে ভাষা সংস্থাপিত ছিল, তাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন"—কাহারা? মূলে "তাহারা" শব্দটিও নাই। "প্রবিষ্টাং" শব্দকে "স্থাপিত ছিল" অনুবাদ করিলে "প্রবেশের" অর্থ একবারে মারা গেল। বেদভাষা প্রথমে যজ্ঞরত ঋষিদের মনে প্রবিষ্ট হয়, পরে ইতর সাধারণে তাহা প্রাপ্ত হয়,এই অর্থ অনুবাদে আদৌ স্পষ্টীকৃত হয় নাই। "বি+অদধুঃ" শব্দের অর্থ="স্থাপন করিয়াছেন," "বিস্তার করিলেন" নহে। "অভিসংনবংতে" ইহার মূল অর্থ স্তবকরা নহে, অভিমুখে আগমন করা। মাত্রাসজ্ঘটিত গমনের নাম অভিসংনবন বা নৃত্য।

৪। "কথা দেখিয়াও"—ইত্যাদি। মূলে "বাচং" আছে। দত্ত মহাশয়

কথার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারে না, কেহ শুনিয়াও শুনে না। যেমন প্রেমপরিপূর্ণা সুন্দরপরিচ্ছদধারিণী ভার্য্যা আপন স্বামীর নিকট নিজ দেহ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ বাগ্‌দেবী কোন কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হয়েন।

দেখে না, কেহ কেহ শুনিয়াও শুনে না (অর্থাৎ ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারে না।) সুবাসিনী জায়া যেমন প্রেমপরবশ হইয়া পতির নিকট স্বীয় অঙ্গ উদ্‌ঘাটন করেন বেদভাষা তেমনি (বেদরসিক) কোনও ব্যক্তির নিকট অবয়ব প্রকাশ করেন (সকলের নিকট করেন না)।

৫। পণ্ডিতসমাজে কোন কোন ব্যক্তির এই প্রতিষ্ঠা হয় যে সে উত্তম ভাবগ্রাহী তাহাকে ছাড়িয়া কোন কার্য্য হয় না। কেহ বা পুষ্পফল-বিহীন অসার বাক্য অভ্যাস করে, তাহার যে বাক্য উহা যেন বাস্তবিক

৫। "সখ্য"বিষয়ে কেবল কোনও কোনও ব্যক্তিকে স্থিরপীত অর্থাৎ সারগ্রাহী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এবং প্রকৃত পুণ্যজনক যজ্ঞকার্য্য সকলে ঈদৃশ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা হয় না। অন্য লোকে পুষ্প-

---

ইহার পারিভাষিক অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। প্রথম ঋকে "বাচঃ অগ্রং" দ্বিতীয় ঋকে "বাচম্ অক্রত" ও "নিহিতাধিবাচি", তৃতীয় ঋকে "বাচঃ পদবী", সর্ব্বত্রই "বাক্"-শব্দের অর্থ বেদভাষা। এখানেও তাই। "তদ্রূপ বাগ্‌দেবী" ইত্যাদি—দত্ত মহাশয় বাগ্‌দেবী কোথায় পাইলেন? যে "বাচ্"-শব্দকে প্রথমে কেবল "কথা" বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা আবার "বাগ্‌দেবী" কিরূপে হইল? ফলতঃ, আদ্যোপান্ত এই ঋকে বাচ্ শব্দের অর্থ বেদভাষা; কথাও নহে, বাগ্‌দেবীও নহে। (প্রসঙ্গতঃ বলি, কেহ কেহ বলেন,—ঋগ্বেদ-রচনাকালে লিপিপদ্ধতি ছিল না। কিন্তু এস্থলে স্পষ্টাক্ষরে বেদভাষাকে দেখার কথা রহিয়াছে। ইহাতে তৎকালে গ্রন্থাকারে বেদ বিদ্যমান থাকার আভাস পাওয়া যাইতেছে।)

৫। মূলে আছে—"সখ্যে"; অনুবাদে হইয়াছে—"পণ্ডিত সমাজে"। ১ম ঋকে এই "সখ্য"—শব্দকে দত্ত মহাশয় "বন্ধুত্ব" বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। "বন্ধুত্ব" ও "পণ্ডিত সমাজের" কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝা যায় না। বলা বাহুল্য, এ স্থানে "সখ্য" অর্থ="সখার" ভাব বা "সখাত্ব" অর্থাৎ "ঋষিত্ব"। মূলের তাৎ-

দুগ্ধপ্রদ গাভী নহে, কাল্পনিক মায়াময় গাভী মাত্র।

ফলবিহীন বেদবাক্য অধ্যয়ন করিয়া (অর্থাৎ কেবল শব্দমাত্র অভ্যাস করিয়াও ভাবার্থ পরিগ্রহ না করিয়া কেবল কপটতা দ্বারা অদুগ্ধপ্রদ (অর্থাৎ নিষ্ফল) ক্রিয়া আচরণ করে।

৬। বিদ্বান্ বন্ধুকে যে ত্যাগ করে তাহার কথায় কোন ফল নাই। সে যাহা কিছু শুনে বৃথাই শুনে। সে সৎকর্ম্মের পন্থা অবগত হইতে পারে না।

৬। যিনি রহস্যবিৎ সখাকে পরিত্যাগ করেন, এমন কি, বেদবাক্য শ্রবণের ফলও তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না। তিনি তদ্দ্বারা "সুকৃতের" পন্থা অবগত হইতে পারেন না।

পর্য্য এই যে, অনেকে "সখা" বলিয়া পরিচিত হয়েন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও "স্থিরপীত" সখা বিরল। দত্ত মহাশয়ের শেষার্দ্ধের অনুবাদ মূল হইতে দূরগত হইয়াছে। তিনি উহাতে দুইটি সমাপিকা ক্রিয়া যোগ করিয়াছেন, মূলে একটির অধিক নাই। "মায়য়া এষ অধেনু আচরতি" = "এই ব্যক্তি মায়া দ্বারা অধেনুকে আচরণ করে" এই মন্ত্র মূল। ইহার অনুবাদ হইয়াছে—"তাহার যে বাক্য উহা যেন বাস্তবিক দুগ্ধপ্রদ গাভী নহে," ইত্যাদি। এস্থলে বক্তব্য (ক) মূলে "উহার যে বাক্য" ঈদৃশ শব্দ নাই। (খ) "গাভী নহে"—ইহার "নহে" (ন ভবতি) মূলে নাই। (গ) মায়াময় গাভী কিরূপ সামগ্রী? "মায়য়া" = মায়া দ্বারা; ইহাতে মায়াময় কোথা হইতে আইসে?

৬। অনুবাদের প্রথম অংশের অর্থ কি? "বাক্" শব্দের অর্থ যে সূক্তে বরাবর বেদবাক্য, তাহার অপলাপ করিয়া বা তাহা না বুঝিয়া, দত্ত মহাশয় বিপদে পড়িয়াছেন। তাই তিনি "বাচি" এই মূলের "কথায়" এইরূপ অনুবাদ করিয়া অর্থ হারাইয়াছেন। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে যে, স্থিরপীত সখাকে পরিত্যাগ করিয়া যে যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা "অধেনু" অর্থাৎ নিষ্ফল। এক্ষণে বলা হইতেছে, যজ্ঞের ফল না হউক, বেদবাক্য-শ্রবণের যে উপকার, তাহাও সেরূপ স্থলে ঘটে না; কেন না, যে বেদের ভাবার্থ পরিগ্রহ করিতে অসমর্থ, সে ধর্ম্মের তত্ত্ব কিরূপে বুঝাইবে?

৭। যাহাদিগের চক্ষু আছে, কর্ণ আছে, এরূপ বন্ধুগণ মনের ভাব প্রকটন বিষয়ে অসাধারণ হইয়া উঠিলেন। যে হ্রদের জলে কেবল মুখ বা কক্ষ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হয় সে যেমন অগভীর, কেহ কেহ তেমনি অগভীর। কেহ কেহ বা স্নান করিবার উপযুক্ত সুগভীর হ্রদের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

৭। আমাদের প্রাচীন "সখা" (ঋষিগণ) যাঁহাদের প্রকৃত চক্ষু ছিল, প্রকৃত কর্ণ ছিল, তাঁহারা মনের শক্তিতে অসাধারণ ছিলেন। কিন্তু কোনও কোনও ব্যক্তির বিবেচনায় তাঁহারা অগভীর জলাশয়ের ন্যায় যাহাতে কেবল কক্ষমাত্র নিমগ্ন হয়। পক্ষান্তরে অবগাহন করণানন্তর কোনও কোনও ব্যক্তির বিবেচনায় তাঁহারা গভীর হ্রদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন।

৮। যখন অনেক স্তোতা একত্র

৮। ব্রাহ্মণ ঋত্বিকগণ যৎকালে

৭। অনুবাদে এই অত্যুজ্জ্বল ঋকৃটি একবারে নিষ্প্রভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দত্ত মহাশয় শেষার্দ্ধের অন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই। "দদৃশ্রে" এই ক্রিয়ার কর্ত্তা কে, কর্ম্ম কে? দত্ত মহাশয় "ত্বে"—একে ইহাকেই কর্ম্মস্বরূপ লইয়াছেন বোধ হয়। আমার বিবেচনায়, "ত্বে"-শব্দ এস্থলে সপ্তম্যন্ত। "বভূবুঃ-" ক্রিয়ার কর্ত্তা যে সখায়ঃ আছে, তাহাই "দদৃশ্রে" ক্রিয়ার কর্ম্ম। কোনও কোনও ব্যক্তিতে, অর্থাৎ কোনও কোনও ব্যক্তির মনে সখাগণ অগভীর বলিয়া দৃষ্ট হয়েন। নতুবা, পূর্ব্বার্দ্ধে সখাগণ অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা গভীর বলিলে নিতান্ত অসংলগ্ন হয়।

তাৎপর্য্য এই। একই জলাশয়ের নিকট দুই ব্যক্তি গিয়াছে, মনে কর। এক ব্যক্তি রজ্জুতে একটি লোটা বাঁধিয়া তাহার দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমাণ জল তুলিতে ইচ্ছা করে; অপর ব্যক্তি অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিতে ইচ্ছা করে। প্রথম ব্যক্তি তীরে দণ্ডায়মান হইয়া লোটা নিক্ষেপ করিয়া দেখিল যে, পাত্রটি কেবল জলে নিমগ্ন হয় মাত্র। সে ব্যক্তি ভাবিল, জলাশয়ের জল অগভীর। দ্বিতীয় ব্যক্তি স্নানের জন্য অবগাহন করিয়া দেখিল যে, জল অগাধ। তদ্রূপ যাহারা পল্লবগ্রাহী পণ্ডিত, তাহারা ঋষিদিগকে অগভীর ও যাহারা সুদীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া সমালোচনা দ্বারা বৈদিক ঋষিদের ভাবে অবগাহন করিয়াছেন, তাঁহারা সেই ঋষিগণকে গভীর মনে করেন।

৮। দত্ত মহাশয়ের সংস্কার যে, ঋগ্বেদরচনাকালে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়

হইয়া মনের ভাব সমস্ত হৃদয়ে আলোচনা পূর্ব্বক অবধারিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন তখন কোনও কোনও ব্যক্তির কিছুই জ্ঞান জন্মে না কেহ কেহ স্তোত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করেন।

মিলিত হইয়া সেই সকল মন্ত্র দ্বারা ঈশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়েন, যাহা (ঋষিগণ কর্ত্তৃক) হৃদয়ে অনেক আলোচনার পর রচিত হইয়াছে, তৎকালে (উক্ত মন্ত্র সকল) বিদ্যার সহিত কাহাকেও বা পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ কাহারও কাহারও হৃদয়ে মন্ত্রনিহিত ব্রহ্মবিদ্যার বিকাশ হয় না) আর কেহ কেহ বা "ব্রহ্ম" (ব্রহ্মবিদ্যায় সুপণ্ডিত) হইয়া বিচরণ করেন।

৯। এই যে সকল ব্যক্তি, যাহারা ইহকাল বা পরকাল কিছুই পর্য্যালোচনা করে না, যাহারা স্তুতিপ্রয়োগ বা সোম যাগ কিছুই করে না, তাহারা পাপযুক্ত অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্ব্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করিবার উপযুক্ত হয় অথবা তন্তুবায়ের কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়।

৯। এই যে সকল ব্যক্তি, যাহারা না ইহলোক না পরলোকের সেবা করে (মুক্তি বা অভ্যুদয় কামনায় ঈশ্বরের সেবা না করে) না ব্রহ্মে আত্মসমর্পণকারী না সোমযাগকারী, তাহারা মলিন (রীতিতে) বেদবাক্য লাভ করিয়া অজ্ঞান থাকিয়া (সিরী) হলচালক হয়, তাঁত বুনে।

ছিল না। তজ্জন্য বেদে যেখানে "ব্রাহ্মণ" শব্দ পাইয়াছেন, সেখানে উক্ত শব্দের সরল অর্থ ত্যাগ করিয়া, "স্তোতা", "স্তোত্রজ্ঞ" ইত্যাদি অর্থ করিয়াছেন। যথাস্থানে দেখাইব,—এটি দত্ত মহাশয়ের ভ্রম। এই ঋকে "ব্রাহ্মণ" ও "ব্রহ্মা" এই দুই শব্দ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ জাতিবাচক; "ব্রাহ্মণাঃ সখায়ঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতীয় ঋত্বিকগণ। আর সেই ঋত্বিকগণের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্টরূপে বেদানুশীলনের দ্বারা বেদনিহিত "বিদ্যা" অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পাণ্ডিত্যের উৎকর্ষ লাভ করিতেন, তাঁহারা ঋত্বিকদের মধ্যে প্রধান শ্রেণীর "ব্রহ্মা" নামক ঋত্বিক্ হইতেন। ঋকের এই সরল অর্থ দত্ত মহাশয়ের অনুবাদে বিশদ হয় নাই।

৯। দত্ত মহাশয় এই স্থানে বেদরচনাকালে "ব্রাহ্মণ" জাতি না থাকা

১০। যশ মিত্রের ন্যায় কার্য্য করে, ইহা সভাতে প্রাধান্য প্রদান করে, সেই যশ প্রাপ্ত হইলে সকলেই আহ্লাদিত হয় কারণ যশের দ্বারা দুর্ণাম দূর হয়, অন্নলাভ হয়, বলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, নানা প্রকারে উপযুক্ত হওয়া যায়।

১০। সমুদায় সখাগণ যশস্বী, সভাবিজয়ী (ব্রহ্ম নামক) সখার দ্বারা আনন্দিত হয়েন। কেন না, পাপের অপনোদনকারী ও অন্নের প্রাপয়িতা (তাদৃশ সখা) এই সখাগণের পুণ্য-জনক উপাসনাকার্য্যের পক্ষে বিশেষ হিতকারী হয়েন।

১১। একজন প্রচুর পরিমাণে ঋকসমূহ উচ্চারণ করতঃ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকল্পে সাহায্য করেন, আর এক জন গায়ত্রী ছন্দে সামগান করেন; যিনি ব্রহ্মা নামক পুরোহিত, তিনি জাত বিদ্যা বিষয় ব্যাখ্যা করেন। অপর একজন পুরোহিত যজ্ঞানুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যগুলি ক্রমশঃ সম্পন্ন করেন।

১১। এক ব্যক্তি যজ্ঞের পরিমাপের সামগ্রীর পরিমাপ করেন; অন্য এক ব্যক্তি স্বীয় শাখাগত ঋক্ সকল সংগ্রহ করিয়া তাহা উচ্চারণ করেন; তৃতীয় এক ব্যক্তি সেই সকল ঋকে যে গেয় গান আছে, তাহা গান করেন। ফলতঃ ব্রহ্মানামক ব্যক্তিই, উপাসনাকার্য্যে যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাহার প্রবক্তা।

অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। তাহা মনে করিবার কোনও কারণ নাই। মূলে যে "ব্রাহ্মনাসঃ" শব্দ আছে, তাহাতে জাতিতে ব্রাহ্মণও বুঝায় এবং ব্রহ্মে আত্মসমর্পণকারীও বুঝায়। Christian শব্দেও জাতিতে খ্রীষ্টানও বুঝায়, আর ঈশ্বর ও খ্রীষ্টভক্তও বুঝায়। ফলতঃ, যাঁহারা ব্রাহ্মণজাতির প্রবর্ত্তক, তাঁহারা ব্রহ্মে আত্মসমর্পণকারী, ব্রহ্মের দাস ছিলেন। তাই ব্রাহ্মণ বলিলে তাদৃশ উচ্চ অর্থ বুঝাইত। স্থলবিশেষে ব্রাহ্মণশব্দে ঐরূপ অর্থ প্রকাশ করে বলিয়া যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ছিল না, ইহা কিরূপ যুক্তি? সেকালে বৈশ্যেরাও বেদাভ্যাস করিত। সুতরাং বেদাভ্যাসের পর হলচালক তন্তুবায় হওয়াতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এস্থলে, সাধারণ বেদাধ্যায়ীগণ যে কেবল বেদের স্থূলার্থ অবগত হইতেন, ইহাই প্রকাশ পাইতেছে।

১০। দত্ত মহাশয়ের অনুবাদ একবারে খাপছাড়া, প্রকরণের সহিত সম্পর্কশূন্য। যে অন্বয়ের দ্বারা ঐরূপ অনুবাদ হয়, তাহা নিতান্ত কষ্টসিদ্ধ।

সূক্তে ব্রহ্মজ্ঞানী বেদাধ্যায়ীর প্রশংসাই মূল কথা। অনুবাদে সে মূলকথার কোনও সংশ্রব নাই।

ব্রহ্মানামক ঋত্বিক্‌গণ অন্যান্য ঋত্বিক্ অপেক্ষা পণ্ডিত হইতেন। এক্ষণেও আমাদের শ্রাদ্ধাদিতে বিশেষ পণ্ডিত লোকেই ব্রহ্মবরণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়েন। যুক্তি ও বিচারের দ্বারা ঈশ্বরের সত্তা প্রতিপাদিত করিতে না পারিলে, নাস্তিকদের তর্কবিতর্ক ন্যায়ানুগত যুক্তি দ্বারা দূরীভূত করিতে সমর্থ না হইলে, কোনও ব্যক্তি ব্রহ্মার পদের যোগ্য হইত না। অন্যান্য লোক কেবল বেদের স্থূলার্থ শিখিয়াই ক্ষান্ত হইত, ব্রহ্মারা সরহস্য বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিতেন।' ১০ম ও ১১শ ঋকে ব্রহ্মার গুণ-কীর্ত্তন দেখা যায়। সভাবিজয়ী ব্রহ্মা ঋত্বিকের আগমনে অন্যান্য ঋত্বিকেরা আনন্দিত হয়েন। অন্যান্য ঋত্বিকেরা যজ্ঞের ইতর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ যজ্ঞের প্রধান কার্য্য, তাহা ব্রহ্মা নামক ঋত্বিকের দ্বারাই সুসিদ্ধ হয়। ইহাই শেষ দুই ঋকের তাৎপর্য্য অর্থ।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

হিন্দুদিগের রসায়ন।

পারদ।

পূর্ব্বকার প্রবন্ধে হিন্দুদিগের যন্ত্রাদির বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। কিন্তু সকল প্রকার যন্ত্রের বিবরণ, এমন কি, অনেক প্রকার যন্ত্রের নাম পর্য্যন্তও উল্লিখিত হয় নাই। এখন হইতে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে, তাহাতে অনেক নূতন নূতন যন্ত্রের যথাসাধ্য বিবরণ দেওয়া যাইবেক। অদ্যকার প্রবন্ধে পারদবিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

হিন্দু চিকিৎসকগণ এখন পর্য্যন্ত যেরূপ প্রকারে পারদ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা মনে হইলে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়। ইউরোপের সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মতে, প্রাচীন হিন্দুরা পারদের কোন ব্যবহার জানিতেন না। ঔষধরূপে ইহার ব্যবহার অনেকটা আধুনিক বটে, কিন্তু অন্যান্য কার্য্যে পারদ কিম্বা তদ্ঘটিত পদার্থ ব্যবহৃত হইত কি না, তদ্বিষয়ে উক্ত

ছান্দোগ্য উপনিষদে দর্পণের উল্লেখ আছে; কিন্তু তখন কি কি পদার্থে দর্পণ গঠিত হইত,তাহা স্থির করা এক প্রকার অসম্ভব; কারণ তাহার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায় না। ৵ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের মতে তখনকার হিন্দুরা কাঁচের ব্যবহার জানিতেন না; সুতরাং দর্পণ প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে পারদের ব্যবহার থাকাও অসম্ভব। তাঁহার মতে, সম্ভবতঃ তখন ধাতুনির্ম্মিত দর্পণ ব্যবহৃত হইত। শ্বেত বর্ণের ধাতু কিম্বা মিশ্রিত ধাতু সকলের (alloys) ফলক উত্তমরূপ পালিস্ (polish) করিলে দর্পণের ন্যায় ব্যবহার করা যাইতে পারে। অনেক ধাতুর সহিত পারদ সহজেই যুক্ত হয়; ইহাকে ইংরাজী ভাষায় amalgam বলে। পারদের এই গুণ হিন্দুরা বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন,তাহা এই প্রবন্ধেই প্রতিপন্ন হইবে। এই পারদযুক্ত ধাতুফলক উত্তমরূপে পালিস্ করিলে দর্পণের ন্যায় ব্যবহার করাও যাইতে পারে, সুতরাং পূর্ব্বকালের দর্পণ যে এই নিয়মে প্রস্তুত হইত না, তাহা কে বলিতে পারেন!

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে পারদের কোন খনি ছিল কি না, তাহা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই; হিন্দুদিগের রাজত্বসময়ের এমন কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই, যাহাতে পারদের খনির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। বিখ্যাত আইন-আক্‌বারিতে, প্রত্যেক সুবাতে যে সমস্ত খনি ছিল, তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাতেও পারদখনির কোন উল্লেখ নাই। ইহাও সম্ভব যে, আক্‌বরের সময়ে কোন খনি আবিষ্কৃত হয় নাই। আবশ্যকীয় পারদ চীন, তিব্বত এবং নেপাল হইতে আসিত। এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের হিন্দু স্ত্রীলোকেরা যে সিন্দুর ব্যবহার করেন, তাহাকে সচরাচর "চীনের সিন্দুর" বলে। অধুনা বৃটিশরাজের ভূতত্ত্ব-বিভাগের বিবরণীতেও ইহার কোন যথার্থ বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবল এই মাত্র জানা যায় যে, মান্দ্রাজপ্রদেশান্তর্গত কানালোর নামক স্থানে পারদের খনি আছে। কিন্তু ইহা কত দূর সত্য, তাহা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয় নাই। *

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ঔষধরূপে পারদ কিম্বা তদ্‌ঘটিত পদার্থের ব্যবহার অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। চরকসংহিতা কিম্বা সুশ্রুতে ইহার বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। কোন কোন চিকিৎসক বলেন যে, চরকসংহিতাতে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

* Ball's Economic Geology, Pages 170-72.

চরকসংহিতার কুষ্ঠ-অধ্যায়ে একস্থানে লিখিত আছে যে, "সর্ব্বব্যাধিবিনাশন-মদ্যাত কুষ্ঠোরসঞ্চ নিগৃহীতম্"। ৺ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত, এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়। তাঁহার মতে যখন চরকসংহিতায় পারদ শব্দের প্রয়োগ অধিক দেখা যায়, তখন এস্থলে পারদশব্দের পরিবর্ত্তে যে রসশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে না। রসশব্দে অনেক অর্থ বুঝায়; সুতরাং এস্থলে রসশব্দের অন্য অর্থ হওয়া সম্ভব। * পারদের পরিবর্ত্তে অন্য ঔষধ তখন কুষ্ঠরোগ নিবারণার্থ ব্যবহৃত হইত; যথা স্বর্ণ, গন্ধক, ভোল (myrrh) ইত্যাদি। সর্ব্বপ্রথমে চক্রদত্ত সংগ্রহে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কি প্রকারে যে ভারতবর্ষে ঔষধার্থে পারদের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা স্থির করা বড়ই সুকঠিন। কেহ কেহ বলেন যে, মুসলমানেরা ইহা প্রথমে ভারতবর্ষে ঔষধরূপে প্রচলিত করে। কিন্তু মুসলমানেরা সহজে ঔষধার্থ পারদ ব্যবহার করিত না। কারণ, "তালিক-সরিফতে" ইহার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, মুসলমানেরা অতি সাবধানে কদাচিৎ পারদঘটিত ঔষধাদি ব্যবহার করিত।

পারদের পর্য্যায়শব্দ অনেক; যথা;—

> রসেন্দ্রঃ পারদঃ সূতঃ সূতরাজশ্চ সূতকঃ।
> শিবতেজোরসঃ সপ্তনামান্যেবং রসস্য তু॥

অন্য মতে;—

> শিববীজো রসঃ সূতঃ পারদশ্চ রসেন্দ্রকঃ।
> এতানি রসনামানি তথান্যানি যথাশিবঃ॥

রসেন্দ্র, পারদ, সূত, সূতরাজ, সূতক, শিবতেজ ও রস, এই সাতটি পারদের নাম।

অন্যমতে,—শিববীজ, রস, সূত, পারদ, রসেন্দ্র এই কয়েকটি পারদের নাম। কাহারও কাহারও মতে শিববাচক শব্দে পারদ বুঝায়।

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই হিঙ্গুল (Cinnabar বা vermillion) হইতেই পারদ প্রস্তুত করা হয়। হিন্দুদিগেরও ইহা অবিদিত ছিল না। রসেন্দ্র-সারসংগ্রহ নামক গ্রন্থে দেখা যায় যে ঃ—

> জম্বীরনিম্বুনীরেণ মর্দ্দিতো হিঙ্গুলোদিনম্।
> ঊর্দ্ধপাতনযন্ত্রেন গ্রাহ্যঃ স্যান্নির্ম্মলোরসঃ॥

* Sanskrit Materia Medica by Dr. U. C. Dutt, Page 27, foot-note.

মতান্তর ;—

পারিভদ্ররসৈঃ পেষ্যং হিঙ্গুলং যামমাত্রকম্।
জম্বীরাণাং রসৈর্ব্বাথ পচেৎ পাচনযন্ত্রকে॥
তং সূতং যোজয়েদ্ যোগে সপ্তকঞ্চুকবর্জিতম্।
সংশুদ্ধিমন্তরেণাপি শুদ্ধোঽয়ং রসকর্ম্মণি॥

ভাবার্থ ;—

জম্বীর ও নেবুর রসের সহিত হিঙ্গুল এক দিন মর্দ্দন করত উর্দ্ধপাতন যন্ত্রে গ্রহণ করিবে ; তাহাতে পারদ নির্ম্মল হয়।

অথবা পালিতা-মাদারের রসে হিঙ্গুল এক প্রহরকাল মর্দ্দন করণান্তর পুনরায় জম্বীর রস দ্বারা আর এক প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া উর্দ্ধপাতনযন্ত্রে পারদ গ্রহণ করিবে। এই উপায়ে বিনা শোধনে পারদ সপ্তদোষশূন্য ও বিশুদ্ধ হয়,এবং সকলপ্রকার রস কর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভাবপ্রকাশের হিঙ্গুলাদ্রসমাকর্ষণবিধিও এইরূপ, কেবলমাত্র পালিতা-মাদারের স্থানে নিম্বপত্র ব্যবহার করিতে হয়।

এ সকল স্থানে পাত্রস্থ বায়ুতে যে অম্লজান (Oxygen) থাকে, তাহা গন্ধকের সহিত যুক্ত হইয়া দ্বি-অম্ল-গন্ধক বায়ু (Sulphur dioxide gas) রূপে নির্গত হয়। ইহা হইতেই বেশ বুঝা যাইতে পারে যে, হিঙ্গুল অম্লজানের সহিত উত্তপ্ত করিলেই পারদ পাওয়া যাইতে পারে। অম্লজানের সহিত যুক্ত হওয়া গন্ধকের একটি বিশেষ গুণ। অদ্যাবধি ইউরোপে এইরূপে খনি হইতে পারদ নির্য্যাতন করা হয়। অনেক সময়ে চূর্ণ প্রস্তরের (Lime stone) গুঁড়া ইহার সহিত মিশ্রিত করা হয়। পারদ অম্লজানের যুক্ত না হয় বলিয়া অঙ্গার (Coal) মিশ্রিত করা হয়। * এখানেও লেবুর বা পালিতা-মাদারের রস অগ্নির উত্তাপে অঙ্গাররূপে পরিণত হয়।

নানাপ্রকার উপায়ে হিন্দুরা পারদ শোধন করিতেন। এক রসেন্দ্রসার-সংগ্রহে ১৫ কিম্বা ১৬ প্রকার উপায় লিখিত আছে। পারদ সচরাচর সীসক (Lead), বঙ্গ (Tin) এবং ব্যূঢ় পদার্থ (Organic matters) সংযুক্ত থাকে। অনেক মতানুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাঁজি, আরনাল বা সারিবা (Acetic acid with some other fatty acids) দ্বারা পারদকে ধৌত করিতে হয়। ইহার বিশেষ কারণ যে সীসক অতি সহজেই কাঁজিস্থ

* Thorpis Dictionary of Applied chemistry Vol II., page 555.

অম্লের সহিত যুক্ত হয়; এই যুক্ত পদার্থকে Lead acetate বলে। ইহা সহজেই জলের সহিত মিশ্রিত হয়। সুতরাং এই উপায়ে সহজেই পারদ হইতে সীসক পৃথক করা যাইতে পারে। কখন কখন কাঁজির পরিবর্ত্তে লেবুর রস বা আমরুলি শাকের রসও ব্যবহৃত হয়। লেবুর রসে Citric acid এবং আমরুলিশাকের রসে Oxalic acid প্রচুর পরিমাণে আছে। এই দুই দ্রাবক সহজেই সহজেই সীসকের সহিত যুক্ত হয়। বারম্বার পারদে অগ্নির সাহায্যে ধূমাকারে পরিণত করিয়া একত্রিত করিলে যে ইহা বিশুদ্ধ হয়, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়;—

কুমার্য্যা চ নিশাচূর্ণৈর্দ্দিনং সূতং বিমর্দ্দয়েৎ।
পাতয়েৎ পাতনাযন্ত্রে সম্যক্ শুদ্ধোভবেদ্রসঃ॥

অথবা তির্য্যকপাতনপ্রণালী দ্বারা অতি সহজেই পারদকে বিশুদ্ধ করা যায়।

ঘটে রসং বিনিঃক্ষিপ্য সজলং ঘটমন্যকম্।
তির্য্যঙ্মুখং দ্বেয়ো কৃত্বা তন্মুখং রোধয়েৎ সুধীঃ।
রসাধো জালয়েদগ্নিং যাবৎসূতো জলং বিশেৎ॥

আধুনিক পাশ্চাত্য রাসায়নিকদিগের মতে হিঙ্গুলে কত পরিমাণ পারদ আছে, তাহা জানিতে হইলে প্রায় এইরূপ উপায়ই অবলম্বন করিতে হয়।

আবার সময়ে সময়ে দেখা যায় যে, পারদকে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য গন্ধকের সহিত উহা মর্দ্দিত করিয়া পরে ঊর্দ্ধপাতনযন্ত্রে জম্বীরের রসের সহিত পাক করিতে হয়। যথা;—

রসস্য দ্বাদশাংশেন গন্ধং দত্ত্বা বিমর্দ্দয়েৎ।
জাম্বীরোত্থৈর্দ্রবৈর্যামং পাচ্যং পাতনযন্ত্রকে।
পুনর্ম্মর্দ্যং পুনঃপাচ্যং সপ্তবারং বিধানতঃ॥

পারদের এক বিশেষ গুণ যে, ইহা সহজেই অনেক ধাতুর সহিত যুক্ত হয়। ইহাকে ইংরাজীতে আমালগাম (Amalgam) বলে। পূর্ব্বকালের হিন্দু চিকিৎসকগণ ইহা বিদিত ছিলেন। পারদ তাম্রচূর্ণ বা পত্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া, পরে ঊর্দ্ধপাতনযন্ত্র দ্বারা অগ্নিতাপে পরিশুদ্ধ করিয়া লইতেন। তাঁহারা এই গুণ জ্ঞাত থাকায় স্বর্ণ, রৌপ্যাদি অনেক ধাতু পরিশুদ্ধ করিতে সক্ষম হইতেন।

যে পারদের অন্তর্ভাগ সুনীল এবং বহির্ভাগ উজ্জ্বল এবং যাহা মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন, তাদৃশ পারদই প্রশস্ত। এবং যে পারদ ধূম্রবর্ণ,

পাণ্ডুবর্ণ অথবা নানা বর্ণে চিত্রিত, তাহা কখনই রসায়নকর্ম্মে ব্যবহার করা উচিত নহে।

অন্তঃসুনীলো বহিরুজ্জ্বলো যো মধ্যাহ্নসূর্য্যপ্রতিমপ্রকাশঃ।
শস্তোঽথ ধূম্রঃ পরিপাণ্ডরশ্চ চিত্রো ন যোজ্যা রসকর্ম্মসিদ্ধৌ।

পারদের অনেকগুলি গুণ হিন্দুরা জ্ঞাত ছিলেন। প্রথমতঃ, ইহা অতিশয় গুরু এবং চঞ্চল (Mobile), এই চঞ্চলতাদোষ দূরীকরণার্থ নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, ইহা অতি সহজেই ধূম্রাকার প্রাপ্ত হয়। এই গুণ জানিতেন বলিয়া, হিন্দুরা অতি বিশুদ্ধ পারদ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, ইহা অতি সহজেই গন্ধকের সহিত যুক্ত হয়; এই গুণ জ্ঞাত থাকায় হিঙ্গুলে যে পারদ আছে, তাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ, ইহা অনেক ধাতুর সহিত যুক্ত হয়।

এখন দেখা যাউক যে, পারদ হইতে কতগুলি যৌগিক পদার্থ হিন্দুরা আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রায় সকল পুস্তকেই চারি প্রকার পারদসংযুক্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

১। কৃষ্ণভস্ম (Black Sulphide of mercury)

২। পীতভস্ম (An intermediate product between red and black Sulphides)

৩। রক্তভস্ম, রসসিন্দুর, হিঙ্গুল (Vermillion or cinnabar or red Sulphide of mercury)

৪। রসকর্পূর বা শ্বেতভস্ম (Calomel and Corrosive Sublimate)

ইহা ব্যতীত, কতকগুলি উপায়ে পারদের যে মারণবিধি আছে, তাহা সম্ভবতঃ আর কিছুই নহে; কেবলমাত্র বায়ুস্থ অম্লজানের সহিত যুক্ত পারদ অর্থাৎ একাম্ল পারদ (mercuric oxide)। ইহা দেখিতে অতিশয় রক্তবর্ণ।

কৃষ্ণভস্ম, পীতভস্ম ও রক্তভস্ম, ইহারা সকলেই কেবল মাত্র পারদ ও গন্ধকের সংযোগে ঘটিয়া থাকে। স্বর্ণসিন্দূর, মকরধ্বজ, পারদ ও গন্ধকযুক্ত পদার্থ বিশেষ। অনেকের বিশ্বাস যে, স্বর্ণসিন্দূর ও মকরধ্বজে স্বর্ণ আছে। প্রস্তুতকালীন স্বর্ণ ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু উহাতে স্বর্ণ থাকে না। ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয় বলেন যে, বোধ হয়, প্রস্তুতকালীন স্বর্ণের কোন কোন বিশেষ গুণ মকরধ্বজ প্রাপ্ত হয়। যেখানে রাসায়নিকেরা কোন রাসায়নিক ক্রিয়ার যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম না হয়েন, সেইখানেই তাঁহারা

কোন প্রকার catalytic অথবা cyclic action বলিয়া স্থির করেন। মকর-ধ্বজে স্বর্ণ থাকাও সেইরূপ।

যখন দেখা যায় যে, মকরধ্বজে স্বর্ণ নাই, তখন কি প্রকারে যে মকর-ধ্বজে ও স্বর্ণসিন্দূরে স্বর্ণের গুণ বর্ত্তায়, তাহা স্থির করা অসম্ভব বোধ হয়। আমরা দশ বার স্থান হইতে মকরধ্বজ আনাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোনটাতেই স্বর্ণের লেশমাত্র দেখিতে পাই নাই। হিঙ্গুলে যে পরিমাণ পারদ ও গন্ধক আছে, মকরধ্বজে ও স্বর্ণসিন্দূরেও সেই পরিমাণ গন্ধক ও পারদ পাওয়া যায়। প্রস্তুত করিবার সময়ে যত পরিমাণে স্বর্ণ লওয়া যায়, পাত্রস্থ অবশিষ্টাংশে প্রায় সেই পরিমাণে স্বর্ণ পুনরায় পাওয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহার আণবিক আকারের (molecular structures) পরিবর্ত্তন হয়।

কণাকারের (crystalline structures) কোন পরিবর্ত্তনে ঘটে না, তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। কারণ, হিঙ্গুল যে শ্রেণীর অন্তর্গত, মকরধ্বজ ও স্বর্ণসিন্দূরও সেই শ্রেণীর অন্তর্গত।

১। কৃষ্ণভস্ম, কজ্জলিকা এবং রসপর্পটী, এক প্রকার দ্রব্য। সকল দ্রব্যেই পারদ ও গন্ধক আছে; কেবলমাত্র পরিমাণের তারতম্য মাত্র। নিম্নে ইহাদিগের প্রস্তুতের নিয়ম উদ্ধৃত করা গেল :—

লৌহপাত্রেঽথবা তাম্রে পলৈকং শুদ্ধগন্ধকম্।
মৃদ্বগ্নিনা দ্রুতে তস্মিন্ শুদ্ধসূতং পলত্রয়ম্।
ক্ষিপ্ত্বাথ চালয়েৎ কিঞ্চিৎ লৌহদর্ব্ব্যা পুনঃপুনঃ।
গোময়ে কদলীপত্রং তস্যোপরি চ চালয়েৎ॥—রসেন্দ্রসারসংগ্রহ।

তিন ভাগ পারদ ও এক ভাগ গন্ধক প্রথমতঃ বেশ মর্দ্দন করিয়া মৃদু অগ্নির উপরে লৌহ কিম্বা তাম্র পাত্রে দ্রব করিয়া, গোময়ের উপরিস্থ কদলী-পত্রের উপর ঢালিয়া লইতে হয়; ইহাকেই কৃষ্ণভস্ম বলে।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং খল্লে তাবদ্বিমর্দ্দয়েৎ।
সূতং ন দৃশ্যতে যাবৎ কিন্তু কজ্জলবদ্ভবেৎ॥
এষা কজ্জলিকা খ্যাতা * * *—রসেন্দ্রসারসংগ্রহ।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত পারদ অদৃশ্য না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমভাগ পারদ ও গন্ধক মর্দ্দন করিতে হয়। ইহাকেই কজ্জলিকা বলে।

রসপর্পটীর প্রস্তুতপ্রণালী কৃষ্ণভস্মের ন্যায়, কেবলমাত্র সমভাগ গন্ধক ও পারদ লইতে হয়, আর ঘৃতের সহিত গলাইতে হয়।

পূর্ব্বোক্তৌ দ্বিবিধৌ শুদ্ধৌ সমানৌ রসগন্ধকৌ।
সম্মর্দ্য কজ্জলাভন্তু চূর্ণং কুর্য্যাদ্দৃঢ়াশয়ে॥
তত বদর বহ্নিস্থে লৌহপাত্রে দ্রবীকৃতম্।
গোময়োপরিসন্নস্তঃ কদলীপত্রপাতনাৎ।
কুর্য্যাচ্চ পর্পটাকারং তস্য রক্তীদ্বয়ং ক্রমাৎ॥—চিকিৎসারত্ন।

পীতভস্ম বা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রস;—ইহাতেও কেবল পারদ ও গন্ধক আছে; ইহার প্রস্তুতপ্রণালী নিম্নে লিখিত হইল।

মর্দ্দয়েদ্রসগন্ধৌ চ হস্তিশুণ্ডীদ্রবৈর্দৃঢ়ম্।
ভূধাত্রিকারসৈর্ব্বাপি পর্য্যন্তং দিনসপ্তকম্।
বিমুব্য বালুকাযন্ত্রে মূষায়াং সন্নিবেশয়েৎ।
দিনমেকং দদেদগ্নিং মন্দং মন্দং নিশাবধি।
এবং নিষ্পদ্যতে পীতঃ পীতঃ সূতস্তু গৃহ্যতে॥—রসেন্দ্রসারসংগ্রহ।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক, হাতিশুঁড়ার ও ভূমিআমলকীর রসে সাত দিন মর্দ্দন করিয়া, মূষামধ্যে স্থাপন করিবে। পরে একটি আবৃত মূষার মধ্যে উহা রাখিয়া, বালুকাযন্ত্রের সাহায্যে প্রায় বার ঘণ্টা কাল পাক করিলে, সেই পারদ ভস্মীভূত পীতবর্ণ হয়।

৩। **রক্তভস্ম, রসসিন্দুর, হিঙ্গুল ইত্যাদি**ঃ—হিঙ্গুল খনিজ পদার্থ; ইহার অনেক নাম। যথা;—

হিঙ্গুলে হিঙ্গুলুর্খ্যাতি দরদঃ শুকতুণ্ডকঃ।
রসগন্ধকসম্ভূতো হিঙ্গুলোদৈতারক্তকঃ॥

পারদ ও গন্ধক সহযোগে যে হিঙ্গুল জন্মিয়া থাকে, তাহা হিন্দু চিকিৎসকগণ জ্ঞাত ছিলেন। যথা;—

হিঙ্গুলং দিব্যং রসগন্ধকসম্ভবম্।

রক্তভস্ম বা রসসিন্দুর প্রস্তুতপ্রণালী একপ্রকার। নিম্নে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল ঃ—

শুদ্ধসূতস্য গৃহ্নীয়াদ্ভিষগ্ ভাগচতুষ্টয়ম্।
শুদ্ধগন্ধস্য ভাগৈকং তাবৎ কৃত্রিমগন্ধকম্।
অথবা পারদস্যার্দ্ধং শুদ্ধগন্ধকমেবহি।
তয়োঃ কজ্জলিকাং কুর্য্যাদ্দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ।
মৃত্তিকাং বাসসা সার্দ্ধং কুট্টয়েদভিযত্নতঃ।
তয়া বারত্রয়ং সম্যকাচকুপীং প্রলেপয়েৎ।
মৃত্তিকাং শোষয়িত্বা তু কূপ্যা কজ্জলিকাং ক্ষিপেৎ।

তাং কূপীং বালুকাযন্ত্রে স্থাপয়িত্বা রসং পচেৎ।
অগ্নিং নিরন্তরং দদ্যাদ্ যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্।
গৃহ্নীয়াদূর্দ্ধসংলগ্নং সিন্দূরসদৃশং রসম্॥—ভাবপ্রকাশ।
ভাগো রসস্য ত্রয় এব ভাগা গন্ধস্য মাষঃ পবনাশনস্য।
সংমর্দ্দ্য গাঢ়ং সকলং সুভাণ্ডে তাং কজ্জলীং কাচঘটে নিদধ্যাৎ;
সংরুধ্য মৃৎকর্পটকৈর্ঘটীন্তাং মুখে সচূর্ণাং খটিকাঞ্চ দত্ত্বা।
ক্রমাগ্নিনা ত্রীণি দিনানি পক্ত্বা তা বালুকাযন্ত্রগতাং ততঃ স্যাৎ।
বন্ধূকপুষ্পারুণমীশজস্য * * *—রসেন্দ্রসারসংগ্রহ

অথবা;—

পলমাত্রং রসং শুদ্ধং তাবন্মাত্রন্তু গন্ধকম্।
বিধিবৎ কজ্জলীকৃত্বা ন্যগ্রোধাঙ্কুরবারিভিঃ।
ভাবনাং ত্রিতয়ং দত্ত্বা স্থালীমধ্যে নিধাপয়েৎ।
বিরচ্য কবচীযন্ত্রং বালুকাভিঃ প্রপূরয়েৎ।
দত্ত্বা তদন্তে মন্দাগ্নিং পচেদ্যামচতুষ্টয়ম্।
জায়তে রসসিন্দূরং তরুণাদিত্যসন্নিভম্॥—রসেন্দ্রসারসংগ্রহ।

ভাবার্থ;—

৪ ভাগ শোধিত পারদ, ১ ভাগ শুদ্ধ গন্ধক ও ১ ভাগ কৃত্রিম গন্ধক গ্রহণ করিয়া, অথবা পারদের অর্দ্ধাংশ শুদ্ধ গন্ধক লইয়া, একদিন মর্দ্দন করিয়া, কজ্জলী প্রস্তুত করিবে। তৎপরে কুট্টিত বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা একটি কাচকূপী উত্তমরূপে লেপন করিয়া শুষ্ক করিবে; এইরূপে তিন বার লেপন ও শুষ্ককরণের পর, উপরিউক্ত কজ্জলী উহার মধ্যে স্থাপন করিবে; পরে ক্রমাগত চারি দিন প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। শীতল হইলে ঐ কূপীর ঊর্দ্ধসংলগ্ন সিন্দূরসদৃশ রস গ্রহণ করিবে।

এক পল পারদ, তিন পল গন্ধক ও এক মাষা সীস একত্র মর্দ্দিত করিয়া, একটি কাচকূপীর ভিতর স্থাপন করণান্তর, একখানি মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা কূপীটি আবৃত করিবে, এবং উহার মুখ চূর্ণ ও খড়ি দ্বারা আবদ্ধ করিবে, তৎপরে, ক্রমাগত তিন দিন অগ্নি দ্বারা বালুকাযন্ত্রে পাক করিলেই ঐ পারদ বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ হয়।

এক পল গন্ধক ও এক পল পারদ একত্রে মিশাইয়া, যথানিয়মে কজ্জলী করিয়া, বটাঙ্কুরের কাথে বারত্রয় ভাবনা দিয়া, সেই কজ্জলী একটি বোতলের মধ্যে স্থাপন করিবে। পরে মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্র দ্বারা সেই বোতলটি বেষ্টন পূর্ব্বক, বালুকাযন্ত্রের উপর অগ্নির সাহায্যে চারি প্রহর পর্য্যন্ত পাক

করিবে। এই প্রকার করিলে, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ রসসিন্দুর উৎপন্ন হয়।

৪। রসকর্পূর বা শ্বেতভস্ম ঃ—নিম্নে দুইটি উপায় লিখিত হইল ঃ—

পিষ্টং পাংশুপটুপ্রগাঢ়মমলং বজ্রাম্বুনানৈকশঃ
সূতং ধাতুগতং খটীকবলিতং তং সংপুটে রোধয়েৎ।
অন্তস্তল্লবণস্য তস্য চ তলে প্রজ্জ্বাল্য বহ্নিং দৃঢ়ম্
যন্ত্রং গ্রাহ্যমথেন্দুকুন্দধবলং ভস্মোপরিস্থং শনৈঃ॥—রসেন্দ্রসারসংগ্রহ।

পারদের সহিত সৈন্ধবলবণ ও ধূলি মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করতঃ পারদকে নির্ম্মল করিবে। তৎপরে সেই শুদ্ধ পারদ সিজের রসে (আঠা) পুনঃপুনঃ মর্দ্দন করিয়া লৌহপাত্রের মধ্যে রাখিয়া,তাহার মুখ খটিকা দ্বারা বন্ধ করিবে পরে, সেই পাত্র একটি লবণপূর্ণ পাত্রের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক প্রবল অগ্নিতাপে পাক করিতে হইবে। এইরূপ পাক করিলে, সেই লৌহপাত্রের উপরিস্থ পারদ, কুন্দকুসুমের কিম্বা চন্দ্রের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও ভস্মীভূত হয়।

এখানে লবণস্থ ক্লোরিন (Chlorine) পারদের সহিত মিশ্রিত হইয়া রসকর্পূর উৎপাদন করে। ইংরাজী কেলোমেল (Calomel) এইরূপে প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

শুদ্ধসূতসমং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং গৈরিকং সুধীঃ।
ইষ্টিকাং খটিকাং তদ্বৎ স্ফটিকাং সিন্ধুজন্ম চ।
এভিশ্চূর্ণৈর্যুতং সূতং যাবদ্যামং বিমর্দ্দয়েৎ।
তচ্চূর্ণসহিতং সূতং স্থালীমধ্যে পরিক্ষিপেৎ।
তস্য স্থাল্যা মুখে স্থালীমপরাং ধারয়েৎ সমাম্।
সবস্ত্রকুট্টিতমৃদা মুদ্রয়েদনয়োর্মুখম্।
সংশোষ্য মুদ্রয়েদ্ভূয়োভূয়ঃ সংশোষ্য মুদ্রয়েৎ।
সম্যগ্বিশোষ্য মুদ্রাং তাং স্থালীচুল্ল্যাং বিধারয়েৎ।
অগ্নিং নিরন্তরং দদ্যাদ্ যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্।
অঙ্গারোপরি তদ্যন্ত্রং রক্ষেদ্যত্নাদহর্নিশম্।
শনৈরুদ্ঘাটয়েদ্যন্ত্রমূর্দ্ধস্থালীগতং রসম্।
কর্পূরবৎ সুবিমলং গৃহ্নীয়াদ্ গুণবত্তরম্॥-ভাবপ্রকাশ।

পারদকে সংক্ষিপ্তভাবে শোধন করিয়া গেরিমাটি (Red ochre), ইষ্টিকা, খড়ি, ফটকিরি, সৈন্ধবলবণ, উইয়ের মাটি, ক্ষারলবণ (খাঁড়ী লবণ) Sodium sulphate) এবং ভাণ্ডরঞ্জক মৃত্তিকা, এই কয়েকটি দ্রব্য পারদের সমপরিমাণ গ্রহণ ও চূর্ণ করিয়া, বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। পরে এই সকল চূর্ণ দ্বারা

পারদকে এক প্রহরকাল মর্দ্দন করত একটি স্থালীর মধ্যে স্থাপন করিয়া তদুপরি আর একটি স্থালী রাখিবে, তৎপরে বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা স্থালী-দ্বয়ের সন্ধিস্থান রুদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে পুনরায় ঐরূপ বস্ত্রখণ্ড ও মৃত্তিকা দ্বারা সন্ধিস্থানে লেপ দিবে; এই নিয়মে উত্তমরূপে মুদ্রিত ও শুষ্ক হইলে, ঐ স্থালী চুল্লির উপরি স্থাপন করত, অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ক্রমাগত চারি দিন জ্বাল দিবে। পরে শীতল হইলে স্থালীর মুখ ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিবে যে, উহার মধ্যে কর্পূরের ন্যায় নির্ম্মল রস দৃষ্ট হইতেছে; তাহাই গ্রহণ করিবে। ইহা অত্যন্ত গুণকারক। অতিশয় উত্তাপে ফট্‌কিরি বিশ্লিষ্ট হইয়া গন্ধক দ্রাবক উৎপাদন করে। এই গন্ধকদ্রাবক ও লবণ, অগ্নির সাহায্যে লবণকদ্রাবক (Hydrochloric acid) এবং খাঁড়ী লবণে পরিণত হয়।

পারদের সহিত এই লবণক দ্রাবক মিশ্রিত হইয়া রসকর্পূরে পরিণত হয়। সচারচর রসকর্পূর বলিলে অনেকেই ইংরাজী corrosive sublimate (mercuric chloride) বুঝিয়া থাকেন। কিন্তু উপরিউক্ত উপায় দ্বারা কেবলমাত্র calomel (mercurous chloride) প্রস্তুত হইতে পারে। কারণ, কতক ভাগ গন্ধকদ্রাবক (sulphuric acid) বাষ্পাকার পারদের সহিত মিশ্রিত হয়, এবং তৎপরে এই গন্ধকাম্লযুক্ত পারদ, লবণ ও পারদ রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা শ্বেতভস্ম উৎপাদন করে।

ডাক্তার এন্সিলি সাহেবের কৃত সংস্কৃত ভৈষজ্যরত্নাবলীতে দেখা যায় যে, যে মাদ্রাজ প্রদেশের হিন্দু চিকিৎসকগণ এক উপায়ে অতি উৎকৃষ্ট রসকর্পূর প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এই রসকর্পূর বিশুদ্ধ corrosive sublimate। ঐ প্রদেশের হিন্দু চিকিৎসকগণ সংস্কৃত গ্রন্থানুসারেই প্রস্তুত করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের দেশে উক্ত সংস্কৃত গ্রন্থের ব্যবহার দেখা যায় না।

প্রথমতঃ, তিন তোলা গন্ধক একটি মুচির (crucible) মধ্যে ঢালিয়া দিয়া অগ্নির উপর বসাইতে হইবে। অগ্নির উত্তাপে যখন বেশ গলিয়া যাইবে, তখন তাহাতে বিশ তোলা পারদ ঢালিয়া দিয়া, ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে সমস্তটা বেশ কৃষ্ণভস্মের ন্যায় হইবেক। তৎপরে আর একটি মুচিতে ইষ্টক গুঁড়া ছড়াইয়া, তাহার উপর এক ভাগ লবণ স্থাপন করিয়া, সেই কৃষ্ণভস্ম ঢালিয়া দিয়া, আর একটি মুচি বিপরীতভাবে বসাইয়া সন্ধিস্থান

আবদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে ক্রমাগত এক দিবস অগ্নির উপর পাক করিবে। শীতল হইলে, খুলিয়া উপরিস্থ মুচির গাত্রে শ্বেতবর্ণের রসপুষ্প বা রসকর্পূর পাওয়া যাইবে।

কখন কখন ইহার পরিবর্ত্তে চারি তোলা গন্ধক, বিশ তোলা পারদ ও অর্দ্ধভাগ লবণ দেওয়া যাইতে পারে।

উক্ত রসকর্পূর ২০ তোলার সহিত ২০ তোলা লবণ, ১০ তোলা তুঁতিয়া, ৫ তোলা ফটকিরি, ৫ তোলা সোরা, ৫ তোলা খাঁড়ী লবণ, ২॥০ তোলা হিরাকস, ১।০ তোলা নিসাদল (salammoniac) মিশ্রিত করিয়া, অতি উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে। তৎপরে একটি বড় মুচির ভিতর ঢালিয়া দিয়া, আর একটি মুচি উহার উপর বিপরীত ভাবে বসাইয়া, সন্ধিস্থান পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে বন্ধ করিতে হইবে। তৎপরে, ক্রমাগত দেড়-দিবস প্রজ্বলিত অগ্নির উপর পাক করিতে হইবে। পরে খুলিলে অতি-বিশুদ্ধ রসকর্পূর উপরিস্থ পাত্রের গায়ে পাওয়া যাইবে। মুচির পরিবর্ত্তে একটি বোতল ব্যবহার করা প্রশস্ত। কেবল বোতলের মুখ প্রথমতঃ এক-খণ্ড খড়ি দ্বারা বদ্ধ করিতে হয়। বোতলের গলদেশে সমস্ত রসকর্পূর একত্রিত হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে ইহাকে সৌবীর বলে। তুঁতিয়া, ফটকিরি এবং হিরাকশস্থ গন্ধকাম্ল সোরার সহিত যুক্ত হইয়া, যবক্ষার দ্রাবক Nitric acid উৎপন্ন করে। গন্ধকদ্রাবকের কতকাংশ নিশাদলের সহিত মিশ্রিত হইয়া লবণকদ্রাবক hydrochloric acid উৎপন্ন করে। এই যবক্ষার এবং লবণক-দ্রাবক বাষ্পভাবে মিশ্রিত হওয়ায় ক্লোরাইন (chlorine) প্রস্তুত হয়।

এক্ষণে এই বাষ্পাকার ক্লোরাইন ধূমাকার রসকর্পূরের সহিত যুক্ত হয়। সুতরাং, এই নিয়মে কেবল করোসিব সবলিমেট (corrosive sublimate) পাওয়া যায়। এক জন বিখ্যাত ইংরাজ রসায়নবিৎ পণ্ডিত ইহা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে ;—

"The close resemblance of this ancient method to that practised in Holland at this day is very remarkable. Indeed, were it an object to devise a process for the cheap manufacture of corrosive sublimate from bazar materials and bazar vessels, the most accomplished chemist could make but little improvements in the sagacious though empiric formula of the Tamuls.

"These precepts could only have resulted from the closest combination of observation of chemical phenomena, and of the medicinal effects of the remedies prepared. With precisely similar habits, and with all the aid of modern science, the descendents of these extraordinary men may be reasonably expected to contribute much to the progress of chemical and pharmaceutical knowledge. *

পারদ সম্বন্ধে বলিবার ও শিখিবার অনেক আছে, কিন্তু মাসিক পত্রিকায় আর প্রকাশ করা অসম্ভব বিবেচনায়, এই স্থানেই শেষ করিতে বাধ্য হইলাম।

শ্রীকুলভূষণ ভাতুড়ী।

ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্য।

ইতিপূর্ব্বে জগদ্‌বিখ্যাত নাবিক ভাস্কো ডা গামার ১৪৯৮ খৃঃ ২০ মে কালিকট বন্দরে উপস্থিতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পর্ত্তুগিজগণ অতি শুভক্ষণে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে উপস্থিত হইয়া, বিশেষ সমাদরের সহিত গৃহীত হয়।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই মলবার উপকূলে খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ও কাল-ক্রমে তথায় খৃষ্টানের সম্মান ও প্রতিপত্তি বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয়। অতি সংক্ষেপে দক্ষিণাপথে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচলনসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে, সেণ্ট টমাস নামে জনৈক মহাপুরুষ মেসোপটেমিয়া দেশে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য জলপথে ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সকট্রা দ্বীপের অধিবাসীগণকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, তিনি মলবার উপকূলে উপনীত হন। মলবার ও করমণ্ডল উপকূলে তাঁহার দ্বারা খৃষ্টধর্ম্মের

মাহাত্ম্য প্রচারিত হইতে থাকে। খৃষ্টীয় ৬৮ শাকের ডিসেম্বর মাসে, তিনি বর্ত্তমান মান্দ্রাজ নগরের নিকটস্থ মলিয়াপুরে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ উপস্থিত হন। তত্রত্য হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের উত্তেজনায়, অজ্ঞ হিন্দুরা তাঁহার প্রাণ-বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হয়। হিন্দুরা তাঁহার প্রতি অবিশ্রান্ত অত্যাচার করিতে থাকে। ২১শে ডিসেম্বর হিন্দুদিগের নিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডের প্রহারে তিনি মৃতপ্রায় হন। অবশেষে জনৈক নিষ্ঠুর হিন্দুর নিক্ষিপ্ত বর্ষার আঘাতে, মলিয়াপুরে এই মহাত্মার নশ্বর জীবনের অবসান হয়। যে স্থলে এই মহাপুরুষের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, অদ্যাপি সেই স্থান "সেণ্ট টমাস শৈল" নামে প্রসিদ্ধ। ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে মৃত মহাত্মার অস্থি মলিয়াপুর হইতে মেসোপটে-মিয়ার অন্তর্গত এডেস নগরে নীত হইয়া, মহা সমারোহে সমাহিত হয়। ১৫২২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগিজগণ মান্দ্রাজ হইতে গোয়া নগরে মৃত মহাত্মার নশ্বর দেহের অবশেষ আনয়ন করিয়া সমাহিত করেন। কাহারও মতে সেণ্ট টমাস পারস্য ও মধ্য-এসিয়ায় খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিয়া, ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলমিস নগরে নিহত হন।

সেণ্ট টমাস দক্ষিণভারতে খৃষ্টধর্ম্মের যে বীজ বপন করিয়া জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করেন, তাহা কালক্রমে সুফল প্রসব করিতে থাকে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে (১১০খৃঃ) এক শত বাণিজ্যপোত সহ রোম্যান বণিকগণ লোহিতসাগরের তীরবর্ত্তী মিয়স-হার্ম্মস নামক বন্দর হইতে আরব ও সিংহল দ্বীপ পরিদর্শন করিয়া মলবারে উপনীত হন। তাঁহারা মলবার উপকূলে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী যে সকল ইহুদিকে উপনিবিষ্ট দর্শন করেন, তাহাদের বংশধরেরা অদ্যাপি তথায় "বেনি-ইজরেইল" নামে পরিচিত। সেণ্ট টমাসের মৃত্যুর পর, এই সকল ইহুদি বণিকদিগের দ্বারা দক্ষিণ ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম পুনঃ-প্রবর্ত্তিত হয়। রোম্যান বণিকেরা যে বাণিজ্যার্থ খৃষ্টের আবির্ভাবের পরে ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রোম্যান সম্রাট আগাষ্টাস, টাইবিরিয়াস ও নিরোর নামাঙ্কিত, বহু শত রৌপ্য মুদ্রার আবি-ষ্কার দ্বারা তাহা সপ্রমাণিত হইতেছে। ১৮৪২ খৃঃ কোইম্বাটুরে, ও ১৮৫০খৃঃ কলিকটে, পূর্ব্বোক্ত সম্রাটদিগের নামাঙ্কিত বহু শত রৌপ্য মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে পঞ্জাবের অন্তর্গত হাজারা প্রদেশে রোম্যান সম্রাট-দিগের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া, রোমের সহিত ভারতবর্ষের স্থলপথে বাণিজ্যের পরিচয় দিতেছে।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বোক্ত রোম্যান বণিকদিগের নিকট আলেকজেন্দ্রিয়া নগরীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক পেণ্টিনাস, মলবার উপকূলে খৃষ্টধর্ম্মের অস্তিত্বের বিষয়,শেষভাগে অবগত হন। ইতিপূর্ব্বে, খৃষ্টের শিষ্য সেণ্ট বার্থোলমিউ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া, মলবারের খৃষ্টানদিগের মধ্যে হিব্রুভাষায় রচিত "মেথুর লিখিত সুসমাচার" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তকের অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত করেন। পোটাসের ধর্ম্মযাজক বিসপ সেণ্ট হিপোলিটাস ২২০ খৃঃ এই বার্থোলমিউকে ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পেণ্টিনাস মলবার উপকূলে আগমন করিয়া, তথায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত দেখিতে পান।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে (২৭৭ খৃঃ) টমাস মেনিকিয়ান খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য মলবার উপকূলে আগমন করেন। কথিত আছে, ব্যাবিলনের প্যাট্রিয়ার্ক (প্রধান ধর্ম্মযাজক) দক্ষিণ ভারতীয় খৃষ্টধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করেন। অনুমান ৩৫৫ খৃঃ প্রধান ধর্ম্মযাজক এথেনেসিয়াস পাদরী ফ্রুমেণ্টাসকে মলবারে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আরম্ভে সুপ্রসিদ্ধ নেষ্টারিয়াস আবির্ভূত হন। তিনি কুমারী মেরীকে খৃষ্টের মাতা বলিয়া অস্বীকার করাতে, ৪৩১ খৃঃ এফিসাস নগরীর ধর্ম্মসভা দ্বারা সমাজচ্যুত হন। পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী পারস্যবাসী খৃষ্টানদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, এক নূতন দলের প্রতিষ্ঠা করে। সেণ্ট টমাসের মতাবলম্বী খৃষ্টানেরা এই নূতন দলের সহিত যোগ দিয়া, নেষ্টারিয়ান খৃষ্টানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ব্যাবিলন নগরে তাহাদের প্রধান ধর্ম্মযাজক দলপতিরূপে অবস্থিতি করিতে থাকেন। প্রাচীন সিরীয় ভাষায় তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত ও ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় বলিয়া, তাহারা "সিরীয়ান খৃষ্টান" নামে অভিহিত। পঞ্চম শতাব্দীতে এই অভিনব খৃষ্টধর্ম্ম ইউরোপ ও আফ্রিকা হইতে বিতাড়িত ও নির্ব্বাসিত হইয়া, আসিয়া মহাদেশের পশ্চিমাংশে ও মলবার উপকূলে আশ্রয় গ্রহণ করে। খৃষ্টীয় পঞ্চম হইতে পঞ্চদশতম শতাব্দী পর্য্যন্ত চীনদেশ হইতে সাইপ্রাস দ্বীপ পর্য্যন্ত, এই নবীন ধর্ম্ম প্রভুত্ব করিতে থাকে। সিংহল ও মলবার উপকূলে পারস্য দেশ হইতে ধর্ম্মযাজকগণ প্রেরিত হইতে থাকে।

ব্দীতে মলবার-উপকূলস্থ কল্যাণ নগরে পারস্য হইতে প্রেরিত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক বাস করিত।

অতি প্রাচীনকাল হইতে মলবারে যদিও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তথাপি তাহা অতি হীন অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। ৬৬০ খৃঃ জিসেজেবাস নামে পাদরী পারস্যের প্রধান ধর্ম্মযাজক সাইমিয়নকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে উল্লিখিত ছিল যে, দক্ষিণভারতে খৃষ্টানদিগের মধ্যে কোনও রীতিমত ধর্ম্মযাজক ও প্রচারক বর্ত্তমান নাই। অষ্টম শতাব্দীতে আর্ম্মেণীয় বণিক টমাস বাণিজ্যার্থ মলবার উপকূলে উপনিবিষ্ট হন। তিনি দুইটি ভারতীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত কালক্রমে তাঁহার বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। তিনি খৃষ্টানগণের দুরাবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। সেই সময়ে (প্রায় ৭৮০ খৃঃ) মলবারের সিরিয়ান খৃষ্টানেরা, নানাবিধ অত্যাচারে উৎপীড়নে মৃতপ্রায় হইয়া, অতি হীন অবস্থায় পর্ব্বত, অরণ্য প্রভৃতি দুর্গম স্থানে বাস করিতেছিল; তিনি দেশীয় রাজাদিগের নিকট হইতে এই আদেশ বাহির করেন যে, স্বধর্ম্ম অনুসারে ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে খৃষ্টানদিগের উপর কোনও অত্যাচার ও উৎপীড়ন সংঘটিত হইবে না। তিনি এই অনুগ্রহলাভে পরম প্রীত হইয়া, মলবার উপকূলে খৃষ্টধর্ম্মের প্রধান যাজক ও প্রচারকের পদে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হন, এবং ধর্ম্মালোচনায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পাদরী জোর্ডেনাস মলবারে খৃষ্টানদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাব অন্তর্হিত দেখিতে পান। এই নামমাত্র খৃষ্টানগণ, সেণ্ট টমাসকেই খৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মানুমোদিত অভিষেক (Baptism) ক্রিয়া পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়।

পর্ত্তুগিজ জাতির ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে আগমনের পূর্ব্বে, মলবারের খৃষ্টানগণ সুপ্রসিদ্ধ শিখজাতির ন্যায়, ভারতীয় নৃপতিদিগের আশ্রয়ে রণনিপুণ জাতিতে পরিণত হয়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে, দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নরপতি চেরুমল, পেরুমল এক সনন্দ দ্বারা তাহাদিগকে নায়রজাতীয় সম্ভ্রান্ত লোকের যাবতীয় স্বত্তাধিকার প্রদান করিয়া, আপনার অধিকার মধ্যে খৃষ্টানদিগকে নায়রদিগের সমতুল্য করিয়া তোলেন। স্থানীয় রাজারা খৃষ্টানদিগকে শরীররক্ষণাদি অতিবিশ্বস্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া পুরস্কৃত করেন। বারুদ, বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে সবিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়া, ভারতীয়

হইত। এইরূপে মলবারে খৃষ্টানের সম্মান ও প্রতিপত্তি সবিশেষ বর্দ্ধিত হয়। পর্ত্তুগিজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা, এই মলবার উপকূলে সর্ব্বপ্রথম আগত হইয়া, প্রথমাবধি বিশেষ সমাদর ও অভ্যর্থনা লাভ করেন।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো ডা গামার কালিকট বন্দরে উপস্থিতির পর হইতে ক্রমান্বয়ে ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত, প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন অবস্থায় পর্ত্তুগাল ভারতীয় বাণিজ্য অধিকার ও উপভোগ করিয়া, সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করে। এই সময়ে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য পর্ত্তুগাল, শোভা ও সমৃদ্ধি, ধন ও মান, সাহিত্য ও বিজ্ঞান, সভ্যতা ও প্রতিপত্তিতে, ইউরোপের আদর্শস্থানীয়,অদ্বিতীয় রাজ্যে পরিণত হয়। এই সময় হইতে ভারতীয় বাণিজ্য মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী আরব ও মুরদিগের হস্তচ্যুত হইয়া, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পর্ত্তুগালের হস্তগত হয়। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল হইতে চীন ও জাপান পর্য্যন্ত প্রাচীন মহাদেশের সমগ্র সমুদ্রতীরে ও যাবতীয় প্রধান প্রধান বন্দরে, পর্ত্তুগিজ জাতির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতে ইটালীর অধোগতির আরম্ভ, এবং ভূমধ্যসাগরের পরিবর্ত্তে আটলাণ্টিক মহাসাগর সভ্যতা ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ক্ষুদ্র পর্ত্তুগালের অর্দ্ধেক অধিবাসী স্বদেশ ছাড়িয়া এই অতীব লাভজনক বাণিজ্যব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়। পর্ত্তুগিজ বণিকেরা ভারতীয় বন্দরসমূহের সর্ব্বতোমুখ আধিপত্য লাভ করিয়া, পর্ত্তুগালের নরপতির নামে ভারতীয় ও পূর্ব্বাঞ্চলীয় বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয় পূর্ব্বক, লিসবন নগরে তাহা প্রেরণ করিতে থাকে। ভারতীয় মসলা, অগুরু, চন্দন, এবং মণিমুক্তাদি বহুমূল্য দ্রব্যজাত সুলভ মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য, দলে দলে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি লিসবন নগরে সমাগত হইতে থাকে। মিসর ও আসিয়া মাইনর হইতে অধিক মূল্য ও শুল্ক দিয়া, জল ও স্থলপথে, ভেনিস্, জেনোয়া প্রভৃতি ইতালীয় নগরী ভারতীয় দ্রব্যজাতের ক্রয়বিক্রয় দ্বারা ইতিপূর্ব্বে বিলক্ষণ লাভবান ও সমৃদ্ধ হইতেছিল। এই সময় হইতে তাহাদের এই লাভকর বাণিজ্যের দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়,এবং ইতালীর অধোগতির সূচনা হয়। ফ্লোরেন্স নগরের পশমের বিস্তীর্ণ ব্যবসায়,ভেনিস,পিসা ও জেনোয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য ও উপনিবেশের মূলে, এই সময়ে কুঠারাঘাত পতিত হইয়া, ইতালীর শোভা সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইতে থাকে। বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে এই সময়েই ইতালী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, ফ্রান্স ও স্পেন রাজ্যের রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। অবিলম্বে ইতালী বিজিত ও বিভক্ত হইয়া, দাসত্বের কঠোর নিগড়বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই

সময় হইতে মিসর ও তুরুস্কের বৈদেশিক বাণিজ্যজাত আয়ের যথেষ্ট হ্রাস হয়। আলেপো, আলেকজেন্দ্রিয়া, ট্রেবিজন্দ, জেনোয়া, ভেনিস, অগসবার্গ ও নুরেমবার্গ নগরীর শোভা সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়। প্রাচীন সভ্যতা ও উন্নতির কেন্দ্রস্থল ভূমধ্যসাগর হইতে, সৌভাগ্যলক্ষ্মী আটলাণ্টিক মহাসাগরের পূর্ব্বতীরে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা ও সাহিত্য, বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ইতালী ও জর্ম্মণী হইতে অন্তর্হিত হইয়া, আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীরে অবিলম্বে উপনীত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ইতালী ও জর্ম্মনীর মধ্যে, ইউরোপের প্রতিভা ও শিল্পবিজ্ঞান আবদ্ধ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের পশ্চিম উপকূল প্রতিভা ও মহত্ত্বের আকরে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা নগণ্য পর্ত্তুগাল পশ্চিম ইউরোপে এই অতিগৌরবান্বিত নবযুগ প্রবর্ত্তিত করেন। ভারতবর্ষের আবিষ্কারচেষ্টায়, কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কৃত করিয়া, এই নবযুগের প্রবর্ত্তনে পর্ত্তুগালের যৎপরোনাস্তি সাহায্য করেন।

পর্ত্তুগালের এই স্বর্ণযুগে, লিসবন নগরী ভারতীয় ও প্রাচ্য বাণিজ্যের অদ্বিতীয় কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। ওলন্দাজ ও ইংরেজ বণিকেরা লিসবন হইতে ভারতীয় বহুমূল্য বাণিজ্যদ্রব্য আনয়ন পূর্ব্বক, ইউরোপের সর্ব্বত্র ক্রয় বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হয়। বাণিজ্যজীবী ওলন্দাজদিগের দ্বারা এই সময়ে এণ্টোয়ার্প নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভূয়সী সমৃদ্ধি লাভ করে। লিসবন ও এণ্টোয়ার্পের বন্দর বহুলোকে আকীর্ণ এবং বাণিজ্যের অদ্বিতীয় কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠে। বাণিজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এণ্টোয়ার্পে জনতার এত দূর বৃদ্ধি হয় যে, ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে নগরের পুরাতন প্রাচীর ভগ্ন করিয়া তাহার আয়তন বিশেষরূপে বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইয়া উঠে। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের আদেশে, পার্ম্মার ডিউক বিদ্রোহী ওলন্দাজদিগের দমনের জন্য এণ্টোয়ার্প অবরোধ করেন। তদবধি এই সমৃদ্ধ নগরের অবনতি আরম্ভ হইয়া, আমষ্টারডাম ও লণ্ডন নগরের শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি সাধিত হইতে থাকে। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েষ্টফেলিয়া নগরের সন্ধিপত্রের দ্বারা, এণ্টোয়ার্পের বাণিজ্যবৈভব একবারে অন্তর্হিত হয়।

পর্ত্তুগাল প্রজাতন্ত্র ভেনিস নগরীর বৈদেশিক বাণিজ্য হস্তগত করিয়া, ভেনিসের বৈদেশিক অধিকারের শাসনপ্রণালী ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত করে। পর্ত্তুগিজদিগের প্রচলিত শাসনপ্রণালী, অদ্যাপি ভারতবর্ষের অনেকাংশে

অব্যাহত ভাবে প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। সাইপ্রাস, ক্রীট, ইউবিয়া ও মোরিয়া প্রভৃতি স্থানে যে প্রণালী অন্যূন পাঁচ শত বৎসর ভেনিস প্রবর্ত্তিত রাখে, পর্ত্তুগাল, ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে নানা স্থান অধিকারপূর্ব্বক, সেই শাসনপ্রণালী ভেনিসের পদানুসরণক্রমে প্রচলিত করে। ভেনিস প্রত্যেক উপনিবেশে এক জন সম্ভ্রান্ত ভেনিসিয়ানকে দুই বৎসরের জন্য শাসন কর্ত্তা-রূপে প্রেরণ করিত। কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভেনিসিয়ান দ্বারা তাঁহার মন্ত্রীসভা গঠিত হইত। অন্যান্য ভেনিসিয় কর্ম্মচারী, শাসনকার্য্যে রাজপ্রতিনিধির সাহায্য করিত। স্থানীয় লোকের শাসনকার্য্যে কোনও অধিকার থাকিত না। ভারতবর্ষের অধিকার ও বাণিজ্যবিস্তারের নিমিত্ত, রাজা ইমানুয়েল, তিন বৎসরের জন্য ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে আলমিডা নামক জনৈক সভাসদকে রাজপ্রতি-নিধি নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। পর্ত্তুগিজদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষের বিবরণ ভবিষ্যতে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে ইচ্ছা রহিল।

১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রাজা তৃতীয় জনের পুত্র সিবাষ্টিয়ান মুরদিগের সহিত সমরে নিহত হইলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে স্পেন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর দ্বিতীয় ফিলিপ এই সুযোগে পর্ত্তুগালের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া, তাহার সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। এই সময় হইতে পর্ত্তুগালের সৌভাগ্যলক্ষ্মী বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে চিরকালের জন্য অন্তর্হিতা হইলেন। পর্ত্তুগাল অধিকারের পর, ফিলিপ নব বলে বলীয়ান হইয়া, ইংলণ্ডের সহিত তুমুল সংগ্রামের আয়োজন করিলেন। অবিলম্বে লিসবন নগরের সহিত ইংরেজ বণিকগণের বাণিজ্য রহিত হইল। তাহারা ওলন্দাজ বণিকদিগের নিকট হইতে দুই তিন গুণ অধিক মূল্য দিয়া ভারতীয় বাণিজ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে, অতি পরাক্রান্ত স্পেনিস রণতরীর পরাজয়-সাধনের পর, ইংলণ্ডে বাণিজ্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইল।

১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রোটেষ্টাট ধর্ম্মের অনুরাগী হলেণ্ড, স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ রক্ষার্থ ব্যগ্র হইয়া, স্পেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল। লিসবনের বন্দরে তাহাদের বাণিজ্য জাহাজ ধৃত হওয়াতে, ভারতীয় দ্রব্যপ্রাপ্তির দ্বার অবরুদ্ধ হইল। তদবধি ওলন্দাজেরা ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ আগমন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তাহারা পর্ত্তুগালের ভারতীয় বাণিজ্য হস্তগত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। পর্ত্তুগিজ জাতির বহুসংখ্যক বাণিজ্য জাহাজ ও বন্দর, বিদ্রোহী ওলন্দাজদিগের হস্তগত ও অধিকৃত হইতে লাগিল। দীর্ঘকালব্যাপী

তুমুল ও অসম যুদ্ধবিগ্রহের পর, হলেণ্ড স্বাধীনতা লাভ করিয়া, পর্ত্তুগালের ভারতীয় বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করিল। ফিলিপের অত্যাচারে এক দিকে যেমন, পর্ত্তুগালের অধঃপতন হইল, এবং তাহার বাণিজ্য-বিষয়ক প্রাধান্য অল্পকালের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল, অপর দিকে তেমনই ওলন্দাজজাতির ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইল। ভারতীয় বাণিজ্য হস্তগত করিয়া, পর্ত্তুগালের ন্যায়, হলেণ্ডও উন্নতির চরমসীমায় অধিরূঢ় হইল। ইউরোপের অন্যান্য দেশের শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত হইয়া, ভারতীয় বাণিজ্য-লাভের পর, হলেণ্ড, শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সভ্যতায় সমগ্র ইউরোপকে অতিক্রম করিল। ক্ষুদ্র হলেণ্ড, বাণিজ্যবলে অসীমশক্তিশালী হইয়া উঠিল। এইরূপে লিসবনের পরিবর্ত্তে আমষ্টারডাম ইউরোপে বৈদেশিক বাণিজ্যের অদ্বিতীয় কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

আরঙ্গীবের রাজনীতি।

তৃতীয় প্রস্তাব।

সম্রাট সাহজাহান যখন এই প্রকার অবস্থায়, তখন জনরব ঘোষণা করিল, তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। দ্রুত পবনসঞ্চারের মত, এই কথা সুদূরে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার পুত্রদের নিকট পৌঁছিল। সকল যুবরাজই মনে মনে উপায়কল্পনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে পথ দেখাইলেন বাঙ্গালার সাহসুজা।

সুজা পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, সর্ব্বাগ্রে দিল্লী যাত্রা করিলেন। সমস্ত সৈন্যসামন্ত তিনি পূর্ব্ব হইতেই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। তিনি শস্যশ্যামলা ফলজলপূর্ণা বঙ্গভূমির শাসনকর্ত্তৃত্ব পাইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার অর্থাভাবও ছিল না। সুজা ঈশ্বরের নাম লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন। সেই অগণ্য বাহিনী তাঁহার সঙ্গে দিল্লী অভিমুখে চলিল। "মৃত্যু না হয় সিংহাসন" এই কথা বলিয়া, সাহ সুজা যাত্রা আরম্ভ করিলেন। জনরব যে, পথে সৈন্য বৃদ্ধি করিবার কল্পনায়, তিনি উষ্ট্রপৃষ্ঠে সুবর্ণ মুদ্রা বোঝাই করিয়া লইয়াছিলেন।

সুজার রাজধানীতে আগমনের কথাটা বৃদ্ধ বাদসাহের কাণে উঠিল। সুজা পথে এই কথা প্রচার করিয়াছিলেন যে, "লোভী নীচাশয় দারার হস্তে বিষপ্রয়োগ দ্বারা আমার পিতা, সম্রাটের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছে। আমি পিতৃহন্তাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে রাজধানীতে চলিয়াছি।" এ কথাটাও সাহজাহান না শুনিলেন, এমন নহে। প্রাচীন বাদসাহ এ প্রকার সংকটময় স্থলে "বলপ্রয়োগ" প্রথা আদৌ মনে স্থান না দিয়া, "মিষ্ট বচনের" আশ্রয় লইলেন। তিনি পুত্রকে লিখিলেন, "বৎস! আমি নিরাপদে আছি। পীড়া সাংঘাতিক হইলেও তাহাতে কোনও কুফল হয় নাই। দারার সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এইরূপ উৎকণ্ঠার জন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ দিতেছি। তোমার পিতৃভক্তিও প্রশংসনীয়। আমার অনুরোধ, তুমি বাঙ্গালায় নিজকর্ম্মে ফিরিয়া যাও।"

সুজা পিতার হস্তলিপি দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় ফিরিতে তাঁহার মন সরিল না। দিল্লীতে রাজসভায় তাঁহার যে সমস্ত প্রতিনিধি ছিল, তাহারা সংবাদ দিল, "বাদসাহের পীড়া সাংঘাতিক; এ সময়ে দিল্লীতে না থাকিলে, তাঁহার স্বার্থসিদ্ধির অনেক অন্তরায় উপস্থিত হইবে।" পিতার নিকট হইতে সুজা যে পত্র পাইয়াছিলেন, তাহা গোপন করিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ সসৈন্যে রাজধানী অভিমুখে চলিলেন।

সংবাদটা রাজধানীতে দারার নিকট পৌঁছিল। সাহজাহান তখন আগরায়। তিনি পিতার সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া, স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলেমান সেকোকে সুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সুলেমান সুদক্ষ, সুযোদ্ধা, সুবিবেচক; দারার সদ্গুণরাশির অধিকাংশই তাঁহাতে সন্নিবেশিত ছিল। তথাপি যুবক বলিয়া প্রাচীন মহারাজ জয়সিংহ ও সুবিখ্যাত সেনানী দলিল খাঁ, কুমারের সঙ্গে প্রেরিত হইলেন। দারা গোপনে মহারাজ জয়সিংহকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন "যদি সহজে অনুরোধ উপরোধে সুজা বাঙ্গালায় ফিরিয়া যান, তবে কুমারকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে দিবেন না।"

আগরা ও রাজমহলের মধ্যপথে, উভয় সৈন্যের সম্মিলন হইল। মহারাজ জয়সিংহ কেবল যে অভিজ্ঞতায় প্রবীণ, এরূপ নহে। তাঁহার বীরত্বের অপূর্ব্বকাহিনী কে না জানে? হিন্দু মহারাজকে কুমারেরা ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া চলিতেন; মহারাজ জয়সিংহ শিবির সংস্থাপন করিয়াই, যুবরাজ সাহ সুজার কাছে নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠাইলেন।

মহারাজ জয়সিংহের পত্র।

যুবরাজ!

আপনি যেরূপ পিতৃস্নেহ-উদ্বেলিত হৃদয়ে এই অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ পুত্রোচিত কার্য্য হইয়াছে বটে, কিন্তু অপর পক্ষে সেই পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপনি গৌরবোচিত কার্য্য করেন নাই। আপনি যে পিতার অপঘাতমৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া অপরাধীদিগকে প্রতিফল দিবার জন্য এই বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন, আপনার বীরত্বের পরিচয় প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন, আপনার সেই আরাধ্য পিতা বাদসাহ এখনও জীবিত। আমাদের অধীনস্থ এই বিপুল বাহিনী তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরসমষ্টি—ইহাদের সহিত অযথা কারণে যুদ্ধবিগ্রহাদি বাধাইলে বা ইহাদিগকে বিনাশ করিলে আপনার গৌরবে কলঙ্ক পড়িবে। যুবরাজ! আপনি বাঙ্গালায় ফিরিয়া যান। বীরত্ব যদি কলঙ্কমণ্ডিত হয়, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা অধিক গ্লানিকর আর কিছুই নাই।"

জয়সিংহের পত্র পাইয়া সুজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। প্রাচীন হিন্দু মহারাজকে তিনি সবিশেষ ভক্তি করিতেন; ভয়ও যে না করিতেন, এরূপ নহে। রাজপুতের তরবারির সাহায্য যে মোগলের রাজ্যশাসনপক্ষে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, তাহাও তিনি জানিতেন। কিন্তু এই প্রকার অবস্থায় তাঁহাকে অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না। একবার তাঁহার আগরা-দরবারস্থ প্রণিধিদের "সাবধানবাক্য" মনে জাগিল, একবার মণিমুক্তাময় বহুমূল্য আগরার সিংহাসন ও রাজদণ্ডের কথা মনে পড়িল। সাহ সুজা সরল পথ ত্যাগ করিয়া জয়সিংহকে কৌশলে প্রলোভিত করিবার পথ আবিষ্কার করিলেন,—তাঁহার মনে মনে রহিল যে, জয়সিংহ একটু অসতর্ক হইলেই অমনি সদলে গিয়া তাহার উপর পড়িব। তিনি উত্তর পাঠাইলেন, "মহারাজ! সমস্ত সাম্রাজ্য সাক্ষী যে, পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া ভিন্ন আমার বাঙ্গালা-ত্যাগের আর অন্য কোনও কারণ নাই। পিতা বাদসাহ যখন জীবিত রহিয়াছেন, আর এ সংবাদ আপনার মুখে পাইলাম, তখন আমার অন্য কিছুই অভিলাষ নাই। আপনি শীঘ্র আগরায় ফিরিয়া গিয়া পিতাকে সংবাদ দিবেন যে, আমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। কিন্তু মহারাজ! আপনাকে আমার একটি অনুরোধ,—আশা করি,—এই সামান্য অনুরোধটি অন্ততঃ আমার প্রতি স্নেহের অনুরোধে ও আমার সম্মানরক্ষার

জন্যও পালন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আপনি সৈনদল লইয়া আগে চলিয়া যান; আমি গেলে লোকে জানিবে, আমি ভীত হইয়া পলাইতেছি। আপনি ও আমার ভ্রাতুঃষ্পুত্র স্থলেমান, আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিলে, আমি আপনার উপদেশপালনে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত।"

অন্য লোক হইলে এস্থলে বিড়ম্বিত হইত বটে, কিন্তু জয়সিংহ বলিয়াই তাহা হইল না। মহারাজা বুঝিতে পারিলেন যে, যুবরাজ সহজ পথে চলেন নাই। কিন্তু এ প্রকার প্রস্তাবে অসম্মত হইলে সুজার সহিত তাঁহাদের বিরোধ তৎক্ষণাৎ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, এই ভাবিয়া, তিনি "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই মহদ্বাক্যেরই অনুসরণ করিলেন। তিনি যুবরাজকে বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার প্রস্তাবানুসারেই সমস্ত কার্য্য করা হইবে।

সে কালে কোন প্রকার যুদ্ধযাত্রাকালে মোগল বাদসাহের নিয়মিত সেনাসংখ্যার সহিত অতিরিক্ত কতকগুলি সৈন্যও আসিত। ইহারা প্রকৃত পক্ষে রাজসরকারের অন্নভোজী নহে। তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত কেবল লুঠের সময়ে। লুঠপাঠ করিয়া যাহা কিছু পাওয়া যাইত, তাহারা বখরা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিত। মহারাজ জয়সিংহ কৌশল করিয়া ইহাদেরই দুই চারি দলকে তৎপরদিন প্রত্যুষে অগ্রগামী করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদের সঙ্গে কতক কতক মালপত্রও রওনা হইয়া গেল। সুজার নিযুক্ত চরেরা ভিতরের কথা না জানিয়া, সম্রাট্‌সৈন্যের প্রস্থানবার্ত্তা তাঁহার কর্ণগোচর করিল। আর ভ্রান্ত সুজা দৃপ্তসিংহের ন্যায় অগণ্য বাহিণী সহিত মহারাজ জয়সিংহের সৈন্যসমূহের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিলেন।

মোগলসৈন্য মহারাজ জয়সিংহের শিক্ষামতে এই প্রকার অতর্কিত আক্রমণের গতিরোধ করিতে সম্যক্‌রূপে প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সেই দিনের সেই ক্ষুদ্র যুদ্ধে সাহ সুজার আশা ভরসা স্রোতোমুখগামী তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল। যুবরাজের সৈন্যমধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়াতে, জয়সিংহ বিজয়শ্রী লাভ করিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পলায়মান সুজাকে ধৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিবার বিশেষ কারণ ছিল। দারার উপর তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল। দারা তাঁহাকে উপহাস করিয়া "ওস্তাদজী" বলিতেন। সুজাকে ধরিলে দারারই মনস্তুষ্টি করা হইবে ভাবিয়া, তিনি যুবরাজকে পলায়নের অবসর দিলেন।

এদিকে যখন এই প্রকার হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে, তখন দাক্ষিণাত্যে

কূটবুদ্ধি আরঙ্গীব কি প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা একবার দেখা যাউক।

আরঙ্গীব সংবাদ পাইলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ মুরাদ ইতিপূর্ব্বে সাজিয়া গুজিয়া গুজরাট হইতে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন। সুজা ও মুরাদ, পিতৃ-বিদ্রোহিতা-ক্ষেত্রের প্রথম স্থলে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুচতুর আরঙ্গীব তাহাদের পশ্চাতে থাকিয়া কার্য্য করিতে মনস্থ করিলেন। তিনি প্রচ্ছন্নভাবে মুরাদকে হস্তগত করিয়া তাহার সৈন্য সামন্ত করতলগত করিবার জন্য নিম্নলিখিত চাতুরীময় পত্রখানি তাঁহার শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন।

আরঙ্গীবের পত্র।

"প্রাণাধিক ভ্রাতঃ—তুমি বোধ হয় বিশেষরূপে অবগত আছ—আমি রাজ্যস্পৃহাকে কি প্রকারে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত প্রশমিত করিয়াছি। আমার মনের ইচ্ছা, শীঘ্র রাজনৈতিক কোলাহল হইতে অপসৃত হইয়া আমার এই হীন জীবনের শেষকয়েক বৎসর নির্জ্জনে ঈশ্বরচিন্তায় যাপন করি। জগতের ঐশ্বর্য্য প্রলোভন, আমি ইন্দ্রিয়গুলির ন্যায় জয় করিয়াছি। আমার যাহা কিছু আকাঙ্ক্ষা, তাহা একবারেই নির্ব্বেদমুখে বিসর্জ্জন করিয়াছি। তবে একমাত্র চিন্তার বিষয় এই যে, আমার হৃদয়ের দেবতা ঈশ্বরপ্রেরিত মহম্মদের ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধে আমি এই ক্ষুদ্র ক্ষমতার দ্বারা কিছু সাহায্য করি। আমার সম্মানার্হ পিতা বাদসাহের চারি পুত্রের মধ্যে তুমিই যে আমার এই আন্তরিক উদ্দেশ্যসিদ্ধিকরণার্থে বিশেষ উপযুক্ত পাত্র, তাহার আর সন্দেহ নাই। কেন যে এরূপ বলিলাম, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছি। দারা যে "কাফের" হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সকলেই জানে। সুজা অগ্নি-উপাসক পারসীকের কন্যা বিবাহ করিয়া তাহাদের মতি গতি অবলম্বন করিতেছে। কেবলমাত্র সেই সত্যস্বরূপ মহম্মদে অনুরক্ত আছ তুমি। ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদই ধন্য। "কাফের" বা "পারসীক" সিংহাসনে বসিলে আমার কখনই সহ্য হইবে না। তুমি আমার বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও, আমি এখন হইতে তোমায় সম্রাটের মত সম্মান প্রদর্শন করিব। তুমিই সিংহাসনে বসিবার যোগ্য, রাজমুকুট তোমারই মস্তক ধারণ করিবার উপযুক্ত। তাই আজ তোমায় রাজসম্মান প্রদান করিতেছি। তুমিই প্রকৃত মুসলমান ও বিশ্বাসীদের একমাত্র রক্ষক স্বরূপ। যুবরাজ!

আমায় অনুমতি দাও,আমার সমস্ত সেনা আমি তোমার সহিত মিলিত করি। ধর্ম্মের পক্ষ হইয়া, ধর্ম্মের জন্য আমি ধর্ম্মসমরে যোগদান করি। কাফেরের—অবিশ্বাসীর—অনাচারীর রক্তস্রোতে এই শাণিত কৃপাণের রুধিরতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিয়া, তোমার ধর্ম্মময়-সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিয়া দিই। ভাই! এত সহায়তা যে আমি নিঃস্বার্থভাবে করিতেছি, এরূপ নহে। আমার একটি প্রার্থনার বিষয় আছে। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, যখন তুমি এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া "তক্ততাউস" অধিকার করিবে, তখন আমার একটা বন্দোবস্ত করিয়া আমায় মক্কায় পাঠাইয়া দিও। আমি মহম্মদের কবরোপরি বসিয়া জীবনের শেষ ভাগ তোমাদের মঙ্গল প্রার্থনায় অতিবাহিত করিব।" মুরাদ অতি সহজেই এই পত্রে প্রলুব্ধ হইলেন, তাঁহার হৃদয় ভ্রাতৃপ্রেমে, বিশেষতঃ আরঙ্গীবের অমানুষিক নিঃস্বার্থতায় বিশেষ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আরঙ্গীবের গোঁড়ামির কথা তিনি জানিতেন; এ প্রকার প্রস্তাবের মধ্যে যে কোন গভীর উদ্দেশ্য নিহিত আছে, ইহা তাঁহার মনে আদৌ উদিত হইল না। তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে আরও স্নেহপূর্ণ স্বরে ভ্রাতৃস্নেহপ্রণোদিত যুক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন।

মুরাদ তাঁহার প্রিয় সহচর সাহ আব্বাসের পুনঃ পুনঃ নিষেধসত্ত্বেও, আরঙ্গীবের সৈন্যের সহিত আনন্দে মিলিত হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আরঙ্গীবের চতুরতা এইখানেই পর্য্যবসিত হইল না। তিনি তাঁহার সম্পদে সুহৃদ—বিপদে সহায়—অন্তরে মঙ্গলেচ্ছু মীরজুমলাকে হস্তগত করিবার জন্য এক অভূতপূর্ব্ব উপায় অবলম্বন করিলেন।

দারার কৌশলে আরঙ্গীবের সহায়তাকরণপক্ষে মীরজুমলা সম্পূর্ণরূপে হস্তপদবদ্ধ হইয়াছিলেন। দারা প্রতিভূস্বরূপ তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে দিল্লীতে আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন। মীরজুমলা কোন উপায়ে আরঙ্গীবের সহায়তা করিলেই, দারা অতি সহজেই তাঁহার স্ত্রীপুত্রদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে পারে। এই সকল ভাবিয়া মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও, মীরজুমলা এই বিবেচ্য বিষয়ে শেষ মন্তব্যে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। আরঙ্গীব ইহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি স্বীয় জেষ্ঠ পুত্র মহম্মদকে তাঁহার নিকটে গোপনে পাঠাইয়া সংবাদ দিলেন, "আপনি এক কাজ করিলে দুই দিক্ রক্ষা পায়। আপনার সৈন্যদিগকে পূর্ব্ব হইতেই শিক্ষা দিয়া রাখিবেন যে, আমি আপনাকে ছলক্রমে বন্দী করিব। তাহাদের সম্মুখে বন্দী করিয়া আমি আপ-

নাকে শিবিরে আনিলে দারা ভাবিবেন, এ কার্য্যে আপনার কোন হাত নাই, অথচ আপনার বিপুলবাহিনী আমার করতলগত হইবে।”

কার্য্যে তাহাই হইল, মীরজুমলার সৈন্যসামন্ত আরঞ্জীবের সহিত আসিয়া মিলিল। এই সময়ে আরঞ্জীবের গোঁড়ামিও (অন্ততঃ লোক দেখাইবার জন্য) একটু পর্দ্দা উঠিল। তিনি অশ্বারোহণকালে সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“ঈশ্বর সাক্ষী, আমি ধর্ম্মের রক্ষণার্থে এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি।” “আলকোরাণ” হাতে লইয়া তিনি তাহা দুই চার বার চুম্বন করিয়া বক্ষঃস্থলে স্থাপিত করিলেন। সৈন্যেরা তাঁহার ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দেখিয়া আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি চারিদিকে সাহজাহানের মৃত্যুসংবাদও ঘোষণা করিয়া দিলেন। প্রতিদিন কতকগুলি করিয়া চিঠিপত্র তাঁহার নিকট পৌঁছিতে লাগিল। তিনি সেই সব বাজে চিঠি দেখাইয়া সৈন্যদের বুঝাইয়া দিলেন, এ সব দিল্লী হইতে বাদসাহের মৃত্যুবৃত্তান্ত আনিয়াছে। তাঁহার মুখ বিমর্ষ ও গম্ভীর ভাবে পূর্ণ। তাঁহার দাক্ষিণাত্যত্যাগের পূর্ব্বে সকলে জানিল, সাহজাহান আর ইহলোকে নাই।

আরঞ্জীব মুরাদের সৈন্যদলের সহিত একত্রিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পাছে মুরাদের মনে কোন প্রকার সন্দেহ জন্মে, পাছে তিনি মীরজুমলার সৈন্যদলের সহিত তাঁহার সৈন্যদলের সংমিশ্রণ দেখিয়া কোনও সন্দেহ করেন, এই ভয়ে আরঞ্জীব পুনঃপুনঃ তাঁহাকে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক পত্র পাঠাইতে লাগিলেন। কোন স্থানে গিয়া দুই ভ্রাতার সৈন্যদল একত্রিত হইবে, ইহা মুরাদই স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া দেখা করিতে চাহিলে, আরঞ্জীব বিনয়পূর্ণ বচনে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “সম্রাট তাঁহার ক্রীতদাসের জন্য আগুয়ান হইয়া আসিবেন, ইহা কখন প্রথামত কার্য্য হইতে পারে না। আমিই যত শীঘ্র পারি, সুবিধামতে যাত্রা করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

দুই ভ্রাতায় সাক্ষাৎ হইল। এত স্নেহময়, এত প্রেমময় মিলন লোকে খুব কমই দেখিয়াছিল। মুরাদকে দূরে আসিতে দেখিয়া, আরঞ্জীব সন্ত্রস্তভাবে হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পদব্রজে কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকটস্থ হইয়া, একবারে সম্রাটোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন। মুরাদ তখন মদিরার মোহে উন্মত্ত। হতভাগ্য মুরাদ আরঞ্জীবের এই কৌশলময় ভাব ভঙ্গীতে সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত হইলেন।

এই সময় হইতে আরঞ্জীব মোরাদকে "সম্রাট" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে ও গোপনে সকল সময়ে তাঁহাকে বাদসাহোচিত সম্মান দেখাইতে লাগিলেন। মুরাদ যেখানে বসেন, আরঞ্জীব সেখান হইতে একটু নীচে বসেন। মুরাদ কোন স্থানে গেলে আরঞ্জীব সামান্য শরীর-রক্ষীর ন্যায় তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করেন। সৈন্যচালনার সময় প্রতিপদেই কনিষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ ব্যতীত কোন কাজই করেন না। এই প্রকার অবস্থায় স্বীয় কূটবুদ্ধিতে মুগ্ধ—প্রলুব্ধ—সহজবিশ্বাসী কনিষ্ঠকে প্রতারিত করিয়া, তাঁহারা দুই জনে দিল্লী অভিমুখে চলিলেন।

এদিকে সাহজাহানের দরবার দুই নূতনবিধ গোলযোগের সূচনা দেখিয়া, দারার আদেশমত রাজধানীর দুর্গরক্ষার ব্যাপারে বেশী মনোযোগ দিলেন। "মান্দো" বলিয়া একটি জঙ্গল রাজধানীর অনতিদূরে ছিল। এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, শত্রু যে বিশেষ বলীয়ান হইয়া উঠিতে পারে, তাহা গর্ব্বিত দারার মনে আদৌ স্থান পাইল না। দারা সুজার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মনে মনে আত্মগরিমায় অত্যন্ত স্ফীত হইয়া উঠিতেছিলেন। এক্ষণে সহসা দুই প্রবল শত্রুকে একেবারে সম্মুখীন দেখিয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

মুরাদের সাহসের কথা তিনি জানিতেন, আরঞ্জীবের কূটবুদ্ধি ও নানা-বিধ কৌশলময় কার্য্যপ্রণালীও তিনি অবগত ছিলেন; সুতরাং এক্ষণে যাহাতে এই দুই সহোদরের মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, তাহার উপায়চিন্তায় মনো-নিবেশ করিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে মুরাদকে লিখিলেন, "ভাই! সম্রাট এখনও জীবিত, তবে কেন তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া রাজাবমাননা ও পিতৃ-অবমাননা, এই উভয়বিধ গর্হিত দোষে দূষিত হও?"

মুরাদের চৈতন্য হইল। কি! পিতা সম্রাট—সেই স্নেহময় জনক এখনও জীবিত, আর আমি দুর্ভাগ্য সন্তান তাঁহার এই বৃদ্ধাবস্থায়—এই আসন্ন অব-স্থায়—সামান্য সিংহাসনের জন্য বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত? মুরাদের সরলহৃদয় উল্লিখিত চিন্তায় ভরিয়া উঠিল। তিনি বিবেকের কঠোর দংশনে স্বীয় হৃদয়ে বিশেষ যাতনা অনুভব করিলেন। ত্বরিত পদে আরঞ্জীবের শিবিরে গমন করিয়া, তাঁহাকে পত্র দেখাইয়া বলিলেন, "দাদা! আর না, চল আমরা এই স্থান হইতেই ফিরিয়া যাই। মুরাদবক্‌স পিতৃবিদ্রোহী বলিয়া কলঙ্ক কিনিতে চাহে না। তুমি ফিরিয়া না যাও, আমি এই কলঙ্কিত ব্যাপারে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এখনি প্রস্থান করিব।"

মুরাদের পরিবর্ত্তন দেখিয়া আরঞ্জীব কিয়ৎ পরিমাণে দমিয়া গেলেন। কিন্তু যে কূটবুদ্ধির সহায়ে তিনি ভবিষ্যতে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, সেই কূটবুদ্ধির ছায়া তখনই তাঁহার মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হইল। তিনি সহাস্যে সহজভাবে মুরাদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যুবরাজ! সম্রাটকে অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত করিবার জন্য যে দুর্বৃত্ত দারা সম্পূর্ণরূপে দায়ী, সেই দুষ্টই এই প্রকার বৃথা জনরব প্রচারে আপনার কার্য্যের হন্তারক হইতেছে। সেই প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের দুই ভ্রাতার পথে কণ্টক বিস্তার করিতেছে। আমরা সাবধান না হইলে, তাহার বিস্তীর্ণ বাগুরা হইতে উদ্ধার পাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। এইরূপে একত্রিত না থাকিলেও আমরা নিরাপদ নহি। পিতার অন্যায় হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইতে আমরা উভয়ে অগ্রসর হইয়াছি। এখন যদি আমরা এই সামান্য জনরবে দারার ছলনায় ভীত হইয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করি, এবং সেই পিতৃহন্তার সিংহাসনের পথ সরল করিয়া দিই, তাহা হইলে ইহার অব্যবহিত ফল শীঘ্রই ভোগ করিতে হইবে। তখন এই সহজসাধ্য যুদ্ধ ব্যাপার পরিত্যাগ করিবার জন্য আমাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হইবে।

"প্রিয়তম ভ্রাতঃ—এক্ষেত্রে আমার অপেক্ষা আপনার ক্ষতির ভাগই অধিক। অধার্ম্মিক, কদাচারীকে সিংহাসনে দেখিলে যদিও আমাদের উভয়েরই দুঃখ হইবে, তথাপি আপনি যখন দেখিবেন, আপনার উপযুক্ত রাজদণ্ড সহজে আপনার হস্তস্খলিত হইয়া সর্ব্ববিষয়ে অনুপযুক্ত বিধর্ম্মী দারার হাতে পড়িয়াছে, মুসলমানের গৌরবনিকেতনস্বরূপ দিল্লীর মণিখচিত সিংহাসন "অবিশ্বাসী" "কদাচারী" দারার শরীরভার বহন করিতেছে, তখন আর আপনার অনুতাপ রাখিবার স্থান থাকিবে না। আমাদের অগ্রসর হইতে দিন। আর বৃথা সন্দেহে আলোড়িত হইবেন না। যুদ্ধে জয়ী না হইতে পারিলে আমাদের পতন অনিবার্য্য। দারার নিষ্ঠুরতা ও পাশবিক প্রবৃত্তি তখন আমাদের সম্বন্ধে তাহাদের প্রকৃত সীমা অতিক্রম করিবে। যদি সাহজাহান,—আমাদের স্নেহময় পিতা,—সেই ভারতেশ্বর বস্তুতই জীবিত থাকেন, তখন আমরা তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিব। দিল্লী হইতে স্বরাজ্যে ফিরিয়া যাইব। তিনি এ কার্য্যে আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিলে, কখনও আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না।"

এই সমস্ত কৌশলপূর্ণ উপদেশে, বীচিমালা-আকুলিত সমুদ্রবক্ষের ন্যায়

যুবরাজের চঞ্চল হৃদয়ে রাজ্য ও মণিময় সিংহাসনের বাসনা জাগিয়া উঠিল। তিনি মনে মনে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, এই ভীষণ আহবে আত্মসমর্পণ করিতে অগ্রসর হইলেন। মনের কথা আরঞ্জীবকে খুলিয়া বলিলেন। আর সেই কূটবুদ্ধি প্রগাঢ়রাজনৈতিকজ্ঞানসম্পন্ন, লিপি-কুশলী আরঞ্জীব, ভ্রাতাকে প্রতারিত করিয়া, স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লইলেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

দেবযান।

জুয়ানিতো এল্ মোরেনিতো (Juanito el Morenito) সেভিলের উপনগরী ত্রিয়ানার (Triana) রাস্তায় লালিত পালিত হইয়াছে। সে শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। কোনখানে নির্দ্দিষ্ট আবাস নাই। অযত্নপালিত পরগাছার ন্যায় ঘটনাক্রমে পঞ্চদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। গোটাকতক ফল বা খানকতক শস্তা ভাজা মাছ খাইয়া ও কখন কাহারো আস্তাবলে বা রাস্তার ফুট্‌পাতের উপর শয়ন করিয়া, তাহার দিন কাটিয়াছে। নানারকম কাজ্ করিয়া সে মধ্যে মধ্যে দু'এক পয়সা রোজগার্ করিত, কিন্তু থিয়েটারের দুয়ারে প্রোগ্রাম্ বিক্রী করাই তাহার কাছে সর্ব্বপেক্ষা লাভ-জনক ব্যবসা। ছেঁড়া কাপড় চোপড় হইলেও দেখিতে বেশ সুশ্রী; হাসি-মুখ, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ও উজ্জ্বল চক্ষু দেখিলেই বোধ হয়, তাহার শরীরে কতকটা জিপ্‌সীদিগের রক্ত আছে। জিপ্‌সীদের ন্যায় সে অত্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয়; ও তাহাদিগের মতন ষাঁড়ের লড়াই দেখিতে ও দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহার বড় ভাল লাগিত।

আজ গুড্ ফ্রাইডের দিন তাহার মেজাজ্‌টা কিছু খিট্‌খিটে। ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য পনর দিন সমস্ত থিয়েটার বন্ধ হইয়াছে। এক পয়সা রোজ্‌গার নাই। পকেট একেবারে শূন্য। আরো তাহার দুঃখ,—সে দিন একটা জাঁকাল ষাঁড়ের লড়াই হইবে, কিন্তু অর্থাভাবে তাহার দেখিবার কোন উপায় নাই। যাহা হউক, সেভিলের রাস্তায় কিন্তু একবার ভাগ্যপরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এই মনে করিয়া, মাথা হইতে খড়ের কুটা ঝাড়িয়া, সে একটা

আস্তাবল হইতে বাহির হইল। মনে মনে এস্‌পারাজাঁর (Esperanza) অধিষ্ঠিত খ্রীষ্টজননী কুমারী মেরীর নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে চলিল। মোরেনিতো এই দেবীর কিছু বিশেষ ভক্ত।

প্রাতঃকালটি বড় সুন্দর। সুদূরে ঘননীল আকাশের কোলে গিরাল্ডার রক্তাভ স্তম্ভটি প্রতিভাত হইতেছিল। পথে লোকারণ্য। নিকটবর্ত্তী জনপদবাসীরা Confradiasএর যাত্রোৎসবে যোগ দিবার নিমিত্ত সেভিলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

Plaza de Tors নামক বাগানের নিকট আসিয়াই দেখিল, টিকিট্‌-ঘরের সম্মুখে রাস্তায় অসংখ্য লোক জড় হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া তাহার মনের দুঃখটা আরো ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। চারি ঘণ্টা খালি পায়ে নগরের পাথর-বাঁধান রাস্তায় ভাজা মাছের ও গরম পিঠার গন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে,—বিচিত্রবস্ত্রপরিহিত মল্লদিগের পশ্চাতে অনেক বিশ্রামগৃহে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এক কপর্দ্দকও উপার্জ্জন হয় নাই। আজ ভাগ্যদেবী তাহার উপর নিতান্তই অপ্রসন্ন। সকল স্থানেই বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইতেছিল। যাহারা প্রধান প্রধান পাণ্ডার নাম ও যাত্রার বিবরণ সম্বলিত কাগজ বিক্রয় করিতেছিল, তাহারা দেরী হইয়াছে বলিয়া হাঁকাইয়া দিল। দু'একটি পিয়াস্তর উপার্জ্জন করিবার আর কোনও প্রকার উপায় সে ঠাওরাইয়া পাইতেছিল না। অবশেষে উদরের জ্বালায় ও রৌদ্রের প্রখরতাপে ক্লান্ত হইয়া, একটি বাগানের ফটকের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। সেই উদ্যান হইতেই দেবযাত্রা আরম্ভ হইবে।

বিশ্রাম করিতে করিতে সে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমটা প্রাতরাশের কাজ করিল। মোরেনিতোকে বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। এক হাতের উপর মাথার কাল কোঁকড়া চুলগুলি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভ্রূ কৃষ্ণ ও আকর্ণবিশ্রান্ত। প্রবালরক্ত অধরোষ্ঠের ভিতর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্ত একটু একটু দেখা যাইতেছিল।

সেই সময় একজন ভ্রমণকারী যুবক ও একটি যুবতী সেই স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহারা হয় ত দম্পতী। সুন্দরীটি অপরের হস্তের উপর যেরূপ ভর দিয়া যাইতেছিল, তাহাতে বোধ হয়, দম্পতী না হইলেও, তাহারা প্রণয়ী।

যুবক বলিল,—"দেখ—ছোঁড়াটা কি সুন্দর। কি চমৎকার ছবি! হাবভাব সমস্ত নিখুঁত। আর হাতখানিও যেন অদৃষ্টদেবীর উপহারের অপেক্ষায় বাড়াইয়া রহিয়াছে।"

"আচ্ছা, এই সময় ওর মুঠার মধ্যে যদি টাকা দেওয়া যায়—ও জেগে উঠে না জানি কি আশ্চর্য্যই হবে?"

প্রণয়ীরা প্রায়ই দাতা। যুবক একটি রৌপ্যমুদ্রা বালকের উন্মুক্ত তালুতে দিল। শীতল ধাতুস্পর্শে তাহার করতল একটু গুটাইয়া আসিল। প্রণয়ী-যুগল হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

মোরেনিতো স্বপ্ন দেখিতেছিল, যেন পবিত্র কুমারী, ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিচিত্রবর্ণ সোপান দিয়া আকাশ হইতে নামিয়া আসিতেছেন। তাঁহার মস্তকে পদ্মের মুকুট, হস্তে কয়েকটি শ্বেত গোলাপ। তিনি বীণাবিনিন্দিত-স্বরে যেন বলিলেন, "জুয়ানিতো! তুমি প্রত্যহ সকালে বিকালে আমায় ডাক। আজ আমার জ্যোতির্ম্ময় পুত্রের উত্থানের দিন—আজ আমি তোমার কামনা পূরণ করিব। তুমি আজ বৃষযুদ্ধ দেখিতে পাইবে।" এই কথা বলিয়া, দেবরাণী মেরী তাহার হস্তে কয়েকটা গোলাপের পাপড়ি ভাঙ্গিয়া দিলেন,—কিন্তু পাপড়িগুলি মোরেনিতোর হস্তে রৌপ্যময় হইল। আহ্লাদে মোরেনিতোর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

সে শিলাশয়ন হইতে গাত্রোত্থান করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, হাত হইতে একটা রৌপ্যমুদ্রা পাথরের উপর পড়িয়া ঝন্ ঝন্ শব্দ হইয়া উঠিল। সে কিছুতেই এই অসম্ভব ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। সে মুদ্রাটি কুড়াইয়া লইল, ইহা একটি নূতন পাঁচ পিয়াস্তর। তবে দেবজননীর কথা মিথ্যা নয়! এক লাফে সে Plaza de Torsর দিকে ছুটিল।

একটা মোড় ফিরিতেই একটি বালিকার সহিত তাহার ধাক্কা লাগিল। মোরেনিতো তাহাকে চিনিতে পারিল। বালিকার বাড়ীও সেভিলের উপনগরী ত্রিয়ানাতে। বালিকার মুখখানি ম্লান ও বড় বড় কাল চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত। মেরেনিতো বলিল, "কি হয়েছে সাতা (La Chatta)?"

"আমার মায়ের বড় অসুখ। দু'রাত্রি মোটে আমার ঘুম্ হয়নি। ডাক্তার সকাল বেলা দেখে একটা ওষুধ খেতে বলে গেছে, কিন্তু সেই বুড়া দোকানদার টাকা না হ'লে আর ওষুধ্ দেবে না। কি করি? কিন্তু মা যদি মরে যায়, আমি আর বেশী দিন বাঁচব না।"

মোরেনিতো সেই অশ্রুপূর্ণ মুখখানির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর হটাৎ সেই অদ্ভুত পিয়াস্তরটি বালিকার করতলে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "মিনা মিয়া! (mina mia=আদরের সম্ভাষণ) এই টাকা নাও। এটি আমি Esperanzaর কুমারী মেরীর কাছ হইতে পাইয়াছি। তোমার মার অসুখ ভাল হবার জন্য দিলে তিনি বোধ হয় রাগ করিবেন না।"

লা-সাতা আহ্লাদে অধীর হইয়া ঔষধ কিনিবার জন্য ছুটিল। মোরেনিতোকে ধন্যবাদ দিবারও তার অবসর ছিল না।

মোরেনিতোর আর বৃষযুদ্ধ দেখা ঘটিয়া উঠিল না। কিন্তু ত্যাগস্বীকারের পুরস্কার আছেই। পরের রবিবারে লা-সাতার মা একটু ভাল থাকায় বালিকা জুয়ানিতোকে খুঁজিয়া বাহির করিল। লা-সাতা ঔষধ কিনিয়া মোরেনিতোর প্রদত্ত মুদ্রার অবশিষ্টাংশ দিয়া দুইটি লাল গোলাপ ফুল কিনিয়াছিল। সে ফুল দুটি কাল চুলের তরঙ্গের মধ্যে গুঁজিয়া আসিয়াছিল। দু'জনে,নগরোপান্তে নেবুফুলের গন্ধে আমোদিত Guadalquiver নদীর ধারে বেড়াইতে গেল।

নববসন্তসমাগমে বালিকার মুখখানি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। হয় ত বা হৃদয়ের মধ্যে কি মধুময় ভাবের জন্য কচি মুখখানি এত সুন্দর ও কোমল দেখাইতেছিল। একটি নিভৃত কুঞ্জের মধ্যে পৌঁছিয়া বালিকা মোরেনিতোর কণ্ঠ জড়াইয়া বলিল—Te quiero, companireo—"আমি তোমায় ভাল বাসি, সখা।" যখন এই পর্ব্বোপলক্ষে চারিদিকের মন্দিরে ঘণ্টা বাজিতেছিল, তখন নদীকুলে শষ্পশয্যায় বসিয়া, দুইটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক বালিকা প্রথম প্রণয়ের মধুর চুম্বন আদান প্রদান করিতেছিল। (১)

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

সাংখ্যস্বরলিপি।

তানসেনের গান।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

প্যারে! (২) তুহি ব্রহ্ম (৩) তুহি বিষ্ণু তুহি শেষ তুহি মহেশ
তুহি আদ তুহি নাদ তুহি অনাদ তুহি গণেশ।

(১) Andre Theuriet.

(২) আস্থায়ী প্রকৃতরূপে "তুহি ব্রহ্ম—" হইতে আরম্ভ হইয়াছে। "প্যারে" কথাটি আস্থায়ীর অতিরিক্ত।

(৩) বঙ্গীয় পাঠকেরা সচরাচর ব্রহ্ম না বলিয়া ব্রম্‌হ্ উচ্চারণ করেন। হকার শ্বাস মকারের পরে ফেলিয়া তাঁহারা উচ্চারণের বিড়ম্বনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ব্রহ্মার

জল স্থল মরুত ব্যোম তুহি অকার যম সোম
তুহি উকার তুহি মকার নিরাকার তুহি ধনেশ।
তুহি বেদ তুহি পুরাণ তুহি হদীশ তুহি কোরাণ
তুহি ধ্যান তুহি জ্ঞান তুহি ভুবনেশ।
তানসেন কহে ব্যান তুহি দেন তুহি রয়্‌ন
তুহি ঘরি পলছন তুহি বরুণ তুহি দিনেশ॥

তালি। ৩ঃ। ০। ৪। ০। ১। ২। আরম্ভ। স্থা। অ। ভো।
মাত্রা। ৪। ৪। ৪। ৪। ৪। ৪। তালি। ৩। ৩। ৩।

(স্থা)। ১ ১ সা সা। রে রে রে রে। রে রে
(স্থা)। প্যা রে। তু হি — —। — —

রে রে। -পা -মা মা মা। গ্‌মা রে রে রে। রে
ব্র —। — — হ্‌ম —। তু হি — —। —

-সা সা — নি (২)। -সা সা সা সা। সা -নি (২) সা
— বি —। — — ম্ভু —। তু — হি

-নি (২)। — সা সা রে রে। -গাঁ গাঁ রে —সা। সা
—। — — শে —। — — ষ —। তু

সা স্‌রে — নিঁ (২)। নিঁ (২) নিঁ (২) নিঁ (২) — ধা (২)। নিঁ (২) — ধা (২)
— হি —। ম — হে —। — —

প্রকৃত উচ্চারণে মকারের পূর্ব্বে হকারের শ্বাস ফেলিতে হইবে। আমি প্রকৃত উচ্চারণানুযায়ী "ব্রহ্ম" কথাটির শব্দ বিভাগ করিয়া স্বরের নিম্নে বসাইয়াছি। যথা

রে রে। পা — মা মা মা।
ব্র —। — — হ্‌ম —।

অথবা এরূপেও বসাইলে বসাইতে পারা যায়ঃ— রে রে। পা — মা মা মা।
ব্র —। হ — ম্ম —।

কিন্তু যদি "ব্রহ্ম" কথাটির বঙ্গীয় উচ্চারণানুযায়ী শব্দ বিভাগ করিয়া স্বরগুলির নিম্নে বসাইতাম, তাহা হইলে এইরূপ হইত ঃ—

রে রে। — পা — মা মা মা।
ব্রম্‌ —। — — হ —।

পা পা । মা মা মা মা ।—গ্‌মা —রে মা মা ।
২ ২
শ — । তু হি — — । — — আ — ।

মা মা মা মা । মা মা পা —মা । পা পা
— — দ — । তু — হি — । — —

২ ২ ২ ২ ১ ২ ২
ন্‌সা—নি । সা সা সা সা । সা — নি রে
না — । — — দ — । তু — হি

২ ২ ২ ২ ২ ২
—সা । সা সা সা—রে । নিঁ — সা নিঁ —ধা ।
— । অ — না — । — — দ — ।

প্‌ধা ধা পা —মা । মা — গা গ্‌মা —রে ।—গা
তু — হি — । গ — ণে — । —

গা সা সা । (স্থা—পু) । রে রে রে রে ।
— শ — । (স্থা—পু) । তু হি — — ।

রে রে রে রে । -পা পা মা মা । গ্‌মা
— — ব্র — । — — হ্ম — । তু

রে রে রে। রে—সা সা—ম্রি। —সা সা সা -সা।
২
হি — —। — — রি —। — — ষু —।

২ ২
(স্তু)। মা পা পা—মা। --পা পা ন্‌সা —নি। সা —নি
(স্তু)। জ ল — —। — — স্থ —। — —

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
সা সা। স্‌ রে —সা মা সা। সা সা সা —নি
ল —। ম — রু —। ত — ব্যো —

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
সা সা সা সা। সা —নি সা সা। সা সা
— — ম —। তু — হি —। অ —

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
রে রে। —৮গা ৮গা রে —সা। সা সা —স্‌ রে
কা —। — — র —। য — —

। নিঁ। নিঁ নিঁ ধ্‌নিঁ ধা। —নিঁ —ধা পা পা। মা মা
—। ম — সো —। — — ম —। তু —

মা মা। মা মা মা —গা। —মা মা মা মা।
হি —। উ — কা —। — — র —।

২ ২ ২
মা মা পা পা। পা পা ন্‌সা —নি। —সা সা
তু — হি —। ম — কা —। —

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
সা সা। সা সা সা —নি। —ন্‌রে —সা সা —রে।
র —। নি রো — —। — — ষ্কা —।

২
—নিঁ —সা নিঁ —ধা। প্‌ধা ধা পা —মা। মা —গা
— — র —। তু — হি —। ধ —

গ্‌রে রে।—গা —সা সা সা। (স্থা—পু)। রে রে
নে —। — — শ —। (স্থা—পু)। তু হি

রে রে। রে রে রে রে। —পা পা মা মা।
— —। — — ব্র —। — — ক্ষ —।

। গ্‌মা রে রে রে। রে —সা সা নিঁ। -সা সা
২
। তু হি — —। — — বি —। — —

সা সা। (ভো)। মা মা মা মা। গ্‌মা —রে মা
ষ্ণু —। (ভো)। তু হি — —। — — বে

মা।—পা —মা পা পা। ধা ধা ধ্‌নিঁ —পা। পা
—। — — দ —। তু — হি —। পু

পা পা—মা।—পা পা পা পা। ম্‌পা—মা পা
— রা —। — — ণ —। তু — হি

২ ২ ২ —
পা। পা পা ধা ধা। — সা সা সা
—। হ্ন — দী —। — — শ

২
—সা। ধা —নিঁ পা —মা। মা মা গ্‌মা —গা। —মা
—। তু — হি —। কো — রা —। —

—রে রে রে। সা সা সা —নি। —সা সা
২
— ণ —। তু হি — —। — —

রে রে । —গাঁ গাঁ রে —সা । সা সা স্‌রে —নি̐ ।
২
ধ্যা — । — — ন — । তু — হি — ।

। নি̐ নি̐ নি̐— ধা ।— নি̐— পা পা পা । গ্‌মা
। — — তা । — — ন — । তু —

রে রে । রে রে মা মা । পা— মা পা পা পা ।
হি — । — — ভু — । — — ব — ।

। প্‌নি̐ —ধা ধা ধা । — নি̐ —মা — পা পা ।
। নে — — — । — — — — ।

। পা পা পা পা । ম্‌পা — মা — পা —মা । পা
। — — — — । শ তা — — — । ন

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
পা ন্‌ সা — নি । — সা — নি সা সা । স্‌রে — সা
— সে — । — — ন — । ক —

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
সা সা । সা সা সা — নি । সা সা সা সা ।
হে — । — — ব্যা — । — — ন — ।

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
ন্‌সা —নি সা — নি । সা সা রে রে । — ৺গা ৺গা
তু — হি — । — — দে — । — —

২ ২ ২ ২ ২ ২
রে — সা । সা সা স্‌ রে — নি̐ । নি̐ নি̐ নি̐ — ধা ।
ন — । তু — হি — । — — র — ।

। ধ্‌নি̐ — পা পা পা । মা মা মা — গা । — মা মা
। — য়্‌ — ন — । তু হি — — । — —

মা — গা । — মা মা মা মা । মা মা পা — মা ।
ঘ — । — — রি— । প — ল — ।

১ ২ ২ ২ ২
। পা পা ন্‌সা — নি । সা সা সা সা ।
। — — ছ — । — — ন — ।

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
। সা — নি ন্‌স্‌রে — সা । সা সা সা
। তু — হি — । ব — ক

২ ২
— রে । — নি — সা নি — । প্‌ ধা ধা পা — মা।
। ণ । তু হি ।

। মা গা গ্‌রে রে । গা সা সা সা । রেঃ
। দী নে । শ । তু

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রোশিনারা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিল্লী মহানগরীতে অদ্য দিওয়ালীর (দীপাবলী) রাত্রি। হিন্দুদিগের গৃহ দীপালোকিত, মুসলমানদিগের গৃহে আলোক নাই। সর্ব্বাপেক্ষা রাজা রতনচাঁদের গৃহে আলোকের অত্যন্ত আড়ম্বর। রতনচাঁদ সে সময় এক-প্রকার হিন্দুস্থানের শাসনকর্ত্তা। আবদুল্লা খাঁ কুতুব উলমুলুক প্রধান রাজ-মন্ত্রী। তিনিই প্রকৃত বাদসাহ, ফিরোকসায়ের নামমাত্র বাদসাহ ছিলেন। রতনচাঁদ মন্ত্রীর দক্ষিণ হস্ত, মন্ত্রী সকল কর্ম্মের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। রাজা রতনচাঁদের মনোহর অট্টালিকা আমুলশীর্ষ আলো-কিত; স্ফটিকের দীপে চন্দন, মল্লিকা, চামেলীর তৈল জ্বলিতেছিল; দ্বার-দেশে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট নানাবর্ণরঞ্জিত আলোক দর্শকের চক্ষু ঝলসিয়া জ্বলিতেছিল; রাজার কর্ম্মচারীগণ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া দর্শকদিগের গাত্রে আতর ও গোলাপ জল নিক্ষেপ করিতেছিল।

নগরে কিন্তু উৎসবের অন্য চিহ্ন ছিল না। দর্শকেরা ভয়ে ভয়ে আলোক দেখিয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া যাইতেছিল। তখন সকলে প্রাণ হাতে করিয়া বাস করিত, কখন কাহার মাথা যাইবে, কিছুই স্থিরতা ছিল না। ফিরোকসায়ের যে দিন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল অদ্যাবধি তাহা রুদ্ধ হয় নাই। সেই জন্য নগরে এমন নিরানন্দ। কেবল যাহারা আবদুল্লা খাঁর স্বপক্ষে, তাহাদের কোন আশঙ্কা ছিল না। সেই কারণে রতনচাঁদ নিঃশঙ্ক চিত্তে উৎসবে মাতিয়াছিলেন।

সুসজ্জিত বৃহৎ দ্বিতল গৃহে মহফিল বসিয়াছে। বাইজীর নৃত্যের তরঙ্গ

উঠিয়াছে ; রাজা রতনচাঁদ মসনদের উপর বসিয়া আছেন। এমন সময়ে কয়েক জন ভৃত্য ব্যস্ত হইয়া আসিয়া সংবাদ দিল, স্বয়ং আমীর উল উমরা কুতুব-উল-মুলক বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান।

রাজা রতনচাঁদের আর গীত শ্রবণ করা হইল না। শশব্যস্তে বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন। উজীর পাল্কীর ভিতরে উপবেশন করিয়াছিলেন। রতনচাঁদ ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া পাল্কী ধরিয়া কহিলেন, "দাসের কি সৌভাগ্য! হুজুর স্বয়ং আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন।"

উজীর রতনচাঁদের স্কন্ধে ভর দিয়া পাল্কী হইতে অবতরণ করিলেন। দ্বারের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "রতনচাঁদ, তোমার সঙ্গে গোপনে কিছু কথা আছে।"

যে গৃহে নৃত্য গীত হইতেছিল, রতনচাঁদ উজীরকে সেখানে না লইয়া গিয়া একটি নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উজীরকে উপবেশন করাইয়া, তাঁহার সম্মুখে যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইলেন।

উজীর কহিলেন, "রতনচাঁদ, আমার হৃদয় সহস্র শরে বিদ্ধ হইয়া সহস্র খণ্ড হইয়া গিয়াছে।"

আবদুল্লা খাঁ যে ভাষায় কথা কহিতেছিলেন, তাহাতে অলঙ্কার ও অত্যুক্তির বাহুল্য। রতনচাঁদ মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "হুজুরের হৃদয় দুই দিন কখন অখণ্ড থাকে না। আবার কোন ভাগ্যবতী নয়নবাণ দ্বারা আপনার হৃদয় বিদ্ধ করিল ?"

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে উজীরের বড় নিন্দা ছিল। নিত্য নূতন প্রেমে পতিত হইতেন, নিত্য নূতন প্রণয়িণীর অন্বেষণ করিতেন। রাজা রতনচাঁদ উজীরের চরিত্র বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। উজীরের হৃদয় নিত্য সহস্রধা খণ্ড বিখণ্ড হইত, নিত্য জোড়া লাগিত। রতনচাঁদ তাঁহার কথায় বিস্মিত হইলেন না। কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার কাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল ?"

উজীর হৃদয়ের উপর হস্ত নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "এবার তামাসা নয়। বড় সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি। কে, কি নাম, কিছুই জানি না। তোমার প্রতিবেশিনী, এই মাত্র জানি।"

উজীরের কথা শুনিয়া রতনচাঁদের ভয় হইল। কাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, ভাবিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে হাসিয়া কহিলেন, "আমার গৃহের নিকটে কোন হুরি বাস করেন, আমি ত কিছুই জানি না।"

আবদুল্লা খাঁ কহিলেন, "তুমি দেশ লুটিবে না কালো চক্ষু দেখিবে? প্রেমের সেবা করিবার তোমার অবকাশ কোথায়? এখন আমার সঙ্গে এস। তোমার গৃহের পশ্চাতে যে গলি আছে, সেই গলি দেখিতে পাওয়া যায়,—এমন কোন প্রকোষ্ঠে চল।"

রাজা রতনচাঁদ উজীরকে সঙ্গে করিয়া ত্রিতালায় উঠিলেন। একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উজীর কহিলেন,—"গৃহের আলোক নিভাইয়া দাও।"

রাজা স্বহস্তে সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত করিলেন। তখন উজীর সাবধানে গৃহের একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ মুক্ত করিলেন। পথের পরপার্শ্বে আর একটি ত্রিতল গৃহ। সে গৃহে আলোক জ্বলিতেছিল না। কোন মুসলমানের গৃহ হইবে। গৃহের একটি গবাক্ষ মুক্ত ছিল। গবাক্ষপথে একটি রমণী দাঁড়াইয়াছিল। এক একবার মুখ বাড়াইয়া রাজা রতনচাঁদের আলোকিত অট্টালিকা নিরীক্ষণ করিতেছিল। সেই সময় অসংখ্য দীপের আলোক তাহার মুখে পতিত হইতেছিল। উজীর সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া রতনচাঁদকে মৃদু স্বরে বলিলেন,—"দেখ!"

রতনচাঁদ সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন। রমণীর মুখে যে সময় আলোক পতিত হইতেছিল, সে পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছিল; এজন্য তাহাকে এক বারে অনেকক্ষণ দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু রতনচাঁদ যাহা দেখিলেন, তাহাতে উজীরের অস্থিরতার কারণ বুঝিতে পারিলেন। মস্তকে ও স্কন্ধে সূক্ষ্ম বস্ত্রের ওড়না, অঙ্গে মণি-মুক্তাখচিত বহুমূল্য বস্ত্র; বস্ত্র অঙ্গে মিলিত হইয়া রহিয়াছে, এজন্য দেহের গঠন লক্ষিত হইতেছে। ক্ষুদ্র মস্তক, স্বচ্ছ দর্পণ-সম ললাটের চারিদিকে কুঞ্চিত অলকগুচ্ছ পড়িয়াছে, পৃষ্ঠে চক্ষে তরঙ্গায়িত কেশরাশি দুলিতেছে। দীর্ঘ, তুলিচিত্রিত ভ্রূযুগলের তলে বিশাল উজ্জ্বল চক্ষু চঞ্চল কটাক্ষে চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে। কপোল কখন রক্তবর্ণ, কখন উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ, ওষ্ঠাধর কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত, লোহিতবর্ণ। গঠনের পূর্ণতায় ও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণতায় সেই রূপরাশি,উচ্ছলিত হইতেছে। রমণী কিছু দীর্ঘাকৃতি, প্রতি পদক্ষেপে সেই পূর্ণ লাবণ্য-সমুদ্রে যেন তরঙ্গ উঠিতেছে।

রাজা রতনচাঁদ দেখিয়া কহিলেন, "চক্ষু সার্থক হইল। আপনি বাদসাহের বাদসাহ, এ রূপ আপনারই উপযুক্ত। বাদসাহেরও মহলে এমন সুন্দরী নাই; ইহার পরিচয় পাইয়াছেন?"

উজীর কহিলেন, "আমি কিছুই জানি না। তোমার গৃহের সম্মুখ দিয়া যাইতে ইহাকে দেখিলাম। তোমার গৃহের সম্মুখে থাকে, তোমার জানিবার কথা। কিন্তু যেই হউক, আজ উহাকে না পাইলে, আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না।"

রতনচাঁদ কহিলেন, "অমন কথা বলিবেন না, এই সমস্ত রাজত্বের ভার আপনার হস্তে; এত আকুল হইবেন না।"

উজীর কহিলেন, "যদি আমার কোন ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে আজ ইহাকে আমার হৃদয়ের অধীশ্বরী করিব। রতনচাঁদ, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর, কি উপায়ে ইহাকে পাইব বল।"

রতনচাঁদ স্কন্ধ অবনত করিয়া কহিলেন, "আপনার অপ্রাপ্য কি আছে? ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে আমি সন্ধান লইয়া আসি। ইহার পরিচয় জানি।"

উজীর কহিলেন, "আমি বসিয়া আছি, তুমি শীঘ্র আইস। জানিও আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে, যে পর্য্যন্ত এই ভুবনমোহিনীকে হৃদয়ে ধারণ না করিতেছি, সে পর্য্যন্ত আমার হৃদয় শীতল হইবে না।"

রতনচাঁদ বক্ষে দুই হস্ত বাঁধিয়া, মস্তক নত করিয়া, বাহিরে গমন করিলেন। উজীর সেই অন্ধকার গৃহে বসিয়া একদৃষ্টে সুন্দরীকে দেখিতে লাগিলেন। রাজা রতনচাঁদ যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন উজীর ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। রতনচাঁদকে দেখিয়াই কহিলেন, "কি জানিতে পারিয়াছ, শীঘ্র বল।"

রতনচাঁদ কহিলেন, "বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না; কিন্তু বোধ হয় ইহারা দিল্লীতে বাস করে না, সম্প্রতি এখানে আসিয়াছে। ইহার স্বামী, এই গৃহ, অল্পদিন হইল, ক্রয় করিয়াছে। দাস দাসী অধিক নাই, স্বামী সর্ব্বদা গৃহে থাকে না। ইহারা কি করে, কেহ জানে না; কিন্তু কাহারও সহিত বড় একটা সাক্ষাৎ করে না।"

উজীর কহিলেন, "ভালই হইয়াছে। এখানকার কোন আমীর ওমরাহ হইলে গোলমাল হইত। কিন্তু তাহা হইলেও ইহাকে ত্যাগ করিতাম না। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, কিন্তু ইহার আশা ত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি অবিলম্বে উহাকে আনয়ন কর।"

রতনচাঁদ অত্যন্ত ভীত হইয়া কহিলেন, "এখানে?"

উজীরের বিলম্ব সহিতেছিল না, কহিলেন, "কেন, ক্ষতি কি ?"

রতনচাঁদ কহিলেন, "এ হুজুরের গৃহ, কিন্তু এমন সুন্দরীর উপযুক্ত স্থান নয়। আমার গৃহের পার্শ্বে বাড়ী, গোলমালও হইতে পারে। আর একটু দূরে লইয়া গেলে ভাল হয়।"

উজীর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "সেই পরামর্শ উত্তম। আমি ইহাকে পাইলে কিছুদিন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি না, নির্জ্জনে থাকিতে চাহি। যমুনার তীরে আমার যে প্রমোদ উদ্যান আছে, সেইখানে পাঠাইয়া দাও।"

রতনচাঁদ কহিলেন, "যে আজ্ঞা। ভৃত্যের আর একটি নিবেদন আছে।"

"কি ?"

"আমার লোকজন এ কর্ম্মে তেমন দক্ষ নয়, যদি হুজুরের লোক পাঠাইয়া দেন ত ভাল হয়।"

উজীর কহিলেন, "আমার খোজাদিগকে পাঠাইয়া দিতেছি। এখন আমি আর বিলম্ব করিব না।"

সিঁড়ী নামিবার সময় উজীর কহিলেন, "রাজা রতনচাঁদ, তোমার কাছে অনেক সাহায্যের আশা করিয়াছিলাম। তুমি খুব সাহায্য করিয়াছ!"

রতনচাঁদের যথেষ্ট প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল। তৎক্ষণাৎ কহিলেন, "আমি আপনার সামান্য দাস, আমার দ্বারা আপনার কি সহায়তা হইতে পারে ? কোন কর্ম্ম হুজুরের অসাধ্য যে আপনি কাহারও সহায়তা প্রার্থনা করিবেন ?"

দ্বারে উপস্থিত হইয়া উজীর কহিলেন, "যাহা হউক, তোমার গৃহের নিকট তাহাকে দেখিয়াছি, এ কারণে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

রতনচাঁদ মেরুদণ্ড ধনুকের মত বাঁকাইয়া কহিলেন, "হুজুর যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অনেক দিনের একটা প্রার্থনা পূর্ণ হয়।"

পাল্কীতে পা রাখিয়া উজীর কহিলেন, "ওনাও পরগনার সনন্দ চাও ? আচ্ছা, কাল সনন্দ লিখিয়া আনিও, মোহর লাগাইয়া দিব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। দীপাবলী নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। অন্ধকারে

যমুনা বহিতেছে। যমুনাতীরে উদ্যানবাটিকায় উজীর অস্থিরচিত্তে পাদ-চারণ করিতেছেন।

নক্ষত্রবিম্ব চূর্ণ হইয়া যমুনার জলে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। তীর-স্থিত বৃক্ষের ছায়া জলে পড়িয়াছে। জল অবিশ্রান্ত ছুটিয়াছে, স্রোতের কল কল, পত পত শব্দ শ্রবণে পশিতেছে।

উজীরের প্রমোদাগারে বাহিরে আলোক ছিল না। বৃহৎ প্রাসাদ অন্ধকারে মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাসাদের সম্মুখে আচ্ছাদিত বারান্দায় উজীর ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতেছিলেন।

চারি জন বাহক পাল্কী স্কন্ধে লইয়া উদ্যানে প্রবেশ করিল। বাহকেরা নিঃশব্দে আসিতেছিল। পাল্কীর অগ্রে ও পশ্চাতে দশ বার জন লোক সশস্ত্রে আসিতেছিল। পাল্কী দেখিয়া উজীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বারের সম্মুখে শিবিকা উপস্থিত হইলে, এক জন বৃদ্ধা দাসী দ্বার উদ্ঘাটন করিল। তাহার সঙ্কেত মত বাহকেরা শিবিকা ভিতরে লইয়া গেল।

রক্ষকদিগের নায়ক,যে ঘরে উজীর প্রবেশ করিয়াছিলেন,সেই ঘরে গেল। উজীর দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "কেমন আখ্‌তর, কোন বিশেষ গোলযোগ হয় নাই ত ?"

খোজা অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া কহিল, "না হুজুর, বাড়ীতে লোকজন অধিক ছিল না। বেগমও কিছু গোলমাল করেন নাই, আমি বলিবামাত্র পাল্কীতে আরোহণ করিলেন।"

"স্বামী গৃহে ছিল না ?"

"না। তাহা হইলে একটা হাঙ্গামা হইত। কিন্তু হুজুর যে হুকুম করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা শূন্যহস্তে ফিরিয়া আসিতে পারিতাম না।"

উজীর কহিলেন, "আচ্ছা, যাও।" খোজা চলিয়া গেল।

দ্বার রুদ্ধ করিয়া উজীর কয়েকটি প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া নিঃশব্দে আর একটি দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দ্বার আপনি নিঃশব্দে বন্ধ হইয়া গেল।

সে গৃহে আর কেহ ছিল না, কেবল যে রমণী আবদুল্লা খাঁর আদেশমত আনীত হইয়াছিল, সে বিস্মিত হইয়া গৃহের চারি দিকে অবলোকন করিতেছিল।

গৃহের আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ। স্বর্ণ ও রজতশৃঙ্খলে লম্বিত স্ফটিকাধারে নীল পীত লোহিত বর্ণের আলোক মৃদু মৃদু জ্বলিতেছিল। পারস্যদেশীয় উৎকৃষ্ট গালিচার উপর কোথাও কিংখাপ, কোথাও অতি কোমল কাশ্মীর-দেশীয় মেষচর্ম্ম, কোথাও বোখারার বিচিত্র কারুকার্য্য বিশিষ্ট রেশমের চাদর। গৃহের একদিকে ক্ষুদ্র উপবনের ন্যায়; ক্ষুদ্র তমাল ও লতাকুঞ্জের মধ্যে স্ফটিকের সরোবর, তাহার মধ্যে চীনদেশীয় মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। পরীর মুখের ন্যায় একটি উৎস রহিয়াছে; হীরকের দন্তপংক্তি, নীলকান্তমণির চক্ষু, সুবর্ণনির্ম্মিত বাহু; তাহার বক্ত্র হইতে জল ঊর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। আলোকে শতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া, সূক্ষ্ম বারিকণা স্ফটিকের সরোবরে পতিত হইতেছে। গৃহের উর্দ্ধদেশ মুকুরে মণ্ডিত; প্রাচীরে দিল্লীর প্রধান চিত্র-করদিগের নির্ম্মিত চিত্র; সেই সকল চিত্র দেখিয়া রমণীর মুখ লজ্জায় লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল।

গৃহ দেখিয়া বিস্মিত হইবারই কথা। সম্রাটের গৃহেও এরূপ সজ্জা অতি-শয় বিরল। আবদুল্লা খাঁ যে সময় গৃহে প্রবেশ করিলেন, রমণী তখন কিছু জানিতে পারিল না; কিন্তু গৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, অতএব উজীরকে শীঘ্রই দেখিতে পাইল। তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

উজীর আপনার বক্ষে দুই হস্ত রক্ষা করিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, "আমি রূপের দাস। তোমার তুল্য রূপসী জগতে নাই, অতএব তুমি আমাকে দাস বলিয়া জানিবে। লোকে আমায় আবদুল্লা খাঁ, হিন্দুস্থানের বাদসাহের উজীর বলিয়া জানে।"

উজীর মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার পরিচয় পাইয়া রমণী বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে অভিভূত হইবে। কিন্তু রমণী বিস্ময়াতিশয্য প্রকাশ না করিয়া মৃদু মৃদু কহিল, "আমি হিন্দুস্থানে নূতন আসিয়াছি, কাহারও নাম শুনি নাই। কিন্তু আমাকে এখানে আনিলে কেন? আমি মনে করিয়াছিলাম, স্বামী-সন্দর্শনে যাইতেছি।"

আবদুল্লা খাঁ কহিলেন, "তুমি যেখানে বাস করিতেছিলে, সে কি তোমার স্বামীগৃহ নহে?"

রমণী উজীরের প্রতি একবার তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, "তুমি কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? আমাকে এখানে কেন আনিয়াছ? আমার

মনে শঙ্কা হইতেছে, আমি যে গৃহে ছিলাম, আমায় সেইখানে পাঠাইয়া দাও।”

আবছল্লা খাঁ কহিলেন, “তুমিই এখানে গৃহস্বামিনী, তোমার আশঙ্কা কিসের? আমি তোমার দাস। যদি বিশ্বাস না কর ত এই দেখ।” এই বলিয়া, উজীর, সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা, বাদসাহের রক্ষাকর্ত্তা, যুক্তকরে যুবতীর পদতলে পতিত হইলেন।

রমণী ভীতার ন্যায় কম্পিত হৃদয়ে সরিয়া গেল। কহিল, “লুব্ধ, তুমি কি করিতেছ? আমি স্বাধীন নহি, আমার স্বামী বর্ত্তমান। যে কথা শ্রবণেও পাপ, সে কথা আমায় কেন বলিতেছ?”

উজীর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, “আমি ইচ্ছা করিলে দিল্লীর বাদসাহকে সিংহাসনে রাখিতে পারি, ইচ্ছা করিলে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারি। আবছল্লা খাঁকে পদানত দেখিয়া যে রমণী আপনাকে ভাগ্যবতী মনে না করে, সে নিশ্চিত অল্পবুদ্ধি॥ কিন্তু তোমার দোষ নাই, তুমি দিল্লীতে সম্প্রতি আসিয়াছ। প্রেয়সি! সন্ধ্যা হইতে তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে। এখন আমাকে রক্ষা কর, আর বিলম্ব করিও না।” বলিয়া উজীর রমণীর হস্ত ধারণ করিলেন।

রমণী কহিল, “আমার হস্ত মুক্ত কর, নহিলে চীৎকার করিব।”

উজীর হাস্য করিলেন। “তোমার কোমল কণ্ঠে আঘাত লাগিবে, এই জন্য চীৎকার করিতে নিষেধ করিতেছি; নহিলে কোন ক্ষতি নাই। তোমার পূর্ব্বে অনেক সুন্দরী এই গৃহে চীৎকার করিয়াছে, কিন্তু কাহারও কোন ফললাভ হয় নাই। চীৎকার করিলে গৃহের বাহিরে শব্দ যায় না। এ গৃহ আমার, তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ? তোমার সাহায্যার্থ এখানে কে আসিবে?” উজীর রমণীর কর আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময় গৃহস্থিত উপবনের তালপত্র ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইল। গৃহমধ্যে অকস্মাৎ মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল, “দুরাত্মন্, রমণীর হস্ত ত্যাগ কর্।” তীব্র ক্রুদ্ধ স্বর শুনিয়া এবং পরুষ বাক্য বুঝিতে পারিয়া, উজীর বিস্মিত ও কুপিত হইয়া সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। রমণী এ পর্য্যন্ত চীৎকার করে নাই। হস্ত মুক্ত হইল দেখিয়া ও তৃতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া, রমণীও

সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল। আগন্তুককে দেখিয়া রমণী অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল।

আগন্তুক রমণীকে লক্ষ্য করিয়া একটিমাত্র কথা কহিল, "রোশিনারা!"

রমণী চকিত হইয়া একেবারে স্তব্ধ হইল।

উজীর দেখিলেন, গৃহের সমস্ত দ্বার যেমন রুদ্ধ ছিল, তেমনি রুদ্ধ রহিয়াছে, কোন দিকে প্রবেশ পথ নাই। উজীর ক্রোধান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

আগন্তুক ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "আপাততঃ তোমার পাপের বিঘ্নকারী।"

উজীর ফিরিয়া কহিলেন, "বাহিরে কে আছে, এই তস্করকে ধরিয়া বন্ধন কর।"

আগন্তুক পূর্ব্বের ন্যায় কহিল, "উজীর সাহেব, আর একটু চীৎকার করিয়া দেখ। স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর এ গৃহের বাহিরে শোনা যায় না, দেখ তোমার কথা কেহ শুনিতে পায় কি না।"

তখন উজীরের স্মরণ হইল যে, গৃহের ভিত্তি যে কৌশলে নির্ম্মিত, তাহাতে কোন শব্দ বাহিরে যায় না। তিনি অন্য কথা না কহিয়া, দ্বার মুক্ত করিয়া বাহিরে গমন করিতে উদ্যত হইলেন।

এক লম্ফে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া আগন্তুক তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। কহিল, "আবদুল্লা খাঁ, অত ব্যস্ত হইও না। আমার ইচ্ছা হইলে দ্বার খুলিব। তুমি এখন ক্ষান্ত হও।"

আবদুল্লা খাঁ অত্যন্ত বলবান। বলপূর্ব্বক হস্ত মোচন করিয়া আগন্তুককে প্রহার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আগন্তুক তাঁহাকে ধরিয়া অবলীলাক্রমে গালিচার উপর নিক্ষেপ করিল। তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহার বক্ষে জানু পাতিয়া বসিয়া কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিল। গৃহের উজ্জ্বল আলোকে ছুরিকা জলিতে লাগিল। আগন্তুক কহিল, "আবদুল্লা খাঁ, এই ঘরে তুমি কত অবলা রমণীর সর্ব্বনাশ করিয়াছ, মনে করিয়া দেখ। এই ঘরেই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত। এখন যদি তোমার বক্ষে এই ছুরী বিদ্ধ করি, তাহা হইলে কে তোমায় রক্ষা করে?"

আবদুল্লা খাঁ তখন মনে প্রমাদ গণিলেন। মনে করিলেন, তাঁহার কোন শত্রু এই ব্যক্তিকে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছে। সম্মুখে

মৃত্যু দেখিয়াও আবদুল্লা খাঁ ভীত হইলেন না, প্রাণভিক্ষা চাহিলেন না, কোন কথা কহিলেন না। আজমীরের বিখ্যাত সৈয়দদিগের বংশে তাঁহার জন্ম। সে বংশে কাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে নাই। বলপ্রকাশ অনর্থক বুঝিতে পারিয়া, উজীর তাঁহার হত্যাকারীকে দেখিতে লাগিলেন।

সে ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহাকে নরহত্যাব্যবসায়ী বোধ হইত না। বিদেশীর বেশ, আকৃতি কিছু দীর্ঘ, সূক্ষ্মবস্ত্রের মধ্যে দৃঢ় মাংসপেশী লক্ষিত হইতেছে। কেশ ও গুম্ফশ্মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ, চক্ষু প্রশস্ত এবং অত্যন্ত তীব্রোজ্জ্বল। এ সময় ক্রোধে তাহার চক্ষু জ্বলিতেছিল ও নাসিকা স্ফুরিত হইতেছিল। সেই কঠিন কটাক্ষে এবং কঠোর মুখশ্রীতে উজীর দয়ার কোমলতা দেখিতে পাইলেন না। তিনি স্থিরভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু মৃত্যু তখন আসিল না। সে ব্যক্তি আবদুল্লা খাঁকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিল। কহিল, "উজীর সাহেব, গাত্রোত্থান করুন। যদি মরিবার সাধ না থাকে, তাহা হইলে আমি যাহা বলিতেছি কর।"

অপমানে উজীরের মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা হইতেছিল। তিনি কোন কথা না কহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার অপমানকারী বস্ত্রমধ্য হইতে ক্ষুদ্র মসীপাত্র, লেখনী এবং কাগজ খণ্ড বাহির করিল। কহিল, "আমি যাহা বলিতেছি, লেখ।"

উজীর কহিলেন, "কি লিখিতে হইবে?"

"তোমার ভৃত্যদিগকে লিখিয়া দাও যে, কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, এই রমণীকে এবং আমাকে বাহিরে গমন করিতে দেয়।"

উজীর কহিলেন, "এ রমণী তোমার কে? তোমার সঙ্গে যাইতে সম্মত আছে কি না, কেমন করিয়া জানিব?"

সে ব্যক্তি কহিল, "তোমার জানিবার কোন আবশ্যক নাই। তোমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই, আমি যাহা বলিতেছি কর।"

উজীর কহিলেন, "আমি লিখিব না।"

"তবে মর," বলিয়া সে ব্যক্তি উজীরের হৃদয়ের উপর ছুরিকা ধরিল। মাংস বিদ্ধ হওয়াতে উজীরের বস্ত্রে শোণিত দেখা দিল। যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া উজীর কহিলেন, "লিখিতেছি।"

সে ব্যক্তি ছুরী নামাইল।

আদেশমত উজীর লিখিয়া দিলেন। লেখা সমাপ্ত হইলে সে ব্যক্তি উজীরকে কহিল, "তোমার হস্তের অঙ্গুরীয় খুলিয়া দাও।"

উজীর কহিলেন, "অঙ্গুরীয় বাদশাহের নামাঙ্কিত। কেমন করিয়া দিব?"

অপরিচিত ব্যক্তি কহিল, "কোন চিন্তা নাই,আমি চোর নহি। অঙ্গুরীতে কিছু প্রয়োজন আছে। পরে তোমায় ফেরত পাঠাইব।"

বিনাবাক্যে উজীর অঙ্গুরী খুলিয়া দিলেন। অঙ্গুরী গ্রহণ করিয়া অপরিচিত ব্যক্তি উজীরের উষ্ণীষ গ্রহণ করিল। উষ্ণীষ খুলিয়া উজিরকে বাধিতে উদ্যত হইল। উজীর কহিলেন, "তুমি যাহা চাহিয়াছ, দিয়াছি। আবার কেন আমার অপমান করিতেছ?

সে ব্যক্তি সস্মিত মুখে কহিল, "আমি কি আপনাকে অপমান করিতে পারি? একটুকু সাবধান হওয়া আবশ্যক বলিয়া আপনাকে একটু কষ্ট দিতেছি। কি জানি, আপনার যদি মতের পরিবর্ত্তন হয়, আমরা বাহিরে গমন করিলে যদি অঙ্গুরী ও পত্র আবার ফিরিয়া চাহেন।"

উজীর ক্রোধে ও অপমানে অস্থির হইয়া বল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অপরিচিত কহিল, "উজীর সাহেব, কেন বৃথা কোমল শরীরে বেদনা অনুভব করিবেন?" তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া, তাঁহার হস্ত ও পদদ্বয় সুদৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। উজীরের আর উত্থানশক্তি রহিল না। তখন সে ব্যক্তি উজীরকে দীর্ঘ সেলাম করিয়া বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "আবদুল্লা খাঁ, কুতুব-উল-মুল্‌ক, উজীর-ই-আলম, তুমি দিল্লীর বাদসাহের প্রভু, কিন্তু তোমার আচরণ তস্করের ও পশুর ন্যায়। পশুর ন্যায় যদি এখন তোমায় হত্যা করি, তাহা হইলে আমার কোন পাপ হয় না, কিন্তু তোমার অদৃষ্টে এত শীঘ্র নিষ্কৃতি নাই। এখন তুমি বন্ধনে অপমানিত হইতেছ, কিন্তু বন্দীর অবস্থায় তোমাকে দীর্ঘকাল কাটাইতে হইবে। তখন কারাগারে বসিয়া আমার কথা স্মরণ করিও, এবং যে পাপরাশি সঞ্চয় করিতেছ, তাহার জন্য অনুতাপ করিও।"

রমণী এক পার্শ্বে প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মোহাকৃষ্ট পক্ষী যেমন অজগরকে নিরীক্ষণ করে,সেইরূপ অপরিচিত পুরুষকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। অপরিচিত ব্যক্তি কহিল, "রোশিনারা, আমার সঙ্গে আইস।"

রোশিনারা কলের পুত্তলীর ন্যায় তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। পুরুষ

গৃহের বাহির হইয়া, বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিল। উজীর আপনার আলোকিত সুসজ্জিত প্রমোদগৃহে বন্দী রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পর দিবস রাজা রতনচাঁদ আপনার নামে ওনাও পরগনার সনন্দ প্রস্তুত করিয়া উজীরের মোহরের জন্য উজীরের গৃহে উপনীত হইলেন। শুনিলেন কুতুব-উল-মুলক গৃহে নাই। রাজা মনে মনে একটু হাস্য করিলেন। উজীর কোথায় ছিলেন, তিনি জানিতেন। উজীর যেখানেই থাকুন, রাজা রতনচাঁদের প্রবেশমার্গ অবারিত। তিনি উদ্যানবাটিকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

খোজা আখ্‌তর তাঁহাকে দেখিয়া মাথা হেলাইল। চুপি চুপি বলিল, "হুজুর এখনও উঠেন নাই।"

"স্নানাহার হয় নাই?"

"না।"

"সে কি? বেগম কোথায়?"

"বেগম এখানে নাই। কাল রাত্রেই চলিয়া গিয়াছেন।"

রাজা রতনচাঁদ আশ্চর্য্য হইলেন। রমণী যদি না থাকে, তাহা হইলে উজীরের উঠিতে এত বেলা হইতেছে কেন? আর তিনি রমণীকে রাতারাতিই বা বিদায় করিয়া দিলেন কেন? এমত সুন্দরী পাইলে ত তিনি তাহাকে এত শীঘ্র ত্যাগ করেন না। নিশ্চয়ই ইহার ভিতরে কোন রহস্য আছে।

রাজা রতনচাঁদ কহিলেন, "তিনি এত বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যান না। তাঁহার নিকটেও কেহ নাই। তোমার মনে কিছু সন্দেহ হইতেছে না?"

খোজা বলিল, "তিনি না ডাকিলে কেমন করিয়া যাই? হয় ত তিনি রাগ করিবেন।"

রাজা রতনচাঁদ কহিলেন, "বলিও, আমি কোন বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছি, তাহা হইলে তিনি রাগ করিবেন না।"

সকলেই জানিত, উজীর রাজা রতনচাঁদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করেন। খোজা আর কিছু না বলিয়া উজীরের প্রমোদ-গৃহের অভিমুখে গমন করিল। রতনচাঁদ পশ্চাতে চলিলেন। খোজা দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত

হইয়া ধীরে ধীরে দ্বার উদ্ঘাটন করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে চীৎকার করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। রাজা রতনচাঁদও ভীত হইয়া বেগে খোজার পশ্চাতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। উজীরের কোন অমঙ্গল হইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ।

সর্ব্বনাশের কথা বটে। গৃহতলে কুতুব-উল-মুলক, বাদসাহের প্রভু বসিয়া অধোবদনে—সামান্ত তস্করের ন্যায় বন্দী, উঠিবার ক্ষমতা নাই। রাজা রতনচাঁদ ও খোজা শশব্যস্তে তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। অপমানে, অভিমানে, ক্রোধে উজীরের চক্ষে জল আসিয়াছিল। মুক্ত হইয়াই তিনি খোজাকে লাথি মারিলেন; কহিলেন,—"নিমকহারাম! আমার ঘরে গোপনে শত্রু প্রবেশ করে,—তোমরা কোন সন্ধান রাখ না।"

খোজা কাঁদিতে লাগিল; কহিল,—"খোদাবন্দ! এ মহলের ভার আমার হাতে নাই; আর কাল রাত্রে আপনি আমাকে অন্য কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছিলেন। আমাকে বিনা দোষে অপরাধী করিতেছেন।"

উজীর রতনচাঁদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও; তোমার মুখ দেখিতে চাহি না।"

রাজা অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া কহিলেন,—"দাসের কি অপরাধ?"

অপরাধ প্রকৃত পক্ষে এই যে, তিনি ও খোজা, উজীরের সেই দুরবস্থা ও লাঞ্ছনা দর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু সে কথা তো উজীর স্বীকার করিবেন না, তিনি যাহাকে সম্মুখে পাইলেন, তাহাকেই দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন। তাহার পর, ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া অনেক প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তি যে, কেমন করিয়া গুপ্তভাবে ভৃত্যদিগের অজ্ঞাতে বিলাসাগারে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে দ্বার-রক্ষকের পদতলে বেত্রাঘাতের আদেশ হইল। সে আঘাতে মূর্চ্ছিত হইল; কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না।

উজীর তখন রাজা রতনচাঁদের নিকট অপরিচিতের আকৃতি ও পরিচ্ছদ বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—"যদি তাহাকে দিল্লীতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে জীবিত হউক বা মৃত হউক, আমার সাক্ষাতে আনিতে হইবে। জীবিতাবস্থায় ধৃত করিয়া আনিলেই আমি সন্তুষ্ট হইব।" রমণীর সম্বন্ধে বলিলেন, "তাহার জন্য আমি এত কষ্ট পাইয়াছি, তাহাকে আমি কখন ত্যাগ করিব না। যেখানে পাওয়া যায়, ধরিয়া আনিতে হইবে।"

রাজা রতনচাঁদ কোন কথা কহিতে পারিলেন না। যুক্তহস্ত চক্ষে বক্ষে এবং মস্তকে স্পর্শ করিয়া, আভূমি মস্তক অবনত করিয়া বিদায় হইলেন। ওনাও পরগণার সনন্দ তাঁহার বস্ত্রমধ্যেই রহিল। সে কথা উল্লেখ করিবার উপযুক্ত সময় নহে, বুঝিতে পারিলেন। কেবল তাহাই নহে, উজীরের আদেশে তিনি বাক্‌শূন্য হইলেন। সেই উচ্চ অট্টালিকা যেন তাঁহার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি বিনা পরিশ্রমে একটা পরগণা পাইবার আশায় ছিলেন, সে আশা পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার উপর উজীরের এইরূপ কঠিন আদেশ হইল। পালন করিতে পারিবেন না, রাজা রতন-চাঁদের এমন কথা বলিবার সাধ্য ছিল না। তিনি রাজধানীতে এক প্রকার সর্ব্বক্ষমতাপন্ন হইলেও উজীরের কিঙ্কর মাত্র। উজীর ইচ্ছা করিলে এক কথায় তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে পারেন। রাজা কি করিবেন? কোথায় সে উজীরের অবমাননাকারী অপরিচিত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইবেন? হয় তো সে ব্যক্তি কোন প্রধান ওমারাহের নিয়োজিত, তাহাকে ধরিতে গিয়া রাজা শত্রু সংখ্যা বর্দ্ধিত করিবেন। সে রমণীকেই বা অন্বেষণ করিয়া কোথায় পাইবেন? কুক্ষণে উজীর সেই রমণীকে দেখিয়াছিলেন, কুক্ষণে রাজা রতন-চাঁদ ওনাও পরগণার সনন্দ চাহিয়াছিলেন।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রাজা রতনচাঁদ শুনিলেন, এক ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় অনেক ক্ষণ হইতে বসিয়া আছে। কোন বিশেষ প্রয়োজন, রাজার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিয়া যাইতে চাহে না। রাজা তাহাকে ডাকিতে অনুমতি দিলেন।

তাহাকে পারস্যদেশী বলিয়া রাজা চিনিতে পারিলেন। পারসীভাষায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি বলিবার আছে?'

সে ব্যক্তি কহিল, "মহাশয়, আমি আপনার প্রতিবেশী। এখানে সম্প্রতি আসিয়াছি। আপনার গৃহের পশ্চাতে এক গৃহে সস্ত্রীক বাস করি। কল্য রাত্রে এক দল দস্যু আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার স্ত্রীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।" বলিতে বলিতে তাহার নাসিকা ও ওষ্ঠাধর স্ফূরিত হইতে লাগিল, ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল।

রাজা রতনচাঁদ কহিলেন, "আমাকে এ কথা বলিতে অসিয়াছ কেন? আমি কি করিব?"

পারস্যদেশীয় পুরুষ কহিল, "আপনি উজীরের প্রধান কর্ম্মচারী, আপনি

ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন? আপনার কাছে না আসিয়া কোথায় যাইব? দিল্লীতে পুরস্ত্রীর উপর এমন অত্যাচার হয় জানিলে, আমি এখানে আসিতাম না। আমি জানিতাম, সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের সম্ভ্রম এখানে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষিত হইয়া থাকে।"

রাজা বলিলেন, "সে কথা মিথ্যা নহে।" ক্ষণকাল চিন্তার পর পুনরায় কহিলেন, "কাহারও প্রতি তোমার সন্দেহ হইতেছে?"

এই কথায় সে ব্যক্তি চমকিত হইয়া রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "এ কথা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন?"

রাজা কহিলেন, "বলিতে কোন আপত্তি থাকে ত বলিবার আবশ্যক নাই।"

পারসীক কহিল, "এক জনের উপর আমার সন্দেহ আছে। তাহার জন্যই আমি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এখানে আসি; মনে করিয়াছিলাম, এত দূর আমাদের সঙ্গে আসিবে না। কিন্তু এ কর্ম্ম যদি তাহার হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের নিকট সাহায্যতা প্রার্থনা করা বৃথা। মানুষে তাহাকে পারিবে না।"

রাজা কহিলেন, "কেন?"

পারসীক কহিল, "সে ব্যক্তি অলৌকিক ক্ষমতা ধারণ করে। জীন তাহার বশীভূত।"

রাজা অল্প হাস্য করিলেন, ভৌতিক অথবা পৈশাচিক ক্ষমতায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে ব্যক্তি দেখিতে কেমন?"

পারসীকের বর্ণনার সহিত উজীরের বর্ণনা মিলিল। রাজা রতনচাঁদ বুঝিলেন যে, পারসীকের স্ত্রীহরণকারী ও উজীরের বন্ধনকারী একই ব্যক্তি। তিনি কহিলেন, "বোধ হয় সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধৃত হইবে। সে এখানে আরও গুরুতর অপরাধ করিয়াছে।"

পারসীক নিশ্বাস ত্যাগ করিল, কহিল, "তাহার ক্ষমতা আপনি এখনও জানেন না।"

রাজা কহিলেন, "তুমি তাহার অনুসন্ধান কর। আমি লোক নিযুক্ত করিতেছি, কোন সংবাদ পাইলেই তুমি জানিতে পারিবে।"

পারসীক বিষণ্ণচিত্তে বিদায় হইল।

উজীর সহরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। রাজা রতনচাঁদ তাঁহাকে এই নূতন সংবাদ লোক দ্বারা না জানাইয়া স্বয়ং জানাইতে গেলেন। ব্যস্ততা-

বশতঃ রাজা বহুসংখ্যক অনুচর সঙ্গে লইলেন না। পথে যাইতে এক স্থানে একটি অন্ধকার সঙ্কীর্ণ গলি। সেই গলির মধ্যে বাদসাহের সৈনিকবেশ-ধারী কয়েক ব্যক্তি দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদিগের নেতা অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে যাইতেছে?"

রাজা রতনচাঁদের লোক জন বাদসাহের লোককে বড় ভয় করিত না। প্রকৃত বাদসাহ কে, তাহারা সকলেই জানিত। সৈনিকের কথায় অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কহিল, "রায় রায়েন রাজা রতনচাঁদ। পথ ছাড়িয়া দাও।"

পথ ছাড়িয়া না দিয়া, সৈনিক আসিয়া রাজার পাল্কী ধরিল; বলিল,—"রাজা সাহেব! আপনাকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবার হুকুম আছে; পরোয়ানা দেখুন।" এই বলিয়া রাজার সম্মুখে পরোয়ানা ধরিল।

রতনচাঁদ দেখিলেন, পরোয়ানার উপর বাদশাহের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কের মোহর। অঙ্গুরীয়ের কথা উজীর রতনচাঁদকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। রাজা রতনচাঁদ জানিতেন, সে অঙ্গুরী উজীরের হস্তে থাকিত, এবং বিশেষ আবশ্যকীয় কর্ম্ম না হইলে তাহা ব্যবহৃত হইত না। তাহা হইলে উজীর স্বয়ং রাজা রতনচাঁদকে বন্দী করিবার আদেশ দিয়াছেন? রতনচাঁদের জানুদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল, তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, হৃদয় কম্পিত হইল। কম্পিত হস্তে পরোয়ানা লইয়া মস্তকে স্পর্শ করিলেন; কম্পিত স্বরে সজল নয়নে কহিলেন,—"বাদসাহের আজ্ঞা মস্তকের পরে চক্ষের পরে ধারণ করি। শাহানশাহা দীর্ঘজীবী হউন।"

অনুচরেরা বিস্ময়ে অভিভূত হইল। বাদশাহের প্রতি রাজা রতনচাঁদের এত ভক্তি হইল কবে থেকে? তাহাদের মধ্যে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিল, সে অগ্রসর হইয়া রাজার কানে কানে বলিল, "মহারাজ করেন কি? আমাদিগকে আজ্ঞা করুন, আমরা ইহাদিগকে মারিয়া খেদাইয়া দিই।"

রাজা মাথা নাড়িলেন। মোহরের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, "কুতুব-উল-মুলক স্বয়ং এ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহার উপর কে কথা কহিবে?" আকাশে চাহিয়া রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে।"

প্রকাশ্যে রাজা অনুচরদিগকে কহিলেন,—"তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, আমি এই সৈনিকদিগের সহিত গমন করিতেছি। বাদশাহের আজ্ঞা সর্ব্বদা

শিরোধার্য্য।" বিবাদেও কোন ফল ছিল না; কারণ, সৈনিকদিগের সংখ্যা অধিক, রাজার অনুচরেরা নিশ্চয় পরাজিত হইত।

রাজাকে পাল্কী হইতে নামিতে হইল না। বাহকেরা সৈনিকদলের আদেশমত তাহাদিগের সঙ্গে চলিল, রাজা রতনচাঁদের ভৃত্যগণ ভীত ও বিমর্ষ হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কবিতা-কুঞ্জ।

বৎসরের শেষে।

বৎসরের হলো শেষ
আশার পাই না থাই;
জীবনে নাহিক কাজ
মরিলেই বেঁচে যাই!
কত কাঁটা ফুটেছিল?
একটি ফুলের তরে,
কত অশ্রু ঝরেছিল
একটি হাসির পরে;
সমুখে আলেয়া আলো
পিছনে ফিরিয়া দেখি—
এখনো রক্তিম নভ
দগ্ধ গৃহ।বহ্নি মাখি।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

অবসানে।

তখন তো বুঝিনেক তাহা—
যখন সে পলে পলে,
প্রতি পদে দিত ব'লে,
নিমেষে ফুরাবে গান গাওয়া;—
সখি! এ পুর্ণিমা রাত,
এই গন্ধবাহী বাত,
শাখে শাখে কোকিল পাপিয়া—
সকলি মুহূর্ত্তাধীন;
এ নব-যৌবন দিন।
কেন লাজ-হাসি, আধ-চাওয়া—
দু'দিনের এ দখিণা হাওয়া!
মুকুল ফুটাতে আসে,
কলি কি কম্পিত ত্রাসে;
সৌরভে মাতে না অলিকুল!—
কমনীয় রূপরাশি,
পাতে পাতে পরকাশি,
সপে না কি সুষমা অতুল,
দু'দিনে কি করে না লো ফুল?
জীবনে মাহেন্দ্রক্ষণ
কুসুমিত এ যৌবন;
সন্ধি-পূজা—অষ্টমীর সার।
আত্মায় আত্মায় ভোগ,
পূজক পূজ্যতে যোগ,
মহাযোগ—পানীয় তৃষার!
তাই থাকিতে থাকিতে বেলা,
পুরা সই! এই বেলা
অনন্ত অতৃপ্তি আকাঙ্ক্ষার।
জানি সব পুরিবে না,
সময়ে তো কুলাবে না,
যদি হয় অক্ষয় ভাণ্ডার।
হৃদয় দরিদ্র র'বে
বাসনা কভু না যাবে,
ভ্রমিবে ভুবনে হাহাকার!
তাই দেখিতে কি বাসনা তোমার?

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী।

কালিদাস ও সেক্ষপীয়র।

---

(৭)

কালিদাস।

'কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি।' এ কথা সপ্রমাণ করিতে গিয়া আমি বলিয়াছি যে, কথাটা কল্পনা-সিদ্ধান্ত মাত্র। যদি এই কল্পনাসিদ্ধান্তের সহিত সকল ঘটনার সমাবেশ হয়, সকল বিষয়ের অবিবাদ হয়, তবে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত,অন্যথা কল্পনামাত্র। যদি আমরা দেখি কালিদাসের সাক্ষাতে সমগ্র সৌন্দর্য্যজগৎ অবভাত হয়; বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ বৌদ্ধজগৎ ও অধ্যাত্মজগৎ আপন আপন আবরণ বসন ফেলিয়া দিয়া, আপনাদের নগ্ন সৌন্দর্য্য স্বরূপ প্রকটিত করিয়া শোভিত হয়; যদি আমরা দেখি সুন্দর শত মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার কাব্য আলো করিয়া থাকে; যাহা অসুন্দর অমধুর অসুকুমার, তাঁহার কাব্যে প্রবেশ লাভ করিতে পায় না; তবে আমরা অবশ্যই মানিব যে, ঐ কল্পনাসিদ্ধান্তই স্থির সিদ্ধান্ত, কল্পনা মাত্র নহে; তবে আমরা মানিব কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার প্রতি-ভার মূলতত্ত্ব অমানুষী সৌন্দর্য্য দৃষ্টি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা যথাক্রমে বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ ও অধ্যাত্মজগতের আলোচনা করিয়াছি; আর আলোচনার ফলে দেখিয়াছি যে,বাস্তবিকই ঐ চারি জগৎ আপন আপন আবরণ বসন ফেলিয়া দিয়া কালি-দাসের সাক্ষাতে আপনাদের নগ্ন সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিয়া শোভিত হয়,বাস্ত-বিকই সুন্দর শত মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার কাব্য আলো করিয়া থাকে। অতএব কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি,তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী সৌন্দর্য্যদৃষ্টি।

আমি ইতিপূর্ব্বে সমালোচক মহাশয়দিগের উদ্দেশে বলিয়াছি যে, তাঁহারা ভাবেন যে ভাব, ভাষা, উপমাকৌশল, চরিত্রসৃষ্টি, শব্দবিন্যাস,ছন্দের ঝঙ্কার, ইহাদের পৃথক অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়; অতএব ইহারা বাস্তবিক পৃথক্। ইহারা যে এক মূলের শাখা প্রশাখা, এক দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ইহারা যে এক অদ্বিতীয় কারণসম্ভূত, এ কথা তাঁহারা সময়ে সময়ে ভুলিয়া যান। এই অদ্বিতীয় কারণ, কবির প্রতিভা। ইহাই ভাব, ভাষা, উপমা-

কৌশল, চরিত্রসৃষ্টি, শব্দবিন্যাস, ছন্দের ঝঙ্কার প্রভৃতির জননী। এ কথা যদি সত্য হয় আর কালিদাসের প্রতিভার মূলতত্ত্ব যদি সৌন্দর্য্য দৃষ্টি হয়, তবে আমরা দেখিব যে, তাঁহার ভাব, ভাষা, উপমাকৌশল, চরিত্রসৃষ্টি, শব্দবিন্যাস, ছন্দের ঝঙ্কার, সকলই সুন্দর, সৌন্দর্য্যময়। তবেই সপ্রমাণ হইবে যে, যাহা অসুন্দর, অমধুর, অসুকুমার, তাঁহার কাব্যে প্রবেশ লাভ করিতে পায় না; অতএব তিনি সৌন্দর্য্যের কবি।

প্রথম ছন্দের ঝঙ্কারের কথা বলি। আমার অনেক সময় মনে হয় যে, মানুষ যদি সকল ইন্দ্রিয়বিহীন হইয়া, বুদ্ধিহীন, বিবেকহীন, কল্পনাহীন হইয়া শুদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্ত হইত, তাহা হইলেও সে কবি ও কাব্যের উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা বুঝিতে পারিত। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে কোন এক ছন্দের ঝঙ্কার আছে—একটা মধুর, গম্ভীর, সুন্দর, আরাব আছে, যাহা ক্ষুদ্র কবিরা শত চেষ্টায়ও অনুকরণ করিতে পারে না। এই ঝঙ্কার, এই আরাবই—যাহা প্রাণের কাণে অনুভব করিতে হয়, শ্রেষ্ঠ কাব্যের অদ্বিতীয় লক্ষণ।

ইংরাজ সমালোচক আর্ণল্ড * এ কথা বেশ বিশদ ভাবে বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন "কবির ভাষার প্রধান উপাদান শব্দবিন্যাস ও ছন্দের ঝঙ্কার। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে যেমন ভাবে সত্য ও গাম্ভীর্য্যের সমাবেশ থাকে, তেমনি শব্দবিন্যাসে ও ছন্দের ঝঙ্কারে, (ভাষায়) উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যের সমাবেশ থাকে। কোন কবির কাব্যে যে পরিমাণে, শব্দবিন্যাসে ও ছন্দের ঝঙ্কারে এই উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যের অভাব লক্ষিত হয়, সেই পরিমাণে ভাবে সত্য ও গাম্ভীর্য্যের অভাব দৃষ্ট হয়।" অতএব শব্দবিন্যাস ও ছন্দের ঝঙ্কার, কবির কবিত্বের পরিচয় জানিবার উৎকৃষ্ট লক্ষণ। শব্দ-বিন্যাসের কথা পরে বলিব। ছন্দের ঝঙ্কারের কথা অগ্রে বলি। কালি-দাসের কাব্যে এই ঝঙ্কার যেমন মধুর গম্ভীর সুন্দর, এমন আর কোথায়ও শুনিয়াছ কি? তাঁহার কাব্য আবৃত্তি করিলে মনে হয়, যেন কোন্ স্বর্গযন্ত্রী বীণাযন্ত্রে দিব্য রাগিণী আলাপ করিতেছে; আর আমরা আকাশের তলে

---

* To the style and manner of the best poetry, their special character, their accent is given by their diction and even more by their movement. * * In proportion as this high stamp of diction and movement is absent from a poet's style and manner, we shall find also that high poetic truth and seriousness are absent from his substance and matter.

Mathew Arnold, Essays in criticism.

বসিয়া সেই অমৃতনিস্যন্দিনী সঙ্গীতধারায় অভিষিক্ত হইতেছি। প্রাণের কাণে যে না এ আরাব অনুভব করিয়াছে, আমার মনে হয়, তাহার কাব্য-শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। আর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ সঙ্গীতধারা সমান উলসিত প্রবাহে, রঙ্গে ভঙ্গে, তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে; বিরাম নাই, অবসাদ নাই, গতিভঙ্গ নাই। বলা বাহুল্য, সেক্ষপীয়রেরও বীণা স্বর্গীয়; কিন্তু সে বীণার সময়ে সময়ে তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়, সুরের লহরী বক্র উচ্ছল উচ্ছৃঙ্খল গতিতে বহিতে থাকে। কালিদাসের কিন্তু সেরূপ নহে। *

এই ছন্দের ঝঙ্কার, এই মধুর গম্ভীর সুন্দর আরাব, কথায় বুঝান যায় না। জয়দেবের 'ললিত লবঙ্গলতা' ইহার অতি দূরে দূরে অনুসরণমাত্র, নৈষধের পদলালিত্য ইহার ব্যঙ্গছায়ামাত্র। দুই চারিটা দৃষ্টান্ত দিই।

শশিনং পুনরেতি শর্ব্বরী
দয়িতা দ্বন্দ্বচরং পতত্রিণম্ ॥
দৈবীনাং মানুষীণাঞ্চ প্রতিহর্ত্তা ত্বমাপদাম্।
তমালতালীবনরাজিনীলা ॥
অথ মদনবধূরুপপ্লবান্তং
ব্যসনকৃশা পরিপালয়াম্বভূব ॥
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে ॥
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাম্ ॥
সিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনাচাটুকারঃ ॥
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্‌ভজেথাঃ ॥

কালিদাসের শব্দবিন্যাসও অতি অপূর্ব্ব। এক জন সমালোচক মিলটন সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, কালিদাসের প্রতি সে কথা সম্পূর্ণ খাটে। কথাটি এই—"তাঁহার কাব্যে শব্দবিন্যাস এমন অপূর্ব্ব, যে এক শব্দের পরিবর্ত্তে সেই অর্থবোধক অন্য প্রতিশব্দ দাও, কবিতার আর পূর্ব্বের মাধুর্য্য থাকিবে না; আলিবাবার গল্পে 'খোল সিসেম' বলিলেই দ্বার খুলিত; সিসেমের

* যাঁহারা যত্ন করিয়া সেক্ষপীয়র পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, তাঁহার নাটকে কত ছন্দোভঙ্গ, অধিকাক্ষর, ন্যূনাক্ষর, অযথাক্ষর আছে। কালিদাসের সমগ্র কাব্যের কোথাও একটি ছন্দের পতন অবধি নাই। কালিদাস কবি ও কৌশলী (Artist); সেক্ষপীয়র শুধুই কবি।

প্রতিশব্দ কত কথা রহিয়াছে, তাহাদের নাম কর, দ্বার খুলিবে না। ইহাও সেইরূপ।" সাধ করিয়া কি আর্ণল্ড বলিয়াছেন যে, কোন কবির কাব্যে যে পরিমাণে শব্দবিন্যাসে ও ছন্দের ঝঙ্কারে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্যের অভাব লক্ষিত হয়, সেই পরিমাণে ভাবে সত্য ও গাম্ভীর্য্যের অভাব দৃষ্ট হয়। এই শব্দবিন্যাস কি বুঝাইবার জন্য আর্ণল্ড এই উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

Absent thee from felicity a while.
In cradle of the rude imperious surge.
O martyr souded in viginitee !
And courage never to submit or yield
And what is else not to be overcome.

এই শব্দবিন্যাসের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া বুঝান যায় না। ইহা অনুভব করিয়া বুঝিতে হয়। কালিদাসে এই শব্দবিন্যাস কি উৎকৃষ্ট, কথায় কথায় সংযোগ কত মধুর সুন্দর, তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে বুঝা যাইবে। বলা বাহুল্য, এ সকল দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া বাহির করি নাই। যাহা অযাচিত উপস্থিত হইতেছে, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি।

১। অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম্
অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্ ॥

২। কলাচ সা কান্তিমতী কলাবত-
স্তমস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী ॥

৩। অপমেঘোদয়ং বর্ষমদৃষ্টকুসুমং ফলম্ ॥

৪। স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো
বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে ॥

৫। আকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্ ॥

৬। একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং
নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ ॥

৭। নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥

৮। প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোপি হর্ত্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ॥

৯। আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রায়শোহ্যঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥

১। বৃষ্টিক্ষোভরহিত জলধর, তরঙ্গবিহীন জলধি।

২। সুধাকরের সেই মনোহর কলা আর তুমি এই জগতের নেত্রকৌমুদী।

৩। মেঘ বিনা বর্ষপাত, বিনাফুলে ফল।

৪। স্বজনের সাক্ষাতে সংযত দুঃখ প্রকটিত হয়।

৫। চারুতারকাখচিত আকাশ।

৬। একছত্র পৃথিবীর সাম্রাজ্য, নবীন যৌবন, বরবপু।

৭। চক্রের নেমির মত মানুষের ভাগ্যের বিপরিবর্ত্তন হয়।

৮। নলিনীর কমল বদন হইতে শিশিরাশ্রু মুছাইতে দিবাকর সমাগত হইয়াছেন, এখন মেঘে তাঁহার কর অপসারণ করিলে দারুণ ক্রোধ হইবারই কথা।

৯। কুসুমকোমল রমণীর সপ্রণয় হৃদয় যে বিরহে স্ফুটিত হয় না, আশার বন্ধনই ইহার কারণ।

কালিদাসের চরিত্রসৃষ্টির পর্য্যালোচনা করিলে ঐ এক কথাই সপ্রমাণ হয়—তিনি সৌন্দর্য্যের কবি। রঘু, কুমার, মেঘদূত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী, কোন্ কাব্যে কোন্ চরিত্র আছে, যাহা সুন্দর নহে? দিলীপ, সুদক্ষিণা, রঘু, অজ, ইন্দুমতী, দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, কুশ, কুমুদ্বতী; হরগৌরী, কাম রতি, ইন্দ্র, হিমালয়, সপ্তর্ষি; যক্ষ যক্ষপত্নী; উর্ব্বশী, চিত্রলেখা, পুরুরবা, কুমার; দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, কণ্ব, অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, বিদূষক; এ সকল চরিত্র শতবৈচিত্র্যে বিচিত্রিত হইলেও এক অংশে সমান; সকলই সৌন্দর্য্যময়। নর নারী, দেব মানব, সংসারী বিরাগী, যুবা শিশু, কালিদাস যে চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই সুন্দর। আমার বিশ্বাস—ইয়াগো, এডমণ্ড, রিগন, ফলস্‌ষ্ট্যাফের মত চরিত্র, কালিদাস কল্পনা করিতে পারিতেন না; ইহারা অসুন্দর, তিনি সুন্দরের কবি,—অসুন্দরের কল্পনা করিবেন কেমন করিয়া?

কালিদাসের উপমাকৌশল জগৎবিখ্যাত; 'উপমা কালিদাসস্য'। এ উপমাকৌশলের আলোচনা করিলেও আমরা দেখিব—তিনি সৌন্দর্য্যের কবি। উপমা কাব্যের অলঙ্কার; যেমন রত্নভূষণে সুন্দরীকে আরও সুন্দর দেখায়, সেইরূপ উপমায় সুন্দর কাব্য আরও সুন্দর হয়। পোপ বা ড্রাইডেনের মত কাব্যকার, যাঁহাদের কবিতার সহিত সৌন্দর্য্যের বড় একটা নিকট সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদের কাব্যে বড় একটা উপমার উৎপাত নাই। কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, সেই জন্য তাঁহার কাব্যে উপমার পূর্ণ বিকাশ। দুই চারিটা দৃষ্টান্ত দেখুন।

নীল সিন্ধুজলে প্রস্তরের সেতু, যেন নীলাকাশে নক্ষত্র ধবল ছায়াপথের মত শোভিতেছে।

সঙ্গীতশ্রবণে একাগ্রা অশ্রুমুখী সভা, প্রভাতে নিশ্চল শিশিরবর্ষিণী বনস্থলীর ন্যায় হইল। মৃণালিনীর হিমকৃত উপদ্রবের ন্যায় রমণী দুঃখিতার আকার ধারণ করিয়াছে। স্তনভারে ঈষৎ আনতদেহা, অরুণ বাসধারিণী গৌরী, পুষ্পস্তবকনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিতা লতার ন্যায় শোভিতা হইলেন।

মদন বিরহে রতি, কিরণক্ষয়ে ধূসর দিবসের শশিলেখার মত হইল। শিরীষফুল ভ্রমরের কোমলস্পর্শ সহিতে পারে, কিন্তু পতত্রীর কঠোর সংস্পর্শ কিরূপে সহিবে? উমা সুকুমারী, তপস্যার ক্লেশ কি তাঁহার সহ্য হয়?

শ্যামজলধর, বিচিত্র ইন্দ্রধনু খচিত হইয়া শিখিপুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণের মত হয়। বীচিবিহ্বল নদীর জল ভ্রূভঙ্গসুন্দর রমণীর মুখের মত।

মোহিনীর অঙ্গসৌকুমার্য্য প্রিয়ঙ্গুলতার ন্যায়, অক্ষিপাত চকিত হরিণীর প্রেক্ষণের ন্যায়, কেশকলাপ ময়ূরীর পুচ্ছভারের ন্যায়, ও ভ্রূবিলাস পবনতাড়িত নদীজলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গহিল্লোলের ন্যায়।

একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, এই সকল উপমাতেই উপমান সুধুই উপমেয়ের সদৃশ নহে, কিন্তু তাহার আপনার একটা উৎকৃষ্ট সৌন্দর্য্য আছে। নক্ষত্র ধবল ছায়াপথ, শিশিরবর্ষিণী বনস্থলী, হিমক্লিষ্টা নলিনী, পল্লবিতা লতা, ইত্যাদি প্রত্যেক উপমানই সুন্দর। কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, সেই জন্য তাঁহার উপমেয়ই কেবল সুন্দর নহে, তাঁহার উপমানও সুন্দর।

এ কথার অর্থ কি, কালিদাসের উপমার সহিত বেকনের উপমার তুলনা করিলে বুঝা যায়। বেকনের প্রায় প্রতি পত্রে উপমার সমাবেশ দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে উপমা * কাব্যোপযোগী নহে; তাহার উদ্দেশ্য অর্থবোধ বা সাদৃশ্যবুদ্ধি; সৌন্দর্য্যসৃষ্টি নহে। মিলটনের † উপমা এক একটি ক্ষুদ্র কথা-সরিৎ; তাঁহার উদ্দেশ্য যেন গ্রীক কবির অনুকরণ; সৌন্দর্য্যসৃষ্টি নহে। কালি-

* দৃষ্টান্ত দেখুন—Pope Alexander finding himself pent and locked up by a league was desirous to trouble the waters of Italy that he might fish the better.

† স্বর্গচ্যুতির ২য় সর্গে একটা উপমার দৈর্ঘ্য আট পংক্তি—As when from mountain tops the dusky clouds &c.

দাসের উপমার একমাত্র উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য সমাবেশ। তিনি সুন্দরের কবি।

ভাব ও ভাষার আলোচনা করিলেও এই কথাই সপ্রমাণ হয়। তাঁহার ভাব শান্ত, মধুর, করুণ, অমুৎকট, অকঠোর, অতীব্র; এক কথায় তাঁহার ভাব সুন্দর। তাঁহার ভাষা সুকুমার, কোমল গম্ভীর, অনশ্লীল, অগ্রাম্য, অবিকট; এক কথায় তাঁহার ভাষা সুন্দর। সেক্ষপীয়রের ভাব ও ভাষা অনেক স্থলে ইহার ঠিক্ বিপরীত। অর্থাৎ, অনেক স্থলে তাঁহার ভাব উৎকট, কঠোর, তীব্র, অমধুর, অশান্ত, অকরুণ; তাঁহার ভাষা অশ্লীল, গ্রাম্য, বিকট, অকোমল, অগম্ভীর, অসুকুমার। এক জন ফরাসী লেখক এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন;—"সেক্ষপীয়রের ভাষা বিকটশব্দময়ী; তাঁহার কাব্যের মত আর কোথাও শব্দের এত বিকটতা দৃষ্ট হয় না। উৎকট তুলনা, অত্যুক্তি, সম্বোধন, ভাববিপর্য্যয়, চিত্রাধিক্য, দিব্য প্রচণ্ডের সমাবেশ, এ সকলই তাঁহার কাব্যের উপাদান।" * কালিদাসে আমরা এ সকল কিছুই দেখিব না, কারণ তিনি কবি ও কৌশলী, সেক্ষপীয়র সুধুই কবি।

একটা কথার একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাউক। আমরা এক এক জনের কাছে শুনি, কালিদাস অশ্লীল। এই অশ্লীলতার অর্থ কি? অশ্লীল বলিতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা বুঝিতেন, আমরা সুরুচির ধ্বজা, ইংরাজি শিখিয়া তাহা বুঝি না। সংস্কৃত অলঙ্কারে অশ্লীলতা একটা কাব্যের দোষ। যে শব্দের দ্বারা ব্রীড়া, ঘৃণা বা অমঙ্গলের ভাব উদয় হয়, তাহাই অশ্লীল। সেক্ষপীয়রের 'চতুর্থ হেনরী'র পাঠক অনায়াসেই স্বীকার করিবেন যে, সেক্ষপীয়র ঘোরতর অশ্লীল। তাঁহার ফলস্ট্যাফ প্রভৃতির মুখে আমরা যে সকল কথা শুনি, তাহাতে বাস্তবিকই কর্ণে অঙ্গুলী দিতে হয়। লিয়র, সিম্বেলিন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট নাটকেও এই দোষের অভাব নাই। অধিক কি, তাঁহার পোরসিয়া, বিয়েত্রিস্ প্রভৃতি শিক্ষিতা নারীরা যে সকল কথা মুখে আনেন, আমাদের তাহা মনে আসিলেই ব্রীড়া বা জুগুপ্সার উদয় হয়। সুরুচির ধ্বজা পাঠক হয় ত ঐ দোষে সেক্ষপীয়র

---

* Shakspere's style is a compound of furious expression. No man has submitted words to such a contortion. Mingled contrasts, raving exaggerations, apostrophes, exclamations, the whole fury of the ode, inversion of ideas, accumulation of images, the horrible and the divine, jumbled into the same line.

Taine; English Literature.

পাঠই বন্ধ করিবেন। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে ইহাতে সেক্ষপীয়রের বড় অপরাধ নাই। তিনি মানুষতার কবি; মানুষের যাহা ভাষা, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যদি ফলস্ষ্ট্যাফের মত মানুষ অশ্লীল কথা কহে, তিনি কি করিবেন? যদি লীয়র বা পস্‌থুমাসের অবস্থায় পড়িলে মানুষের মুখে অশ্লীল কথা আসে, তিনি কি তাহার রোধ করিতে পারিবেন? যদি তাঁহার সময়ের শিক্ষিতা নারীরা দুই একটা ব্রীড়াজনক বাক্য বলিত, তাহাতে তাঁহার অপরাধ কি? তিনি মানুষতার কবি; মানুষ যেমন, তাঁহাকে ত সেইরূপই চিত্র আঁকিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই ব্রীড়া—জুগুপ্‌সাকারী অশ্লীলতায় যে সৌন্দর্য্যের হানি হয়, ইহা অবশ্যই মানিতে হয়। সেই জন্য এরূপ অশ্লীলতা কাব্যের দোষের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি; যাহা কাব্যের দোষ, যাহাতে কাব্যত্বের হানি হয়, তাহা তাঁহার কাব্যে থাকিবে কেন? এরূপ অশ্লীলতা তাঁহার কাব্যে নাই। কিন্তু আর এক প্রকার অশ্লীলতা আছে, যাহা বাস্তবিক অশ্লীলতা কি না, সে পক্ষে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তবে আজকালকার শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভাষায় ইহাকে অশ্লীলতা বলে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক ইহাকে আদিরস বলিতেন। কাব্য নাটকে প্রণয়ের মূলে এই আদিরস থাকে। আমরা এখন যাহাকে অশ্লীল বলি (স্তন, চুম্বন প্রভৃতি), এ রসের অবতারণায় এরূপ দুই একটা শব্দ আবশ্যক মত প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে কাব্যের হানি না হইয়া বরং সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ হয়। সেই জন্য সুরুচির-ভয়ে-অভীত কালিদাস এরূপ অশ্লীলতার (?) স্থানে স্থানে অবতারণা করিয়াছেন। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিই;—

> সৈকতঞ্চ সরযূং বিবৃণ্বতীং
> শ্রোনিবিম্বমিব হংসমেখলম্।
> স্বপ্রিয়াবিলসিতানুকারিণীং
> সৌধজালবিবরৈর্ব্যলোকয়ৎ॥

অথবা,

> নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র যক্ষাঙ্গনানাং
> বাসঃ কামাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎস্থ প্রিয়েষু।
> অর্চ্চিস্তুঙ্গানভিমুখগতান্ প্রাপ্য রত্নপ্রদীপান্
> হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফলপ্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ॥

সুরুচির ভয়ে এ দুই শ্লোকের অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। কিন্তু সুরুচির

ধ্বজাকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করি যে, যাহাকে তিনি অশ্লীলতা বলিতে শিখিয়াছেন, তাহাতে সৌন্দর্য্যের হ্রাস না হইয়া উপচয় হইল কি না? কালিদাসের অশ্লীলতাও সৌন্দর্য্যমাখা।

অতএব আমরা দেখিলাম, কালিদাসের ভাব, ভাষা, উপমাকৌশল, চরিত্র-সৃষ্টি, শব্দবিন্যাস, ছন্দের ঝঙ্কার, সকলই সুন্দর সৌন্দর্য্যময়। ইতিপূর্ব্বেই বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ ও অধ্যাত্মজগতের আলোচনায় দেখিয়াছি যে, ঐ চারি জগতের সমগ্র সৌন্দর্য্য তাঁহার সাক্ষাতে প্রকটিত হয়। অতএব সপ্রমাণ হইল যে, যাহা সুন্দর মধুর সুকুমার, তাহাই তাঁহার কাব্যের উপাদান। কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী সৌন্দর্য্য দৃষ্টি।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

বুড়া কয়েদীর দুঃখ।

ইভ্‌স্ (Yves) এক দিন সন্ধ্যার সময় বন্দর হইতে গন্‌বোটে (Gun boat) করিয়া জন কয়েক বন্দীকে নিউক্যালিডোনিয়া-অভিমুখী একখানি জাহাজে তুলিয়া দিতে গিয়াছিল। তাহার মুখে এই গল্পটি শুনিয়াছিলাম।

এই কয়েদীদের মধ্যে একজন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ অতি যত্নে খাঁচায় করিয়া একটি চড়াইপাখী লইয়া যাইতেছিল।

এই বৃদ্ধের মুখের ভাব ততটা মন্দ নয়। কিন্তু তাহার সহিত এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ একজন নবীন ভদ্রলোকের ঘৃণাকুঞ্চিত মুখখানি কি বীভৎস! নিকটের বস্তু ভাল করিয়া প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া, এই যুবকের ক্ষুদ্র ও পাণ্ডু-বর্ণ নাসিকার উপর একখানি চস্‌মা। ইভ্‌স্ কোনও প্রকারে সময় কাটা-ইবার জন্য, এই বৃদ্ধের সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল।

বুড়া, চুরী করিয়া ও আশ্রয়হীন নিষ্কর্ম্মা বলিয়া, পাঁচ ছয় বার শাস্তি পাইয়াছে। সে বলিল, "যখন মানুষে একবার চুরী করিয়াছে, তখন আর চুরী না করিয়া কি প্রকারে চুপ্ করিয়া থাকিতে পারে? তাহার কোন ব্যবসাও নাই, আর লোকেও তাহাকে বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াইতে দেয় না; কাজেই সে চুরী করিবে না ত কি? কি বল তুমি? এবার মাঠে একজন

গাড়োয়ানের একগাছা চাবুক্, একটা লাউ ও এক বস্তা আলু চুরী করিয়া এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আমায় ফ্রান্সে মরিতে না দিয়া এই বুড়া বয়সে বিদেশে পাঠাইয়া তাহাদের কি লাভ হইতেছে?" এক জনকে আগ্রহের সহিত তাহার কথা শুনিতে দেখিয়া, বুড়া আহ্লাদে ইভস্‌কে তাহার দরিদ্রের অমূল্য রত্ন খাঁচাটি দেখাইল।

পাখীটি বেশ পোষ মানিয়াছিল। এক বৎসর কারাগারে থাকিয়া সে বৃদ্ধের গলার আওয়াজ্ চিনিতে পারিত ...... বুড়া অনেক কষ্টে নিউক্যালিডোনিয়ায় এই পাখীটি লইয়া যাইবার আদেশ পাইয়াছিল। তাহার পর, পিঞ্জরনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ ও পুরাণ তার সংগ্রহ করিতে পরিশ্রমের ক্রটি হয় নাই। খাঁচাটি সুন্দর দেখাইবে বলিয়া, সে একটু সবুজ রংও আহরণ করিয়াছিল।

এইখানে আমার ইভ্‌সের ঠিক্ কথাগুলি পর্য্যন্ত মনে পড়িতেছে। "বেচারি চড়াইটি কয়েদীদিগের ধূসর বর্ণের মোটা রুটী খাইয়াই অন্যান্য পাখীর ন্যায় বেশ আনন্দে খাঁচার মধ্যে লাফাইয়া বেড়াইতেছিল।"

কয়েক ঘণ্টা পরে নৌকা জাহাজের ধারে আসিয়া লাগিল। কয়েদীরা এই দীর্ঘ জলযাত্রার জন্য জাহাজে উঠিতেছিল। ইভ্‌সের আর বুড়ার কথা কিছুই মনে ছিল না। ঘটনাক্রমে তাহার পাশ দিয়া যাইতে বুড়া সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত স্বরে খাঁচাটি হাতে করিয়া বলিল, "এই নাও, খাঁচাটি তোমায় দিলাম। আমার আর কোন দরকার নাই, তুমি এ'তে কিছু রাখ্‌তে পার।"

"সে কি? না,না,—তুমি পাখীটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। বিদেশে এ তোমার বেশ সঙ্গী হবে।"

"সে কি আর খাঁচায় আছে? তুমি তবে কিছুই জান না; তা' হলে তুমি কিছু শুন্‌তেও পাওনি। সে আর ওখানে নেই!" এই কথা বলিতে বলিতে অব্যক্ত গভীর দুঃখে বৃদ্ধের গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু পড়িল।

নৌকাখানি খুব্ একবার দুলিয়া ওঠায় খাঁচার দুয়ার খুলিয়া যায়। পাখীটির ডানা কাটা। সে ভয়ে খাঁচার বাহির হইয়া ঝট্‌পট্ করিতে করিতে সমুদ্রের জলের উপর গিয়া পড়িল। কি ভয়ানক অবস্থা! পাখীটি প্রাণপণে প্রখর সমুদ্রতরঙ্গের সহিত যুঝিতেছিল। বৃদ্ধ উপায়হীন হইয়া হাত কামড়াইতেছিল। বুড়ার প্রথমে সাহায্যের জন্য চেঁচাইয়া কাহাকেও ডাকিতে ইচ্ছা হইতেছিল, ছুটিয়া গিয়া

করযোড়ে ইভ্‌সের কাছে প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল—কিন্তু নিজের ঘৃণিত ও হীন অবস্থার কথা ভাবিয়া, তাহার মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। তাহার মতন একটা হতভাগা বুড়ার পাখীর জন্য কে আর দুঃখিত হইবে? তাহার ন্যায় লোকের প্রার্থনা শুনিবার জন্য কাহার আর এত মাথা ব্যথা পড়িবে? এক জন কয়েদীর একটা চড়াইপাখী ডুবিয়া মরিতেছে বলিয়া যে নৌকা থামান হইবে, ইহা কল্পনারও অতীত। এ রকম চিন্তা মনে আসিতেই পারে না। কাজেই বুড়া চুপ্ করিয়া বসিয়া ক্ষুদ্র পাখীটির আকুলীবিকুলী দেখিতেছিল। অবশেষে ভাসিতে ভাসিতে সাগরের শুভ্র ফেনার মধ্যে পাখীটি অদৃশ্য হইয়া গেল। এই কোলাহলপূর্ণ সাগরাম্বরা ধরিত্রীতে সে যে চিরদিনের জন্য নিতান্তই একাকী, এই কথা ভাবিয়া তাহার বিষম যাতনা হইতেছিল। এই তীব্র নিরাশায় তাহার চক্ষু জলে ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। তাহার সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ভদ্রলোকটি বুড়াকে কাঁদিতে দেখিয়া হাসিতেছিল।

সযত্ননির্ম্মিত খাঁচাটি রাখিয়া দিবার তাহার একটুও ইচ্ছা ছিল না। ইভস্ মনোযোগের সহিত তাহার কাহিনী শুনিয়াছে বলিয়া, এই দীর্ঘ যাত্রার পূর্ব্বে, ইভস্‌কে এই সম্পত্তিটি দিয়া যাইবার জন্য বুড়ার একান্ত ইচ্ছা।

ইভস্ ঘৃণা করিয়া তাহার এই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করিল না;—বুড়া পাছে এই কথা মনে করে বলিয়া, ইভস্ সজল নয়নে নির্ব্বাসিতের এই বিহগকূজনহীন পিঞ্জরটি গ্রহণ করিল।

এই গল্পের মধ্যে যে কি আকুল ব্যথা আছে, আমি তাহা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিলাম না।

গল্প শুনিতে শুনিতে অনেক রাত হইয়াছিল, আমি শয়ন করিতে যাইতেছিলাম। আমার জীবনের মধ্যে অনেক গগনভেদী শোকধ্বনি শুনিয়াছি, অনেক হৃদয়বিদারী অভিনয় ও কত শত মরণ দেখিয়াছি; কিন্তু আমার এ সমস্তে বড় একটা কখনো কষ্ট হয় নাই। কিন্তু সে দিন এই বুড়ার কষ্ট আমার হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। বোধ হইতেছিল, সে রাত্রে আর কোন ক্রমে চক্ষের পাতা বুজিতে পারিব না। আমি বলিলাম, "আচ্ছা, বোধ হয় বুড়াকে আর একটা পাখী দিবার কোন উপায় নাই।"

ইভস্ উত্তর দিল, "এই কথা আমারও মনে হইতেছিল। তাহার চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে,সময় থাকিলে,—আমি ভাবিতেছিলাম—একটা খুব সুন্দর পাখী

কিনিয়া এই খাঁচার মধ্যে করিয়া তাহাকে দিয়া আসিব। কিন্তু এটা একটু শক্ত। আমি ত বুড়ার নাম পর্য্যন্ত জানি না। কিন্তু তুমি যদি চেষ্টা কর, হয় ত এই কয়েদীকে খুঁজিয়া তাহাকে এই উপহার দিয়া আসিতে পার। লোকে হয় ত এটা একটা আশ্চর্য্য কাজ ভাববে—নয় ?"

"তার আর ভুল আছে" এই কথা বলিয়া আমার একটু আহ্লাদ হইতেছিল ও সেই সঙ্গে মনে মনে একটু হাসি আসিতেছিল। কিন্তু সকালবেলায় আমার পূর্ব্বকল্পিত অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করিতে প্রবৃত্তি হইল না। এই সমস্ত উপহার ব্যাপারটা ছেলেমানুষী বলিয়া বোধ হইতেছিল। মর্ম্মভেদী নিরাশা-ব্যথিত হৃদয়কে শুধু একটা খেলনা দিয়া শান্ত করিতে যাওয়া নিতান্ত হাস্যজনক। স্বর্গ হইতে বিচিত্র বিহঙ্গম আনিয়া দিলেও, এই কুৎসিত ছিন্ন-পক্ষ কারাগৃহে লালিত পাখীর কথা সে কখন ভুলিতে পারিত না। বহুকাল পরে সে বুড়ার মৃত হৃদয়ে অনন্ত মধুর করুণার উৎস খুলিয়া দিয়াছিল,—এই শুষ্ক কঠিন হৃদয় হইতে দুই বিন্দু অশ্রু বাহির করিয়াছিল।*

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

বৰ্দ্ধনরাজগণ।

(৩)

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, স্থান্বীশ্বরে বর্দ্ধন রাজবংশের অভ্যুদয়। প্রথমতঃ, বর্দ্ধনগণ কেবল স্থান্বীশ্বর বিষয়ের (পরগণার) অধিপতি ছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের রাজ্যসীমা প্রসারিত হইয়াছিল। চীনপরিব্রাজক হিয়ানসাঙ বলেন, স্থান্বীশ্বর রাজ্যের পরিধি ১১৬৭—১৪০০ মাইল। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রকৃত পক্ষে পাঞ্জাবের দক্ষিণাংশ ও রাজপুতানার পূর্ব্বাংশ মাত্র প্রভাকরবর্দ্ধনের করতলস্থ ছিল। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য রাজ্য প্রভাকরবর্দ্ধন কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া থাকিলেও, তাহা স্থায়ীরূপে স্থান্বীশ্বর রাজদণ্ডের অধীন হয় নাই। এই রাজ্যের পূর্ব্বসীমা মৌখরীবংশীয়দিগের দণ্ডাধীন কান্যকুব্জের সহিত সংযুক্ত ছিল। গ্রহবর্ম্মার অকাল-

* Piere Lotti.

মৃত্যুর পর, তাঁহার শ্যালক রাজ্যবৰ্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন সেই রাজ্য প্রাপ্ত হন। মহারাজ হর্ষ দিগ্বিজয় কার্য্য সমাধা করিয়া, স্থান্বীশ্বর পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক কান্যকুব্জ নগরে স্বীয় রাজপাট সংস্থাপিত করেন। পাঞ্জাবের দক্ষিণাংশ হইতে মিথিলা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূমি,সাক্ষাৎসম্বন্ধে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের দণ্ডাধীন ছিল।

প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লী মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের করতলস্থ ছিল। দিল্লী জেলার অন্তর্গত শোনপাঠনগরে হর্ষবর্দ্ধনের যে বৃহৎ তাম্রমুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহার কোন কোন অংশ বিনষ্ট হইয়া গেলেও, তাহাতে হর্ষবর্দ্ধন ও তাঁহার পূৰ্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এজন্য সেই মুদ্রার প্রতিলিপি এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

১। ... ... য ... শ্রীমহা ... ...
২। ... পরমাদিত্যভ জ শ্রীরাজ্যবৰ্দ্ধনঃ॥ তস্যপুত্রস্তৎপ
৩। ... শ্রীমহাদেব্যামু দিত্যভক্ত মহারাজ শ্রীমদাদিত্য
৪। ... ॥-স্য মহাসেনগুপ্তাদেব্যামুৎপন্ন
৫। ... য সৰ্ব্ববর্ণাশ্রমব্যবস্থাপনপ্রবৃ
৬। ... য ব প্রবৰ্দ্ধ পরমাদিত্যভক্ত পরমভট্টারক
৭। মহারাজাধিরাজ শ্রীপ্রভাকর বৰ্দ্ধনঃ॥ তস্যপুত্র স্তৎ পাদানুধ্যা
৮। ই শ্রীমত্যা যশোমত্যা পরমসৌগত
৯। মহারাজাধি শ্রীরাজ্যব ॥
১০। ধ্যাতো মহাদেব্যা যশোমত্যা
১১। ... ...
১২। ... হরাজা রাজ শ্রীহর্ষ ... ...
১৩। বৰ্দ্ধনঃ॥

পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মহাভারতের নায়ক পাণ্ডবদিগের রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থ হর্ষবর্দ্ধনের করতলস্থ ছিল। এক্ষণে আমরা দেখাইব যে, রামায়ণের নায়ক শ্রীরামচন্দ্রের পৈত্রিক রাজ্য উত্তরকোশল বা অযোধ্যাপ্রদেশও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হর্ষের রাজদণ্ডের অধীন ছিল।

১৮১০ শকাব্দের শীত ঋতুতে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশান্তর্গত আজিমগড় নগরীর ৩২ মাইল দূরবর্ত্তী মধুবন গ্রামের জনৈক কৃষক ষৎকালে ক্ষেত্রকর্ষণ করিতেছিল, সেই সময় তাহার হলফলকে বিদ্ধ হইয়া ২০ $\frac{১}{৪}$ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ১৩$\frac{৪}{১}$ ইঞ্চ পরিসর একখণ্ড তাম্রফলক ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল।

আজিমগড়ের কালেক্‌টর সাহেব দ্বারা উক্ত তাম্রফলক লক্ষ্ণৌনগরীস্থিত চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার ভুলার ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। এই তাম্রফলক মহারাজাধিরাজ হর্ষের দানপত্র। পণ্ডিতপ্রবর ডাক্তার ভগবানলাল ইন্দ্রজী, নেপাল হইতে যে সকল ক্ষোদিত লিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার ১৫ সংখ্যক লিপির অক্ষরের সহিত এই তাম্রফলকের অক্ষর একাকৃতিবিশিষ্ট। এই ফলকপত্র পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি, পাঠকদিগকে তাহার অংশভাগী না করিয়া বিরত হইতে পারিলাম না। এ জন্য তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

প্রথম পংক্তি—ওঁ স্বস্তি মহানৌহস্ত্যশ্বজয়স্কন্ধাবারত্ পিণ্থিকায়াঃ মহারাজশ্রীনরবর্দ্ধনস্তস্য পুত্রস্তৎপাদানুধ্যাতঃ শ্রীবজ্রিণীদেব্যামুৎপন্নঃ পরমাদিত্যভক্তো

দ্বিতীয় পংক্তি—মহারাজশ্রীরাজ্যবর্দ্ধনস্তস্য পুত্রস্তৎপদানুধ্যাতঃ শ্রীঅপ্‌সরোদেব্যামুৎপন্নঃ পরমাদিত্যভক্তো মহারাজশ্রীমদাদিত্যবর্দ্ধনস্তস্য পুত্রস্তৎপাদানুধ্যাতঃ শ্রীমহা

তৃতীয় পংক্তি—সেনগুপ্তাদেব্যামুৎপন্নশ্চতুঃসমুদ্রাতিক্রান্তকীর্ত্তিপ্রতাপানুরাগোপনতান্যরাজো বর্ণাশ্রমব্যবস্থাপনপ্রবৃত্ত চক্র একচক্ররথ প্রজানামার্ত্তিহরঃ

চতুর্থ পংক্তি—পরমাদিত্যভক্তঃ পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজশ্রীপ্রভাকরবর্দ্ধনস্তস্য পুত্রস্তৎপাদানুধ্যাতঃ সিতয়শঃ প্রতানবিচ্ছুরিতসকলভুবনমণ্ডলঃ পরিগৃহীত

পঞ্চম পংক্তি—ধনদবরুণেন্দ্রলোকপালতেজাঃ সৎপথোপার্জ্জিতানেকপ্রবিণভূমিপ্রদানসম্প্রীণিতার্থিহৃদায়াতিশয়িতপূর্ব্বরাজচরিতো দেব্যামমলযশোমত্যাং

ষষ্ঠ পংক্তি—শ্রীযশোমত্যামুৎপন্নঃ পরমসৌগতঃ সুগত ইব পরহিতৈকরতঃ পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজশ্রীরাজ্যবর্দ্ধন রাজানো যুধি দুষ্টবাজিন ইব শ্রীদেবগুপ্তা

সপ্তম পংক্তি— ... ... দয়ঃ

কৃত্বা যেন কশা প্রহারবিমুখা সর্ব্বে সমং সংযতাঃ (।) উৎখায় দ্বিষতো বিজিত্য বসুধাং কৃত্বা প্রজানাং প্রিয়ং (।) প্রাণানুজ্ঝিতবানরাতিভবনে সত্যানুরোধেন যঃ (॥) তস্যানুজ

অষ্টম পংক্তি—স্তৎপাদানুধ্যাতঃ পরমমাহেশ্বরো মহেশ্বর ইব সর্ব্বসত্বানুকম্পো পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজশ্রীহর্ষঃ শ্রাবস্তোভুক্তৌ কুণ্ডধানো বৈষয়িক সোমকুণ্ডিকাগ্রামে—

নবম পংক্তি—সমুপগতাং মহাসামন্তমহারাজদৌস্মাধসাধনিকপ্রমাতাররাজস্থানীয়কুমারামাত্যোপরিকবিষয়পতিভটচাটসবেকাদীন্ প্রতি-বাসিজনপদাশ্চসমা—

দশম পংক্তি—জ্ঞাপয়ত্যস্ত বঃ সম্বিদিতং ময়ং সোমকুণ্ডিকাগ্রামো ব্রাহ্মণ-বামরথ্যেন কূটশাসনেন ভুক্তক ইতি বিচার্য্য যতস্তচ্ছাসন ভঙক্ত্বা তস্মাদাক্ষিপ্য চ স্বসীমা—

একাদশ পংক্তি—পর্য্যন্ত সোদ্রঙ্গ সর্ব্বরাজকুলাভাব্য প্রত্যয়াসমেতঃ সর্ব্ব-পরিহিতপরিহারো বিষয়াদ্বদ্ধৃতপিণ্ডঃ পুত্রপৌত্রানুগচন্দ্রার্ক্কক্ষিতি-সমকালীনো—

দ্বাদশ পংক্তি—ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন ময়া পিতুঃ পরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ-শ্রীপ্রভাকরবর্দ্ধনদেবস্য মাতুঃ পরমভট্টারিকামহাদেবীরাজ্ঞী-শ্রীযশোমতীদেব্যাঃ

ত্রয়োদশ পংক্তি—জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজশ্রীরাজ্যবর্দ্ধনদেবপদা-নাং চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে সাবর্ণিসগোত্রচ্ছন্দোগসব্রহ্মচারিভট্ট-বাতস্বামি—

চতুর্দ্দশ পংক্তি—বিষ্ণুবৃদ্ধসগোত্রবহ্বচসব্রহ্মচারিশিবদেবস্বামিভ্যাং প্রতিগ্রহ-ধর্ম্মণা গ্রহারত্বেন প্রতিপাদিতঃ বিদিত্বা ভবদ্ভি সমনুমন্তব্যঃ প্রতি

পঞ্চদশ পংক্তি—বাসিজনপদৈরপ্যাজ্ঞাশ্রবণবিধেযৈর্ভূত্বা যথাসমুচিততুল্যমেয়ভাগভোগকরহিরণ্যাদিপ্রত্যয়াঃ অনয়োরেবো পতেয়াঃ সেবোপস্থানং চ করণীয়মিত্য—

ষোড়শ পংক্তি— ... ... পি চ॥ অস্মৎকুলক্রমমুদারমুদাহরদ্ভিরন্যৈশ্চ দানমিদমভ্যনুমোদনীয়ং (।) লক্ষ্ম্যাস্তড়িৎসলিলচঞ্চলায়াঃ দানং ফলং পরযশঃপরিপালনঞ্চ॥ কর্ম্মণা

সপ্তদশ পংক্তি—মনসা বাচা কর্ত্তব্যং প্রাণিনে হিতং (।) হর্ষেনৈত (ৎ) সমা-খ্যাতং ধর্ম্মার্জ্জনমনুত্তমং॥ দূতকোত্রমহাপ্রমাতারমহাসামন্তশ্রীস্কন্ধ-গুপ্তঃ মহাক্ষপটলাধিকরণাধি—

অষ্টাদশ পংক্তি—কৃতসামন্তমহারাজেশ্বরগুপ্তসমাদেশাচ্চোৎকীর্ণং গুর্জ্জরেন সম্বৎ ২০+৫ মার্গশীর্ষবদি ৬।

বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের মতে, মহারাজ যুবনাশ্বের পৌত্র রাজা শ্রাবের পুত্র শ্রাবস্ত, স্বনামখ্যাত শ্রাবস্তী নগরী নির্ম্মাণ করেন। ত্রিকাণ্ডশেষের মতে, এই নগরীর অপর নাম ধর্ম্মপত্তন। এই নগর উত্তরকোশলের মধ্যে অবস্থিত। বুদ্ধদেব শাক্যসিংহের সময়ে শ্রাবস্তী অযোধ্যার সর্ব্বপ্রধান নগরী ছিল। বুদ্ধের সমসাময়িক প্রবলপ্রতাপশালী নরপতি প্রাসনজিৎ এই নগরে বাস করিতেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী সুদত্ত, স্বীয় দানশীলতা দ্বারা "অনাথ-পিণ্ডদ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরিব্রাজক হিয়ানসাঙ শ্রাবস্তী রাজ্যের পরিধি ১০০০—১২০০ মাইল লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রধান নগর শ্রাবস্তীকে তিনি পরিত্যক্ত ও ভগ্নদশাপ্রাপ্ত লিখিয়াছেন।* শ্রাবস্তী রাজ্য এবং উত্তর কোশলের অন্যান্য অংশ তৎকালে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের দণ্ডাধীন ছিল।

এই শ্রাবস্তীভুক্ত্যন্তর্গত কুণ্ডধান-বিষয়ের (পরগণার) অধীন সোম-কুণ্ডিকা-নামক গ্রাম, বামরথ্য-নামক জনৈক ব্রাহ্মণ, কূট (জাল) সনন্দের বলে ভোগ করিতেছিলেন। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন এই সংবাদ অবগত হইয়া, সেই কূট সনন্দ বিনষ্ট করেন, এবং সোমকুণ্ডিকাগ্রাম সাবর্ণি-গোত্রজ চ্ছান্দোগ (সামবেদী) ব্রহ্মচারী ভট্ট বীতস্বামী এবং বিষ্ণুবৃদ্ধ-গোত্রজ বহ্বৃচ (ঋগ্বেদী) ব্রহ্মচারী শিবদেবস্বামীকে দান করেন।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন রাজদণ্ড ধারণ পূর্ব্বক একটি অব্দ প্রবর্ত্তিত করেন। বিখ্যাত মুসলমান গ্রন্থকার আলবেরুণী, খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার মতে, হর্ষবর্দ্ধন, বিক্রমাদিত্যের (সম্বতের) ৬৬৪ বৎসরের পরবর্ত্তী; সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ৫২৯ শকাব্দে (৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে) হর্ষবর্দ্ধন রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন।†

---

* The kingdom of Sravasti is about 6000 li in circuit. The chief town is desert and ruined.—Si-yu-ki. Vol. II. p. 1.

† আলবেরুণী বলেন, "ভারতবাসীগণ সচরাচর শ্রীহর্ষ, বিক্রমাদিত্য, শক বল্লভ এবং গুপ্তাব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।" (Alberuni's Indika by Sachu. Vol. II p. 5) কিন্তু এস্থলে পণ্ডিতপ্রবর আলবেরুণী হর্ষবর্দ্ধনের প্রচলিত অব্দকে লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, তৎপক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে; কারণ,ইহার কয়েক পংক্তি নিম্নে তিনি বলিতেছেন,—Now the year 400 of Yazdajirad, which we have chosen as a gauge, corresponds to following years of the Indian eras:—(1) to the year 1483 of the era of Sri-Harsha.

পরিব্রাজক হিয়োনসাঙের বর্ণিত ঘটনাসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া, পণ্ডিতপ্রবর মেক্‌সমূলার বলেন, ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে (৫৩২ শকাব্দে) হর্ষবর্দ্ধন রাজদণ্ড ধারণ করেন। পঞ্চবিংশতি হর্ষাব্দে উল্লিখিত দানকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। বাণভট্ট স্কন্দগুপ্তকে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের গজসৈন্যের নায়ক লিখিয়াছেন। উক্ত তাম্রফলকে সেই স্কন্দগুপ্তকে "মহাসামন্ত মহারাজ" লেখা হইয়াছে। বোধ হয়, স্কন্দগুপ্ত মহারাজ হর্ষের অধীনস্থ "সামন্ত" নরপতি এবং সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে উক্ত দানকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

রোশিনারা।

(২)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাজা রতনচাঁদ বন্দী হইয়াছেন, এক দণ্ডের মধ্যে এই কথা দিল্লীতে রাষ্ট্র হইয়া গেল। শুনিয়া অনেকে আনন্দিত হইল—রতনচাঁদ সামান্য অবস্থা হইতে সহসা বহুক্ষমতাপন্ন হইয়া নানাবিধ অত্যাচার করিতেন। উজীরের ভয়ে তাঁহাকে কেহ কিছু বলিত না। কিন্তু তাঁহার বিপদের সময় সহানুভূতি প্রকাশ করিবারও বড় কেহ ছিল না। কেবল রাজা রতনচাঁদের পরিবারের মধ্যে এবং তাঁহার প্রতিপালিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অত্যন্ত আশঙ্কা ও কোলাহল উপস্থিত হইল। তাঁহার জনকতক মোসাহেব উজীরের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল।

---

(2) to the 1088 of the era of Vikramaditya ; (3) to the year 953 of Saka Kala ; (4) to the year 712 of the Balava era, which is identical with Gupta Kala. এই বর্ণনা দ্বারা শ্রীহর্ষাব্দ বিক্রম-সংবতে ৪০০ বৎসরের এবং শকাব্দের ৫৩৫ বৎসরের পরবর্ত্তী হইতেছে। সুতরাং, উল্লিখিত শ্রীহর্ষ, বর্দ্ধনকুলতিলক হর্ষবর্দ্ধন হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইতেছেন। কিন্তু আলবেরুণী স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "তিনি কাশ্মীরদেশীয় পঞ্জিকা-পাঠে জ্ঞাত হইয়াছেন যে, শ্রীহর্ষ (বর্দ্ধন) বিক্রমাদিত্যের ৬৬৪ বৎসরের পরবর্ত্তী।" তদনুসারে, আমরা হর্ষবর্দ্ধনের অভিষেককাল ৫২৯ শকাব্দ (৬০৭ খৃষ্টাব্দ) সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

আবদুল্লা খাঁ প্রথমে বিশ্বাসই করেন না। তাঁহার অজ্ঞাতে বাদশাহের কি সাধ্য যে, রতনচাঁদকে বন্দী করেন, কিংবা তাহাকে কোনরূপ অপমান করেন? বাদশাহের এমন ক্ষমতাও নাই যে, উজীরের দ্বারের ভিক্ষুককে কিছু বলেন, রতনচাঁদ এবং উজীর অভিন্নহৃদয়, কোন্ সাহসে বাদশাহ রাজাকে অপমানিত করিবেন? এমন অসম্ভব কথা উজীর কিছুতেই বিশ্বাস করিতে সম্মত হন না।

রাজা রতনচাঁদের একজন পারিষদ কহিল, "খোদাবন্দ, বাদশাহের শরীর-রক্ষক সৈনিকগণ রাজাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছে। পরোয়ানায় বাদশাহী মোহর ছিল।"

উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মোহর?" সকল মোহর তাঁহার নিকটে থাকিত।

পারিষদ কহিল, "বাদশাহের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ের মোহর। গোপনীয় কর্ম্মের জন্য সেই মোহরই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।"

উজীর বেগে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। যে অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী ধারণ করিতেন, স্পর্শ করিয়া দেখিলেন। মনের বেগে কহিলেন, "যদি রতনচাঁদের কোন বিপদ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আমারও বিপদ নিকট জানিবে। এখন কথা কহিবার সময় নহে। কেবল রতনচাঁদকে রক্ষা করিতে হইবে না, আমাকে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। চেষ্টার ক্রটী হইবে এই সান্ত্বনা লইয়া তোমরা গৃহে যাও।"

অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে উজীর দুর্গাভ্যন্তরস্থিত রাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন। ফিরোকসায়ের জনানা মহলে বুলবুলির লড়াই দেখিতেছিলেন। কুতুব উলমুল্‌ক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া শশব্যস্তে বাহিরে আসিলেন। খাসদেওয়ানের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র গৃহে উজীর অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাদশাহকে আসিতে দেখিয়া দরবারি ধরণে তিনবার পিছু হটিয়া সেলাম করিলেন,অগ্রসর হইবার সময় সেইরূপ সেলাম করিলেন। বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "জাঁহাপনা,কিছু বিশেষ নিবেদন করিবার আছে।"

বাদশাহের ইঙ্গিতমাত্র আর সকলে বাহিরে গেল। ফিরোকসায়ের উজীরের হস্তধারণ করিয়া আপনার পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন, কহিলেন, "আবদুল্লা খাঁ, তোমাকে কিছু চিন্তিত দেখিতেছি। কি হইয়াছে? কোন-দিকে শত্রু উপস্থিত হইয়াছে? সমস্ত মঙ্গল ত?"

আবদুল্লা খাঁ কহিলেন, "বাহিরের শত্রু হইতে কোন্ আশঙ্কা নাই, ঘরের শত্রু হইতেই ভয়। অতি অদ্ভুত সংবাদ পাইয়া আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি।"

বাদশাহ বিপদের আশঙ্কা করিয়া কহিলেন, "কি হইয়াছে?"

উজীর কহিলেন, "রতনচাঁদ বন্দী হইয়াছে। শহরশুদ্ধ লোক বলিতেছে, "সে বাদশাহের আদেশে বন্দী হইয়াছে।"

ফিরোকসায়ের আবদুল্লা খাঁর প্রতি কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "আবদুল্লা খাঁ, তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিতেছ? তোমার অজ্ঞাতে অথবা তোমার পরামর্শ ব্যতীত আমি কি করিয়া থাকি? বিশেষ রতনচাঁদ আমার কি ক্ষতি করিয়াছে যে, তাহাকে আমি বন্দী করিব? সে তোমার একান্ত অনুগৃহীত, আমি কি জানি না?"

উজীর কহিলেন, "সেই জন্য এ কথা আমারও বিশ্বাস হইতেছে না। কিন্তু দুই এক জন পরোয়ানা দেখিয়াছে, তাহারা কহিতেছে, পরোয়ানার উপর বাদশাহের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কের মোহর আছে।"

বাদশাহ ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন, "সে অঙ্গুরী ত তোমার কাছে।"

উজীর অঙ্গুরীয়শূন্য হস্ত দেখাইয়া কহিলেন, "অঙ্গুরী চুরী গিয়াছে।"

বাদশাহ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া চুরী গেল?"

সত্য কথা বলিতে গেলে অনেক কথা বাহির হইয়া পড়ে। উজীর চক্ষু ফিরাইয়া মৃদু মৃদু কহিলেন, "আমার অজ্ঞাতে চুরী গিয়াছে।"

বাদশাহ মনের ভাব গোপন না করিয়া ভীত স্বরে কহিলেন, "আবদুল্লা খাঁ, আমাদের উভয়েরই কোন গুপ্ত শত্রু আছে। তুমি এই বিপদের প্রতিকার কর, আমি কি করিব? আমাকে যেমন পরামর্শ দিবে, সেইরূপ করিব।"

উজীর কহিলেন, "আমারও তাহাই মনে হইতেছে। আপনি ইহার কিছু জানেন না?"

বাদশাহ উজীরের হস্ত ধারণ করিয়া কিছু বিষণ্ণ ভাবে কহিলেন, "তোমার কাছে আমার গোপনীয় কি আছে? তুমিও তোমার ভ্রাতা হুসেন আলি খাঁ বিপদের সময় আমায় আশ্রয় দিয়াছিলে, যুদ্ধক্ষেত্রে আমার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলে, তোমরাই আমাকে মসনদে বসাইয়াছ, সে কথা কি আমি বিস্মৃত হইয়াছি? তোমাদের সহিত আমি শত্রুতা করিব? রতনচাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে তোমায় বলিতাম। আমার কথা তুমি বিশ্বাস করিতেছ না?"

উজীর কহিলেন, "অপরাধ লইবেন না, চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এ বিষয়ের তথ্য জানিতেছি।"

উজীর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা রতনচাঁদের অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক ছুটিল। উজীরের গুপ্তচর সর্ব্বত্র থাকিত, দুর্গের নিকটে যাহারা থাকিত,তাহারা আসিয়া সংবাদ দিল, বাদশাহের নিজের কোন সৈনিক বাহিরে যায় নাই, দুর্গে কোন শিবিকা প্রবেশ করে নাই। উজীর বুঝিয়াছিলেন, এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে বাদশাহের কোন হাত নাই। তবে রতনচাঁদকে কে বন্দী করিয়া লইয়া গেল, কেন লইয়া গেল? অঙ্গুরীয়কের কথা শুনিয়াই তাঁহার মনে আশঙ্কার ছায়া পতিত হইয়াছিল—উজীর সেই তীব্রচক্ষু অপরিচিত পুরুষকে স্মরণ করিলেন। উজীরের মনে নানা দুর্ভাবনা উপস্থিত হইতে লাগিল।

দিল্লীতে উজীরের গুপ্তচরদিগের অবিদিত কোন স্থান ছিল না। কিন্তু রাজা রতনচাঁদকে কে লইয়া গেল, কোথায় লইয়া গেল, কোন সন্ধান পাইল না।

সন্ধ্যার সময় উজীর আপনার অট্টালিকায় বসিয়াছিলেন। গৃহে একটি মাত্র আলোক জ্বলিতেছিল। বাম হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া উজীর চিন্তা করিতেছিলেন। দুই চারি জন পারিষদ সম্মুখে নীরব হইয়া উপবেশন করিয়াছিল। সহসা গৃহের মধ্যে উজীরের পার্শ্ববর্ত্তী ভিত্তিতে মনুষ্যের ছায়া পতিত হইল। উজীর ছায়া দেখিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন।

দেখিলেন, তীব্রজ্বালাশালীচক্ষু, পিঙ্গলকেশ, সেই অপরিচিত পুরুষ! তাহাকে দেখিবামাত্র উজীর লম্ফ দিয়া উঠিলেন, চীৎকার পূর্ব্বক কহিলেন, "ইহাকে ধর, যেন পলায়ন না করে!"

অপরিচিত পুরুষ স্বয়ং দ্বার রুদ্ধ করিয়া সস্মিত মুখে কহিল, "উজীর সাহেব, যদি পলায়ন করিবারই ইচ্ছা থাকিবে, তাহা হইলে আপনার গৃহে উপস্থিত হইব কেন? আপনার লোকেরা এতদিন অন্বেষণ করিয়া আমার দেখা পায় নাই, এই জন্য স্বয়ং ধরা দিতে আসিয়াছি। আপনি এত চীৎকার করিতেছেন কেন?"

এই শ্লেষাত্মক কথায় উজীরের পূর্ব্ব অপমান শতগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ক্রোধে শরীর কাঁপিতে লাগিল। পারিষদদিগকে কহিলেন, "ইহাকে তোমরা অবিলম্বে বন্ধন কর। এই ব্যক্তি আমার পরম শত্রু।

ইহাকে বন্ধন করিয়া ইহার পদতলে পাঁচ শত বেত্রাঘাত কর, তৎপরে চিম্‌টা দিয়া ইহার শরীরের সমস্ত মাংস অস্থি হইতে পৃথক কর, সেই মাংস শ্মশানের কুক্কুর দ্বারা ভোজন করাও। ইহাকে সহস্রবার হত্যা করিলেও ইহার দুষ্কৃতির প্রতিশোধ হয় না।"

পিঙ্গলকেশ পুরুষ মাথা তুলিয়া উচ্চ হাস্য করিল। হাস্যের শব্দ শুনিয়া উজীর শিহরিয়া উঠিলেন। পারিষদেরা সেই গর্ব্বিত ধৃষ্টকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইল।

অপরিচিতের হস্তে একটি ক্ষুদ্র যষ্টি ছিল, সেই যষ্টির ভিতর হইতে ক্ষুদ্র তরবারির ন্যায় একটা অস্ত্র নিষ্কাশিত করিল। সেই তরবারি দ্বারা পারিষদ-দিগকে একে একে চকিতের ন্যায় স্পর্শ করিল। অতি লঘু স্পর্শ, আঘাতের সম্ভাবনা মাত্র ছিল না, কিন্তু সেই স্পর্শে পারিষদগণ যন্ত্রণাসূচক চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে উজীরের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল, কিন্তু পূর্ব্ব অপমানের স্মৃতি তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ হইতেছিল। তাঁহার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র গুপ্ত দ্বার ছিল। সেই দ্বার অল্প উদ্‌ঘাটিত করিয়া উজীর করতালি ধ্বনি করিলেন। সেই সঙ্কেত শ্রবণ করিবামাত্র, বহুসংখ্যক ভৃত্য ও খোজা অন্য দ্বার দিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিল। উজীর অপরিচিত ব্যক্তিকে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, "ইহাকে শীঘ্র বন্ধন কর। বল প্রকাশ করে ত হত্যা কর।"

উজীরের আদেশ সমাপ্ত না হইতেই সেই অপরিচিত পুরুষ হস্তস্থিত ক্ষুদ্র তরবারি নক্ষত্রবেগে চতুর্দ্দিকে সঞ্চালন করিতে লাগিল। কাহাকেও স্পর্শ করিল না, শূন্যে তরবারি চালনা করিতে লাগিল। উর্দ্ধে, অধোদিকে, দক্ষিণে, বামে, সেই তরবারি সঞ্চালনে অগ্নি উৎপন্ন হইল—শুভ্র, তীব্র, চক্ষু ঝলসন-কারী জ্বালা, তরবারির গতিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তরল অগ্নিতে তরঙ্গরাশি উঠিল। গৃহের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত অগ্নিময় প্রাচীর নির্ম্মিত হইল। প্রাচীরের মধ্যস্থলে অপরিচিত দণ্ডায়মান হইল, তাহার বলিষ্ঠ ঋজু দেহ এবং পিঙ্গলকেশশ্মশ্রুরাজিত মুখমণ্ডল অগ্নি শিখাবেষ্টিত হইয়া শোভিতে লাগিল।

ভৃত্যগণ মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বিস্ময়ে কিছুকাল উজীরের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অবশেষে কহিলেন, "ইন্দ্রজাল! ইন্দ্রজাল!

তোমরা অনর্থক ভীত হইও না। দুরাত্মাকে বন্ধন কর, নহিলে পলায়ন করিবে।”

এক জন সাহস করিয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু অগ্নি স্পর্শ করিবামাত্র বিকট চীৎকার করিয়া পতিত হইল। আর কেহ অগ্রসর হইল না।

অপরিচিত উজীরকে সম্বোধন করিয়া দৃঢ় স্বরে কহিল, “আবদুল্লা খাঁ সাবধান! দুই বার যাহা দেখিয়াছ, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছ, যে আমি তোমাকে তৃণ জ্ঞান করি। ইচ্ছা করিলে এই দণ্ডে এই গৃহ এবং তোমাকে ভস্মসাৎ করিতে পারি। আমার সন্ধান হইতে বিরত হও, নহিলে তৃতীয় বার তোমার দোষ মার্জ্জনা করিব না।”

অপরিচিত পুরুষ স্বয়ং যে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল, সেই দ্বার মুক্ত করিয়া বাহিরে গেল। তৎক্ষণাৎ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। সেই সঙ্গে গৃহের আলোক নিভিয়া গেল। দুর্নিরীক্ষ্য লেলিহানশিখ, অগ্নিসমুদ্রের পরিবর্ত্তে ভীতিসাধক ঘোর অন্ধকার রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বন্দী হইয়া রাজা রতনচাঁদ পাল্কীর ভিতরেই রহিলেন। অল্প দূর গমন করিয়াই সৈনিকনায়ক তাঁহাকে পাল্কী হইতে অবতরণ করিতে সঙ্কেত করিল, সঙ্কেত মত রাজা নীচে নামিলেন। বাহকদিগকে সৈনিক কহিল, “তোমরা পাল্কী ফিরাইয়া রাজা রতনচাঁদের গৃহে লইয়া যাও।” রাজা রতনচাঁদও মস্তক হেলাইয়া সেই আদেশ করিলেন। বাহক ও পাল্কী দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সৈনিক কহিল, “আমি আজ্ঞার দাস, আমার অপরাধ লইবেন না। এই স্থান হইতে আপনার চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছি।”

রাজা কোন কথা কহিলেন না। সম্মতি প্রকাশ করিবার জন্য মস্তক অবনত করিলেন। কিন্তু মনে মনে জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, উজীর তাঁহার বধাজ্ঞা দিয়াছেন, এবং সেই জন্য এরূপ আয়োজন। রাজা অনন্যোপায় হইয়া ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন।

দৃষ্টিহীন হইয়া রাজাকে অধিকদূর গমন করিতে হইল না। তাঁহার সম্মুখে একটা দ্বার মুক্ত হইল, তাঁহার পশ্চাতে আবার সেই দ্বার বন্ধ হইল, শব্দ দ্বারা অনুভব করিলেন। তাহার পর কতকগুলি সোপান, তাহার পর

বোধ হইল, যেন গৃহের ভিতর দিয়া গমন করিতেছেন। এমন সময় যে তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া যাইতেছিল, সে দাঁড়াইল, রাজার চক্ষের আবরণ মোচন করিয়া দিল।

রাজা চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে নীত হইয়াছেন। গৃহে সামগ্রীর মধ্যে একখানি জীর্ণ খট্টা, আর কিছু নাই। রাজার পথপ্রদর্শক কহিল, "এই স্থানে আপনার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পলায়নের চেষ্টা করিবেন না, বাহিরে প্রহরা। আবশ্যকীয় আহার্য্য এই স্থানেই পাইবেন।" সে ব্যক্তি গৃহের একমাত্র দ্বার খুলিয়া বাহির হইতে বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

রাজা রতনচাঁদ সেই প্রাচীন মলিন খট্টার উপর বসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

ক্ষুদ্র গবাক্ষ দিয়া গৃহে আলোক প্রবেশ করিতেছিল। বসিয়া বসিয়া রাজা সেই আলোক দেখিতে লাগিলেন—মনে কোন আশা ছিল না, যেন জীবনের গ্রন্থি গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, মৃত্যুর আগমনেও মনে ভীতির সঞ্চার হইতেছিল না, যেন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সশরীরে পৃথিবীর বাহিরে লইয়া আসিয়াছে, তাঁহার ফিরিয়া যাইবার সাধ্য নাই, প্রবৃত্তিও নাই।

আলোকরশ্মি ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল। সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বে একজন রক্ষক কিছু খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় জল রাখিয়া গেল। রাজা রতনচাঁদের ক্ষুধা কিছুমাত্র ছিল না, কিন্তু তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছিল। জলপাত্র হস্তে লইয়া মনে করিলেন, যদি এই জলে বিষ মিশ্রিত থাকে। তাহাতেই বা ক্ষতি কি! উজীরই হউন অথবা বাদশাহই হউন, যাহার প্রতি তাঁহারা অপ্রসন্ন হন, সে কখন অধিক কাল জীবিত থাকে না। রতনচাঁদ কয় দিন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবেন? জলের একবার আস্বাদ গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, তাহাতে তিক্ত, কটু বা কষায় রস পাইলেন না। আর চিন্তা না করিয়া রতনচাঁদ জল পান করিলেন।

একরাত্রি রাজার পক্ষে সহস্র ভয়ঙ্করী রজনীর মত গেল। নিদ্রা পলকের জন্য চক্ষে আসিল না। দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিবস মধ্যাহ্নের সময় পূর্ব্বদিনের রক্ষক কিছু আহার্য্য রাখিয়া গেল, কিন্তু রাজার সহিত কথা কহিল না। রাজা জলস্পর্শ করিলেন না। সন্ধ্যা হইবার কিছু পূর্ব্বে কারাগারের দ্বার মুক্ত হইল। রাজা একজন অপরিচিত সম্ভ্রান্ত পুরুষকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাকে দেখিয়া রতনচাঁদ

উজীরের বর্ণনা স্মরণ করিলেন। তাহার অঙ্গুলীতে বাদশাহের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখিয়া তাঁহার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

অপরিচিত কহিল, "রাজা রতনচাঁদ, বাদশাহ বা উজীর কেহই তোমায় বন্দী করেন নাই, আমি তোমায় বন্দী করিয়াছি, এখন বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিতেছ। তোমার কোন আশঙ্কা নাই, তোমার মত ক্ষুদ্র প্রাণীর হিংসা করিয়া আমার কোন ফল নাই। তোমাকে গোটাকতক কথা বলিবার জন্য এখানে আনয়ন করিয়াছি। উজীর আবদুল্লা খাঁ আমার উপর একটু বিরক্ত হইয়াছেন, কোন কথা শুনিতে চান না, এজন্য তোমায় বলিতেছি। উজীরের তুমি ক্রীতদাস, তাহা আমি অবগত আছি। উজীর আমার বলের পরিচয় কিছু পাইয়াছেন, তুমি কৌশলের কিছু পরিচয় পাইয়াছ। আবদুল্লা খাঁকে বলিও, যে কার্য্যে আমি হস্তক্ষেপ করি, তাহাতে যেন কোন বাধা না দেন। আবদুল্লা খাঁ কোন্ ছার, ইচ্ছা করিলে আমি এই মোগল সাম্রাজ্য, তৈমুরের বংশ ধ্বংস করিতে পারি, কিন্তু আমাকে তাহা করিতে হইবে না, কাল স্বয়ং সেই কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। এখানে আমার কিছু কর্ম্ম আছে। তোমাকে এবং তোমার প্রভুকে সাবধান করিয়া দিতেছি, আমার সঙ্গে বাদ সাধিও না। ক্রুদ্ধ হইলে পিপীলিকার ন্যায় তোমাদিগকে পদদলিত করিব।"

রাজা কাল ও পাত্র বুঝিতেন। বুঝিলেন, এ সময় ক্রোধপ্রকাশের নহে। বিনয় পূর্ব্বক কহিলেন, "আমি কেন মহাশয়ের অমঙ্গল চেষ্টা করিব? আমি আপনাকে পূর্ব্বে দেখি নাই, আপনার নাম পর্য্যন্ত জানি না।"

অপরিচিত কহিল, "আমি যাহা বলিলাম, উজীরকে বলিও। এবার আমার নিকট অপরাধী হইলে উভয়ের কাহারও মার্জ্জনা নাই, স্মরণ রাখিও।"

রাজা রতনচাঁদ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অপরিচিত অঙ্গুলী হইতে অঙ্গুরীয় মোচন করিয়া রাজা রতনচাঁদের হস্তে দিয়া হাস্যমুখে কহিল, "উজীরকে অঙ্গুরী ফিরাইয়া দিও। আপাততঃ আমার প্রয়োজন নাই।" অপরিচিত চলিয়া গেল। সন্ধ্যার পর ভৃত্যের বেশধারী দুই ব্যক্তি আসিয়া রাজা রতনচাঁদের চক্ষু আবৃত করিয়া তাঁহাকে বাহিরে লইয়া গেল। পূর্ব্বের ন্যায় সোপানশ্রেণী অবতরণ করিলেন, দ্বার উদ্‌ঘাটিত ও রুদ্ধ হইল। পথে কিছু দূর গিয়া, তাহারা রাজার চক্ষু মোচন করিয়া দিয়া, আর এক দিকে বেগে চলিয়া গেল। রাজা দেখিলেন, পূর্ব্বদিবস যে স্থানে ধৃত হইয়াছিলেন, সেই-

স্থানে আসিয়াছেন। মুক্তি পাইয়া রাজা উৰ্দ্ধশ্বাসে গৃহে পলায়ন করিলেন। পদব্রজে ধাবমান হইতেছেন বলিয়া সে সময় তাঁহার মনে তিলার্দ্ধ লজ্জা হইল না।

রাজা রতনচাঁদ গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, উজীর তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রাজা রতনচাঁদ সশস্ত্র অনুচরগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া উজীরের প্রাসাদে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের যে কথোপকথন হইল, তাহা সবিস্তারে বর্ণনীয় নহে। দুই জনে যে কথোপকথন হইল, তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত ও শঙ্কিত হইলেন। অজানিত বিপদের আশঙ্কায়, উভয়ের চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে উঠিয়া রাজা রতনচাঁদ কুতুব উল মুলকের দরবারে গমন করিতেছেন, এমন সময় রোশিনারার স্বামী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, অভিবাদন করিয়া কহিল, "রাজা সাহেব, আমার বিষয় কি করিলেন?"

রাজা কিছু লজ্জিত হইয়া, প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া, কহিলেন, "এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান পাই নাই। আমার লোক জন চারি দিকে অন্বেষণ করিতেছে।"

পারসীক কহিল, "এখানে একজন সাধু আসিয়াছেন। তিনি আমার সহায়তা করিবেন বলিয়াছেন।"

রাজা মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে তিনি?"

"তাহা জানি না। এখানে তাঁহাকে কেহ চেনে না। কোথা হইতে আসিয়াছেন, জানি না। তিনি একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

রাজা রতনচাঁদ ভ্রূভঙ্গ করিলেন। "তাঁহাকে আমার বাড়ী দেখাইয়া দিবার কেহ নাই?"

পারসীক কুণ্ঠিত ভাবে কহিল, "তিনি কাহারও গৃহে গমন করেন না।"

এ কথা শ্রবণ করিয়া রাজা রতনচাঁদ বিস্মিত হইলেন না। সেকালে বাদশাহেরা পর্য্যন্ত সাধু ফকীরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এমন শুনা গিয়াছে যে, বাদশাহকে দেখিয়া সাধুগণ আসন ত্যাগ করিতেন না। জাহাঙ্গীরকে এইরূপ একজন ফকীর কহিয়াছিলেন যে, তিনি বাদশাহের

বাদশাহকে ভজনা করেন, দিল্লীর বাদশাহকে গণনার মধ্যে আনেন না। জাহাঙ্গীর একথা শুনিয়া অপমানিত বোধ করেন নাই। রাজা রতনচাঁদ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তিনি না আসেন, আমি তাঁহার দর্শনে যাইব।"

বহুসংখ্যক অনুচরে পরিবৃত হইয়া, রাজা রতনচাঁদ সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। নদীর তীরে নগরের বাহিরে একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে সাধু বাস করিতেন। কুটীরে রাজা রতনচাঁদ ও পারসীক প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যগণ বাহিরে রহিল।

রাজা রতনচাঁদ যুক্ত করে সাধুকে প্রণাম করিলেন। সাধু হস্ত দ্বারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—আসন ত্যাগ করিলেন না।

সাধুর তেজঃপুঞ্জ দীর্ঘ শরীর, ভস্ম জটা ললাটিকার আড়ম্বর নাই। পরিচ্ছন্ন গৈরিক বসন, শ্মশ্রুবহুল প্রশান্ত মুখমণ্ডল, প্রশস্ত ললাটের তলে অন্তর্ভেদী চক্ষু। বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চাশ বৎসর হইবে, কিন্তু শরীরে জরার কোন লক্ষণ নাই। রাজা রতনচাঁদ দেখিলেন, এ ব্যক্তি আর যাহাই হউক, ভণ্ড ভিক্ষুক নহে।

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তুমি রাজা রতনচাঁদ?"

রাজা অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া কহিলেন, "আমি স্বামীজির দাস।"

সন্ন্যাসী পারসীককে সঙ্কেত করিয়া কহিলেন, "এ ব্যক্তির কিরূপ বিপদ শুনিয়াছ? তোমরা নগরের শাসনকর্ত্তা, কোন প্রতিকার করিতে পার না?"

রাজা কহিলেন, "ইহার যেরূপ বিপদ, আমাদিগেরও সেইরূপ বিপদ। মানুষের সাধ্য হইলে পারা যায়, কিন্তু অমানুষী শক্তিকে কে পারিবে?"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "অমানুষী শক্তি আছে, বিশ্বাস কর?"

রাজা বলিলেন, "স্বচক্ষে দেখিয়া কেমন করিয়া অবিশ্বাস করিব?"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "তোমার যেমন আশঙ্কা, উজীরের সেইরূপ আশঙ্কা।"

রাজা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। সন্ন্যাসী কহিলেন, "তোমাকে একটি কথা বলিবার আছে। এ ব্যক্তি স্ত্রীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইলে উজীর আপনার অসদভিপ্রায় যেন পরিত্যাগ করেন, নহিলে তাঁহার বিপদ ঘটিবে। উজীর এ কথার কি উত্তর দেন, আমি জানিতে চাহি।"

রাজা রতনচাঁদ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি উজীরের অভিপ্রায় কেমন করিয়া অবগত হইলেন?"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "সে কথা জিজ্ঞাসা করায় ফল নাই। আমি যাহা বলিলাম, উজীরকে বলিয়া আইস।"

রাজা রতনচাঁদ উজীরের নিকট গমন করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া উজীর তাঁহার সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসীর কুটীরে আগমন করিলেন। প্রথম সম্ভাষণের পর উজীর কহিলেন, "আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। এই ব্যক্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমাদিগের এই প্রার্থনা।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "যে বলে সে ব্যক্তি এই সকল দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই বল ক্ষয় হইয়াছে। তোমরা আমার সঙ্গে আইস।"

কুটীরের বাহিরে আসিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "সঙ্গে লোক জনের আবশ্যক নাই। তোমরা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ছদ্মবেশে আমার সঙ্গে আইস।"

সন্ন্যাসীকে দেখিয়া উজীরের ও রাজা রতনচাঁদের এমন বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তাঁহারা অসঙ্কোচে সন্ন্যাসীর আদেশ পালন করিলেন। পারসীক তাঁহাদের সঙ্গে চলিল।

সন্ন্যাসী পথ দেখাইয়া গমন করিতে লাগিলেন, উজীর ও রতনচাঁদ তাঁহার পশ্চাতে চলিলেন। অনেক দূর গমন করিয়া একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে একটি দ্বিতল গৃহের সম্মুখে সন্ন্যাসী দাঁড়াইলেন। ডাকিলেন, "নসীর খাঁ!"

দ্বার খুলিয়া, উজীরের এবং রতনচাঁদের পূর্ব্বদৃষ্ট অপরিচিত পুরুষ বাহিরে আসিল। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া, মস্তক অবনত করিয়া, যুক্ত করে দণ্ডায়মান হইল।

সন্ন্যাসী পারসীকের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, "নসীর খাঁ, তুমি এই ব্যক্তির স্ত্রী হরণ করিয়াছ?"

নসীর খাঁ কোন কথা কহিল না, মৌন হইয়া রহিল।

সন্ন্যাসী গৃহে প্রবেশ করিলেন, সকলে তাঁহার পশ্চাৎ প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসী পারসীককে কহিলেন, "তোমার স্ত্রী এই গৃহে আছে, তাহাকে আনয়ন কর।"

পারসীক কহিল, "সে পতিত হইয়াছে। আমি তাহাকে আর গ্রহণ করিতে পারি না।"

সন্ন্যাসী কহিলেন, "যদি পতিত হইয়া থাকে ত নিজের দোষে। নসীর খাঁ যতই দুর্ব্বৃত্ত হউক, তাহার এমন সাধ্য নাই যে, স্ত্রীলোকের প্রতি বল-

প্রকাশ করে। তাহা হইলে যে বলে সে বলীয়ান, সেই বলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।"

অবগুণ্ঠনবতী রোশিনারাকে পারসীক লইয়া আসিল। সন্ন্যাসী নসীর খাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই রমণীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছ?"

নসীর খাঁ কহিল, "আমি ইহার অঙ্গ স্পর্শ করি নাই।"

রোশিনারা মস্তকের ইঙ্গিত দ্বারা এই কথার অনুমোদন করিল।

সন্ন্যাসী পারসীককে কহিলেন, "তোমার স্ত্রী বিশুদ্ধস্বভাব, ইঁহাকে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। আমার আজ্ঞা মত তুমি দ্বিধাশূন্য অন্তঃকরণে ইঁহাকে গ্রহণ কর।"

নসীর খাঁকে কহিলেন, "নসীর খাঁ, তোমার ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, আমার সঙ্গে আইস।"

উজীর এবং রাজা রতনচাঁদকে কহিলেন, "তোমরা নির্ভয়ে গৃহে ফিরিয়া যাও, ইহাকে আর দেখিতে পাইবে না।"

সন্ন্যাসী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নসীর খাঁ অধোবদনে তাঁহার অনুগামী হইল।

সমাপ্ত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

তর্কবৈচিত্র্য।

বহির্জগতে বৈচিত্র্য যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ, অন্তর্জগতেও বৈচিত্র্য সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ। মনুষ্যমাত্রেরই অবয়ব যদি অভিন্ন ও একরূপ হইত, তাহা হইলে সমাজ অচল হইয়া উঠিত। মনুষ্যমাত্রেই একমতাবলম্বী হইলে, জীবন অসহ্য ও নীরস হইয়া পড়িত। অতএব, কোন বিষয়ে দুই জনের দুই মত হইলে, বিস্ময়ের অথবা বিরক্তির কোন কারণ নাই। সকল বিষয়ে দুই জন একমত হওয়াই আশ্চর্য্য। এক বিষয়ে দুই জন ভিন্নমতাবলম্বী বিচার করিতে আরম্ভ করিলে, তর্ক উপস্থিত হয়। অন্য তত্ত্বের ইতিহাস যেরূপ কাল ও পাত্রানুযায়ী, এই তর্কতত্ত্বের ইতিহাসও সেইরূপ কাল ও পাত্রসাপেক্ষ।

অষ্টাবক্র বন্দীতে যখন বিচার উপস্থিত হয়, তখন এইরূপ স্থির হয় যে,

যে পরাজিত হইবে, তাহাকে বন্ধন করিয়া জলে নিমজ্জিত করিবে। এরূপ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ রাখিয়াও অনেকে বিচার করিত। তাহার পর, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা দেশে দেশে অন্য পণ্ডিতদিগের সহিত তর্ক করিয়া বেড়াইতেন। তর্কে যে হারিত, সে জেতার শিষ্যত্ব স্বীকার করিত। অন্য রকম প্রতিজ্ঞা করিয়াও বিচার হইত। বিদ্যার প্রতিজ্ঞা :—

প্রতিজ্ঞা করিল সেই, বিচারে জিনিবে যেই,
পতি হবে সেই সে তাহার।

আমাদের দেশে পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক বড় ভয়ানক ব্যাপার। গালি গালাজ ত কথায় কথায় হইত, মারামারি না হইয়া তর্ক প্রায় ক্ষান্ত হইত না। মুখামুখী তর্কে মারামারি না হউক্, মুখ ছুটিবার ভয় সর্ব্বদাই থাকে। কবির লড়াইও এক প্রকার বিচার।

এখন তর্কের প্রণালী আর একরূপ। লিখিয়া তর্ক চলে। ইহাতে অনেক ভদ্রস্থ থাকে। রাগের মাথায় দুর্ব্বাক্য বলিবার প্রলোভন সম্বরণ করা যায়, বাক্য সংযম করিবার অবকাশ পাওয়া যায়, রসিকতা প্রকাশের অবসর হয়। লিখিয়া যে গালাগালি চলে না এমন নহে, কিন্তু গালাগালি না দিয়াও যে তর্ক হইতে পারে, এমন সম্ভাবনা হয়। তবে মধ্যস্থ না মানিয়া তর্ক করার দোষ এই যে তর্ক ফুরায় না, কিন্তু চিত্ত ও বাক্যসংযম বড় শীঘ্র ফুরাইয়া যায়।

উপক্রমণিকা স্বরূপ এই কয়টা কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বঙ্গের দুই জন খ্যাতনামা লেখক কিছু দিন হইতে বিস্তর তর্ক করিয়া আসিতেছেন। সেই বিস্তারিত বাদপ্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক বোধ হইতেছে। বাবু চন্দ্রনাথ বসু এবং বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে বিশেষ পরিচিত। উভয়ে মহৎ স্বভাব, উভয়ে স্বদেশানুরাগী। ইঁহাদের মধ্যে কোন বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে অতিশয় শান্ত ও সংযতভাবে তর্ক হইবার কথা, অন্যথা হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, বাবু চন্দ্রনাথ বসু কোন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার বিরুদ্ধে আর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। চন্দ্রনাথ বাবু তাহার প্রত্যুত্তর দেন। সেই অবধি চন্দ্রনাথ বাবু যে কোন বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ বাবু সেই মত খণ্ডন করিয়াছেন। প্রতিবারেই তর্কের সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথ বাবু

করিয়াছেন। এই কথাটা একটু খুলিয়া বলিতে হইতেছে। একটা কোন কথা লইয়া যদি মতচ্ছেদ হয়, তাহা হইলে তর্কেরও গৌরব থাকে, শ্রোতা ও পাঠকগণও বিরক্ত হয় না। কিন্তু প্রতি কথায়, প্রতি মতে, তর্ক কিঞ্চিৎ বিরক্তিকর হইয়া উঠে। লয়তত্ত্ব লইয়া যখন তর্ক উপস্থিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ বাবু গত ভাদ্র মাসের "সাহিত্যে" লিখিয়াছিলেন, 'চন্দ্রনাথ বাবু উত্তরোত্তর আমাদের প্রতি রাগ করিতেছেন, ইহাতেই আমরা কিছু চিন্তিত হইয়াছি।' জিতক্রোধ পুরুষ হইলে রাগ করা সকল অবস্থায় অন্যায়, কিন্তু সহজ মানুষের শরীরে একটু আধটু রাগ থাকিবার কথা। রবীন্দ্রনাথ বাবু যদি চন্দ্রনাথ বাবুর অবস্থায় পতিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি রাগ করিতেন কি না,সেই কথা জিজ্ঞাস্য। অবস্থাটা বাহির হইতে দেখিতে এইরূপ;—চন্দ্রনাথ বাবু যদি পূর্ব্বমুখ হইয়া দাঁড়াইলেন, অমনি রবীন্দ্রনাথ বাবু পশ্চিমমুখ হইলেন; চন্দ্রনাথ বাবু হস্তে লেখনী ধারণ করিলেই, রবীন্দ্রনাথ বাবু একেবারে খড়্গহস্ত; চন্দ্রনাথ বাবু যদি লয়তত্ত্ব লেখেন, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ বাবু সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন; যদি চন্দ্রনাথ বাবু ঋষিদিগের সুখ্যাতি করেন, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথ বাবু সাহেবদিগের গুণগান করেন। মানিলাম, চন্দ্রনাথ বাবুর মতই অপ্রামাণ্য, সকল সিদ্ধান্তই অসিদ্ধ, এবং সকল কথাই অগ্রাহ্য। কিন্তু এই কথা একবার বলিয়াই ত রবীন্দ্রনাথ বাবু খালাস পাইতে পারেন। এক কথা বারম্বার বলিবার প্রয়োজন কি? যদি এমন সম্ভাবনা থাকিত যে, চন্দ্রনাথ বাবু নিজের ভ্রান্ত মত সমূহ ত্যাগ করিয়া অবশেষে রবীন্দ্রনাথ বাবুর মত গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলেও এই অনন্ত তর্ক কতক বুঝা যাইত, কিন্তু সে সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। রবীন্দ্রনাথ বাবুও অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ করি, তাঁহার প্রকাশিত মতের সংখ্যা চন্দ্রনাথ বাবুর মতের অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে। এ কথাও মানিলাম যে, রবীন্দ্রনাথ বাবুর মত অভ্রান্ত ও অকাট্য। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি সে কথা বুঝিয়া, অথবা বুঝিতে না পারিয়া, কোমর বাঁধিয়া রবীন্দ্রনাথ বাবুর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তিনি যখন যে কথা বলেন, সেই কথা কাটিয়া ফেলে; তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহারই বিরুদ্ধে আর একটা প্রবন্ধ লেখে; তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহারই বিপক্ষে আর একটা বক্তৃতা করে; তাহা হইলে যদি সে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ বাবুর বিশেষ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্ভ্রমের পাত্র না হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কথা উঠিবে না। অতএব, চন্দ্রনাথ বাবু রাগ

করিলে কতক মার্জ্জনীয় বোধ হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাবুর রাগের কোনই কারণ নাই ; কেন না, তিনিই প্রত্যেক বারে গায় পড়িয়া তর্ক তুলিয়াছেন। প্রত্যেক বারে বলিতেছি, কারণ দুই এক বিষয়ে মতভেদ হওয়া ও ভিন্ন মত প্রকাশিত হওয়ায় কোন আপত্তি নাই। লয়তত্ত্বের বিচারকালে রবীন্দ্রনাথ বাবু বলিয়াছিলেন (সাহিত্য, ভাদ্র) 'বিষয়টা গুরুতর, অতএব এ সম্বন্ধে বাদপ্রতিবাদ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে।' কিন্তু আহার তত্ত্বটাও কি সেইরূপ গুরুতর ?

তর্কের মীমাংসা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তর্কের প্রণালী আলোচনা করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। যখন মতের বিরোধ লইয়াই কথা, তখন ব্যক্তিগত কোন কথাই উঠিতে পারে না, পরস্পরকে বিদ্রূপ করা বা কঠিন কথা বলা দূরে থাকুক। আষাঢ় মাসের সাধনায় রবীন্দ্রনাথ বাবু লিখিয়াছেন :— "প্রবন্ধের উপসংহারে (চন্দ্রনাথ বাবুর লয় বিষয়ক প্রবন্ধ—সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ) চন্দ্রনাথ বাবু রাগের মাথায়, আমাদিগকে অথবা কাহাকে ঠিক জানি না, স্বজাতিদ্রোহী বলিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনার মধ্যেও লোকে পরস্পরকে এমন সকল কঠিন কথা বলিয়া থাকে !" চন্দ্রনাথ বাবু যদি এমন কথা বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্যায় করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কঠিন কথার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বাবু কেমন কোমল কথা বলিলেন, দেখা যাউক। এ পর্য্যন্ত বাদপ্রতিবাদ গদ্যে চলিতেছিল। শ্রাবণ মাসের সাধনায় "হিংটিং ছট্" নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সেই কবিতা বাবু রবীন্দ্রনাথের রচনা। কবিতার একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা কোঁচা শতবার খসে' খসে' পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্ব্ব দেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।"

এই ব্যঙ্গপূর্ণ রচনার লক্ষ্য কে? পাছে কোন সন্দেহ থাকে, এই জন্য কবিতার শেষ আরও স্পষ্টরূপে লিখিত হইয়াছে :—

"বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি' বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই, আর, নাই যাহা আছে,
এ কথা জাজ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।"

রবীন্দ্রনাথ বাবু কি মনে করিয়া এই কবিতা লিখিয়াছিলেন, জানি না। চন্দ্রনাথ বাবু কি বুঝিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু অনেকেই বুঝিয়াছে যে, এই বিদ্রূপ ও ঘৃণাপূর্ণ কবিতার লক্ষ্য চন্দ্রনাথ বাবু। এ কথা যদি রবীন্দ্রনাথ বাবু অস্বীকার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার রুচির প্রশংসা করা যায় না। এরূপ লেখা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনার মধ্যে কেহ কাহাকে এরূপ বিদ্রূপ ও হতশ্রদ্ধা করিয়া থাকে! কবির লড়াই আর কতদুর বাকি রহিল!

সংযম ও সম্ভ্রমের শাসন একবার ভঙ্গ হইলে তাচ্ছীল্য ভাব সহজেই আসিয়া পড়ে। চন্দ্রনাথ বাবু কড়াক্রান্তি-শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বাবু লিখিয়াছেন :—"অন্ধ আত্মাভিমান বৃদ্ধি করিবার জন্য চোখ বুজিয়া পাণ্ডিত্য করা অলস সময় যাপনের একটা উপায় বটে।" স্বজাতিদ্রোহী কথাটা কঠিন হইল, আর এ কথাটা কঠিন হইল না! যদি সুশিক্ষিত উদারস্বভাব সুলেখকগণ মতভেদ প্রকাশ কালে বিদ্রূপ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে না পারিবেন, তাহা হইলে আর কে করিবে?

বঙ্কিমচন্দ্র।

কপালকুণ্ডলা।

প্রদোষে সিন্ধুর কূলে দাঁড়ায়ে পথিক,
কে এলো বিজন পথে, বুঝি দিগঙ্গনা
এলেন স্বরগ হতে দেখাইতে দিক,
কাতরে এমন আর কাহার করুণা?
কিম্বা বনদেবী বুঝি হেথা নিরজনে,
প্রকৃতির বিকশিত শ্যামল অঞ্চলে
মগন ছিলেন নিজ সৌন্দর্য্য-স্বপনে,
সহসা ভাঙ্গিল ঘোর সকাতর বোলে।
কি মধুর শোভে আলুলায়িতকুন্তলা,
চাঁদ যেন মেঘে ঢাকা তেমনি মুখানি;
জ্যোতির্ম্ময় আঁখে যেন ঝলকে চপলা,
চঞ্চল সমীর খেলে সে অঞ্চল টানি;
"পথিক ভুলেছো পথ!"—প্রদোষ আঁধার—
উরিলেন বনদেবী করুণা অপার!

শ্যামাসুন্দরী।

এখনো কুমারী ভাব সরল হৃদয়ে,
যেন গো মধুর প্রাতে বিহগ কাকলি
এই সবে ঘুম হ'তে উঠেছে ফুটিয়ে,
আধ-ফোটা স্বর তার বুঝাবে কি বলি!
অথবা বসন্তে তুমি ফুটন্ত মল্লিকা
শুধুই সুবাস দিবে নিমেষের তরে,
সমীর পরশ তুমি সবে না বালিকা
লাজে সঙ্কুচিত সদা পড়িবে যে ঝরে।
তাই বুঝি বঙ্গগৃহে বিধবার প্রায়,
সধবা কুলীন বধূ রয়েছ সরলা,
ও হৃদয় কেহ ত গো জানিল না হায়
শুধু ও শ্যামাঙ্গী মূর্ত্তি বালিকা চপলা।
কি গোপন উৎস জাগে পরাণের ছায়,
কেহ ত বারেক এসে দেখিল না হায়!

মতি বিবি।

বসন্ত কাননে সুখে খেলে প্রজাপতি
এ ফুলে ও ফুলে মধু মিটিছে পিয়াস,
কি মধুর জ্যোৎস্না তায় কি মধুর রাতি,
পুলকিত প্রাণ মন মেটে না তিয়াষ।
আলসে গুঞ্জন করি কহিছে লালসা
আরো ফুল ফুটে আছে নব অনুরাগে,
অমনি জাগিয়া প্রাণে উঠে শত আশা,
নব যৌবনের রাতি নব নব যাগে।
বর্ত্তমান সুখে হায় ভুলেছ সকল,
জান না এ ধরা মাঝে সবি হয় শেষ,
বাকি রবে আঁখি-কোণে ম্লান অশ্রুজল
হৃদয় দহন মাত্র হবে অবশেষ।
চিরকাল সুধা পানে উঠিবে গরল,
জানিবে জীবন কি গো বুঝিবে সকল।

ভ্রমর।

সুশ্যামাঙ্গী মূর্ত্তি খানি এই ধরাতলে,
অপরাজিতাটি ফুটি নিজ নীলিমায়।
সমীর পাগল ওই সৌরভেতে ভুলে
ওরি মাঝে চিরদিন ঘুমাইতে চায়।
আপনি ফুটিয়া নিজ মহিমা-শিখরে,
দূর হতে প্রেমময়ি! বিলাইছ প্রেম;
দু'দিন চেনে নি বলে চিরদিন তরে
ভস্মাবৃত রবে কি গো এ উজল হেম?
এ ত নয় ক্ষুদ্রকায়া পঙ্কিলা তটিনী,
এ যে গো সিন্ধুর বারি ফেনোর্ম্মিবিশাল।
তোলপাড় হৃদয়েতে কি করে না জানি,
ভাঙ্গিয়া নে যাবে সাথে বুঝি চিরকাল।
দু'দিন হয়েছে ম্লান পঙ্কিল ধরায়,
সে কলঙ্ক যাবে তব পবিত্র ছায়ায়।

রোহিণী।

তুমি কি হইবে দোষী? তা ত কভু নয়।
প্রজাপতি-রূপ-ধন্ধে মোহান্ধ নয়ন।
সাধ তারে কাছে সদা বুকে টেনে লয়,
তারি মাঝে নেহারিবে স্বরগ-স্বপন।
ও ক্ষুদ্র হৃদয়ে ছিল যতটুকু বল
একেবারে সঞ্চিয়াত ডুবিলে অতলে
নব দীপ্তি লয়ে তব নয়ন রঞ্জিল,
তবু ত আঁখির আগে রূপশিখানলে।
জাগাইল যৌবনের প্রথম বাসনা,
রক্ত কুসুমিত সেই ফুল্ল বিম্বাধর।
সেই নিরজনে তাই হারালে আপনা
মগন হইলে প্রেম-সমাধির পর।
প্রথম যৌবনে সেই অনুরাগ নব,
কি করিবে, এ ত দোষ নয় কভু তব।

মৃণালিনী।

এমন পবিত্র প্রেম কোথা আছে আর?
কি চোকে দেখেছ তুমি বুঝিতে পারি না।
কত দিন সয়েছিলে কত দুঃখভার,
আশাপথ চেয়ে শেষে মিটিল বাসনা।
শিশিরেতে সিক্ত সেই অশোকের প্রায়
আপনার নম্রতায় আপনি বিলীনা।
তবু ত ফণিনী সম হৃদয়ের ছায়
সুপ্ত গর্ব্ব লুক্কায়িত, কেহ ত জানে না।
একটি বিশ্বাসে শুধু হৃদয় বাঁধিয়া
এক দৃষ্টে চেয়ে আছ ধ্রুবতারা পানে;
অবিশ্বাস-রেখা এক হৃদয়ে আসিয়া
কখনো ব্যথিত তব করেনিক প্রাণে।
সুকঠিন শিলাতলে উজল নয়নে,
তখনো বিশ্বাস বাঁধা মধু আলিঙ্গনে।

মনোরমা।

সুকুমার ভাবময়ী তুমি সুকুমারী,
হৃদয় প্রাচ্ছন্ন তব কি পবিত্র ভাসে।
কখনো বালিকা, কভু সুগম্ভীরা নারী,
কখনো পাষাণী, কভু ভরা অনুরাগে।
ও হৃদয় এক দিন কেহ বুঝিল না—
রহস্যময়ী যে তুমি রহস্য আগার।
প্রকৃতির বিকশিত হৃদয়-বাসনা
কে বুঝিবে বল শুধু চেয়ে দেখি তার?
তবু ত জাহ্নবীপারা প্রণয়ের স্রোতে
উন্মত্ত মাতঙ্গ ভাসে শুনেছ পুরাণে,
তাহারি তুলনা আজি মিলে তোমা সাথে,
তাই প্রেম ধায় তব পশুপতি পানে।
কেহ ত জানে না তোমা নিমেষের তরে
বালিকা অথবা নারী এই ধরা পরে।

গিরিজায়া।

শুধু তুমি এ ধরায় সুখের বিভব,
হাসিয়া এসেছো সুখে হেসে যাবে চলে।
ঢেলে দাও সবারে গো ও হৃদয় তব,
মুছাও দুঃখীর ম্লান নয়নের জলে।
গভীর দুঃখের চিত্র, তারি মাঝখানে
পুলকিত হিয়া লয়ে দাঁড়াইলে এসে।
কুসুম ফুটিয়া উঠে নিদাঘ কাননে,
বসন্ত খেলায় এসে বরষার শেষে।
অমনি জাগিয়া উঠে মধুর কাকলি
হৃদয়ের এক এক শ্যাম শাখা হতে।
নিশ্চল তটিনী রুদ্ধ, খেলায় উছলি
ভাসায়ে নে যায় মন হরষের স্রোতে।
স্নেহময়ি! এ ধরায় এসেছ হাসিয়া,
এমনি হরষে ভোর যেও গো চলিয়া।

শৈবলিনী।

ক্ষুদ্র এক শৈল পার্শ্বে দুটি নির্ঝরিণী,
বহিয়া আসিতেছিল মিলায়ে মিশায়।
এক কলতান যেন দুটি কলধ্বনি,
চলিয়া যাইবে দোঁহে মিশিয়া দোঁহায়।

সহসা উপলখণ্ডে পাইয়া সে বাধা
চলে গেল নিঝ'রিণী সাগরের পানে।
অন্ধকার জীবনেতে আলো সেই আধা
চিত্রিত রহিল তবু কেন গো কে জানে?
সহস্র ঝটিকা বহে গিয়াছে ত তবু
সেই সুখ সে প্রণয় তেমনি চিত্রিত।
পাষাণের রেখা হায় যায় কিগো কভু?
চিরজীবনের তরে হয় সে অঙ্কিত।
তবু সে মহান সেই সাগর মুরতি
অন্ধকার গেহে জ্বলে রবিকর ভাতি!

দলনী বিবি।

রজত জোছনাময়ী পূর্ণিমার শশী,
চারিদিক ঘিরে থাকে তারকা মালায়;
একটি তাহার মাঝে পড়েছে কি খসি
আঁধার বিজন এই তটিনীবেলায়?
অতি ক্ষুদ্র আপনারে মনে শুধু জানে,
জানে না ত কি মহত্ত্ব হৃদয়-ছায়ায়।
না হলে টলিল কি গো রাজা সিংহাসনে
ক্ষুদ্র বালিকার সেই প্রেমের মায়ায়।
এত যে মহৎ তবু এই ছিল শেষ
নীচ সৈনিকের ধিক্ উপহাসবাণী!
বিষপাত্র মাত্র তার হল অবশেষ,
নিভিল পরের গৃহে জীবনবাহিনী।
তবু সে জানিল তারে হৃদয়-দেবতা,
উদ্দেশ্য চরণ তলে জানাইল ব্যথা।

কুন্দ।

প্রথমে দেখিনু তোমা মৃত্যু শয্যা পাশে
একেলা দীপের মত দীপহীন ঘরে।
তার পরে বাপী-তীরে বসিয়া নিরাশে
আপনাকে হেরেছিলে ভবিষ্য আঁধারে।
শেষ, সেই ভূমিতলে রয়েছ শয়ান,
বিষে ভরা সেই তব পাণ্ড মুখ খানি।
সহসা সলিলে পূর্ণ হইল নয়ান,
খুলিলে গো হৃদয়ের সে রুদ্ধ কাহিনী।
দেখালে খুলিয়া হৃদি নিখিল সম্মুখে
হৃদয়ের প্রেম আর প্রতাপ তাহার।
মাথাটি রাখিয়া কোলে কি গভীর ঘুমে
ঘুমায়ে পড়িয়াছিলে মরণ মাঝার।
আধ-ফোটা কুন্দ ফুল না ফুটিতে হায়
নিঠুর সমীর স্পর্শে ওই ঝরে যায়!

সূর্য্যমুখী।

আপনি মহিমাময়ী তুমি গরীয়সী,
তোমার প্রতাপে মুগ্ধ নিখিল ভুবন!
ছেয়েছিল ও হৃদয়ে তবু ঈর্ষ্যারাশি
সে তীব্র জ্বালায় কুন্দে করিলে দাহন।
যারে ভালবাসি শুধু সেই যে আমার—
এ বিশ্বাস-বজ্রে বেঁধে রেখেছিলে প্রাণ।
শেষকালে পেয়েছিলে প্রতিদিন তার,
চরণের তলে পড়ি তবু অপমান।
এ কি গো হইতে পারে গৃহলক্ষ্মী হীনা,
কি করিবে হইবে বল; যাহার বিহনে
তৃষাতুর কেঁদে মরে আকুল বাসনা;
এক পল না হেরিলে প্রাণ নাহি মানে।
তাই কি ছলনা করি গেছিলে চলিয়া
বাঁধিতে প্রণয়-ডোর নূতন করিয়া?

কমল।

সদাই রহস্যময়ী প্রেমে ভরা মন,
ছল অভিমান করি কাঁদাতে বাসনা।
প্রতি পলে সাধ প্রেম দেখিতে কেমন,
নয়নে নয়নে রেখে মিটাতে কামনা।
আপাঙ্গে চাহিলে সেই আঁখির লহরী
কি করিত আবেগেতে চঞ্চল হৃদয়।
সেই অবসরে সদা মন চুরি করি
প্রেম-ডালি সযতনে রাখিতে সাজায়।

শ্যামল পল্লব ছায় আপনা লুকায়
সুবাস বিলায়ে দেয় সুরভিত ফুল।
হৃদয়ের ডালা খুলি বিভলেতে হায়
প্রেম সুধাদানে সদা করিছ আকুল।
আধেক রহস্যময়ী, আধা প্রেমময়,
সমস্ত হৃদয় মন দিতেছ বিলায়।

তিলোত্তমা।

কি মধুর নম্রতায় আপনি বিলীনা,
ধূলিধূসরিত মরি দলিত কুসুম!
আছিলে প্রেমের মোহে আপনি মগনা,
সহসা বজ্রের শব্দে ভাঙ্গিল সে ঘুম।
শেষ সেই নিভু নিভু মরণ-শয্যায়
অপলক আঁখে আছ আশা-পথ চেয়ে।
পাণ্ডুর মুখানি লয়ে শুকতারা হায়!
আকাশের প্রান্তে যাবে এখনি মিলায়ে।
নিশির শিশির সিক্ত আধ-ফোটা ফুল,
সমীরে চঞ্চল হায় যায় বুঝি ঝরে।
সহসা এ কি এ দৃশ্য নয়ন আকুল
হৃদি-গেহ ঝলকিত তীব্র রবি করে।
তাই বুঝি এখনও ম্লান দু' অধরে
হাসিটি ফুটিয়া উঠে মুখে খেলা করে!

আয়েসা।

মধুর সৌন্দর্য্যভারে সুন্দর আপনি,
বিধাতার চিত্র এটি মমোমত করে;
কি কৌশল কারু করি রচিল না জানি,
কি যে চিত্র মোহকর কি সৌন্দর্য্য ঝরে।
নিজের গৌরবভারে গর্ব্বিতা ফণিনী,
মুক্ত কণ্ঠে কি দেখালে মহত্ত্ববিকাশ!
হৃদয়ের প্রেমময় রুদ্ধ কল্লোলিনী
আবেগে বহিয়া এসে দীপ্ত পরকাশ।
যতনে সঁপি দিলে গোপন হৃদয়,
প্রতিদান-আশা কিছু রহিল না আর।
মহিমার উপযুক্ত এ সাজে তোমায়
তবু সাধ অঙ্কুরীয় চুম্ব বিম্বাধরে।
এ যে ক্ষুদ্র নারী প্রায় হৃদয়টি বলি
তাই কি তটিনী বক্ষে দিয়াছিলে ফেলি?

বিমলা।

যৌবন গিয়াছে চলে হৃদয় যৌবন
পুলকিত শ্যাম পত্র দিয়াছে বিছায়।
ফুটিছে হৃদয়-শাখে কুসুম নূতন,
আকুলিত প্রাণ মন সে দখিনা বায়।
এখনো কজ্জলরেখা সে দুটি নয়নে।
অপাঙ্গে বিহ্বল দৃষ্টি যায় নি চলিয়া।
প্রতি অঙ্গ শিহরিছে নবীন যৌবনে,
হাব ভাব লীলা তব বেড়ায় খেলিয়া।
একি হায় দু'দিনেতে ফুরাল সকলি,
কোথা সে অপাঙ্গদৃষ্টে ঝরিছে গরল।
সহসা বসন্ত গেল ও কুসুম দলি,
লয়ে গেছে সাথে তার বিভব সকল।
এই কি সে লীলাময়ী বিহ্বলা সে নারী?
এ বীর্য্য লুকান ছিল সে হৃদয়ে তারি।

শান্তি।

এ তটিনী এত দিন বহে অন্তঃশীলা
নিবিড় বনের মাঝে আপন কল্লোলে;
সহসা পেয়েছে পথ ক্ষুদ্র বীচিমালা;
আলোকে নয়ন অন্ধ রবি কর খেলে।
সাগরসঙ্গমে বুঝি তাই চলে যায়,
কে রোধিবে গতি তার আপনার বলে।
শিব শক্তি ছাড়া কভু হয়েছে কি হায়
তাই ত বেঁধেছে মন মুছি অশ্রুজলে।
এত দিন ছিল শুধু কাননের ফুল
সৌন্দর্য্য ছড়াত শুধু কানন মাঝার।
প্রত্যেক মানবে আজ করিবে আকুল
দেখাইবে কত বীর্য্য ছিল হৃদে তার।

এই ত উচিত তব তুমি শক্তিময়ী
প্রেমবলে বিশ্ব মাঝে হইয়াছ জয়ী!

কল্যাণী।

দিয়াছ হৃদয় বলি নিখিল চরণে
পতি যে হৃদয় ধন দেছ উপহার।
কি কাজ রাখিয়া ছার এ ক্ষুদ্র পরাণে
তেয়াগিতে অকালেতে প্রাণ আপনার।
সহসা উঠিল জেগে নবীন ভুবনে
মূর্ত্তিমতী ভক্তি যেন জগৎ মাঝারে।
মোহিলে সবার আঁখি আপন কিরণে।
পাপী সে মোহান্ধ হয়ে ত্যজে আপনারে।
জাগে সে পবিত্র মূর্ত্তি মানস নয়নে
ক্ষুদ্র গৃহ হেরি সেই চিত্র লেখা তায়।
বিছায়ে যাদুর ক্ষুদ্র মগন ধেয়ানে
উদ্দেশ্যে দেবতা কাছে গেছে প্রাণ হায়।
ঈশ্বর পূজিতে গেলে আসে প্রাণেশ্বর,
এ দোষ কে দেবে বৃথা বল তোমা পর।

চঞ্চলা।

ক্ষুদ্র রাজকন্যা বটে, হৃদয়ের পরে,
কি তরঙ্গ খেলিতেছে সতত আবেগে,
কি গৌরব, কি মহত্ত্ব, ও হৃদয়ে ঝরে,
আপনাকে সঁপেছিলে তাই অনুরাগে।
বিচিত্র কক্ষের মাঝে বিচিত্র শয্যায়
সখী সবে মগ্ন নিজ রহস্যের মাঝে,
সহসা দেখিল তারা প্রতিমার প্রায়
দেবী কি মানবী হবে চেয়ে শুধু আছে!
সহসা জাগিল কক্ষ হাসির লহরে,
সখী সাথে কথা হল নয়নে নয়নে।
চিত্র লয়ে কি বিচিত্র মহিমা-শিখরে
দাঁড়াইয়া ভাঙ্গিলে গো সে রাঙ্গা চরণে।
পুরিল কামনা তব, হলে রাজরাণী
থামিল উন্নত সেই প্রণয়-বাহিনী।

প্রফুল্ল।

কি হৃদয়ে ছিল সাধ? এক বার হায়
পতি সে দেবতা, তারে হেরিতে নয়নে।
দয়াময় মিটালেন তব বাসনায়
হৃদয় পড়িল বাঁধা একটি চুম্বনে।
সহসা কপাল ক্রমে এ কি হল হায়
দীন ভিখারিনী উচ্চে ঐশ্বর্য্য মাঝার।
হৃদয়ের তৃষা তাহে মিটিবে কোথায়?
অনিবার হাহাকার সেই বাসনার।
তাই কি ভিখারী বেশে যেতেছ আবার
পূজিতে চরণ দুটি সোহাগ করিয়া?
এই ত উচিত কাজে সেজেছে তোমায়
কি ফল ঐশ্বর্য্য মাঝে রহিলে ডুবিয়া?
হৃদয়ের সে সৌন্দর্য্য হল প্রতিভাত,
মিশিলে আসিয়া যবে নিখিলের সাথ!

সাগর।

চঞ্চলা কৌতুকময়ী সরলা বালিকা,
সবেতে বিমুগ্ধ হয় নয়ন চতুর।
গৃহে ফুটে আছে বুঝি কমলকলিকা,
বিকাশে সৌন্দর্য্য নিজ সুবাস মধুর।
সপত্নীর ঈর্ষা গিয়ে একি কৌতূহল
সাজালে কুসুমশয্যা আপন শয্যায়!
হাসিয়া আবদ্ধ করি রাখিলে শিকল
আড়ি পেতে দেখাটুকু আঁখির কোণায়।
বালিকা বয়সে এত কিসের গরব,
প্রতিশোধ নিলে তাই চরণ সেবায়,
আবার নিভিল গর্ব্ব, সেই ত গো সব
হৃদয় বিকায়ে আছ সে চরণ-ছায়।
মধুর কৌতুকময়ী বালিকা চপলা,
সরল মধুর হৃদি জানেনাক ছলা।

শ্রী।

একি দৃশ্য হেরিতেছি বৃক্ষশাখা 'পরে
সহসা প্রতিমা মরি নৃমুণ্ডমালিনী।

দুলিছে অঞ্চল মুক্ত চঞ্চল সমীরে,
দেবতা আশীষে ভরা কর জয়ধ্বনি!
তার পর সন্ধ্যাবেলা সেই একাকিনী
বৈতরণী পারে চেয়ে আকুলিত মন,
কেশপাশ জটা হল, তুমি উদাসিনি!
কোথা যাও? এ সংসার বড়ই গহন।
রাজসিংহাসন কাঁদে, কোথা রাজরাণী!
এ ভিখারী বেশে তুমি যেতেছ চলিয়া।
নবীন যৌবনে মরি নব উদাসিনী
স্বীয় স্বার্থ দিলে বলি প্রেমের লাগিয়া।
যখন নয়ন জলে ধরিল চরণ,
পাষাণি! বারেক তবু গলিল না মন?

রমা।

অতি ক্ষুদ্র হৃদি তব টল টল করে
সংসারের প্রতি এই সংশয়-দোলায়।
হৃদি-বৃন্ত সদা কাঁপে মৃদুল সমীরে,
কিছু যে সবে না ভর, ঝরে যেতে চায়,—
তবু কি মমতাময়ি! হৃদয় তোমার,
স্নেহ প্রেম চারি ধারে পড়িছে উছলি।
সদাই সজল আঁখি ঝরে অশ্রুধার,
সদা ভয় এ হৃদয় যাবে বুঝি দলি।
সরলা বালিকা তাই সংসার ছলনা
ডুবাইল একেবারে জলধি পাথারে।
পুরিল না জীবনের একটি বাসনা,
অভাগী জীবন-ধন সঁপে যাও কারে?
কণ্টক-আবৃত বনে ও সুরভিরাশি
কেহ বুঝিল না হায়! দলে গেল হাসি।

জয়ন্তী।

স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, দাঁড়াইয়া স্তিমিত আলোকে
গেরুয়া বসন পরে করেতে ত্রিশূল।
কি তীব্র কোমল জ্যোতি নয়নে ঝলকে,
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী, হল বুঝি ভুল।
সহস্র লোকের মাঝে সে সভামণ্ডপ,
অধোমুখে লাজময়ী ধেয়ানে মগন।
মূঢ় তারা, জানেনাক তোমার প্রতাপ,
পাপের পঙ্কিল স্রোতে অন্ধ যে নয়ন!
তবু অন্তর্য্যামী তিনি সহায় তোমার,
দুরন্ত সরম হতে বাঁচাবার তরে
রাজরাণী সখী সাথে ঘিরে চারি ধার
সে মধু অমৃত নাম আননেতে ঝরে!
এ জগতে কোন ব্রত করি উদ্‌যাপন,
যাবে মনোগত তব গেহেতে আপন?।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

বাজীরাও ও মস্তানী।

১৭২১ খৃষ্টাব্দে পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হইলে, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র (প্রথম) বাজীরাও (১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম) পেশওয়ের পদে অভিষিক্ত হইলেন। উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি খান্‌দেশ ও মালব বিজয়ে বহির্গত হইলেন। ১৭২৪ খৃঃ অঃ খানদেশ ও তাহার এক বৎসর পরে মালব মহারাষ্ট্রীয়গণের পদানত হয়। ১৭২৬ খৃঃ অঃ প্রতিনিধি শ্রীপতিরাওএর

পরামর্শ মতে মহারাষ্ট্রপতি মহারাজ-শাহু কর্ণাটক প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করণার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন। সুবিজ্ঞ বাজীরাও এই অভিযানের বিরোধী হইলেও, মহারাজ শাহুর আদেশ পালনানুরোধে তাঁহাকে এই অভিযানে যোগ দিতে হইয়াছিল। কর্ণাটকের যুদ্ধে জয়ী হইলেও মহারাষ্ট্রীয়গণকে এই অভিযানে কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল।

বাজীরাও অতিশয় সুচতুর, কর্ম্মদক্ষ ও সাহসী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ তৎকালে কেহ ছিল না। রাজনীতিজ্ঞতায় তিনি বৃদ্ধ নিজাম উল্‌মুল্‌ককেও পরাজিত করিয়াছিলেন। বাজীরাওএর চেষ্টায় মহারাষ্ট্র রাজ্যের বিশেষ উন্নতি ও মুসলমানগণের বিশেষতঃ নিজামউল্‌মুল্‌কের দর্প সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ হইয়াছিল। বাজীরাওএর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে নিজামউল্‌মুল্‌ক শোক প্রকাশ করতঃ বলিয়াছিলেন—"অসৎগক্‌রুল্লা, সুনিয়ে সাহেব, ইস্‌মুল্‌কমে এক বাজী অওর সব পাজী! ফিলহাল মেরী ছান্নবে বরসকী উমর হ্যায়; ইস্‌কে দরমিয়ান্ বাজীরাওকে মুআকিক্, এহলেঅদল্, রেহেমদিল অওর জওয়ামর্দ্দ, এ্যায়্‌সা কোই সরদার মেরে দুশ্‌মনোঁমে নজর নহি আয়া। বাদ উস্‌কে কজাকে, অগরবেঃ তুম্‌নে মরাঠে লোগোঁকো শিকাস্ত দিয়া, তো তুমনে কুছ মর্দ্দুমী কীই এ্যায়সা নহিঁ।" অর্থাৎ, এই পৃথিবীতে একমাত্র বাজীরাও প্রকৃত মনুষ্য, তদ্‌ব্যতীত আর সকলেই পাজী। আমার এই ৯৬ বৎসর বয়সের মধ্যে বাজীরাওএর ন্যায় সৎ ও দয়ালু বিচারক এবং সাহসী বীর আমার শত্রুগণের মধ্যে এপর্য্যন্ত কেহ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বাজীরাওএর মৃত্যুর পর যদি এখন তোমরা মহারাষ্ট্রীয়গণকে বশীভূত বা ক্ষতিগ্রস্ত কর, তবে তাহাতে কিছুমাত্র বীরত্ব নাই।

যাহা হউক, বাজীরাওকে কর্ণাটকের যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত দেখিয়া, সুচতুর নিজামউল্‌মুল্‌ক, শ্রীপতিরাও প্রতিনিধিকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া, তাঁহার দ্বারা মহারাজ শাহুকে হয়দরাবাদ প্রদেশের চৌথ (চতুর্থাংশ) ও সরদেশমুখী (দশমাংশ) স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে সম্মত করাইলেন। শাহু রাজ্যের ক্ষতি-বৃদ্ধি নিজে কিছুই বুঝিতেন না। সুতরাং প্রতিনিধির পরামর্শানুসারে ইন্দাপুরের নিকটস্থ প্রদেশের কিয়দংশ ও বার্ষিক নগদ কয়েক লক্ষ টাকা পাইবার আশায় নিজামের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বাজীরাও এই সংবাদ-শ্রবণে ও শ্রীপতিরাওএর স্বার্থপরতায় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ ও ক্ষুণ্ণ হইলেন। কিন্তু উপায়াভাবে তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য নীরবে থাকিতে হইল।

অল্পদিনের মধ্যেই নিজাম স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়-গণের প্রাপ্য টাকা প্রদান করিতে অসম্মত হওয়ায়, বাজীরাও মহারাজ শাহুর অনুমতিক্রমে ১৭২৭ খৃঃ অঃ নবেম্বর মাসে নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। কোলাপুরাধিপতি সাম্ভাজীর সহিত মহারাজ শাহুর বিবাদ ছিল। সুতরাং সময় বুঝিয়া সাম্ভাজী নিজামের সহিত যোগ দিলেন। কিন্তু বাজীরাওএর অদ্ভুত রণচাতুর্য্যে নিজাম মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে বাধ্য হইলেন। বাজীরাও নিজামের সহিত সন্ধি স্থাপনে সম্মত হইলেন।

সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছে। উভয় পক্ষের শিবির গোদাবরী তীরে সংস্থাপিত রহিয়াছে। নিশীথ সময়। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ ও নীরব। শুক্ল-পক্ষের প্রদীপ্ত চন্দ্রকিরণে গোদাবরীর মৃদুবাহী চঞ্চল জলরাশি রজতের ন্যায় চক্ চক্ করিতেছে। নদীতীরস্থ বৃক্ষাদি জ্যোৎস্না-স্নাত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। পেশওয়ের শিবিরে সেজ জলিতেছে। দেওয়ানি, ফড়ণ-বীনা, শিন্ধিয়া, হোলকর প্রভৃতির পরামর্শানুসারে, নিজামের নিকট হইতে যে সন্ধিপত্র লিখিয়া লইতে হইবে, তাহার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছে। শশাঙ্কদেব সুষুপ্ত পৃথিবীর বক্ষের উপর স্বীয় শান্তোজ্বল কিরণ বিকীরণ করিয়া তাহার এক অপূর্ব্ব নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। পেশওয়ে ও নিজামের বস্ত্রগৃহগুলি চন্দ্রকিরণপ্রদীপ্ত হইয়া রজতমণ্ডিতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

পেশওয়ের শিবিরে সন্ধিপত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছে, এমন সময় মুসলমান শিবির হইতে একজন অশ্বারোহী বীরযুবক মহারাষ্ট্রীয় শিবিরের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বার-রক্ষক স্বীয় প্রভুর অনুমতিক্রমে তাঁহাকে শিবিরমধ্যে লইয়া গেল। বীরযুবক বাজীরাওএর সম্মুখে নীত হইলে, সেলাম করিয়া বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। যুবককে দেখিয়া ১৫।১৬ বর্ষ বয়স্ক উমেদার বলিয়া বোধ হইল। তাঁহার কটিদেশে তরবারী লম্বমান, পৃষ্ঠে বন্দুকের গুলিপূর্ণ তোষ্‌দান, মুখশ্রী সাতিশয় কমনীয় ও লাবণ্য-পূর্ণ, অথচ তাহাতে তেজস্বিতা ও গাম্ভীর্য্যের অভাব নাই। যুবককে দেখিয়া বাজীরাও অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে যুবক বলিলেন,—

"জনাবে আলী, বন্দা নিজাম সাহেবকে তেয়্‌ নামে হ্যায়। মৈ এক

পঠানকা ফরজন্দ হুঁ। মেরা নাম মস্তান খাঁ হ্যায়। হুজুরকা ইক্‌বাল অওর তারিফ সুন্‌কে আয়া হুঁ। অওর উম্মেদ হ্যায় কি হুজুরকে খিদমতমে রহুঁ।”

বাজীরাও তাঁহাকে উমেদার জানিয়া বলিলেন,—

“বহুত খুব। অগর তুম হম্‌সেনেকী অওর ইমান্‌সে চলোগে, তো তুমারী অচ্ছী পর্‌বরীশ হোগী।”

এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণ মাত্র মুসলমান যুবক বলিলেন,—

আগরবেঃ মেরায়েঃ লিবাস্ মর্দ্দকা হ্যায়,তো ম্যায়্ অওরৎকী জাত হুঁ; মুঝে মস্তানী কহতেঁ হ্যায়। নিজাম সাহেবনে মেরে ওয়ালিদ্‌কো কতল করকে, মুঝে অওর মেরী মাকো অপ্‌নে জনানখানেমে রথ্‌খা। ওহিঁ ম্যায়্ ছোটী সে বড়ী হো গয়ী। আপ্‌কে জবাম্মর্দ্দীকী অওর খুব সুরতীকি তারিফ সুন্‌কে, মেরা দিল্ নিহায়ৎ আপ্‌কে তরফ মায়ল হুআ। বল্‌কে কল্ হুজুরকি সওয়ারী জিয়াফৎকে ওয়াস্তে, নিজামসাহেবকে লস্করমে আঈথী; উস্ বক্‌থ মেরী নিগঃ হুজুরকে উপর বরাবর পহুঁচী, অওর ম্যোঁর্ ফের্ ফতা হুই। য়েঃ মেরা হাল হ্যায়। ম্যেয়্ উম্মেদওয়ার হুঁ কে হুজুর মেহরবান্ হোকে আপ্‌কা কৌল্‌পুরা করেঙ্গে।”

মুসলমান যুবতীর মুখে এই অনপেক্ষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বাজীরাও চমকিত হইলেন। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অধর্ম্ম বিবেচনায়, সকলের পরামর্শ ও অনুরোধক্রমে, তিনি মস্তানীকে স্বীয় অন্তঃপুরে আশ্রয় প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য, মস্তানী অতিশয় রূপবতী ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। মস্তানী ও বাজীরাওএর স্ত্রী কাশীবাই, উভয়েই পরস্পরকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। মস্তানীকে সপত্নী নামের কলঙ্কবিমোচনকারিণী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাজীরাওএর ঔরসে, মস্তানীর এক পুত্র হয়। তাঁহার নাম সমশের বাহাদুর।

প্রকৃতির পরিচয়।

৩

সাধারণের বিশ্বাস, মনুষ্য ও পশুবুদ্ধিতে প্রভেদ অনেক। পশুবুদ্ধি বয়স অনুসারে উন্নতি লাভ করে। একটি গণ্ডীর ভিতর তাহার বুদ্ধি ঘুরিয়া বেড়ায়। মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা আছে; পশুর ন্যায় প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসে সে কোন কর্ম্ম করিতে চাহে না। বুদ্ধিবলে মনুষ্য ভাবপ্রবণতা দমন করে, পশুর ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই, তাহার দূরদর্শিতাও নাই। অন্যকে স্থানবিশেষে, কালবিশেষে বিপন্ন হইতে দেখিয়া, সে স্থান বা কাল পরিহার করিতে তাহার চৈতন্য হয় না। এক জন যাহা খাইয়া প্রাণত্যাগ করে, অন্যে আগ্রহ পূর্ব্বক তাহাই খায়। বিলাতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হক্‌সলি সাহেব বলেন, অতি নিকৃষ্ট বর্ব্বরেরও কিয়ৎপরিমাণে গণনা-শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পশু জাতির শ্রেষ্ঠ জীবেরও গণনা-শক্তি নাই।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে, অন্যান্য মানসিক শক্তি সম্বন্ধে, মনুষ্য ও ইতর প্রাণীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণভেদ থাকিলেও, প্রকারভেদ আদৌ নাই। এ প্রবন্ধে দেখাইব, বিবেচনাশক্তিসম্বন্ধেও মনুষ্য ও পশু প্রকৃতি একই জাতীয়। পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, সভ্য মানবের সহিত কোনও বিষয়ে ইতর প্রাণীর তুলনা সঙ্গত নহে, এ প্রবন্ধেও পাঠকগণকে সে কথাটি স্মরণ করাইয়া দিলাম।

বয়স অনুসারে পশু বুদ্ধি উন্নতি লাভ করে নাই, এ কথাটি সত্য নহে। পশু পক্ষীর শিশু সন্তান যত অখাদ্যে প্রলুব্ধ হয়, বয়স্কেরা তত হয় না। রোমানিজ সাহেব বলেন, শিশু মধুমক্ষীর মধুচক্রের কারুকৌশল, বয়স্কের মধুচক্রের কৌশলের মত উৎকৃষ্ট নহে। মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া বাস করা মধুমক্ষীর অভ্যাস, কিন্তু কৃত্রিম মধুচক্র পাইলে, মধুমক্ষী নির্ম্মাণ-কষ্ট স্বীকার করে না, কৃত্রিম চক্রেই বাস করে। স্থান, কাল ও অবস্থান ভেদে, পক্ষীগণ ভিন্ন পদার্থে ও ভিন্নরূপে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। টেলিগ্রাফের তার দিয়া একটি বায়স বাসস্থান প্রস্তুত করিয়াছিল। এ আশ্চর্য্য কুলায় কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ায় একজাতীয় কাকাতুয়া আম মাংস ভক্ষণ করিতে শিক্ষা করিয়াছে। মনুষ্যকে শত্রু বলিয়া

ভয় করিতে পশু পক্ষীগণ ক্রমে শিক্ষা করে। ক্ষুদ্রকায় অপেক্ষা বৃহৎ-কায়েরা মনুষ্যের অধিক বাধ্য বলিয়া, তাহারা মনুষ্যকে যত ভয় করে, ক্ষুদ্র-কায়গণ তত ভয় করে না। খঞ্জন ও চাহা একজাতীয়, কিন্তু ভিন্ন শ্রেণীর পক্ষী। খঞ্জনকে কেহ মারিতে চায় না। কিন্তু চাহা মনুষ্যের বড় মুখ-রোচক। ফল এই হইয়াছে যে, চাহা বন্দুক দেখিলেই দূর হইতে পলায়ন করে। কিন্তু খঞ্জন শিকারীর হাতের নিকট নাচিয়া বেড়ায়। ঘুঘু ও হরিলের মধ্যেও এই প্রভেদ দেখা যায়। সদ্যোজাত মনুষ্য শিশুর চক্ষের কাছে আঙ্গুল নাড়িলে সে চক্ষু বুজায় না ; কারণ, ভয় কি, সে জানে না। কিন্তু বয়স্ক মনুষ্য তুলার আঁশ পড়িবার ভয়ে চক্ষু বুজায়। যে-মাঠে যে গরু সর্ব্বদা চরিয়া থাকে,আকৃতিক্রমে তাহার কোনটি একবার কোন বিষাক্ত লতা পত্র ভক্ষণ করিলে,সেই মাঠের কোন গরু আর কখন প্রতারিত হয় না। কিন্তু নূতন গরু আসিলে সেই প্রকার ভ্রমে পড়িয়া থাকে। বানরের অনুসন্ধিৎসা বড় প্রবল, তাথাপি বানর বুদ্ধিবলে অনুসন্ধানবৃত্তি দমন করিয়া রাখে, দেখা গিয়াছে। একটি কাগজের বাক্সে একটি ভীমরুল পুরিয়া বানরের নিকটে দিলে কি রঙ্গই উপস্থিত হয়! বাক্সের ভিতর কি ভোঁ ভোঁ করিতেছে, তাহা দেখিতে তাহার বড়ই সাধ হয়,অথচ সাহস হয় না,—সে কত কৌশলে, কত সাবধানে তাহাকে বধ করিয়া ভক্ষণ করে।

বস্তুতঃ, মানুষের ন্যায় ইতর প্রাণীর মনোবৃত্তিও কর্ষণসাধ্য। যাহার যে বৃত্তি কর্ষিত হইয়াছে, তাহার সে বৃত্তি ততই বিকশিত হইয়াছে। মনুষ্য কি ছিল ও কি হইয়াছে,ভাবিলে গর্ব্ব হয় ; আবার ভবিষ্যতে যাহা হইবে,তাহার কল্পনা করিলে দুঃখ হয়। কেন আমরা দলের আগে আসিয়া পড়িলাম।

অসভ্যদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বড় অল্প। একটি ঘটনা বুঝাইয়া দিলেও তাহার মত আর একটি তাহারা বুঝে না। দশটি দ্রব্য তুলনা করিয়া, তাহার একটি সাধারণ ধর্ম্ম নির্ণয় করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। দশটি কারণ মিলিয়া যদি একটি কার্য্য উৎপাদন করে, কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ব কারণটি তাহারা হিসাবে ধরিয়া থাকে। উপস্থিত কারণ ও দূরতর কার্য্য, উভয়ই তাহাদের বুদ্ধির অতীত। দুইটি কারণ একত্র করিয়া, বুদ্ধি খাটাইয়া, কোন কার্য্য করিতে হইলে, তাহারা দিশেহারা হইয়া পড়ে। স্মৃতি বা চিন্তা-শক্তি খাটাইতে হয়, এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, অসভ্যের মন টলমল করিতে থাকে। ব্রাজিলের অসভ্যেরা দুই একটি কথার উত্তর দিয়া

অধীর হইয়া পড়ে, ও নির্ব্বোধের মত কথা বলিতে থাকে। দামোরা জাতি পাঁচটির অধিক গণিতে হইলে বিষম গোলে পড়ে। একটি ভেড়ার দাম দুই আটি তামাক হইলে, দুইটি ভেড়ার পরিবর্ত্তে কয় আটি তামাক পাইবে, হিসাব করিতে পারে না। একবার দুই আটি দিয়া একটি লইয়া লুকাইয়া, আবার দুই আটি তামাক দিতে হয়।

পাছে পরস্পরকে হিংসা করে, এই ভয়ে উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা দুই খানা জাল এক সঙ্গে ফেলে না,এবং যে বঁড়শীতে একবার মাছ ধরিয়াছে, এক মুঠা বঁড়সী অপেক্ষা তাহাকে অধিক মূল্যবান মনে করে। কাপ্তেন লিয়ন সাহেবের বাজাইবার একটি বড় অর্গান ও একটি ছোট বাক্স ছিল, এস্কীমো জাতিরা ছোট বাক্সটিকে বড় অর্গানের সন্তান মনে করিত। বুস-মানেরা চাপমান্ সাহেবের বড় গাড়ীটিকে ছোট গাড়ীটির মা বলিত। কুক সাহেব টাহীরী দ্বীপের লোকদিগকে কএকটি পেরেক দিয়াছিলেন, তাহারা সেই গুলিকে মাটীতে বপন করিয়াছিল। জুলুরা যখন গরু কিনিতে যায় বা কোন স্ত্রীলোকের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিতে যায়, তখন সেই স্ত্রীলো-কের বা বিক্রেতার মন নরম করিবার জন্য, এক টুকুরা কাঠ চিবাইতে চিবাইতে গিয়া থাকে। খন্দজাতি ভূদেবীর নিকট যখন নরবলি দেয়, তখন ভয়ে, শোকে বা যন্ত্রণায় অভাগার চক্ষে জলধারা পড়িলেই মনে করে, মাঠে সেবার যথেষ্ট বৃষ্টি হইবে। সারভিয়া দেশের লোকেরা বলে, একটি কুমারীকে পত্র পুষ্পে সাজাইয়া মাথায় জল ঢালিয়া দিলে বৃষ্টি হয়। মধ্য আফ্রিকার গুনীরা সগুণ করিয়া অপরাধী ধরিয়া দেয়; তাহারা একটি মুরগী কাটিয়া দেখে, তাহার পাখায় যদি কোন দাগ থাকে, তবে সন্তান বা কুটুম্বের কেহ অপরাধী। কেহ তুক না করিলে রোগ হয় না। সাঁওতালদের বিশ্বাস, কাহারও পীড়া হইলে তাহারা রোজা ডাকিয়া স্বগুণ করে। একটি শালপাতায় তেল দিয়া রোজা ঘসিতে থাকে, অন্য এক জন আত্মীয়, স্বজন ও প্রতিবেশীদের নাম করিতে থাকে। যাহার নাম করিবার সময় তেলের বর্ণ সবুজ হয়, সে ডাইন,—রোগের কারণ। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, সকলেই ডাইন হইতে পারে, সাঁওতালের হাতে ডাইনের নিস্তার নাই। পূর্ব্বে আয়র্লণ্ডের লোকেরা ভেড়ার কণ্ঠের হাড়ে কাল দাগ দেখিলে মৃত্যু আশঙ্কা করিত।

অনেক অসভ্য জাতি আহার্য্য সঞ্চয় করিতে জানে না। এক দিন

আহার্য্য মিলিলে রাশি রাশি ভক্ষণ করিয়া ফেলে ও তাহার পর উপবাস করে। যদি এক জনের রোজগার দশ জনে ভাগ করিয়া লয়, তবে দশ জনের রোজগারে সকলেই প্রতিদিন কিছু কিছু খাইতে পারে। কিন্তু এতটুকু বুদ্ধি তাহাদের মস্তিষ্কে নাই। কোন কোন পশু যেমন বৎসরের কয়েক মাস উপবাস করিয়া গিরিগুহায় পড়িয়া থাকে, কোন কোন অসভ্যজাতিকে সেইরূপ করিতে দেখা যায়।

Rev. L. L. Wood a baptist minster residing in the Rocky mountains and his sons had observed a number of Indians of the Moqui tribe enter a large cavern in the vicinity and had not seen them come out. Wood, his sons and 20 other men from Marcus Daly's ranch determined to find out the intentions of the band. Heavily armed and well supplied with torches they entered the cave and after proceeding fully a mile they came upon those they were in search of. There were forty of them and they were all in a comatose state, in fact hibernating just like bears and other animals. They had been there in that condition ever since autumn and are still there, with the exception of a boy and a girl who were taken to the daly ranch. It seems however impossible to throughly awaken them, though several attempts have been made, and they will not eat or drink when let alone they relapse into the same comatose state.

অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহার অনেক অসভ্যজাতি জানে না। কি মৃগয়া কার্য্যে, কি যুদ্ধ করিতে, প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া আঘাত করা পাটাগোনিয়াবাসী বন্যগণের একমাত্র উপায়। বানরেরাও পাথর ছুড়িয়া যুদ্ধ করিতে জানে, এবং কোনও কোনও জাতীয় বানর লাঠি ব্যবহার করে। অসভ্যেরা যেমন গরু বা ভেড়া পোষে, পিপীলিকারাও তেমনি দুগ্ধ দিবার জন্য আকাই-ডিম নামে একজাতীয় কীট পোষে। বাসস্থাননির্ম্মাণে পশু পক্ষী অসভ্য-দিগের অপেক্ষা নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। বুসমানেরা অদ্যাপি গুহা মধ্যে বাস করিয়া থাকে। ইহারা পশুপালনও করে না, কৃষিকার্য্যও জানে না। মৃগয়াই অনেক অসভ্যের একমাত্র জীবনধারণের উপায়। অষ্ট্রেলিয়া, তাসমেনিয়া ও ফিজীবাসীগণ এবং পারাগোয়েবাসী ইণ্ডিয়ানেরা মৃগয়াজীবী।

পশু পক্ষী অগ্নির ব্যবহার জানে না, কিন্তু অনেক বর্ব্বরজাতি তাহা জানে,

তথাপি কোন কোন অসভ্য জাতিকে আমমাংস ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করিতে দেখা যায়। গ্রীকোয়া, হটেণ্টট, ও বুসমানেরাও এইরূপ করে। আবিসিনিয়াবাসী অসভ্যেরা গরু চরিবার সময় খানিকটা মাংস কাটিয়া লইয়া কাঁচা খায়। ফুয়েজী ও পাটাগোনিয়াবাসীরা মৎস্য ও পক্ষী-মাংস কাঁচা খায়। এস্কিমোরা মৎস্য ও মাংস কাঁচা খাইয়া থাকে। অসভ্যের গণনাশক্তি অতি সামান্য। সিংহলবাসী বেদ্ধা, ব্যাধ বা বেদীয়া জাতির ভাষায় সংখ্যাবাচক একটিও শব্দ নাই। ব্রাজী-লের বন্যজাতিরা অঙ্গুলীর পর্ব্বে তিন পর্য্যন্ত গণিতে পারে, তাহার অধিক হইলেই "অনেক" বলে। বাটুকুদো ও পুরী ভাষায় এক দুই বলিয়া "অনেক" বলিতে হয়, তাসমেনিয়াদের মধ্যেও এইরূপ, নবহলণ্ডে দুইএর অধিক আর সংখ্যা নাই, কামিলয়র ভাষায় ছয় অবধি গণনা করা যায়। এস্থলে এক কথা বলা আবশ্যক যে, ভাষায় শব্দ না থাকিলেও, ইষারা দ্বারা অধিক গণনা করিতে অনেক অসভ্যজাতি শিখিয়াছে।

পিপীলিকা ও মধুমক্ষী, বিবিধ পক্ষী ও বিবর যে কৌশলে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, পৃথিবীর অর্দ্ধেক মনুষ্য অদ্যাপি তাহা শিখে নাই। যদি কেহ এই কার্য্য বিচারশক্তির পরিচায়ক বলিয়া স্বীকার করিতে না চান, এজন্য আমি অন্য প্রকার উদাহরণ সংগ্রহ করিতেছি। পিপীলিকার গ্রাস হইতে মিষ্ট সামগ্রী রক্ষা করিবার জন্য গৃহিণীরা কতই প্রয়াস পান! অনেকে জলের মধ্যে খাবার রাখিয়া দিয়া দেখিয়াছেন, সাঁতার দিয়া জল পার হইয়া পিপীলিকাগণ খাদ্যদ্রব্য আক্রমণ করে। হয় ত কেহ কেহ জানেন না যে, সাঁতার দেওয়া অসাধ্য হইলে কোন কোন জাতীয় পিপীলিকা দেয়াল বহিয়া ছাদে উঠিয়া হাত পা ছাড়িয়া দিয়া পড়িয়া যায়। এমনি হিসাব করিয়া পড়ে, ঠিক খাবারের উপর পড়িয়া থাকে।

মক্ষীরাজ্যের এমনি বন্দোবস্ত যে, কোথাও সঞ্চয়ের সম্ভাবনা দেখিলে সে আনন্দসংবাদ ভারবাহী শ্রমজীবী শ্রেণীতে মাত্র প্রচারিত হয়। কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহ বা বিপদ আপদের সংবাদ হইলে, সর্ব্বাগ্রে রাজেশ্বরীর নিকট সে সংবাদ পাঠাইতে হয়। তাঁহার আদেশে সকল প্রজার নিকট অতঃপর উহা প্রচারিত হয়, ও যুদ্ধের আয়োজন হইতে থাকে। মক্ষীরাজ্যে রাহাজানী বিরল নহে; মক্ষীচক্রের কিয়দ্দূরে চারি পাঁচটি মক্ষী ডাকাইতি করিবার জন্য ওত করিয়া থাকে। কোন মক্ষীকে মধু লইয়া একাকী ফিরিতে দেখিলে,

তাহারা তাহাকে আক্রমণ করে। কেহ তাহার পা চাপিয়া ধরে; কেহ তাহাকে কামড়াইতে থাকে; যাতনায় সে হাঁ করিলেই, তাহার মুখের মধু কাড়িয়া লইয়া, দস্যুরা দ্রুতপদে পলায়ন করে।

মধুমক্ষীরা মানুষ চিনিতে পারে। যাহারা কৃত্রিমচক্রে মক্ষিকা রাখিয়া মধুর ব্যবসা করে, তাহারা বলে যে, মক্ষীগণ কখন পরিচিত মিত্রকে আক্রমণ করে না। গিরিজীয়ম সাহেব ঘরের দ্বারে নেটালদেশীয় একদল মক্ষীকে চক্র বাঁধিতে দিয়াছিলেন। কোনও কাফ্রী সে দ্বারের নিকটে আসিলে মক্ষিকারা তাহাকে আক্রমণ করিত; কিন্তু সাহেব কতবার তাহাদের বাসা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন, একবার ভিন্ন কখনও কোনও মক্ষী তাঁহাকে আক্রমণ করে নাই। যেটা একবার তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, সাহেব বলেন, সেটা একটা অবোধ বালক। ওয়াইল্ডমান সাহেব একদল মক্ষীকে এমনি শিখাইয়াছিলেন যে, আজ্ঞা দিলেই তাহারা তাঁহার মাথার উপর ঘুরিয়া বেড়াইত। আজ্ঞা দিলেই মেজের উপর স্থির হইয়া বসিত; কখন রণবেশে সজ্জিত হইত; আর "চল" বলিলেই যুদ্ধ করিবার মত ভিন্ন ভিন্ন দলে অগ্রসর হইত। সাহেবের কাছে তাহারা এতদূর ভদ্রতা শিখিয়াছিল যে, অন্য লোকে তামাসা দেখিবার জন্য উপস্থিত থাকিলে, তাহারা কাহাকেও কখন আক্রমণ করিত না।

ডাক্তার ইরাস্‌মস্ ডার্বিন লিখিয়াছেন, একদিন একটি বোলতা একটা বড় মাছি লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু মাছীটা বড় ভারী ছিল, কিন্তু বার বার চেষ্টা করিয়া পরাস্ত হইলে, বোলতা মাছীটাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া মাথার ভাগ লইয়া উড়িয়া গেল, কিন্তু মাছীর পাখায় বাতাস বাঁধাতে সে পড়িয়া গেল। অগত্যা প্রথমে একটা, তার পর আর একটা পাখা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, সে অনায়াসে বোঝা লইয়া চলিয়া গেল।

ঊর্ণনাভেরা কীট পতঙ্গ ধরিবার জন্য জাল পাতিয়া থাকে। বাতাস জোরে বহিলে জাল উড়িয়া যায়, জালের উদ্দেশ্য সফল হয় না। এজন্য তাহারা কখন কখন ছোট ছোট পাথর কুড়াইয়া জালে ঝুলাইয়া দেয়।

বিচ্ছু বা কাঁকড়াবিছা আগুনের বেড় দিয়া ঘেরিয়া দিলে যখন যাতনায় অস্থির হয়, তখন আপনার হুল আপনার মাথায় ফুটাইয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়া যাতনার অবসান করে।

একটি ভদ্র লোক, একটি বেঙ মারিয়া শুকাইবার জন্য একটি লাঠীতে

বাঁধিয়া, লাঠীটি মাটীতে পুঁতিয়া দিয়াছিলেন; বেঙের দুর্গন্ধে কতকগুলি গুবরেপোকা লাঠীর ধারে একত্র হয়। কিন্তু লাঠীতে চড়িতে না পারিয়া তাহারা লাঠীর তলা খুঁড়িতে আরম্ভ করে। মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে লাঠীটি পড়িয়া গেলে, তাহারা মৃত বেঙটি লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল।

পুরীর সমুদ্রতটে এক রকম ছোট ছোট কাঁকড়া অনেকেই দেখিয়াছেন, ইহারা অতি দ্রুত দৌড়িতে পারে; এবং দৌড়ে পরাস্ত হইলে অতি শীঘ্র বালুতে গর্ত্ত কাটিয়া অদৃশ্য হয়। এক দিন গার্ডনার সাহেব এই জাতীয় একটি কাঁকড়াকে গর্ত্ত কাটীতে দেখিতেছিলেন; কৌতুক দেখিবার জন্য সাহেব তাহার গর্ত্তমুখে চারিটি ছোট ছোট ঝিনুক ফেলিয়া দেন; ইহার একটি গড়াইয়া গর্ত্তমুখে পড়িয়া যায়। অবিলম্বে কাঁকড়াটি ঝিনুকখানি লইয়া বাহিরে আসিয়া দূরে রাখিয়া গেল। ফিরিয়া যাইবার সময় সে অন্য তিন-খানি ঝিনুক দেখিতে পায়; পাছে সেগুলিও গড়াইয়া গর্ত্তে পড়ে, এজন্য সে সেগুলিকেও দূরে প্রথমটির কাছে সরাইয়া রাখিয়া গেল। কাঁকড়ার যে ভবিষ্যৎ চিন্তা আছে, ইহা তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত।

পারিসের রাজপ্রাসাদে একটি চৌবাচ্চায় কতকগুলি মাছ পোষা ছিল। নাম ধরিয়া ডাকিলেই তাহারা নিকটে আসিত। জার্ম্মেণী ও অন্যান্য দেশে ঘণ্টা বাজাইয়া পোষা মাছদিগকে খাইবার জন্য ডাকা হয়।

নূতন জল পাইয়া ভেকগণ যখন দল বাঁধিয়া আনন্দে সঙ্গীত করিতে থাকে, তখনও তাহাদের সতর্কতার অভাব হয় না। পাড়ের উপর একটি পেচক যাইয়া বসিলে, সকলে একবারে নীরব হয়।

সিংহলের নিগম্বে নগরের একটি ধনী লোক, বাড়ীতে পাহারা দিবার জন্য, কুকুরের পরিবর্ত্তে কয়েকটি সর্প পুষিয়াছেন। তাহারা বাড়ীর কাহাকে কিছু বলে না; কিন্তু চোর আসিলে তাহার প্রাণান্ত ঘটায়।

মিসেস লি লিখিয়াছেন, তাঁহার মালী এক দিন একটি রবিন পক্ষীর ব্যবহারে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছিল। পক্ষীটি বারম্বার মালীর কাছে আসিয়া চীৎকার করিতেছিল ও একটি নির্দ্দিষ্ট দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছিল, তাহার ভাব দেখিয়া মালী বুঝিল, যেন সে তাহার সাহায্য চাহিতেছে। তাহার সঙ্গে যাইয়া মালী দেখিল, একটি টবের পাশে সে বাসা করিয়া কয়েকটি সন্তান উৎপাদন করিয়াছে, তাহার অনতিদূরে একটি সাপ ছিল; বোধ হয়, সে শাবক কয়টি খাইবার লোভে আসিয়াছিল। মালী সাপটিকে মারিয়া

ফেলিলে রবিনের চীৎকার কমে। গোরিং সাহেব লিখিয়াছেন, একটি বাটীতে কতকগুলি রাজহাঁস ছিল; তাহার কিছু দূরে পনের দিন অন্তর হাট বসিত। সেই হাটে ধান চাউলের খুব ক্রয় বিক্রয় হইত। হাটের পর দিন হাঁসগুলি সেই হাটে চরিতে আসিত, অন্য দিন আসিত না। ইহারা কি করিয়া দিনের হিসাব করিত? ভাবিও না, ধান চাউলের গন্ধে আসিত। একবার কোনও কারণে নিয়মিত দিনে হাট বসে নাই, কিন্তু সেবারও তাহারা আসিয়াছিল। নিকল সাহেব বলেন, আগরার প্রধান জেলে কতকগুলি গোলা পায়রা বাস করে, ইহারা সারাদিন মাঠে চরিয়া সন্ধ্যার সময় জেলে ফিরিয়া আসে। জেলে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে নিকটস্থ একটি পুকুরে জল খায়। সে পুকুরে বিস্তর কচ্ছপ আছে। কচ্ছপেরা সুবিধা পাইলেই পায়রা ধরে। এখন পায়রাগুলি এমনই শিখিয়াছে যে, জল খাইতে নামিবার পূর্ব্বে, একবার পুকুরের এ পার ও পার উড়িয়া দেখে। তাহার পর, এক জায়গায় নামিয়া, তাড়াতাড়ি একটু জল খাইয়া, আর এক জায়গায় যায়। এমনি করিয়া তিন চারি বারে তৃষ্ণা নিবারণ করে। তোবড়া হইতে যে দানা পড়িয়া যায়, এক জায়গায় কতকগুলি পায়রা তাহাই খাইত। তাহাতে পেট না ভরিলে, একটা গিয়া ঘোড়ার চোখের উপর পড়িত। চোখ ঝাড়িবার জন্য ঘোড়া মুখ নাড়িত, তাহাতে আরও কতকগুলি দানা পড়িয়া যাইত। পায়রাগুলি এইরূপে উদর পূর্ণ করিত। দেওয়ালের গর্ত্তে চামচিকা বাস করে। কখন কখন চড়ুই পাখী তাহাদের বাসা দখল করিয়া লয়। জোরে না পারিয়া, চড়ুই যখন ভিতরে বসিয়া আনন্দ করিতে থাকে, চামচিকা কাদা আনিয়া বাসার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। চড়ুই বাহির হইতে না পারিয়া অনাহারে মরিয়া যায়। কুকুরের নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য ফাঁকি দিতে না পারিলে, কাকেরা একটি সঙ্গী ডাকিয়া আনে। তখন একটা কাক কুকুরটাকে ছোঁ মারে, কুকুর তাহাকে কামড়াইবার জন্য মুখ ফিরাইলেই অন্যটা তাহার খাবার লইয়া প্রস্থান করে।

কোন গাছের ফল খাইতে ইচ্ছা হইলে যদি মুখ দিয়া শাখা ধরিতে না পারে, তবে হরিণেরা পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ায়, এবং শৃঙ্গে ডাল জড়াইয়া নাড়া দিতে থাকে। যথেষ্ট ফল মাটীতে পড়িলে তাহা কুড়াইয়া খায়। কেবন সাহেব একটি শূকরী পুষিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি সন্তান হয়। শূকরী জঙ্গল হইতে চরিয়া ফিরিয়া আসিলে, সাহেব এক একটি

করিয়া তিন দিনে তিনটি শিশু হত্যা করেন। চতুর্থ দিনে দেখা গেল, শূকরী একা ফিরিয়া আসিয়াছে, সঙ্গে একটি সন্তানও নাই। কয়েক দিন অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছিল, অভাগিনী অবশিষ্ট শিশুদিগকে বাঁচাইবার জন্য তাহাদিগকে এক জঙ্গলে লুকাইয়া আসিয়াছিল। তাহার সন্তান-সংখ্যা দিন দিন যে কম হইতেছিল, সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। শূকরেরাও গাছ নাড়া দিয়া ফল পাড়িয়া খাইতে জানে। কবি কাউপার তাঁহার পোষা খড়গোস পুসের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, পুসের পীড়ার সময় বিশেষ যত্ন করিয়া আমি তাঁহাকে আরাম করিয়াছিলাম। আরোগ্য হইবার পরে, সে অতি যত্নে আমার হাত চাটিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিত। আমি তাহাকে বাগানে বেড়াইতে লইয়া যাইতাম। বেড়াইবার সময় হইলে সে আমার হাঁটুর উপর থাবা মারিয়া আমার মুখের পানে তাকাইয়া সঙ্কেত করিত। ইহাতেও আমি না বুঝিলে সে দাঁত দিয়া জামা ধরিয়া টানিতে থাকিত।

No creature could be more grateful than my patient after recovery a sentiment which he most significantly expressed by licking my hand, first the back of it then the palm, then every finger separately, then between all the fingers as if anxious to leave no part of it unsaluted, a ceremony which he never performed but once again upon a similar occasion. Finding him extremely tractable, I made it my custom to carry him always after breakfast into the garden......I had not long habituated him to this taste of liberty before he began to be impatient for the return of the time when he might enjoy it. He would invite me to the garden by drumming upon my knee and by a look of such expression as it was not possible to misinterpret. If this rhetoric did not immediately succeeded he would take the skirt of my coat between his teeth and pull it with all his force.

ইন্দুরের বুদ্ধিপরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। দুটা ইন্দুরে মিলিয়া বড় বড় হাঁসের ডিম সিঁড়ি পার করিয়া উপর হইতে নীচের ঘরে লইয়া যায়। অথচ একটি ভাঙ্গে না।

বোতলে প্রবেশ করিতে না পারিয়া ইন্দুরে লেজ ডুবাইয়া কিরূপে তেল চুরি করে, অনেকেই শুনিয়াছেন। বোতলের মুখের কাছে উঠিতে না পারিলে ইন্দুরেরা বোতলের পাশে মাটী জমা করিয়া উচ্চ করিয়া লয়। এবং

লেজ দিয়া তেল স্পর্শ করিতে না পারিলে বোতলের ভিতর মাটী ফেলিয়া দেয়, নীচে মাটী পড়াতে তেল উপরে উঠে! আহার্য্য লইয়া নদী পার হইতে হইলে, আট দশটা ইন্দুরে মিলিয়া একখানা ঘুঁটে বা কাষ্ঠখণ্ডে আহার্য্য চাপাইয়া, তাহা নদীতে ভাসাইয়া দেয়। আপনারা চারি দিক হইতে তাহার উপর মুখ দিয়া চাপিয়া লাঙ্গুলকে দাঁড় করিয়া নদী পার হইয়া চলিয়া যায়। গৃহনির্ম্মাণে, সেতুবন্ধনে ও পয়োনালা-খননে, বীবরেরা কি আশ্চর্য্য বুদ্ধি-কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে, অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। এজন্য এখানে সে সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না।

জলে কোন দ্রব্য ভাসিতে দেখিলে হাত বাড়াইয়া যদি ধরিতে না পারে, তবে ভালুকেরা হাত দিয়া কোলের দিকে জল কাটে, তখন সেই টানে দ্রব্যটি নিকটে আসে। মাটীর উপরে কোন দ্রব্য শুঁড় দিয়া নাগাইল না পাইলে, হাতী সম্মুখের কোন দ্রব্য লক্ষ্য করিয়া জোরে ফুঁ দেয়, বাতাসের জোরে সে পদার্থটি আগে গিয়া লক্ষিত পদার্থে বাধা পাইয়া হাতীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। কলিকাতার লর্ড বিশপ উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন, একটি হাতীর চোখের পীড়া হয়; তিন দিন সে কিছুই দেখিতে পায় নাই। ডাক্তার ওয়েব তাহার চোখে নাইট্রেড অব্ সিলভার প্রয়োগ করিতে চাহিলে, হাতীটাকে ধরাধরি করিয়া শোয়াইয়া ফেলা হয়। ঔষধ দিবামাত্র জ্বালায় হাতীটা চীৎকার করিয়া উঠে। কিন্তু রোগের উপশম হয়; এবং সে কিছু দেখিতে পায়। পর দিন অন্য চক্ষে সেইরূপ ঔষধ দিবার জন্য ডাক্তার উপস্থিত হইলে, তাঁহার স্বর শুনিয়া, হাতীটা আপনি শুইয়া পড়ে, শুঁড়টি উঁচু করে, এবং ফোড়া কাটিবার সময় মানুষ যেমন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভবিতব্যের নিকট মস্তক অবনত করে, হাতীটিও তেমনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিল। এ দিন সে চীৎকার করে নাই, এবং ঔষধ প্রয়োগ শেষ হইলে শুঁড় নাড়িয়া ও অন্য প্রকারে আপন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল।

The animal when he was brought out and heard the Doctor's voice lay down of himself, placed his head quietly on one side curled up his trunk, drew in his breath like a human being about to endure a painful operation, gave a sigh of relief when it was over and then by motions of his trunk and other gestures gave widest signs of wishing to express his

gratitude. Here we plainly see in the elephant memory, understanding and reasoning from one thing to another.

একটি হস্তী-শাবক যুদ্ধে আহত হইয়াছিল; তাহার যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে, ঔষধ দিবার জন্য কাহাকেও সে কাছে আসিতে দিত না। সকল চেষ্টা বিফল হইলে, মাহুত তাহার মাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলে। তখন সে যাইয়া বল পূর্ব্বক তাহাকে চাপিয়া ধরে, এবং ডাক্তার ঔষধ দেয়। যে কয় দিন ঔষধ দিবার দরকার হইয়াছিল, তাহার মা ঐরূপ করিয়াছিল। কোন স্থান চুলকাইবার আবশ্যক হইলে যদি শুঁড় দিয়া সে স্থান স্পর্শ করিতে না পারে, তবে হাতীরা শুঁড় দিয়া বাঁশের টুকরা বা অন্য কোন পদার্থ ধরিয়া সে স্থান চুলকায়। পাদ্রী টাউনসেণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন, কোন মাহুত রুটী তৈয়ার করিয়া ঘাস ও পাথর চাপা দিয়া রাখিয়া, কোন কার্য্যের জন্য অন্যত্র গিয়াছিল। সে অদৃশ্য হইলে, তাহার হাতিটি শুঁড় দিয়া পায়ের শিকল খুলিয়া আসিয়া সে রুটিগুলি খাইয়া আবার তেমনি করিয়া ঘাস ও পাথর চাপা দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া যায়। কিন্তু পায়ে শিকল লাগাইতে না পারিয়া এমনি করিয়া জড়াইয়া দিয়াছিল যে, হঠাৎ দেখিলে বোধ হইবে, যেন পায়ে শিকল বাঁধা আছে।

স্মিথ সাহেবের একটি বিড়াল ছিল। তাহার শিশুগুলিকে অপরিষ্কার দেখিলেই সাহেব বিড়ালটির কান মলিয়া দিতেন। তাহার পর দেখা গেল, বিড়ালটি সন্তানগুলির কান মলিয়া দিয়া পরিষ্কার হইতে শিখাইতেছে।

ডাক্তার ক্লীন সাহেব লিখিয়াছেন, আমরা পাখীদের খাইবার জন্য রুটীর গুঁড়া ছড়াইয়া দিতাম। আমাদের বিড়াল সেখানে লুকাইয়া থাকিত। পাখীরা তাহা খাইতে আসিলে, তাহাদের দুই একটি উদরসাৎ করিত। কয়েক দিন আমরা গুঁড়া ছড়াই নাই। কিন্তু সে কয় দিন বিড়ালটি স্বয়ং গুঁড়া ছড়াইয়া দিত। একদিন একটি বিড়াল এক ঘরে বন্ধ থাকিয়া যায়। পলাইবার কোন পথ না পাইয়া সে হাত দিয়া খিড়কী তুলিয়া বাহিরের ছিটকানী সোজা করিয়া জোরে কপাট ঠেলিয়া খুলিয়া পলায়ন করিয়াছিল। হঠাৎ কেরোসিন তেল ও আগুন পড়িয়া একটি বিড়ালের লোম জ্বলিয়া উঠে। সে আপনি জলে ঝাঁপ দিয়া আগুন নিবাইয়াছিল।

কুকুরেরা মনের ভাব ঈসারা কি শব্দ করিয়া স্বজাতীয়ের নিকট ও মানুষের কাছে প্রকাশ করিতে পারে। আবডিন নগরের

একটি লোক বরফ পার হইবার সময় ডুবিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কুকুর অনেক রকমে চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিতে বিফল হইলে, গ্রামের একটি লোককে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিল। রাখালের কুকুর, রাখাল না থাকিলে, মেষদিগকে পাহারা দেয়, যেন তাহারা কাহারও ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারে, কোন মেষ গর্ত্তে পড়িয়া গেলে তাহাকে উঠাইয়া দেয়, এবং দিন শেষ হইলে তাহাদিগকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনে।

কোন কোন কুকুর বাড়ীর সকলে ঘুমাইলে গলাবন্ধের ভিতর হইতে মাথা গলাইয়া অন্যত্র প্রস্থান করে,এবং কেহ জাগিবার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া গলাবন্ধে মাথা গলাইয়া শুইয়া থাকে। এক দিন দুটি কুকুরে ঝগড়া করিয়াছিল। পরদিন একটা একখানা বিস্কুট লইয়া অন্যটাকে দিয়া, তাহার সহিত ভাব করিয়াছিল। কোন কোন কুকুর পয়সা লইয়া বাজার করিয়া আনে। বিক্রেতা কম জিনিষ দিলে সে জিনিষও লয় না, সেখান হইতে উঠেও না। এক গায়কের কুকুর এমনই তাল, মান বুঝিয়াছিল যে, কেহ গান করিবার সময় তাল কাটিলে সে চীৎকার করিয়া তাহার গানে বাধা দিত। ফটোগ্রাফে কুকুরে প্রভুর চিত্র বুঝিতে পারে। ত্রিভুজের দুই বাহু যে তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর, ইহা কুকুরে জানে। ঘোড়া ভয় পাইয়া গাড়ী লইয়া পলাইলে কুকুর দৌড়িয়া গিয়া লাগাম কামড়াইয়া ঘোড়াকে টানিয়া রাখে, দেখা গিয়াছে। নদী পার হইবার সময় নদীর জলে পা দিয়া কুকুর বুঝিয়া লয়, জোয়ার কি ভাটা হইয়াছে, এবং তদনুসারে কিছু উপর বা নীচে গিয়া জলে নামে; সুতরাং গন্তব্য স্থানে পার হইয়া যাইতে বিশেষ কষ্ট হয় না। এক ব্যক্তির নীরো নামে একটি কুকুর ছিল। তাঁহার দুই জায়গায় দুইটি বাড়ী ছিল। নীরো কখন এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী হাঁটিয়া যাইত; কখন ষ্টেশনে গিয়া ট্রেনে চড়িয়া নিকটস্থ ষ্টেশনে নামিত। বোধ হয়, কোন কারণে নামিতে না পারিয়া, সে একবার কিছু দূরের ষ্টেশনে গিয়াছিল। তথায় নামিয়া, কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, তাহার পর ফেরত ট্রেনে চড়িয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়াছিল।

বানরেরা একবার ছুরিতে হাত কাটিলে এমন করিয়া ছুরি ধরে যে, আর কখন হাত কাটে না। একটা বানর আপন ঘরের কপাটে চড়িয়া ছাদের উপর উঠিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সে যত বার উঠিতে যাইতেছিল, তত বার কপাট সরিয়া দরজার উপর পড়িয়াছিল। তখন সে একটা কম্বল

লইয়া কপাটের ধারে আটক দিয়া ছাদে উঠিয়াছিল। শিপ সাহেব লিখিয়াছেন যে, একবার এক দল বানর পাথর ফেলিয়া তাঁহার কুড়ি জন গোরার সঙ্গে লড়াই করিয়াছিল। সে যুদ্ধে সাহেবরা পরাস্ত হন। রোমানিজ সাহেবের একটি বানর কাহারও উপর রাগ হইলে, নিকটে যাহা পাইত,তাহা লইয়া ঠিক তাগ করিয়া ছুঁড়িয়া মারিত। কিন্তু কোন লোভের পদার্থ হইলে তাহা মুঠার ভিতর রাখিয়া ছুঁড়িবার ভান করিত। নীলার ঘাটোয়ালের বাড়ীতে আমিও একটি বানরকে ইট ছুঁড়িয়া মারিতে দেখিয়াছিলাম। বানরে চাবী দিতে, চাবী খুলিতে, পেঁচ কসিতে ও পেঁচ ঘুরাইতে জানে। ইহাদের অনুসন্ধিৎসা বড়ই প্রবল। ইহারা যাহা করিতে দেখে, তাহাই করিতে চেষ্টা করে। বানরের বুদ্ধি সম্বন্ধে সহস্র উদাহরণ সকলেই জানে, সুতরাং অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। ইহারা কথা কহিয়া স্বজাতীয়ের মধ্যে মনোভাব প্রকাশ করে, গার্নার সাহেবের এরূপ বিশ্বাস।

পশুর সহিত মনুষ্যের তুলনা করিলে মনুষ্যের লজ্জিত হইবার কারণ নাই, বরং পশুদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতি জন্মে। পশু পক্ষীর মানসিক উৎকর্ষণ পরিসমাপ্ত হইয়াছে, মনুষ্য সবে পশুত্ব পরিহার করিয়া মানব জীবন আরম্ভ করিয়াছে। সম্মুখে অনন্ত উন্নতি, অসীম উৎকর্ষণ। দেহ মনের ব্যাবৃত্তি ক্রমে একদিন মনুষ্য দেবপদবীতে আরোহণ করিবে, পশুত্বের লেশ রহিবে না; তখনও পশু পশুই রহিবে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়।

আরঙ্গীবের রাজনীতি।

চতুর্থ প্রস্তাব।

বিদ্রোহী সৈন্য ক্রমশঃ দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আরঙ্গীব নিজে "বিলম্বে কার্য্যহানি" এই নীতির সারবত্তা অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়াই সে ক্ষেত্রে তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইল। দারার পুত্র সুলেমান বঙ্গদেশ হইতে বিজয়ী হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে—সে দিল্লীতে পৌছিলে

বাদশাহের সেনাবল সম্পূর্ণ বৃদ্ধি পাইবে, এই ভাবিয়া তিনি কালহানি অকর্ত্তব্য বোধে দ্রুতপদে দিল্লীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হইলেন।

সাহজাহান এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। পুত্র-দিগের এই প্রকার দুর্ব্বিনীত ভাব অমার্জ্জনীয় ভাবিয়া,তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য, সেই অসুস্থাবস্থাতেও সৈন্যচালনার প্রস্তাব করিলেন। রাজসভায় মন্ত্রীবর্গের মধ্যে আরঙ্গীবের হিতাকাঙ্ক্ষী অনেকে ছিল, তাহারা বৃদ্ধ বাদশাহকে বুঝাইয়া দিল যে, যুদ্ধক্ষেত্র বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বেগম সাহেবও বৃদ্ধ ও অসুস্থ পিতাকে যুদ্ধে যাইতে দিতে নিতান্ত ইচ্ছা ছিল না বলিয়া,একটু কাঁদিয়া কাটিয়া বাদশাহের মতপরিবর্ত্তনে অনেক সহায়তা করিলেন।

দারা নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে উৎসুক হইলেও, পিতার নিকট হইতে দূরে যাওয়া, তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি বৃদ্ধ বাদশাহের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, কাশেম খাঁ ও মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে আরঙ্গীব ও মুরাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

একটি নদীতীরে দিল্লী হইতে অনতিদূরে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। যুদ্ধ সম্বন্ধে সমস্ত বর্ণনা করিতে গেলে আমাদের স্থানে কুলাইবে না, এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, বাদশাহ-সৈন্যের অন্যতম নায়ক কাশেম খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায়, আরঙ্গীব সেই ক্ষেত্রে বিজয়শ্রী লাভ করিলেন।

এই শোচনীয় পরাজয়সংবাদ যখন আগরায় সাহজাহানের নিকট পৌছিল, তখন বাদশাহ অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইলেন। আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া বাদশাহ ধীরে ধীরে বলিলেন—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কেন না তিনি ক্রমে ক্রমে আমায় সিংহাসন হইতে স্খলিত করিতেছেন। আমি মহাপাপী, পাপে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলাম—হে ঈশ্বর! আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।" পরাজয়সংবাদ পাইয়া, যুবরাজ দারা ক্রোধোন্মত্ত হইয়া, বিশ্বাসঘাতক কাশেম খাঁর উপর অজস্র অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে লাগি-লেন। তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্ত বর্ণ ধারণ করিল। মীরজুমলা আর-ঙ্গীবের সহিত যোগদান না করিলে কখনই এরূপ ঘটিত না, এই ভাবিয়া, তিনি সর্ব্বপ্রথমে তাহার স্ত্রীপুত্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন। বলা বাহুল্য, সেই ক্ষেত্রে সাহজাহানের প্রবোধবাক্যে মীরজুমলার স্ত্রীকন্যা পরিত্রাণ পাইল।

বিজয়শ্রী লাভ করিয়া, আরঞ্জীব আগরার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দারা এই সংবাদে অতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া যথাসম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পিতার অনুমতি চাহিতে গেলেন—সাহজাহান সস্নেহ স্বরে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিলেন, "যাও বৎস! যুদ্ধে বিজয়শ্রী লাভ কর, ঈশ্বর যদি আমার প্রার্থনা শুনেন, তবে তুমি অচিরাৎ যুদ্ধে জয়ী হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিবে, আর সেই বিদ্রোহী অকৃতজ্ঞ পুত্রদ্বয়, তাহাদের সন্তপ্ত পিতার নিদারুণ অভিশাপ-ভোগ করিবে।"

পিতার আশীর্ব্বাদ লইয়া, যুবরাজ দারা যুদ্ধযাত্রা করিলেন—যুদ্ধযাত্রায় এ প্রকার ঐশ্বর্য্য আর কেহ কখন দেখে নাই। স্বর্ণমণ্ডিত শিবির বেষ্টিত অগণ্যবাহিনীসমন্বিত সেই স্কন্ধাবার একটি ক্ষুদ্র নগরবৎ প্রতীয়মান হইল—চারি দিকে কেবল নহবতের শব্দ,—যুদ্ধ-দামামার কর্ণবিদারক ধ্বনি, সৈনিকের উচ্চ কোলাহল, অশ্বের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিতধ্বনি, আর তরবারির নিষ্কাষণশব্দ। এই প্রকার অবস্থায়, চারি দিন ধরিয়া কুচ করিয়া, সৈন্যদল চম্বল নদী তীরে পৌঁছিল।

চম্বলের যে ধারে দারা ছাউনী করিয়াছিলেন, তাহা একটি ক্ষুদ্র নগরবৎ প্রতীয়মান হইল। তখন গ্রীষ্মকাল, চম্বলের জলও অনেক শুখাইয়া গিয়াছে; নদী পার হইতে না পারিলে বিপক্ষ সৈন্য কিছুই করিতে পারিবে না ভাবিয়া, দারা নদীপথে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলেন। আরঞ্জীবের সৈন্যদল সংখ্যায় অল্প, ইতিপূর্ব্বে যুদ্ধ করিয়াও তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং তাহারা অগত্যা যুদ্ধাদির কোন উদ্যোগ না করিয়া, অপর পারে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

চম্বলের যে পার্শ্বে আরঞ্জীব ও মোরাদের যুক্ত সেনা অবস্থান করিতেছিল, সে দিকের সমস্ত ভূভাগ চম্পৎ নামক কোন রাজপুত সামন্তের অধীনে ছিল। আরঞ্জীব কৌশল করিয়া তাহাকে বহুতর উপঢৌকনাদি দ্বারা বশীভূত করিয়া, তাহার অধিকৃত প্রদেশের মধ্য দিয়া সৈন্য লইয়া চম্বল অতিক্রম করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

গভীর নিশীথে, অন্ধকারে শরীর ঢাকিয়া, আরঞ্জীবের সৈন্য দারার ছাউনীর সার্দ্ধ সপ্ত ক্রোশ পূর্ব্বে, ধীরে ধীরে নদী পার হইল। যখন সেই অষ্ট সহস্র সৈন্যের ত্রিচতুর্থাংশ নদী পার হইয়া গিয়াছে, তখন দারার নিকট এই অদ্ভুত চতুরতার সংবাদ পৌঁছিল। দারা খলিলুল্লা খাঁ নামক এক বিশ্বস্ত

নানীকে ভ্রাতার সেনাদিগকে বাধা দিবার জন্য অগ্রগামী করিয়া লেন।

খলিলুল্লা বিশ্বাসঘাতক,—খলিল আরঙ্গীবের চতুরতা অতিক্রম করিতে ল না। অর্থের সহায়তায় আরঙ্গীব তাহার তরবারির শক্তি ও প্রভু- প্রবৃত্তি হরণ করিলেন। রামসিংহ নামক বিখ্যাত রাজপুত সেনা- য়ক, খলিলুল্লার প্রভুভক্তির সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া, দারাকে তৎক্ষণাৎ ক্রমণের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতক লিলুল্লা তর্কবলে তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল করিয়া দিল। আরঙ্গীবের সৈন্য না বাধায় আগরা হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে, সামনগর নামক স্থানে (পরে তেহাবাদ) নিরাপদে উত্তীর্ণ হইল।

সমসাময়িক ইতিহাসলেখকেরা, এই যুদ্ধের অতি বিস্তৃত বর্ণনা করিয়া গেছেন। ততটা বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে না গিয়া এই কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত বে যে, আরঙ্গীব সেই যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে বিজয়শ্রী লাভ করিলেন। দারা রাজিত হইয়া আত্মরক্ষার্থে পলায়নপর হইলেন।

আরঙ্গীব দারার পরিত্যক্ত শিবির ও তন্মধ্যস্থ দ্রব্যাদি অধিকার করিয়া, রাদকে দারার স্বর্ণখচিত পটমণ্ডপের মধ্যে সুখশয্যায় বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া, নিজে এক ক্ষুদ্র কুটীরে গিয়া, ঈশ্বরোপাসনা আরম্ভ করি- লেন। যখন তিনি সেই ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর হইতে বাহির হইলেন, তখন লোকে বিস্মিত হইয়া দেখিল, তাঁহার মুখ স্বর্গীয়তেজে পরিপূর্ণ, বক্ষঃস্থল কোরাণ- সংস্পৃষ্ট, মুখে অস্ফুটভাবে ঈশ্বরগুণগান। তিনি ধীরে ধীরে মুরাদের রত্নময় শিবিরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বিশ্বাসঘাতক খলিলুল্লাকে ভ্রাতার সম্মুখে উপস্থিত করাইয়া, তাহার পদবৃদ্ধি করিয়া দিলেন, এবং বলিলেন, "সম্রাট! প্রিয়তম ভ্রাতঃ! অদ্যকার দিনের ন্যায় যদি আর একটি কঠোর পরীক্ষাময় দিন আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারি, যদি সেই দিনের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই বুঝিব, দিল্লীর সিংহাসন আপনার করতলস্থ হইয়াছে।"

মুরাদ যখন যুদ্ধের শ্রান্তি হইতে অবসর লইয়া শিবিরমধ্যে সুখভোগে আসক্ত, তখন মহাকৌশলী আরঙ্গীব প্রতি দিবসেই দিল্লীর দরবারে তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদের সহিত চিঠিপত্র চালাইতে লাগিলেন। রসিনারা বেগম তাঁহাকে সাহজাহানের অন্তঃপুরের সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন। চারি দিকে

সুবিধা পাইয়া, আরঙ্গীব মহারাজ জয়সিংহকে স্বহস্তে লিখিয়া, দারার এ পরাভব সংবাদ প্রদান করিলেন।

১৬৫৮ খৃঃ অব্দের জুন মাসে, আরঙ্গীব ও মুরাদের যুক্ত সৈন্য আ হইতে এক ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইল। আরঙ্গীব যতই কূটবুদ্ধি হউন কেন, দুর্গ আক্রমণ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রতিযো তাঁহার ক্ষমতা ও বুদ্ধির অতীত ব্যাপার ছিল। তখনও অনেক সেনা সাহজ হানের নিমকের প্রকৃত মর্য্যাদা রাখিয়া চলিয়াছিল। বাদসাহ যদি সেই রু অবস্থাতেও একবার হস্তীপৃষ্ঠে সমরক্ষেত্রে দেখা দিতেন, তাহা হইলে হয় আরঙ্গীবকে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইত।

সাহজাহান দুর্গপ্রাকার হইতে নগরীর অবরুদ্ধ, অবস্থা অবলোক করিলেন। তাঁহার যৌবনের উৎসাহ ও যুদ্ধানুরাগ, সেই বৃদ্ধ বয়সে পুনরা নবীভূত হইল। বিদ্রোহী পুত্রদিগকে বাধা দিবার জন্য দুর্গপ্রাকারে কাম সাজাইতে আদেশ করিলেন। তিন দিন ধরিয়া অগ্নিবর্ষণ চলিল, কি তাহাতেও দুই ভ্রাতার যুক্ত সেনাদল হারিল না। তাহারা নিরাপদে দু নিম্নে পৌঁছিল। আরঙ্গীব তখনও সেখানে আসিয়া পৌঁছান নাই। তি পীড়ার ভান করিয়া নূতনবিধ মতলব আঁটিতেছিলেন।

আরঙ্গীবের সকল উদ্দেশ্যই প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। দারা ও সুজার সম্বন্ধে তিনি তখন নিশ্চিন্ত। একমাত্র চিন্তার বিষয় বৃদ্ধ পিতা, আর মুরাদ। সে ত তাঁহার অসীম ক্ষমতার তুলনায় অতি সামান্য। তাঁহার ইচ্ছা হইলেই তিনি তাঁহাকে পিষিয়া ফেলিতে পারেন। বৃদ্ধ পিতাকে কৌশলে হস্তগত করিবার উপায়চিন্তাই তাঁহার প্রধান অবলম্বন হইয়া উঠিল।

আরঙ্গীব তাঁহার এক বিশ্বস্ত নপুংসক অনুচরকে সাহজাহানের নিকট পাঠাইলেন। তাহাকে বলিয়া দিলেন, "পিতাকে বলিও, যেন আগ্রা-অবরোধ-সম্বন্ধে তিনি আমার কোন অপরাধ না লন। আমার শরীর অসুস্থ, সৈন্যেরা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আগ্রা অবরোধ করিয়াছে। আমার শরীর সুস্থ হইলেই আমি তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিব। তিনি যেন আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদকে আমার প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রদান করেন।" বাদসাহের অন্তঃপুরে কনলমফ্ শ্রেণীর তাতারজাতীয় এক শ্রেণীর স্ত্রী-সেনা সর্ব্বদাই অস্ত্র শস্ত্রে প্রস্তুত থাকিত। তাহারা বাদসাহের শরীররক্ষার কার্য্য করিত। জেহানারার

পরামর্শে ইহাদের সহায়তায় সাহজাহান আরঙ্গীব ও মুরাদকে বধ করিবার উপায় স্থির করিলেন। রসিনারার পত্রে বাদসাহের মনের কথা আরঙ্গীব জানিতে পারিয়া সতর্ক হইয়া রহিলেন। পিতার পুনরাহ্বান সত্বেও তিনি দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

একদিন জেহানারা সহজে প্রলোভিত করিবার জন্য, সহজবুদ্ধি মুরাদের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। মুরাদ জেহানারাকে মনে মনে ঘৃণা করিতেন। দারার শুভাকাঙ্ক্ষিনী বলিয়া অযাচিতভাবে শিবিরে উপস্থিত হইলেও, মুরাদ তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিলেন। জেহানারা ক্ষুব্ধা ও সন্তপ্তা হইয়া, মনে মনে মুরাদের মুণ্ডপাত করিতে করিতে শিবির ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন, এমন সময়ে আরঙ্গীব সবেগে তাঁহার শিবির হইতে বাহির হইয়া, দৌড়াইয়া আসিয়া তাঁহার শিবিকা ধরিলেন। সবিনয়ে বলিলেন, "ভগিনি! একবার দয়া করিয়া আমার শিবিরে পদার্পণ কর, আমি আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কতিপয় প্রস্তাব তোমার নিকট উপস্থিত করিতে চাই।"

শিবিরমধ্যে জেহানারাকে একাকিনী পাইয়া, আরঙ্গীব তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন, তিনি এই বিদ্রোহাচরণের জন্য সম্পূর্ণরূপে অনুতপ্ত হইয়াছেন। সিংহাসনে তাঁহার কোন অভিলাষ নাই, কেবলমাত্র মুরাদের অনুরোধেই এই সমস্ত ব্যাপারের অনুষ্ঠান। পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু লজ্জা, ভীষণ লজ্জা আসিয়া তাহার পথে প্রতিবন্ধক হইয়াছে। পিতা—উদারহৃদয় বাদসাহ ত নিশ্চয়ই তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু তত্রাচ তিনি তাঁহার সম্মুখে মুখ তুলিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। তবে জেহানারা যদি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় পুত্র যুবরাজ মহম্মদকে পিতৃসন্নিধানে পাঠাইয়া প্রথমে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, পরে তাঁহার সমক্ষে দুই ভ্রাতায় উপস্থিত হইতে পারেন।

আরঙ্গীবের কৌশলে তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী জেহানারা প্রতারিত হইলেন। তিনি শিবিকারোহণে দুর্গে প্রত্যাগমন করিয়া, পিতাকে এ সম্বন্ধে অনুরোধ করিলেন। সাহজাহান এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহার মনের ভিতর অন্য গূঢ় উদ্দেশ্য রহিল। তিনি কৌশলে আরঙ্গীবকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মহম্মদের জন্য তিনি নানাবিধ উপহারদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। সাহজাহানের মনের কথা আরঙ্গীব কি করিয়া

বুঝিলেন, তাহা তিনিই জানেন। তিনি মহম্মদকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—"প্রচুর সৈন্য লইয়া রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিও এবং কার্য্যক্ষেত্রে বিবেচনা করিয়া কাজ করিও।"

পিতার উপযুক্ত পুত্র যুবরাজ মহম্মদ সৈন্য লইয়া দুর্গ প্রবেশ করিয়াই দ্বারের প্রহরীদের নিরস্ত্র করিলেন। প্রাসাদমধ্যে যাইতে যে সমস্ত অস্ত্রধারী স্ত্রীসৈন্য বা প্রহরী পাইলেন, তাহাদের সম্বন্ধেও সেইরূপ ব্যবস্থা হইল। এত কৌশলে এই সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইল যে, বাদসাহ তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। মহম্মদ তখন নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া বাদসাহের নিকট উপস্থিত হইলেন,তাঁহাকে গম্ভীর ভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা! বার্দ্ধক্য আপনাকে রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত করিয়াছে। জীবনের এই শেষ অবস্থায় আপনি সুখে ও শান্তির সহিত অতিবাহিত করেন, ইহাই আমার ইচ্ছা। বহু মুদ্রাব্যয়ে, বহু পরিশ্রমে, আপনি কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে যে সমস্ত নয়নরঞ্জন উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে স্ত্রী ও বেগমগণকে লইয়া সুখে কালযাপন করুন। আপনার চক্ষু হইতে আমরা সূর্য্যালোকে অন্তর্হিত করিতে চাহি না। অর্থাৎ, অন্ধতমসাবৃত কারাগারে আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে চাহি না, কিন্তু আমার ইচ্ছা, আপনি যোগ্যপাত্র পুত্রদিগকে আপনার সিংহাসন প্রদান করুন।"

সাহজাহান এই অভূতপূর্ব্ব স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাহার পৌত্র—যে তাঁহার সহিত তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, সে যে তাঁহাকে এরূপে অপমান করিতে সাহসী হইবে, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল। তাঁহার মুখমণ্ডল ক্রোধে লোহিতবর্ণ ধারণ করিল—তিনি পার্শ্বস্থ রমণী-সৈনিকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু তাহাদের মুখ ইতিপূর্ব্বেই আবদ্ধ হইয়াছে। সাহজাহান রোষে, ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন—মহম্মদ গম্ভীর কণ্ঠে প্রহরীদিগকে সেই সুধাধবলিত দেওয়ানখাসের চারিদিকে রাখিয়া বলিলেন—"সম্রাট! আপনি এখন বন্দী।"

সাহজাহান মাথায় হাত দিয়া ধীরে ধীরে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে সাহস সঞ্চয় করিয়া, বৃদ্ধ বাদসাহ এক নূতনবিধ কল্পনার উদ্ভাবন করিলেন। যদি তাহা সুসিদ্ধ হইত, হয় ত তাহাতে আরঙ্গীবের আশা ভরসা সমূলে উৎপাটিত হইত। বাদসাহ সস্নেহ স্বরে মহম্মদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! যে পুত্র তাহার পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে

পারে, সে যে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে নিজ ঔরসজাত সন্তানকে ... করিবে, তাহা কে বলিতে পারে! আমার পুত্রেরা বিদ্রোহী, পাপে—অন্যায় উপায়ে তাহারা সিংহাসন অধিকার করিতে চাহে—সে সিংহাসন আমি তাহাদিগকে ভোগ করিতে দিব না। আমি তোমায় আমার মুকুট সমর্পণ করিতেছি; আগরা সহর তোমার হস্তগত—তুমি এই সময়ে স্বীয় বাহুবলে সিংহাসনে অধিরোহণ কর। বৎস! আমার মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ তোমার মস্তকের উপর পড়ুক।" অন্য কেহ হইলে হয় ত এই প্রলোভনে ভুলিত—কিন্তু মহম্মদ আরঙ্গীবের পুত্র বলিয়া, ভবিষ্যৎ দেখিয়া, সেই প্রচণ্ড লোভ সামলাইয়া উঠিলেন।

কোষাগারের চাবি বাদসাহপৌত্র পূর্ব্বেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আরঙ্গীব ও মুরাদ আগরায় পৌঁছিয়া কোষাগারস্থ বহুকালসঞ্চিত ধনরত্নাদি দুই ভায়ে সমানভাবে অংশ করিয়া লইলেন। যাহা কিছু হুকুমপত্র চলিতে লাগিল, তাহাতে উভয় ভ্রাতার স্বাক্ষর। আরঙ্গীবের দান এই সময়ে সীমা অতিক্রম করিল। তাঁহার অনুগত সমস্ত কর্ম্মচারী ও ওমরাহগণ যথেষ্টরূপে পুরস্কৃত হইলেন। সায়েস্তা খাঁ আগরার শাসনকর্তৃত্ব লাভ করিলেন। এইরূপে অসম্ভাবিত উপায়ে, অল্প রক্তপাতে প্রাসাদাধিকার করিয়া, আরঙ্গীব দারার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যোগী হইলেন।

যাত্রাকালে আরঙ্গীব মুরাদকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন, মুরাদের হিতাকাঙ্ক্ষীরা নিষেধ করিল, কিন্তু তিনি তখন জয়োল্লাসে উন্মত্ত, আরঙ্গীবের উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, কেহ তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না। নিয়তির হাত কে কোথায় অতিক্রম করিয়াছে? মুরাদ যদি সেই ক্ষেত্রে আরঙ্গীবের অনুবর্ত্তী না হইতেন, তাহা হইলে হয় ত তাঁহার শোচনীয় পরিণাম সুদূরপরাহত হইত।

আরঙ্গীবের সৈন্য দিল্লীর ধারে ধারে নদীতীরে যাত্রা করিয়া মথুরায় পৌঁছিল। নদীর দুই পার্শ্বে দুই ভ্রাতার শিবির সন্নিবেশিত হইল। আরঙ্গীবের ভ্রাতৃস্নেহ এই সময়ে এত দূর উছলিয়া উঠিল যে, লোকে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। আরঙ্গীব নদীর উপর ভাসমান সেতু প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায়, ভাবী সম্রাট্‌স্বরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতার শিবিরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তথায় মুরাদের ঐশ্বর্য্যময় অভিষেকের কথা ভিন্ন আর তাঁহাদের আলোচনার কিছু ছিল না। কি প্রকার

অভিষেকের সহিত অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইবে, তাঁহার উপযুক্ত দরবারের সৌন্দর্য্য সাধন জন্য কিরূপ বন্দোবস্ত আবশ্যক, এই সব সুখ-স্বপ্নময় উজ্জ্বল আশায় তিনি প্রলুব্ধ মুরাদকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

মুরাদ অভিষেকের আশায় উন্মত্ত। দিনের পর দিন গেল, কৈ কিছুই ত হইল না। যে দিন স্থির ছিল, তাহা কাটিয়া গেল। একদিন আপত্তি উঠিল, অভিষেকের উপযুক্ত বড় তাঁবু তখনও আসিয়া পৌছায় নাই। আর একদিন ওজর হইল, উপহারদ্রব্যসম্ভার তখনও আসিয়া পৌছায় নাই। সে গুলি পৌছিল; তখন আপত্তি উঠিল, হাতী ঘোড়ার সাজ ও সৈন্যদের পোষাক প্রস্তুত হয় নাই। প্রলুব্ধ মোরাদ এইরূপে ভুলিতে লাগিলেন। তিনি অভিষেকের ভবিষ্যৎ আশায় উৎফুল্ল হইয়া, শিবিরের মধ্যে নৃত্য-গীতের মহা আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুচরেরা সেই আমোদে মাতিল। সেরাজীর সুগন্ধে,কলকণ্ঠ রমণীর সুধাময় সঙ্গীতে সেই, যমুনাতীরস্থ শিবিরে আনন্দের পূর্ণোচ্ছ্বাস চলিতে লাগিল।

আরঙ্গীবের শিবিরে ইহার ঠিক বিপরীত ভাব। তথায় নৃত্যগীত নাই, মদিরোৎসব নাই, রমণীর সুধাময় গীতিধ্বনি নাই। কেবল গম্ভীর ভাব, আর তার মাঝে মাঝে, প্রাতে ও সন্ধ্যায় নেমাজের আজানধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না।

মথুরার বাদসাহী মস্‌জিদের নিকটে প্রশস্ত ময়দানে অভিষেকের তাঁবু পড়িয়াছিল। মুরাদ সেইস্থানে প্রথমতঃ অভিষিক্ত হইবেন। মুসলমান ধর্ম্মযাজক তাঁহার মস্তকে ধর্ম্মময় মুকুট পরাইয়া দিবে। পরদিন অভিষেক। তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রে আরঙ্গীব পীড়ার ভান করিয়া ভ্রাতাকে নিজ শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য, জ্যোতিষীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন যে, পর দিন অভিষেকের উপযুক্ত দিন কি না।

মুরাদ আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া অগ্রজের নিমন্ত্রণ রাখিতে চলিলেন। তাঁহার একমাত্র প্রিয় বিশ্বস্ত অনুচর সাহা আব্বাস ইহাতে অমঙ্গলের ছায়া দেখিল। সেই বিশ্বাসী ভৃত্য মুরাদকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও, তিনি নিয়তি বশে তাহার কথা উল্লঙ্ঘন করিয়া, আরঙ্গীবের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। মুরাদ নদীপার হইতেছেন, তাঁহার আর এক জন বিশ্বস্ত অনুচর (ইব্রাহিম খাঁ) আসিয়া তাঁহার অশ্বের বল্গা ধারণ করিল, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল—যুবরাজ! আপনি কোথায় যাইতেছেন? আর-

ঙ্গীবের নিকট যাত্রা ত আমি শুভসূচক দেখিতেছি না।” মুরাদ তাহাকে ধমকাইয়া বলিলেন,—“দেখিতেছ না যে, আমি মুকুট পরিতে যাইতেছি? আমার স্নেহময় ভ্রাতা আমার মস্তকে সেই সুবর্ণময় মুকুট পরাইয়া দিবে।” অশ্ব কষাঘাতে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল; ইব্রাহিম অশ্রুপূর্ণ নয়নে শিবিরে ফিরিল।

শিবিরদ্বারে আরঙ্গীবের নিযুক্ত কাজী সাহেব দাঁড়াইয়া। মুরাদকে শিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কাজী সাহেব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বলিলেন, “যুবরাজ! কোথায় যাইতেছেন? ঈশ্বর করুন, আপনার যাত্রাকালের ন্যায় প্রত্যাগমন সময়ও এইরূপ শুভসূচক হউক। এমন সময়ে আরঙ্গীব শিবিরদ্বারে দেখা দিলেন। কথাটা চাপা পড়িল।

ভবিষ্যৎ তাহাকে এত সাবধান করিয়া দিলেও, মুরাদ সাবধান হইলেন না। নিয়তি তাঁহাকে ধ্বংসমুখে টানিয়া লইয়া চলিল। আরঙ্গীব সস্নেহে সম্মানের সহিত তাঁহাকে এক সিংহাসনে বসাইলেন। মদিরা গন্ধে উন্মত্ত কতকগুলা মক্ষিকা আসিয়া মুরাদের মুখে বসিতেছিল,আরঙ্গীব স্বীয় বস্ত্রপ্রান্ত দিয়া সেইগুলি তাড়াইয়া দিলেন। মুরাদের মুখে ঘাম ঝরিতেছিল, তিনি নিজে মুছাইয়া দিলেন। তাঁহার জন্য গোলাপজলে শীতল স্নানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহাকে “মহারাজ!” “সম্রাট!” “জাঁহাপনা!” ইত্যাদি গৌরবময় সম্বোধনে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন।

আহারের আয়োজন হইল, আরঙ্গীবের শিবিরে কেহ কখন মদিরার আমদানি দেখে নাই। এবার তাহাও হইল। দুই ভ্রাতায় বসিয়া আহার করিতে লাগিলেন। মুরাদ এই সুখের দিনে মদিরার মাত্রা আরও বাড়াইলেন;—তাহাতে কি ছিল, কে জানে,—যুবরাজ শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

গভীর রাত্রি;—সেই প্রান্তরে শিবির মধ্যে সুখময় শয্যায় মুরাদ প্রফুল্লচিত্তে নিদ্রার ক্রোড়ে অঙ্গ ঢালিয়াছেন। তাঁহার অনুচর সাহ আব্বাস জাগিয়াছিল; কিন্তু সে ক্লান্ত হইয়া সবেমাত্র ঘুমাইয়াছে। এমন সময়ে আরঙ্গীব নিজে সেই কক্ষে প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রবেশ করিলেন। কৌশলে মোরাদের কটিবন্ধস্থ অসি ও চর্ম্ম অপসারিত করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন,—“রক্ষী! অগ্রসর হইয়া আইস।”

অগ্রে আরঙ্গীব, পশ্চাতে বর্ত্তিকা ধরিয়া সাত আট জন অস্ত্রধারী

সৈনিক। আরঙ্গীবের চীৎকারে সাহ আব্বাসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে চীৎকার করিয়া মুরাদের নিদ্রাভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু আরঙ্গীবের কটাক্ষপাতে মুহূর্ত্তমধ্যে জাগরিত মুরাদের শিথিল শরীর রৌপ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল। আরঙ্গীব ভাইয়ের জন্য এই শৃঙ্খল পূর্ব্ব হইতে গড়াইয়া রাখিয়াছিলেন।

এত কৌশলে এই কাজ সমাহিত হইল, একটু মাত্রও কেহ জানিতে পারিল না। মুরাদের শিবিরে তাঁহার অনুচরেরা উৎসবামোদে মত্ত। আরঙ্গীবের শিবিরে নৃত্যগীতাদির শব্দ তখনও থামে নাই। মুরাদের লোকে ভাবিল, দুই ভ্রাতায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছেন।

পরদিন প্রাতে অভিষেক। আরঙ্গীব প্রভাতের পূর্ব্বে আজ্ঞা প্রচার করিলেন, "অভিষেকক্ষেত্রে জনতাস্থলে দাঙ্গা হাঙ্গামা খুব সম্ভব। সম্রাটের সৈনিকেরা অস্ত্রবলে বলীয়ান হইয়া এ প্রকার স্থলে নিরীহ দর্শকের উপর অত্যাচার করিয়া থাকে; এ ক্ষেত্রে সেই দুর্ঘটনা নিবারণ জন্য কোন সৈনিকই অস্ত্র লইয়া আসিতে পারিবে না। মুরাদের সৈনিকেরা নিরস্ত্র হইয়া অভিষেক দেখিতে আসিল।

সহসা এক জয়ধ্বনি উঠিল, তাহার মধ্যোদ্গত শব্দ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতে লাগিল, লোকে শুনিল, প্রতিধ্বনি গাইতেছে, "আরঙ্গীবের জয় হউক" "বাদশাহ আরঙ্গীব দীর্ঘজীবী হউন।" যাহারা জনরবের মূল, তাহারা আরঙ্গীবের অস্ত্রধারী সৈন্য। তাহারা কাছে আসিয়া মুক্তকণ্ঠে নূতন বাদশাহের জয়োচ্চারণ করিল।

মুরাদের সৈন্যেরা তখন বুঝিতে পারিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আরঙ্গীবের কুটবুদ্ধি—গতরাত্রের নিমন্ত্রণের অর্থ—সবই তাহারা বুঝিতে পারিল। কিন্তু বুঝিয়া কি করিবে, তাহাদের হাতে হাতিয়ার নাই। তাহারা নীরবে নিমকের অবমাননা করিয়া মর্ম্মদগ্ধ হইতে লাগিল। আর তাহাদের সম্মুখে হতভাগা মুরাদ বন্দীভাবে দিল্লীতে প্রেরিত হইলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই সংখ্যায় "সাহিত্যের" তৃতীয় বর্ষ শেষ হইল। আগামী সন ১৩০০ সালের বৈশাখ মাস হইতে চতুর্থ বর্ষের আরম্ভ হইবে। গ্রাহক মহাশয়গণ, অনুগ্রহ পূর্ব্বক, ১৩০০ সালের ১লা বৈশাখের পূর্ব্বে, স্ব স্ব দেয় অগ্রিম মূল্য ২৲ দুই টাকা পাঠাইয়া দিয়া অনুগৃহীত **করিবেন।**

সাহিত্য-মুদ্রণের সৌকর্য্য ও সৌষ্ঠবের জন্য, "সাহিত্য-যন্ত্র" নামে নূতন যন্ত্র সংস্থাপিত হইতেছে। চতুর্থ বর্ষ হইতে "সাহিত্য" নিজের যন্ত্রে মুদ্রিত হইবে। নব বর্ষের নূতন আয়োজনের জন্য, এ সময়ে **আমাদের টাকার বিশেষ প্রয়োজন**; আশা করি, গ্রাহক মহাশয়েরা, যত সত্বর পারেন, "সাহিত্য-কার্য্যালয়; ২৩ নং বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা" এই ঠিকানায়, চতুর্থ বর্ষের অগ্রিম মূল্য ২৲ দুই টাকা পাঠাইয়া দিয়া, আমাদিগকে উৎসাহিত ও অনুগৃহীত করিবেন।

চতুর্থ বর্ষের সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য যথোচিত চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটী হইতেছে না। আশা করি, আমাদের গ্রাহক মহাশয়েরাও, শীঘ্র মূল্য পাঠাইয়া আমাদিগকে উপকৃত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কার্য্যাধ্যক্ষ।

প্রেতী।

বৌদ্ধ উপাখ্যান।

একদা রাজা অশোক স্বীয় গুরু উপগুপ্তকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকট আর একটি সুভাষিত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি নিজ গুরুর নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছেন, আমাকেও অবিকল সেইরূপ বলুন। রাজা, উপগুপ্তকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, রাজন্! আমি গুরুর নিকট যেরূপ শুনিয়াছি, আপনার ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত সেইরূপই বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

পূর্ব্বকালে এক সময়ে ভগবান্ বুদ্ধদেব ভিক্ষু, শ্রাবক, বোধিসত্ত্ব এবং উপাসকগণের সহিত রাজগৃহনগরে গমন করিয়া, তত্রত্য কলন্দক-নামক বেণুকাননে ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন। ভগবানের মুখনিঃসৃত ধর্ম্মামৃত পান করিবার জন্য দেবতা, অসুর, মনুষ্য, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও রাক্ষস, উরগ, রাজা, বৈদ্য, বণিক, ঋষি, যোগী, যতি এবং ব্রহ্মচারী, সকলেই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তথায় আসীন ছিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে নানাবিধ পূজোপকরণ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া, সমাহিতচিত্তে দর্শন করিতেছিলেন। এই সময় আত্মতত্ত্বজ্ঞ মৌদ্গল্যায়ন প্রেতভুবনে বিচরণ করিতে করিতে একটি প্রেতী দর্শন করিলেন। তাহার সর্ব্বাঙ্গ লোম ও কেশ দ্বারা আচ্ছন্ন, আকৃতি দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় বিকট, মুখ সূচিকার ন্যায় ক্ষুদ্র অথচ কলেবর প্রকাণ্ড, উদর পর্ব্বতসন্নিভ এবং কেশপাশ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ। সে তীব্র বেদনায় নিতান্ত কাতর ও অত্যন্ত পিপাসিত হইয়া মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছিত হইতেছে। আয়ুষ্মান মৌদ্গল্যায়ন সেই প্রেতীকে অনেক ক্ষণ অবলোকন করিয়া, এ কে? এরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এরূপ কি পাপ করিয়াছ যে, যাহাতে এরূপ দুঃখভাগিনী হইতে হইয়াছে? তুমি তৃষ্ণার্ত্তা হইয়া জলের জন্য ব্যাকুলভাবে চতুর্দ্দিকে কি জন্য বিচরণ করিতেছ?

যতিশ্রেষ্ঠ মৌদ্গল্যায়ন সেই প্রেতীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সে করুণস্বরে বিলাপ করিতে করিতে তাঁহাকে বলিল, ভগবন্! আমি

পাপকারিণী না হইলে তৃষ্ণাপ্রতপ্তাঙ্গ হইয়া জলের জন্য ভ্রমণ করিব কেন? আমি তৃষ্ণাতুর হইয়া যেখানে জলপানের জন্য গমন করি, তথায় নদী প্রভৃতি জলাশয় আমার দৃষ্টিনিক্ষেপমাত্রেই বিশুষ্ক হইয়া যায়। আকাশ হইতে বৃষ্টিপাত হইতেছে দেখিয়া যখন আমি প্রবল পিপাসাভরে জলপান করিবার জন্য বেগে ধাবমান হই, তখন দেখি, সেই জলবিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়। এইরূপ দেখিয়া আমি নিরাশায় অন্ধের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করি। আমি কি পাপে এইরূপ দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি, জগতের শাস্তা দেবাদিদেব ভগবান বুদ্ধদেবকে তাহা জিজ্ঞাসা করুন। আমি পূর্ব্বকালে যে জঘন্য কার্য্য করিয়াছি, তাহা তিনি নিশ্চয়ই প্রাণীগণকে জ্ঞানালোকে আলোকিত করিবার জন্য বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিবেন। তাহা শুনিয়া, যাবতীয় প্রাণিগণ পাপমার্গ হইতে বিরত হইবে, এবং সর্ব্বদা শুভকার্য্য করিবে। প্রেতী মৌদ্গল্যায়নকে এই কথা বলিয়া স্বস্থানে গমন করিল।

অনন্তর মৌদ্গল্যায়ন বুদ্ধদেবকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য বেণুকাননে গমন করিলেন। ভগবান তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মৌদ্গল্যায়ন! তুমি অদ্য কোথা হইতে আসিতেছ, এবং কোন কোন স্থান ভ্রমণ করিয়াছ? আমার কাছেই বা কি মনে করিয়া আসিয়াছ, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

তখন মৌদ্গল্যায়ন মহামুনি জিনেন্দ্রের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া বলিলেন, ভগবন্! আমি প্রেতভূমি বিচরণ করিয়া আসিতেছি, সেখানে একটি ভয়ানক প্রেতীকে দেখিলাম। সে উলঙ্গ, তাহার আকৃতি দগ্ধকাষ্ঠসদৃশ, উদর পর্ব্বতসন্নিভ, মুখের ছিদ্র সূচাছিদ্রের ন্যায়, সর্ব্বাঙ্গ রোম ও কেশাচ্ছন্ন। দারুণ বেদনায় অভিভূত হইয়া সে আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে। তাহার দেহ অত্যন্ত অশুচি ও দুর্গন্ধময়। সে ক্ষুৎপিপাসাভরে মলমূত্র ভোজন করিতেছে। ভগবন্! আমি দেখিলাম, সেই সাক্ষাৎ পাপমূর্ত্তি প্রেতী তৃষার্ত্ত হইয়া জলাশয় হইতে জলাশয়ান্তরে ভ্রমণ করিতেছে। কিন্তু যখন সে নদী কূপ বা তড়াগ জলপূর্ণ দেখিয়া ধাবিত হয়, তাহার দৃষ্টিমাত্রে সেই সকল জলাশয় শুষ্ক হইয়া পঙ্কবিশেষে পরিণত হয়। তখন সে নিরাশ ও পিপাসাকুলিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; আবার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জল ও অন্ন অন্বেষণের জন্য নানাদেশে বিচরণ করে, কিন্তু তাহার ভাগ্যে খাদ্য বা পানীয় লাভ কোথাও ঘটে না। তখন সে নিরুপায় হইয়া মলমূত্র আহারের

চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাও প্রচুর পরিমাণে না পাওয়ায় ক্ষুধা তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিতে পারে না। সে আমাকে দেখিয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মৃদুস্বরে বলিল, মহাশয়! ভগবান আপনার মঙ্গল করুন! আপনি এই পাপিনীকে কিঞ্চিৎ জলদান করুন,—আমি পিপাসায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি। সে এই কথা বলিয়া আমার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া পানীয় প্রার্থনা করিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, এখানে জল নাই; তুমি কে, কি জন্যই বা এরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছ, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে কি পাপে তোমাকে এরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে, বল। ভগবন্! প্রেতী আমার এই কথা শুনিয়া বলিল, এ হতভাগিনী নিজ পাপের কথা কি বলিবে? আপনি সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তিনিই আমার সমস্ত পাপকার্য্য বর্ণনা করিবেন। তাহার এইরূপ কথা শুনিয়া আমি আপনার নিকট সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আসিয়াছি। আহা! সেই প্রেতী ভয়ঙ্কর বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া, আর্ত্তস্বরে রোদন করিতেছে। যেখানে মলমূত্র রহিয়াছে, সে দুঃখিতান্তঃকরণে সেইখানে যাইতেছে; তাহাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইতেছে না। প্রভো! আমি সেই পাপিনীকে এই প্রকার দুঃখভোগ করিতে দেখিয়া আসিলাম। সে এই পৃথিবীতে এমন কি কঠোর পাপ করিয়াছে যে, তাহাকে এতাদৃশ অসহ্য দুঃখভোগ করিতে হইতেছে? সে কখন পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুগতি লাভ করিবে, আপনি প্রাণিগণের মঙ্গলের জন্য তাহা বলিয়া অনুগৃহীত করুন। মৌদ্গল্যায়ন ভগবানকে এই কথা বলিলে তিনি বলিলেন, পাপিষ্ঠা প্রেতী যে কার্য্যের জন্য এরূপ দুঃখ-ভোগ করিতেছে, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পুরাকালে কাশ্যপ নামক সর্ব্ববিৎ বুদ্ধ, যাহাতে বোধিজ্ঞান লাভ করা যায়, সেই বিষয়ে উপদেশ দান করিতে করিতে বারাণসী নগরে মৃগদাবে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় ভিক্ষু ও বোধিসত্ত্বগণে বেষ্টিত হইয়া, যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ, এরূপ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু কোনও নগর হইতে প্রত্যাগত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষু তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া, ঐ স্থানে একটি কূপের সমীপে গমন করিলেন। তথায় একটি স্ত্রীলোক কূপ হইতে কলসে করিয়া জল লইয়া যাইতেছিল। ভিক্ষু সেই স্ত্রীলোকের নিকট এই বলিয়া জল প্রার্থনা করিলেন, ভগিনি! আমি তৃষ্ণার্ত্ত, অনেক দূর হইতে

আসিতেছি। তুমি জল লইয়া যাইতেছ দেখিয়া তোমার নিকট আসিলাম, আমাকে জল দিয়া জীবনদান কর। আমাকে জীবনদান করিলে তুমি দীর্ঘজীবিনী ও রোগশূন্যা হইবে। ভিক্ষু এই কথা বলিলে, দুষ্টাশয়া সেই স্ত্রীলোক মদভরে গর্ব্বিত হইয়া বলিল, ওরে ভিক্ষু! এখানে আসিস্ না, যদি তুই জলাভাবে মরিয়া যাস্, তথাপি আমি জল দিব না। আমার জল-কলস শূন্য হইয়া যাইবে। আমি কূপ হইতে যত্ন করিয়া জল তুলিয়া কলস পূর্ণ করিয়াছি, ও বহন করিয়া গৃহে লইয়া যাইতেছি; নির্লজ্জ! এই জল কি তোমার জন্য আমি লইয়া যাইতেছি? পরের নিকট জল চাহিতে লজ্জা করিতেছে না? তুমি কি রাজা, না উত্তমর্ণ, না গুরু? পাপাশয়া এই-রূপে ভিক্ষুকে ভৎর্সনা পূর্ব্বক জলদান না করিয়াই গৃহে চলিয়া গেল। ভিক্ষুও লজ্জিত হইয়া তাহাকে আর কিছুই বলিলেন না, অন্যত্র গিয়া জল পান করিলেন। তিনি একটি তরুমূলে উপবেশন করিয়া জলপানকালে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! এই দুর্ম্মতি স্ত্রীলোক মাৎসর্য্যভরে দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মের অবমাননা করিল! সে অনেক পুণ্যে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, তাহাও নিস্ফল করিল। জানি না, কখন পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সদগতি লাভ করিবে। হতভাগিনী পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুখ লাভ করুক ও ধর্ম্মে তাহার মতি হউক। জিতেন্দ্রিয় ভিক্ষু মহাশয় এইরূপ চিন্তা করিয়া, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘাত্মক ত্রিরত্নকে স্মরণ করিয়া, ধ্যানে সমাহিত হইলেন।

ইতিমধ্যে সেই পাপাশয়া স্ত্রীলোক গৃহে উপস্থিত হইয়া ভর্ত্তাকে পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিল, স্বামিন্! অদ্য আমি যখন জল কলস পূর্ণ করিয়া গৃহে আসিতেছিলাম, পথে এক জন ভিক্ষু আমার নিকট জল চাহিল; আমি তাহাকে জল না দিয়াই শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি, সে আমার নিকট অনেকবার জল চাহিয়াছিল, কিন্তু আমি তাকে একটুও জল দিই নাই। ভর্ত্তা এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পরুষনেত্রে বলিলেন, পাপিনি! তুই তৃষিত ভিক্ষুকে কেন জলদান করিস্ নাই? যখন জলমাত্রপ্রদানেও তোর ইচ্ছা নাই, তখন তুই কি প্রকারে অন্ন, ধন বা রত্ন দান করিতে ভরসা করিবি? তোর যাচকের প্রতি দয়া নাই, তুই নিতান্ত পাপিষ্ঠা। যে স্ত্রী যাচককে জল দান করিতেও কাতরা, সে সতী হইলেও আমি তাহাকে চাহি না।

তুই আমার প্রিয়া হইলেও আমি তোকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। তবে যদি আমার প্রীতিভাজন হইতে চাস্ তাহা হইলে যাচকগণকে সাদরে দান করিতে অভ্যাস কর্। নচেৎ আমি তোকে পরিত্যাগ করিলাম, তুই আমার গৃহ হইতে চলিয়া যা। আমাদিগকে নিশ্চয়ই একদিন মরিতেই হইবে। যে স্ত্রী দ্বারা ধর্ম্মহানি হয়, সে স্ত্রী লইয়া পুরুষের কি প্রয়োজন? যে স্ত্রী মাৎসর্য্যপূর্ণা, তাহার দ্বারা পুরুষের কেবল ধর্ম্মনাশ হয়। অতএব তুই আমার গৃহ হইতে চলিয়া যা। ধর্ম্ম দ্বারাই লোক উদ্ধার পাইয়া থাকে, স্ত্রী দ্বারায় উদ্ধার পায় না। অতএব পাপানুরাগিণী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তোর দ্বারা আমার যশঃ ও ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতেছে, অতএব আমি তোর সহিত আহার বিহার করিতে ইচ্ছা করি না। যদি ধর্ম্মাচরণ করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সহিত গৃহে বাস কর্।

ভর্ত্তা এইরূপ বলিলেও, ঐ স্ত্রীলোক তাঁহার কথায় জ্ঞানলাভ করিল না। তাহার চিত্ত মাৎসর্য্যপূর্ণ থাকায়, সে রোষভরে তাঁহাকে উত্তর করিল, আমি তোমার গৃহে থাকিতে চাহি না, এখনই চলিলাম। আমি এরূপ কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে এত কটু বলিলে? সেই ভিক্ষু কি তোমার গুরু, না রাজা, না ভ্রাতা, না পিতা? সে যখন তোমার কেহই নহে, তখন তাহাকে দি, বা নাই দি, তাহাতে তোমার কি? আমি কখন কোন ভিক্ষুকে কিছুই দিব না, না দিলে কি হইবে? আমি দি বা না দি, সে কথায় তোমার কাজ কি? পাপই হউক বা ধর্ম্মই হউক, আমার হইবে; সে চিন্তা করিয়া তোমার কি হইবে? মঙ্গল বা অমঙ্গলের ভাগী তুমি না হইলেও, যদি গৃহে থাকা তোমার বিবেচনায় দোষের হয়, আমি গৃহে বাস করিতে চাহি না, এখনই চলিলাম। আমি প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি কাহাকেও কিছু দান করিতে পারিব না। দুষ্টা এইরূপে স্বামীকে ভৎর্সনা করিল। সে তদবধি কাহাকেও কিছু দান করিত না। গৃহে অতিথি আসিতে দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইত, এবং বলপূর্ব্বক তাহাকে বাহির করিয়া দিত। অতিথি যখন আশীর্ব্বাদ করিয়া ফিরিয়া যাইত, তখন সে হাসিতে থাকিত এবং তাহার নিন্দা করিত। পাছে কোন যাচক আসিয়া প্রার্থনা করে, এই ভয়ে সে সর্ব্বদা গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিত, এবং সর্ব্বদাই গৃহমধ্যে থাকিত, কখনই গৃহের বাহিরে যাইত না। এই বিষয় লইয়া স্বামীর সহিত

তাহার সর্ব্বদা কলহ হইত, সে কেবল নিজের উদর পূরণ করিয়াই কাল-যাপন করিত। যখন রুগ্নাবস্থায় তাহার অন্তিমকাল উপস্থিত, তখনও সে কাহাকেও কিছু দান করিতে ইচ্ছা করে নাই। অনন্তর, সে তৃষ্ণাতুরা হইয়াই প্রাণত্যাগ করে, এক্ষণে নরকে গিয়া প্রেতযোনি লাভ করিয়াছে।

হে মৌদ্গল্য! আমি যে দুষ্টা মদগর্ব্বিতা স্ত্রীর কথা বলিলাম, এই প্রেতী সেই স্ত্রী। এই প্রত্যক্ষপাপরূপিণীকে দর্শন করিয়া সকলেরই যাচককে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক জলদান করা উচিত। জলদান সকল বস্তু দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। জলই লোকের জীবন, জলপান না করিলে লোকে প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। অতএব তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে জলদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

নিরাহার তপস্বীগণ জলপান করিয়া অনেক বৎসর জীবিত থাকেন। লোকে সমস্ত আহার ত্যাগ করিয়াও জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে; কিন্তু সমস্ত অন্ন উপভোগ করিয়াও জলাভাবে অধীর হইয়া পড়ে। অতএব জলদানকে জীবনদান বলা যাইতে পারে। সর্ব্ববিধ দান অপেক্ষা জল দানই প্রশস্ত; বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে এবং তৃষ্ণার্ত্ত রোগী, বৃদ্ধ ও আতুরকে জলদান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

জলদান দ্বারা দেবলোক, পিতৃলোক এবং অন্যান্য প্রাণিগণ তৃপ্তিলাভ করেন। যে দ্রব্য অত্যন্ত অশুচি, তাহাও জলাভিষিক্ত হইবামাত্র বিশুদ্ধ হয়।

যে সকল দেবগণ স্বর্গে দিব্যকান্তার সহিত সুধাপান করিয়া বিহার করিতেছেন, যে সকল চক্রবর্ত্তী নৃপেন্দ্রগণ অবনীমণ্ডলে সুখে রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই জলদান পুণ্যেই এইরূপ উচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন। অতএব হে আনন্দ! যাচকগণকে সাদরে জলদান করা উচিত।

ভগবান এই কথা বলিলে, ভিক্ষুগণ সর্ব্বদা সমস্ত প্রাণীকে জলদান করিতে কৃতনিশ্চয় হইল। কিন্তু সদয়হৃদয় আনন্দ গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, গুরুদেব! কি করিলে এবং কোন সময়ে ঐ পাপিষ্ঠার পাপ মোচন হইবে?

আনন্দ এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর ভগবান বলিলেন,—হে আনন্দ! কি প্রকারে তাহার পাপ মোচন হইবে, তাহা শ্রবণ কর।

এই স্ত্রীলোক বহুকাল নরকে ভ্রমণ করিতে করিতে দুঃখে ও অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, যখন বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ, এই রত্নত্রয়ের শরণ লইবে, তখন ভগবান

বুদ্ধদেব তাহাকে স্বপ্রভা দ্বারা স্পর্শ করিবেন। তখন সে অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিবে, অদ্য আমি কার প্রভাবে এতাদৃশ সুখলাভ করিতেছি। আমার ভাগ্যে কি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোনও সুখকর স্থানে বাস করা ঘটিবে? ভগবান তখন তাহাকে উপদেশ দান করিবেন; সে ভগবানের মুখনিঃসৃত অমৃত পান করিয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া স্তব করিবে।

ভগবন্ আপনাকে নমস্কার! আমাকে কৃপা পূর্ব্বক উদ্ধার করুন ও ধর্ম্ম-মার্গ প্রদর্শন করুন; আমি আপনার শরণ লইলাম।

দয়ানিধি ভগবান সেই পিশাচীর প্রার্থনাবাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহাকে আর্য্যমার্গ প্রদর্শন করাইবেন। সে ক্রমে নরক হইতে সুখাবতী নামক স্বর্গলোকে গমন করিবে, এবং তথায় বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিবে।

আনন্দ, ভিক্ষুগণের সহিত ভগবানের এইরূপ কথা শুনিয়া, পিশাচী উদ্ধারলাভ করিবে বলিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইলেন।

উপগুপ্ত বলিলেন, হে মহারাজ অশোক! আপনারও ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া বোধিজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। এইরূপ করিলে আপনি প্রথমে সুখাবতী নামক স্বর্গলাভ এবং পরে নির্ব্বাণলাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস।

মধুচ্ছন্দার সোমযাগ।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সোমযাগের—অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম নামক সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও মূলীভূত সোমমহোৎসবের পাঁচটি অঙ্গ। প্রথম অঙ্গের নাম দীক্ষা। সোমযাগে অনেক দ্রব্য সামগ্রী আহরণের প্রয়োজন হইত, ধার্ম্মিকদিগকে মূল্যবান দক্ষিণা দিতে হইত, এবং যজ্ঞের কয়েকদিন অকাতরে অন্নবিতরণ করিতে হইত। ষোল জন ঋত্বিক না হইলে, মধুচ্ছন্দার সময়ের সোমযাগ নির্ব্বাহিত হইত না। ঋত্বিকগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক

শ্রেণীর এক এক জন প্রধান ও তাঁহার তিন তিন জন সহকারী ঋত্বিক হইতেন। প্রধান প্রধান চারি ঋত্বিকের নাম হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা। মধুচ্ছন্দার ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সূক্তে এই চারি শ্রেণীর ঋত্বিকের উল্লেখ দেখা যায়। মধুচ্ছন্দার এক ঋকে দেখা যায়,—

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণোঽর্চংত্যর্কমর্কিণঃ।
ব্রহ্মাণস্ত্বা শতক্রত উদ্বংশমিব যেমিরে॥

এ স্থলে গায়ত্রী বা উদ্গাতাগণ, অর্কী বা হোতাগণ ও ব্রহ্মাগণ বলিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর বহু ঋত্বিকের স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। যদিও এই ঋকে অধ্বর্য্যুদের উল্লেখ নাই—তথাপি স্থানান্তরে "অধ্বর্য্যবঃ" বলিয়া তাহাদিগকে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের চতুর্দ্দশ সূক্তটির আদ্যন্ত অধ্বর্য্যুগণকে সম্বোধন করিয়া রচিত। এই সূক্ত গৃৎসমদের বলিয়া যদি কেহ তাঁহাকে মধুচ্ছন্দার অপেক্ষা অর্বাচীন হওয়া সম্ভব বিবেচনা করেন, তবে তাঁহাদিগকে মধুচ্ছন্দার পিতা বিশ্বামিত্রের রচিত তৃতীয় মণ্ডলের ৭ম সূক্ত দেখিতে অনুরোধ করি। তথায় স্পষ্টাক্ষরে পাঁচ জন অধ্বর্য্যু ও সাত জন বষ্ঠকর্ত্তার (হোতা ও উদ্গাতা ?) উল্লেখ আছে। অতএব, মধুচ্ছন্দার সময়ে সোমযাগে ষোল জন ঋত্বিকই যজ্ঞে ব্রতী হইতেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনেকের সংস্কার আছে যে, ঋগ্বেদের সময়ের সোমযাগ অতি সরল ও অল্পায়াসসাধ্য ছিল, ঘরে ঘরে সোমযাগ হইত; এবং প্রত্যেক পরিবারের গৃহস্বামীই ঋত্বিক্ বা Priest এর কার্য্য করিতেন। ইহা নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি-মূলক সংস্কার। মধুচ্ছন্দার সময়ে মহাড়ম্বরে সোমযাগ সম্পন্ন হইত। এক দিনে যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইত না। অগ্নিষ্টোম যে সোমযাগের প্রকৃতিও সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, তাহাতে অন্ততঃ সাত দিন ধরিয়া যজ্ঞ হইত। বলা বাহুল্য যে, কেবল সমৃদ্ধিশালী লোকেই সোমযাগ করিতে সক্ষম হইত।

যজমান প্রথমে বিদ্বান ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে গিয়া ষোল জন ঋত্বিক বরণ বা মনোনীত করিতেন। পরে একটি শুভদিনে সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী আহরণ শেষ হইলে পর, ঋত্বিকগণ যজমানকে "দীক্ষিত" করিতেন।

দীক্ষার পূর্ব্বে একটি প্রশস্ত ও পরিস্কৃত স্থানে যজ্ঞভূমি রচনা হইত। যজ্ঞভূমিকে সংমৃষ্ট ও যূপ পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত করা হইত। চারি দিকে চারিটি তোরণ নির্ম্মিত হইত। যজ্ঞভূমির মধ্যে যজ্ঞীয় অগ্নি

প্রজ্বালনের বেদী এবং মধ্যে ঋত্বিকগণের বিষ্ণ্য বা বসিবার স্থান, এবং উত্তরাংশে "উত্তর বেদী" নামক হোমের স্থান রচিত হইত। যজ্ঞভূমির মধ্যে একটি "প্রাগংশ" বা "দীক্ষিতবিষ্ণি" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উহাই দীক্ষিতের বসিবার স্থান।

ঋত্বিকগণ প্রথমে যজমানকে নবনীতের দ্বারা অভ্যক্ত করিতেন, এবং একবিংশতি দর্ভপিঞ্জূলের দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাঁহার দেহের পবিত্রতা সাধন করিতেন। পরে জলের দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিতেন। অভিষেকের পর তাঁহাকে দীক্ষিতবিষ্ণি নামক স্থানে লইয়া গিয়া বসাইতেন। তথায় তাঁহাকে কৃষ্ণাজিনের উত্তরীয় দিতেন, এবং বস্ত্রাচ্ছাদিত করিতেন। যেন তাঁহার নূতন গর্ভবাস সাধন হইতেছে, এইরূপ ক্রিয়া করা হইত। গর্ভস্থ শিশু হাত মুঠা করিয়া থাকে; অতএব ঐ সময়ে যজমান বদ্ধমুষ্টি হইয়া বসিতেন। এই দীক্ষিত বিষ্ণি নামক স্থান যজমানের দ্বিতীয় জন্মের "যোনি" বলিয়া পরিগণিত হইত। কুতূহলী পাঠক এই বিষয়ের সবিস্তর অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করিলে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রথম পঞ্চিকা পাঠ করিবেন।

এই "দীক্ষা" নামক ক্রিয়ার প্রধান দেবতা অগ্নি ও বিষ্ণু। পরমেশ্বর সমুদায় দেবতার সমষ্টিস্বরূপ। বিষ্ণু সেই সর্ব্বদেবময় পরমাত্মার উত্তমাঙ্গ ও অগ্নি শেষাঙ্গ বলিয়া কল্পিত হইত। অগ্নি ও বিষ্ণুর মধ্যে অন্য সকল দেবতা অবস্থিত। সুতরাং, অগ্নি ও বিষ্ণু, এই দুই নামে পরমেশ্বরের আরাধনা করিলে পূর্ণ পরমাত্মার আরাধনা করা হইল বিবেচনায়, দীক্ষাতে অগ্নি ও বিষ্ণুকে আহ্বান ও প্রার্থনা করা হইত। ফলতঃ, ঋত্বিকগণ যজমানকে বুঝাইয়া দিতে ভুলিতেন না যে, অগ্নিতে, বিষ্ণুতে এবং সর্ব্বদেবময় পরমাত্মাতে কোন ভেদ নাই। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ১ম পঞ্চিকা, ১ম অধ্যায়)

অগ্নি ও বিষ্ণু এই নামে সম্বোধন করিয়া, ঋত্বিকেরা পরমাত্মার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতেন—

অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাং
সঙ্গতানা মুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ।
যজমানায় পরিগৃহ্য দেবান্
দীক্ষয়েদং হবিরাগচ্ছতং নঃ॥
অগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপ উত্তমং মহো
দীক্ষাপালায় বনতং হি শক্রা।

বিশ্বৈ দেবৈর্যজ্ঞিয়েঃ সংবিদানৌ
দীক্ষামস্মৈ যজমানায় ধত্তম্ ॥ *

সঙ্গত দেবতাগণের সর্ব্বোচ্চ স্থানে বিষ্ণু, সর্ব্ব নিম্ন যে স্থান মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা আসন্ন, তথায় অগ্নি অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। হে অগ্নি ও বিষ্ণু, যজমানের মঙ্গলের জন্য সমুদায় দেবতাগণের সহিত দীক্ষা লইয়া আমার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া আগমন কর। হে জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি ও বিষ্ণু, এই দীক্ষাপাল যজমানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃস্বরূপ যে "তপস্" বা জ্ঞান, তাহা দান কর। পূজনীয় সমুদায় দেবতার সহিত মিলিত হইয়া তোমরা এই যজমানকে যজ্ঞদীক্ষা প্রদান কর।

পাঠকবৃন্দ এই প্রার্থনার তাৎপর্য্যটি বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক অনুশীলন করিবেন। ঋত্বিকগণ যজমানের জন্য কি প্রার্থনা করিতেছেন? "তপঃ উত্তমং মহঃ।" উত্তমং মহঃ জ্যোতিঃস্বরূপং তপঃ জ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ। তপস্ শব্দের বৈদিক অর্থ "জ্ঞান"; তমস্ ইহার বিপরীত। মনু বলেন—

ধর্ম্মেন হি সহায়েন তমস্ তরতি দুস্তরং ॥

এই তমস্ সামান্য অন্ধকার নহে; মৃত্যুর পর পাপীর আত্মা যে অন্ধকারে নিমগ্ন হয় হয়, সেই তমস্।

উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে ॥

যে ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে নাই, মৃত্যুর পর তাহাকে অন্ধতমস্ নামক গতি প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহার বিপরীত যে দিব্যজ্ঞান, যাহাতে আত্মার অমরত্ব সাধন হয়, তাহার নাম তপস্। সায়ণ এই তপস্ শব্দের জ্ঞান অর্থ দিয়া একটি শ্রুতির প্রমান দেন, "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।" প্রণিধান করিয়া দেখিলে আর সন্দেহ থাকে না যে, "তপঃ উত্তমং মহঃ" ব্রহ্মজ্ঞানের নামান্তর।†

এক্ষণে পাঠকবৃন্দ সোমযাগের দীক্ষা কিরূপ ব্যাপার, তাহা কিঞ্চিৎ অবগত হইলেন। সোমযাগের সমুদায় তাৎপর্য্য এই দীক্ষায় প্রকাশ। যজমান

---

* অধ্যাপক শকলের সঙ্কলিত সংহিতায় অর্থাৎ শাকলশাখায় এই মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহাদের উল্লেখ আছে। অন্য কোন শাখায় এই মন্ত্র ছিল, তাহা জানা নাই।

† পাঠকবৃন্দ এই ভাষার সহিত আমাদের গায়ত্রীমন্ত্রের "সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গঃ" এই ভাষার তুলনা করিবেন।

আশা করেন, পরমেশ্বরের অনুগ্রহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন। তিনি আশা করেন যে, তাদৃশ জ্ঞান লাভ হইলে তাঁহার দ্বিতীয় জন্মের সাধন হইবে। এই বিষয়ে পরে আরো আলোচনা করা যাইবে।

এক্ষণে দীক্ষাঘটিত আর একটি কথা বলিয়া দীক্ষার প্রস্তাব এ স্থলে শেষ করিব। ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে,—

"দীক্ষাই ঋত, দীক্ষাই সত্য। অতএব, দীক্ষিত ব্যক্তির সত্যবাদী হওয়া কর্ত্তব্য। কথিত আছে, 'মনুষ্য হইয়া সমুদায় সত্য কথা বলিতে কে যোগ্য হয়? দেবতারাই সত্যসংহিত, মনুষ্য অনৃতসংহিত।' পূর্ব্বাপর বিশেষ বিবেচনা করিয়া কথা কহিবে। তাহা হইলেই সত্যময় বাক্য উদিত হইবে।"

ঋত্বিকগণ দীক্ষিত যজমানকে এইরূপ উপদেশ দিতেন। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, সত্যবাদী হওয়াই আমাদের দ্বিতীয় জন্মের প্রথম সোপান।

এক্ষণে সোমযাগের অন্যান্য অঙ্গের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতেছি। দীক্ষার ক্রিয়াতে প্রথম দিবস অতিবাহিত হইলে দ্বিতীয় দিবসে সোমক্রয় করা হয়। এই দিবসে "সোমকে" অর্থাৎ লতারূপ সোমকে যজ্ঞভূমিতে আড়ম্বরের সহিত এক শকটে করিয়া আনা হইত। আনিবার সময় বেদ সংগীত হইত। যেন রাজা অতিথির ন্যায় যজ্ঞস্থলে আসিলেন,—এই জন্য ইহার নাম আতিথ্য-ইষ্টি। ইহাই দ্বিতীয় দিবসের প্রধান ক্রিয়া ও উৎসব।

পরে তিন দিন ধরিয়া প্রবর্গ্য নামক ক্রিয়া। ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়ে। সংক্ষেপে এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ইহা সোমযাগের মুখ্য ক্রিয়া নহে, ইহা মুখ্য ক্রিয়ার অর্থাৎ সোমপানের প্রবেশিকাস্বরূপ। এই সমস্ত ক্রিয়া এইরূপ ভাবে নির্ব্বাহ হইত, যেন যজমানের জন্য স্বর্গারোহণের উপযুক্ত নূতন তনু নির্ম্মিত হইতেছে; যজমান যেন ব্রহ্মজন্মের গর্ভে এখনও বাস করিতেছেন, এবং তাঁহার নূতন দেহ পুষ্ট হইতেছে। তিন দিনই নানা বেদমন্ত্র পাঠ করা হইত। "মহাবীর" বা "ঘর্ম্ম" নামক একটি পাত্রে ঋত্বিকগণ মন্ত্রপূত করিয়া দুগ্ধ পাক করিতেন, যজমানকে সেই দুগ্ধ খাইয়া থাকিতে হইত। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে, দুই বার প্রবর্গ্য নামক ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইত।

এইরূপে যজ্ঞের পাঁচ দিন অতিবাহিত হইত। মধুচ্ছন্দা যে এগারটি সূক্ত রচনা করিয়াছেন, তাহা দীক্ষার আতিথ্য-ইষ্টি বা প্রবর্গ্য ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হইবার জন্য রচিত হয় নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া পাঠক মনে করিবেন না

যে, মধুচ্ছন্দার সময়ে ঐ সকল ক্রিয়া ছিল না। মধুচ্ছন্দার পিতা বিশ্বামিত্রের "কিংতে কৃণ্বংতি কীকটেষু" মন্ত্রে প্রবর্গ্য ঘর্ম্মের স্পষ্ট উল্লেখ আছে ; তাহাতেই মধুচ্ছন্দার সময়ে প্রবর্গ্য ক্রিয়ার বিদ্যমানতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মধুচ্ছন্দার সূক্ত বুঝিতে গেলে দীক্ষাদি অঙ্গ কিরূপ ছিল, তাহা জানা আবশ্যক।

প্রবর্গ্যের পর পশুযাগ। পশুযাগসম্বন্ধেও মধুচ্ছন্দা কোন সূক্ত রচনা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার পিতা বিশ্বামিত্র পশুযাগব্যবহার্য্য এক আপ্রী সূক্ত রচনা করিয়া গিয়াছেন, উহা তৃতীয় মণ্ডলের চতুর্থ সূক্ত। আর তাঁহার পিতামহ গাথী পশুযাগসম্বন্ধীয় আর একটি সূক্ত রচনা করিয়াছেন। ইহাতে মধুচ্ছন্দার সময়ে পশুযাগের বিদ্যমানতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। গাথীর সূক্তটি শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন,—

"হে জাতবেদা অগ্নি! আমাদের এই যজ্ঞ অমরগণের নিকট সমর্পণ কর। আমাদের হব্য সেবা কর। হে হোতা! উপবিষ্ট হইয়া সকলের প্রথমে মেদ ও ঘৃতের বিন্দু সমূহ বিশেষ রূপে ভক্ষণ কর।

"হে পাবক! (১) এই সাঙ্গ যজ্ঞে ঘৃতবিশিষ্ট মেদোবিন্দু সকল তোমার ও দেবগণের পানার্থ ক্ষরিত হইতেছে, অতএব, আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ও বরণীয় ধন দান কর।

"হে ভজনীয় অগ্নি! তুমি মেধাবী, ঘৃতস্রাবী বিন্দু সকল তোমার জন্য ; তুমি ঋষি ও শ্রেষ্ঠ, তুমি প্রজ্বলিত হইতেছ। তুমি যজ্ঞের পালক হও।

"হে সততগমনশীল (২) ও দীপ্তিমান্! তোমার জন্য মেদোরূপ হব্যের বিন্দু সকল ক্ষরিত হইতেছে। কবিরা তোমার স্তব করে, মহাতেজের সহিত আগমন কর, হে মেধাবী! আমাদের হব্যের সেবা কর।

"হে অগ্নি! আমরা মধ্য হইতে অতিশয় সারযুক্ত মেদ (পশুর) মধ্য হইতে উত্তোলন করিয়া তোমাকে প্রদান করিব। হে নিবাসপ্রদ অগ্নি! চর্ম্মের উপর যে বিন্দু সকল তোমার জন্য ক্ষরিত হইতেছে, তাহা দেবতাদের প্রত্যেককে বিভাগ করিয়া দাও।

---

(১) পাবক পাপশোধক। সায়ণ।

(২) মূলে আছে—অধ্রিগো। দত্ত মহাশয় সায়ণের অনুসরণ করিয়া এই অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু সায়ণ এ স্থলে বেশী বিদ্যা দেখাইয়াছেন। অধ্রিগু পশুহন্তা ঋত্বিকের নাম। এখানে অগ্নিকে অধ্রিগু বলায় বিশেষ সার্থকতা আছে। যেমন মনুষ্য অধ্রিগু পশু বলি দেয়, তেমনি অধ্রিগু অগ্নি যজমানের পশুজন্মের বিনাশ করেন।

এ স্থলে একটি প্রশ্ন উঠিতেছে। তৎকালীন পশুযাগে ছাগ ও মেষ বলি হইত, না গোহত্যা হইত? গাথী, বিশ্বামিত্র, মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি ঋষিরা সোমযাগে গরু বলিদান করিতেন কি না? ব্রাহ্মণেরা গোহত্যার কথায় কর্ণে হস্ত দিবেন সন্দেহ নাই! কিন্তু আজ কাল ইস্কুলের ছাত্রদিগকে পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে, ঋগ্বেদরচনাকালে গোহত্যা ও গোমাংসভক্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের সময়ে যদিও তাদৃশ প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে যে একালেও গোমাংস ভোজন করিতে হইবে, তাহা নহে; পক্ষান্তরে যাহাদের গোমাংসভোজনে আপত্তি নাই, আমরা তাঁহাদেরও কোন দোষদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা কেবল ঐতিহাসিক তত্ত্বের সমালোচনা করিতেছি মাত্র। যাঁহারা বলেন যে, ঋগ্বেদের সময়ে গোমাংস যজ্ঞীয় ছিল, তাঁহাদের মত কত দূর প্রামাণিক, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীউমেশচন্দ্র বটব্যাল।

সঙ্গিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রভাত অরুণালোক তখনও ঘাটে আসিয়া পড়ে নাই, কেবল জলের উপর ঊষার আলো পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল। চান্দেরী নদী নাচিয়া নাচিয়া যেন কোন অনন্ত উদ্দেশে নিশিদিন অবিরাম ভাবে চলিতেছে। তীরে নাগকেশর গাছের উপর একটা কোকিল ডাকিতেছিল, নীরব বনের মাঝে তাহার মধুর সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া মিশাইয়া যাইতেছিল। দূরে অর্ব্বলী অটলভাবে যেন জগতের সুখ দুঃখের, ভাঙ্গা গড়ার, কত অতীত কীর্ত্তির সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সংসার তখনও নিদ্রাশ্রান্ত নয়ন ভাল করিয়া উন্মীলন করিতে পারে নাই, অর্দ্ধজাগ্রত হইয়া অলস ভাবে ধীরে ধীরে নয়ন মেলিতেছে। এমন সময় দুইটি বালিকা ছোট ছোট দুটি কলস লইয়া ঘাটে আসিল। ভাদ্র মাস,

আকাশ নীল নির্ম্মল। নিকটের বনশ্রেণী ক্রমে ক্রমে দূরে গিয়া যেন আকাশের সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে। চান্দেরী পূর্ণযৌবনা রমণীর ন্যায়, হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত তরঙ্গমালা লইয়া, কূলে কূলে কানে কানে টল টল করিতেছে। ধীরে ধীরে আধখানা সূর্য্য পূর্ব্বগগনে জাগিয়া উঠিতেছে। মধুরতার সহিত গাম্ভীর্য্যের মিলন হইয়াছে।

বালিকা দুটির বড়টির বয়স ১২।১৩ বৎসর হইবে, তাহার নাম রমা। রমা সুন্দরী, তাহার সৌন্দর্য্যের কথা পল্লীতে বিখ্যাত। দৃষ্টি আনন্দমোহপূর্ণ, নবযৌবনের বিকাশে চঞ্চল। মুখে প্রফুল্লতা উৎকণ্ঠায় মিশ্রিত। চোখে, মুখে, দৃষ্টিতে যেন আবেগ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাল্য-যৌবনের সন্ধিস্থলে অপূর্ব্ব শ্রীতে রমার সুকুমার তনু পূর্ণ হইয়াছে।

ছোটটির নাম স্বরস্বতী। সে ১১।১২ বছরের। দলিত কুসুমের যেমন একটু করুণ সৌন্দর্য্য থাকে, প্রভাত-শুকতারার যেমন পাণ্ডুশ্রী থাকে, তেমনি কেমন একটু মাধুর্য্য তাহার মুখে, দৃষ্টিতে, লুক্কায়িত রহিয়াছে। সে সৌন্দর্য্যে তীব্রতা নাই, তাই সকলে তাহা বুঝিতে বা উপভোগ করিতে পারে না। বালিকার চপলতা বিন্দুমাত্রও তাহার মুখে নাই, তাহার পরিবর্ত্তে গম্ভীর শান্ত ভাব। নয়ন দুটির বিষণ্ণ স্থির দৃষ্টি।

রমা ঘাটে আসিয়া একবার আকাশের দিকে, একবার পরপারের তরু-শ্রেণীর দিকে, মাঝে মাঝে চমকিত ভাবে ঘাটের পথের দিকে, ফিরিয়া চাহিতেছিল। একটু পরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "মোহন আজ আর আসিল না!"

স্বরস্বতী সোপানে বসিয়া নত দৃষ্টিতে জলকল্লোলের খেলা দেখিতেছিল। সম্প্রতি তাহার একটি ভাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে, সেই কথা মনে পড়িয়া বিন্দু বিন্দু চোখের জল জলে মিশাইতেছিল। এমন সময় রমার কথা কানে গেল। সে মুখ তুলিয়া বলিল, "মোহন আজ আসিবে বলিয়াছিল?"

রমা হাসিয়া বলিল, "না, মোহন আসিবে বলে নাই, তাহা হইলে সে এতক্ষণ আসিত।"

স্বরস্বতী জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি?"

রমা কথার উত্তর দিল না, একটু অন্যমনস্ক হইয়াছিল। দূরে তরুশ্রেণীর মধ্যে মনুষ্যের মত একজন দেখা যাইতেছিল, রমা একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়াছিল। যখন সে ক্রমে নিকটে আসিল, তখন রমা "মোহন!" এই

কথাটি বলিয়া, একটু আগ্রহের ভাবে অগ্রসর হইয়া গেল। স্বরস্বতী ঘাটে দাঁড়াইয়া থাকিল।

মোহনলাল শ্রীমান ও বলিষ্ঠ। বয়স ১৮ বৎসর। মুখে ও পরিচ্ছদে কিছু বিলাসিতার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই মোহনই রমার ভাবী স্বামী। তাহার সহিত রমার বিবাহসম্বন্ধ ঠিক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তবু বাল্যকালের খেলার সঙ্গী বলিয়া, রমা মোহনকে লজ্জা করিত না।

মোহন আসিলে রমা বলিল, "আজ এত দেরী কেন মোহন? এতক্ষণ কি করিতেছিলে?"

মোহন বাম হস্তের সাজি দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া বলিল, "এই দেখ রমা, তোমার জন্য আজ কত ফুল তুলিয়া আনিয়াছি।"

রমা বলিল, "তাই ত, সকাল হইতে বুঝি ফুল তুলিতেছিলে? অনেক ফুল ত তুলিয়াছ মোহন? স্বরস্বতী, ভাই দেখে যা, মোহন কত ফুল আনিয়াছে।"

স্বরস্বতী রমার কথা শুনিয়া, রমার রাগ করিবার ভয়ে সেই দিকে পা বাড়াইতে গেল, কিন্তু পা অবাধ্য হইয়া তাহার বিপরীত দিকে অগ্রসর হইল। রমা স্বরস্বতীর বিপদ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "তোর ভাই এত লজ্জা? মোহনের কাছেও তোর লজ্জা করে?"

স্বরস্বতীর মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে এক পা এক পা করিয়া জলে পা বাড়াইতে লাগিল। মোহন তাহার সেই লজ্জারক্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। শেষে বলিল, "রমা, আমি যাই। স্বরস্বতী আমার জন্য লজ্জায় বড়ই কষ্ট পাইতেছে।" বলিয়া মোহন চলিয়া গেল।

মোহনকে যতক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল, রমা নিমেষবিহীন চক্ষে সেই বনপথের দিকে চাহিয়া রহিল। যখন মোহন একেবারে বনের ভিতর মিশাইয়া গেল, তখনও রমা সেইভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

স্বরস্বতী জল হইতে ডাকিল, "রমা!"

রমা চমকিত ভাবে পিছনে ফিরিয়া চাহিল।

স্বরস্বতী একটু হাসিয়া বলিল, "মোহন আসিলে তোমার ত জ্ঞান থাকে না, দেখ দেখি কত বেলা হইয়া গিয়াছে। স্নান করিবে না?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম প্রেমের বিকাশ কি মধুর! তখন জগৎ যেন শুধু মধুময় বলিয়া বোধ হয়। এই সুন্দর পৃথিবীতে অসৌন্দর্য্য যে কিছু আছে, তাহা মনে থাকে না। জীবন যেন কেবল সুখস্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। রমার কোমল হৃদয় এই প্রণয়মোহে আচ্ছন্ন। মোহনের কথা ত ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু এখন যেমন মধুর বোধ হয়, এমন মধুর ত কখনও লাগিত না। মোহনের হাসি কি মধুর! মোহন যাহা করে, সকলই সুন্দর, সকলই মধুর! মোহনের যে কিছু দোষ থাকিতে পারে, এ কথা রমার হৃদয়ে এক মুহূর্ত্তও স্থান পাইত না।

স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে যখন সংসার নিদ্রিতের মত নীরব শ্রান্তভাবে থাকিত, যখন পশু পক্ষীরা রৌদ্রতাপে তপ্ত হইয়া নিজ নিজ আশ্রয়ে বিশ্রাম করিত, কেহ কোথাও থাকিত না, সেই সময় নদীর ধারে, নাগকেশর তরুর ছায়ায়, পাথরের উপর বসিয়া, মোহন আর রমা কত গল্পই করিত। ছেলেবেলা হইতে দু'জনে চিরদিন একত্র ছিল, তাই এ প্রণয়ে লজ্জার বাধা নাই। তখনও বালিকার প্রেম, ইহাতে যৌবনের সঙ্কোচ, অভিমানের ছলনা প্রভৃতি কিছুই নাই। সেই চাঁদেরী নদীর তীরে, সেই নির্জ্জন নাগকেশর-তরুতলে, শিলাসনে, চারিধারে প্রকৃতির মধুর স্নেহ, তাহার মধ্যে মগ্ন হইয়া বালিকা ভাবিত, "বুঝি মোহন আর আমি ছাড়া জগতে আর কেহ নাই। বুঝি মোহনের জন্যই আমি, আমার জন্যই মোহন।"

আর মোহন! সে নিজে নিজের হৃদয় বুঝিতে পারে নাই। রমাসুন্দরী, তাহার বাল্যসহচরী, তাই সে ভাবিত, সে রমাকে ভালবাসে; কিন্তু সেই সঙ্গে কি জানি কেন স্বরস্বতীর লজ্জারক্ত মুখকান্তিও তাহার মনে জাগিত। মোহন আপনাকে আপনি বুঝিতে পারে নাই, তাহার নিজের হৃদয় তাহাকে প্রতারণা করিতেছিল।

সেই নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে তরুতলে বসিয়া দুজনে কত কথা হইত! রমা চরণের কবিতা শিখিয়াছিল, তাহাই মোহনের নিকট আবৃত্তি করিত। চান্দেরী নদীর কল কল তরঙ্গ প্রবাহের সঙ্গে বালিকার মধুর কণ্ঠনিঃসৃত রাজপুতানার অতীত গৌরবকাহিনী মিশিয়া যাইত।

গাহিতে গাহিতে যখন রমা থামিত, তখন তাহার সেই চিরহাস্যময় মুখ গম্ভীর হইত, সে মোহনকে আকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিত "মোহন,

সে দিন কি আর ফিরিয়া আসিবে না?" মোহন রমার ভাব বুঝিতে পারিত না, সে বলিত "কোন দিন?" রমার তখন আর সে বালিকার চপলভাব থাকিত না; নয়ন উজ্জ্বল হইত, মুখে দৃপ্তভঙ্গী বিকশিত হইত। সে গম্ভীরভাবে বলিত, "সেই দিন, যে দিন হামীর ছিলেন, যে দিন প্রতাপসিংহ ছিলেন, সঙ্গ ছিলেন, সেই দিন কি আর ফিরিবে না? এখন কি করিলে সে দিন ফিরিয়া আসে?"

মোহনের ও কথা বড় ভাল লাগিত না। সে কথার উত্তর না দিয়া মোহন অন্য কথা তুলিত।

"রমা, আমাদের কেমন নূতন দোলনা হয়েছে, তা তুমি দেখেছ? কাল তুমি দুলিবে না?"

রমা বলিত, "না মোহন, আমার দুলিতে ইচ্ছা করে না, আমার কিছুই ভাল লাগে না, যখন এ সকল কথা মনে পড়ে। আহা, কেন সে দিন গেল?"

মোহন হাসিয়া বলিত, "তা, তুমি কি সে দিন ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না কি?"

রমা মোহনের কথা শুনিয়া খানিক নীরব হইয়া থাকিত, শেষে নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যথিত চিত্তে বলিত, "না মোহন, তুমি হাসিও না, আমার বড় কষ্ট হয়।" ধন্য সেই দেশ, যে দেশে বালিকারও এমন স্বদেশপ্রেম!

আবার কোন দিন রমা পুষ্পের মালা গাঁথিত, চঞ্চল অলকদাম মুখের উপর বার বার পড়িয়া তাহাকে বিরক্ত করিত। রমা এক মনে পুষ্পহার গাঁথিত, মোহন রমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। রমা মালা গাঁথিতে গাঁথিতে গুণ গুণ স্বরে গান গাহিত।

যখন সে গাহিত, তখন মোহন রমার মধুর ও আবেগপূর্ণ স্বর শুনিতে শুনিতে মুগ্ধচিত্তে অবাক হইয়া থাকিত। নদী কুলু কুলু রবে অবিশ্রাম বহিয়া যাইত। সরস্বতী তখন কোথা?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সরস্বতী ও রমা দু'জনে জ্ঞাতিভগিনী, ব্রাহ্মণকন্যা। রমা অল্প বয়সে মাতৃহীনা হইয়াছিল, তাহাদের বাড়ীর ভিতর সে কেবল একটি সন্তান, তাই সে সকলের বড় আদরিণী। সে যখন যাহা চাহিয়াছে, তখনই তাহা

পাইয়াছে। কখনো কেহ তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করে নাই; তাই সে স্বভাবতঃ কিছু অভিমানিনী আর গর্ব্বিতস্বভাব হইয়াছিল।

আর সরস্বতী? সে ছেলেবেলা হইতে কখনো কাহারও সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিত না। সকলের নিকটই যেন সে কত অপ-রাধিনী! সর্ব্বদাই তাহার সঙ্কোচ। মানুষের দৃষ্টিভারে লজ্জাবতী লতার মত সে সঙ্কুচিত। এমন মধুর শান্ত স্বভাব, যে একবার তাহাকে দেখিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে।

সরস্বতী কেবল রমাকে সঙ্কোচ করিত না। রমা তাহার প্রাণের প্রাণ! যদি কখনো রমা অন্যায় করিয়া তাহাকে কিছু তিরস্কার করিত, তখন সরস্বতী কাঁদিয়া ফেলিত বটে, কিন্তু তাহার জন্য রমার উপর তাহার কখন রাগ হইত না। রমাও সরস্বতীর চোখে জল দেখিয়া আবার তখনই অনুতপ্ত হইত। এই দুই সঙ্গিনীতে কখনো বিবাদ কি মনোমালিন্য হয় নাই। একবার রমার অসুখ করিয়াছিল, তখন ১৫ দিন সরস্বতীর আহার নিদ্রা ছিল না। ইহার মধ্যে সে একমুহূর্ত্তও রমাকে ছাড়িয়া অন্য স্থানে যায় নাই, যখন রমা মোহনের সঙ্গে গল্প করিত, তখন সরস্বতীর কোন কাজ না থাকিলে সে তাহার একটু দূরে আড়ালে বসিয়া থাকিত। মোহনের সম্মুখে তাহার যাইতে লজ্জা করে, অথচ রমাকে ছাড়িয়া একাও সে থাকিতে পারে না, কাজেই সে এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। যখন রমা জ্ঞানহারা হইয়া মোহনের সঙ্গে গল্প করিত, তখন সরস্বতী অনিমিষ নয়নে তাহাদের দেখিত। কে বলিবে, এমন লুকাইয়া দেখিয়া তাহার কি সুখ?

সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসিয়াছে, সরস্বতী ঘরে প্রদীপ দিয়া, ভাইটিকে কোলে করিয়া প্রাঙ্গনে আসিল। কাল রমার বিবাহ, সরস্বতীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ। সে রমাদের বাড়ী যাইতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে "সর-স্বতী কোথায় যাইতেছিস্" বলিয়া, এক মুখ হাসি লইয়া, রমা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

রমাকে দেখিয়া সরস্বতীর চোখে মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল; সে বলিল, "আজ সমস্ত দিন তোমার দেখা পাই নাই কেন?"

রমা উত্তর দিল না।

সরস্বতী আবার তেমনি একটু হাসিয়া বলিল, "কাল তোমার বিবাহ

বলিয়া এস নাই, না? তা, এখন আর কি আমাদের দেখা দিবে, এখন মোহনই তোমার সঙ্গী হইবে।" সরস্বতী আজ আনন্দ উচ্ছ্বাসে অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়া, শেষে আপনিই লজ্জিত হইল।

রমা বলিল, "তুই মোহনকে কেন লজ্জা করিস্ সরস্বতী?"

সরস্বতী বলিল, "কি জানি ভাই, এই খোকা সব জানে। কেমন খোকা ভাই?" বলিয়া ভাইয়ের মুখে একটা চুম খাইল।

রমা বলিল, "তোর সকলই অনাসৃষ্টি! মোহনকে আবার কিসের লজ্জা? আর এরি মধ্যে তোর এত লজ্জা কোথা হ'তে এল?"

সরস্বতী একটু হাসিয়া বলিল, "রমা, রাগ কোর না। আমি কি করিব? আমি মোহনের সম্মুখে যেতে পারি না, কেন তা বলিতে পারি না।"

রমা মৃদু তিরস্কার ছলে বলিল "যাঃ, তবে তুই মোহনকে ভালবাসিস্ না।"

রমার এই কথায় অপরাধিনীর ন্যায় সরস্বতীর প্রফুল্ল মুখ মলিন হইয়া গেল। সে একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "রমা, আমি মোহনকে ভালবাসি। তুমি মোহনকে ভালবাস, আমি কেন বাসিব না? তুমি যখন মোহনের কাছে থাক, তখন আমার তাহা দেখিতে ইচ্ছা করে। তাই দূর হইতে দেখি, কাছে গিয়া তোমাদের কথায় বাধা দিতে ইচ্ছা হয় না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মোহনলাল অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, কিন্তু অভিভাবক কেহ নাই। কাজেই মোহন কুসঙ্গে পড়িয়াছিল। অল্পবয়স্ক বালক অতুল ঐশ্বর্য্য হাতে পাইলে তাহার মস্তিষ্কের স্থিরতা থাকে না, মোহনেরও তাহা হইয়াছিল। বিশেষতঃ পারিষদগণের সদুপদেশে মোহন দিন দিনই অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। তবে তাহার হৃদয় বড় কোমল ছিল, তাই সঙ্গীগণের সৎপরামর্শেও সহজে তাহার হৃদয়ের সে মধুর ভাবটুকু অন্তর্হিত হয় নাই।

তরল ও বিলাসী চিত্তে কখনো ভালবাসা স্থান পাইত না, সে কেবল রমার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়াছিল। যখন রমার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল, তখন কিছু দিনেই তাহার সেই মোহ ফুরাইয়া গেল, তখন রমা তাহার নিকট নিতান্ত বিরক্তির সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল। সরস্বতীর

আরক্ত সুন্দর মুখ, তাহার যৌবনস্বপ্নে জাগিতেছিল, এখন সরস্বতীই কেবল তাহার একমাত্র আরাধনার বস্তু হইল। কি করিলে সরস্বতীকে পাইবে, কেবল তাহাই মোহনের একমাত্র চিন্তা, রমা এখন আর ভাল লাগে না।

রমা মোহনের এ পরিবর্ত্তন, প্রথম প্রথম তেমন ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। তখন তাহার হৃদয় নবানুরাগের আনন্দে বিভোর, কিন্তু রমা ক্রমে ক্রমে যেন স্বামীর কেমন কেমন ভাব দেখিতে লাগিল। প্রথম ভাল করিয়া কিছু বুঝিতে পারিল না।

এখন কি আর মোহন রমাকে তেমন ভালবাসে না? কই, এখন রমা কাছে গেলে তাঁহার মুখে ত আনন্দের চিহ্ন দেখা যায় না; বরং তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার যেন বিরক্ত বিরক্ত ভাবই বোধ হয়, এখন রমা প্রেম-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তেমনি "মোহন!" বলিয়া ডাকিলে কই তিনি ত উত্তর দেন না? রমা মোহনের নিকট কি অপরাধ করিয়াছে?

রমা কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া একদিন মোহনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি কিছু অসুখ করেছে?"

মোহন স্তব্ধ ভাবে বলিল, "না।"

রমা আর কিছু কথা খুঁজিয়া পাইল না। হায়, সেই অফুরান কথা এখন কোথায় গেল?

রমা খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। দেখিল, তাহার কথায় মোহনের মন নাই, তিনি অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতেছেন।

রমা আবার বলিল, "তবে তোমায় এমন বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?"

মোহন সেইভাবে উত্তর দিল, "বিষণ্ণ আবার কোথা?"

রমা আর পারিল না, সে কাতর স্বরে বলিল, "আমার কথায় ভাল করিয়া উত্তর দাও না কেন? আমি কি কিছু দোষ করিয়াছি?"

মোহন অন্যমনস্ক ছিল, বুঝি রমার কথা শুনিতে পাইল না। সে কথার উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল।

রমা কি করিবে? রমার রোদন ছাড়া আর উপায় কি?

ছেলেবেলা হইতে দুঃখ যে কাহাকে বলে, অনাদর কাহাকে বলে, তাহা সে জানিত না। আজ মোহনের অনাদর তাহার সহ্য হইবে কেন? অভিমানিনী বালিকার কখনো দুঃখ, কখনো অভিমান আসিয়া হৃদয় অধিকার করিতে লাগিল।

কিন্তু অভিমান কাহার উপর? মোহনকে কথা জিজ্ঞাসা না করিলে আপনি কোন কথা বলিবে না। কখনো কখনো কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াও উত্তর পাওয়া যায় না। কাজেই রমা আর একদিন অনেক কষ্টে বুক বাঁধিয়া, মোহনকে অনুনয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেন কথা কও না, বল। আমি কি অপরাধ করিয়াছি, বল।"

আজ রমার সৌভাগ্যক্রমে মোহন মিষ্ট স্বরে উত্তর দিল, "তুমি কি অপরাধ করিবে, রমা?"

মোহনের আদরে রমার হৃদয়ের দুঃখতরঙ্গ উথলিয়া উঠিল। অভিমানে হৃদয় পূর্ণ হইল। "তবে তুমি আমার কোন কথার উত্তর দাও না কেন? আমি তোমার কাছে কি করিয়াছি।" বলিয়া রমা কাঁদিয়া ফেলিল।

রমার চোখে জল দেখিয়া মোহনের হৃদয় কোমল হইল, মনে অনুতাপ হইল। সে বলিল, "তোমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহি নাই? সেটা ত আমার বড়ই অন্যায় হইয়াছে। তাহাতে কি তুমি বড় কষ্ট পাইয়াছ, রমা?"

রমা এক মুহূর্ত্তে সব ভুলিয়া গেল, তাহার আর কোন কথা মনে থাকিল না। আনন্দে পূর্ণ হইয়া সে মোহনের সহিত কত কথাই কহিতে লাগিল। মোহনও ক্ষণিক মোহে রমার সেই প্রেমপূর্ণ অনিন্দনীয় মুখ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে ক্রমে ক্রমে ছেলেবেলার কত কথা উঠিল, কতদিনকার কত ছোট ছোট কাহিনী মনে পড়িয়া সুখে লজ্জায় হৃদয় পূর্ণ হইতে লাগিল; শেষে রমা বলিল, "আহা, সরস্বতীকে আমার একবার দেখিতে ইচ্ছা করে, তাহাকে কত দিন দেখি নাই।"

মোহন শুনিয়া আবার অন্যমনস্ক হইল, সরস্বতীর লজ্জারক্ত সুকুমার মুখচ্ছবি আবার তাহার মনে পড়িল।

রমা বলিল, "সরস্বতী আমায় কত ভাল বাসিত, কি শান্ত লাজুক মেয়ে! অমন সুন্দর মুখ আমি কোথাও দেখি নাই। সরস্বতীর বিবাহসম্বন্ধ কি কোথাও হইয়াছে, বলিতে পার?"

মোহন অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমা মোহনের সে ভাব লক্ষ্য না করিয়া বলিল, "সরস্বতীর বিবাহের সময় কি আমোদই হবে। আমি সে সময় সেখানে যাইব। মোহন, এবার বোধ হয় সরস্বতী আর তোমাকে লজ্জা করিবে না। ওকি, তুমি কোথায় যাইতেছ?"

মোহন উত্তর না দিয়া বাহির হইয়া যায় দেখিয়া, রমা মোহনের সঙ্গে সঙ্গে গেল। গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা যাইতেছ ?"

মোহন অপ্রসন্নভাবে বলিল "তুমি ঘরে যাও।"

রমা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হইয়াছে ?" মোহন বলিল, "আমাকে বিরক্ত করিও না।" বলিয়া মোহন চলিয়া গেল।

হায়, রমার সে মাহেন্দ্র মুহূর্ত্তের আনন্দস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সেই সঙ্গে বুঝি অভিমানিনীর হৃদয়ও ভাঙ্গিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ফাল্গুন মাস, সায়াহ্নকাল। নববসন্তসমাগমে বৃক্ষের নবপত্রবিকাশ ও নবমুকুলোদ্গম হইতেছে, মানবের হৃদয়েও বুঝি নব আশা জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতি যেন রূপডালি ফুলে ফলে সাজাইয়া বিশ্বপতির চরণে উপহার দিতেছেন। চারিদিক কাঞ্চন ফুলের বর্ণে আলো হইয়া উঠিয়াছে। পার্ব্বতীয় প্রদেশে বসন্তের শোভা কি সুন্দর, তাহা বঙ্গদেশে থাকিয়া বুঝা যায় না, সেই নবপত্রশোভিত শাল-অরণ্যময় পর্ব্বতশৃঙ্গ, স্থানে স্থানে শত শত বনপুষ্প ফুটিয়া রহিয়াছে। পৃথিবী হাস্যময়ী, পুষ্পভূষণা! এক একটা গাছ সর্ব্বাঙ্গ ফুটন্ত পরগাছায় ঢাকিয়া উচ্চশির তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উপরে সুনীল নির্ম্মল আকাশ, নিম্নে পুষ্পভূষিতা আনন্দময়ী ধরণী!

কাল হোলী উৎসব হইয়া গিয়াছে। রাজপথে এখনও ধুলা দেখা যাইতেছে না, চারিদিকই ফাগে লালে-লাল হইয়াছে। রাজপথ দিয়া রমণীগণ হোলীর গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। রঙ্গিন লালবস্ত্র পরিয়া, ছোট ছোট ছেলে কোলে করিয়া, যুবতীর দল কাতারে কাতারে চলিয়াছে। আজ সকলেরই পরিধান রক্তবস্ত্র, সকলেরই মুখে আনন্দচিহ্ন।

এমন সুখের দিনে একটি যুবতী একাকিনী বসিয়া কি ভাবিতেছে? কপোল বহিয়া ঝর ঝর করিয়া জলবিন্দুগুলি ভূমিতল সিক্ত করিতেছে। সে উৎসবের বস্ত্র পরে নাই, উৎসবে তাহার আনন্দ নাই।

এই কি রমা? এই কি সে চঞ্চল হাস্যময় নয়নের দৃষ্টি? সেই অর্দ্ধস্ফুট মুকুলের এই কি বিকশিত কুসুম? রমাকে আর চেনা যায় না, সে একেবারে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সুন্দর বদন কালিমাময় হইয়াছে।

হায়, রমার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। ফুটোনোন্মুখ বালিকাহৃদয়ে প্রণয়-

মোহকল্পনায় সে যে নন্দনকানন গড়িয়াছিল, কঠোর মতের আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন সে মোহনকে চিনিয়াছে, এত দিন পরে মোহনের প্রকৃত ছবি তাহার চক্ষে পড়িয়াছে। হায়, পৃথিবীর গতিই এই!

এমন সময় মোহনলাল গৃহে প্রবেশ করিল। মোহনের আর সেই পূর্ব্বের মত বিশুষ্ক চিন্তাপূর্ণ মুখচ্ছবি নাই, যেন কোন কার্য্যের সফলতায় তাহা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

মোহন আসিয়া বলিল, "আজ যে উৎসবের বসন পর নাই? রমা, কাঁদিতেছিলে নাকি?"

রমার চোখের জল তখনই শুখাইয়া গেল। পরিষ্কার কণ্ঠে গম্ভীর স্বরে রমা জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহ কবে স্থির হইয়াছে?" এ কথা সকলেই জানিত। মোহনের গোপন করিবার দরকার ছিল না, তথাপি বিস্মিতের মত বলিল, "কাহার বিবাহ, রমা?"

রমা সেইভাবে বলিল, "তোমার বিবাহ?"

মোহন হাসিয়া বলিল, "সে কি? আমার বিবাহ? কাহার সঙ্গে?"

রমা বলিল, "সরস্বতীর সঙ্গে।"

মোহনলাল উত্তর না পাইয়া নীরব হইয়া রহিল।

মোহনলালের ধনের অভাব ছিল না, দেখিতেও তিনি সুরূপ, তিনি ইচ্ছা করিলেই শত শত সুন্দরীকে বিবাহ করিতে পারেন। তিনি যখন বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন, তখন সরস্বতীর দরিদ্র পিতা মাতা মহানন্দে তাহাতে সম্মতি দিলেন। মোহনলালের মত এমন সুপাত্র সরস্বতীর কপালে যে হইবে, তাহা কে ভাবিয়াছিল? তবে যদি সতীনের কথা বল, তা সতীন এমন কাহারই বা না থাকে? বিশেষতঃ, রমার মত সতীন, তাহাতে আপত্তির কোনও কারণই নাই। রমার সহিত যে সরস্বতীর বিবাদ হইবে না, কেহ কাহারও সৌভাগ্যে হিংসা করিবে না, ইহা স্থির নিশ্চয়। অতএব, এমন বিবাহে সম্মতি দিতে সরস্বতীর পিতামাতার তিলার্দ্ধও বিলম্ব হয় নাই। বিবাহের দিনও স্থির হইয়াছিল, কিন্তু সরস্বতী এ পর্য্যন্ত এ কথা কিছু জানিত না।

মোহনলাল একটু চুপ করিয়া শেষে হাসিয়া বলিল, "সরস্বতীর সঙ্গে আমার বিবাহ, এ সংবাদ তোমাকে কে দিল?" রমা উত্তর দিল না, বুঝি উত্তর দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। তখন মোহনলাল আবার বলিল,

"সরস্বতীকে তুমি না বড় ভালবাস? সরস্বতী যদি তোমার সপত্নী হয়, তাহাতে আর তোমার দুঃখ কেন? ভালই ত হইবে, দুজনে চিরকাল একত্রে থাকিবে।"

রমার উত্তর না পাইয়া বলিল, "রমা, তুমি যে আমার কথায় উত্তর দিচ্ছ না? আমার উপর কি রাগ করেছো?" বলিয়া রমার হাত ধরিল।

রমার সর্ব্ব-শরীরে যেন অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। বাল্যের গর্ব্বিত স্বভাব যেন তাহার ফিরিয়া আসিল। সে ধীরে ধীরে হস্ত মুক্ত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "মোহন, তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না;— আমি আর তোমার স্ত্রী নহি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তেমনি মধুর উষা; সেই চান্দেরী নদীতীরের বনশ্রেণী! সেই রমা ও সরস্বতী! কিন্তু হায়, সে দিন কোথা? সে সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে, তাহা আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না।

চারিধারেই সেই শৈশবের স্মৃতিচিহ্ন, নীরব ভাষায় যেন কতদিনের কত কাহিনী বলিতেছে। কিন্তু হায়, সে মধুময় শৈশবকাল কোথা? শৈশবের সে সরল মধুসিক্ত অন্তর কোথায়?

ধীরে ধীরে প্রভাতের বায়ু রমা ও সরস্বতীর অলক কাঁপাইয়া বহিয়া যাইতেছে। রমার মুখ শুষ্ক, গম্ভীর ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম শোভা পাইতেছে। সরস্বতীর মুখ ম্লান, বহু রোদন হেতু চক্ষু রক্তবর্ণ।

তেমনি আধখানা সূর্য্য ধীরে ধীরে পূর্ব্ব গগনে দেখা দিতেছে। এই সোপানে একদিন মোহন বসিয়াছিল, রমা মালা গাঁথিতেছিল। সেও এমনি সময়। এমন সময় সরস্বতী না জানিয়া ঘাটে আসিয়া কি লজ্জাই পাইয়াছিল। রমা সরস্বতী হাসিয়া হাসিয়া কত উপহাস করিতেছিল, সে দিন আর সরস্বতীর লজ্জা রাখিবার স্থান ছিল না।

এই সব স্মৃতিতে আজ রমা ও সরস্বতীর হৃদয় মথিত হইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে রমা অতি মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "সরস্বতি, তুমি মোহনকে বিবাহ করিবে না কেন? মোহন কি অপাত্র? তিনি কি তোমার স্বামী হইবার যোগ্য নন? সরস্বতি, তাহা নয়। তাঁহার গুণ অনেক আছে,

কিন্তু কেবল আমারই 'অদৃষ্টদোষ।" হায় রমা, এখন তোমার গর্ব্ব, অভি-
মান কোথা ?

সরস্বতী রুদ্ধস্বরে বলিল, "রমা, তুমিও কি আমাকে ঐ কথা বলিবে ? তোমার কি মনে নাই, এক বছর আগে তুমি এক দিন বলেছিলে, 'সরস্বতি, তুই মোহনকে ভালবাসিস্ না ;' আমি বলিয়াছিলাম, 'তুমি মোহনকে ভালবাস, তবে আমি কেন বাসিব না ?' এ কথার অর্থ তুমি বুঝিতে পার নাই। আমার আবার বিবাহ কি ? তোমার সুখ দেখিলে আমার সুখ হয়, তোমার কষ্টে আমার বুক ফাটিয়া যায়। লোকে স্বামীকে কেমন ভালবাসে, জানি না ; কিন্তু আমি সূর্য্যদেবকে সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি, আমি তোমাকে যত ভালবাসি, এত আর কাহাকেও নয়।" বলিতে বলিতে সরস্বতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে আর কিছু বলিতে পারিল না। অজস্র অশ্রুধারে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার পর দু'জনে কেহ আর কোন কথা কহিল না। দু'জনে নীরব হইয়া রহিল। দু'জনের নীরব হৃদয় দু'জনে অনুভব করিতে লাগিল। আকাশ অবাক হইয়া দুজনের এই পবিত্র সখিপ্রেমের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

ক্রমে সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে আকাশে উদিত হইলেন। কনক রৌদ্র অরণ্যে, বৃক্ষপত্রে, সলিলে, রমা ও সরস্বতীর মুখে আসিয়া পড়িতে লাগিল। মাঠ দিয়া কৃষকসন্তান গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে ;—

এক নজর তোম্‌কো না দেখ্‌নেসে হাম মর্ যাওয়েঙ্গে
জানি জানি মর্ যাওয়েঙ্গে।
জানি তেরা শির্‌কা কসম
সেবি জহর খাওয়েঙ্গে,
জানি জানি সেবি জহর খাওয়েঙ্গে।

সঙ্গীতের মধুর স্বর আসিয়া রমার শ্রবণে প্রবেশ করিয়া কত তরঙ্গই তুলিতে লাগিল। সরস্বতী নীরব জ্ঞানহীনের মত বসিয়া রহিয়াছে। সহসা রমা বলিল, "সরস্বতী, স্নান করি আয়, বেলা হইয়া গেল।"

সরস্বতী তেমনি অন্যমনস্ক ভাবে যেন কি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া জলের ভিতর একটি একটি করিয়া সোপান অবতরণ করিতে লাগিল, শেষে শেষ সোপানে গিয়া দাঁড়াইল। তখন আকাশের দিকে চাহিয়া বিকৃত কণ্ঠে সরস্বতী বলিল, "ভগবন্ সূর্য্যদেব ! আমার পাপ লইও না। তুমি অন্তর্যামী,

আমার হৃদয়ের ব্যাথা দেখিতে পাইতেছ। ভগবতী চান্দেরী দেবি, তুমি আমাকে আশ্রয় দাও!" বলিয়া সরস্বতী শেষ সোপান হইতে পা বাড়াইল।

রমা দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "সরস্বতী করিস্ কি, করিস্ কি?"

"দিদি, বিবাহে অমত করা আমার সাধ নহে, আমি বিবাহবন্ধনও পরিতে পারিব না, আমাকে ক্ষমা কর!" বলিতে বলিতে সরস্বতী ডুবিয়া গেল। রমাও সেই সঙ্গে চীৎকার করিয়া ডুবিল। অন্য ঘাটে যাহারা ছিল, তাহারা চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া বহুকষ্টে রমাকে তুলিল, কিন্তু সরস্বতীকে অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহ খুঁজিয়া পাইল না।

* * * *

এই ঘটনার পর প্রায় দুই তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। মোহনলাল ইতিমধ্যে এক সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, রমা আর তাঁহার গৃহে যায় নাই। সে নীরবে জীবনভার বহন করিতেছে। কাহারও অসুখ হইলে শুশ্রূষা করিতে যায়, কাহারও বিপদে ছুটিয়া যায়, বৃদ্ধ পিতার সেবা করে, আর অবসর পাইলেই ঘাটে আসিয়া অন্যমনস্ক হইয়া চান্দেরী নদীর অগাধ কৃষ্ণ সলিলের দিকে স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। তাহার কি অমূল্য রত্নই এই নদীতলে হারাইয়া গিয়াছে! কখনো চিন্তামগ্ন হইয়া আপনা-আপনি অস্ফুট স্বরে বলে, "এই নদীতলে, এই শান্ত শীতল শয্যায়! হায়, কবে তাহার কাছে যাইব? কবে এই শীতল সলিলে হৃদয়ের জ্বালা নিবিবে?"

শ্রীমতী সরলাবালা দাসী।

গেটের প্রেমকাহিনী।*

প্রফেসর ব্ল্যাকী লিখিতেছেন,—"গেটে যে স্ত্রীলোক দেখিলেই প্রেমে পড়িতেন, তাহাতে ত আমি দোষ দেখি না। তিনি সুন্দরী রমণীর মাধুর্য্য-শরমুখে আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেন না। আমিও পারি না।" কথাটা পড়িলেই, গ্রেচেন, ক্যাচেনশনকফ্, ফ্রীড্রিকা ব্রাওঁ, লোট্টাবফ্, মিনা হার্জলিব, লিলি সোলেমান—বস্তুতঃ গেটের সকল প্রেমের পরিণামই একরূপ

* ১৮৯২ সালের ১৫ ডিসেম্বরের রিভিউ অফ্ রিভিউস্ হইতে।

সেটা একটা স্বতঃসিদ্ধ—সকলের নামই মনে আসে। কবির চক্ষে একটা নূতন সৌন্দর্য্য বিম্বিত হইলেই, পূর্ব্ব প্রণয়, পূর্ব্ব চিত্রগুলি একে একে অতীতের দূর কুজ্ঝটিকার মধ্যে ডুবিয়া যাইত, ধীরে ধীরে, কাব্যজগতের মধুর ভাবে ডুবিয়া যাইত। লোটাবকের প্রেমকাহিনী গেটে স্বয়ং 'ওয়ারদারে' বলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ব্যারনেস্ ভন্ ষ্টীনের সহিত গেটের প্রেমে এই প্রথার একটু ব্যতিক্রম হইয়াছিল। গেটের অন্য প্রেমে এবং এই প্রেমে একটু প্রভেদ ছিল। ব্যারনেস্ ভন্ ষ্টীন উইমারকোর্টের জনৈক সভ্যের গৃহিণী এবং স্বয়ং দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত ছিলেন। দশ বৎসর কাল যাবৎ তিনি কবির প্রেমগুরু ও—কি বলিব ?—ইংরাজী না বলিলে চলে না,—Father confessor স্বরূপ বিরাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার কুমারী নাম সার্লোটা। সার্লোটা ১৭৪২ খৃঃঅব্দে উইমারে জন্মগ্রহণ করেন, পিতা কোর্টমার্শাল ভন্সার্ড ও মাতা একটি স্কচবংশীয়া। বাল্যাবস্থাটা তাঁহার অতি কড়াক্কড়ে কাটিয়াছিল। একটা খেলনা পুতুলের সাহচর্য্যও ঘটে নাই। ভন্সার্ড জনপ্রাণীর সহিত দেখা করিতেন না, আপনার কাজেই সারাদিন কাটাইতেন; ভন্সার্ডপত্নী অতি ভালমানুষ, নিতান্ত "গোবেচারি" ছিলেন। ১৭৬৪ সালে সার্লোটা ভাবিলেন, উদ্বাহবন্ধনে একটু সুখভোগ করিবেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অবস্থার বড় পরিবর্ত্ত ঘটিল না। সার্লোটা স্বভাবতঃ ভাবময়ী গম্ভীরপ্রকৃতি, কল্পনারথে চড়িয়া জীবনে "কি-এক-কেমন-তর" সুখের লালসায় ভাসমানা; কাজেই কাব্যে ও কারুকার্য্যপথে ছুটিয়া উদ্বেগ কথঞ্চিৎ শমিত করিতে লাগিলেন। গেটেরও তখন ক্ল্যাভিগো, বার্লিচিঞ্জেন ও ওয়ার্দার লিডেন-উদ্ভূত যশোগান উঠিতেছে—সুতরাং যুবক গেটে ও যুবতী সার্লো মিলিয়া গেলেন!

পীড়িত হইয়া ভন্-ষ্টীনপত্নী পায়রমণ্টে বেড়াইতে গিয়া ডাক্তার জিমারমনের সহিত আলাপ করিয়া আসিলেন। উইমারে ফিরিয়াই এক চিঠিতে গেটের কথা শুনিবার ও তাঁহাকে দেখিবার মহা বাসনা প্রকাশ করিয়া ডাক্তারকে লিখিলেন। ডাক্তার বলিলেন—"হায় হায়! তুমি গেটেকে দেখিতে চাহিতেছ; কিন্তু সেই কান্তিকুহকময় যুবক তোমার কাছে বিষম হইয়া দাঁড়াইতে পারে!" তথাপি ডাক্তার গেটেকে ভনষ্টীনপত্নীর কথা বলিলেন—গেটেও সেই রমণীহৃদয়ে প্রকৃতি কিরূপে বিম্বিত হইয়াছে,

দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন; ডাক্তার আবার লিখিলেন,—"কিন্তু মনে রাখিও, তোমার কথা শুনিয়া তিন রাত্রি গেটের ঘুম হয় নাই।" এই-রূপে উভয়েই প্রস্তুত—উভয়েই উৎসুক হইলেন। সার্লোটার তখন ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রম ও প্রকৃতই তিনি সাত ছেলের মা; সংসার করি-তেছেন; কিন্তু সে উদাসহৃদয়ে পিতা, ভর্ত্তা কি ভ্রাতার জন্য টান নাই। গেটের বয়ঃক্রম ২০ বৎসর মাত্র, জগৎ তাঁহার চক্ষে তখনও কিরণময়, আশাময়, উদ্যমময়; আর কি স্ত্রী কি পুরুষ, সকলেরই বাহাবায় তিনি মোহগ্রস্থ। তাঁহাদের প্রথম দেখার একমাত্র বর্ত্তমান অভিজ্ঞান এইটুকু আছে যে, গেটে ও গ্র্যাণ্ড ডিউক একত্র একদা প্রদোষের আলোক আঁধারে ষ্টীন্-গৃহে প্রবেশ করিয়া, অন্যান্য আহূত ব্যক্তিকে দেখিলেন, আর দেখিলেন, ষ্টীন্-শিশু একাদশবর্ষীয় কার্লকে। তাহার পরে আবার কবে দেখা হইয়াছিল জানি না—তবে অতি অল্পদিন পরেই গেটে ষ্টীন্দিগের কোচবর্গ আলয়ে অবস্থিতি করেন, এবং সেই সময়ে সার্লোটার ডেস্কের উপরে "গেটে, ডিসেম্বর, ৬, ১৮৭৫" খোদিত করিয়া-ছিলেন। এই ত মুখবন্ধ। কিন্তু প্রেমটা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল? পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে। তবে গল্প যত দূর, তত দূর হইলে সেটা কখনই সম্ভব হইত না। বস্তুতঃ সার্লোটার গম্ভীর গরিমাময় প্রেমমাহাত্ম্যেই গেটের প্রাণ আবদ্ধ ছিল। চতুরা বুঝিয়াছিল, গেটেকে অঞ্চল প্রান্ত হইতে দূরে রাখিয়া চলিতে পারিলেই তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে। কত সময়ে গেটের চিঠির জবাব আসিত না, গেটের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় রহিত হইত। আবার গেটে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আত্মতিরস্কারে সার্লোটার পদানত হইতেন, আর বন্ধনটা আরো প্রগাঢ় হইয়া আসিত। সার্লোটাও গেটের অদ্ভুত ক্ষমতা, অলৌকিক স্বভাবে হৃদয়ের সখ্য স্থাপন করিয়া মনে করিলেন, তাঁহার কল্পনাজগতের এক অধিপতি পাইয়াছেন। বস্তুতঃ সার্লোটা তাঁহার অন্তর্জগতে অন্যাপেক্ষা অধিকতর প্রতাপে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। সেই সময়ে, কবি সেই মোহময়ী রমণীর চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, সকল সময়ে, সকল কার্য্যে কেবল তাঁহারি ছায়ায় অবস্থান করি-তেন।

এইরূপে দশ বৎসর কাটিল। কিন্তু সার্লোটার বয়স হইয়াছিল—তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে, কবিই হউন আর মহৎই হউন, মানুষের শরীর রক্তমাংসে

গঠিত। কাব্যরস ব্যতীত কবিহৃদয়ে অন্যরসের উদ্রেক, অন্যরসের লালসাও কথন না কথন আসিবেই আসিবে। সেইটুকুই তাঁহার মনে হয় নাই—তাই দশ বৎসর পরে সহসা সব চমক, সব মোহ, সব ইন্দ্রজাল দূর হইয়া গেল, অতীতের অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

কি জানি কেন, এক দিন গেটের মনে ইটালি দেখিবার বাসনা হইল। গ্র্যাণ্ড ডিউক ব্যতীত কাহাকেও না বলিয়া, জনপ্রাণীকে না জানিতে দিয়া, তিনি ইটালি চলিয়া গেলেন। ইটালির মধুর প্রকৃতি, সুন্দর নর নারী, উন্নত শিল্প, অবারিত বিলাসকৌতুকে সার্লোটার বন্ধনমুক্ত কবি ভাসিয়া গেলেন। সার্লোটা তাঁহাকে বন্দী করিয়াও যোজনান্তরে রাখিয়াছিলেন, সে বন্ধন যেন সহসা ছিঁড়িয়া গেল। তাঁহার প্রকৃতির, হৃদয়ের ও কবিত্বের বিকাশ হইল;—আবার যখন উইমারে ফিরিয়া আসিলেন, হায়! তখন সে গেটে তরুণতর হইয়াছেন। হৃদয়জড়িত মহাশোকে সার্লোটা দেখিলেন,—গেটের উপরে তাঁহার আর কোন ক্ষমতা নাই, ভূতপ্রণয়ী আজ দূরান্তরিত বন্ধুমাত্র!

কালিদাস ও সেক্ষপীয়র।

(৮)

শকুন্তলা।

কালিদাসের প্রতিভার বিশ্লেষণে শকুন্তলার বিষয়ে দুই এক কথা না বলিলে, সমালোচনা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। চন্দ্রনাথ বাবুর শকুন্তলাতত্ত্বের পর, এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার আছে, মনে হয় না। তবে তাঁহার লক্ষ্য ও আমার লক্ষ্য এক নহে; সেই জন্য দুই এক কথা বলিব। অবশ্য যেখানে তাঁহার বাক্যের দ্বারা আমার পক্ষ সমর্থিত হইবে, সেখানে তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিতে সঙ্কুচিত হইব না।

শকুন্তলা নাটকের উদ্দেশে মহাকবি তত্ত্বদর্শী গেটে * লিখিয়াছেন,—

বসন্তের ফুল্ল ফুল, শরতের ফলের মিলন,
পুষ্ট তিরপিত আত্মা, মোহে যাহে মানবের মন,

---

* Wouldst thou the new year's blossoms and the fruits of its decline,
And all by which the soul is nutured fiasted fed
Wouldst thou the heaven and earth, in one sole name combine
I name thee, Sakuntala and all, at once is said.—Goethe.

স্বরগের মরতের এক ঠাঁই অপূর্ব্ব মিশ্রণ,
'শকুন্তলা' 'শকুন্তলা' কিবা আর আছে অকথন!

ইহা বড় সহজ প্রশংসার কথা নহে। কাব্যের ইহা অপেক্ষা উচ্চ স্তুতি হইতে পারে না। গেটে সমালোচকশিরোমণি, তাঁহার প্রশংসাবাদ যে যথাযথ, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নাই। কিন্তু এ সকল কথার অর্থ কি? শকুন্তলার এমন কি গুণ আছে—'পুষ্ট তিরপিত আত্মা মোহে যাহে মানবের মন?' এমন কি পদার্থ আছে, যাহা 'স্বরগের মরতের এক ঠাঁই অপূর্ব্ব মিশ্রণ।' আমার বিশ্বাস, ইহার উত্তর এই যে, সৌন্দর্য্যের কবি কালিদাসের সৌন্দর্য্যপ্রতিভার শকুন্তলাই পূর্ণ বিকাশ। তাঁহার কবিতা-নন্দনবনে শকুন্তলাই পারিজাত, তাঁহার কাব্যাকাশে শকুন্তলাই চন্দ্রমা, তাঁহার সৌন্দর্য্যসাগরে শকুন্তলাই মুক্তাফল। বহির্, অন্তর্, বৌদ্ধ ও অধ্যাত্ম, এই চারি জগতের সৌন্দর্য্য, আর সুন্দর ভাব, সুন্দর ভাষা, সুন্দর উপমাকৌশল, সুন্দর চরিত্রসৃষ্টি, সুন্দর শব্দবিন্যাস, সুন্দর ছন্দের ঝঙ্কার; এ সকল সৌন্দর্য্যেরই, এক শকুন্তলায় সমাবেশ দেখিতে পাই। শকুন্তলা যেন সৌন্দর্য্য ছানিয়া রচিত, সৌন্দর্য্য-উপাদানে গঠিত, সৌন্দর্য্যময়!

সেই প্রবাতসুভগ, লতাপ্রতানশোভী মালিনীতীর স্মরণ করুন, যাহার সৈকতে হংসমিথুন নিশ্চল হইয়া রয়, যাহার অদূরে হিমালয়শিখর শোভিতে থাকে, যাহার তটতরুমূলে কৃষ্ণসার মৃগীর সহিত ক্রীড়ারসে মগ্ন হয়, যেখানে লতাকুঞ্জে কণবাহী শীতল পবন ফুলমধুসম্পর্কে সুরভিত হইয়া বহিয়া যায়,* সেই শান্তরসাস্পদ কণ্বাশ্রম স্মরণ করুন, যেখানে কোটরনিবাসী শুকমুখচ্যুত নীবারকণা তরুতলে প্রক্ষিপ্ত রহে, যেখানে ইঙ্গুদীতৈলাক্ত শিলাখণ্ডনিচয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহে; যেখানে অত্রস্ত মৃগকুল নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করে; যেখানে বিন্দু বিন্দু বল্কলবারি ঝরিয়া পল্বলপথ রেখাঙ্কিত করে; যেখানে পবনচালিত সরোজল তরুমূল প্রক্ষালন করে, যেখানে অরুণকিশলয়রাগ যজ্ঞধূমসংস্পর্শে বিমলিন হয়, যেখানে বৃক্ষশাখায় মুনিজনের জীর্ণ বল্কল বিলম্বিত রহে। সেই 'গ্রীবাভঙ্গাভিরাম' হরিণশিশু

---

* উইলসন সাহেব যথার্থ বলিয়াছেন, প্রাকৃতিক পদার্থের প্রতি অনুরাগ হিন্দু কবির কাব্যের একটি অতি সুন্দর লক্ষণ। এ অনুরাগ প্রায়ই ভাষায় প্রকটিত হয়। কিন্তু শকুন্তলা নাটকই ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পিতার আশ্রম হইতে বিদায়কালে শকুন্তলা যত্নপালিত তরুলতার নিকট, যত্নলালিত মৃগশিশুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছে, এ দৃশ্য অতীব হৃদয়গ্রাহী।

স্মরণ করুন, যাহার বিবৃত মুখ হইতে শষ্পাঙ্কুর ঝরিয়া পড়ে, শরাঘাতভয়ে দীর্ঘায়ত দেহ আকুঞ্চিত হয়, দ্রুত উল্লম্ফনে যেন মাটি ছাড়িয়া শূন্যমার্গে ধাবমান হয়। প্রচণ্ডরবিকিরণসহিষ্ণু, 'সদা ধনুঃ আস্ফালনে বিশাল-উরস,' গিরিচর করীর ন্যায় দীর্ঘায়ত দুষ্মন্তের সেই পুরুষকারপূর্ণ বীরমূর্ত্তি স্মরণ করুন। যাহার অধর নবকিশলয়ের অরুণরাগে লোহিত, বাহুদ্বয় পেলব শাখাসৌকুমার্য্যে সুকোমল, দেহযষ্টি মনোজ্ঞ যৌবনকুসুমভারে সজ্জিত, শকুন্তলার সেই অনাঘ্রাত পুষ্পের মত, নখাঘাত-অবিক্ষত কিশলয়ের মত, অপরিহিত রত্নের মত, অনাস্বাদিত মধুরসের মত মধুরতম রূপশোভা স্মরণ করুন। বহির্জগতের আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যক নাই।

অন্তর্জগতে—অপরিচিত ঔরস পুত্রের অঙ্গ সংস্পর্শে দুষ্মন্ত অমৃত রসে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই বাৎসল্য স্মরণ করুন, দানবজয়ী সুরসুন্দরীর স্তুতিগীতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া আপনার ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই অবিকত্থনা স্মরণ করুন; বিধুর বিরহশয়নে বিপন্নের আর্ত্তস্বর শুনিয়াই বীরদম্ভে ধনুঃ আস্ফালন করিয়াছিলেন, সেই উৎসাহ স্মরণ করুন। শকুন্তলা চরণে কুশাঙ্কুর বিঁধিয়াছে বলিয়া, তরুশাখায় বল্কল বাধিয়াছে বলিয়া এক বার দুষ্মন্তের দিকে ফিরিয়াছিলেন, সেই প্রেমছল স্মরণ করুন; বিরহিণী পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া, তরু-লতা-সখী স্বজন পৃথিবী ভুলিয়া, ক্রোধমূর্ত্তি দুর্ব্বাসার কঠোর অভিশাপ না শুনিয়া, চিত্রার্পিতার ন্যায় নিষ্পন্দভাবে দুষ্মন্তে লীন হইয়াছিলেন, সে প্রেমলীনতা স্মরণ করুন; স্নেহময়ী বনবালা চিরতরে তপোবন ছাড়িয়া যাইতে স্নেহাসারে বর্দ্ধিত তরুলতা শাখাবাহু প্রসারিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিল, বনবাসসুহৃৎ বিহঙ্গকুল কোকিল কুহরণে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল, হরিণী দর্ভকবল ভুলিয়া অনিমেষে চাহিয়াছিল, ময়ূরী নর্ত্তন ছাড়িয়া উৎসবহীন হইয়াছিল, সযত্নরক্ষিত মৃগশিশু অঞ্চল টানিয়া গমনের প্রতিরোধ করিয়াছিল, হৃদয়ময়ী বিগলিত হৃদয়ে সখীর গলা জড়াইয়া আকুল প্রাণে কতই কাঁদিয়াছিল, মলয়তরুবিগলিতা চন্দনলতার ন্যায় কতই কাতরে স্নেহময় পিতার পদমূলে লুণ্ঠিতা হইয়াছিল, আশ্রমপালিতা বিদায়ের কালে 'কাতর হৃদয়ের শেষ নিশ্বাসের মত, সংসারত্যাগীর শেষ মায়ার ক্রন্দনের মত' কি করুণ কোমলতম শেষ দৃষ্টিতে আশ্রমের পানে চাহিয়াছিল, —শকুন্তলার সেই বিদায়বিষাদ স্মরণ করুন।*

* আমি অন্যত্র লিখিয়াছি, কালিদাস দেবতুলিত কণ্বের শান্ত আশ্রমে এই বিষাদচিত্র

বৌদ্ধজগতে—দুষ্মন্তের সেই সরস দার্শনিকতা স্মরণ করুন—"রম্য রূপ দেখিয়া মধুর শব্দ শুনিয়া সুখী জীবও যে উৎকণ্ঠিত হয়, ইহার কারণ সংস্কার-রূপে বদ্ধমূল জন্মান্তর প্রণয়ের অজানা পূর্ব্বস্মৃতি।" সেই কশ্যপ অদিতির বিবরণ স্মরণ করুন—"যাঁহাদের হইতে তেজোময় দ্বাদশসূর্য্যমণ্ডল উদ্ভূত হইয়াছে, যাঁহারা ত্রিজগতের ঈশ্বর যজ্ঞেশ্বর ইন্দ্রের জনকজননী, যাঁহাদের অবলম্বনে পরমপুরুষ অনাদি নারায়ণ অবতার হইয়াছিলেন।" আর প্রস্তাবনায় সেই অপূর্ব্ব নান্দী স্মরণ করুন—"অষ্টমূর্ত্তি মহাদেব সকলের মঙ্গল বিধান করুন; বারি, যাহা স্রষ্টার আদি সৃষ্টি; বহ্নি, যাহা বিধিহুত হব্যের বাহক; হোতা, যজ্ঞকারী; চন্দ্র সূর্য্য, যাহারা কালনিরূপক; আকাশ, যাহা শব্দান্বিত, বিশ্বব্যাপী; পৃথিবী, যাহা ভূতধাত্রী, বায়ু, যাহা প্রাণীর প্রাণভূত; এই অষ্টমূর্ত্তি মহাদেব সকলের মঙ্গলবিধান করুন।

অধ্যাত্মজগতে—দুষ্মন্তের সেই চিত্তসংযম স্মরণ করুন। দুষ্মন্ত শকুন্তলার সাক্ষাৎ হইল; উভয়েই উভয়কে আত্মসমর্পণ করিলেন। কিন্তু মিলন হইল না; শকুন্তলা বিরহজ্বালায় জ্বলিয়া নলিনীপত্রশয্যায় শয়ন করিলেন; দুষ্মন্ত চন্দ্রকিরণে বিদগ্ধ হইয়া অনলপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। অনেক যাতনার পর মিলন হইল, কিন্তু মিলনের সুখাস্বাদ না ঘটিতেই গুরুজনের আগমনে শকুন্তলা স্থানান্তরে গেলেন। দুষ্মন্ত হতাশ হইয়া, তাঁহার পদ্মমুখ, রক্তাধর ও চটুল নয়নের কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার তখন চিত্তের অবস্থা কিরূপ? সহসা রাক্ষসত্রস্ত তাপসের আর্ত্তস্বর শুনিলেন; বিরহ বিষাদ বিকল্প কোথায় লুকাইল। দুষ্মন্ত বীরদন্তে ভয়ার্ত্তের ত্রাণে অগ্রসর হইলেন।

আবার শকুন্তলাপ্রত্যাখ্যানে দুষ্মন্তের সেই ধর্ম্মানুরাগ * স্মরণ করুন।

আঁকিয়াছেন। জগতের কাব্যে ইহার তুলনা নাই। তিল তিল করিয়া বিষাদ সঞ্চিত হইয়া হৃদয় ভাসাইয়া নয়নে বহিয়া পড়ে। * * সেই হর্ষবিষাদময়ী শান্তিপ্রতিমা শকুন্তলাকে মনে পড়ে, সেই লতাভগিনী, সেই পাদপসখী, সেই হরিণীসোদরা, সেই সখী-অন্তপ্রাণা শকুন্তলাকে মনে পড়ে। চন্দ্রনাথ বাবু যথার্থ লিখিয়াছেন, "যে কৌশলে মহাকবি এই চমৎকার বিদায়দৃশ্যের করুণরসোদ্দীপকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা মহাকবি সেক্ষপীয়র প্রদর্শিত এণ্টনির বক্তৃতারচনাকৌশল অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।"

* এ কথা চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার শকুন্তলাতত্ত্বে অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন। আমি এ অংশে তাঁহার অনুসরণ করিতেছি মাত্র।

আশ্রম হইতে ফিরিয়া দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। শকুন্তলা শার্ঙ্গরবের সহিত আপন অতুলিত রূপরাশি লইয়া দুষ্মন্তের সভায় উপস্থিত হইল। এ সেই রূপরাশি, যাহা দেখিয়া কিছু দিন পূর্ব্বে দুষ্মন্ত উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, যাহাকে তিনি অনাঘ্রাত পুষ্প, নবীন কিশলয় ইত্যাদির সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। এখনও সে রূপের প্রভা কিছুমাত্র ক্ষীণ হয় নাই। তাঁহার মনে হইল, যেন সভাস্থলে ফুল্ল প্রবাল ফুটিয়া উঠিল। এই স্ত্রীরত্ন অযাচিত হইয়া তাঁহার গলায় শোভিতে চাহিল; কিন্তু তিনি তাহা ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিলেন। 'তখন কোমলতাময়ী শকুন্তলা চরণদলিত ফণিনীর ন্যায় বিষময় বাক্যে তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিলেন'—শকুন্তলা, যাঁহার প্রতিবাক্যে তাঁহার কর্ণে পীযূষধারা বর্ষিত। 'তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ঋষিকুমার শার্ঙ্গরব তাঁহার উপর শাপাগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিলেন'—ঋষিকুমার, যাঁহার হৃদয়ে দাহিকাশক্তি নিহিত আছে, সূর্য্যকান্তে যেমন গূঢ় অগ্নি নিহিত থাকে। কিন্তু দুষ্মন্ত তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তাঁহার ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ রহিল। 'তিনি ধর্ম্মবীর।' 'যেখানে ধর্ম্মের বিপর্য্যয়, সেখানে ভুবনমোহিনী রমণীও তুচ্ছ, অগ্নিপ্রভ মহাঋষিও তুচ্ছ! কি ধর্ম্মানুরাগ! কি চিত্তসংযম!'

শকুন্তলার ভাব সুন্দর, ভাষা সুন্দর। কালিদাসের ভাব সর্ব্বত্রই মধুর, শান্ত, করুণ, অনুৎকট, অকঠোর, অতীব্র; কিন্তু শকুন্তলায় তাহা আরও মধুর, আরও শান্ত, আরও করুণ, আরও অনুৎকট, আরও অকঠোর, আরও অতীব্র। এইরূপ, ভাষা সর্ব্বত্রই সুকুমার, কোমল, গম্ভীর, অনশ্লীল, অগ্রাম্য, অবিকট; কিন্তু শকুন্তলায় তাহা আরও সুকুমার, আরও কোমল, আরও গম্ভীর, আরও অনশ্লীল, আরও অগ্রাম্য, আরও অবিকট। পরিণত গোলাপের দলে ও মুকুলের পাপ্‌ড়ীতে যে অন্তর, কালিদাসের অন্যান্য কাব্যের ভাব ও ভাষা এবং শকুন্তলার ভাব ও ভাষায় সেই প্রভেদ।

শকুন্তলা উপমাসৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ। সুকুমারী শকুন্তলার বৃক্ষে জলসেচন, নীলোৎপলপত্রে শমীলতার ছেদনের ন্যায় সর্ব্বথা অসঙ্গত। শৈবালবেষ্টিত কমলের ন্যায়, অঙ্কলাঞ্ছিত শশাঙ্কের ন্যায়, বল্কলবিশোভিনী শকুন্তলার রূপ। অনঙ্গতাপতাপিতা শকুন্তলা উষ্ণপবনস্পৃষ্ট মাধবীলতার ন্যায় শ্লথশোভাময়ী।

রূপলুব্ধ রাজার ধর্ম্মভয়ে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান, প্রভাতে ভ্রমরের শিশির-সিক্ত কুন্দপুষ্পে মধুপানবিরতির মত।

সজীব শকুন্তলাকে পরিত্যাগ করিয়া দুষ্মন্তের তাহার চিত্রপ্রতিকৃতিতে অনুরাগ, পূর্ণতোয়া স্রোতস্বতী ছাড়িয়া মরীচিকার অনুসরণের ন্যায়।

নবমালিকালতা যেরূপ অনুরূপ চূতবৃক্ষ স্বয়ং আশ্রয় করে, শকুন্তলা সেই-রূপ অনুরূপ পতি দুষ্মন্তে স্বয়ম্বরা হইলেন।

শকুন্তলার শব্দবিন্যাসের উৎকর্ষ অতি সুন্দর। এ কৌশল কালিদাসের সকল কাব্যেই অপূর্ব্ব, এখানে আরও অপূর্ব্ব।

(১) চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং
রহস্যাখ্যায়ীব স্বনসি মৃদু কর্ণান্তিকচরঃ॥

(২) অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈঃ
অনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্॥

(৩) উগ্গলিঅদব্ভকবলা মআ, পরিচ্চত্তনচ্চনা মোরা।
ওসরিঅপণ্ডুপত্তা মুয়ন্তি অস্সূ বিঅ লদাও॥

(৪) রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভিঃ
ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজোমৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ॥

(১) হে ভ্রমর! অপাঙ্গে চঞ্চল চকিত নয়ন বার বার স্পর্শ করিতেছ, শ্রুতিমূলে কি যেন রহস্যকথা চুপে চুপে বলিতেছ।

(২) অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায়, নখাঘাত অবিক্ষত কিশলয়ের ন্যায়, অপ-রিহিত রত্নের ন্যায়, অনাস্বাদিত মধুরসের ন্যায় মনোহর রূপ।

(৩) মৃগ দর্ভকবল পরিত্যাগ করিয়াছে, ময়ূরী নর্ত্তন ভুলিয়া গিয়াছে, লতা পাণ্ডুপত্রচ্ছলে অশ্রু মোচন করিতেছে।

(৪) পথি মাঝে মাঝে সর মনোহর
বিকচ নলিনে ধরিবে শোভা।
ছায়াতরুকুল নিবারি আতপ
বিরচিবে বীথি মানসলোভা॥
ভূমে পদতলে হবে ধূলিরাশি
কোমল সরোজ পরাগনিভ।
মৃদুল মৃদুল মেদুর অনিলে
করিবে কুশল গমন শুভ॥

(এক বন্ধুর অপ্রকাশিত অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত।)

শকুন্তলার ছন্দের ঝঙ্কার অতি অপূর্ব্ব। কালিদাসে সর্ব্বত্রই এই ঝঙ্কার মধুর, গম্ভীর, সুন্দর; কিন্তু শকুন্তলায় যেন ইহা আরও মধুর, আরও গম্ভীর, আরও সুন্দর। দেবর্ষি নারদের যে বীণাধ্বনি শুনা যায়, যাহাতে ত্রিলোক মোহিত হইত, বুঝি সে বীণা এই তানে বাজিত। রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণের যে বাঁশরীরব, যাহাতে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া কুলবধূ কুল ত্যজিয়া আসিত, যাহা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া প্রাণ আকুলিত করিত, বোধ হয়, সে বাঁশী এই সুরে বাঁধা ছিল।

পাতুং ন ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।
সা নিন্দতী স্বানি ভাগ্যানি বালা।
গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্ত্তি॥
পাদাকৃষ্টব্রততিবলয়াসঙ্গসঞ্জাতপাশঃ॥
ইসীসি চুম্বিআইং ভমরেহিং সুউমারকেসরসিহাইং।
ওদংসঅন্তি দঅমানা পমদাও সিরীসকুসুমাইং॥

শকুন্তলার চরিত্রসৃষ্টিও অতি সুন্দর, সুন্দরের সুন্দর। সামান্য কঞ্চুকী হইতে নায়ক দুষ্মন্ত পর্য্যন্ত, সামান্যা তপস্বিনী হইতে নায়িকা শকুন্তলা পর্য্যন্ত, সকল চরিত্রই সুন্দর, কেহ অসুন্দর নয়। দুষ্মন্ত, সর্ব্বদমন, কণ্ব, সেনাপতি, কঞ্চুকী বিদূষক, ঋষিকুমার, মাতলি প্রভৃতি পুরুষচিত্র, শকুন্তলা অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, গোতমী, সানুমতী প্রভৃতি স্ত্রীচিত্র, সকলই সৌন্দর্য্য—তুলিতে আঁকা; এ কবির চিত্রপটে অসুন্দরের স্থান কুলায় না। এই চিত্রপটের তিনটি চিত্রের আমরা একটু আলোচনা করিব—কণ্ব, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার।

মহর্ষি কণ্ব মহামহিমান্বিত মহাপুরুষের চিত্র। তিনি ত্রিকালদর্শী, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান তাঁহার জ্ঞাননেত্রে প্রতিভাত হয়। তিনি দিব্যশক্তিমান্; যজ্ঞবিঘ্নকারী দুরন্ত রাক্ষসকুল তাঁহার প্রভাবে ভয়ত্রস্ত হয়, অশরীরিণী ছন্দোময়ী আকাশবাণী তাঁহার অগ্নিগৃহে উচ্চারিত হয়, দিব্যাভরণ ও ক্ষৌমবসন তাঁহার দুহিতার জন্য তরুশাখায় আপনি প্রসূত হয়। তিনি শান্ত, দান্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগীপুরুষ। তিনি বিরাগী, কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্যে শুষ্ক কঠোরতা নাই। তিনি সহৃদয়, জীব ও জড়জগতে সর্ব্বত্র তাঁহার চিত্তের সংপ্রসারণ। তরুলতা তাঁহার যত্নের বস্তু, পশু পক্ষী তাঁহার স্নেহের পাত্র; নর নারী তাঁহার ভালবাসার পদার্থ। তিনি সংসারত্যাগী, কিন্তু শকুন্তলার বিদায়কালে তাঁহার দৃষ্টি অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। "তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গাভি-

মুখে কিন্তু এই ক্ষুদ্র পৃথিবীও তাঁহার স্বর্গের অন্তর্ভূত। তাঁহার চিন্তা ব্রহ্ম-সম্বন্ধ কিন্তু জগতের সকলেই তাঁহার ব্রহ্মের অন্তর্গত। তিনি স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য; তিনি ইহকাল এবং পরকাল; তিনি পুরুষ এবং প্রকৃতি; তিনি মোহ এবং বৈরাগ্য; তিনি চিন্তা এবং হৃদয়; তিনি শান্তি এবং তেজ।"* চিন্তা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। চিন্তা তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না। কল্পনা তাঁহাকে কল্পনায় আনিতে পারে না। বুদ্ধি তাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না। তিনি প্রাচীন ভারতের উন্নতির অভ্রভেদী শিখরের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ধীর স্থির গম্ভীর মূর্ত্তিতে বিরাজিত রহিয়াছেন।

দুষ্মন্ত আদর্শ হিন্দু নরপতির বিচিত্র উজ্জ্বল চিত্র। তাঁহার দেহ প্রচণ্ড-রবিকিরণসহিষ্ণু, বিশাল উরস, গিরিবর করীর ন্যায় দীর্ঘায়ত। তিনি বিলাসবিদ্বেষী, ব্যায়ামনিষ্ঠ, মৃগয়াপটু যুবাপুরুষ। তাঁহার বীরত্ব ও বাহুবল ভুবনবিখ্যাত। বিঘ্নকারী প্রচণ্ড রাক্ষসকুল তাঁহার কোদণ্ডটঙ্কারে ভয়-ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করে; ত্রিদিবকণ্টক বা দানবকুল তাঁহার নিশিত শরে ছিন্ন ভিন্ন হয়। তিনি ভয়ত্রাতা, মর্ত্ত্যে মুনিজন বিঘ্নবিনাশের জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হন; স্বর্গে সুরেশ্বর দৈত্যদমনের জন্য তাঁহাকে সাদরাহ্বান করেন। অথচ তিনি দম্ভহীন, বিনীত, বিকত্থনারহিত; মাতলির শিষ্টাচারে, সুরনারীর স্তুতিগীতে সম্বর্দ্ধিত হইয়া আপনার ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি রাজতন্ত্রপারগ, আদর্শ রাজা; শোকে দুঃখে অবসাদে তাঁহার রাজকার্য্যের বিরাম নাই; ভ্রাম্যমাণ রবির, সদাবহ বায়ুর যেমন বিরাম নাই। পিতা-পুত্র-বন্ধু-বিরহিত বিধুর প্রজার তিনিই পিতা-পুত্র-বন্ধুস্থানীয়। তিনি চিত্তবীর, চিত্তসংযম তাঁহার চিরাভ্যস্ত, শকুন্তলাবিরহে হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছে, অথচ বদনে তাহার চিহ্নমাত্র নাই; শকুন্তলার প্রত্যাখ্যানে প্রাণ অনুতাপজর্জ্জর, চিত্ত বিরাগবিক্ষিপ্ত, অথচ দেবতার বিপদে ধনু আস্ফালিয়া দৈত্যদলনে কণিকামাত্র বিক্রমহানি নাই। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ; প্রিয়াবিরহে চন্দ্রকিরণে বিদগ্ধ হইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন, হতাশ হইয়া প্রিয়ার পদ্মমুখ, রক্তাধর, চটুল নয়নের কথা ভাবিতেছেন, সহসা বিপন্নের আর্ত্তস্বর শুনিলেন; বিরহবিষাদবিকল্প লুকাইয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রবল হইল। বীরদম্ভে ভয়ার্ত্তের ত্রাণে অগ্রসর হইলেন।

তিনি ধর্ম্মবীর; শকুন্তলার প্রেম আস্বাদনের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল,

---

* চন্দ্রনাথ বাবুর শকুন্তলাতত্ত্ব; ১০২ পৃষ্ঠা।

তিনি বিবেকজ্ঞানে তাহাকে সংযত করিলেন; ভুবনমোহিনী রূপসী রূপের ডালি লইয়া, তাঁহাকে উপহার দিতে প্রস্তুত, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। ঋষি তপস্বীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা আরও প্রগাঢ়তর। তাঁহার বিশ্বাস, সকল ধনের ক্ষয় আছে, কেবল ধর্ম্ম-ধনের ক্ষয় নাই।

তিনি প্রণয়ী, তাঁহার প্রেম গভীর, উচ্ছল, হৃদয়ব্যাপী। শকুন্তলাকে হারাইয়া, চিন্তা জাগরণে তাঁহার শরীর কৃশ হইল, উষ্ণ বিরহনিশ্বাসে অধর শুষ্ক হইল, বর্ষাজলতাড়িত তটভূমির মত মিলনাশা একে একে অন্তর্হিত হইল, বেশরচনার আর স্পৃহা রহিল না, জগতের সুখে আর শান্তি রহিল না, স্বহস্তচিত্রিত প্রিয়ার চিত্রপ্রতিকৃতি জীবনের অবলম্বন হইয়া উঠিল। চন্দ্রনাথ বাবু যথার্থ বলিয়াছেন, বাস্তবিকই দুষ্মন্তচরিত্রের প্রশস্ত ভিত্তি অনন্ত বিস্তার এবং অনন্ত গম্ভীরতা।

আর শকুন্তলা—বনবালা স্বভাবসরলা কুসুম-কোমলা শকুন্তলা? শকুন্তলা মধুরতাময়ী, সৌকুমার্য্যঘনা। "তাঁহার বদন সুকুমার, অধর ভ্রূযুগ ললাট সুকুমার, সুকুমার কপোল, সুকুমার কেশ। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গীতে সৌকুমার্য্য; বাহুতে, বাহুর প্রক্ষেপে সৌকুমার্য্য; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই সৌকুমার্য্য; সুকুমার চরণ, চরণবিন্যাস সুকুমার। বচন সুকুমার; গমন সুকুমার, কটাক্ষ সুকুমার।" * তাঁহার হৃদয় সুকুমার, ভাব সুকুমার, উচ্ছ্বাস সুকুমার, আবেগ সুকুমার, বিরহ সুকুমার, মিলন সুকুমার, পূর্ব্বরাগ সুকুমার, প্রণয় সুকুমার, অভিমান সুকুমার, ব্রীড়া সুকুমার। শকুন্তলা সৌকুমার্য্যঘনা। তাঁহার প্রেম ইয়ত্তাহীন, যে প্রেমের বশে শ্রমকাতরা কোমলাঙ্গী প্রখর আতপতাপে প্রতপ্ত হইয়াও অতি দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া ক্লিষ্ট হয়েন না; বিরহিণী পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া, চিত্রার্পিতার ন্যায় দুষ্মন্তে লীন হইয়া, সংহারমূর্ত্তি দুর্ব্বাসার কঠোর অভিশাপ শুনিতে পান না, বিবাসিনী দীর্ঘ প্রবাসের পর প্রত্যাখ্যানকারী পতির সন্দর্শন লাভ করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে পারেন না। তাঁহার স্নেহ সীমাহীন; পিতা প্রিয়সখী, বন্ধু, স্বজন ব্যাপিয়া পশু পক্ষীতে সংক্রামিত হয়, তরুলতায় সংপ্রসারিত হয়; তাই কোকিল, কুহরণে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করে, মৃগশিশু অঞ্চল টানিয়া তাঁহার গমনের প্রতিরোধ করে, তাই তরুলতায় জলসেচন

† বঙ্কিম বাবু মনোরমার ঐরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

না করিলে তাঁহার জলপানে প্রবৃত্তি হয় না; তরুলতার পল্লব কুসুম ছিঁড়িয়া অঙ্গপ্রসাধন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয় না; তাই নবমালিকার সহিত চূত-তরুর বিবাহ দিয়া তিনি উৎফুল্লা হয়েন। শকুন্তলা ভাবময়ী, হৃদয়ময়ী। তাঁহার 'হৃদয় এক আশ্চর্য্য পদার্থ।* সে হৃদয়ের ভালবাসা অগাধ, স্নেহ অগাধ, বিশ্বাস অগাধ, সম্ভ্রমকারিতা অপরিমেয়, কোমলতা অনির্বচনীয়, সরলতা চমৎকারিণী।" এমন কোমল মধুর সুকুমার সুন্দর চরিত্র কাব্য জগতে † আর নাই। এখন বোধ হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, কালিদাস সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী সৌন্দর্য্যদৃষ্টি। কথাটা বোধ হয় আর কল্পনাসিদ্ধান্ত নাই, স্থিরসিদ্ধান্ত দাঁড়াইয়াছে। কারণ, ইহার সহিত সকল ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, সকল বিষয়ের অবিবাদ হইয়াছে। কারণ আমরা দেখিয়াছি যে, কালিদাসের সাক্ষাতে সমগ্র সৌন্দর্য্য জগৎ অবভাত হয়; বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ, বৌদ্ধজগৎ ও অধ্যাত্মজগৎ, আপন আপন আবরণ বসন ফেলিয়া দিয়া, আপনাদের নগ্ন সৌন্দর্য্যস্বরূপ প্রকটিত করিয়া শোভিত হয়; কারণ, আমরা দেখিয়াছি, সুন্দর শত মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার কাব্য আলো করিয়া আছে, যাহা অসুন্দর অমধুর অসুকুমার, তাঁহার কাব্যে প্রবেশ লাভ করিতে পায় না; কারণ, আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার ভাব, ভাষা উপমা-কৌশল, চরিত্রসৃষ্টি, শব্দবিন্যাস, ছন্দের ঝঙ্কার, সকলই সুন্দর সৌন্দর্য্যময়। অতএব তিনি সৌন্দর্য্যের কবি। তাঁহার কবিতা কাব্যজগতের তিলোত্তমা; দেবশিল্পী যেমন সৌন্দর্য্যজগতের তিল তিল বাছিয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি সৌন্দর্য্যজগৎ চুনিয়া চুনিয়া তাঁহার কবিতা-তিলোত্তমা রচনা করিয়াছেন; তিনি অমানুষ, তিনি দেবশিল্পী।

শ্রদ্ধাস্পদ সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিম বাবু কালিদাসের কাব্যের নন্দনকাননের সহিত তুলনা করিয়াছেন; সেও এই মর্ম্মের কথা। তিনি লিখিয়াছেন—"যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দনকাননে অপর্য্যাপ্ত স্তূপীকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়।" হইবারই কথা; কালিদাস যে সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহার যে প্রতিভার মূলতত্ত্ব অমানুষী সৌন্দর্য্যদৃষ্টি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

* শকুন্তলাতত্ত্ব—৯৮ পৃঃ।

† আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, অন্তর্জগতের বিষয় হৃদয়ের ভাব; এখানে দেখিলাম, একটি চরিত্র হৃদয়ময় ভাবঘন, অর্থাৎ অন্তর্জগতের সৌন্দর্য্য ঘনীভূত হইয়া এ চরিত্র গঠিত। এইরূপ রামচরিত্র অধ্যাত্মতাময়, আধ্যাত্মিকতাঘন, অর্থাৎ অধ্যাত্মজগতের সৌন্দর্য্য ঘনীভূত হইয়া গঠিত।

আরঙ্গীবের রাজনীতি।

(শেষ প্রস্তাব)

মুরাদ কারাগারে; সুজা বাঙ্গলার জঙ্গলে জঙ্গলে কয়েক জন বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া পলায়নপরায়ণ; দারা লাহোর ত্যাগ করিয়া সিন্ধুদেশে পলাইয়াছেন; আরঙ্গীব লাহোরের সুপ্রসিদ্ধ সালিমার উদ্যানে মহাসমারোহে সিংহাসনাভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার নির্জ্জন কুটীরবাস, মক্কায় নৈরাশ্যময় জীবন, সংসারে বীতস্পৃহা, কোরাণে অত্যানুরক্তি, এই অভিষেকের কোলাহলের মধ্যে কোথায় ডুবিয়া রহিল, কে বলিতে পারে?

সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার পর,পদ সম্পূর্ণরূপে নিষ্কণ্টক করিবার জন্য, আরঙ্গীব পুনরায় দারার অনুসন্ধানে গুজরাটে গিয়া পৌঁছিলেন। দারা গুজরাটে যশোবন্ত সিংহের অনুগ্রহভাজন হইয়া কিয়ৎপরিমাণে বলসঞ্চয় করিয়াছিলেন। কিন্তু আরঙ্গীব এক কৌশলপূর্ণ পত্রে অতি সহজেই যশোবন্তকে করায়ত্ত করিয়া লইলেন। দারা আরঙ্গীবের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেও, পুনরায় বন্দী হইয়া দিল্লীতে নীত হইলেন। কারা-[illegible]রে তাঁহার সিংহাসন স্থাপিত হইল। দারা বন্দীভাবে কারাগারে অবস্থান [illegible]রিতেছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ শিশু পুত্র তাঁহার একমাত্র সঙ্গী। আরঙ্গীব [illegible]াহাকেও কাড়িয়া লইয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে আবদ্ধ করিলেন। তখন দারা [illegible]ঝিলেন, তাঁহার আর জীবনের আশা নাই। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত [illegible]ইলেন। আরঙ্গীব তাঁহাকে "বিধর্ম্মী" বলিতেন। বস্তুতঃ তিনি তাহাই [illegible]ছলেন; তাঁহার মত অনে[illegible]টা খ্রীষ্টানী। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া, জীবনের [illegible]শেষ কয় দিন তিনি ফাদার বুশী নামক ফ্লেমিশাদেশীয় এক পাদরীর সহিত [illegible]থা করিবার অনুমতি আরঙ্গীবের নিকট চাহিলেন। তাহাও অগ্রাহ্য [illegible]ইল। তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মহম্মদ আমায় [illegible]ষ্ট করিয়াছে—খ্রীষ্টধর্ম্ম আমায় রক্ষা করিবে।"

দারার দিন শেষ হইয়া আসিল। আরঙ্গীব তাঁহার বধের দিন স্থির [illegible]করিলেন। হতভাগ্য যুবরাজ জ্যেষ্ঠ ও সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াও অপ-[illegible]াধীর ন্যায় কনিষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। যে দারার প্রতি মুখ

তুলিয়া চাহিতে সমস্ত ওমরাহ ভয় করিত, আজ সেই দারার দুঃখে কেহ আনন্দিত ও কেহ বা দুঃখিত হইতে লাগিল।

আরঙ্গীব দারাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাইলেন। তাঁহার এক জন সঙ্গী প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, যদি আপনি আমাদের সম্রাটকে (আরঙ্গীবকে) এই দোষে অবরুদ্ধ করিতেন, তবে তাঁহাকে কি দণ্ড দিতেন?" দারা সরোষে উত্তর দিলেন, "যে পিতৃহন্তা, যে পিতৃদ্রোহী, যে সম্রাটের বিদ্রোহী; তাহাকে পৃথিবীতে দণ্ড দিবার কিছুই নাই।" এই দম্ভপূর্ণ উত্তরে আরঙ্গীব জ্বলিয়া উঠিলেন। তখনি তাঁহার আদেশে, সেই হতভাগ্যের রাজমস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িল। *

আরঙ্গীব ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি দারার ছিন্নশির কাছে আনাইলেন, বিশেষ সন্তোষের সহিত সহাস্যমুখে তাঁহার দিকে দেখিলেন। তিনি তরবারীর সূক্ষ্মাগ্রভাগ দ্বারা সেই ছিন্নমস্তকে আঘাত করিলেন। তরবারীর খোঁচা দিয়া সেই শবচক্ষু জোর করিয়া খুলিয়া দেখিলেন—তাহাতে একটি কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে কি না? এরূপ দেখিবার কারণ, পাছে কেহ আর কাহাকেও বধ করিয়া অনুচরেরা দারাকে ছাড়িয়া দিয়া থাকে। তাহার পর সেই ছিন্নমস্তক কাষ্ঠবাক্সে আবদ্ধ ও মখমলে মণ্ডিত হইয়া সাহজাহানের নিকট আগরায় পৌঁছিল।

বৃদ্ধ বাদসাহ তখন আহারে বসিয়াছিলেন। আরঙ্গীবের নাম করিয়া সেই উপহার মেজের উপর রাখা হইল। সাহজাহান ভাবিলেন, পুত্র তাঁহাকে অবরোধ করিলেও সম্পূর্ণ স্নেহশূন্য হন নাই। তিনি সেই কথা মুখেও প্রকাশ করিলেন। পরক্ষণেই সেই কাষ্ঠাধার খুলিবামাত্র যখন তাঁহার প্রাণসম প্রিয় পুত্র দারার সেই রুধিরপ্লাবিত ছিন্নমস্তক তাঁহার চক্ষে পড়িল, তখন তিনি চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। বেগম সাহেব, যিনি আজীবন দারার পক্ষপাতিনীছিলেন, তিনিও ক্রন্দনের রোলে আগরার দুর্গমধ্যস্থ সেই ক্ষুদ্রকারাগার পরিপূর্ণ করিলেন। ইহার পর, আরাকানে সুজার পরিবারের অপমৃত্যুসংবাদ শুনিয়া, আরঙ্গীব সর্ব্বাপেক্ষা প্রফুল্লচিত্ত হইয়া উঠিলেন। সুজার পলায়ন ও তাঁহার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধীয়

* মেনশী বলেন—মৃত্যুর পূর্ব্বে আরঙ্গীব দারার মুখে নিম্নলিখিত কথাগুলি শুনিয়াছিলেন;—"Mahamet mara micnehet e ben alla Mariam mi bacchet." ইহার অর্থ মহম্মদ আমায় মারিলেন, কিন্তু মেরীর পুত্র আমায় রক্ষা করিবেন।

সমস্ত ঘটনা, এক স্বতন্ত্র প্রবন্ধের উপকরণ; সুতরাং এ স্থলেই আমরা তাহা অসম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিলাম।

এখন কথা হইতেছে মুরাদকে লইয়া। মুরাদ গোয়ালিয়র দুর্গে কঠিন-প্রস্তরময় কারামধ্যে দীর্ঘ নিশ্বাস ও অশ্রুজলে শরীর শীর্ণ করিতেছিলেন। এ প্রকার অবস্থাতেও তিনি দুই বার জানালা ভাঙ্গিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িয়া, প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দুইবারই তাহাতে ব্যর্থ-মনোরথ হয়েন।

মোগল রাজসংসারে একটি প্রাচীন প্রথা ছিল,—"জীবন ও মৃত্যু" সম্বন্ধে ক্ষমতা পরিচালনের সর্ব্বপ্রথম ভার রাজসংসারের নিযুক্ত কাজীরাই উপযুক্ত উৎসবের সহিত বাদশাহদের প্রতি সমর্পণ করিতেন। আরঙ্গীবের সময়ে যে কাজী ছিলেন—তিনি বার্দ্ধক্য ও নিতান্ত ধর্ম্মপ্রকৃতির অনুরক্তির জন্য,আরঙ্গীবের নানাবিধ অত্যাচার ও অসদ্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে যখন প্রথমতঃ ক্ষমতাদানের জন্য অনুরোধ করা হইল, তখন তিনি অস্বীকার করিলেন। আরঙ্গীব ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি অন্য কাজী নিয়োগ করিয়া সে কলঙ্ক মোচন করিলেন।

যে মহা কৌশলে তিনি, সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ হইতে রাজপরিচ্ছদে ভূষিত হইয়াছিলেন, তাহারই সহায়তায়, মুরাদের বিরুদ্ধে তিনি এক মিথ্যা-অভিযোগকারীকে খাড়া করাইলেন। সে অভিযোগ করিল, "মুরাদ যখন গুজরাটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন সাহজাহানের এক প্রধান কর্ম্মচারীকে বিনা অপরাধে প্রাণদণ্ডিত করিয়াছিলেন। সেই নিরীহ ব্যক্তির শীতল শোণিত এখনও বিচারের জন্য চীৎকার করিতেছে।

আরঙ্গীব গম্ভীর ভাবে এই অভিযোগ শুনিলেন, ভ্রাতার নামে এই প্রকার অভিযোগ আনিয়াছে বলিয়া; তিনি অভিযোগকারীর দিকে রোষ-সঞ্চারিত রক্তনেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেন। তার পর যেন আন্তরিক অনুশোচনার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "হায়, আমি কি হতভাগ্য! আমার সিংহাসনের পথ কি কণ্টকিত? ইহার জন্য কি সমগ্র রাজবংশীয়দের শোণিতপাত করিতে হইবে?"

তাঁহার সভাসদ কর্ম্মচারীরা ও জ্যোতিষীরা এই প্রকার অপরিসীম ভ্রাতৃস্নেহের উদ্রেক দেখিয়া (?) কপটতার সহিত বলিল, "জাঁহাপনা! তুচ্ছ ভ্রাতৃস্নেহের জন্য, এই ধর্ম্মময় সিংহাসন কলঙ্কিত করিবেন না। ইহাই

আপনার সমক্ষে প্রথম অভিযোগ ; অপরাধীকে, স্নেহের অনুরোধে ছাড়িয়া দিয়া, মোগলদিগের সূক্ষ্ম বিচারপ্রবৃত্তি কলুষিত করিবেন না।"

আরঙ্গীবের হৃদয়ে, ন্যায়বিচারপ্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, আবার সেই কঠোর, কপটীর চক্ষে, ভ্রাতৃস্নেহের পরিচায়ক দুই এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দুও দেখা দিল ; তিনি, গম্ভীরস্বরে কম্পিতকণ্ঠে মৌখিক স্নেহের অনুরোধে বলিলেন, "তবে তাহাই হউক,আইনের মর্য্যাদাই বলবতী হউক,রাজকুমারকে—আমার প্রিয়তম ভ্রাতাকে তোমরা যেখান হইতে আনিয়াছ, সেইখানেই লইয়া যাও। আইনের দণ্ড তোমরাই প্রদান কর।" বলা বাহুল্য, হতভাগ্য মুরাদ প্রহরী-দিগের রক্ষিত বিষাক্ত সর্প দ্বারা দংশিত হইয়া নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইলেন।

সম্রাট হইবার কিয়দ্দিন পরে, আরঙ্গীব তাঁহার রাজসভাস্থ প্রধান প্রধান ইতিহাসলেখকদিগকে সমবেত করিয়া আদেশ করেন—"তোমরা ভবিষ্যৎ-বংশাবলীর জন্য আমার রাজ্যাধিকারের সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ কর, যেন আমার এই প্রকার গৌরবান্বিত উপায়ে সিংহাসনলাভকার্য্য তাহাদের পথ-প্রদর্শক হইতে পারে।" তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাসলেখক (কাফি খাঁ ?) সবিনয়ে বলিলেন, "জাঁহাপনা ! আপনার গৌরবান্বিত আদেশ পালিত হইতে কালবিলম্ব হইবে না, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনা[র] পিতার অবরোধ ও ভ্রাতৃগণের নৃশংসরূপে নিধনব্যাপার কিরূপ ভা[বে] চিত্রিত করিব ?" এ কথার উত্তরে আরঙ্গীব বলিয়াছিলেন,"মোগল রাজ[্যের] মঙ্গলার্থে আমি ঈদৃশ উপায়ে রাজ্যাধিকার করিয়াছি। ধর্ম্ম,—সত্য[ঃ] মহম্মদীয় ধর্ম্ম আমাদের সিংহাসনের মূলভিত্তি, আমি সেই স্খলিত ভিত্তির দৃঢ়তর করিবার জন্য এই অস্বাভাবিক পথ অনুসরণ করিয়াছি। পি[তা] বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত রাজ্যশাসনে অপারক ; ভ্রাতারা মহম্মদীয় ধর্ম্মের বিরোধী তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই ঈশ্বর আমায় এরূপ পথে প্রণোদি[ত] করাইয়াছেন। আমার রাজ্যলাভের যাহা কিছু গৌরব, সকলই সেই মঙ্গলম[য়] ঈশ্বরের। তাঁহারই বিধানে, তাঁহারই অপরিবর্ত্তনীয় প্রহেলিকাময় নিয়মে সামান্য 'ফকীর' আজ 'সম্রাট' হইয়াছে। তিনি এই আমার ঘটনাতে [ঐ] 'মহতের পতন' ও 'ক্ষুদ্রের অভ্যুত্থান' এই কঠোর সত্য মঙ্গল ভা[বে] প্রকাশ করিয়াছেন।"

নানা কারণে এ প্রবন্ধে হয় ত আমাদের উদ্দেশ্যানুযায়ী সমস্ত কথা ব[লা] হয় নাই, তথাপি যে কঠোর রাজনীতির আনুসারী হইয়া আরঙ্গীব দিল্লী

রত্নখচিত স্বর্ণসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ আমরা পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। যে কঠোর রাজনীতির অনুসরণে মোগল-রাজ্যের পতন সম্ভাবিত হইয়াছিল, তাহা আমরা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করিব।

সমাপ্ত।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

ভারতচন্দ্র।

সমাজ ও সময় লইয়া কবি;—কাব্য, সমাজ ও সময়ের মান-চিত্র এবং অভাবনিদর্শক। এই জন্যই এক সময়ে দুইরূপ কবির আবির্ভাব হইতে পারে। কোথাও বা লঘু ও অসার হাস্যে আপনার জাতীয় হীনতার হীনত্ব ঢাকিবার প্রয়াস; অলঙ্কারের বা মজার কথার পরচুলার ভিতর, আপনার প্রেতপঙ্কিল প্রতিকৃতি লুকাইয়া, অধঃপতনের শিখা, আমোদের হাততালিতে প্রদক্ষিণ করা; কোথাও বা জাতীয় হীনতায়, সামাজিক দৈন্যে, কোন মৃত, পবিত্র, অতীতের মুখপানে চাহিয়া, কোন সংক্ষুব্ধ, পবিত্র আত্মার নিরাশ-নিশ্বাস!—অপাপবিদ্ধ, আদর্শ মনুষ্য অঙ্কনের তপঃসাধন! এই জন্যই মিল্টনের মহাকাব্য ও উইচার্লির নাটকাবলী এক সময়ে সম্ভব;—এই জন্যই ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সেনের পুণ্যগাথা সমসাময়িক। এক জন, জীবনের গণ্ডীর ভিতর দুইটা অশ্লীল তামাসা লইয়া পরিতৃপ্ত; অপর জন, মরণের ব্যবধান ছাড়াইয়া, সসীম অসীমে বিবাহ-বন্ধন বাঁধিয়া দেন।

বাঙ্গালীর প্রথম কবি জয়দেব। বাঙ্গালার স্বাধীনতার সায়াহ্নে, অধঃপতিত জাতির অলস জীবনের জন্য, বৈশাখী পূর্ণিমার মত প্রতিভায়, বিলাসিনীর বিলাস বা অভিসার গাহিতে তাঁহার জন্ম। মুসলমান আসিল; বাঙ্গালার দুর্দ্দিনের কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

বাঙ্গালা ভাষা, তখনও একেবারে মৈথিলী পরিচ্ছদ ছাড়িতে পারে নাই; বাঙ্গালী তখনও একেবারে বিলাসবিভ্রম ভুলিতে পারে নাই; তাই চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির বিশ্বপ্লাবী প্রেমের ভিতর, স্থানে স্থানে, আমরা মদনবিকার দেখিতে পাই। দুর্দ্দিন মনুষ্যের অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি করে;—বিদ্যাপতি ও চণ্ডী

দাস প্রভৃতির প্রেম আধ্যাত্মিক। জাতীয় জীবন শিথিল হইয়াছিল; রাজ-বিপ্লবে বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনও দিন দিন শিথিল হইতে লাগিল। প্রাণ-হীন, সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মপ্রক্রিয়ায় দুঃখিতের শান্তি মিলিত না—দুঃখিত জাতির এই অভাবের উচ্ছ্বাসই—চৈতন্য দেব। চৈতন্য, বাঙ্গালায় জীবন্ত ধর্ম্ম ঢালিয়া দিলেন; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদ বৈষ্ণবেরা পথে পথে গাহিতে লাগিল। নূতন প্রেমের উচ্ছ্বাসে, নূতন বৈষ্ণব কবিকুল, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি কাব্য লিখিলেন। নূতনের প্রতিবাদ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে; চৈতন্যের ধর্ম্মের প্রতিবাদ হইল। বৈষ্ণবের এ প্রেমপূর্ণ, কবিত্বপূর্ণ ধর্ম্ম, সংসারের পোদ্দারে বুঝিতে পারিল না;—অসিচর্ম্মের উপাসক এ বাঁশীর গানের ভিতর বিশেষ কিছু দেবত্ব দেখিতে পাইল না। বাঙ্গালা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল—শাক্ত এবং বৈষ্ণব। চৈতন্যের সময়ের মত, বাঙ্গালীর জ্ঞানের গৌরব কখন হয় নাই। নবদ্বীপ, শান্তিপুর হইতে নূতন ধর্ম্মের জীবনী-উৎস ছুটিতে লাগিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের নীলাচলযাত্রার পর, তান্ত্রিক মতের আবার প্রাদুর্ভাব হয়—প্রত্যাগত প্রবাসী সন্তানের স্নেহে, লোক, প্রাচীন মত অবলম্বন করিতে লাগিল।

বাঙ্গলায় আবার অবিরোধে, দ্বিগুণ শক্তিতে, পঞ্চ মকারের উপাসনা চলিল। পার্সি তখন অর্থকরী বিদ্যা, ব্রাহ্মণের ভিতর অনেকেই সংস্কৃত জানিত না। মুসলমানের বিদ্যায় এমন কিছু ছিল না, যাহা সংস্কৃতে পদে বসিতে পারে; এবং সে শিক্ষার উপায়ও দুর্লভ ছিল। লোকে শিক্ষার অভাব হইল, কত দিন পরে, পৌরাণিক প্রসঙ্গে, কৃত্তিবাস রামায় লিখেন। প্রতিভা অশিক্ষাতেও কার্য্যকরী, দেশে পুরাণের আকারে লৌকিক আখ্যায়িকার সৃষ্টি হইল। এইরূপ আখ্যায়িকাই, সংস্কৃতজ্ঞ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের ভিত্তি। বৈষ্ণবকবিগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের স্রষ্টা মুকুন্দরাম প্রথম শাক্তকবি। উপযুক্ত শিক্ষার অভাব সত্ত্বেও, অনেক গ্রাম কবি পাঁচালী রচনা করিতে লাগিলেন; কাব্যও সেইরূপ হইতে লাগিল। চতুষ্পাঠী ভিন্ন, অন্য লোক স্বল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত; তন্ত্রের মত অবিরোধে চলিয়াছে; চৈতন্যের লীলাস্থল নবদ্বীপ বা অদ্বৈতের বাসভূমি শান্তিপুর, তখন খেড়ু বা অশ্লীল কাব্যের জন্য বিখ্যাত,—ভারতচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলেন।

আভিজাত্যে ভারতচন্দ্র বিশেষ সম্ভ্রান্ত; পাণ্ডুয়ার জমীদার ভূপ

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের তিনি কনিষ্ঠ পুত্র। বর্দ্ধমানাধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রের মাতার সহিত বিরোধে, নরেন্দ্রনারায়ণ নিঃস্ব হয়েন;—কবি মাতুলাশ্রয়ে পলায়ন করিলেন। ভারতচন্দ্র, সংস্কৃত ও পারসি ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন। বর্দ্ধমান রাজভবনে, আপনাদিগের সম্পত্তির মোক্তাররূপে অবস্থিতির সময়, তাঁহার কারাদণ্ড হয়। কারাধ্যক্ষের অনুকম্পায় পলায়ন করিয়া, তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। অবশেষে ফরাশডাঙ্গার ৺ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজকবি পদে নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে অন্নদামঙ্গল রচিত হয়। ভারতচন্দ্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে জীবলীলা সম্বরণ করেন।

শব্দ ও অর্থপ্রতিপত্তি লইয়া কাব্যের উৎকর্ষ;—যাঁহার ভাব ও ভাষা সমানরূপে মহান এবং সুন্দর, তিনি মহাকবি। কিন্তু সচরাচর আমরা দুই-রূপ কাব্য দেখিতে পাই, হয় শব্দগত, নয় ভাবগত। প্রথমের উদাহরণ গীতগোবিন্দ, অন্নদামঙ্গল;—দ্বিতীয়ের উদাহরণ, বৈষ্ণবকবিগণের পদাবলী প্রভৃতি। প্রথমের সৌন্দর্য্য—সযত্নরক্ষিত প্রমোদ-উদ্যানের মত;—দ্বিতীয়ের সৌন্দর্য্য সন্ধ্যানিলসন্তাড়িত বনলতার ন্যায়। একটি সৌন্দর্য্যে বাবুদের "বারুণী পুষ্করিণী"—অপরটি নীলাকাশতলে, সন্ধ্যার কাল ছায়ার মাঝে, পর্ব্বতাবরোহিণী শুভ্র নির্ঝরিণী। এক স্থানে শুধু পদলালিত্য; অপরত্র আবেগের সৌন্দর্য্যে পদমাধুর্য্য। একের ঘসামাজা বিন্যস্ত মাধুরী, অলঙ্কশাস্ত্রের পৌনঃপৌনিক নিয়মের বাধ্য;—অপরের অচেষ্টিত রূপ, অবিজ্ঞাতে আপনি ফুটিয়া উঠে। ভারতচন্দ্র শাব্দিক কবি;—নিম্নে আমরা তাহাই দেখাইব।

অন্নদামঙ্গল তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সৃষ্টিপ্রকরণ, দেব-দেবীর বন্দনা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, শিববিবাহ প্রভৃতি বর্ণিত;—দ্বিতীয় ভাগ বিদ্যাসুন্দর; তৃতীয় ভাগ মানসিংহ। অন্নদামঙ্গলের প্রথমভাগ, কবি-কঙ্কণ চণ্ডীর যথাযথ অনুকরণ। শিবনিন্দা, অন্নদাপাটনীসংবাদ, প্রভৃতি বর্ণনার কঙ্কাল, কবিকঙ্কণ হইতে; ভারতচন্দ্র তাহাতে মাংস যোজনা করিয়াছেন মাত্র। ইহা যদি সুবর্ণ হয়, তবে তাহা কবিকঙ্কণের—ভারতচন্দ্র পালিশ করিয়াছেন। যে একটা ব্যাকুলতা, যে একটা হৃদয়ের উভয়কূলপ্লাবী প্রগাঢ় ধর্ম্মের প্রবাহ, আমরা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে, মিল্টনে, রামপ্রসাদ সেনে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের স্থানে স্থানে, দেখিতে পাই; নৈষ্ঠিক ভারত, অন্নদা-

মঙ্গলে তাহা ফুটাইতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্রে অসীমের সহিত কুটুম্বিতা প্রকাশের.ক্ষমতা ছিল না। আমরা বুঝিতে পারি না, আপাপবিদ্ধ, উদাসীন কবি, আপনার হৃদয়ের ছায়া ফুটাইতে কেন অসমর্থ! তবে ভারতচন্দ্রের মৌলিকত্ব কোথায়? বিদ্যাসুন্দর ও হীরামালিনীর সৃজনে।

অনেকেই কবিরাজের ধুয়া ধরিয়া বলেন, রসাত্মক বাক্যের নাম কাব্য—বিদ্যাসুন্দর আদিরসাত্মক কাব্য। কিন্তু আদিরস কাহাকে বলে? মধ্যকালীন সংস্কৃত অলঙ্কার ছাড়িয়া দাও, প্রাচীন ভারতে আদিরস কাহাকে কহিত? পৌরাণিক বলিবেন, যে রস অস্বাদন করিয়া সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী অমর; তাহার নাম আদিরস;—মরুময় ইন্দ্রিয়ের চির-বুভুক্ষা নহে। প্রেম অর্থে স্বার্থত্যাগ; বাঞ্ছিতের ভিতর আপনাকে ডুবাইয়া দেওয়া। আদিরস দেহের সহিত পুড়িয়া যায় না; এ দেশের অধঃপতনের সহিত জাতীয় অলঙ্কারে, আদিরস ও শৃঙ্গাররস, একার্থবাচক হইয়াছিল। কালিদাস এ দোষের অতীত নহেন, গম্ভীর ভারবিও এই আদর্শের অনুবর্ত্তক। দেকার্টে ও স্পাইনোজা প্রেমকে একটি স্বতন্ত্র মনোবৃত্তির মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন—এই বৃত্তির উচ্ছ্বাসই আদিরস। আদিশব্দে "প্রথম" অর্থ হইলে আদিরস প্রথম রস। কিন্তু মনুষ্য, আহারের অভাব প্রথম অনুভব করে; তবে আদিরস প্রথমঅনুভূত রস নহে। আদি অর্থে "প্রধান" হইলে, আদিরস প্রধান রস। কিন্তু যে রসে বিদ্যাসুন্দর গঠিত ভারতের পুণ্য ঋষিরা কি তাহাকে মনুষ্যের প্রধান বৃত্তির উচ্ছ্বাস কহিতে পারেন? দয়া, ভক্তি, প্রেম হইতে ইন্দ্রিয়লালসা বলবতী হইতে পারে; কিন্ত অপকৃষ্ট স্বীকার করিতে হইবে। তবে বিদ্যাসুন্দর আদিরসাত্মক কাব নহে; উহা অশ্লীল বা অসৎকাব্য।

এ কথা জিজ্ঞাস্য—এ অশ্লীলতা মার্জ্জনীয় কি না? নাটককার হৃদয়ের ঘাত প্রতিঘাত দেখাইতে, পাপবৃত্তির চিত্র বা কার্য্য দেখাইতে পারেন; কাব্যের সে উদ্দেশ্য নহে। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন ইউরোপীয় গ্রন্থে অশ্লীলতা আছে; তবে ভারতচন্দ্রকে দোষ দাও কেন? আমরা বলি, অশ্লীলতা কোনও স্থানেই মার্জ্জনীয় নহে। আমরা মাধুর্য্যের অনুরোধে, নগ্ন সৌন্দর্য্যের দ্বেষ্টা নহি; কিন্তু আমরা কদাচার সমর্থন করিব না। আমরা শুনিয়া অবাক হই, "মিল্টনের কোন স্থানে নাকি অশ্লীল চিত্র" আছে। "সেক্স পীয়রের অশ্লীলতা," আমরা ভাবিয়া পাই না, কোন প্রধান নায়কের চরিত্রে

তাহা আছে কি না। মহাকবির মহতী প্রতিভা, মাতাল দ্বাররক্ষকের মত্ততা ও লেডী ম্যাকবেথের ঘুমন্ত স্বপ্নসঞ্চরণ, হ্যাম্‌লেট ও ফলষ্টাফ, সকল চিত্রেই সমান পারদর্শিনী। বল দেখি, দুষ্মন্তের প্রশংসা "অহিণঅমহুলোলুবো-ভুমং" না "সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ"! বল দেখি, ভারবির অমরত্ব "ব্যপোহিতুং লোচনতো মুখানিলৈঃ" এই স্থানে, না "অস্মদ্ বিনা মা ভুশমুন্মনীভূঃ" এইখানে? ভারতচন্দ্রে অশ্লীল ভিন্ন পারিপাট্য নাই। আমরা অন্যত্র এমন কোন সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই না, যাহাতে এ অশ্লীলতা, সাময়িক রুচির ফল বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি। যদি কোন স্থানে, কবির কাব্যের সহিত তন্ময়ত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে, তবে তাহা অশ্লীল স্থানে। কেহ কেহ বলেন, যুগধর্ম্মে মানুষের ক্রমিক নৈতিক অবনতি দেখাইবার জন্যই বিদ্যাসুন্দরের প্রসঙ্গ;—ভারতের বিদ্যাসুন্দর একরূপ ভবিষ্য পুরাণ। আমরা বুঝিতে পারি না, যদি মনুষ্যের অধঃপতন দেখানই উদ্দেশ্য, তবে সে উৎপথপ্রতিপন্নের আবার সশরীরে স্বর্গারোহণ কিরূপ? ভারতচন্দ্র অপ্রয়োজনে অশ্লীল, হীরামালিনী সৃজনের উপযুক্ত কবি। ইহাঁর আগা-গোড়াই বিপরীত। জ্বালাময়ী প্রতিভা সত্ত্বেও হেনে (Heine) বলিয়াছেন, "বায়রণ অর্দ্ধকবিতার রাজ্যে কবি"—আমরা বলি, ভারতচন্দ্রও সেইরূপ।

ভারতের কাব্য ব্যঙ্গকাব্য। কিন্তু হোরেস, ড্রাইডেন (Dryden) প্রভৃতি ব্যঙ্গকাব্যকারগণের মতে, ব্যক্তিগত ব্যঙ্গ (Lampoon) সকল সময়ে অনু-মোদনীয় নহে। ব্যক্তিবিশেষ সমাজের পীড়াদায়ক না হইলে, ব্যক্তিগত ব্যঙ্গকাব্য অভদ্রতা। ভারতের বিদ্যাসুন্দর-রচনা—ভীরুর বৈরনির্য্যাতন। ভারতচন্দ্র ব্যঙ্গকাব্যের নিয়ম ব্যতিরেকে বাঙ্গালীর ড্রাইডেন।

তবে ভারতচন্দ্র কি কবি নন? কবি নন, এ কথা কে বলিবে! রূপ বা প্রাকৃতিক বর্ণনে, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের ভাব আসিয়াছে;—ভাষা এত সুন্দর কাহার? মর্ম্মর পাষাণের উপর উজ্জ্বলপ্রভ মণিমাণিক্যের মত, এক একটি কথা যেন ঘসিয়া মাজিয়া, খুদিয়া গলাইয়া বসান হইয়াছে। তুমি একটি কথা, বা একটি চরণ তুলিয়া লইতে পার,—কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তেমন সুন্দর কিছু বসাইতে পারিবে না।

ভারতের কাব্য কথার তাজমহল! এত সাংসারিক জ্ঞান, এত সামান্য কথায় কোন কবির প্রতি চরণে প্রতিভাত? কাহার কথা বাঙ্গালীর এত গৃহের কথা হইয়াছে? ভারতচন্দ্র বাঙ্গালা পদ্যের যে গঠন গড়িয়াছেন,

সে বিশ্বকর্ম্মার কারিগরিতে কে না চমৎকৃত!—রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত মধুর গঠনে আজও তাঁহার প্রসাদভোগী। ভারতচন্দ্র বাঙ্গালার কবি; বাঙ্গালীর গৃহ-মমতা, বাঙ্গালীর প্রবলের প্রাবল্য, রাণীর সংবাদে ও কোটালের নিগ্রহে জীবন্ত। ভারতচন্দ্র সাংসারিক কবি (?)—সাময়িক সমাজের বিরাট বাণী। আমরা জানি না, কোনও বাঙ্গালী কবির গান, সময়ের অস্থিমজ্জার ভিতর এত অন্তরপ্রবিষ্ট কি না! কম সৌভাগ্যের কথা নহে,—অনেক সময়ে দেশে ভারত-শব্দে তাঁহাকেই বুঝায়। কৃত্তিবাস যে কবিকুলের প্রতিষ্ঠাতা, মুকুন্দরাম যাহার মধ্যাহ্ন সূর্য্য, ভারতচন্দ্র তাহার শেষ কবি। ভারতচন্দ্র চলিয়া গেলেন, তাঁহার অমর ছন্দ রহিয়া গেল। বাঙ্গালায় ইংরাজের জাহাজ আসিতেছিল; আমরা দেখিব, এভনের কূল হইতে সওদাগর কি মহারত্ন লইয়া আসিতেছে।

শ্রীনলিনীনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সাংখ্যস্বরলিপি।

কবিরের গান।

ভারতবর্ষে চিরদিন পৌত্তলিকতার মধ্যেও পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান চলিয়া আসিয়াছে। প্রাচীন কাল হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান ভারতের অন্তরে অন্তরে নিহিত হইয়া রহিয়াছে, সময়ে সময়ে তাহা আমাদের দেশের মোহ ও কুসংস্কার রাশি ভেদ করিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এক একটি সাধু পুরুষ উঠিয়া, মধ্যে মধ্যে সেই বিমল একেশ্বরবাদ জনসমাজে প্রচার করিয়া দেন এই সাধু পুরুষদিগের মধ্যে কবীরও একজন। আমরা নিম্নে যে গানটি স্বরলিপি করিয়া দিতেছি, তাহাতে, কবীর যে কিরূপ ব্রহ্মবাদী ছিলেন, তাহা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। কবীর কহিতেছেন;—জলের মধ্যে থাকিয়া মীন পিপাসী, ইহা শুনিয়া আমার হাসি পায়। পূর্ণব্রহ্ম তিনি সর্ব্বঘটে রহিয়াছেন, অথচ মানব উদাসী হইয়া তাঁহার অনুসন্ধানার্থে ফিরিয়া বেড়ায় হে সংশয়ভ্রমে পতিত মানব! আত্মজ্ঞান বিনা মথুরাই বা কি, আর কাশীই বা কি? শুন ভাই সাধু! সেই অবিনাশী ব্রহ্মকে (আত্মজ্ঞান হইলে) সহজে লাভ করা যায়। কিন্তু কবিরের এই উচ্ছ্বাসের মধ্যেও যেন ভক্তের বিনীত

ভাবের কিঞ্চিৎ অভাব হইয়াছে। বাস্তবিকই আমরা সকলেই জলের মধ্যে পিপাসী মীনের ন্যায় বিচরণ করিতেছি, ইহাতে কবিরের ন্যায় জ্ঞানীর হাসি পাওয়ার অপেক্ষা কাতর হওয়াই সঙ্গত ছিল। এই অবস্থায় আমাদের বৈদিক ঋষি ঈশ্বরের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিয়া কবিরের অপেক্ষাও অধিক সরল মহত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন ;—

"অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়॥"

জলরাশির মধ্যে বাস করিয়াও তোমার স্তোতাকে তৃষ্ণা আক্রমণ করিয়াছে। কৃপা কর হে ঈশ্বর কৃপা কর।

ঋষির এই গানে কি কাতর সরলতা! কবিরের অপেক্ষা বশিষ্ঠ ঋষির গানে হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

কবীরের সম্বন্ধে আমরা এখানে অধিক কিছু বলিতে চাহি না, গানের জন্য যেটুকু আবশ্যক সেইটুকু বলিলাম। কবীরের সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় পাঠকগণ স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।

পানিমে মীন পিয়াসী।

রাগিনী কাফি———তাল যৎ।

পানিমে মীন পিয়াসিরে মোক শুনত শুনত লাগে হাসিরে
পূরণ ব্রহ্ম সকল ঘটবরতে খোজত ফেরত উদাসিরে
আত্মজ্ঞান বিনে নরভটকে কেয়া মথুরা কেয়া কাসিরে
কহত কবীর শুন ভাই সাধো সহজে মিলে অবিনাসিরে॥

তালি। ২ঃ। ৩। ০। ১।　　　আরম্ভ। স্থল স্থ।
মাত্রা। ৩। ৪। ৩। ৪।　　　তালি। ২। ২।

(স্থা)। রে রে রে । রে রে রে রে । ম্গাঁ
(স্থা)। পা — — । — — নি মেঁ । মী

গাঁ গাঁ । ১/২রে —১/২সা -রে মা মা । পা পা পা ।
— — । — — — ন পি । য়া — — ।

। পা পা পা -মা । মা মা -গা । সা মা মা -পা ।
। । — — — । সি — — । রে — — — ।

ম্গাঁ গাঁ গাঁ । গাঁ গা রে রে । ম্গাঁ গাঁ গাঁ ।
পা — — । — — নি মে । মী — — ।

। -১/২রে -১/২সা -রে মা মা । পা পা পা । পা পা
। — — — ন পি । য়া — — । — —

পা -মা । মা মা -গা । মা মা মা -গা । গ্‌ম্‌পা ১/২
— — । সি — — । রে — — — । —

১/২পা -১/২মা -১/২পা -মা । ম্‌গাঁ গাঁ রে রে । ম্‌গাঁ গাঁ
— — — — । পা — নি মে । মী —

গাঁ । -১/২রে -১/২সা —রে পা ধা । নি নি ২সা ।
— । — — — মো ক । শু ন ত ।

। ২সা ২সা ২সা নি । ২সা ২সা নিঁ । নিঁ ৩/৪নিঁ — ১/৪ধা
। — — শু ন । ত — — । লা গে —

-নিঁ —পা । ধ্‌নিঁ -ধ্‌নিঁ -পা । -মা -গা -মা -গা । গ্‌ম্‌পা
— — । হা — — । — — — — । —

-মা মা । মা মা মা -পা । (স্থা—পূ) । ম্‌গাঁ গাঁ গাঁ ।
— সি । রে — — — । (স্থা—পূ) । পা — —

। গাঁ গাঁ রে রে । ম্‌গাঁ গাঁ গাঁ । -১/২রে -১/২সা —রে
। — — নি মে । মী — — । — — —

মা মা । (স্ত—প্র) । পা পা পা । পা পা পা ধা ।
ন পি । (স্ত—প্র) । পূ — — । — — র ণ ।

। নি নি —২সা । ২সা ২সা ২সা ২সা । ২সা ২সা — নি ।
। ব্র — — । হ্ম — — স । ক ল — ।

। -২সা ২সা ২রে ২রে । ২স্‌২রে ২রে ২সা । —নিঁ নিঁ — ধা
। — — ঘ ট । ব র তে । — — —

—পা । পা -২সা -নি । ২সা ২সা ২সা ২সা । ন্‌২সা — নিঁ
— । থো — — । জ — ত — । ফে — —

নি ̐ । ধ্নি ̐ -ধা ধ্নি ̐ —পা । পধ্নি ̐ -ধ্নি ̐ — পা । -মা
— । র — ত উ । দা — — । —

মা মা — গা । -গম্পা -মা মা । মা মা মা — পা ।
— — — । — — সি । রে — — — ।

(স্থা—পূ) । ম্গাঁ গাঁ গাঁ । গাঁ গাঁ রে রে । ম্গাঁ গাঁ গাঁ— । ১রে২
(স্থা—পূ) । পা — — । — — নি মে । মী — — । —

—১সা২ —রে মা মা । (স্ত—দ্বি) । পা পা পা । পা পা
— — ন পি । (স্ত—দ্বি) । আ — — । — —

পা — ধা । নি নি নি । — সা২ সা২ সা২ সা২ । সা২
স্বা — । জ্বা — — । — — ন বি । নে

সা২ — নি । -সা২ সা২ সা২ সা২ । স২রে২ রে২ সা২ । — নি ̐
— — । — — ন র । ভ ট কে । —

নি ̐ — ধা — পা । পা — সা২ — নি । সা২ সা২ সা২ সা২ ।
— — — । কেয়া — — । ম থু রা — ।

ন্ ̐সা২ — নি ̐ নি ̐ । —ধ্নি ̐ — ধা — ধ্নি ̐ — পা । পধ্নি ̐ —ধ্নি ̐
কেয়া — — । — — — — । কা —

— পা । — মা মা মা — গাঁ । — গঁম্পা পা মা । মা মা
— । — — — — । — — সি । রে —

মা — পা । (স্থা—পূ) । ম্গাঁ গাঁ গাঁ । গাঁ গাঁ রে রে ।
— — । (স্থা—পূ) । পা — — । — — নি মে ।

। ম্গাঁ গাঁ গাঁ । — ১রে২ —১সা২ — রে মা মা । (স্ত—তৃ) । পা
। মী — — । — — — ন পি । (স্ত—তৃ) । ক

পা পা । পা পা পা ধা । নি নি নি । — সা২ সা২
হ ত । — — — ক । বী — — । — —

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২
সা সা । সা সা সা । সা সা সা সা । রে
র — । — — — । শু ন ভা —ই । সা

২ ২ ২
—সা —রে । সা —নিঁ —ধা পা । পা পা পা । পা
— — । ধো — — — । — — — । স

২ ২ ২
সা নি সা । ন্ঁসা -নিঁ -ধা । — ধনিঁ — পা পা পা ।
হ জে মি । লে — — । — — অ বি ।

। প্ধ্নিঁ — ধ্নিঁ — পা । — মা মা মা —গাঁ । —গম্পা
। না — — । — — — — । —

মা মা । মা মা মা — পা ॥ (স্থা—পু) । ম্গাঁ ঃ
— সি । রে — — — ॥ (স্থা—পু) । পা

ব্যাখ্যা।

" । রে রে রে ! রে রে রে রে । "
। পা — — । — — নি মে ।

এখানে যদি রে স্বর গুলির মধ্যে মধ্যে আশচিহ্ন থাকিত, তাহা হইলে পাঁচবার পা আ আ আ আ এইরূপ গাহিতে হইত। কিন্তু আশচিহ্ন নাই বলিয়া পা কথাটি পাঁচমাত্রাকাল রেখাবে একটানে গাহিতে হইবে। এইরূপ অন্যান্য স্থানেও।

"গ্ম্পা" এখানে গ্ ম্ স্ত্রীস্বর দুইটি অতিদ্রুত ছুঁইয়াই পাস্বরে গিয়া পড়িতে হইবে।

একমাত্রা=সা বা এক্ বলিতে যে সময় লাগে।

মাত্রানিরূপক সংখ্যা স্বরের ডান বা বামপার্শ্বে ঘন — সংলগ্ন করিয়া লিখিত হয়। যথা ১/২পা অথবা পা১/২ দুইই এক কথা।

স্ত—প্র=অন্তরা প্রথম। স্ত—দ্বি=অন্তরা দ্বিতীয়। স্ত—তৃ=অন্তরা তৃতীয়। ইত্যাদি।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ।

শেষ প্রস্তাব।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ সাতারায় পদার্পণ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার উন্নতির সূত্রপাত হয়। অম্বাজী পন্ত পুরন্দরে ও প্রতিনিধি পরশুরাম ত্রিম্বক পণ্ডিত (১) এতদুভয়ের অনুগ্রহে ও অনুরোধে, বালাজী পন্ত তাৎকালিক সেনাপতি ধনাজীরাও জাধব-এঁর (২) অধীনে, প্রথমে উমেদার ও

(১) ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজা রাজারামের রাজত্বকালে, ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে "প্রতিনিধি" পদ নূতন সৃষ্ট হয়। রাজার পরেই প্রতিনিধির পদ। পেশওয়ে প্রভৃতি সকলেই প্রতিনিধির অধীন। প্রহ্লাদ নিরাজী (নিরঞ্জনজী ?) প্রথম প্রতিনিধি। তৎপরে 'ভিমাজী রঘুনাথ' ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিনিধি-পদে অভিষিক্ত হয়েন। কিন্তু ভিমাজী রঘুনাথের শৌর্য্য ও দক্ষতার অভাব জন্য তিনি পদচ্যুত হয়েন, এবং তৎপদে রাজারামের স্ত্রী তারাবাই কর্ত্তৃক পরশু-রাম ত্র্যম্বক অভিষিক্ত হন। তিনি তারাবাইর জন্য শাহুর সহিত যুদ্ধ করেন, ও যুদ্ধে পরাভূত হইয়া বন্দী হয়েন। পরে শাহুর আনুগত্য স্বীকার করিতে সম্মত হইলে, পুনরায় প্রতিনিধি পদ প্রাপ্ত হইলেন। প্রতিনিধি পরশুরাম ত্র্যম্বকের মুদ্রাতে (শীলমোহরে) নিম্নলিখিত শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল। যথা,---

"শ্রী আই আদিপুরুষ প্রসন্নঃ
রাজারাম স্বামীকৃপানিধিঃ
তস্য পরশুরাম ত্র্যম্বক প্রতিনিধিঃ ॥"

মহারাজ শাহুর অরনুগত্যস্বীকার করিয়া তদীয় প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত হইলে পর, নিম্ন লিখিত শ্লোকবিশিষ্ট মুদ্রা ব্যবহার করিতেন। যথা,—

"শ্রীআই আদি পুরুষঃ
শ্রীশাহুছত্রপতি স্বামী কৃপানিধিঃ
তস্য পরশুরাম ত্র্যম্বক প্রতিনিধিঃ ॥"

(২) মহাত্মা শিবাজীর সময় ইনি একজন জুম্লেদার ("জুম্লেদারঃ শতাধিপঃ" ইতি রাজব্যব-হারকোষঃ) ছিলেন। রাজারামের রাজত্বকালে ধনাজী (ধনঞ্জয়জী) রাও জাধব সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার মুদ্রা এইরূপ ছিল ; যথা,—

"রাজারাম চরণী দৃঢ় ভাও।
সেনাপতি ধনাজী জাধব রাও ॥"

(ভাও অর্থে ভক্তি) ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তারাবাইর পক্ষ হইতে শাহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। কিন্তু

পরে কারকুনের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে মহারাজ শাহু কারামুক্ত হইয়া মহারাষ্ট্রসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, রাজ্যের জমাবন্দী ও রাজস্ব আদায়ের ভার, সেনাপতি জাধবের প্রতি সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেনাপতি এই নূতন কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া, তৎসম্পাদনার্থ, এক শত টাকা বেতনে বালাজী বিশ্বনাথ ও অম্বাজীপন্তকে কারকুন নিযুক্ত করিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে রাজস্ব আদায়ের কোনও সুবন্দোবস্ত বা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না; এবং বালাজী বিশ্বনাথের ন্যায় সুদক্ষ কারকুনও তৎকালে অতি অল্পই ছিল। বালাজী বিশ্বনাথ স্বীয় অদ্ভুত প্রতিভাবলে রাজস্ব আদায়ের এরূপ সুনিয়ম স্থাপন ও তৎসম্বন্ধীয় হিসাবের কাগজপত্রগুলি এরূপ ভাবে প্রস্তুত করিলেন যে, অত্যল্প কালের মধ্যেই রাজস্বসংক্রান্ত প্রায় সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল। এইরূপে কার্য্যদক্ষতাগুণে তিনি সেনাপতি জাধবের এত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন যে, তিনি মহারাজ শাহুর সমক্ষে সর্ব্বদা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। মহারাজ শাহুও বালাজীপন্তের সদ্‌গুণে ও কার্য্যতৎপরতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। অনতিদীর্ঘ কালের মধ্যেই বালাজী বিশ্বনাথ রাজসভায় এত দূর প্রতিপত্তি লাভ করিলেন যে, ১৭১০ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি ধনাজীরাও জাধবের মৃত্যু হইলে, রাজস্বসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যভার তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইল।

ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হইলে পর, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মুআজিম (বাহাদুর শাহ) সেনাপতি জুলফিকার খাঁকে "অমীরউল্ উমরাহ" উপাধি প্রদানপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের শাসনভার প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত ভার প্রাপ্ত হইয়া, জুলফিকার খাঁ হয়দরাবাদ জয় করণার্থে যাত্রা করিলে, মহারাষ্ট্রপতি শাহু তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। জুলফিকার খাঁও শাহুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায়, শাহু সুলতান মুআজিম বা বাহাদুর শাহের নিকট হইতে, দক্ষিণা-পথের চৌথ ও সরদেশমুখী (রাজস্বের দশমাংশ) সত্বের সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে, তদীয় পুত্রগণ দিল্লীর সিংহা-

---

শাহুকে চিনিতে পারিয়া ও প্রকৃত উত্তরাধিকারী জানিয়া, তিনি শাহুর পক্ষ অবলম্বন করিলেন। সেনাপতি বালাজী বিশ্বনাথের কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে ৫ সহস্র অশ্বারোহিসৈন্যের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন।

সন লইয়া বিবাদ করিতে লাগিলেন। এই বিবাদ-উপস্থিতি, জুলফিকর খাঁর মৃত্যু ও দাক্ষিণাত্যে নূতন সুভাদার নিযুক্ত হওয়ায়, মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রাপ্ত চৌথ ও সরদেশমুখী আর পূর্ব্ববৎ যথাসময়ে আদায় হয় না দেখিয়া, ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শাহু ধনাজী জাধবের পুত্র সেনাপতি চন্দ্রসেন জাধবকে তাহা আদায় করিবার জন্য সৈন্যসহ মুসলমানরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। এই অভিযানে, বালাজী বিশ্বনাথ সেনাপতির কার্য্যের পরিদর্শকরূপে প্রেরিত হইলেন।

ধনাজী জাধবের মৃত্যুর পর, বালাজী বিশ্বনাথ রাজস্বসংক্রান্ত সমস্ত ভার প্রাপ্ত হওয়ায়, চন্দ্রসেন অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার পরিদর্শক নিযুক্ত হওয়ায়, সেই অসন্তোষ দশগুণ বৃদ্ধি পাইল। তিনি কিছুতেই এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া প্রতিশোধগ্রহণের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন।

একদা উভয়ে কতিপয় অশ্বারোহী লইয়া মৃগয়া করিতে গমন করিলে, তথায় কোনও সামান্য কারণে উভয়ের মধ্যে একটু বাক্ বিতণ্ডা হয়। তৎপরে বালাজী বিশ্বনাথকে একটি হরিণের পশ্চাদ্ধাবনে রত দেখিয়া, চন্দ্রসেন স্বীয় অশ্বারোহী সৈন্য সহ সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ সহসা এইরূপ আক্রান্ত হইয়া, কতিপয় অশ্বারোহী সহ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া 'সাসবড়' গ্রামে গমন করিলেন। তথায় সচিব শঙ্করজী নারায়ণের জনৈক কর্ম্মচারী ছিলেন। পুরন্দর দুর্গ তাঁহার অধীনে ছিল। পুরন্দর দুর্গে আশ্রয় পাইবার জন্য, বালাজী বিশ্বনাথ কাতর কণ্ঠে উক্ত কর্ম্মচারীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সেনাপতির ভয়ে কর্ম্মচারী মহাশয় তাঁহাকে দুর্গ মধ্যে আশ্রয় দিতে পারিলেন না। এদিকে সেনাপতির অশ্বারোহীগণ বালাজী বিশ্বনাথের অনুসন্ধান করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে বালাজী অতিমাত্র ভীত হইয়া, "পাণ্ডবগড়" নামক একটি নিকটবর্ত্তী গিরিদুর্গের অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। সেনাপতির যমদূতসদৃশ অশ্বারোহীগণ সেখানেও তাঁহাদের অনুসরণ করায়, তাঁহারা কিছু দিনের জন্য ছদ্মবেশে বনমধ্যে লুকায়িত হইয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে বালাজী বিশ্বনাথের সঙ্গে তদীয় পুত্রদ্বয়—বাজীরাও ও চিমাজী আপা—ছিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথের সমভিব্যাহারিগণের মধ্যে 'পিলাজীরাও জাধব' ও

'নাথজীরাও ধুমাল' নামক দুই জন অতিবিশ্বস্ত মরাঠা সিল্লিদার ছিলেন। তাঁহারা বালাজীকে অতিশয় বিপদগ্রস্ত দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলেন,—"আমরা স্বীয় আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবগণের সাহায্যে, যে প্রকারে হউক আপনাদিগকে সম্মুখস্থিত পাণ্ডবগড়ে লইয়া যাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।" তাঁহারা এই বলিয়া কানন মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া, স্ব স্ব বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদিগকে একত্রিত করিয়া বালাজী বিশ্বনাথকে সঙ্গে লইয়া সেনাপতির অশ্বারোহীগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পাণ্ডবগড়ের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পাণ্ডবগড়ের দুর্গরক্ষক মহারাজ শাহুর আদেশে বালাজী বিশ্বনাথকে দুর্গ মধ্যে আশ্রয় প্রদান করিলেন।

সেনাপতি চন্দ্রসেন বালাজী বিশ্বনাথকে দুর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য দুর্গরক্ষককে অনেক অনুরোধ করিলেন। দুর্গরক্ষক কিছুতেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত না হওয়ায়, সেনাপতি তাঁহাকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; এবং পরিশেষে বলিলেন, "বালাজী-পন্তকে আমার হস্তে সমর্পণ না করিলে, আমি মহারাজ শাহুকে পরিত্যাগ করিয়া বিপক্ষদলের সহিত মিলিত হইব।" এই সংবাদশ্রবণে শাহু কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, বালাজী বিশ্বনাথকে চন্দ্রসেনের হস্তে সমর্পণ করিতে দুর্গ-রক্ষককে নিষেধ করিলেন; এবং 'সরলস্কর হয়বৎরাও নিম্বালকরকে' সৈন্যসহ চন্দ্রসেন জাধবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। 'হয়বৎরাও নিম্বালকরের' আগমনবার্ত্তা শ্রবণে, চন্দ্রসেন পাণ্ডবগড় পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। নিম্বালকরের সহিত চন্দ্রসেনের 'দেউর' নাম স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে চন্দ্রসেন পরাজিত হইয়া, সর্জ্জেরাও ঘাটগে ও রম্ভাজীরাও নিম্বালকরকে সঙ্গে লইয়া, সসৈন্যে দাক্ষিণাত্যের মোগলপ্রতিনিধি সুভাদার চিনকুলিচ খাঁর অশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই চিনকুলিচ খাঁ ইতিহাসে নিজাম উল্‌মুল্‌ক নামে পরিচিত। ইহাঁর প্রকৃত নাম "কমরুদ্দীন।" ঔরঙ্গজীব তাঁহাকে পাঁচ সহস্র অশ্বারোহীর মনসবদার ও বিজাপুরের সুভাদার নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার "চিনকুলিচ খাঁ" নাম রাখিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজীবের প্রপৌত্র ফরুকশের বাদশাহ তাঁহাকে "নিজাম উল্‌মুল্‌ক" উপাধি ও দাক্ষিণাত্যের শাসনভার প্রদান করেন। যাহা হউক, নিজাম উল্‌মুল্‌ক এই পরাজিত ও অপমানিত মরাঠা সর্দ্দারকে যথোচিত সম্মানিত করিয়া, আশ্রয় প্রদান করিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া, স্বীয় পুত্রদ্বয় স সাতারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সরলস্কর হয়বৎরাও নিম্বালকর, চন্দ্রসেনকে পরাজিত করিয়া, মোগলাধিকৃত প্রদেশসমূহ লুণ্ঠন করিতে অগ্রসর হইলেন। তদ্দর্শনে নিজাম উন্মুলক তাঁহার গতিরোধমানসে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। হয়বৎরাওএর সাহায্যের জন্য সাতারা হইতে সৈন্য প্রেরিত হইল। মহারাজ শাহু বালাজী বিশ্বনাথকে সোকর্ত্তা” উপাধি প্রদান করিয়া বহু সৈন্য সহ সরলস্কর নিম্বালকরের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ যথাসময়ে সরলস্করের সহিত মিলিত হইলেন। পুরন্দর দুর্গের সন্নিধানে উভয় পক্ষের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ জয়ী হইলেও, যুদ্ধ শেষ হইলে পর, রম্ভাজীরাও নিম্বালকর পুনা আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। পরিশেষে বালাজী বিশ্বনাথ মোগলগণের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, সাতারায় প্রত্যাগমন করিলেন। মোগলগণও ঔরঙ্গাবাদে প্রতি-গমন করিল।

এই সময়ে মহারাষ্ট্র রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণের মধ্যে কেহ শাহুর পক্ষ, কেহ কোলাপুরাধিপতি সাম্ভাজীর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। কেহ বা মোগলগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বা কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া স্বস্বপ্রধান ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন; এবং আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যাঁহারা এইরূপে স্বাধীন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে "দামাজী (দামোদরজী) ঘোরাত" ও "উদয়জী বৌহাণ"ই প্রধান। উদয়জী বৌহাণের উপদ্রবে শাহু অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া, তাহাকে "শিরাল" ও "কহ্লাড়" (কৃষ্ণা ও কোয়না নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটবর্ত্তী ও কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তীরস্থিত প্রদেশ) প্রদেশের "চৌথ" সত্ব প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাহ্নোজী আঙ্গ্রে আপনাকে কোলাপুরাধিপতি সাম্ভাজীর অধীনস্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন। সাবন্তবাড়ী (ক) বোম্বাই (খ)

(ক) যাহাকে এক্ষণে সাবন্তবাড়ী বলা হয়, তাহার প্রকৃত নাম বাড়ী। সাবন্ত উত্তরাধিকারী মরাঠাগণ বংশপরম্পরাক্রমে এই প্রদেশের দেশমুখ ছিলেন বলিয়া, তাঁহাদিগকে "বাড়ীকর সাবন্ত" ও এই প্রদেশকে "সাবন্তাচী বাড়ী" (সাবন্তগণের বাড়ী) বা সাবন্ত বাড়ী বলে।

(খ) ইহার মহারাষ্ট্রীয় উচ্চারণ "মুম্বই"। পোর্ত্তুগিজগণ ইহার সুন্দর উপকূল দেখিয়া ইহার নাম (Bon-bay) রাখিয়াছিলেন।

ের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় প্রদেশের অধিপতি হইয়াও তিনি শাহুর অধিকৃত কল্যাণ পরগণা জয় করণের উদ্যোগ করিতেছিলেন। অপর দিকে রাজা কৃষ্ণরাও খটাওকর (গ) বিদ্রোহী হইয়া রাজ্য মধ্যে উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক মরাঠা সামন্ত ছিলেন, যাঁহারা শাহুর অধীনতা স্বীকার করিতেন না।

এইরূপে সর্ব্বত্র অরাজকতা বিস্তৃত হইয়া মহারাষ্ট্ররাজ্য বিনাশে উন্মুখ হইলে, মহারাজ শাহু ও তাঁহার সদস্যগণ অতিশয় বিষণ্ণ ও চিন্তিত হইলেন। এই সময়ে বালাজী বিশ্বনাথের বুদ্ধিকৌশলে ও বিক্রমে অরাজকতাপূর্ণ মহারাষ্ট্রে শান্তি স্থাপিত ও মহারাজ শাহুর আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়া মহারাষ্ট্রীয়-গণের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইল। সকলকে চিন্তিত ও উৎসাহহীন দেখিয়া, বালাজী বিশ্বনাথ শাহুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এই সময়ে যথোচিত বিক্রম প্রকাশ না করিলে মহারাষ্ট্র রাজ্য নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। এ সময়ে ধৈর্য্যচ্যুত না হইয়া বিশেষ সাহস ও পৌরুষ প্রকাশ করা আবশ্যক। অতএব, প্রথমে দামাজী ঘোরাতকে বশীভূত করিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হউক। অথবা মহারাজের আদেশ পাইলে আমিই এ কার্য্যসাধনে চেষ্টা করিতে পারি।" বালাজী বিশ্বনাথের এইরূপ সাহসপূর্ণ বাক্যে সদস্যগণ কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত হইলেন, এবং মহারাজ শাহু অতিমাত্র প্রীত হইয়া রাজ্যের অরাজকতা দূরীকরণের ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিলেন। এই সময় হইতে বালাজী বিশ্বনাথ প্রায় সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যের নেতৃত্বগ্রহণে অগ্রসর হইতেন। মহারাজ শাহুও প্রায় সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার পরামর্শের অনুবর্ত্তন করিতেন।

১৭১৩ খৃষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ দামাজী ঘোরাতের উদ্দেশ্যে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। দামাজী ঘোরাত পুনার ৪০ মাইল পূর্ব্বদিকস্থিত 'হিঙ্গণ গ্রামের সুদৃঢ় ক্ষুদ্র দুর্গের অধিপতি ছিলেন। হিঙ্গণ গ্রামের চতুষ্পার্শ্বে প্রায় ২০ ক্রোশ ব্যাপী ভূভাগ তাঁহার অধীনে ছিল। দামাজী অতিশয় ক্রূরস্বভাব, বিশ্বাসঘাতক ও অর্থলোভী ছিলেন। বালাজী বিশ্বনাথকে সসৈন্যে আসিতে দেখিয়া, তিনি সন্ধির প্রস্তাব ও সন্ধিবিষয়ক কথোপকথন জন্য তাঁহাকে দুর্গের মধ্যে আহ্বান করিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ দুর্গমধ্যে

(গ) শম্ভু মহাদেব নামক পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের অধিপতি। মোগলগণের নিকট ‍হইতে ইনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

প্রবেশ করিতে সন্দেহ প্রকাশ করিলে, তিনি "বেলভাণ্ডার" (বিল্বপত্র ও হরিদ্রা) স্পর্শ করত শপথপূর্ব্বক কহিলেন,—"আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে দুর্গ মধ্যে আগমন করুন। আপনার সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার বা বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হইবে না।" বেলভাণ্ডার মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে অতিশয় পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। দামাজী উহা স্পর্শ করিয়া শপথ করায়, বালাজী বিশ্বনাথ বিশ্বস্তচিত্তে সপরিবারে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাঁহারা ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ, রাধাবাই, বাজীরাও, চিমাজীআপা ও অম্বাজী পন্ত পুরন্দরে প্রভৃতি সকলেই বন্দী হইলেন। ঘোরাতকে শপথের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে,তিনি বলিলেন,—"বেলভাণ্ডার আবার কি? বেল (বিল্ব-পত্র) গাছের পাতা বই ত আর কিছুই নয়! উহা আমার কোন অনিষ্ট সাধ ı করিতে পারে? ভাণ্ডার (হরিদ্রা) ত আমরা প্রত্যহই ব্যঞ্জনাদি যোগে ভক্ষণ করিয়া থাকি!" এই কথা বলিয়া ক্রূরমতি ঘোরাত তাঁহাদের ৫ জনের সমক্ষে পাঁচটি উত্তপ্ত ভস্মপূর্ণ কবলপাত্র (তোব্রা) আহারের জন্য রাখিয়া দিলেন; এবং বিবিধ প্রকারে যন্ত্রণা প্রদান ও অপমানিত করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের মুক্তির জন্য নিষ্ক্রয়স্বরূপ বহু অর্থ প্রার্থনা করিলেন। মহারাষ্ট্রপতি শাহু বালাজী বিশ্বনাথের মুক্তির জন্য প্রার্থিত অর্থ ঘোরাতকে প্রদান করিলেন।

বালাজী বিশ্বনাথ সাতারায় ফিরিয়া আসিলে, শাহু সচিব নারায়ণ শঙ্করকে ঘোরাতের বিরুদ্ধে, পেশওয়ে "বহিরোপন্ত পিঙ্গলে"কে (ঘ) কাহ্লোজী আঙ্গের বিরুদ্ধে ও বালাজী বিশ্বনাথকে রাজা কৃষ্ণরাও খটাওকরের বিরুদ্ধে প্রেরণ

(খ) অনেকে বালাজী বিশ্বনাথকে প্রথম পেশওয়ে বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। বালাজী বিশ্বনাথ পেশওয়ে বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার সময় হইতে পেশওয়ে পদ পুরুষানুক্রমিক (hereditory) হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃত পক্ষে, 'শ্যামরাজ নীলকণ্ঠ রাঞ্জেকর'ই প্রথম পেশওয়ে। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ছত্রপতি শিবাজী নীরা ও কোরনা নদীর মধ্যস্থিত প্রদেশের রক্ষণ ভার শ্যামরাজ নীলকণ্ঠকে সমর্পণ করতঃ পেশওয়া পদ প্রদান করিলেন। ১৬৫৮ খৃঃ ফতেখাঁর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়, শ্যামরাজ পন্ত পদচ্যুত ও মোরেশ্বর ত্র্যম্বক পিঙ্গলে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। শিবাজীর পুত্র সাম্ভাজী কলুশা নামক জনৈক কানোজা ব্রাহ্মণের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার প্রদান করিয়া মোরেশ্বর পন্ত পেশওয়ে ও শিবাজীর অন্যান্য কর্ম্মচারীকে কারারুদ্ধ করিলেন। তৎপরে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে শাহু সাতারার রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া, কারারুদ্ধ মোরেশ্বরের পুত্র বহিরোপন্ত পিঙ্গলেকে পেশওয়ে-পদে অভিষিক্ত করেন।

করিলেন। সাতারা প্রায় এক সময়েই তিন জন তিন দিকে যাত্রা করিলেন। ঘোরাতের সহিত যুদ্ধে নারায়ণশঙ্কর পরাভূত হইয়া বন্দী হইলেন। এই সময়ে কৃষ্ণরাও খটাওকর অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় সাহসের সহিত বালাজী বিশ্বনাথকে আক্রমণ করিলেন। 'আউন্দ' গ্রামের নিকটে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হইল। বহুক্ষণের যুদ্ধের পর বিজয়শ্রী সম্পূর্ণরূপে বালাজী বিশ্বনাথের অঙ্ক-শায়িনী ও খটাওকর তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। বলিয়াছি, কান্হোজী আঙ্গ্রে কল্যাণ অধিকার করিবার চেষ্টায় ছিলেন। পেশওয়ে বহিরোপন্ত পিঙ্গলে উহা রক্ষার জন্য কঙ্কণে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আঙ্গ্রের সহিত যুদ্ধে পেশওয়ে পরাজিত ও বন্দীভূত হইলেন। লোহগড়-নামক গিরিদুর্গ ও রাজমাচী আঙ্গ্রের হস্তগত হইল।

কান্হোজী আঙ্গ্রে পেশওয়েকে বন্দী করিয়া সাতারা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ উদ্যোগদর্শনে, মহারাজ শাহু অতিশয় ব্যগ্র হইয়া, যথাসাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, বালাজী বিশ্বনাথকে উহার নেতৃত্ব প্রদান করতঃ, আঙ্গ্রের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ সসৈন্যে লোহগড়ের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তিনি আঙ্গ্রের বলবীর্য্য ও সমরদক্ষতার বিষয় বিশেষরূপে অবগত ছিলেন ; এই নিমিত্ত, ও আঙ্গ্রের সহিত তাঁহার পূর্ব্বসৌহৃদ্যবশতঃ, দণ্ডনীতি অপেক্ষা সামনীতি অবলম্বন করা অধিকতর যুক্ত বিবেচনা করিয়া, তিনি আঙ্গ্রের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। এই যুক্তি সন্ধির ফলে (১) পেশওয়ে বহিরোপন্ত কারামুক্ত হইলেন, (২) কোলাপুরাধিপতি সম্ভাজীকে পরিত্যাগ করিয়া আঙ্গ্রে শাহুর পক্ষ অবলম্বন করিলেন (৩) শাহুর যে সমস্ত দুর্গ আঙ্গ্রে বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তৎ-সমস্ত (রাজমাচী ব্যতীত) প্রত্যর্পণ করিলেন। এবং (৪) আঙ্গ্রে শাহুর নিকট হইতে দশটি সুদৃঢ় ও ১৬টি সামান্য দুর্গ, তন্নিকটস্থিত গ্রামসমূহ ও (৫) শাহুর অধীনস্থ রণতরীসমূহের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন। (৬) এতদ্ব্যতীত তাঁহার "সর্খেল" উপাধি দৃঢ়ীকৃত হইল।

এই সন্ধির ফলে সিদ্দিগণের অধিকৃত প্রদেশের কিয়দংশ মহারাষ্ট্র রাজ্যভুক্ত হওয়ায়, তাঁহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া, আঙ্গ্রের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলেন। তখন আঙ্গ্রে ও বালাজী বিশ্বনাথ উভয়েই একত্র হইয়া, সিদ্দির বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। এতদুভয়ের যুক্ত সৈন্যের পরাক্রমে,সিদ্দিগণ সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া,মহারাজ শাহুর অধীনতা স্বীকার কবিতে বাধ্য হইলেন।

এইরূপে পেশওয়েকে কারামুক্ত, মহাবলপরাক্রান্ত আঙ্গের সহিত সন্ধি-স্থাপন ও সিদ্দিগণকে বশীভূত করিয়া, বালাজী বিশ্বনাথ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে সাতারায় প্রত্যাগমন করিলেন। মহারাজ শাহু তাঁহার এই কার্য্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিলেন। বহিরোপন্ত পিঙ্গলে, আঙ্গের সহিত সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায়, শাহু তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত ও বালাজী বিশ্বনাথকে তাঁহার মহৎ কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে বালাজী ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে "পেশওয়ে" (৪) পদে অভিষিক্ত হইলেন।

শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর।

শীর্ণ পত্র।

একখানি ছবি অনবরত দেখিতে দেখিতে প্রায়ই অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইতে পারে। কিন্তু একত্রে অনেক ছবি দেখিবার সময়েও মনের এই প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। সেই জন্য বৃহৎ চিত্রশালার মধ্যে আমাদের চক্ষের পাতা এত অবসন্ন হইয়া আসে, ও চারিদিকের আসনগুলিতে এত লোকের জনতা দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই চিত্রসমুদ্রের মধ্য হইতে যিনি কয়েকখানি বাছিয়া লইয়া প্রত্যহ সেইগুলিকে দেখিতে আসেন, তিনিই ধন্য।

এই প্রকারে চিত্রশালার অধ্যক্ষদিগের অজ্ঞাতসারে, তুমি একটি নিজের ক্ষুদ্র চিত্রশালা প্রস্তুত করিতে পার। এই কয়েকখানি ব্যতীত আর সমস্ত আলেখ্য কেবল গিল্টির ফ্রেমের মধ্যে রঙ্গ-মাখান কাপড় ও ঘরের আসবাব মাত্র। চলিয়া যাইবার সময় তুমি একবার মাত্র এই সমস্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যাও—এই দর্শনে চক্ষু অণুমাত্র ক্লান্ত হইয়া পড়ে না।

কখন কখন দু' একখানি নূতন ছবি এই সংগ্রহভুক্ত করিয়া লও। একখানি ছবি হয় ত তুমি এ পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছ, কিন্তু একদিন ভাল করিয়া দেখিয়া, তোমার ক্ষুদ্র চিত্রশালার ভিতর স্থান দান কর। এই

(৪) "প্রধানঃ পেশওয়ে তথা" ইতি রাজব্যবহারকোষঃ। অষ্ট প্রধানের মধ্যে যিনি মুখ্য প্রধান, তিনি পেশওয়া। পেশওয়া শব্দ সম্ভ্রমসূচক হইলে "পেশওয়ে" এই রূপ প্রাপ্ত হয়।

প্রকারে তোমার আলেখ্যের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই উপায় অবলম্বন করিয়া, কালে, হয় ত একটি সুবৃহৎ চিত্রশালা তোমার একপ্রকার নিজস্ব হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু এই প্রকারে চিত্রসংগ্রহের অবসর কোথায়? তোমায় তাড়াতাড়ি কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। কাঠুরিয়া বনের মধ্য দিয়া যাইবার সময় যেরূপ ছেদ্য বৃক্ষগুলিতে একটি বিশেষ চিহ্ন দিয়া যায়, তুমিও সেইরূপ চিত্রতালিকা লইয়া সংগ্রহযোগ্য আলেখ্যসমূহের পাশে দাগ দিয়া যাও।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগ্রহগুলি নানা প্রকারের। বিখ্যাত ও বহুপ্রশংসিত অনেক আলেখ্য ইহার মধ্যে খুঁজিয়া পাইবে না, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে অনেক অজানিত চিত্রকরের অযত্নপরিত্যক্ত চিত্রসমূহ দেখিতে পাইবে। এই আশ্চর্য্য সংগ্রহ বুঝিতে হইলে, সংগ্রাহককে আড়কাটি করিয়া চিত্রশালায় প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রকার এক ক্ষুদ্র সংগ্রহ হইতে নিম্নের ছবিখানি গৃহীত হইল।

১৮৭৮ সালের সাঁলোর (১) এক কোণে, ইভারটন্ সেণ্টস্‌বেরি নামক এক জন ইংরাজ চিত্রকরের একখানি ছবি স্থান পাইয়াছিল। এই চিত্র লইয়া কোন প্রকার হুলস্থূল পড়ে নাই। ছবিখানি নিতান্ত বৃহৎ বা নিতান্ত ক্ষুদ্র নয় বলিয়া, এবং রঙ্গের ও Compositionর লেশমাত্র আড়ম্বর না থাকায়, অলস দর্শকদিগের দৃষ্টি সে দিকে বড় একটা আকৃষ্ট হয় নাই।

কিন্তু ছবিখানি সে স্থানটিতে বেশ মানাইয়াছিল। লোকে চলিয়া যাইবার সময় ছবিখানির উপর সহৃদয় কটাক্ষপাত করিয়া যাইতেছিল। কারণ, চিত্রাঙ্কিত বিষয়টি সকলেরই বেশ বোধগম্য ও নিতান্ত পরিচিত।

ছবিখানিতে দুটি প্রণয়ীর প্রণয়কলহ চিত্রিত। লোকে এই ছবিখানি দেখিয়া, একটু মুচ্‌কিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মনে মনে এই প্রকার আর একটি ছবি অঙ্কিত হইতেছিল। এই কলহ নানা প্রকার সম্ভব ও অসম্ভব অদ্ভুত কারণ হইতে উত্থিত, ও সকলের মনে হইতেছিল, একটি চুম্বনে এই প্রণয়কলহের পরিসমাপ্তি হইবে।

তথাপি এই ছবিখানিরও বিশেষ দর্শকবৃন্দ ছিল, এবং অনেক ক্ষুদ্র সংগ্রহে ইহা উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়াছিল।

এই ছবিখানির নিকট দিয়া যাইবার সময় দেখিতে পাইবে, একটি লোক

(১) ফ্রান্সের বিখ্যাত চিত্রপ্রদর্শনী গৃহ।

একাকী এই চিত্রদর্শনে নিমগ্ন হইয়া আছে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লোক এই প্রকারে একাগ্রচিত্তে চিত্রদর্শনে নিবিষ্ট লক্ষিত হইবে। কিন্তু সকলের মুখেই একপ্রকার বিশেষ ভাব। যেন ছবি হইতে শুষ্ক আপাণ্ডুর আভা আসিয়া, দর্শকদিগের মুখের উপর পড়িয়াছিল।

তুমি নিকটে পৌছিলে দর্শক সেথান হইতে আস্তে আস্তে চলিয়া যাইবে। যেন এই সুন্দর জিনিষটি সুধু এক সময়ে একজনের উপভোগ করিবার অধিকার,—যেন এই পটসমীপে একাকী থাকাই নিতান্ত আবশ্যক।

উদ্যানের এক প্রান্তে উচ্চ প্রাচীরের গায়ে একটি নিদাঘমণ্ডপ। মণ্ডপটি অতি সামান্যভাবে জাফ্‌রির দ্বারা খিলানের আকারে নির্ম্মিত। প্রাচীরাংশ, পশ্চাতে ভিত্তির কার্য্য করিতেছে। সমস্ত মণ্ডপটি একপ্রকার বন্য দ্রাক্ষা-লতার দ্বারা আবৃত। দ্রাক্ষালতা নিদাঘমণ্ডপের বাম পার্শ্ব হইতে উঠিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল তন্তু বিস্তার করিয়াছে।

প্রায় শরতের শেষ। নিদাঘমণ্ডপের ঘনপর্ণনির্ম্মিত ছাদ ধ্বংশাবশেষে পরিণত। কেবল দ্রাক্ষালতার অতি কচি ডগার উপর দু' একটি পাতা আছে মাত্র। ঝরিয়া পড়িবার পূর্ব্বে, এই পাতাগুলির উপর গমনোদ্যত নিদাঘ তাহার অবশিষ্ট রঙ্গটুকু সমস্ত ঢালিয়া দিয়া যায়। রক্তও হরিৎবর্ণ পুষ্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঁড়ির ন্যায় এই পাতাগুলি, শরতের ম্লান সৌন্দর্য্য দিয়া, বাগান-টিকে আলো করিয়া রাখিয়াছে।

চারি দিক এই ঝরা পাতায় আবৃত। নিদাঘমণ্ডপের সম্মুখে বাতাস অতি যত্নের সহিত অপেক্ষাকৃত সুন্দর শীর্ণ পত্রগুলিকে লইয়া, একটি পরিষ্কার ক্ষুদ্র স্তূপ করিয়া রাখিয়াছে।

বৃক্ষ সকলও প্রায় পত্রহীন। শীর্ণ পত্রের ন্যায় একটি শুষ্ক শাখার উপর বসিয়া, একটি কপিশ বর্ণের উদ্যানবিহারী পক্ষী, অতীত বসন্ত-গীতের দু' একটি চরণ অতি কষ্টে স্মরণপথে আনিয়া, অনবরত অশ্রান্তচিত্তে গাহিতে-ছিল।

সমস্ত ছবিতে কেবল আইভিলতাগুলি বেশ জীবন্ত। দুঃখের ন্যায়, কি গ্রীষ্মে কি শীতে আইভিলতা সর্ব্বদাই সজীব।

আইভি অতিক্ষুদ্র ফাটলে বা গর্ত্তে কোমল ডগা লইয়া অতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া না পড়িলে আমরা আর বুঝিতে পারি না যে, ইহাকে সমূলে উৎপাটন করা অত্যন্ত কঠিন

ব্যাপার ; যাহার উপর ইহার একবার গতিবিধি হইয়াছে, তাহাকে বিনাশ না করিয়া ইহা শীঘ্র ক্ষান্ত হয় না।

আইভি নীরব দুঃখের ন্যায়। ভিতরকার ধ্বংসাবস্থা উপরে সুন্দর চাকচিক্যশালী পত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখে। লোকেও এই প্রকার সুন্দর হাসির আবরণ দিয়া নিজেকে ঢাকিয়া রাখে। মনে হয়, যেন ভিতরকার আইভি-লতামণ্ডিত ধ্বংসাবস্থা তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

এই নিদাঘমণ্ডপের মধ্যস্থানে একখানি আসনের উপর একটি প্রাপ্ত-যৌবনা কিশোরী। হাত দু'খানি ক্রোড়ের উপর ন্যস্ত। মস্তক অবনত। সুন্দর মুখে কি এক নূতন রকম ভাব। মুখে রাগ, বিরক্তি বা সাধারণ মনগুম্‌টানর ভাব নয়। ইহা তীক্ষ্ণ হৃদয়নিষ্পেষী নিরাশা। তাহার মুখ দেখিলে বোধ হয়, যেন কি সুন্দর জিনিস তাহার হাত হইতে গড়িয়া পড়িয়া যাইতেছে, তাহার ধরিয়া রাখিবার আর কোন ক্ষমতা নাই—কি যেন হাতের মধ্যে শুকাইয়া যাইতেছে।

প্রণয়ী যুবক বালিকার আসনের উপর হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এতক্ষণে সে বুঝিতে পারিয়াছে, এ সুধু হাসি তামাসা নয়। এ এক বিষম ব্যাপার। এই সামান্য কলহ মিটাইবার সে অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছে। সে তর্ক করিয়াছে, ঠাট্টা তামাসা করিয়াছে, অবশেষে অত্যন্ত নত হইয়া দাসানুদাসের ন্যায় ক্ষমা ভিক্ষা পর্য্যন্ত চাহিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। বালিকার উদাসীন বিষণ্ণভাব কিছুতেই দূর হইতেছিল না।

একটু চিন্তার সহিত বালিকার দিকে নত হইয়া যুবক বলিল, "কিন্তু, তুমি ত জান, আমরা মনে মনে উভয়কে অত্যন্ত ভালবাসি।"

"তাই যদি হবে, তবে এত সহজে আমরা ঝগড়া করি কেন, আর কেন কঠিন ভাষায় এত হৃদয়হীন কথা ব্যবহার করি?"

"কিন্তু প্রাণাধিক, এটা আগাগোড়াই অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার।"

"তা' ত ঠিক্। কিন্তু আমরা কি কি বলেছি, তোমার মনে আছে? আমরা পরস্পরকে ব্যথা দিবার জন্য কেমন খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাছা বাছা শব্দ প্রয়োগ করিতেছিলাম। আমরা পরস্পরের হৃদয় জানি বলিয়া, যেখানে যাহার ক্ষত, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া কেমন চোখা চোখা শাণিত বাক্যবাণ প্রহার করিতেছিলাম! এই ভালবাসা!"

যুবক আর একটু শিথিলভাবে বলিল, "আ—প্রিয়তমে, তুমি ইহাকে

এত গম্ভীর ব্যাপার মনে করিতেছ কেন? যাহারা পরস্পরকে অত্যন্ত ভাল-বাসে, তাহাদের মধ্যেও কি সময়ে সময়ে একটু মনোমালিন্য হয় না? এ রকম সচরাচর হয়েই থাকে।”

“আচ্ছা, আচ্ছা! কিন্তু এমন ভালবাসাও আছে, যেখানে কলহ এক প্রকার অসম্ভব। আর না, হয় ত আমার ভুল,—আমরা যাহাকে ভাল-বাসা বলি, সে আর কিছুই নয়——”

যুবক তাড়াতাড়ি বলিল, “ভালবাসা অবিশ্বাস করিও না” তাহার পর বিচিত্র উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় ভালবাসার গুণ বর্ণনা করিল। ভালবাসা পরস্পরকে পরস্পরের দুর্ব্বলতা সহ্য করিতে শিক্ষা দিয়া, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি করে। ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ সুখ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমিল সত্ত্বেও ইহা পূর্ণ মিলন আনয়ন করে।

দু' একটি কথা মাত্র বালিকার শ্রবণপথে প্রবেশ করিতেছিল। তাহার দৃষ্টি শীর্ণপ্রায় উদ্যানের চারি দিকে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। সে মৃতপ্রায় পত্রপল্লবের শুষ্ক গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছিল। সেই সঙ্গে অতীত বসন্তের কথা, ও শরতের মরণোন্মুখ পুষ্পের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভালবাসার কথা, মনে পড়িতেছিল।

“শুধু ঝরা পাতা”—এই কথা ধীরে ধীরে বলিয়া বালিকা উঠিল। উঠিবার সময়, পবন কর্ত্তৃক সযত্নসঞ্চিত শীর্ণ পত্রস্তূপটি পা দিয়া ছড়াইয়া দিয়া গেল।

বালিকা বৃক্ষবীথিকা ধরিয়া বরাবর গৃহাভিমুখে চলিল। যুবক নিস্তব্ধ হইয়া তাহার পশ্চাতে আসিতেছিল। এক অশান্তিপূর্ণ মোহ আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, বালিকাকে আর ধরিতে পারিবে কি না; না, কুমারী এখন শতযোজন অন্তরে।

বালিকা উদ্যানের কুসুমাস্তরণের উপর দৃষ্টি রাখিয়া অবনত হইয়া চলি-তেছিল। এই নবীন বালিকা হৃদয়ের পরতে পরতে নিরাশা ও অভিমান কাটিয়া বসিয়াছিল।

তাহারা ক্রমে ক্রমে বৃক্ষবীথিকা দিয়া অন্তর্হিত হইল। কিন্তু শূন্য আসনখানি সেই অর্দ্ধশীর্ণ নিদাঘমণ্ডপের মধ্যে পড়িয়া রহিল। বাতাস আবার শুষ্ক পত্রের নূতন স্তূপ নির্ম্মাণ করিতেছিল।

কালপ্রবাহে পর্য্যায়ক্রমে আমরা উদ্যানপ্রান্তে এই শূন্য আসনের উপর

আসিয়া উপবেশন করি, এবং একটি শীর্ণ পত্রের ক্ষুদ্র স্তূপের দিকে অনিমেষে চাহিয়া থাকি। *

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

পরশমণি।

(হেম বাবুর পরশমণি শীর্ষক কবিতা পাঠ করিয়া)

১

কে বলে পরশমণি মানব-নয়ন ?
হে কবি বুঝেছ স্থূল, কবি-চক্ষে একি ভুল !
জাগ্রতে হেরেছ তুমি অলীক স্বপন ?
দুইটি খঞ্জন হেরে, পড়িয়ে মায়ার ফেরে,
ভাবিছ কাঞ্চনে জলে মাণিক্য মোহন ?
স্বালর হইতে তুলে, একখণ্ড কাচ খুলে,
মানবে দিয়াছে বিধি স্ফটিক দর্পণ।
রঙ্গিন এ কাঁচ দিয়া, এই বিশ্ব নিরখিয়া,
কি দেখিতে কি দেখিছ ? অসত্য দর্শন !
হেরি ইন্দ্র নীলকান্তি, কবির হইল ভ্রান্তি।
কে বলে পরশমণি মানব-নয়ন ?

২

যদি এই নর-চক্ষু পরশ হইত,
কভু কিরে অন্য লোক ত্যজি অবসাদ শোক,
আনন্দ কুটীরে বসি হাসিত কাঁদিত ?
প্রিয়া করস্পর্শে হায়, হয়ে রোমাঞ্চিতকায়,
বৈকুণ্ঠের যত দৃশ্য সম্মুখে হেরিত ?
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বেরে, নানাবর্ণে চিত্র করে,
রাখিত সম্মুখে ? বিশ্বে অবাক করিত !
চক্ষে ঘোর বিভাবরী, ডুমুরের ফুল হেরি,
হোমর মিল্টন আজি, দেখ রে চাহিয়া,
নির্ব্বাপিত নেত্রপুটে, স্বর্ণ রাজ মুকুটে
জগতের ছত্রদণ্ডে লয়েছে কাড়িয়া।

৩

প্রেমই পরশমণি জগত ভিতর।
ত্রিলোচনে দিগম্বর, গৌরীরূপ নিরন্তর,
নিরখিয়া এক দৃষ্টে, তবুও কাতর !
দারুণ অতৃপ্তি জ্বলে ;—গৌরীর চরণতলে,
নয়ন মুদিলা তাই ভোলা মহেশ্বর !
আঁধারে মাণিক জ্বলে ; আত্মার মণ্ডপ তলে,
জ্বলে উঠে জ্বল্ জ্বল্ সহস্র দেউটি !
বম্ বম্ হর হর ! প্রেমে গদ গদ হর
মায়ের রাঙা চরণ ধরেন সাপটি !
লালপদ্ম বক্ষে তুলি, হয়ে মহা কুতূহলী,
নেত্র মুদি, হেরে রূপ, উলটি পালটি !

৪

যদি মানবের চক্ষু পরশ পাথর,
বিধবার মূর্ত্তি হেরি, হতে চাও দেশান্তরী
তুমি কেন ? আমিই বা কেন নিরন্তর,

---

* নরওয়ের সুবিখ্যাত লেখক Alexander L. Kiellandর গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ হইতে। অনুবাদক W. Archer.

ওই বিষাদের বেশ, ওই মূর্ত্তিমান ক্লেশ,
হেরি অচঞ্চল চিত্তে পাপিষ্ঠের মত ?
স্বদেশের দুঃখে হায়, বুক তব ফেটে যায়,
হেসে খেলে আমি কিন্তু বেড়াই নিয়ত ?

৫

না গো না, এ চক্ষু নয় সে অতুল মণি !
প্রেমই পরশমণি, যাদুকর স্পর্শে যার,
হয়েছে অমরাবতী মাটীর ধরণী !
ইহারি পরশ বলে, অতুল রূপসী সাজে,
দাঁড়ায় যুবার পার্শ্বে শ্যামাঙ্গী রমণী !
ইহারি পরশ বলে, কৃষ্ণ ভৃঙ্গে ক্রোড়ে লয়ে,
মদনলাঞ্ছন মুখ নেহারে জননী !
ইহারি পরশ পেয়ে, ত্রিভঙ্গের শ্যাম অঙ্গে
হেরে ত্রৈলোক্যের রূপ ব্রজবিহারিণী !
হে কবি, ইহারি বলে, হেরিয়াছ বঙ্গ ঘরে,
ডেসি লেসি ড্যাফোডিল কুসুম লাঞ্ছন,
বঙ্গনারী-পুষ্প-রাজি, বিশ্বে অতুলন !

৬

প্রেমই এ বিশ্বতলে পরশ রতন !
বিদেশে বিরহী যদি, মসীলিপ্ত পত্র পায়,
ভাবে যুবা, পাইয়াছে কথিত কাঞ্চন !
কি যেন কি নিধি পেয়ে, দুঃখিনী বিধবা বালা
স্বামীর পাদুকা হেরে, মুছি দু'নয়ন !
দরিদ্র ভগিনী হায়, ভ্রাতৃ-ফোঁটা ভালে দেয়,
ভ্রাতা ভাবে, "রাজটীকা" বিশ্বে অতুলন !
ভস্ম মাখাইয়া গায়, যৌবন পলায়ে যায়—
প্রবীণারে তবু স্বামী ভাবে গো নবীনা !
প্রেম-স্পর্শমণির এ কি রে গুণপনা ?

৭

কে বলে পরশমণি স্বপন অলীক ?
ইহারি মৃদুল স্পর্শে, জাগি উঠি মহা হর্ষে,
বিহ্বল হয়েছে কবি, অনন্ত প্রেমিক !
প্রমত্ত মাতঙ্গ শুণ্ডে, সাপটিয়া দুই ভুজে,
নিরখিছে গজমুক্তা, আঁখি অনিমিক !
লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী, কালসর্প বিষধরী ;
উত্তাল ফণায় তার হস্ত প্রস্থাপিয়া,
হেরিছে রতন-বিভা, হাসিয়া হাসিয়া !

৮

কে বলে পরশমণি নাহি এ ভুবনে !
প্রজাপতি কলেবরে, সিন্ধুবারে থরে থরে,
প্রিয়ার দশনে আর উজ্জ্বল নয়নে ;
উষার নয়ন-জলে, স্ফুট জয়ন্তীর দলে,
ছেয়ে দিল স্পর্শমণি রতনে রতনে !

৯

কে বলে পরশমণি মানব-নয়ন ?
হে কবি বুঝেছ স্থূল, কবি-চক্ষে একি ভুল ?
জাগ্রতে হেরেছ তুমি অলীক স্বপন ?
দুইটি খঞ্জন হেরে, পড়িয়ে মায়ার ফেরে,
ভাবিছ কাঞ্চনে জ্বলে মাণিক্য মোহন ?
ঝালর হইতে তুলে, একখণ্ড কাচ খুলে,
মানবে দিয়াছে বিধি স্ফটিক দর্পণ।
রঙ্গিন এ কাঁচ দিয়া, এই বিশ্ব নিরখিয়া,
কি দেখিতে কি দেখিছ ? অসত্য দর্শন !
হেরি ইন্দ্র নীলকান্তি, কবির হইল ভ্রান্তি ?
কে বলে পরশমণি মানব-নয়ন !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রঘুবংশ। কালিদাস-প্রণীত রঘুবংশ কাব্যের বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ। প্রথম হইতে অষ্টম সর্গ পর্য্যন্ত।—শ্রীনবীনচন্দ্র দাস, এম-এ প্রণীত। বলিতে কি, বহুকাল কোনও অনুবাদ পড়িয়া এমন আনন্দ হয় নাই। আমরা নবীন বাবুর অনুবাদ করিবার শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তিনি অনুবাদে মূলের যেরূপ ভাব রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন, সচরাচর অনুবাদে সেরূপ দেখা যায় না। অথচ, তাঁহার ভাষা শ্রুতিকটু বা কঠোর হয় নাই। আমরা মূল ও অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ মূলের সহিত মিলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, অনুবাদ কেমন মধুর হইয়াছে। রঘুবংশের প্রথম সর্গে, দিলীপ যখন মহিষী সুদক্ষিণাকে লইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের তপোবনে যাইতেছেন, তখন পথের বর্ণনা দেখুন,—

মূল

সেবামানৌ সুখস্পর্শৈঃ শালনির্য্যাসগন্ধিভিঃ।
পুষ্পরেণূৎকিরৈর্বাতৈরাধূতবনরাজিভিঃ॥

পরস্পরাক্ষিসাদৃশ্যম্ অদূরোজ্ঝিতবর্ত্মসু।
মৃগদ্বন্দেষু পশ্যন্তৌ স্যন্দনাবদ্ধদৃষ্টিষু॥

অনুবাদ।

ছড়ায়ে কুসুমরেণু বহিল সমীর
পরশে শীতল করি দেহ দু'জনার,
বায়ুভরে বনরাজি নত করে শির,
শালবনসুবাসেতে পুরিল কান্তার।
অদূরে দাঁড়ায়ে পথে হরিণ হরিণী
নির্ভয়ে নেহারে রথ বিশাল নয়নে,
কৌতুকে সে আঁখিশোভা দেখে রাজা রাণী,
পরস্পর আঁখি সহ তুলনে দু'জনে।

"অস্তপ্রায় যবে রবি পশ্চিম গগনে," তখন রাজদম্পতী তপোবনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন —

আকীর্ণমৃষিপত্নীনামুটজদ্বাররোধিভিঃ।
অপত্যৈরিব নীবারভাগধেয়োচিতৈর্মৃগৈঃ॥

অত্যন্ত নীবার মুষ্টি পাইবার তরে,
দাঁড়ায়েছে মৃগকুল সতৃষ্ণ অন্তরে,
পর্ণকুটীরের দ্বার করিয়া

শিল্পবিজ্ঞানের কোথায় কি অভাব দূর করিতে পারিলে দু'হাতে পয়সা কুড়ান যায়, রেম্‌ফ্রী সাহেব তাঁহার জাতিভায়াদের জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সেই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে অভাবমাত্র বিবৃত হইয়াছে, উপায় দেখান হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস, ইয়ুরোপের বিজ্ঞানবিৎ শিল্পজীবীরা বরং এই পুস্তিকার দ্বারা কথঞ্চিৎ উপকৃত হইতে পারিবে। কিন্তু, আমাদের জাতীয় বুদ্ধির উদ্ভাবনীশক্তি যেরূপ, তাহাতে বোধ হয় যে, এতদ্দ্বারা আমাদের কোনও উপকারলাভের সম্ভাবনা নাই।

সতীশ বাবু, গ্রন্থকারের অনুরোধে এই পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুবাদের যথেষ্ট প্রশংসা করিতেছি। এরূপ পুস্তকের অনুবাদ বড় কঠিন কার্য্য, সতীশ বাবু এই দুরূহ কার্য্য যেরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা সাধুবাদের যোগ্য। অনুবাদে তাঁহার যোগ্যতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

আমরা আশা করি, অতঃপর সতীশ বাবু উপযুক্ত বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতার পরিচয় দিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের উপরে বাঙ্গালাভাষার অনেক দাবী দাওয়া আছে। তাঁহারা যদি অবসরক্রমে বাঙ্গালাভাষার সেবায় প্রবৃত্ত হন, কালে তাহাতে অনেক সুফল ফলিতে পারে।

এটা কোন যুগ? যুগ কাল সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচার।—শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। দেউস্কর মহাশয় মহারাষ্ট্র দেশীয় ব্রাহ্মণ যুবক;—ভিন্ন-দেশীয় হইয়াও তিনি বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহা আশ্চর্য্য, অনুকরণীয় এবং আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রশংসার যোগ্য। তাঁহার লিপিকৌশল "সাহিত্যের" পাঠকগণের অবিদিত নাই। যুগকালের বিচারেও পাঠক প্রাঞ্জল ভাষার মাধুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গভীর গবেষণাশক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন।

মুরলী। ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক, ইহাতে লেখকের নাম নাই। ছোট ছোট চব্বিশটি পাতায় চব্বিশটি সনেট আছে। সব সনেটগুলি সনেটের লক্ষণাক্রান্ত না হউক, আমরা পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। বোধ করি, ইহাই লেখকের প্রথম উদ্যম। তাঁহার হৃদয়ে ভাব আছে, ভাষা আছে, ভবিষ্যতে যদি উভয়ের প্রতি সমান আধিপত্য বিস্তার করিয়া, মনের কথা গুছাইয়া বলিতে পারেন, তাহা হইলে অনেক হৃদয় তাঁহার বীণাধ্বনিতে আকৃষ্ট হইবে।

বিকাশ। এখানিও একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। বিকাশের লেখকও আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন নাই। অনেকগুলি কবিতা আশাপ্রদ বলিয়া হইল। বিকাশ-প্রণেতার চিন্তাশক্তি আছে, তাঁহার ভাষাও মিষ্ট; ছন্দও মন্দ নহে। নবীন কবি যদি অনুকরণ না করিয়া নিজের পথ নিজে খুঁজিয়া লইতে পারেন, কালে সফলমনোরথ হইবেন। তাঁহার দৃষ্টি [illegible] দূরে, লক্ষ্য উচ্চ, সুতরাং তাঁহার পথও বড় কঠিন। আশা করি, তিনি [illegible] প্রহেলিকায় নিজের কবিতা আবৃত না করিয়া, উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন।

মনোরমার গৃহ।—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। আমরা এই পুস্তকখানি পড়িয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি। মনোরমার গৃহ একটি সাদা-সিদে সাংসারিক গল্প। চণ্ডী বাবু এই পুস্তকে সংসারের বেশ একটি সুখের চিত্র আঁকিয়াছেন। কিন্তু কেমন করিয়া সেই চিত্র নিজের গৃহে আঁকিয়া তোলা যায়, তাঁহার পুস্তকপাঠে তাহা বুঝা যায় না। তিনি যদি প্রতিপন্ন সত্যমাত্র লিপিবদ্ধ না করিয়া, সেই সত্যে উপনীত হইবার প্রণালী, পদ্ধতি ও উপায় দেখাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইত।

"মনোরমার গৃহের" ভাষা প্রাঞ্জল ও মনোহর। কিন্তু দোষশূন্য নহে। আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে গ্রন্থকার ভাষা আরও মার্জ্জিত ও বর্ণাশুদ্ধি একবারে দূরীকৃত করিবেন। অল্পশিক্ষিত বঙ্গবালারা সচারচর বাঙ্গলা গল্প পড়েন। এই পুস্তকও তাঁহাদের জন্যই প্রধানতঃ কল্পিত। তাঁহারা যাহাতে গল্প পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষা করিতে পান, তাহা সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

গ্রন্থকারের বর্ণনাশক্তি আছে, তিনি বেশ মিষ্ট করিয়া গল্প বলিতে পারেন। আমরা বঙ্গীয় মহিলাদের এই পুস্তক পড়িতে অনুরোধ করি; তাঁহাদের পরিশ্রম বিফল হইবে না।